

# মহাভারত ও ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য (দ্বিতীয় খণ্ড)

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on *Mahabharata* before the students of  
Indian Spiritual Heritage Diploma Course at Ramakrishna Vivekananda University,  
Belur Math in the year 2011

(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

## বিরাটপর্ব

### পাণ্ডবদের এক বছর অজ্ঞাতবাস

পাণ্ডবদের এবার এক বছর অজ্ঞাতবাস করতে হবে। কিন্তু একটি বছর অজ্ঞাতবাস করা এদের পক্ষে সত্যিই দুরূহ। কারণ নকুল সহদেবের ঐ রূপ, ভীমের ঐ বিশাল চেহারা আর দ্রৌপদীর রূপের ঐশ্বর্যকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা খুবই মুশকিল, যেখানেই যাবে সবাই চিনে নেবে। পাণ্ডবরা ঠিক করলেন সবাই নিজেদের পরিচয় ও নাম পাল্টে বিরাট রাজার রাজমহলে গিয়ে কাজ নেবেন। বিরাট রাজা আর কৌরবদের ভেতরে প্রথম থেকেই একটা ঠাণ্ডা লড়াই ছিল। মাঝে মাঝেই এই দুই রাজ্যের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকত। সেইজন্য বিরাট রাজার ওখানে আশ্রয় নেওয়াটাই পাণ্ডবদের নিরাপদ মনে হল, ওখান থেকে বেশী খবর বেরোতে পারবে না। অর্জুনের উপর যে এক বছরের জন্য নপুংসক হওয়ার অভিশাপ ছিল, অর্জুন ঠিক করল এইটাই অভিশাপকে কার্যকর করার উপযুক্ত সময়। নপুংসক হলে অর্জুনকেও কেউ চিনতে পারবে না। অর্জুন এখন বিরাট রাজার রাজমহলে গিয়ে বিরাটের মেয়েকে নাচ-গান শেখানর কাজ নেবে। আর ভীমের খাওয়া-দাওয়া করা যেমন পছন্দের রান্নাবান্না করাটাও তাঁর মনপসন্দ কাজ। তাই ঠিক হল ভীম রাঁধুনি হয়ে বিরাট রাজার পাকশালায় চাকরী নেবে। যুধিষ্ঠির ছদ্মবেশে রাজার সভাসদ হয়ে থাকবে। নকুল আর সহদেবের একজন ঘোড়া অন্যজন গরু দেখার কাজ নেবে। দ্রৌপদী স্বৈরিকীর কাজ নেবে। স্বৈরিকী একটা বিশেষ জাত, এদের কাজ ছিল রানীদের চুল বেঁধে দেওয়া, প্রসাধন করান ইত্যাদি। আর সবাই এমন ভাবে কায়দা করে পরিচয় দেবে যে আমরা সবাই রাজা যুধিষ্ঠিরের দরবারে ছিলাম। পাণ্ডবদের সঙ্গে সব সময় প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র থাকত, এখন এই অস্ত্র নিয়ে তো রাজদরবারে যাওয়া যাবে না। সব অস্ত্র আর অন্য আরও অনেক কিছু একটা কাপড়ের মধ্যে বেঁধে শমী বৃক্ষের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হল। শমী বৃক্ষ আসলে একটা অভিশপ্ত ও অপবিত্র বৃক্ষ, লোকজন কেউ ঐ বৃক্ষের ধারে কাছে যায় না। আর অস্ত্রের পুটলটাকে এমন ভাবে কাপড়ে পেঁচিয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছে দূর থেকে দেখে মনে হবে কেউ যেন গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। একেই শমী বৃক্ষ অপবিত্র তার ওপর একটা মরা ঝুলছে দেখে কোন মানুষ ঐ বৃক্ষের ধারে কাছেই যাবে না।

### রাজকর্মচারীর রাজার প্রতি আচরণের ব্যাপারে যুধিষ্ঠিরকে ধৌম্যের শিক্ষা

সবাই এইভাবে অনেক চিন্তা ভাবনা করে বিরাট রাজার ওখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। তখন ধৌম্য ঋষি, যিনি পাণ্ডবদের পুরোহিত ছিলেন, যুধিষ্ঠিরকে বলছেন ‘যুধিষ্ঠির! তুমি তো এত দিন ছিলে রাজা। কিন্তু দরবারীর কাজে রাজার মোসায়ের হয়ে থাকার কোন অভিজ্ঞতা তোমার নেই। তাই আমি তোমাকে এই ব্যাপার কিছু শিক্ষা দিচ্ছি’। মহাভারতে এই ধরণের অনেক শিক্ষা কাহিনী প্রসঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেমন তুমি যখন রাজা অর্থাৎ চিফ এক্সিকিউটিভ হয়েছে তখন তোমার কি ধরণের আচরণ হবে আবার তুমি যখন অধঃস্তন কর্মচারী হয়ে যাবে তখন কিভাবে কাজ করবে। যুধিষ্ঠিরকে এখন রাজার অধঃস্তন কর্মচারী হয়ে কিভাবে থাকবে সেই ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

যখন তুমি রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাবে প্রথমে তুমি রাজার যে দ্বারপাল তার সাথে দেখা করবে। যতই রাজার সাথে তোমার পরিচিতি থাকুক, যতই রাজা তোমাকে ভালোবাসুক, সরাসরি তুমি কক্ষণ রাজার সঙ্গে দেখা করতে যেও না। রাজার আঙা পাওয়ার পরই তুমি ভেতরে যাবে, নিজে থেকে কখনই ঢুকে পড়বে না। রাজা কখন কি ভাব নিয়ে থাকবে বলা যায় না, তুমি যদি সরাসরি চলে যাও তখন ঐ ভাবের ধাক্কাটা প্রথমে তোমার উপর লাগবে। দ্বারবান দিয়ে যখন তুমি খবর পাঠালে, তখন রাজা একটা মানসিক প্রস্তুতি নেওয়ার সময় পেয়ে যাবে। আমরা যে অনেক সময় বড় বড় অফিসার বা বসের চেম্বারে যখন তখন ঢুকে পড়ি এটা কখনই শোভনীয় নয়, এটাই এখানে ধৌম্য যুধিষ্ঠিরকে বোঝাচ্ছেন।

যো ন যানং ন পর্যাঙ্কং ন পীঠং ন গজং রথম্। আরোহেৎ সম্মতোহস্মীতি স রাজবসতিং  
বসেৎ। ১৪/৪/১২। আমি রাজার প্রিয় লোক, রাজা আমাকে খুব খাতির করেন এই মনে করে যে রাজার হাতি, ঘোড়া, রথ, পালঙ্ক, চটি, জুতা ব্যবহার করে না সেইই রাজভবনে বাস করার উপযুক্ত আর সেই রাজবাড়িতে শান্তিতে থাকে। এখানে

রাজাকে বলতে আজকের দিনে বস, মন্ত্রী, আমলা এদেরকেই বোঝাবে। আমি বসের প্রিয় বলে বসকে না জিজ্ঞেস করে বসের গাড়িটা নিয়ে কোন কাজে চলে গেলাম, হয়তো বসেরই কাজে গেছি, কিন্তু বস যখন বেরিয়ে দেখবে তার গাড়ি নেই, তখন পিওন যখন বলবে এইতো আপনার সেক্রেটারি এফুগি গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, বস তখন স্বাভাবিক ভাবেই অসন্তুষ্ট হবেন। যেসব জায়গায় বসলে বা আড্ডা মারলে তোমাকে দুরাচারী বলে সন্দেহ করতে পারে সেইসব জায়গায় কখন বসে আড্ডা মারবে না। যতক্ষণ না তোমাকে জিজ্ঞেস করছে ততক্ষণ রাজাকে তাঁর কর্তব্যের ব্যাপারে উপদেশ দিতে যাবে না। মিথ্যা কথা যারা বলে তাদের প্রতি রাজার খুব নজর থাকে। রাজার যারা দরবারী তাদেরকে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে – *নৈষাং দারেষু কুব্বীত মৈত্রীং প্রাজ্ঞঃ কদাচন। অন্তঃপুরচরা যে চ দ্বেষ্টি যানহিতাশ্চ যে।* ১৪/৪/১৬। রাজার রানীদের সাথে খুব একটা বন্ধুত্ব রাখতে নেই। বসেদের স্ত্রীদের সাথে বন্ধুত্ব কেউ যদি রাখতে যায় সে কিন্তু যে কোন দিন মহা ঝামেলায় পড়ে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, রানীবাসে যারা আনাগোনা করে, অর্থাৎ তোমার যারা সম্মানীয় ব্যক্তি তাদের স্ত্রীরা, রানীর বান্ধবীরা, রাজার সেবিকারা, দাসীরা যাদের রানীবাসে যাতায়াত আছে তাদের সঙ্গে কখন পরিচয় রাখতে নেই। যদি কখন রাজা দেখেন তাঁর কোন দাসী বা সেবিকার সাথে তোমার পরিচয় আছে তখন রাজা তোমাকে সন্দেহ করবে। রাজপরিবারের মহিলা সদস্যদের সঙ্গে কখনই কোন পরিচয় রাখতে নেই। রানীদের ব্যাপারে যদি তোমাকে রাজা কোন কাজ দেন শুধু সেটুকু চূপচাপ করে বেরিয়ে আসবে। রাজার যারা অশুভাকাঙ্ক্ষী তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না, রাজা যদি আজকে কিংবা কালকে জানতে পারে এদের সাথে তোমার মেলামেশা আছে তাহলে তুমি কিন্তু বিপদে পড়ে যাবে। রাজার ঘরে প্রবেশ করে যদি দেখ তোমার বসার জন্য আসন রাখা আছে তাও রাজা যতক্ষণ তোমাকে বসতে না বলছে বসবে না। যদি দেখ রাজা কোন ব্যাপারে নিজের মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন করছেন তখন নিজেকে জন্মান্ন মনে করে সেই রকম আচরণ করবে। ভারতের একটি রাজ্যে কয়েক বছর আগে হিন্দু-মুসলমানদের একটা দাঙ্গা হয়েছিল। সেই দাঙ্গার ব্যাপারে একটা তদন্ত কমিটি বসান হয়েছিল। তদন্ত কমিটির প্রথম মিটিংএ নাকি কথা উঠেছিল যে দাঙ্গার আগে সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নাকি পুলিশ অফিসারদের নিয়ে একটা স্পেশাল মিটিং করেছিলেন। সেই মিটিংএ মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে মুসলমানদের একটা উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে এবং সেখানেই নাকি এই দাঙ্গা লাগাবার একটা পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পরে এক ইয়ং পুলিশ অফিসার সুপ্রীম কোর্টে বলেছে যে আমি ঐ মিটিং ছিলাম আর মুখ্যমন্ত্রী ঐ কথা বলেছিলেন। মজার ব্যাপার হল যেসব পুলিশ অফিসারদের নাম বলেছে তাদের মধ্যে দুজন অফিসার বলেছে আমার তো মনে নেই সেই মিটিংএ কি আলোচনা হয়েছিল। আর চারজন অফিসার বলেছে এই রকম কোন মিটিংই হয়নি। আর যিনি তদন্ত করছিলেন তিনি বলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী এত জুনিয়র অফিসারকে মিটিংএ ডাকতেই পারেন না। ধোঁয়া ঠিক এই কথাই বলছেন, যদি দেখ রাজা তাঁর মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন করছে তুমি এমন আচরণ করবে যেন তুমি জন্মান্ন, মানে তুমি কিছুই দেখনি। রাজার যদি সায় না থাকে এত বড় দাঙ্গা কখনই হতে পারেনা, সেটাই চারজোন অফিসার মিটিংএ ছিল অথচ বলেছে এই ধরনের কোন মিটিংই হয়নি, একেবারে জন্মান্ন হয়ে গেছে তখন। একটা মজার সিনেমা হয়েছিল, ব্রিটেনের একটা খুব নামকরা ল ফার্ম ছিল। বাপ-ঠাকুরদার আমলের কোম্পানি। এখন মালিকের ছোট ছেলেটি ঐ ফার্মে কাজ করছে। ছোট ছেলেটি একজন ক্লায়েন্টের সাথে অফিসে বসে কথা বলছিল। কথা বলতে বলতে খুব উত্তেজিত হয়ে একটা পেপার ওয়েট ছুড়ে মেরেছে। সেই পেপার ওয়েটটা দেওয়ালে তার ঠাকুরদার কাঁচের ফ্রেমে ছবিতে লাগতেই কাঁচটা গেছে ভেঙে। আর ঐ অফিসটা ছিল তার বাবার। বাবা হয়তো এসে তার কর্মচারিকে জিজ্ঞেস করবে ‘তুমি কি জান এই ছবির কাঁচটা কি করে ভেঙেছে?’ লোকটি যদি বলে ‘আপনার ছেলে পেপার ওয়েট ছুড়ে মেরে ভেঙেছে’। তখন ছেলেকে বাবা সোজা করে দেবে। কিন্তু কর্মচারি জানে এই ছেলেটিই পরে মালিক হবে। ছেলেটিও সেই কর্মচারিকে ডেকে জিজ্ঞেস করছে ‘তুমি কি জান ছবির কাঁচটা কি করে ভেঙেছে?’ কর্মচারিটি ভালো করেই জানে যে ছেলেটি ভেঙেছে, কিন্তু বলেছে ‘না স্যার, আমার কোন ধারণাই নেই কাঁচটা কি করে ভাঙতে মারে?’ তখন সে জন্মান্ন হয়ে গেছে। তখন ছেলেটি পাঁচ পাউণ্ডের একটা নোট বার করে বিদায় করে বলেছে ‘তুমি জীবনে অনেক উন্নতি করবে’। এরপরে বাবা এসে হয়তো জিজ্ঞেস করবে তখন কর্মচারিটা বলবে ‘স্যার আমিতো জানিনা কি করে হল, আমি দেখিনি’। যদি বাঁচতে হয়ত তাহলে তোমাকে এইসব ব্যাপারে জন্মান্ন হতে হবে।

রাজা যদি কখন নিজেকে অপমানিত মনে করে তখন রাজা নিজের সন্তান, নাতিপুত্র, ভাই এদেরও সম্মান করে না, দরকার পড়লে এদেরকে বধও করে দিতে পারে, কেননা রাজা প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হয় কিনা। রাজার কাছে যখন থাকবে তখন তুমি মনে করবে তুমি আগুনের কাছে রয়েছ, যে কোন কারণে তুমিকে পুড়িয়ে দিতে পারে, সেইজন্য নিজেকে খুব সামলে নিয়ে চলবে। যে জিনিষ রাজার পছন্দ নয় কখনই সেই জিনিষ সেবন করবে না। তুমি হয়তো তামাক খাও, রাজা

হয়তো তামাক খাওয়া পছন্দ করেন না, কখন রাজার সামনে তামাক খাবে না। সরকারি অফিসে আজকাল কেউ অত কিছু হয়তো মনে করবে না, কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানিতে যদি কাজ করে সেখানে মালিক হয়ত পান খাওয়া পছন্দ করে না, তখন কর্মচারী যদি পান খায় তাহলে তার চাকরিও চলে যেতে পারে। এখানে রাজা মানেই প্রাইভেট কোম্পানি। ধৌম্য বলছেন *দক্ষিণং বাথ বামং বা পার্শ্বমাসীত বাগ্‌যতঃ। রক্ষিণাং হ্যাত্তশস্ত্রাণাং স্থানং পশ্চাদ্বিধীয়তে।* ১৪/৪/২৪। রাজদরবারে সব সময় রাজার ডান দিকে বা বাম দিকে বসবে, মুখোমুখি বা পেছনে কখন বসবে না। রাজার পেছনে সব সময় দেহরক্ষীরা থাকে। *শূরোহস্মীতি ন দৃশুঃ স্যাদবুদ্ধিমানিতি বা পুনঃ। প্রিয়মেবাচরন্ রাজতঃ প্রিয়ো ভবতি ভোগবান্।* ১৪/৪/২৭। রাজার সঙ্গে যখন থাকবে তখন আমি সুরবীর, আমি বুদ্ধিমান এই ভাবনা কখন মাথায় আনবে না, এই শক্তি থাকলেও রাজার সামনে কখন প্রকাশ করবে না।

*ন চৌষ্ঠৌ ন ভুজৌ জানু ন চ বাক্যং সমাক্ষিপেৎ। সদা বাতঞ্চ বাচঞ্চ ঈবনঞ্চাচরেচ্ছনৈঃ।* ১৪/৪/৩০। রাজার সামনে যখন বসে থাকবে তখন ঠোঁট, হাত আর হাঁটু বিনা কারণে নাড়বে না। এগুলো মানসিক অশান্তির লক্ষণ। যখনই কেউ কিছু শোনার সময় পা নাড়তে থাকে তখন বুঝতে হবে তার একঘেঁয়ে লাগছে বা মনটা কোন কারণে উদ্ভিন্ন হয়ে আছে। রাজার সামনে অযথা বকবক করবে না। তোমাকে যখন রাজার সঙ্গে কথা বলতে হবে তখন খুব ধীরে ধীরে কথা বলবে। যদি তোমাকে থুতু ফেলতে হয় তাহলে খুব হালকা করে ফেলবে যাতে রাজা বুঝতে না পারে। এগুলোই হল ভদ্র আচরণ। বড়দের সামনে, সম্মানীয় ব্যক্তিদের সামনে কিভাবে আচরণ করতে হবে তার নিখুঁত বিশ্লেষণ এখানে করা হয়েছে। রাজার দরবারে যদি কোন হাসির কিছু হয়ে যায়, বা হাসি পাওয়ার মত কথা শুনে নিলে কিংবা দেখে নিলে তখন ঐ নিয়ে খুব বেশী হাসাহাসি করবে না। দরবারীরা আসলে হল সব মোসায়ের। মোসায়েরদের মধ্যে একটা রেয়ারেমি চলে কে কাকে নীচে ফেলে টেকা দিয়ে রাজার খাস লোক হবে। এরা তাই সব সময় চেষ্টা করে রাজাকে কিভাবে খুশি করা যায়। এক রাজার অনেকগুলো এই রকম মোসায়ের ছিল, আর মন্ত্রী এদের থেকে একেবারে নাজেহাল হয়ে থাকতেন। মন্ত্রী একদিন ঠিক করল এদের একটু শিক্ষা দিতে হবে। রাঁধুনি কে দিয়ে একদিন মন্ত্রী বেগুন পোড়া বানিয়েছেন। এত সুন্দর বেগুন পোড়া খেয়ে রাজা খুব খুশি হয়ে পরের দিন সকালে বলছে ‘কাল যা বেগুন পোড়া খেলাম, মুখে লেগে আছে’। দরবারী গুলো বলছে ‘হুজুর কি বলব, বেগুনের মত কিছু হয় নাকি! কি সুন্দর রঙ, আর তাই না, বেগুনের মাথাটা কি সুন্দর, একটা রাজমুকুটের মত’। অনেকক্ষণ ধরে তারা বেগুনের নানা প্রশংসা করে যাচ্ছে। সেই রাতে রাজাকে আবার বেগুন পোড়া দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রীর গোপন নির্দেশে ওতে খুব করে ঠেসে লক্ষা দেওয়া হয়েছিল। ঐ ঝাল বেগুন পোড়া খেয়ে রাতে রাজার পেটব্যথা শুরু হয়েছে। লক্ষার জ্বালাতে রাজার প্রচণ্ড পেটব্যথা হচ্ছে, পেটের জ্বালায় সারা রাত ছটফট করে গেছে। পরের দিন রাজদরবারে দরবারীদের সামনে বলছে ‘আরে কাল বেগুন পোড়া খেয়ে আমি পেট ব্যথার জন্য সারা রাত ঘুমোতেই পারিনি’। দরবারীগুলোও সঙ্গে সঙ্গে বলছে ‘হ্যাঁ হুজুর ঠিকই বলেছেন বেগুনের মত বাজে জিনিষ কি আর কিছু হয়! সেইজন্যই তো বেগুন বলে, কোন গুণ নেই তার, গায়ে আবার কাঁটা থাকে’। রাজা তখন বলছে ‘কালকে তো তোমরা বেগুনের এত প্রশংসা করেছিলে আজ আবার এত নিন্দা কেন করছ’! মন্ত্রী এইটাই চাইছিল। তখন দরবারীরা বলছে ‘হুজুর! আমরা তো আপনার দরবারী বেগুনের দরবারীর তো আমরা নই, আমরা রাজার দরবারী, রাজা যার গুণগান করবে আমরাও তার গুণ গাইব’। দরবারীদের অনেক মজার মজার কাহিনী আছে। নবাবদের সময় তখন প্রচুর অর্থ তাদের কাছে থাকত। আর মোসায়েরগুলো চেষ্টা করত রাজাকে তোষামোদ করে হোক আর যেই করেই হোক কিভাবে রাজার কাছ থেকে কিছু আদায় করবে। আর এক অপরকে সব সময় অপদস্ত করার চেষ্টা করে যাবে।

ধৌম্য ঋষি যধিষ্ঠিরকে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। *হাস্যবস্ত্রস্য চাপ্যস্য বর্তমানেষু কেষুচিৎ। নাতিগাঢ়ং প্রহস্যেত ন চাপ্যন্মত্তবদ্রসেৎ।* ১৪/৪/৩১। হাসির কিছু কথা হলে তুমি অট্টহাস করে হাসবে না আবার জড়বৎ হয়ে বসেও থাকবে না। সব কিছুই করবে কিন্তু মাত্রা রেখে একটু মিষ্টি হাসি দেবে। কোন কিছুতে মাত্রা ছাড়াবে না। যে দরবারী রাজা আর রাজকুমারের প্রশংসা করতে থাকে সেই একমাত্র রাজদরবারে টিকে থাকতে পারে। কোন কারণে রাজা যদি তোমার উপর অকারণে রেগে গিয়ে দণ্ড দেয় কিন্তু তারপরেও তুমি যদি রাজার নিন্দা না কর তাহলে তুমি আবার তোমার ঐ ক্ষমতা পেয়ে যাবে। তোমাকে দণ্ড দেওয়ার পর যদি রাজার নিন্দা করতে থাক, রাজা একটা বদমাইশ লোক, রাজার বুদ্ধি নেই বলে নিন্দা করতে থাক তাহলে কিন্তু তুমি আর কোন দিন ঐ আগের মর্যাদা ফিরে পাবে না। যদি নিন্দা না কর তাহলে রাজারও কোন দিন মনে অনুতাপ হতে পারে আমি একে দণ্ড দিয়ে ভুল করেছি, তখন হয়তো তোমাকে আবার ডেকে নেবে। যদি তুমি গায়ের জোরে বা কায়দা করে রাজাকে নিজের মুঠোয় রাখার চেষ্টা কর তাতেও কিন্তু বিপদে পড়ে যাবে, এমন কি

তোমার প্রাণ হানিও হতে পারে। অন্যসম্মান প্রেম্যমানে তু পুরস্কাদ্যঃ সমুৎ পতেৎ। অহং কিং করবাণীতি স রাজবসতিং বসেৎ। ১৪/৪/৪০। যদি দেখ রাজা কাউকে কোন কাজে পাঠাচ্ছে তখন তুমিও উঠে গিয়ে হাঙ্কা করে বলবে ‘আমার জন্যও কি রাজার কোন আদেশ আছে?’ নিজে থেকে এগিয়ে এলে রাজা খুশি হয় আর এই ধরনের লোকেরাই রাজগৃহে বাসের উপযুক্ত।

ধৌম্য ঋষি বলছেন – যুধিষ্ঠির! রাজা যেরকম সাজ পোশাক পরিধান করে তুমিও সেই রকম সাজ পোশাক পড়বে না। এতে রাজা কিন্তু অসন্তুষ্ট হতে পারে। রাজা যেরকম চটি জুতো ব্যবহার করছে তুমিও সেই রকম চটি জুতো ব্যবহার করবে না। ইদানিং কালে কোন কোম্পানির মালিক প্লেনে যাওয়ার সময় যদি দেখে সেই প্লেনে তার কোম্পানির কোন কর্মচারিও যাচ্ছে তখন কোম্পানির মালিকের সেটা পছন্দ হবে না। এমন ভাবে চলতে নিষেধ করা হচ্ছে যাতে রাজা মনে না করে যে তুমি রাজার সমকক্ষ হতে চাইছ। রাজা যদি তোমার সাথে কোন গোপন শলা পরামর্শ করে তখন সেই কথা কখনই কাউকে জানতে দেবে না, গোপনীয়তা যদি তুমি রক্ষা না করতে পার তাহলে তোমার উপর রাজার বিশ্বাস চলে যাবে।

রাজা যদি তোমাকে কখন কোন কাজের দায়িত্ব দেয় তখন সেই কাজের ফায়দা নেওয়ার জন্য কারুর থেকে এক পয়সা ঘুষ নিও না। যে রাজ কর্মচারি ঘুষ নেয় আজকে হোক কালকে হোক যখন জানাজানি হয়ে যাবে সে শাস্তি পায়। আজকে ভারতে আল্লা হাজারে থেকে রামদেও বাবারা সবাই দুর্নীতি নিয়ে কত কিছু বলছে। কিন্তু মহাভারতেই এখানে বলছে তুমি ঘুষ নিও না। মনুস্মৃতিতেও বলছে যদি কেউ ঘুষ নেয় তাকে দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতে রাজার মন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজার খাস লোক সবারই মধ্যে ঘুষ নেওয়ার রেওয়াজ পাকাপোক্ত ভাবে বসে গেছে। প্রাচীন কাল থেকে ঘুষ নেওয়াটা ভারতীয় জীবনধারার একটা রীতিমত সংস্কার হয়ে আছে। ইংরেজরা যখন ভারতের রাজদণ্ড গ্রহণ করেছিল তখন তারা কখনই ভারতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগ করত না। দুর্নীতি বিশেষ করে ঘুষ নেওয়া আর কমিশন খাওয়া ভারতীয়দের রক্তের মধ্যে একেবারে মিশে আছে। যে যেখানে যতটুকু ক্ষমতায় আছে সে সেখানেই ঘুষ নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করছে না। আমাদের সংস্কারের মধ্যে এই দুর্নীতি ঢুকে আছে। অনশন করে, আন্দোলন করে এই জিনিষকে আটকানো যায় না। আল্লা হাজারের মত হাজারটা লোক প্রাণ দিয়ে দিলেও দেশ এই দুর্নীতি থেকে রেহাই পাবে না। একমাত্র আধ্যাত্মিক বিকাশ মানুষের মধ্যে যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ এই অব্যবস্থা চলতেই থাকবে। মহাভারতের মত ধর্মগ্রন্থ বলছে ঘুষ নিও না, তার মানে সেই যুগেও ঘুষ নেওয়ার প্রবৃত্তি ছিল বলেই যুধিষ্ঠিরকে সাবধান করা হচ্ছে তুমি ঘুষ নিও না। এরপর বলছেন রাজা যদি খুশি হয়ে তোমাকে কোন উপহার দেয়, কোন পোশাক দিল, অলঙ্কার দিল তখন সেটা পরিধান করে রাজার সামনে যাবে, তাতে রাজা খুশি হয়। এইভাবে যুধিষ্ঠিরকে অনেক কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর বিরাট রাজার কাছে পাঠিয়েছেন।

### ভীম কর্তৃক কীচক বধ

বিরাট রাজার ওখানে সবাই নিজের নিজের নাম পাঁটে নিয়েছে। যুধিষ্ঠিরের নাম হল কঙ্ক, ভীম রাঁধুনির কাজ নিয়ে নাম নিল বল্লব। বৃহল্লা নাম নিল অর্জুন, তাঁর কাজ নাচ-গান শেখান। নকুল আর সহদেব নাম নিল গ্রন্থিক আর অনিষ্টনেমি, নকুল ঘোড়া দেখার কাজ আর সহদেব গোশালার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ নিয়েছে এবং দ্রৌপদী নাম নিল মালিনী এবং স্বৈরিকীর কাজে নিযুক্ত হল। সবাই যে যার কাজে নেমে পড়েছে। স্বৈরিকীর বেশে দ্রৌপদী তো দেখতে প্রচণ্ড রূপসী। বিরাট রাজার পাটরানীর এক ভাই সেখানে থাকত, তার নাম কীচক। কীচক ছিল খুব বড় পালোয়ান, সে আবার বিরাট রাজার সেনাপতিও ছিল। কীচকের শক্তি ও ক্ষমতার কথা চিন্তা করেই দুর্যোধনরা বিরাট রাজ্য আক্রমণ করতে সাহস করত না। বিরাট রাজাও কীচকের ক্ষমতার ভয়ে তাকে বেশী ঘাটাত না, কীচক যা খুশি করত কিন্তু বিরাট রাজা চোখ বুজে থাকত। কীচকের ঐ শক্তিমত্তার কথা ভেবে সবাই চুপ করে থাকত। এই কীচকের চোখে যখন দ্রৌপদীর সৌন্দর্য ধরা পড়ে গেছে তখন তো তার মাথা গেছে ঘুরে। কীচক গিয়ে তার দিদি রানীমাকে বলেছে ‘দিদি তুমি এই স্বৈরিকীকে আমার সেবায় পাঠিয়ে দাও’। দিদিও ভাইয়ের থেকে নিজেকে একটু সামলে রাখত আর ভাইয়ের প্রতি একটু পক্ষপাতও ছিল। বিরাট রাজার রানীর সঙ্গে দেখা করে দ্রৌপদী আগেই বলে রেখেছিল ‘দেখুন রানীমা, আমার পাঁচজন স্বামী আছে ঐরা সবাই যক্ষ, কিন্তু এখন তাঁরা অভিশপ্ত হয়ে আছেন বলে সামনে আসছেন না। আমি কিছু দিন থাকব তারপর আমি চলে



যাব’। রানীমাও অত কিছু না ভেবে দ্রৌপদীকে রেখে দিয়েছে। কীচক এখন দিদিকে বলছে কায়দা করে স্বৈরিক্তীকে তার রাজমহলে পাঠাতে।

দ্রৌপদীকে এসে রানী বলার পর দ্রৌপদী বলছেন ‘এই প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারছি না, আপনি অন্য কাউকে পাঠান’। রানী দ্রৌপদীর কথায় কোন গ্রাহ্য না করে এক রকম ভয় দেখিয়ে জোর করেই পাঠিয়েছে। দ্রৌপদী কীচকের রাজমহলে যেতেই কীচক তার শয়তানি শুরু করেছে। দ্রৌপদী কীচককে সাবধান করে দিচ্ছে ‘কীচক! আমার পাঁচজন স্বামী যক্ষ। তুমি কিন্তু বিপদে পড়ে যাবে, এই রকম কাজ করো না’। কীচক কোন কথাই শুনবে না। কীচকের শয়তানি শুরু হতেই দ্রৌপদী সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে সোজা রাজার দরবারে চলে এসেছে। কীচকও দ্রৌপদীর পেছনে ধাওয়া করে রাজদরবারে এসে দ্রৌপদীকে সবার সামনে এক লাথি মেরেছে। রাজার কোন ক্ষমতাই নেই যে কীচককে কিছু বলবে। দ্রৌপদী খুব কান্নাকাটি করছে। দ্রৌপদীর উপর এই অত্যাচারের খবর পাঁচ ভাইদের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে জানানো হয়ে গেছে। দ্রৌপদী রাজাকে বলছেন ‘রাজার কাজ হল প্রজার রক্ষা করা আর ধর্ম ও সত্য মার্গে স্থিত থাকা। যদি রাজা নিজের সম্মান আর আশ্রিতের মধ্যে একটুও তফাৎ করে তাহলে রাজার কিন্তু বিনাশ হতে বাধ্য। রাজা যজ্ঞ করে, দান করে, গুরুসেবা করে ততটা পুণ্য পান না, যতটা নিজের কর্তব্য ঠিক ঠিক পালন করে পান’। রাজা একমাত্র কর্তব্য পালন করেই পুণ্য লাভ করে অন্য কিছুতেই তার পুণ্য হয় না। দ্রৌপদী বলছেন ‘ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করলেন তখন ভালো মন্দ সব সৃষ্টি করে বলে দিলেন তুমি ভালোরও ফল পাবে না মন্দেরও ফল পাবে না, ফল পাবে সেটারই যেটাতে তোমার মনের ঠিক ঠিক প্রবণতা রয়েছে’। আমি যদি কাউকে বলি আপনি কি ভালো লোক, আপনার মত লোক হয় না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাকে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছি। কর্মফল কখনই আমি কি কাজ করছি সেই অনুসারে হয় না, আমার মনের ভাব অনুসারে ফল হবে। ঠাকুর বলছেন – ভগবান কে কি কাজ করছে দেখেন না, ভগবান মন দেখেন। এইসব কথা বলে দ্রৌপদী চলে এসেছেন। এখন তিনি একবার এর কাছে একবার ওর কাছে গিয়ে নিজের দুঃখের কথা বলছেন, যুধিষ্ঠিরদের এখন কিছু করার নেই। অর্জুন বলে দিলেন আমি তো এখন নপুংসক হয়ে আছি আমি কিছুই করতে পারব না। এরপর দ্রৌপদী লুকিয়ে ভীমের কাছে গিয়েছে, ভীম তখন ঘুমিয়ে ছিল, ভীমকে গিয়ে ধাক্কা মেরে উঠিয়ে সব বলেছে। ভীম উঠে বলছে ‘তুমি কোন চিন্তা করো না, তুমি কীচককে গিয়ে বল আজকে রাতে তোমার সাথে নৃত্যশালাতে দেখা করতে। কিন্তু তোমাকে যেতে হবে না, বাকিটা আমি সব করে নেব’। দ্রৌপদী কীচককে আমন্ত্রণ দিয়ে রেখেছে। ঐদিকে ভীম দ্রৌপদীর পরিবর্তে আগে থাকতেই পালঙ্কে শুয়ে আছে। কীচকতো উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে।

রাশিয়ার র্যাশ পুটিনের এই রকম একটা ব্যাপার ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় পুটিনের একটা বড় ভূমিকা ছিল। পুটিনের কিছু ব্যাপারে সিদ্ধাই ছিল। ওখানকার রাজার ছেলের হেমোফেলিয়া রোগ ছিল, মাঝে মাঝে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হত। পুটিনের একটা সিদ্ধাই ছিল রাজার ছেলের গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিলে ওর যন্ত্রণাটা সেরে যেত। এমনিত পুটিন মহা গোলমালে লোক ছিল। রাশিয়ার কোন মেয়েই পুটিনের ধারে কাছে নিরাপদ ছিল না। অথচ রানী পুটিনের প্রতি এত অনুগত ছিল যে কল্পনাই করা যায় না। আবার এদিকে পুটিনের নামে এত অভিযোগ আসত সেটা রাজা সহ্য করতে পারতেন না। একবার রাজা এতো তিতিবিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে পুটিনকে সরিয়েই দিয়েছিলেন। পুটিন তখন বলছে ‘আমাকে তুমি সরিয়ে দিচ্ছ! কদিন পর তুমিই আমাকে পাক্কী করে নিয়ে আসবে’। কদিন পরেই রাজার ছেলের হেমোফেলিয়া অসুখটা খুব বেড়ে গেছে, আর এই রোগের এমনিতে কোন চিকিৎসা নেই। ব্যাথা আর যন্ত্রণায় ছেলে চিৎকার করে যাচ্ছে। রানী হাউ হাউ করে কাঁদছে। শেষে রাজা বাধ্য হল পুটিনকে ডাকতে। পুটিন এসে ছেলের গায়ে একটু হাত বুলাতেই সব যন্ত্রণা চলে গেছে। এরপর পুটিনের অত্যাচারে রাশিয়ার ভদ্র সমাজ একেবারে অস্তির হয়ে গেছে, কারুর যে কোন কাজ করাতে হলেই পুটিনের কাছে যেতে হবে। আর যার কোন কাজ করার ব্যাপারে পুটিন সুপারিশ করে দেবে সেই কাজ হতে বাধ্য। কারুর ক্ষমতা ছিল না পুটিনের বিরুদ্ধে কিছু বলে। এদিকে পুটিন ছিল একেবারে নিরক্ষর, নিজের সইটাও ঠিক মত করতে পারত না। মহাভারতে কীচককে যে ভাবে ভীম মেরেছে পুটিনকে শেষে এই ভাবে মারা হয়েছিল। পুটিন এক সুন্দরী মেয়েকে দেখে প্রলুব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই মেয়েটিকে দিয়ে কায়দা করে চিঠি লিখিয়ে পুটিনকে পাঠান হয়েছিল যাতে লেখা ছিল আমি অমুক জায়গায় আপনার সাথে দেখা করব। পুটিন ওখানে যথারীতি পৌঁছে গেছে। ওখানে আগে থাকতেই দুটো লোক তৈরী হয়েছিল, এদের মেয়েকে অত্যাচার করেছিল বলে পুটিনের উপর খাপ্পা ছিল। পুটিন আসতেই এরা ছুরি নিয়ে পুটিনকে আক্রমণ করে। পরে পুটিনকে এই কারণেই মরতে হল। এগুলো খুব পুরনো কায়দা। এই ধরনের লোকেরা কোন মেয়ের প্রতি আসক্ত হলে সেই মেয়েকেই কাজে লাগিয়ে তাকে খুন করে দেয়।

কীচক খুব আনন্দে নৃত্যশালাতে এসেছে। বিছানার কাছে আসতেই ভীম কীচককে ধরে মারতে শুরু করেছে। দুজনে লড়াই শুরু হয়েছে। কীচকের কোন প্রস্তুতিই ছিল না বলে ভীম কীচককে মেরে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। শুধু মারেইনি, কীচকের হাত, পা সব ছিঁড়ে আলাদা করে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। মুণ্ডটাকে একেবারে মুচড়ে দিয়েছে। কীচককে মেরে দ্রৌপদীকে বলল ‘তুমি খবর দিয়ে দাও, আমার গন্ধর্ব স্বামীরা এসে কীচককে শেষ করে দিয়েছে’। দ্রৌপদী খবর দিতেই সবাই এসে গেছে। রাতের ঐ অন্ধকারে কীচকের ঐ অবস্থা দেখে সবাই হতচকিত হয়ে গেছে। কীচক ছিল মহা শক্তিশালী, কিন্তু ভীম এমন অবস্থা করে দিয়েছে যে তাকে চেনাই যাচ্ছে না। ভীমসেনের স্ত্রী! তাকে একজন এসে অপমানিত করছে ভীম তাকে আর ছাড়বে! সবাই তো প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে। কীচকের কিছু আত্মীয় সেখানে থাকত তাদের নাম ছিল উপকীচক। তারা এসে বলছে ‘এই শরীরটাকে তো এভাবে বেশীক্ষণ রাখা যাবে না, এক্ষুণি একে দাহ করিয়ে দিতে হবে’। ভীম মেরে কীচকের শরীরটা এমন বিকৃত করে দিয়েছে যে, যে কেউ দেখলেই ভয়ে আঁতকে উঠবে। উপকীচকরা বলছে ‘কীচক আমাদের সেনাপতি ছিল, দ্রৌপদীর জন্যই আমাদের সেনাপতির এই অবস্থা হয়েছে তাই এর সাথে দ্রৌপদীকে দাহ করিয়ে দেওয়া হোক। কীচক দ্রৌপদীকে যখন জীবিত অবস্থায় পায়নি এখন মৃত অবস্থাতেই দ্রৌপদীকে যেন পায় সেই ব্যবস্থাই করতে হবে’। স্বৈরিক্তীকে এবার বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দ্রৌপদী তো বুঝতে পেরেছে যে ওকে মেরে কীচকের সঙ্গে পুড়িয়ে দেবে। দ্রৌপদী খুব চিৎকার করে আত্ননাদ করে স্বামীদের ডাকছে তোমরা কোথায় আছ আমাকে রক্ষা কর। পাণ্ডবেরা বিরাট রাজার ওখানে সবাই একটা করে ছদ্মনামে পরিচয় দিয়েছিল। কঙ্ক, বৃহন্নলা এই নাম নিয়েতো ডাকা যাবে না, ধরা পড়ার ভয় থেকে যাবে। কিন্তু এই পাঁচজনের মধ্যে যদি কোন গোপন বার্তা পাঠাবার দরকার পড়তে পারে ভেবে তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলাদা নাম করে রেখেছিল – যুধিষ্ঠির জয়, ভীম জয়ন্ত, অর্জুন বিজয়, নকুল জয়ৎসেন আর সহদেব জয়ৎবধ, জয় দিয়েই পাঁচটা নাম। দ্রৌপদী এখন এই পাঁচজনের নাম করে চিৎকার করছে হে জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন, জয়ৎবধ তোমরা কোথায় আমাকে রক্ষা কর। সবাই মনে করছে দ্রৌপদী নিজের গন্ধর্ব স্বামীদের ডাকছে। তখনও ভোর হয়নি, ঘুমের মধ্যে দ্রৌপদীর ঐ আত্ননাদ শুনেই ভীম লাফিয়ে উঠে দৌড়ে শাশানে পৌঁছে গেছে। শাশানের ধারে একটা বড় গাছ ছিল, সেটাকে উপড়ে নিয়ে যত পঞ্চাশ ঘাটটা উপকীচক ছিল সব কটাকেই মেরে শেষ করে রেখে দিয়েছে। শাশান থেকে দ্রৌপদী ফিরে এসেছে। সবাই দ্রৌপদীকে দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে, কেননা খবর চলে এসেছে পঞ্চাশটা উপকীচককে একজন মিলে মেরে দিয়েছে। এই একা একজন গন্ধর্ব একদিকে কীচকের মত এত বড় একজন শক্তিমানকে বধ করেছে তারপর একসাথে পঞ্চাশটা উপকীচককে মেরে দিয়েছে। তার স্ত্রী স্বৈরিক্তীকে দেখে সবাই ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। রাজা বলছেন তুমি এখান থেকে চলে যাও। সব শুনে ভয়ে রানী সুদেষ্ণা আর মেয়ে উত্তরার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোচ্ছে না। দ্রৌপদী তখন বলছেন ‘আমি আর বেশী দিন থাকবো না, আমার স্বামীদের অভিশাপের সময় উত্তীর্ণ হতে আর বেশী দিন বাকি নেই, সময় হয়ে গেলে আমিও এখান থেকে চলে যাব তত দিন যদি আমাকে অনুগ্রহ করে থাকতে দেন’। ভয়ে রানীই তখন বলছে ‘না না, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না, তোমার যত দিন খুশী এখানে থাক। আমার ভাইতো চলে গেল কিন্তু আমি স্বামী আর সন্তান এই দুজনকে তুমি রক্ষা কর, এরা যেন বেঁচে থাকতে পারে’। দ্রৌপদী রানীকে আশ্বাস দিয়ে বলে দিলেন আপনার কোন চিন্তা নেই, এদের কোন ক্ষতিই হবে না।

### কৌরবদের বিরাট রাজার গোপন অপহরণের অপচেষ্টা ও অর্জুনের কাছে পরাজয়

ইতিমধ্যে দুর্যোধন চারিদিকে গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছে পাণ্ডবদের খোঁজের জন্য। কিন্তু কোথাও কোন খোঁজ পাচ্ছে না। এদিকে কীচকের মৃত্যু সংবাদ সব দিকে ছড়িয়ে গেছে। দুর্যোধনদের কাছেও খবর গেছে যে একজন গন্ধর্বের হাতে কীচক বধ হয়েছে। কৌরবরা ভাবছে কীচকের মত এত বড় শক্তিমানকে এইভাবে দুমড়ে মুচড়ে মারার মত শক্তি ভীম ছাড়া আর কারুর নেই, ভীম ছাড়া এই কাজ কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। এরপর আরও ভালো করে খোঁজ করে খবর পেল বিরাটের ওখানে ভীমের মত একজন বিশাল চেহারার পাচক কাজ করছে, কঙ্ক নামে একজন দরবারি আছে। হিসেব করে চারজনের একটা আন্দাজ পেল কিন্তু অর্জুনের সাথে বৃহন্নলার হিসেবটা মেলাতে পারছিল না। তখন কৌরবরা ঠিক করল আরও ভালো করে যাচাই করে দেখতে হবে। কিভাবে যাচাই করবে? দুর্যোধন নিজের সেনাবাহিনীকে দুটো ভাগে ভাগ করে একটা দল বিরাট রাজার রাজ্য আক্রমণ করতে গেল। এতদিন কীচকের ভয়ে কেউ বিরাট রাজ্যের উপর আক্রমণ চালাতে সাহস করত না, এখন কীচক নেই তাই দুর্যোধন তার সেনাবাহিনীর একটা দলকে দিয়ে বিরাট রাজ্যের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। অন্য দিকে এরা ঠিক করে রেখেছে বিরাট রাজার আসল সেনাবাহিনী যখন কৌরবদের এই সেনাদের আক্রমণ মোকাবিলা করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে সেই সুযোগে কৌরবদের আসল সেনাবাহিনী যেই দলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের মত মহারথীরা রয়েছে এরা বিরাট রাজার সব গোপন অপহরণ করে পালাবে। বিরাট রাজার সাথে এখন আর কেউ নেই। পাণ্ডবরা ছদ্মবেশে রয়েছে, যদি বিরাট রাজার সাহায্যে এগিয়ে আসে তাহলেই অজ্ঞাতবাসের শর্ত ভঙ্গ হয়ে ধরা পড়ে

আবার বারো বছরের জন্য সবাইকে জঙ্গলে চলে যেতে হবে। যেভাবেই হোক ভীষ্ম, দ্রোণ এনারাও কিভাবে রাজী হয়ে গেলেন, পাণ্ডবরা যদিও সামনে না আসে তাও আমরা অনেক গোধান পেয়ে যাব। তখনকার দিনে গোধান ছিল প্রচুর অর্থ রোজগারের একটা উৎস, হাজারে হাজারে যদি গরু পেয়ে যাই তাহলে প্রচুর অর্থের আমদানি হবে।

কৌরবদের সেনাবাহিনী বিরাট রাজ্য আক্রমণ করেছে। এদিকে বিরাট রাজাও খবর পেয়ে সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে চলে গেছেন যুদ্ধ করতে। বিরাট রাজার মেয়ের নাম ছিল উত্তরা, পনেরো ষোল বছর বয়স, তারই ছোট ভাই তার নাম উত্তর, দিদির থেকে দুই এক বছরের ছোট। বিরাট রাজা যুদ্ধ করতে যাবার সময় উত্তরকে মজা করে বলছেন ‘এই রাজমহল আমি তোমার উপর ছেড়ে গেলাম’। রাজাতো চলে গেলেন। ইতিমধ্যে আসল সেনারা অন্য দিক দিয়ে আক্রমণ করে গোধান অপহরণ করে নিয়ে পালাচ্ছে। উত্তর একেবারেই বাচ্চা ছেলে, এখনও রানীবাসে মেয়েদের মধ্যেই তার গতিবিধি সীমাবদ্ধ। কৌরবরা গোধান অপহরণ করতে এসেছে শুনেই উত্তর এখন লম্বা লম্বা কথা বলতে শুরু করেছে, কিছু দিন আগে ওর এক সারথিও মারা গেছে। উত্তর বলছে ‘আমার যদি একজন সারথি থাকত আমি তাহলে এদের দেখিয়ে দিতাম। আমার এই ঘোড়ার বেগকে সামলাবার মত কেউ নেই তাই, নাহলে আমি একাই সব কটাকে শেষ করে দিতাম’। মেয়েদের সামনে খুব ভাষণ দিয়ে যাচ্ছে। মেয়েরাও উত্তরকে মজা করে খুব তাঁতিয়ে যাচ্ছে। তখন স্বৈরিক্তী বলল ‘এখানে যে বৃহন্নলা আছে, এ এক সময় অর্জুনের সারথি ছিল, ওকে গিয়ে রাজী করাও’। বৃহন্নলা হল উত্তরার গুরু। উত্তরা গিয়ে বৃহন্নলাকে খুব করে অনুনয় করে বলছে ‘তুমি আমার ভাইয়ের সারথি হয়ে আমাদের মান রক্ষা কর, এটা আমার ভাইয়ের ইজ্জতের ব্যাপার’। অর্জুন এখন বৃহন্নলা নামে আছে তার উপর আবার সে নপুংসক। মেয়েদের সামনে নপুংসকদের মত ঢং ঢাং করে রাজী হতে চাইছে না। মেয়েরাও তার হাবভাব দেখে খুব হাসাহাসি করেছে। তারপর বহু কষ্টে রাজী করান হয়েছে। এরপর সারথি হতে যে কবচ লাগাতে হয় বৃহন্নলাও সব উল্টোপাল্টা করে পড়ছে, দেখাচ্ছে যেন সে কিছুই জানে না। ঐ সব কাণ্ড দেখে মেয়ে গুলো হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। আবার উত্তরকে গিয়ে বলছে ‘তুমি আমাকে নাচতে বল, গান করতে বল আমি সব করে দেখাব কিন্তু এই সারথির কাজ আমার দ্বারা হবে না’। উত্তর বলছে ‘তুমি আগে আমার সারথি হয়ে চল, ফিরে এসে যত খুশী নাচগান করবে’।

যাই হোক বৃহন্নলা অনেক কায়দা টায়দা দেখিয়ে রথ নিয়ে এসেছে। এতক্ষণ উত্তর অন্দরমহলে ছিল। কিন্তু বাইরে এসে দেখছে ঐ বিশাল সৈন্যবাহিনী, অত রথ আর তারমধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের মত মহারথীরা। উত্তর ভাবছে এ আমি কোথায় এসে পড়লাম! বৃহন্নলাকে তখন বলছে ‘আমি এই যুদ্ধ করতে পারবো না বাপু, তুমি তাড়াতাড়ি আমার রথ নিয়ে ফিরে চল’। বৃহন্নলা উত্তরকে বলছে ‘এই গরুগুলোকে যদি ফিরিয়ে না নিয়ে খালি হাতে ফিরে যাও তখন তোমার উপর সবাই হাসবে আর মেয়েরা তোমাকে উপহাস করবে’। উত্তর তখন বলছে ‘দেখো, প্রাণ যদি থেকে যায় পরে আবার সব কিছু অর্জন করে নেওয়া যাবে, প্রাণ হারিয়ে লাভ নেই’। বলেই বৃহন্নলা কিছু বোঝার আগেই উত্তর রথ থেকে লাফ দিয়ে প্রাণ ছেড়ে নিজের রাজমহলের দিকে পালিয়েছে। বৃহন্নলা উত্তরকে পালাতে দেখেই ঘোড়া রথ সব ছেড়ে দিয়ে উত্তরের পেছনে ধাওয়া করেছে ওকে ধরবার জন্য। আর দৌড়বার সময় বৃহন্নলা খুব বিচিত্র ভঙ্গিতে মেয়েদের মত তার বেণী দুটো দোলাচ্ছে। কৌরবরা তখন অবাক হয়ে দেখছে এই সারথি নপুংসকটা কে। প্রথমে তারা হাসছিল, যে যুদ্ধ করতে এসেছে সে পালাচ্ছে আর তার সারথি তাকে ধরে আনতে তাড়া করেছে। এখন বৃহন্নলার ঐ বেণী দোলান আর পদক্ষেপ দেখে কৌরবরা ভাবছে *ক এষ বেষপ্রচ্ছন্নো ভস্মানেব হতাশনঃ। কিঞ্চিদস্য তথা পুংসঃ কিঞ্চিদস্য যথা স্ত্রিয়াঃ।।* ৪/৩৫/৩২। এই বেশে একে, দেখে মনে হচ্ছে ছাই চাপা আগুন। এর কিছু জিনিষ নারীর মত আবার অনেক কিছু পুরুষের মত। এর স্বরূপ পুরো অর্জুনের মত, কিন্তু বেশভূষা পুরো নপুংসকদের। দেখো সেই অর্জুনের উন্নত শির, সেই বলিষ্ঠ কাঁধ, সেই মোটা মোটা বাজু। হাতগুলো দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা অর্জুনের হাত। হাঁটা চলাটাও অবিকল অর্জুনের মত। অর্জুন ছাড়া কেউ হতে পারেনা, কিন্তু নপুংসক কি করে হল!

উত্তর কি অর্জুনের সঙ্গে দৌড়ে পালাতে পারে! উত্তর ধরে ফেলতেই বৃহন্নলাকে উত্তর বলছে ‘শোন বৃহন্নলা! আমি তোমাকে একশটি স্বর্ণমুদ্রা দিচ্ছি আর তার সাথে আটখানা বৈদ্যু মণি আমার গলার হার থেকে খুলে দিচ্ছি, তুমি আর আমাকে বলপূর্বক জোর করে ধরে বেঁধে যুদ্ধে নামিয়ে অঘোরে প্রাণ বিসর্জন দিতে বলো না। গরু চলে যাচ্ছে যাক এখন চল আমরা দুজনেই প্রাণ নিয়ে ফিরে যাই’। বৃহন্নলাতো কিছুতেই উত্তরকে ছাড়বে না। উত্তরকে রথে বসিয়ে সোজা চলে গেল শমীবৃক্ষের তলায়। শমীবৃক্ষের কাছাকাছি আসার আগেই উত্তর আবার টেঁচাতে শুরু করেছে ‘ঐদিকে কোথায় যাচ্ছে, ওদিকে সব ভূতেদের বাসা, ঐ দেখ মরা বুলছে’। বৃহন্নলা উত্তরকে বলছে ‘তোমাকে অত ভাবতে হবে না, তুমি গাছে ওঠ

আর ওখানে ধনুষ রাখা আছে সেটাকে নামিয়ে নিয়ে এস। এবার আমিই যুদ্ধ করব, তোমার এই ধনুষগুলো রথে রেখে দাও কারণ এই ধনুষ আমার হাতের শক্তিকে গ্রহণ করতে পারবে না, আমি প্রথম একবার টান দিলে ধনুর ছিলা ছিড়ে ভেঙে বেরিয়ে যাবে। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র যে শিবের ধনু ভেঙেছিলেন ঠিক এই কারণেই ভেঙে গিয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্রের হাতের এমন শক্তি যে যখন ধনুকে টানলেন তখনই সেটা ভেঙে গেল। অর্জুনও ঠিক তাই বলছেন তোমার ধনুগুলো আমার শক্তিকে নিতে পারবে না, তাই এই ধনুগুলিকে রথের মধ্যে রেখে যা যা করতে বলছি সেই ভাবে গাছ থেকে নামিয়ে আন। এরপর বৃহন্নলা নিজের পরিচয় দিয়ে বলল ‘আমিই অর্জুন! তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না তুমি শুধু ঘোড়ার লাগামটা শক্ত করে ধরে রাখ বাকি কাজ আমি করব’। উত্তর যখন অস্ত্রগুলো নামিয়ে এনেছে তখন অর্জুন একটা একটা করে অস্ত্র দেখিয়ে বলছে এই ধনুটা যুধিষ্ঠিরের, এই তলোয়ারটা নকুলের, এটা ভীমের, এটা সহদেবের’। প্রথমে নিজের পরিচয় দেওয়ার পর বাকি ভাইদের পরিচয় দিয়ে বলছেন ‘তোমার বাবার দরবারে যে কক্ষ আছেন উনি যুধিষ্ঠির, বল্লভ ভীম’ ইত্যাদি বলার পর অর্জুন বলছেন আমি অর্জুন আর আমার আরও কয়েকটি নাম আছে ফাল্গুন, জীম্বু, কিরীটি, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, সব্যসাচী, বিজয়, কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়’। উত্তর এইসব শোনার পর খুব উত্তেজিত হয়ে হতবাক হয়ে গেছে, কি বলবে কিছুই বুঝতে পারছে না। উত্তর জিজ্ঞেস করছে আপনার এই রকম নাম কেন হয়েছে?

অর্জুন উত্তরকে নিজের প্রত্যেকটি নামের ব্যাখ্যা করছেন। যখন রাজসূয় যজ্ঞ হয়েছিল তখন যজ্ঞের জন্য আমি বিভিন্ন দিক থেকে প্রচুর ধন সংগ্রহ করেছিলাম সেইজন্য আমার নাম ধনঞ্জয়। যুদ্ধভূমি থেকে সবার উপর বিজয় না পাওয়া পর্যন্ত আমি কখন ফিরে আসিনা তাই আমার নাম বিজয়। আমার অর্জুন নামের তিনটি অর্থ, আমার মত দীপ্তবান কেউ নেই বলে আমার নাম অর্জুন। ইন্দ্রের পুত্র হওয়াতে অর্জুনকে দেখতে যেমন সুন্দর ছিল গায়ের রঙও সেই রকম দীপ্যমান ছিল। অর্জুনের আরেকটি অর্থ হয় ঋজুতা, মনের মধ্যে কোন ধরনের প্যাঁচ নেই, সব সময় সমান ভাব, সহজ অর্থ হল সরলতা। অর্জুন খুব সরল স্বভাবের ছিল বলেই তার অর্জুন নাম, অর্জুন শব্দের মূল অর্থই হয় ঋজু থেকে, ঋজু মানে অবক্র, সবার প্রতি সম ভাব। অর্জুন নরঋষির অবতার কিনা। অর্জুন শব্দের তৃতীয় অর্থ শুদ্ধ। অর্জুনের যত রকমের কর্ম ছিল সবই শুদ্ধ কর্ম, অশুদ্ধ কর্ম অর্জুন কখনই করে না। আমি উত্তরফাল্গুনি নক্ষত্রে জন্মে ছিলাম তাই আমার নাম ফাল্গুন। একবার আমি দানবদের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলাম তখন দেবরাজ প্রসন্ন হয়ে আমার মস্তকে সূর্য্য সমুজ্জ্বল কিরীট প্রদান করেন তাই আমার নাম কিরীটি। আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে কখন কোন বিভৎস কর্ম করিনি তাই দেবলোক আর মনুষ্যলোকে আমি বিভৎসু নামে পরিচিত। আমার বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্ত দ্বারা সমান ভাবে গাণ্ডীবধনু আকর্ষণ করতে পারি বলে আমার নাম সব্যসাচী। যুদ্ধস্থলে আমার সামনে সাহস করে কেউ এগোতে পারেনা আর আমি অতি দুর্দর্শ শত্রুকেও জয় করি বলে আমার নাম জিম্বু। কৃষ্ণবর্ণ বালক লোকের সাতিশয় প্রিয় বলে আমার পিতা আমার নাম কৃষ্ণ রেখেছেন।

এরপর অর্জুন স্বর্ণে যত দিব্যাস্ত্র পেয়েছিলেন সেগুলোর স্মরণ করলেন। স্মরণ করতেই সব দিব্যাস্ত্র অর্জুনের কাছে আসতে শুরু করেছে। উত্তরকে বলে দিলেন ‘খোকা তুমি শুধু ঘোড়ার লাগামটা ধরে রাখ, তোমাকে আর কিছু ভাবতে হবে না বাকিটা আমিই করে দেব’। এবার অর্জুন একাই যুদ্ধ করতে নেমে গেলেন। অর্জুন যখন সব দায়িত্ব নিয়ে নিলেন তখন রথের চাকার আওয়াজ, ঘোড়ার ডাক সবটাই পাল্টে গেছে। দ্রোণাচার্য শুনেই বলছেন ‘রথের যে আওয়াজ, ঘোড়ার যে আওয়াজ এটা শুনেই মনে হচ্ছে এ অর্জুন ছাড়া আর কেউ হতে পারেনা, অর্জুন ছাড়া রথের এই রকম আওয়াজ আর কারুর হবে না’। কারণ অর্জুন এখন নিজের শক্তিতে পুরো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে কিনা। দ্রোণাচার্যের কথা শুনে দুর্যোধন আবার রেগে গেছে ‘সব রথের এই রকমই আওয়াজ হয়, ঘোড়ারা সব সময় এইভাবেই আওয়াজ করে, আপনারা দিনরাত অর্জুনের প্রশংসা করে করে নিজেরাও ভয় পান আমাদেরও ভয় পাইয়ে দেন। কিন্তু যাই হোক, এরপরেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এদের যুদ্ধের নিয়ম ছিল যখন একজন যোদ্ধা আরেকজনের সাথে যুদ্ধ করত অন্যরা তখন যুদ্ধ করত না। সমানে সমানে যুদ্ধ হয়, একজন হেরে গেলে আরেকজন আসবে। অর্জুন আবার অনেকের সাথে এক সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারতেন আবার দিব্য শক্তিও ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণনা আছে তিনি একটা ধনুকের উপর এক সঙ্গে দশ খানা তীর রেখে চালাতে পারতেন। অন্যরা যখন একটা করে তীর ছুঁড়ত তিনি একসাথে দশখানা তীর মেরে দশটি লক্ষ্যকে ভেদ করে দিতেন। অর্জুন এখন একসাথে সব কৌরবদের মারতে শুরু করেছেন। আর তখন অর্জুনের হাতে দিব্যাস্ত্র। ঠিক ঠিক অর্জুনের সামনে দাঁড়াতে সক্ষম হলেন একমাত্র ভীষ্ম আর দ্রোণাচার্য। সবাই বুঝে নিয়েছে নপুংসকের বেশে এই হল অর্জুন। দুর্যোধন এবার লাফাতে শুরু করেছে, এখনও এক বছর অজ্ঞাতবাসের সময় শেষ হয়নি কিন্তু অর্জুন প্রকাশ্যে এসে গেছে। অর্জুনও বলছে ‘না, এক বছর পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরই আমি সামনে এসেছি’। ভীষ্মকেও বলা হল।

আমাদের পরম্পরাতে কলা, কাষ্টা, মুহূর্ত, দিন, মাস, পক্ষ, নক্ষত্র, গ্রহ, ঋতু ও সংবৎসর এই ভাবে সময়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ কর হয়। যেমন বছর, অর্ধেক মাস, মাস, দিন এইভাবে ভাগ করা থাকে। কিন্তু এর হিসাব ভারতে দুই ভাবে করা হয় একটা সৌরমাস আর চান্দ্রমাসের হিসাব। চান্দ্রমাসের মতে যখন হিসাব করা হয় তখন তার হিসাব একভাবে চলে সৌরমাসের হিসেব আরেক রকম চলে। হিন্দুরা বিশ্বে একমাত্র জাতি যারা দুটোকে একসঙ্গে চালায়। যেমন মুসলমানরা শুধু চান্দ্রমাসের ক্যালেন্ডারের হিসাবে সব কিছু করে। বর্তমানে সারা বিশ্বে সৌরমাসের ক্যালেন্ডারকে অনুসরণ করা হয়, চান্দ্রমাস প্রায় উঠে গেছে। কিন্তু ভারতে প্রাচীন যুগ থেকে এখনও দুটোই চলে। ভীষ্ম তখন বলছেন ‘চান্দ্রমাস থেকে যদি হিসাব করা হয় তাহলে অজ্ঞাতবাসের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে’। কৌরব আর পাণ্ডবদের মধ্যে মূল ঝামেলার কেন্দ্রবিন্দু হল এই চান্দ্রমাস আর সৌরমাসের ক্যালেন্ডার। দুর্যোধনদের হিসেবে দেখা যাচ্ছে অজ্ঞাতবাসের সময় উত্তীর্ণ হবার আগেই অর্জুন আমাদের চোখের সামনে এসে গেছে তাই এদের আবার বারো বছরের জন্য জঙ্গলে চলে যেতে হবে। কিন্তু এরা বলছে না এই হিসাবে আমাদের অজ্ঞাতবাসের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরই অর্জুন সামনে এসেছে। যাই হোক এরপর তো যুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধে এক এক করে সবাইকে যখন হারান হয়ে গেছে অর্জুন তখন সম্মোহনাস্ত্র মারলেন। সম্মোহনাস্ত্র দেবতাদের অস্ত্র। স্বর্গলোক থেকে অর্জুন এই অস্ত্র পেয়েছেন, এখানে অর্জুনের দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগের একটা ছোটখাট পরীক্ষাও হয়ে গেল। সম্মোহনাস্ত্র মারতেই বিপক্ষের সব যোদ্ধা বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। এদিকে উত্তরা ভাইকে বলে রেখেছিল ‘তুমি যখন যুদ্ধ জয় করে ফিরে আসবে তখন যোদ্ধাদের গায়ে যে সব নানা রঙের উত্তরীয় থাকে সেগুলো কেটে নিয়ে আসবে, ওগুলো আমার পুতুলের সাজ হবে’। তারপর বর্ণনা করে অর্জুন উত্তরকে বলছেন অমুকের ঐ রঙের জামা, তমুকের ঐ রঙের উত্তরীয় ‘তুমি যাও সব কেটে নাও’। অর্জুন বলছেন ‘দ্রোণাচার্য আর কৃপাচার্যের গায়ে সাদা রঙের জামা, কর্ণের হলুদ রঙের, অশ্বথামা আর দুর্যোধনের নীল রঙ এগুলো সব তুমি নিয়ে নাও আর ঐয়ে দেখছ উনি হচ্ছেন পিতামহ ভীষ্ম, উনি যে বেহুঁশ হয়ে আছেন দেখছ আসলে উনি কিন্তু বেহুঁশ হননি, শুধু আমাকে ভালোবাসেন বলে বেহুঁশের ভাণ করে আছেন। ওঁর ধারে কাছে দিয়ে যাবে না। ওনার সম্মানার্থে তোমাকে এটা করতেই হবে। আর উনি জেগেই আছেন শুধু ভাণ করে পড়ে আছেন। উত্তর গিয়ে ভীষ্ম ছাড়া সবার গায়ের জামা ও উত্তরীয় থেকে কাপড় কেটে নিয়ে এসেছে।

এবার অর্জুন উত্তরকে নিয়ে রাজমহলে ফিরে এসেছেন। উত্তরাতো খুব খুশি ভাই জিতে ফিরে এসেছে। অর্জুন আগে থাকতেই উত্তরকে বলে রেখেছিল তুমি কিন্তু আমার পরিচয় এখন দিও না। এরপর শেষে যুধিষ্ঠির বিরাট রাজাকে নিজের ও সবার পরিচয় দিলেন। সব শোনার পর তো বিরাট রাজার মাথা গেছে ঘুরে। এই পঞ্চ পাণ্ডব এই ভাবে আমার রাজপ্রাসাদে ছিলেন! সব পরিচয়াদির পর্ব শেষ হতে বিরাট রাজা অর্জুনকে বললেন ‘আমার মেয়ে উত্তরাকে আপনার কাছে অর্পণ করলাম, আপনি উত্তরাকে বিয়ে করে নিন’। অর্জুন তখন খুব সুন্দর বলছেন, ভারতীয় পরম্পরাতে গুরু শিষ্যের সম্পর্কে যে কত উচ্চ স্থান দেওয়া হয় মহাভারত না পড়লে বোঝা যায় না – *অন্তঃপুরেহহমুষিতঃ সদাপশ্যং সুতাং তব। রহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ বিশ্বস্তা পিতৃবন্যায়।। প্রিয়ো বহুমতাস্চাসং নর্তকো গীতকোবিদঃ। আচার্য্যবচ্চ মাং নিত্যং মন্যতে দুহিতা তব।।* ৪/৬৭/৩-৪। না, এই বিবাহ হতে পারেনা, উত্তরাকে আমি স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে পারিনা, কারণ প্রথম কথা হল উত্তরা আমার শিষ্যা। শিষ্যা মানে উত্তরা আমার কন্যাসম। আর দ্বিতীয় কথা হল বৃহল্লা হয়ে আমি আপনার অন্তঃপুরে রানীদের মধ্যে এক বৎসর অতিবাহিত করেছি এবং আপনার কন্যা উত্তরা গোপনে বা প্রকাশ্যে পিতার মতই আমার উপর বিশ্বাস করে এসেছে, এখন আমি যদি একে বিয়ে করি লোকেরা তখন আমার চরিত্রের উপর সন্দেহ করবে। সেইজন্য আমি ঠিক করেছি আমার ছেলে অভিমন্যুর সাথে উত্তরার বিয়ে হোক’। অভিমন্যুর সাথে উত্তরার বিয়ে হয়ে গেল। এরপর শুরু হয়ে গেল ঠিক ঠিক যুদ্ধের প্রস্তুতি। আর এখানে এসে বিরাটপর্ব শেষ হয়ে যায়। এই পর্বের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল রাজার দরবারী হয়ে কিভাবে থাকতে হয়, দ্বিতীয় কাহিনী কীচক বধ আর শেষে এই গোহরণ পর্ব। এরপর শুরু হবে উদ্যোগপর্ব। এখান থেকে মহাভারতের দর্শনটা পুরোপুরি সামনের দিকে আসতে থাকে।

## উদ্যোগপর্ব

বিরাটপর্বের পর শুরু হয় উদ্যোগপর্ব। উদ্যোগপর্ব হল মহাভারত যুদ্ধের প্রস্তুতিকে নিয়ে। দুর্যোধনরা তাদের হিসেবে দেখছে পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের এক বছর না হতেই ধরা পড়ে গেছে, আর এই হিসেবেকেই এরা দৃঢ় ভাবে ধরে নিয়ে ঠিক করেছে পাণ্ডবদের বারো বছরের জন্য আবার জঙ্গলে চলে যেতে হবে, রাজ্য ফেরত দেওয়ার কোন প্রশ্নই আসছে না। অর্জুন বলছে আমি এক বছর অজ্ঞাতবাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরই সামনে এসেছি। এখানে সেই সৌরমাস আর

চান্দ্রমাসের বিতর্ক চলছে। আসলে চান্দ্রমাসে আটাশ দিনেই মাস হয়। সেই হিসাবে প্রত্যেক মাসেই দুদিন করে কমে যায়, আর এক বছরে এমনিতেই চব্বিশ দিন কম হবে। এখন যেমন মোটামুটি সব জায়গাতেই সৌরমাসের হিসেব অনুযায়ী বছরের হিসেব করা হয়, তখনও একটা সঠিক সিদ্ধান্তে কেউ দিতে পারতেন না বছরটা কোন হিসাবে গোণা হবে। ভীষ্ম চান্দ্রমাসের হিসেবটাই মেনে নিয়েছিলেন, এখন তিনি কেন মেনে নিয়েছিলেন সেটা বলা মুশকিল। হয়তো তিনি পাণ্ডবদের ভালোবাসতেন বলে চাইছিলেন না যে পাণ্ডবরা আবার বারো বছরের জন্য জঙ্গলে চলে যাক। কিন্তু দুর্যোধন এই সিদ্ধান্তকে কোন মতেই মানবে না। সেইজন্য এইসব কাহিনীতে পদে পদে নানা রকমের বিতর্কের অবকাশ দেখা যায় আর সব জায়গায় কেমন একটা যেন ধর্ম সংশয়ের উদ্ভব হয়। কে ঠিক আর কে ভুল বোঝা দুষ্কর।

### দূতের গুণাবলী – শ্রীকৃষ্ণের ব্যাখ্যা

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর খবর পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে নিয়ে বিরাট রাজার দরবারে এসেছেন। যুধিষ্ঠিরের আরও যারা হিতৈষী ছিলেন তারাও অনেকেই এসেছেন। সবাই মিলে এখন সভা করে বসে আলোচনা করতে শুরু করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য হল, এবার যদি কৌরবরা রাজ্য ফেরত না দেয় তাহলে যুদ্ধ ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই, আর এই যুদ্ধে কৌরবদের সব কটাকে শেষ করতে হবে। এই বক্তব্যের সাথে শ্রীকৃষ্ণ এটাও বলছেন যে শত্রুপক্ষরা সব কিছু কিভাবে গ্রহণ করছে এই ব্যাপারটাকে না জেনে কোন কিছুই করা যাচ্ছে না। সেইজন্য বিরাট রাজার তরফ থেকেই হোক কিংবা যুধিষ্ঠিরের তরফ থেকেই হোক একজন দূতকে কৌরবদের কাছে পাঠান হবে। এখান থেকে যে দূত হয়ে কৌরবদের ওখানে কথা বলতে যাবে তার চরিত্র কিরকম হবে বলতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *তস্মাদিতো গচ্ছতু ধর্মশীলঃ শুচিঃ কুলীনঃ পুরুষোহপ্রমত্তঃ। দূতঃ সমর্থঃ প্রশমায় তেষাং রাজ্যার্দদানায় যুধিষ্ঠিরস্য।।৫।১।২৪।* যুধিষ্ঠিরের অর্দ্ধ রাজ্য উদ্ধারের জন্য এবং দুর্যোধনদের অসৎ প্রবৃত্তির নিবারণের জন্য এখানে থেকে একজন দূতকে পাঠান হোক। সেই দূতের কি কি গুণ থাকবে? সে হবে ধার্মিক, পবিত্র, কুলীন, সাবধান ও শক্তিশালী। সে যেন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইদানিং কালে যারা রাষ্ট্রের দূত হয়ে বিদেশ যায় তাদের আইএফএস ক্যাডারের হতে হয়, বিভিন্ন ট্রেনিং নিতে হয়। কিন্তু এখানে কোন পেশাদার রাজদূতকে পাঠান হচ্ছে না, এখানে একটা সংবাদ বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে। এখনও আমাদের দেশের সাথে যখন বিদেশের কোন বার্তা বিনিময় হয় তখন একজন বিশেষ ব্যক্তিত্বকে পাঠান হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তি যুদ্ধের সময় মুজিবর রহমানকে জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে হাজারে হাজারে শরণার্থীরা ভারতে চলে আসছে। ইন্দিরা গান্ধী তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ ফিল্ড মার্শাল মানেকশকে ডেকে বললেন ‘ভারতে প্রতিদিন এত শরণার্থীরা বাংলাদেশ থেকে চলে আসছে তাতে পশ্চিমবঙ্গে আর আসামে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে, তুমি কিছু একটা কর’। মানেকশ তখন বললেন ‘আমাকে কি করতে হবে বলুন’। ‘তুমি যুদ্ধ করে সব শরণার্থীদের ফেরত পাঠিয়ে দাও’। মানেকশ বললেন ‘এখন বৃষ্টির সময়, এই চার মাস কিছু করা যাবে না। বৃষ্টিটা শেষ হোক, বন্যার প্রকোপটা বন্ধ হোক তারপর যা করার করা যাবে। এই ক’মাসে আপনি সারা বিশ্বে ঘুরে ঘুরে এই ব্যাপারে জনমত গড়ে তুলুন’। ইন্দিরা গান্ধী তখন প্রধানমন্ত্রী, তখন তিনি এই কাজের ভারটা অপর কারুর উপর ন্যস্ত করেননি। তিনি নিজেই বিভিন্ন দেশ সফরে বেরিয়ে গেলেন। নিম্ন তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, সে তো প্রথমে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথাই বলতে চাইল না। তারপর একদিন সময় দিয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে প্রায় চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করালেন, দেখানোর জন্য যে, ভারত যা করতে চাইছে আমেরিকার তা পছন্দ নয়। নেহেরুর আমল থেকেই ইন্দিরা গান্ধীর আমেরিকার ওপর মহলের প্রচুর প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচিতি হয়ে আছেন। তিনি এখন এর ওর সঙ্গে দেখা করছেন নিজের মত দিচ্ছেন, আর খবরের কাগজের মাধ্যমে সেটাকে ভালো করে প্রচারের ব্যবস্থা করাচ্ছেন। তারপর সব দেশ ঘুরে আসতে আসতে নভেম্বর মাস এসে গেছে। নভেম্বর মাসে সব কিছু প্রস্তুতি নিয়ে ডিসেম্বরে বাংলাদেশের উপর আক্রমণ চালিয়ে দিলেন। পরের দিকে আমেরিকার এক নামকরা মহিলা তাঁর একটা বইতে লিখছেন ‘এই ভদ্রমহিলা আমেরিকাতে এসে মিষ্টি মিষ্টি করে আমাদের এত কথা বললেন, কিন্তু তাঁর মাথাতে বরাবর ঠিকই করা ছিল যে নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে আমি পাকিস্তানকে আক্রমণ করব, অথচ কাউকে ঘুণাঙ্করেও তাঁর এই পরিকল্পনা বুঝতে দিলেন না’।

যারা বিশেষ দূত হয়ে যায় তাদের এটাই বিশেষ গুণ, তোমার পেটের ভেতরে কি আছে কাউকে কখন জানতে দেবে না। ওদের অবস্থাটা কি রকম সেটা জেনে নেবে আর ওর মধ্যেই হাওয়াটা একটু ঘুরিয়ে দেবে। এটা কারা পারে? শ্রীকৃষ্ণ প্রথম গুণ বলছেন *ধর্মশীলঃ*, মানে তাকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবে। *শুচিঃ*, অন্তঃকরণ পবিত্র হতে হবে আর *কুলীনঃ*, তাকে ভালো বংশের লোক হতে হবে। যারা রাজদরবারে যায় রাজার লোকেরাও জানতে চায় লোকটার ইতিহাস কি রকম।

ভদ্র বাড়ির লোক হতে হবে, লেখাপড়া জানা থাকতে হবে, আদব কায়দা ভালো করে জানা থাকা চাই, যার ব্যবহার অন্যদের প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু সব থেকে বড় গুণ বলছেন অপ্রমত্তঃ। প্রমত্ত হল, এরা বড়ই অসাবধান লোক। কি বলতে গিয়ে কি বলে বসবে, কি করতে গিয়ে কি করে ফেলবে নিজেই ঠিক করতে পারেনা। হঠাৎ মেজাজ গরম করে বলেই দিল ‘আপনারা কি মনে করেছেন, আমরা প্রস্তুত হয়ে আছি’। যেমন আমাদের মহাবীর হনুমানকে লঙ্কায় যখন পাঠান হল তাঁকে বলা হয় তুমি লঙ্কায় গিয়ে সীতার খোঁজ নিয়ে এস। ওনার কি মুড হয়ে গেল তিনি ওখানে গিয়ে লড়াই শুরু করে দিলেন। সেটা অবশ্য উনি নিজেও হিসেব করে দেখলেন যে এখন হাতে কিছু সময় আছে এই অবসরে যদি রাবণের কিছু সেনাকে নাশ করে দেওয়া যায়। এটা কিন্তু তাঁর কাজ নয়, তুমি শুধু খোঁজটা নিয়ে চলে এস সীতা কোথায় আছে। শ্রীরামচন্দ্রের সেনারা যখন লঙ্কায় পৌঁছে গেছে তখন শেষ একটা চেষ্টা করার জন্য তখন অঙ্গদকে দূত করে পাঠান হল, কারণ হনুমান আবার যদি কিছু করে বসে। একটু সামান্য কোন ব্যাপারে যেন নিজের মেজাজ না হারিয়ে ফেলে, এই রকম লোককেই পাঠান উচিৎ।

### বলরাম কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের সমালোচনা

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ দুই ভাই, এঁদের সাথে পাণ্ডব আর কৌরব উভয়পক্ষের একটা পারবারিক যোগসূত্র ছিল, সবাই সম্বন্ধী। সেইজন্য যুদ্ধের সময় বলরাম দেখলেন এখানে থাকলে কোন এক পক্ষে আমাকে অংশ নিতে হবে তাই তিনি সেই সময় তীর্থ করতে বেরিয়ে গেলেন। সভাতে এখন বলরাম বলছেন ‘দেখো, কোন অবস্থাতেই কৌরবদের কুপিত করা চলবে না। কারণ এটা মনে রেখো কৌরবদের ক্ষমতা আছে বলেই পাণ্ডবদের রাজ্য অধিকারে নিতে পেরেছে। আর এটাও ভেবে দেখতে হবে যে যুধিষ্ঠির কিন্তু পুরোপুরি নির্দোষ নয়। যুধিষ্ঠির নিজেও জুয়াতে আসক্ত তাই তাঁকে চরম হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন’। বলরাম এখানে দুটো ব্যাপারে কৌরবদের পক্ষে বলছে – প্রথম হল যুধিষ্ঠিরের জুয়াতে আসক্তি আছে বলেই সেই জোর করে খেলতে গিয়ে রাজ্য হারিয়েছে অন্য দিকে কৌরবদের ক্ষমতা আছে বলেই রাজ্য অধিকার করে বসে আছে। তাই কৌরবদের দুর্বল ভাবা খুব ভুল হবে, পাণ্ডবদের বলরাম সাবধান করে দিয়ে বলছেন, হুট করে যুদ্ধে নেমে যেও না। পাণ্ডব আর কৌরবের ব্যাপারে এই দুই ভাই শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম দুই মেরুতে ছিলেন।

ইতিহাস সব সময় জয়ীদের জন্যই লেখা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান আর জাপান হেরে গেল আর আমেরিকা ইংল্যান্ড এখন নিজের মত ইতিহাস লিখে যাচ্ছে। মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবরা জয়ী হলেন আর কৌরবরা হেরে গেল ইতিহাসও পাণ্ডবদের নিয়েই লেখা হয়েছে। এই যুদ্ধই যদি কৌরবরা জিতে যেত তখন ইতিহাস অন্য ভাবে লেখা হত। ছোটবেলা থেকে যে আমরা শুনে আসছি কৌরবরা ছিল ধূর্ত, হিংস্র, ছলচাতুরিতে ভরা আর পাণ্ডবরা একেবারে সাধু পুরুষ, এটা একেবারেই ঠিক নয়। মহাভারতকে এই কারণে বলা হয় পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য। জীবন কখন রূপকথার রাজকুমার আর রাজকুমারীর মত চলেনা, বাস্তব জীবন সব সময় সাদা কালোতে মেশান। মহাভারতের এইটাই বিশেষত্ব, কোন মানুষই পুরোপুরি সাদা হয় না আর কোন মানুষ পুরোপুরি কালো হয় না। যারা পুরো সাদা তাদের মধ্যেও গোলমাল থাকতে বাধ্য আর যারা পুরো কালো তাদের মধ্যেও ভালো কিছু থাকবেই। কৌরবরা যে পুরোপুরি কালো আর পাণ্ডবরা যে পুরোপুরি সাদা ছিল তা নয়, উভয় পক্ষের কিছু না কিছু গোলমাল ছিল। তবে যারা জয়ী হয় ইতিহাস তাদেরকেই বেশী সাদা করে তুলে ধরে। এক জায়গায় জনমেজয় বলছেন ‘দুর্যোধন এই রকম দুষ্কর্ম করল’! তখন বৈশাম্পয়ন মুনি জনমেজয়কে সাবধান করে দিচ্ছেন ‘হে রাজন! আপনি এভাবে বলবেন না, ভুলে যাবেন না উনি আপনার প্রপিতামহ’। বলরাম এই কথাই বলছেন যুধিষ্ঠির পুরোপুরি নির্দোষ নয়। বলরাম বলছেন ‘একদিকে যুধিষ্ঠিরের জুয়া খেলায় আসক্তি আছে কিন্তু জুয়া খেলার কৌশলটাই জানেন না। আর সবাই যুধিষ্ঠিরকে নিষেধ করেছেন জুয়া যাতে না খেলেন, অন্য দিকে শকুনি জুয়া খেলাতে দক্ষ। তা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির শকুনির সাথেই খেলতে থাকলেন। কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন এদের যে কোন একজনের সাথেও খেলতে পারতেন কিন্তু তিনি না খেলে শকুনির সাথেই পুরোটা খেলে গেলেন’। এর কারণ কিন্তু লুকিয়ে আছে যুধিষ্ঠিরের মধ্যেই, যুধিষ্ঠিরের যতই গুণ থাকুক ভেতরে প্রচ্ছন্ন ভাবে তাঁর অহঙ্কারের একটা ভাব থেকে গিয়েছিল। প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তুমি কার সঙ্গে খেলতে চাও, কিন্তু অহঙ্কারে বাঁধছে বলে বলে দিলেন আমি শকুনির সাথেই খেলব। ঠিক একই ভুলের পুনরাবৃত্তি হয়েছিল, যখন যুদ্ধের পরে দুর্যোধন একা বেঁচে আছে তখন যুধিষ্ঠির বলেছিলেন ‘আমাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে যাকে খুশী তুমি বেছে নাও আর যেভাবে তুমি যুদ্ধ করতে চাও কর। আমাদের যে কোন একজনকে হারালেই তুমি পুরো সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে যাবে’। তখনও আবার বাজী লাগাতে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের উপর প্রচণ্ড রোগে গিয়েছিলেন ‘একি! আমরা এতদিন ধরে এত যুদ্ধ করার পর শেষ মুহূর্তে আপনি একাই সব সর্বনাশ করে দিতে চলেছিলেন। দুর্যোধন যদি বলত আমি নকুল কিংবা সহদেবের সঙ্গে গদাযুদ্ধ করব তখন কি হত

ভেবেছেন’! দুর্যোধন একাই নকুল, সহদেব, অর্জুন আর যুধিষ্ঠিরকে একসঙ্গে গদাযুদ্ধে হারিয়ে দেবে। দুর্যোধনের সাথে গদাযুদ্ধ করার ক্ষমতা একমাত্র ভীমের তাও তাকে কায়দা করে হারাতে হয়েছিল। যুধিষ্ঠিরের এই সমস্যাটা ছিল। বলরাম এই কথাই সবাইকে অন্য ভাবে বোঝাতে চাইছেন – আসলে যুধিষ্ঠির জুয়া খেলার ব্যাপারে মুর্থ আবার তার ওপর অহঙ্কারী। যুধিষ্ঠিরের মত সরল সাধাসিধে লোকরা শাস্ত্রের ব্যাপারে পণ্ডিত হলেও জাগতিক ব্যাপারে একেবারেই মুর্থ হয়।

বলরাম বলছেন ‘তাই না, ইনি যত হারছেন ততই রাগে বশীভূত হয়ে খেলতেই থেকে গেলেন, সবাই খেলা থেকে নিবৃত্ত হতে বলছে ইনি কিন্তু কারুর কথায় কর্ণপাত না করে খেলা চালিয়ে গেলেন’। বলরাম তাই বলছেন ‘সেইজন্য এইখান থেকে যিনি দূত হয়ে যাবেন, তিনি প্রথমে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে এবং অন্যান্য বয়ঃজেষ্ঠ্যদের হাতজোড় করে প্রণাম করবে, সামনীতি যুক্ত কথা বলবে। তারপর দুর্যোধনকে কোন রকমে হাতে ধরে এদের জন্য রাজ্য আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। ওখানে গিয়েই যদি বেশী চেষ্টামেচি, ফাটাফাটি করতে যায় তাহলে কিন্তু বিপদ হয়ে যাবে’। এখানে অনেক ধরনের জটিলতার ব্যাপার আছে, আমরা ছোটবেলা থেকে মহাভারত পড়ে যেরকম ভেবেছি মহাভারত সেই রকম নয়। মহাভারতে অনেক জটিলতা আছে বলেই এখনও মহাভারতকে আধার করে কত নাটক, উপন্যাস, কাব্যাদি রচিত হয়ে চলেছে। বলরাম বলছেন ‘কোন ভাবেই যাতে কৌরবদের সাথে পাণ্ডবদের যুদ্ধ না হয়, প্রাণপনে সবাইকে চেষ্টা করতে হবে এই যুদ্ধ যেন না হয়। আর জেনে রেখো *সাম্না জিতোহর্ষেহর্ষকরো ভবেত যুদ্ধেনয়ো ভবিতা নে সোহর্ষঃ*।। ৫/২/১৩। যখনই কোন যুদ্ধ হয় তখনই অনীতিও হয়। আর যখনই অনীতি হয় তখন জগতের কোন কিছুই ভালো হয় না’। অনীতি মানে ধর্মের মত সব কিছু চলে না, কিছু না কিছু অধর্মযুক্ত কর্ম ঢুকে পড়বে। ‘যখনই অনীতি কিছু হয় তখন জগতের কোন কিছুই ভালো হয় না’। এই কারণে সব সময় যুদ্ধকে নিন্দা করা হয়, সবাই চায় যে করেই হোক যুদ্ধকে আটকাতে। স্বামীজী বলছেন ‘চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না’। চালাকি মানেই অনীতি। সভাতে অনেকেই হাজির ছিলেন, এর মধ্যে সাত্যকিও ছিলেন। সাত্যকি হলেন আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রধান সেনাপতি।

### শ্রীকৃষ্ণ সমীপে দুর্যোধন ও অর্জুন উভয়ের একত্র আগমন

সভার আলোচনা শেষ হওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা ফেরত চলে গেছেন। এদিকে ভেতরে ভেতরে দু পক্ষই যুদ্ধের জোর প্রস্তুতি চালাচ্ছে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের পক্ষে নেওয়ার জন্য দুর্যোধন আর অর্জুন দুজনেই এক সঙ্গে দ্বারকাতে পৌঁছে গেছেন। দুজনেই শ্রীকৃষ্ণের ঘরে ঢুকে গেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন নিদ্রায় ছিলেন। কি করে অর্জুন আর দুর্যোধন রাজার ঘরে ঢুকে গেল বোঝা যায় না। কারণ যিনি রাজা তিনি যখন নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছেন তখন তাঁর রক্ষীরা কখনই কাউকে রাজার ঘরে ঢুকতে দেবে না। শ্রীকৃষ্ণ কাগজে কলমে রাজা না হলেও তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজাদের থেকেও বেশী ক্ষমতাসালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু যাই হোক কাহিনী অনুযায়ী দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের মাথার কাছে আর অর্জুন পায়ের কাছে বসল। দুজনে বসে আছে কিন্তু কেউ কারুর সাথে কথা বলছে না।

শ্রীকৃষ্ণ ঘুম থেকে উঠে প্রথমে অর্জুনকে দেখেছেন। তারপর দুর্যোধনকেও দেখতে পেলেন। দুজনে একসঙ্গে কি প্রয়োজনে দ্বারকাতে একেবারে সোজা শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসেছে জিজ্ঞাসাদি করার পর সব শ্রীকৃষ্ণ বললেন ‘দেখো এটা হল আমাদের নিজেদের ঘরের লোকদের লড়াই সেইজন্য আমি কারুর হয়ে কোন অস্ত্র ধারণ করব না, খুব হলে আমি কারুর সারথি হতে পারি। আর আমার চতুরঙ্গিনী সেনা, যাতে হাতি, ঘোড়া, রথ আর পদাতিক বাহিনী আর তার সাথে আমার নারায়ণী সেনা তোমাদের যে কেউ নিতে পার। অর্জুন যেহেতু বয়সে ছোট তাই অর্জুনকেই আগে সুযোগ দেওয়া হোক। অর্জুন আগে বলুক কি চায় আমাকে সারথি রূপে নাকি আমার চতুরঙ্গিনী সেনা ও নারায়ণী সেনা’। অর্জুন বললেন ‘আমার কোন কিছুই লাগবে না আমি শুধু চাই আপনি আমার সাথে থাকুন’। অর্জুনের কথা শুনে দুর্যোধন খুব খুশী, যে কৃষ্ণ লড়াই করবে না সেই কৃষ্ণকে নিয়ে আমার কি কাজ। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন তাঁর রথের সারথি হন। অর্জুনের বক্তব্য ছিল আমি যে ধরনের লড়াই করব সেই লড়াইতে রথ সঞ্চালনের একটা বিশেষ দক্ষতা না থাকলে লড়াই করা যাবে না। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কেউই ঐ ধরনের লড়াইতে রথ সঞ্চালন করতে পারবে না। ঠিক এই ব্যাপারটাই কর্ণের ক্ষেত্রেও হয়েছিল, কর্ণ যখন সেনাপতি হবে তখন কর্ণ বলবে আমার এই রথ শল্য ছাড়া কেউ সঞ্চালন করতে পারবে না।

### মদ্ররাজ শল্যের দুর্যোধনের শিবিরে যোগ

মদ্র দেশের রাজা শল্য নকুল আর সহদেবের মামা। ইতিমধ্যে রাজা শল্য মদ্র দেশ থেকে বেরিয়েছেন পাণ্ডবদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করার জন্য। যুদ্ধের আবহাওয়া তৈরী হচ্ছে, এই সময় চারিদিকে গুপ্তচররাও ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্যোধন তার



গুপ্তচরদের কাছে খবর পেল শল্য যুধিষ্ঠিরের হয়ে যুদ্ধ করবার জন্য মদ্র দেশ থেকে রওনা হয়েছেন। দুর্যোধন তখন নিজে আড়ালে থেকে শল্য যেমন যেমন এগোচ্ছেন তাঁকে খুব খাতির যত্ন করে যাচ্ছে। শল্য এত খুশী হয়ে গেছেন যে তিনি আর থাকতে না পেরে বলছেন ‘যে এত কিছু আমার জন্য আয়োজন করে যাচ্ছে সে আমার সামনে আসুক, সে যা চাইবে আমি তাকে তাই বর দিয়ে দেব’। তখন দুর্যোধন এগিয়ে এসে বলছে ‘মামা, এই আয়োজন আমিই করেছি। আর আমার একটাই একান্ত প্রার্থনা আপনি আমার হয়ে যুদ্ধ করুন’। দুর্যোধনের কথা শুনে শল্য তো আকাশ থেকে পড়লেন, তিনি ভেবেছিলেন যুধিষ্ঠিরই এই আয়োজন করছে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের চরদের নেটওয়ার্ক দুর্বল থাকাতে শল্যের খবর যুধিষ্ঠিরের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। শল্যের এখন কিছুই করার নেই, নিজের কথাতেই দুর্যোধনের কাছে আবদ্ধ হয়ে গেলেন। নকুল সহদেবের নিজের মামা, মানে মাদ্রীর দাদা শল্য চলে গেল ভাগ্নেদের বিরোধী শিবিরে। ভাবলেই কেমন লাগে, যে মামার কোলে পিঠে বড় হয়েছি তার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে হবে। এটাই ধর্মযুদ্ধ। এরপরে কিছু কাহিনী আসছে, তার মধ্যে নহুষের কাহিনী আছে, যেটা এর আগেই আমরা আলোচনা করেছি। এরপর আসছে অন্য প্রসঙ্গ।

### কৌরবদের দূত হয়ে সঞ্জয়ের বিরাট রাজার দরবারে আগমন

কৌরবরা সঞ্জয়কে দূত করে বিরাট রাজ্যে পাঠিয়েছে। সঞ্জয় ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের সারথি আর মন্ত্রী। সঞ্জয় এসেছে বিরাট রাজার দরবারে, যেখানে যুধিষ্ঠিররা বসে আছেন। যুধিষ্ঠির খুব ভদ্র ভাবে সঞ্জয়কে প্রশ্ন করছেন ‘হে তাত! কৌরবরা সবাই কুশলে আছেন তো। আর তাঁদের মাঝখানে যারা ধনুর্ধর, বিদ্বানরা আছেন তাঁরা সবাই সম্মান পাচ্ছেন তো। সবাই নীরোগ ও স্বস্থ আছেন কিনা’। এগুলো হল অনেক দিন পর কোন পরিচিত ব্যক্তির সাথে দেখা হলে কিভাবে কথা বলতে হয় তার একটা দৃষ্টান্ত। যুধিষ্ঠির এরপর জিজ্ঞেস করছেন *কচ্ছিদ্রাজা ব্রাহ্মণানাং যথাবৎ প্রবর্ততে পূর্ববভাত! বৃত্তিম। কচ্ছিদ্রায়ান্ ধার্তারাত্ত্রৌ দ্বিজাতীনাং সঞ্জয়! নোপহন্ত।* ৫/১৩/১৫। রাজা দুর্যোধন আগে যেমন ব্রাহ্মণদের দান দক্ষিণা দিত, তাঁদের জীবিকা চালাবার যে ব্যবস্থা করত এখনও কি সেইভাবে করে যাচ্ছে? আমি কিছু ব্রাহ্মণকে গ্রাম দিয়েছিলাম জমিদারি করার জন্য, সেই গ্রামগুলো রাজা দুর্যোধন ব্রাহ্মণদের থেকে কেড়ে নেয়নি তো? যুধিষ্ঠিরের সব প্রশ্ন শেষ হওয়ার পর এবার সঞ্জয় খুব মিষ্টি করে উত্তর দিতে শুরু করেছেন। সঞ্জয় বলছেন ‘রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধ চান না তিনি শান্তি চান, এই কারণে তিনি আমাকে খুব তাড়াহুড়ো করে এখানে পাঠিয়েছেন। আমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শান্তি সন্দেশ নিয়ে এসেছি। হে যুধিষ্ঠির! তোমরা এখন সৈন্য সংগ্রহ করছ, কিন্তু তোমরা তো সত্ত্বগুণী লোক তাই কেন এত সংগ্রহ করে চলেছ? তোমরা মনে রেখো যুদ্ধ যখন হয় তখন সবারই বিনাশ হয়’। বলা হয় যুদ্ধে যে জেতে সে হারে, আর যে হারে সে মরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন জিতেছিল বটে কিন্তু যুদ্ধের জন্য ব্রিটেন ভারত থেকে কয়েক শত লক্ষ পাউণ্ড ধার নিয়েছিল। তখন ভারত স্বতন্ত্র দেশ কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ব্রিটেন করত। সেই সময় গান্ধীজীরা সবাই আপত্তি করেছিলেন। যুদ্ধের পর ব্রিটেন কায়দা করেছিল যাতে ঐ টাকাটা আর না দিতে হয়। নেহেরুরা ব্যাপারটা ধরতে পেরে প্রচণ্ড আপত্তি করেছিল। কিন্তু ব্রিটেন পরে প্রচুর সময় নিয়েছিল ঐ টাকা শোধ করতে। আমেরিকা থেকে যে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ধার করেছিল, পরে আমেরিকা কিছু কিছু ধার মুকুব করে দিয়েছিল, কিন্তু ব্রিটেন এত ধার নিয়েছিল যে প্রায় দু হাজার সাল পর্যন্ত প্রত্যেক বছর ঋণ শোধ করে গিয়েছিল। সেই ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হয়েছিল আর পঞ্চগ্ন বছর লেগেছে ঋণ শোধ করতে। মাঝখানে এমন অবস্থা হয়েছিল যে এক সময় মনে হয়েছিল ব্রিটেনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। ১৯৪৭ সালে যে ব্রিটেন ভারত ছেড়ে চলে গেল তার পেছনেও ছিল এই ঋণের বোঝা। ভারতকে এখন নিয়ন্ত্রণে রাখা মানে প্রচুর সৈন্য রাখতে হবে। এত সৈন্যের পেছনে যে খরচ হবে তার বদলে কোন আমদানি কিছু নেই, তখন ব্রিটেনের মনে হচ্ছিল কোন রকমে ভারত যেন তার ঘাড় থেকে নেমে যায়। সঞ্জয় বলছেন, এই যে আপনি যুদ্ধের দিকে এগোচ্ছেন এতে সবারই বিনাশ হবে। সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে বলছেন ‘আপনি যুদ্ধের দিকে পা বাড়াবেন না, আর রাজা দুর্যোধনের কাছে বিরাট সেনাবাহিনী জড়ো হয়ে গেছে। এখন দুর্যোধন এমন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে কারুর ক্ষমতা নেই দুর্যোধনের সামনে দাঁড়াতে পারে’। হয়েছিলও ঠিক তাই, কৌরবদের কাছে এগারো অক্ষৌহিনী সেনা আর পাণ্ডবদের কাছে ছিল সাত অক্ষৌহিনী সেনা।

যুধিষ্ঠির সব শুনে নেওয়ার পর সঞ্জয়কে বলছেন ‘আমি এমন কোন কথা তো বলিনি যে আমি যুদ্ধ করতে চাইছি। আপনি ঠিকই বলেছেন যুদ্ধ করার থেকে যুদ্ধ না করা সব সময়ই শ্রেয়। আমরা সেই সুখই চাই যেটাতে মানুষ ধর্ম পথে যেতে পারে, যুদ্ধ দিয়ে কখনই ধর্ম হয় না। যারা শুধু মাত্র ইন্দ্রিয় সুখেই মত্ত থাকে সেটা সব সময়ই দুঃখ রূপ সুখ। ঐ ধরনের সুখের দিকে আমরা কখন যাব না আর যাবারও আমাদের কোন ইচ্ছা নেই। যখনই বিষয় চিন্তন হয় সেটা তখন শুধু শরীর আর মনকে পীড়া দেয়। সুখ ভোগ করলে সাথে সাথে তৃষ্ণাও বাড়তে থাকে’। এখানে যুধিষ্ঠির একটা নতুন কথা

বলছেন ‘যাঁরা পুণ্যাত্মা হন না তাঁরা সংগ্রামে কখন জয়লাভ করতে পারেন না’। একটা কথার পর একটা কথা হয়ে চলেছে। যুধিষ্ঠিরের মূল বক্তব্য হল ‘ইন্দ্রপ্রস্থ যদি আমাদের ফেরত না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু যুদ্ধ হবেই। কারণ আমি যখন দ্যুত ক্রীড়ায় হেরেছিলাম তখন এটাই পণ ছিল’। আসলে সঞ্জয় কি বলতে চাইছেন পরিস্কার নয়। যুধিষ্ঠিরকে শুধু বলে যাচ্ছেন যুদ্ধে নামবেন না। যুদ্ধে নামবেন না তো বলে যাচ্ছে কিন্তু তার বদলে কৌরবরা কি দেবে সেটা পরিস্কার করে কিছু বলছে না। সঞ্জয় ঘুরে ফিরে সেই একই কথা বলে যাচ্ছেন ‘মানুষের জীবন খুবই অল্প কয়েক দিনের, হে যুধিষ্ঠির! যুদ্ধ করে আপনি সেই জীবনকে আরও ছোট করে দেবেন না’। আরও কিছু কথাবার্তা হওয়ার পর সঞ্জয়ের শেষ বক্তব্য হল ‘যুদ্ধ এমন নৃশংস ব্যাপার, এত জীবন হানি হবে, তার থেকে আপনাদের সবাইকে বলি, হে পাণ্ডবরা! *নিবসধ্বং বর্ষপূগান্ বনেষু দুঃখং বাসং পাণ্ডবা ধর্ম এব।।৫/২৭/১৬*। বরঞ্চ আপনারা বারো বছর আবার জঙ্গলে চলে যান’। সঞ্জয় বলতে চাইছেন, বারো বছর আবার আপনার জঙ্গলে চলে গেলে আপনাদেরই পুণ্য হবে, আর লড়াই করে যেটা পেতে চাইছেন সেখানে এতো লোকের মৃত্যু হবে আর তাতে এত পাপ হবে তার থেকে বরং আপনারা আবার বারো বছর জঙ্গলে চলে গেলে এসব কিছুই হবে না।

কম্যুনিষ্টদের ব্যঙ্গ করে ‘এ্যনিমাল ফার্ম’ নামে খুব নামকরা একটা বই আছে। পশুদের একটা ফার্ম ছিল। সেখানকার পশু গুলো একদিন বিদ্রোহ করে দিয়েছে। যত পশুরা ছিল সবাই বিদ্রোহ করে তারাই সাম্রাজ্য অধিকার করে নিল। তারাই এখন ফার্মের মালিক। সাম্রাজ্য নেওয়ার পর সবাই মিটিং করে কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিল, আমরা কি কি করব না, আর কি কি করব ইত্যাদি। এরপর সবাই নতুন এক সমাজ ব্যবস্থা তৈরী করা শুরু করে দিল। সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিল আমরা পশুরা কোন দিন মানুষের সঙ্গে কথা বলব না। কিন্তু কিছু দিন পর এরা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। কম্যুনিষ্টরা যেমন প্রথমে বলেছিল ক্যাপিটালিস্টদের সঙ্গে আমরা কোন সম্পর্ক রাখব না। কদিন পর দেখা গেল ক্যাপিটালিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করত শুরু করেছে। তারপর তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা কখনই মানুষের মত আচরণ করব না। দেখা গেল এখন যারা ক্ষমতায় আছে তারাই সব লুটেপুটে খেতে আরম্ভ করেছে আর মানুষদের সঙ্গে পার্টি চলছে আর ভালো ভালো খাবার দাবার খাচ্ছে। শ্রমিক শ্রেনীরা বাইরের জানলা দিয়ে এদের কাণ্ড হাঁ করে দেখছে। নেতারা ব্যাপারটা জানতেই একটা মিটিং ডেকে বলছে ‘তোমরা কি মনে করেছ এই সব খেয়ে আমরা সুখে আছি! আমাদের প্রাণ দিয়ে ক্যালরি কোলস্টারাল বাড়িয়ে তোমাদের স্বার্থে ওগুলো খেতে হচ্ছে’। এই হচ্ছে স্যাটায়া, যারা ক্ষমতায় থাকে তারা ঠিক এই ভাষাতে আর এই ঢংয়েই কথা বলে। এই যে সঞ্জয় বলছে ‘আপনি যদি যুদ্ধে লিপ্ত হন তাহলে এত প্রাণহানি হবে তাতে সবারই এত পাপ হবে, তার চেয়ে বরং ভালো হবে আপনারা যদি আবার বারো বছরের জন্য বনবাসে চলে যান’। কাউকে যখন বোকা বানাতে হয় তখন গোলমালে জিনিষ গুলিকে খুব সুন্দর করে তুলে ধরতে হয়, আর ভালো জিনিষকে খারাপ বলে চালাতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ সব শোনার পর বলছেন ‘হে সঞ্জয়! আপনি যা বলছেন ঠিকই বলছেন। কিন্তু জুয়া খেলার সময় কত রকমের পাপ হয়েছিল, শুধু পাপই হয়নি, যুধিষ্ঠিরের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে বেকায়দায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। জুয়াতে যুধিষ্ঠির হেরে গেছে ঠিক আছে, কিন্তু তারপর অকথ্য ভাষায় পাণ্ডবদের গালমন্দ করা হয়েছিল, দ্রৌপদীর উপর জঘন্য ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছিল। এত অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেওয়ার পর আর কোন রকমের সন্ধির কথা হতেই পারে না, আর আপনি বনবাসে যাওয়ার কথা ভুলে যান। *জানাসি তুং সঞ্জয়! সর্বমেতদ্যুতে বাক্যং গর্হ্যমেবং যথোক্তম। স্বয়ং ত্বহং প্রার্থয়ে তত্র গন্তুং সমাধাতুং কার্য্যমেতদ্বিপন্নম্।। অহাপয়িত্বা যদি পাণ্ডবার্থং শমং কুরুগামপি চেচ্ছকেয়ম্। পুণ্যঞ্চ মে স্যাচ্ছরিতং মহোদয়ং মুচ্যেরংশ্চ কুরবো মৃত্যুপাশাৎ।।৫/২৯/৪৭-৪৮*। আমি নিজেই হস্তিনাপুর গিয়ে একটা শান্তির বাতাবরণ তৈরী করব। কিন্তু মনে রাখবেন পাণ্ডবদের কোন স্বার্থের হানি আমি হতে দেব না’। এখানে শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রথম গুরুত্ব হচ্ছে পাণ্ডবদের স্বার্থ, দ্বিতীয় হল সন্ধি, তাও কৌরবদের সাথে যে সন্ধি হবে সেখানেও পাণ্ডবদের স্বার্থের ব্যাপারটা প্রথম থাকবে। এদের স্বার্থের হানি করে কোন সন্ধি করা হবে না। তৃতীয় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ‘আমি এই সন্ধি স্থাপন করে মনে করব আমি এক পবিত্র মহান কাজ উদ্ধার করলাম। চতুর্থ আমি কৌরবদের মৃত্যুর ফাঁস থেকে রক্ষা করলাম’। শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য এখানে পরিস্কার, আমি চাইব সন্ধি। কিন্তু সন্ধি করতে গিয়ে আগে দেখব পাণ্ডবদের স্বার্থ কোনটাতে সিদ্ধি হবে। এখানে পাণ্ডবদের সিদ্ধিটা স্পষ্ট, আমার রাজ্য ফেরত চাই। এই শর্তে যদি সন্ধি হয় তাহলে আমি মনে করব আমি একটা পবিত্র কাজ করেছি। এর ফলে তোমাদের কি লাভ হবে? তোমরা মৃত্যুর ফাঁস থেকে বেঁচে যাবে। দুর্যোধনরা জানে না যে কৌরবদের গলায় মৃত্যুর ফাঁস লেগে গেছে। তোমাদের এই ফাঁস থেকে

বাঁচাতে চাইছি, পাণ্ডবদের স্বার্থ চাইছি, সেইজন্য আমি সন্ধির চেষ্টা করব। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন তিনি নিজেই হস্তিনাপুর যাবেন।

### বিদুর নীতি

সঞ্জয়ের ফিরে আসার খবর ছড়িয়ে গেছে। ধৃতরাষ্ট্রও খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন। সঞ্জয় হস্তিনাপুরে ফিরে এসে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করেছেন। ধৃতরাষ্ট্র খুব উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করছেন ‘যুধিষ্ঠির কি ঠিক করল, সেকি আবার ধর্ম পালনের জন্য বারো বছর বনবাসে যাবে?’ সঞ্জয় তখন ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন ‘আমি এখন দীর্ঘ পথযাত্রা ক্লান্ত, আগামীকাল সভায় সবার সামনেই যা বলার বলব’। এই বলে সঞ্জয় নিজের ঘরে চলে যাওয়ার পর ধৃতরাষ্ট্র আরও অস্থির হয়ে পড়েছেন। সেই রাতেই তিনি বিদুরকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বিদুর আসার পর ধৃতরাষ্ট্র বলছেন ‘আমি চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছি, আমার ঘুম আসছে না। আমার পক্ষে যেটা মঙ্গল সেটা তুমি আমাকে বল কারণ তুমি একজন ধর্মজ্ঞ’।

উদ্যোগপর্বের এই তেত্রিশতমো অধ্যায়টি মহাভারতের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই অধ্যায়কে বলা হয় বিদুর নীতি। মহাভারতের পরপর দুটি অধ্যায়ের উপর পৃথক বই আকারে পাওয়া যায়। এর পরেরটি হল সনৎসুজাতীয় সংবাদ। দুটো বইয়ের বক্তব্য পুরো আলাদা। বিদুর নীতি হল শাস্ত্র যা দিয়ে শাসন করে সেটাকে নিয়ে বলা হয়েছে। যে কোন বইয়ের উদ্দেশ্য যখন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থের দিকে মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয় তখনই সেই বইকে শাস্ত্র বলা হয়। নীতি হল মানুষ কিভাবে জীবন-যাপন করবে। এনাদের বক্তব্য হল মানুষ যদি শুধু ঠিক ঠিক শাস্ত্র বর্ণিত নীতি ও আচারকে অনুসরণ করে চলে তাহলে তার অর্থ আর কাম বৃদ্ধি হবে। নীতিশাস্ত্রের উপর অনেক বই আছে, এরমধ্যে চাণক্যনীতি খুব নামকরা নীতিশাস্ত্র, এগুলো হল বুদ্ধিমানের কথা। চাণক্যনীতিতে প্রচুর শ্লোক আছে তারমধ্যে যেমন বলা হচ্ছে পাঁচজন মিলে যখন কাজ করা হয় তখন কোন ব্যাপারে নিজে এগিয়ে গিয়ে কাজ করবে না কারণ তাতে কাজ যদি সফল হয় তাহলে কৃতিত্ব সবাই নেবে, আর যদি গোলমাল হয় তখন সব দোষ তোমার কাঁধে পড়বে। তারপর আছে শুভস্যশীলম্ অশুভস্য কালহরণম্। যে কোন শুভ কাজ যদি হয় তাহলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে, যদি অশুভ কাজ করতে হয় তাহলে যত প্রলম্বিত করা যায় তত প্রলম্বিত করতে থাক। এগুলো হল চাণক্যনীতি, এই নীতিগুলো পালন করলে জীবনে ঝগড়াট ঝামেলা কম হয়। বিদুরের নিজস্ব কতকগুলি নীতি ছিল, সেটাকেই বিদুর নীতি বলা হয়।

পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশ হওয়ার পর হস্তিনাপুরে যা যা নাটক হচ্ছে বিদুর সব দেখে যাচ্ছেন। আজকে এই সন্ধ্যা বেলায় সভা শেষ হয়ে যাওয়ার পর সবাই যে যার মত নিজের নিজের কক্ষে চলে গেছে। ঐদিকে সঞ্জয় বিরাট রাজার ওখান থেকে ফিরে আসার খবর ধৃতরাষ্ট্র পেয়েছে। এবার ধৃতরাষ্ট্রের আর রাতের ঘুম আসছে না। বিদুরকে ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি। বিদুর আসার পর বলছেন ‘বিদুর আমি চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছি, আমার ঘুম আসছে না, তুমি ধর্মের কিছু কথা আমাকে শোনাও’। বিদুর নীতি এইখান থেকে শুরু হচ্ছে। বিদুর বলছে *অভিযুক্তং বলবতা দুর্বলং হীনসাধনম্। হ্রতস্বং কামিনং কৌরবাবিশন্তি প্রজাগরাঃ।।৫।৩৩।১৪*। বিদুর বলছেন রাতে কার ঘুম হয় না? কয়েকজনের রাতে ঘুম হয় না, এরা হল দুর্বল মানুষের যদি বলবান লোকের সাথে শত্রুতা হয়ে যায়। আমি অফিসে কাজ করি, অফিসের সাহেব আমার উপর রেগে গেছেন, আমার রাতে আর ঘুম হবে না। রাশিয়ান লেখক চেখভের একটা গল্প আছে, গল্পের নামই হল ‘ক্লার্ক’। ক্লার্ক গেছে একটা থিয়েটার দেখতে, সেখানে তার অফিসের সাহেবও গেছে। ক্লার্কের এখন একটা হাঁচি পেয়েছে, হাঁচি দিতে গিয়ে দেখে হাঁচিটা সাহেবের গায়ের কাছে গিয়ে পড়েছে। সাহেব প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে ক্লার্কের দিকে তাকিয়েছে। সাহেবের ঐ দৃষ্টি দেখে ক্লার্কের তো ভয়ে আত্মারাম মাথায় উঠে গেছে। রাতে সাহেবের ভয়ে আর ঘুম হয়নি। পরের দিন অফিসে গেছে। অফিসে গিয়ে ভয়ে ভয়ে সাহেবের কাছে গিয়ে বলছে ‘স্যার, কাল আমার হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল সেইজন্য তখন হাঁচি এসে গিয়েছিল’। সাহেব ততক্ষণে ভুলেই গেছে। হাঁচির কথা বলতেই ক্লার্ককে ভাগিয়ে দিয়েছে। সাহেব ভাগিয়ে দেওয়াতে সেও খুব নার্ভাস হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর আবার সাহেবের কাছে গেছে ‘স্যার! আপনি রেগে গেলেন! আমি আপনার কাছে কালকের ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি’। সাহেব তখন খুব চোঁচিয়ে বলছেন ‘ইউ গোট আউট!’ সাহেবের ঐ মেজাজ দেখে এত নার্ভাস হয়ে গেছে ক্লার্কের শরীরটাই খারাপ হয়ে গেল। সাত দিন অফিসে আসছে না, তারপর তার হার্ট এটাক হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা। কিছু দিন পর অফিসে যাওয়ার পর আবার অফিসারের কাছে গিয়ে বলছে ‘স্যার! আমি সেদিন হাঁচতে চাইনি, সত্যি বলছি’। সাহেব আবার চোঁচিয়ে ওকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছে। তখন ক্লার্ক বুঝে গেল সাহেব আমাকে আর কোন দিন ক্ষমা করবে না। ঐ দুঃখেই লোকটি হার্ট

এটাকে মারা গেল। চেখভের কাহিনীগুলো খুব দুঃখের আর তৎকালীন রাশিয়ান সমাজের উপর আধার করে খুব সুন্দর ভাবে তাঁর লেখাগুলো সাজাতেন। বিদুর এই কথা বলছেন, বড়লোকের সাথে যদি আপনার শত্রুতা হয়ে যায় তাহলে আর রাতে ঘুম হবে না।

আর কার রাতে ঘুম হয় না? যার জীবনের সব কিছু চলে গেছে। যেমন কেউ নিজের স্ত্রীকে খুব ভালোবাসে, স্ত্রীই তার একমাত্র অবলম্বন, এখন সেই অবলম্বনই চলে গেছে, ঘুম আর কি করে হবে। যার সব টাকা পয়সা চলে গেছে তারও রাতে ঘুম আসবে না। যে কামী, ভেতরে প্রচুর কামনা-বাসনা আছে, তার রাতে ঘুম হবে না, মাথার মধ্যে খালি কামনা বাসনা গুলো ঘুরতে থাকে, কিভাবে ভোগ করা যায়। চতুর্থ হল চোর, চোরেরা রাতে ঘুমোতে পারেনা, চুরি করার নেশা তাকে ছটফট করাতে থাকে। চোর তাও দিনের বেলায় ঘুমিয়ে নেয় কিন্তু বাকিদের দিনের বেলাতেও ঘুম হয় না। এই চারজনের রাতে ঘুম হয় না, যার বড়লোকের সাথে শত্রুতা হয়ে গেছে, যার সব অবলম্বন চলে গেছে, যে কামী আর চোর। বিদুর সব বলে বলছেন ‘হে রাজন্! আপনার এই চারটির মধ্যে কোনটা হয়েছে, যার জন্য আপনার রাতে ঘুম হচ্ছে না’?

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথাকে এড়িয়ে গিয়ে বলছেন ‘আমি কিছু ভালো কথা তোমার কাছ থেকে শুনতে চাইছি’। বিদুরের সব কথা এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথাকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। বিদুর বলছেন বিদ্বান বা পণ্ডিতের কি কি লক্ষণ *ক্ষিপ্ৰং বিজানাতি চিরং শৃণোতি বিজ্ঞায় চার্থং ভজতে ন কামাৎ। নাসংপৃষতো হ্যাপুযুক্তো পরার্থে তৎ প্রজ্ঞানং প্রথমং পণ্ডিতস্য।।৫/৩৩/২৮।* ‘ঠিক ঠিক বিদ্বান পুরুষ তাঁর সামনের লোকটি কিছু বলতে শুরু করলে সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে শুরু না করে মন দিয়ে অনেকক্ষণ শুনবেন। কিন্তু একটু শোনার পরই বুঝে নেবেন তাঁর সামনের লোকটি কি বলতে চাইছে’। যারা অবিদ্বান তারা আবার দুটোর মধ্যে একটা, তাদের আমি যতই বোঝাই না কেন কিছুই বুঝবে না, আর তা নাহলে বলবে ‘ও আমি বুঝে গেছি, আপনাকে আর বলতে হবে না’। বিদুর বলছেন বিদ্বানরা প্রথমে ধৈর্য ধরে শোনেন, দ্বিতীয় চটপট বুঝে নেন আর তৃতীয় হল কর্তব্য বুদ্ধিকে আশ্রয় করে তাঁরা কাজে নামেন। যে কোন কাজই যখন করতে নামেন তখন এই কাজটা আমাকে করতে হবে, এই ভেবে তাঁরা কাজ করেন। কোন কামনা-বাসনা বা রাগ ঘেষ প্রেরিত হয়ে কাজে নামেন না। বুদ্ধিমান পুরুষ কি করেন? প্রথম হল কোনটা ঠিক কোনটা ভুল তাঁরা জানেন, কোন একটা পরিস্থিতি এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যান পরিস্থিতিটা কোন দিকে যেতে পারে। আমরা কি করি? আমরা জানি পরিস্থিতিটা কি আর এটাও জানি কোনটা ঠিক কোনটা ভুল কিন্তু কাজ করার সময় যেটা করার কথা নয় সেটাই করি। তার মানে আমাদের বুদ্ধির অভাব। বুদ্ধি যে শুধু চটপট বুঝে নেয় তা নয়, সাথে সাথে বুদ্ধি ভুল কাজের দিকে মনকে যেতে দেয় না। বুদ্ধি দুই ধরনের হয়, প্রথম হল সব কিছু চটপট বুঝে নেয়, শুধু বুঝেই নেয় না কাজও সেই রকমটি করে। আমাদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা চটপট বুঝতে পারিনা, আর যদি বা বুঝে নিই কিন্তু সেই অনুসারে কাজ করতে পারিনা। বুদ্ধিকে একদিকে যেমন তীক্ষ্ণ ধারালো হতে হবে অন্য দিকে তার ভার থাকতে হবে, ধার ও ভার দুটোই সমান থাকতে হবে। তলোয়ারের যেমন ধার আছে সাথে তার ভারও আছে তাই এক কোপে কারু গলা যখন তখন কেটে দিতে পারে। বেশীর ভাগ লোকের বুদ্ধি ভোঁতা, কোন ধারই নেই তাই কোন কিছু ধরতেই পারেনা। যদিও বা ধার থাকে তখন সেটা আবার ব্লেডের মত ধার কোন ভার নেই। ব্লেড দিয়ে কাঠ কাটা যাবে না কাঠ কাটতে কুড়োল দরকার, ওজন থাকতে হবে। বুদ্ধি মানেনই হল এই দুটোকে এক সঙ্গে থাকতে হবে, চটপট বুঝে নেবে কি বলতে চাইছে, আর দ্বিতীয় সেটাই করবে যেটা ঠিক। যারা বলে আমি জানি কোনটা ঠিক কিন্তু আমার মন এখন এটা করতে চাইছে না, এরা হল বালবুদ্ধি সম্পন্ন। বিদ্বানদের সম্বন্ধে শেষ কথা বলছেন – অযাচিত হয়ে কোন উপদেশ দেন না। পঞ্চতন্ত্র কাহিনীতে আছে, বৃষ্টিতে কয়েকটা বানর ভিজছিল। পাখিরা উপর থেকে তাদের উপদেশ দিচ্ছে তোমরা বাসা করে নাও না কেন। বানরগুলো শুনছে কিন্তু কিছু বলছে না। বৃষ্টি যখন থেমে গেল তখন বানর গুলো গাছে উঠল, পাখিদের যত বাসা ছিল সব ভেঙে নীচে ফেলে দিল। ট্রেনে দুজন যাত্রীর মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে। একজন বলছে বেশী কিছু বললে এক চড়ে চৌষটিটি দাঁত খুলে দেব। পাশ থেকে একটি লোক তখন বলছে দাঁততো বত্রিশটি হয়। তখন সেই লোকটি বলছে আমি জানতাম আপনি আমাদের মধ্যে ঢুকবেন তাই আপনারটাও জুড়ে নিয়েছি। তাই যতক্ষণ আমার মতামত না চাইছে ততক্ষণ কোন উপদেশ দিতে নেই।

এগুলো যখন বিচার করা হয় তখন বুঝতে পারি আমরা কত মুর্থ। আমরা চটপট বুঝতে পারিনা, বুঝলে সেই মত কাজ করতে পারিনা আর না জিজ্ঞেস করলেও অযাচিত ভাবে অন্যকে উপদেশ দিতে লেগে যাই, আর ধৈর্য ধরে কিছু শোনার ক্ষমতা আমাদের একেবারেই নেই।

এবার মুর্থদের সম্বন্ধে বিদুর বলছেন। মুর্থ কারা? *অশ্রুতশ্চ সমুদ্রদ্বো দরিদ্রশ্চ মহামনাঃ। অর্থাংশাকর্মণা প্রেমুর্মূঢ় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।* ১৫/৩৩/৩৭। পড়াশোনা নেই কিন্তু গর্ব আছে। দরিদ্র হয়েও বড় বড় পরিকল্পনা করে। তৃতীয় হল মুর্থরা কাজ না করেই টাকা পয়সা পাওয়ার কল্পনা করে। বেশীর ভাগ লোকই কোন কাজকর্ম না করে শুধু মেগা প্ল্যান করতে থাকবে। যারাই লটারির টিকিট কেনে তারাই এই পর্যায়ে পড়ে। এটা গেল মুর্থদের ব্যাপারে। এবারে বলছেন মূঢ় চিন্তা কারা। মূঢ় চিন্তার লক্ষণ বলতে গিয়ে অনেক কিছু বলছেন তার মধ্যে একটা শ্লোকে খুব সুন্দর বলছেন *অনাহূতঃ প্রবিশতি অপৃষ্টো বহু ভাষতে। অবিশ্বস্তে বিশ্বসিতি মূঢ়চেতা নরাধমঃ।* ১৫/৩৩/৪৩। যারা অনাহূত অবস্থায় প্রবেশ করে, জিজ্ঞাসা না করলেও বহু কথা বলে, অনধিকারিকে উপদেশ দেয় আর যে কৃপণের আশ্রয় নেয়, এরা সবাই হল মূঢ় চিন্তা ও নরাধম। যে লোক নিজে যে দোষে দোষদুষ্ট সেই দোষ অপরের মধ্যে দেখলে তার নিন্দা করে, যে লোক শত্রুকে মিত্র করে, মিত্রকে শত্রু করে ও হিংসা করে এদেরকে মূঢ়চেতা বলে।

ক্রুর কে? বলছেন, *একঃ সম্পন্নমশ্রীতি বস্তুে বাসশ্চ শোভনম্। যোহসংবিভজ্য ভূত্যেভ্যঃ কো নশংসতরন্ততঃ।* ১৫/৩৩/৪৭। যাদের সাহায্যে তার জীবন নির্বাহ হচ্ছে, যারা আশ্রিত তাদের যে দেখাশোনা করে না কিন্তু নিজে ভালো খাওয়া-দাওয়া করে নিজে ভালো জামা-কাপড় পড়ে, এরাই হল ক্রুর। বেলুড় মঠের সিনিয়র মহারাজরা যখনই কোথাও যান, সেখানে গিয়ে প্রথমে তাঁরা দেখেন তাঁদের ড্রাইভার ও তাঁর পরিচারকদের থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক মত হয়েছে কিনা। অথচ সরকারি বা বেসরকারি অফিসের বড় বড় অফিসাররা কোথাও ট্যুরে গেলে ড্রাইভারদের একবারের জন্যও কোন খোঁজই নেয় না। খুব হলে একবার তাও ফেরার সময় জিজ্ঞেস করবে সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল তো। বেলুড় মঠে আবার এর ঠিক উল্টো, মহারাজদের অনেক জায়গায় আমন্ত্রিত হয়ে যেতে হয়, সেখানে গিয়েই উদ্যোক্তাদের জিজ্ঞেস করবেন ড্রাইভারদের খাওয়ার কি ব্যবস্থা, থাকার কি ব্যবস্থা আছে। কারণ এদের উপর আমাদের জীবন চলছে। কোন ড্রাইভারকে মঠের সন্ন্যাসীরা ড্রাইভার বলে সম্বোধন করবেন না, সব সময়ই তার নাম ধরে দাদা বলে ডাকবেন। দ্বিতীয় বলছেন, যারা আমার আশ্রিত আর যাদের সাহায্যে আমার জীবন নির্বাহ হচ্ছে তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া, সাজ-পোশাকের কোন পার্থক্য রাখতে নেই। মঠ মিশনের সব সেন্টারে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোন পার্থক্য রাখা হয় না, সন্ন্যাসীরা যা খাবেন সেন্টারের কর্মচারীরাও একই খাবার খাবেন। বিদুর বলছেন – *একঃ পাপানি কুরুতে ফলং ভুঙক্তে মহাজনঃ। ভোক্তারো বিপ্রমুচ্যন্তে কর্তা দোষণে লিপ্যতে।* ১৫/৩৩/৪৮। পাপ করে যে অর্থ উপার্জন করা হয় সেই টাকা অনেকেই ভোগ করে কিন্তু তাদের কোন দোষ হয় না, কিন্তু যে পাপ কর্ম করে এই অর্থ উপার্জন করেছে সব দোষ তার উপরই পড়ে। রত্নাকর দস্যুর ক্ষেত্রে এটাই হয়েছিল, রত্নাকর যখন তার স্ত্রী, বাবা মাকে জিজ্ঞেস করেছিল তার পাপের ভাগ তারা নেবে কিনা তখন তারা এই কথাই বলেছিল, তুমি আমাদের দেখাশোনার ভার নিয়েছ এখন তুমি কিভাবে দেখাশোনা করবে সেটা তোমার ব্যাপার।

যারা ক্ষমাবান পুরুষ তাদের একটাই দোষ, লোকেরা অনেক সময় তাদের অসমর্থ বলে মনে করে। বিদুর পরের লাইনেই বলছেন, কিন্তু ক্ষমাশীল লোকদের এটা কিন্তু দোষ নয় কারণ ক্ষমা নিজেই একটা বিরাট বড় শক্তি। এর আগে দেবযানি-শর্মিষ্ঠার সংবাদ আর যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদীর পরস্পরের আলোচনায় এই ক্ষমার প্রসঙ্গ বারবার উঠে এসেছিল। বিদুর বলছেন ‘যে ক্ষমা করে তাকে লোকেরা মনে করে তার ক্ষমতা নেই বলে ক্ষমা করেছে। আসলে কিন্তু তা নয়’। আমাদের যতই শাস্ত্র পড়া থাক, আর যতই ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়ে থাকি আমাদের এই ব্যাপারে কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায়না যে ধর্মই সত্য আর মৃত্যুর পর আমার এই জীবন চলতে থাকবে। এই কথাও মানতে চাইনা যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব কিছু আগে থাকতেই নির্ধারিত হয়ে আছে, আমার যেটা পাওয়ার কথা সেটাই পাব এর বেশীও পাবো না কমও পাবো না। যদিও বা মানি কিন্তু পরিস্থিতি অন্য রকম হলে ধরে রাখতে পারিনা। আমি চেষ্টা করলে আমার আগামী দিনের যেটা হওয়ার কথা সেটাকে পাল্টে দিতে পারি। স্বামীজী যেমন বলছে ‘Man is the maker of his own destiny’ স্বামীজী অবশ্য এটা অন্য অর্থে বলছেন, তামসিক যারা তাদের জন্য বলছেন। আমরা যে শরণাগতির ভাবের কথা বলি, শরণাগতির ভাব মানে এই নয় যে কিছু না করে বসে থাকা। শরণাগতির ভাব হল জিনিষটা যেমনটি এসেছে আমি তেমনটি গ্রহণ করছি।

ক্রিকেটের ব্যাটসম্যানদের কৌশলটাকে উপমা হিসাবে শরণাগতির সঙ্গে তুলনা করা যায়। যখন ফাস্ট বোলিং হবে তখন সেই রকমটি খেলছে, যখন অফস্পিন করে তখন সেই রকম খেলে, যখন লেগস্পিন করে তখন সেইভাবে খেলে। জীবনটাকে এই রকম হতে হবে, যেমনটি পরিস্থিতি এল তখন সেই অনুযায়ী খেলে দিলাম। আমরা শুধু এক ধরনের খেলাই খেলতে জানি, বল যেভাবেই আসুক তখন ঐ একটা ভাবেই খেলতে যাই, সেইজন্যই আমাদের এত দুঃখ-কষ্ট। আমাদের প্রত্যেকের এই এক অবস্থা। একমাত্র যিনি ঈশ্বরের প্রতি শরণাগত তার মধ্যে এই ভাব থাকে না। পরিস্থিতিকে আমি চাইলে আমার মত আমি বেঁকিয়ে দেব। কিন্তু আমাদের ঈশ্বরেই ষোল আনা বিশ্বাস নেই শরণাগতি কোথেকে হবে।

জীবনের একটা লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। আমাকে এখন যেতে হবে গঙ্গাসাগর। নৌকা করে যাচ্ছি, উল্টোদিক থেকে একটা নৌকা আসছে আর তাতে অনেক নাচ গান আনন্দ হচ্ছে, আমি কি এখন নৌকাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে ওদের সাথে নাচ, গান স্মৃতি করে চলে যাব! আমার লক্ষ্য গঙ্গাসাগর, গঙ্গাবক্ষে নৌকা করে যেতে যেতে কত কিছু ভেসে আসছে, মরা ভেসে যাচ্ছে, কাঠ ভেসে যাচ্ছে, কত নৌকা পারাপার করছে। আমি কি এখন এদের সব কিছুর হিসাব করতে যাব যে এই মরাটা কোথেকে ভেসে আসছে, কার শরীর, এই নৌকাটা কোথায় যাচ্ছে এতে কত লোক আছে, সব হিসাব করতে গেলে আমাকে আর গঙ্গাসাগর পৌঁছাতে হবে না। সব কিছুকে পাশ কাটিয়ে আমাকে গঙ্গাসাগরের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যাদের জীবনের উদ্দেশ্য, আমি ঈশ্বর দর্শন করতে চাই, আমি ঈশ্বর অভিমুখী, তখন তাদের যে ঝামেলা গুলো আসে কায়দা করে পাশ কাটিয়ে সেই ঝামেলা থেকে তারা বেরিয়ে আসে। ক্ষমা বলতে কি বোঝাচ্ছে? একজন লোক আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করল। এখন আমি অনেক কিছুই করতে পারি। আমিও তার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারি, আমার বন্ধুদের দিয়ে তার একটা বদলা নিতে পারি, তার বাড়িতে গিয়ে ঝামেলা করতে পারি, কত কিছু করা যেতে পারে। আমি কিন্তু এসব কিছুই করলাম না। ‘আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে, আমাকে গালাগাল দিয়েছে! ও ঠিক আছে’ বলে আমি বেরিয়ে এলাম। লোকটি মনে করল আমি দুর্বল, আবার এসে আমাকে গালাগাল দিল। আমার তাতে কি হল! এবার আমি উল্টোটা ভাবছি, আমি গঙ্গাসাগর না গিয়ে ফরাঙ্কার দিকে যাচ্ছি। উল্টো যাচ্ছি বলে গঙ্গার জল ক্রমাগত ভেসে আসছে, জলের সাথে কখন কচুরিপানা ভেসে আসছে, কখন মরা, কখন গাঁদা ফুলের মালা ভেসে আসছে। আমার নৌকাতে যেটা আটকে যাবে সেটাকে আন্তে করে সরিয়ে দিয়ে আমি ফরাঙ্কা ব্যারেজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আর এগুলোর সাথে আমিও যদি আটকে যাই তাহলে আমাকে আর ফরাঙ্কা যেতে হবে না। আমাকে যদি বলা হয় চার ঘন্টার মধ্যে ফরাঙ্কায় পৌঁছাতে হবে। তখন কি আমি এগুলো কিছু করতে পারবো! জীবন আমাকে তাই বলছে। আমরা সবাই এখানে যারা আছি তারা কেউ পাঁচ বছরের মধ্যে মারা যাব, কেউ দশ বছর কেউ পঁচিশ বছর বাঁচব, কেউই একশ বছর বাঁচব না। আমাদের হাতে এখন কত আর সময় আছে? মেরে কেটে গড়ে পনের কুড়ি বছর। আগেকার দিনে কথাই ছিল ‘বল বুদ্ধি ভরসা তিরিশ পেরোলেই ফর্সা’। আমাদের সবাইর তিরিশ কবেই পেরিয়ে গেছে, তার মানে আমাদের বল বুদ্ধি ভরসা সবই গেছে। আমাদের মুনি ঋষিরা বলছেন বাপু তোমার কুড়ি বছরের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে নাও, বেশী সময় আর তোমার নেই। কিন্তু তার মধ্যে আমরা কি করছি? যে ঝগড়া করল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, যে একটু ভালোবাসা দেখাল তার প্রেমে পড়ে এখন হাবুডুবু খাচ্ছি। এখন যদি বলা এই চার ঘন্টার মধ্যে তুমি যদি ফরাঙ্কা পৌঁছে যাও তাহলে তোমার জীবনের বিরাট একটা লাভ হবে। এখন আমি কি আর কোন দিকে তাকাব? কিশোরকুমারের গান হোক, বরযাত্রীর নাচ গানা হোক কোন দিকেই আর তাকাব না। যদি কিছু এসে ফেঁসে যায় সেগুলিকে তাড়াতাড়ি করে সরিয়ে চোচাঁ দৌড়। আমাদেরও এই একই অবস্থা, এই মানব শরীর ধারণের একটাই উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। ঠাকুর বলছেন আগে জো সো করে মন্দিরে দেবতাকে দর্শন করে নাও তারপর তুমি যা কিছু করার কর, কাঙালীকে ভিক্ষা দাও আর মন্দিরের কারুকার্যই দেখ, আগে বিগ্রহ দর্শন। জ্ঞান, ভক্তি লাভ ছাড়া জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু এইতো কটি মাত্র দিন, পনের কুড়ি বছর তো কোন সময়ই নয়। যখন বুঝে নেয় যে আমারতো আর বেশী সময় নেই তখন কি সে ভাববে কে আমার সাথে ঝগড়া করল, কে আমাকে গালাগাল দিল! এখানে তাই বিদূর বলছেন যেটা লোকেরা মনে করে এটা তার দুর্বলতা, আসলে এটা তার দুর্বলতা নয়, সেই চাইছে কি করে এগুলোকে উপেক্ষা করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। এখন যদি সে লড়াই ঝগড়াতে নেমে পড়ে তাহলে সে আরও ফেঁসে যাবে।

অতি সাধারণ জাগতিক লক্ষ্যগুলিকে বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। হঠাৎ করে খবর হল কাল থেকে চিনির দাম একশ টাকা কেজি হয়ে যাবে। গুনতে পেলাম অমুক দোকানে এখনও পুরনো দামে চিনি পাওয়া যাচ্ছে। কতক্ষণ পাওয়া যাবে? যতক্ষণ স্টক আছে। আমি এখন সব কিছু ফেলে রেখে আগে ঐ দোকানের দিকে দৌড় লাগাব। আজ কুড়ি টাকায় পাওয়া যাচ্ছে আর কাল থেকে একশ টাকায় কিনতে হবে। আর কে দেখে! যত পারব চিনি কিনে রাখতে হবে।

এই ব্যাপারগুলো বুঝতে পারি। কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্যের যে যখন আমাদের জীবনের লক্ষ্য, ভক্তি, জ্ঞান, ঈশ্বর দর্শন নিয়ে কথা হয় তখন সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিই। বিদুর এই কথাই বলছেন, *সোহস্য দোষো ন মন্ত্যব্যঃ ক্ষমা হি পরমং বলম্। ক্ষমা গুণো হ্যশক্তানাং ভূষণং ক্ষমা।।৫/৩৩/৫৫।* যেটাকে তুমি তার দুর্বলতা ভাবছ, আদপেই দুর্বলতা নয়, এটাই তার শক্তি। ক্ষমা অসামর্থ্যদের গুণ এবং সামর্থ্যদের অলঙ্কার, ক্ষমা সকলেরই পরম বল। বিদুর বলছেন – *দ্বাবেব ন বিরাজেতে বিপরীতেন কর্মণা। গৃহস্থশ্চ নিরারম্ভঃ কার্যবাংশৈব ভিক্ষুকঃ।।৫/৩৩/৬৩।* দুই রকমের লোক তাদের নিজেদের বিপরীত কর্মের জন্য শোভা পাননা। প্রথম অকর্মণ্য গৃহস্থ আর কার্যবাংশৈব ভিক্ষুকঃ, সন্ন্যাসী যদি কাজ করে তখন সেটা সন্ন্যাসীতে শোভা পায় না। গৃহস্থ যদি কাজ না করে আর সন্ন্যাসী যদি কাজ করে তখন এই দুটো কারণে পক্ষেই শোভনীয় নয়। গৃহস্থ কাজ করবে কিন্তু সন্ন্যাসী যদি নিজে থেকে উঠে পড়ে কাজে লেগে যায়, জমি কিনছে, বাড়ি বানাচ্ছে এগুলো সন্ন্যাসীর পক্ষে ক্ষতিকারক। মঠের মহারাজরা তাঁদের সংগঠনের স্বার্থে কাজ করেন, কিন্তু এখন কোন সন্ন্যাসী যদি মঠ ছেড়ে চলে যান আর ঠিক করেন আমি একটা আশ্রম বানাব। এরপর জমি কিনতে বাড়ি বানাতে নেমে পড়লেন, বিদুর বলছেন সন্ন্যাসীদের এটা শোভা পায়না। সন্ন্যাসীর শোভা হল ত্যাগে আর গৃহস্থের শোভা কর্মে। গৃহস্থ যদি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকে তখন তার নিন্দা হবে আর সন্ন্যাসী যদি সারাক্ষণ কাজকর্ম নিয়ে মেতে থাকে তখন তাঁর নিন্দা হয়। বিদুর বলছেন *দ্বাবস্তসি নিবষ্টবৌ গলে বদ্ধা দৃঢ়াং শিলাম্। ধনবন্তমদাতারং দরিদ্রধাতপস্বিনম্।।৫/৩৩/৬৬।* দুই রকম লোককে গলায় পাথর বেঁধে ডুবিয়ে দেওয়া উচিত। প্রথম জন হল, যে টাকা পয়সা থাকতেও দান করে না আর দ্বিতীয় দরিদ্র যদি কষ্ট সহ্য না করে। টাকা-পয়সা থাকলে দান করতে হয় আর টাকা-পয়সা না থাকলে সহ্য করতে হয়। ঠাকুর নিমন্ত্রিত হয়ে এক ভক্তের বাড়ি গেছেন। রাখালও ছিল সঙ্গে। সেখানে ঠিক মত ঠাকুরের আদর আপ্যায়ন হয়নি। রাখাল প্রচণ্ড রেগে গেছে ‘চলুন মশাই! এখান থেকে চলে যাই’। ঠাকুর বলছেন ‘পকেটে কানাকাড়ি নেই ফাঙ্কা রোখ করে কি হবে, গাড়ি ভাড়াটা কে দেবে, আর এত রাত্তিরে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে খাবোই বা কি’!

যদি তোমাকে কোন মন্তব্য করতে হয়, গুহ্য কথা আলোচনা করতে হয় তাহলে এই চার ধরনের লোকের সাথে আলোচনা করবে না। *চত্বারি রাজা তু মহাবলেন বজ্জ্যান্যাহঃ পণ্ডিতস্তানি বিদ্যাৎ। অল্প প্রাজ্ঞঃ সহ মন্ত্ৰং ন মুখ্যায়ন দীর্ঘসূত্রৈরলসৈশ্চারশ্চৈশ্চ।।৫/৩৩/৭৫।* প্রথম মন্দবুদ্ধি, যার বুদ্ধি ভোঁতা। দ্বিতীয় দীর্ঘসূত্রী, হচ্ছে হবে, আজ না হলে কাল হবে, এই ধরনের কথা যারা বলে এরাই দীর্ঘসূত্রী, এদের সঙ্গে মন্তব্য করবে না। যারা খুব ছটফট করে, অস্থির চিন্তা, সব ব্যাপারেই তড়বড় করতে থাকে, এদের সঙ্গে কোন মন্তব্য করবে না। চতুর্থ স্বাবক, যারা আপনার খুব প্রশংসা করে, যারা তোষামুদে তারা কখনই রাজাকে সদবুদ্ধি দেবে না।

*চত্বারি চে তাত! গৃহে বসন্তু শ্রিয়াভিযুক্তস্য গৃহস্থধর্মে। বুদ্ধো জ্ঞাতিরবসন্তঃ কুলীনঃ সখা দরিদ্রো ভগিনী চানপত্য।।৫/৩৩/৭৬।* বাড়িতে সব সময় চার ধরনের লোককে রাখা বাড়ি পক্ষে মঙ্গলজনক। বয়স্ক সম্বন্ধী, যে কোন বুড়ো লোককে বাড়িতে রেখে দিলেই হবে না, নিজের আত্মীয় হতে হবে, ঠাকুরদা কিংবা ঠাকুরদা সম্পর্কিত বা নিজের বংশের কাউকে বাড়িতে রেখে দিতে হয়। দ্বিতীয় কুলিন ব্যক্তি যে সঙ্কটে পড়ে আছে। তৃতীয় নির্ধন বন্ধু, আমার কোন বন্ধুর দিনকাল খারাপ হয়ে গেছে, তাকে বাড়িতে রাখাটা কাজের। চতুর্থ হল অপত্যহীন বোন, এমন কোন বোন যে বিধবা বা অবিবাহিতা, কিন্তু গুরুত্ব হল তার কোন সন্তান নেই। সন্তান না থাকার কারণ হল যদি সন্তান থাকে তখন তার মনটা অন্য দিকে থাকবে, সন্তান যদি না থাকে তাহলে তার পুরো মনটা আমার দিকেই থাকবে। দ্বিতীয় যেটা হল আশ্রয়হীন বোন সে একটা আশ্রয় পেল আর মাঝখান থেকে আমি মানসিক বল পেলাম। এই ধরনের বয়স্ক বোন যদি বাড়িতে থাকে সেই বোন কিন্তু বাড়ির অনেক কিছুই সামলে দেয়। এই চার ধরনের লোককে বাড়িতে রাখতে হয়, এরা বাড়িতে থাকলে বাড়ির সব কিছু নির্বিঘ্নে চলতে থাকে। এগুলো বিদুরনীতি, আগেকার দিনের ব্রাহ্মণদের এই শ্লোকগুলো মুখস্ত করিয়ে দেওয়া হত। গ্রামের লোকেরা এসে যখন জিজ্ঞেস করত ‘আচ্ছা পণ্ডিত মশাই! আমার বাড়িতে এই সমস্যা হয়েছে, কি করা যাবে?’ ব্রাহ্মণ তখন চট করে সমস্যার সমাধানটা বলে দিতেন আর সাথে সেই শ্লোকটাকেও বলে দিতেন, এই শ্লোকে বিদুর এই রকম বলেছেন। ‘আচ্ছা পণ্ডিত মশাই আমার বোন বিধবা হয়ে গেছে তাকে বাড়িতে রাখা ঠিক হবে?’ ব্রাহ্মণ সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতেন ‘হ্যাঁ আছে। বিদুর নীতিতে আছে যদি অপত্যহীন ভগিনী থাকে তাহলে বাড়িতে রাখতে পার এতে বাড়ির মঙ্গল হয়।

এরপর বিদুর বলছেন – মানুষ তিনটে জিনিষ হারালে ভয় পায় – আয়ু, ধর্ম ও কীর্তি। টাকা-পয়সা হারিয়ে গেলে বা চলে গেলে মানুষ কিন্তু ভয় পায় না। ইংরাজীতে একটা নামকরা প্রবাদ আছে If you have lost money you have lost nothing, if you have lost health you have lost something and if you have lost time you have lost everything, আয়ু, ধর্ম ও কীর্তি এই তিনটে জিনিষ মানুষ যখন হারায় তখন মানুষ খুব ভয় ও কষ্ট পায়। এই তিনটে কখন হারায়? বিদুর বলছেন তিনটি কারণে আয়ু, ধর্ম ও কীর্তির বিনাশ হয়। *হরণঞ্চ পরস্বানাং পরদারাভিমর্ষণম্। সুহৃদশ্চ পরিত্যাগজ্ঞয়ো দোষাঃ ক্ষয়াবহাঃ। ১৫/৩৩/৭১।* অপরের সম্পত্তি অপহরণ করলে। এখন ভারতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ওপর থেকে নীচুতলা পর্যন্ত ঘুষের যে রমরমা কারবার চলছে, বলছেন এই ঘুষ নেওয়ার ফলে মানুষের আয়ু, ধর্ম ও কীর্তি এই তিনটেই হারায়। কারণ ঘুষ হল অন্যায় ভাবে অপরের থেকে তার উপার্জিত টাকাটা নিয়ে নেওয়া। অন্যায় ভাবে অপরের থেকে যখন টাকা নেওয়া হয় তখন এই তিনটেই চলে যায়। দ্বিতীয় কারণ পরস্বী সংসর্গে। অপরের স্ত্রীর সাথে যদি অবৈধ মেলামেশা করা হয় তখনও এই তিনটে চলে যায়। তৃতীয় কারণ হল, সুহৃৎ মিত্র ত্যাগ। আপনার যে হিতৈষী বন্ধু তাকে যদি ত্যাগ করে দেন তাহলে জেনে নিন আপনার এই তিনটে জিনিষই হারিয়ে যাবে। এইগুলোই হল নীতি, মানব জীবন যেটা চলছে এই নীতির উপর ভিত্তি করেই এগিয়ে চলে। নীতিশাস্ত্র গুলিতে অনেক সময় একই নীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যদি বিদুরনীতি আর চাণক্যনীতিকে পাশাপাশি নিয়ে পড়া হয় তখন দেখা যাবে অনেক নীতি মিলে যাচ্ছে। আবার কখন আলাদা নতুন নীতিও পাওয়া যাবে। চাণক্যনীতিতে যেমন এক জায়গায় বলছে ছয়টি দোষ মানুষকে নাশ করে – নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, আলস্য, ক্রোধ ও দীর্ঘসূত্রতা। বিদুর আবার অন্য ভাবে বলছেন এই তিনটে আয়ু, ধর্ম ও কীর্তি নাশ হয়ে যায় তিন ভাবে, অন্যায় ভাবে অপরের অর্থ আত্মসাৎ করে, পরস্বী সংসর্গে আর হিতৈষী মিত্রকে ত্যাগ করে।

বিদুরনীতি বিশাল অধ্যায়, এখানে সব কিছু আলোচনা করা সম্ভব নয়। কিছু কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। যেমন বলছেন মানুষকে ছয় ধরনের লোককে ত্যাগ করতে হয় – *ষড়্ভিমান্ পুরুষো জহ্যাদ্ভিন্নাং নাবমিবার্ণবে। অপ্রবক্তারমাচার্য্যমনধীয়ানম্ভিজম্। অরক্ষিতারং রাজানং ভার্য্যাধ্গাদ্রিয়বাদিনীম্। গ্রামকামঞ্চ গোপালং বনকামঞ্চ নামিপতম্। ১৫/৩৩/৮৫-৮৬।* যে আচার্য উপদেশ দেয় না, হোতা মানে পূজারী কিন্তু মন্ত্র উচ্চারণ করেনা, রাজা কিন্তু রক্ষা করতে পারেনা, যে স্ত্রী কটু কথা বলে, যে গোয়ালী গ্রামে থাকতে চায় আর যে নাপিত জঙ্গলে থাকতে চায়। গোয়ালী যদি গ্রামে থাকতে চায় তাহলে গরু ঘাস খাবে কোথেকে আর নাপিত যদি জঙ্গলে থাকতে চায় তাহলে চুল-দাড়ি কাটবে কে। সমুদ্রযাত্রায় ফুটো নৌকার মত এদের ত্যাগ করে দেবে। এগুলো হল খুব বাস্তব নীতির কথা। ছয়টি জিনিষ মানুষকে সুখ দেয় *অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ। বশ্যশ্চ পুত্রোহর্থকরী চ বিদ্যা ষড়্ভূজীবলোকস্য সুখানি রাজন্। ১৫/৩৩/৮৮।* অর্থপ্রাপ্তি, নিত্য নীরোগ বা নিত্য স্বস্থ, যদি শরীরে কোন ব্যাধি না থাকে তাহলে মানুষের খুব আনন্দ হয়, ভার্য্যা যদি প্রিয় হয় মানে স্ত্রী যদি প্রিয়ভাষিনী হয় তাহলে খুব সুখ দেয়, সন্তান যদি বাধ্য থাকে আর অর্থকরী বিদ্যা, এমন বিদ্যা যেটা অর্থে রূপান্তরিত হয়।

অর্থকরী বিদ্যাটা আবার খুব মজার ব্যাপার। হিন্দুদের মধ্যে যখনই কোন কিছু করা হয় তখন ঐ জিনিষটা করা হবে বলেই করা হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমরা করি একটা জিনিষ কিন্তু তার ফলটা অন্য রকম চাই। যেমন গ্রামের ছেলেরা কুস্তি খেলছে, কবাডি খেলছে। এরা কিসের জন্য খেলছে? খেলার জন্যই খেলছে। এরা কেউ ভাবেনা যে আমি কবাডি খেলে, কুস্তি করে বড় কিছু হবে, প্রচুর টাকা রোজগার করব। ভারতের অধিনায়ক ধোনি যখন স্কুলে খেলাধুলা করত তখন খেলার জন্যই খেলত। কিন্তু এখন যখন খেলছে তখন ভাবছে আমি আইপিএলে কত টাকার কন্ট্রাক্ট পাব। কারণ এখন তিনি খেলার মাধ্যমে নামঘশ পাচ্ছেন, টাকা-পয়সা পাচ্ছেন। ভারতে যখনই কোন কিছু করা হত বিশেষ করে দুটি জিনিষ, একটা হচ্ছে বিদ্যাচর্চা আরেকটি ধর্মচর্চা, এই দুটো যখন করা হত তখন বিদ্যা আর ধর্মের জন্যই চর্চা করা হত। আমি উপনিষদ কেন পড়ছি? আমার পড়তে ভালো লাগে। আমি জ্যোতিষবিদ্যা কেন পড়ছি? আমার ভালো লাগে বলে পড়ছি। আমি কথামৃত কেন পড়ি? আমার ভালো লাগে। ঠিক তেমনি ধর্মচর্চাতেও এই একই ব্যাপার। আমি রোজ গঙ্গাস্নান কেন করি? আমার ধর্ম তাই করছি। এইটাই নিষ্কাম কর্ম। আমি বেলুড় মঠে কেন যাই? আমার ভালো লাগে। কিন্তু এখন এই দুটোই পাল্টে গেছে। আমরা এখন মন্দিরে ঠাকুরের কাছে একবার কি দুবার মাথা ঠুকেই মনে করছি এতে আমার স্বামী, আমার স্ত্রী, আমার সন্তানরা যেন ভালো থাকে, বাড়িতে কারুর যেন অসুখ না করে, আমার চাকরি যেন ঠিক থাকে। আমরা প্রায় সবাই ঠাকুরের কাছে একবার করে প্রণাম করব আর একটা করে লম্বা লিস্ট ঠাকুরের হাতে ধরিয়ে দেব। কিন্তু



আমরা ভুলে যাই ভক্তি শুধু ভক্তির জন্যই করা। কারুর কিছু অঘটন হলেই বলবে ‘হে ঠাকুর তুমি একি করলে’। তুমি ভক্তি করছ সেতো তোমার ভক্তির স্বার্থেই করছ। সেখানে তোমার মেয়ের ডিভোর্স হয়ে গেল, তোমার ছেলে অবাধ্য হয়ে গেছে এতে ঠাকুরের সাথে কি সম্পর্ক! আমি ঠাকুরকে ভক্তি করছি কেন? ঠাকুরকে ভালো লাগে বলে তাই ভক্তি করছি। এখন আমার ছেলের চাকরি হবে কিনা, মেয়ের বিয়ে হবে কিনা, সবাই ভালো থাকবে কিনা এর সাথে ঠাকুরকে ভালো লাগার কি সম্পর্ক আছে? আমরা মনে করে বসে আছি কবে ঠাকুরকে দু টাকার সন্দেশ কিনে দিয়েছিলাম আর তাতেই ঠাকুর আপনার গোলাম হয়ে আমার বাড়ির সব কিছু সামলাবেন। ঠাকুরও ঠিক এই কথাই বলছেন – এখানকার জন্য দু পয়সার সন্দেশ আনে আর তার সাথে হাজারটি কামনা লাগিয়ে দেয়। যারা নিজেদের ঠাকুরের খুব বড় ভক্ত বলে মনে করছে তাদের একটা জাগতিক ধাক্কা লাগলেই দেখা যাবে এদের ভেতর থেকে সব কিছু বেরিয়ে আসবে, দেখে অবাক লাগবে যে এই লোককেই আমি ঠাকুরের বড় ভক্ত বলে মনে করতাম! আর এদের নিজেদের সব দোষ গিয়ে বেচারী ঠাকুরের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। শ্রীশ্রীমা যিনি সাক্ষাৎ জগৎজননী, আদ্যাশক্তি মহামায়া, তিনি আবার অবতারের স্ত্রী, তাঁকেই বৈধব্যের কত যাতনা সহ্য করতে হয়েছে। যিশু যিনি ঈশ্বরের সন্তান তাঁকে হতে হল ক্রুশবিদ্ধ। শ্রীরামচন্দ্র যিনি পুরুষোত্তম ভগবান, তাঁকে কিনা চৌদ্দ বছর জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হল। সেই তুলনায় আমরা কি এমন হল্যাম যে ঠাকুরের কাছে কোন্ দিন একবার মাথা ঠুকেছি বলে মনে করছি ঠাকুর আমার সব সমস্যা সমাধান করে দিতে বাধ্য।

ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন বলা হল বিদ্যার ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিষ দরকার। আমরা কোন রকমে গ্রাজুয়েট হয়েই বলি আমার চাকরি চাই। গ্রাজুয়েট হওয়ার সাথে চাকরির কোন সম্পর্কই নেই। গ্রাজুয়েট হয়ে গেলে মানে তুমি একটা বিদ্যাতে যোগ্যতা অর্জন করে নিলে। তাই বলে চাকরি কেন তোমাকে দিতে বাধ্য থাকবে? চাকরি একটা আলাদা ব্যাপার আর বিদ্যাটাও আলাদা ব্যাপার। কিন্তু বিদ্যা যখন কোন ভাবে অর্থকরী হয়ে যায়, যখন আমি সেই বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে থাকব তখন সেই বিদ্যা আমাকে সুখ দেবে, এই বিদ্যা এখন অর্থকরী বিদ্যা হয়ে গেল। কিন্তু মনে রাখতে হবে বিদ্যার সাথে অর্থের, টাকা উপার্জনের কোন সম্পর্ক নেই। বিদ্যা পুরো আলাদা জিনিষ। মার্ক টোয়েন তাঁর আত্মজীবনীতে বলছেন, আমাকে আমার খাওয়া পড়ার জন্য, অর্থ উপার্জনের জন্য কোন দিন কাজ করতে হয়নি। মার্ক টোয়েন তাঁর জীবনে প্রচুর বই লিখে গেছেন, তার মধ্যে সব নামকরা বই আছে যেগুলো বিশ্ব সাহিত্যে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। তিনি তারপরে লিখছেন, বই লেখা আমার হবি, লোকেরা আমার হবির জন্য আমাকে টাকা দেয়। বাকিরা হবির জন্য টাকা খরচ করে। যে কোন মানুষকে তার হবির জন্য টাকা খরচ করতে হয় আর মার্ক টোয়েনের হবি হল বই লেখা, লোকেরা মার্ক টোয়েনের বই কিনছে তাই বলছেন আমার হবির জন্য লোকেরা আমাকে টাকা দেয়। যদি কারুর বই পড়ার হবি থাকে, সে বই পড়তে শুরু করলে কোন দিকে আর কিছুরই খেয়াল থাকে না। এখন লোকেরা এসে তাকে বলবে না যে আপনার এত বই পড়ার হবি ঠিক আছে আপনি এই টাকাগুলো নিন। কোন দিনই কেউ এইভাবে তাকে টাকা দেবে না। কিন্তু তার যদি বই লেখার হবি থাকে তাহলে তার বইয়ের জন্য লোকে তাকে টাকা দিচ্ছে, এইটাই হল অর্থকরী বিদ্যা। এই কথাই বিদুর বলছেন তোমার বিদ্যা যদি অর্থকরী হয় তাহলে সেই বিদ্যা খুব সুখ দেয়। বিদ্যা মানুষকে এমনভাবেই সুখ দেবে, তোমার যে হবি সে নিজেই তোমাকে সুখ দেবে কিন্তু সেই হবির যদি অর্থকরী হয়ে যায় তখন দ্বিগুণ সুখ দেবে। কিন্তু হবি যেমন টাকাতে রূপান্তরিত হয় না, ঠিক তেমনি ধর্ম ও বিদ্যা জাগতিক সুখে রূপান্তরিত হয় না। সেইজন্য আমাদের মুনি ঋষিরা বারবার করে আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছে কখনই ধর্ম ও বিদ্যাকে জাগতিক চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে মেশাবে না।

হয় রকমের লোক হয় রকম লোকের থেকে নিজের কাজ আদায় করে বা নিজের জীবিকার ব্যবস্থা করে নেয়। *ষড়িমে ষট্‌সু জীবন্তি সপ্তমো নোপলভ্যতে। চৌরাঃ প্রমত্তে জীবন্তি ব্যাধিতেষু চিকিৎসকাঃ।। প্রমদাঃ কাময়ানেষু যজমানেষু যাজকাঃ। রাজা বিবদমানেষু নিত্যং মুর্খেষু পণ্ডিতাঃ।। ৫/৩৩/৯০-৯১।* এগুলো পড়লে বোঝা যায় তখনকার দিনে মনীষিরা ব্যক্তি মন আর সমষ্টি মনকে কত গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করে গেছেন। চোর অসাবধান লোক থেকে নিজের জীবিকা চালায়। ট্রেনে বাসে যারাই অসাবধান থাকে তাদেরই পকেটমাররা পকেট কাটে। বৈদ্যের জীবিকা চলে রোগীদের থেকে। কামী নারীরা কামী পুরুষদের থেকে জীবিকা চালায়। পুরোহিত যজমান থেকে জীবিকা চালায়। রাজা ঝগড়াটে প্রজাদের থেকে অর্থ রোজগার করে। আগেকার দিনে রাজারাই উকিলের কাজটা করত বলে এখানে রাজার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এখন রাজার বদলে উকিলকে নিয়ে আসতে হবে। মানুষরা ঝগড়া বিবাদ করে বলেই উকিলদের পেট চলে। ভারতে উত্তরকাশী একমাত্র জেলা যেখানে জেলাশাসক আছেন কিন্তু কোন এসপি নেই। কারণ এই

জেলাতে কোন ধরণের ক্রাইম তো দূরের কথা কারুর সাথে কোন ঝগড়া বিবাদও হয় না। জেলার যে আদালত দপ্তর তার উকিলদের কি করণ অবস্থা। একজন উকিল বলছে কারুর যদি মাথা ফাটে আর কারুর বাড়ি হাড়ি যদি ভাঙে তবেই আমার বাড়িতে রান্না হবে। মাথা ফাটে মানে কেউ যদি মারামারি করে আর হাড়ি ভাঙে মানে জমি জায়গা নিয়ে বিবাদের জেরে যদি হাড়ি আলাদা হয় তখনই এরা উকিলের দ্বারস্থ হয় আর তাতেই উকিলের বাড়িতে রান্না চাপবে। এটাই বিদুর বলছেন ঝগড়াটে লোকেদের দিয়েই রাজাদের জীবিকা চলে। যারা বিদ্বান তারা জীবিকা চালায় মুর্খদের থেকে।

ছয় ধরণের লোক তার উপকারীর উপকারকে মনে রাখে না। *ষড়্ভেতে হ্যবমন্যন্তে নিত্যং পূর্বোপকারিণম্। আচার্য্যঃ শিক্ষিতাঃ শিষ্যাঃ কৃতদারাস্চ মাতরম্। নারীং বিগতকামাস্চ কৃতার্থাস্চ প্রযোজকম্। নাবং নিন্তীর্ণকান্তারা আতুরাস্চ চিকিৎসকম্।* ১৫/৩৩/৯৩-৯৪। শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে শিষ্যের আচার্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকে না। আগে যাকে আমি উপকার করেছি সে আমাকে মনে রাখে না। বিবাহিত ছেলে মাকে মনে রাখে না। কাম-বাসনার পূর্তি হয়ে গেলে পুরুষ স্ত্রীকে মনে রাখে না। কারুর সাহায্যের দরকার পড়েছে আমি সাহায্য করে দিলাম পরে সে এই সাহায্যের কথা মনে রাখবে না। নদী পার হয়ে যাওয়ার পর নাবিকের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে না। রুগী সুস্থ হয়ে গেলে ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে না। এই জিনিষগুলোকে আমাদের জীবনে প্রতিটি পদে পদে মেনে চলতে হয়। কোন শিক্ষক মনে করে আমি ছাত্রদের কত যত্ন নিয়ে পড়িয়েছি আর এখন আমার কোন ছাত্রই কৃতজ্ঞতা দেখায় না। শিক্ষকের এটা কখনই আশা করা উচিত নয়, তুমি শিক্ষা দিয়েছ ব্যস্ এখানেই শেষ। মা ছেলেকে কত কষ্ট করে বড় করেছে। বিয়ের পর ঐ বড় করাটা ওখানেই শেষ হয়ে গেল, কিছু প্রত্যাশার কোন প্রশ্নই নেই। কোন নারী যখন পুরুষকে সুখ দেয়, সেটা ওখানেই সমাপ্ত হয়ে যায়, যদি মনে করে আমি পুরুষকে কত সুখ দিয়েছি ভাবাটাই বৃথা, এটাই নিয়ম। নৌকা করে যে মাঝি পার করে দিল মাঝির সাথে সম্পর্ক নদীর পারেই শেষ। রোগীর রোগ নিরাময় করাই ডাক্তারের কাজ, সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর রোগী কখন এসে ডাক্তারকে কৃতজ্ঞতা জানাবে এই আশা নিয়ে ডাক্তারের কখনই অপেক্ষা করা উচিত নয়।

ছয় ধরণের মানুষ সব সময় সন্তুষ্ট থাকে। *ঈর্ষ্যুর্ধ্বাণী হাসন্তুঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ। পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়্ভেতে নিত্যদুঃখিতাঃ।* ১৫/৩৩/৯৬। যে অপরকে হিংসা করে, যে অপরকে ঘৃণা করে, যার মধ্যে কোন কিছুতেই সন্তুষ্টি নেই। আচার্য শঙ্কর এক জায়গায় সন্তোষের সংজ্ঞা দিচ্ছেন – সমাজ যে ভোগের স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছে সেই ভোগ যখন কর্মফলানুসারে নিজে থেকেই আসে সেই ভোগে সন্তুষ্ট থাকাই সন্তোষ। যারা চাকরি করছে তারা সবাই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মাইনে পাচ্ছে, কেউ দশ হাজার পাচ্ছে আবার কেউ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে। সমাজ স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছে যে আমি ইচ্ছে করলে সাইকেল রাখতে পারি, ইচ্ছে করলে মোটর সাইকেলও রাখতে পারি আবার ইচ্ছে করলে গাড়িও রাখতে পারি। আমি আমার কর্মফলানুসারে যে পরিমাণ অর্থ পাচ্ছি সেই অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখন যদি আমার সাইকেল রাখার ক্ষমতা থাকে তাহলে সাইকেলই কিনব আর তাতেই সন্তুষ্ট থাকব, যদি মোটর সাইকেল কেনার ক্ষমতা থাকে তাহলে মোটর সাইকেলেই সন্তুষ্ট থাকব। কিন্তু যার মোটর সাইকেল আছে সে যদি ভাবে আমাকে একটা গাড়ি কিনতে হবে, দরকার হলে আমি লোন নেব, ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করব, তাহলে বুঝতে হবে তার সন্তোষ ভাব নেই, সে কিন্তু এবার বিপদে পড়ে যাবে। অন্য দিকে আমি প্রচুর টাকা আয় করি, আমার ইচ্ছে হল আমি নোংরা পল্লীতে যাব, সেখানে খুব করে মদ খাবো আর ফুর্তি করব। সমাজ কিন্তু এখানে এগুলো করার স্বীকৃতি দেয় না। প্রথমে সামাজিক স্বীকৃতি থাকবে, দ্বিতীয় যেটা নিজে থেকে আসছে তার বাইরে কোন কিছু ভোগ করা যাবে না, ক্রেডিট কার্ড থাকা মানেই আমি আমার ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছি, ক্ষমতার বাইরে যাওয়া মানেই অসন্তোষ। যার মধ্যে অসন্তোষ সে কোন দিন সুখী হয় না। এরপর হল যারা ক্রোধী তারা কিছুতেই সুখে থাকতে পারেনা। আর নিত্য সন্দিক্ত, সব সময় অপরকে সন্দেহ করে যাচ্ছে, সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত লোক কখন সুখে থাকতে পারেনা। শেষ হল পরভাগ্যোপজীবী, অপরের ভাগ্যের উপর ভরসা করে যে বেঁচে আছে সে কখন সুখী হয় না। এই ছয় ধরণের লোক সব সময় দুখী থাকে।

যে রাজা বা ক্ষমতাবান লোক তাকে সাতটি দোষ ত্যাগ করতে হয় *জিয়োহঙ্কা মৃগয়া পানং বাক্‌পারুষ্যঞ্চ পঞ্চমম্। মহচ্চ দণ্ডপারুষ্যমর্থদূষণমেব চ।* ১৫/৩৩/৯৮। নারী বিষয়ক আসক্তি, জুয়া খেলা, শিকার করা, পানাসক্ত হওয়া, কঠোর বচন, কঠোর দণ্ড দেওয়া আর অর্থের দুর্প্রয়োগ। এতক্ষণ ছয় ছয় করে বলে গেলেন তারপর সাত সাত এইভাবে বেড়ে যাচ্ছে। আটে এসে বলছেন মানুষের আটটি গুণ থাকলে খ্যাতি বৃদ্ধি হয় *অষ্টৌ গুণাঃ পুরুষং দীপয়ন্তি*

প্রজ্ঞা চ সত্যঞ্চ দমঃ শ্রুতঞ্চ। পরাক্রমশ্চাবল্লাষিতা চ দানং যথাশক্তি কৃতজ্ঞতা চ।।৫/৩৩/১০৫। বুদ্ধি, কুলিনতা মানে উচ্চবংশ, যদি উচ্চবংশ না হয়ে থাকে তাহলে নিজেকে উন্নত করে বংশটাকে উচ্চ করতে হয়। এরপর বলছেন দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, শাস্ত্র জ্ঞান, শাস্ত্র জানা থাকলে খ্যাতি বাড়ে। পরাক্রম থাকলে খ্যাতি বাড়ে, গৃহস্থদের পরাক্রম রাখতেই হয়। অল্পভাষী, কথা কম বলা, যথা শক্তি দান, যতটা সামর্থ্য ততটা দান করলে খ্যাতি বাড়ে। আর শেষে কৃতজ্ঞতা, যে আমার ভালো করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা রাখলে খ্যাতি হয়। এর আগে বলা হল ছয় ধরনের লোক উপকারীকে মনে রাখে না আর এই শ্লোকে বললেন যে কৃতজ্ঞ তার খ্যাতি হয়। ঐ ছয়টি অবস্থায় শিক্ষকের কাছে শিক্ষা পেয়েছে কিন্তু শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, ছেলেকে মা লালন পালন করে বড় করেছে ছেলে মার প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সাধারণ অবস্থায় মানুষ এই রকমই করে, এখানে কৃতজ্ঞ থাকার ফলটাই বলা হচ্ছে, কৃতজ্ঞ হলে খ্যাতি বাড়ায়। আমি শিক্ষকের কাছে শিক্ষা পেয়ে কর্মক্ষেত্রে আমি অনেক উচ্চ অবস্থায় চলে গেছি কিন্তু শিক্ষককে এখনও মনে রেখে সম্মান করে যাচ্ছি। আমি বিয়ে করেছি, বিয়ে করার পরও মায়ের সব রকম সেবা করে যাচ্ছি, যে আমাকে সুখ বর্ধন করেছে তাকে মনে রেখেছি, এইগুলোই আমাকে খ্যাতির শিখরে নিয়ে যাবে। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আরও সাতটি গুণের কথা বলা হল যে গুণগুলি মানুষের খ্যাতি বৃদ্ধি করে।

এরপর দশ নিয়ে বলছেন। দশ রকমের লোক ধর্মের তত্ত্ব জানতে পারেনা **দশ ধর্মং ন জানন্তি ধৃতরাষ্ট্র!** **নিবোধ তান্। মত্তঃ প্রমত্ত উন্মত্তঃ শ্রান্তঃ ক্রুদ্ধো বুভুক্ষিতঃ।। ত্বরমাণশ্চ লুব্ধশ্চ ভীতঃ কামী চ তে দশ।** **তস্মাদেতেষু সর্বেষু ন প্রসজ্যেত পণ্ডিতঃ।।৫/৩৩/১০৮-১০৯।** প্রথম যারা মত্ত, মত্ত মানে নেশাখোরদের মনের অবস্থা যে রকম হয়। মত্ত শুধু নেশাখোরদের বোঝাচ্ছে না, যে কোন কিছুতে মত্ত, কেউ খেলাধুলা নিয়ে মত্ত হয়ে আছে, কেউ নারীতে মত্ত, এইসব লোক কোন দিন ধর্মের তত্ত্ব জানতে পারেনা। দ্বিতীয় যে প্রমত্ত, মন যার সব সময় চঞ্চল হয়ে আছে, মনের চঞ্চলতার দরুণ মন সব সময়ই অসাবধান। তৃতীয় উন্মত্ত, যারা পাগল, মাথার ঠিক নেই। মত্ত, প্রমত্ত ও উন্মত্ত এরা কখনই ধর্ম কথা শুনতে চায় না। চতুর্থ শ্রান্ত, শরীর যখন খুব ক্লান্ত থাকে, অনেক কাজকর্ম করে পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে তখন ধর্ম কথা নিতে পারবে না। পঞ্চম ক্রুদ্ধ, মনটা রেগে রয়েছে, ধর্ম কথা শুনতে যাবার সময় বাসে ট্রামে যদি কারুর সাথে ঝগড়া হয় তাহলে সেদিন আর ধর্ম কথা শুনতে ইচ্ছে হবে না। ষষ্ঠ বুভুক্ষঃ, মানে ক্ষুধার্ত, পেটে যদি খিদে থাকে ধর্ম কথা কানে যাবে না, ঠাকুর তাই বলছেন খালি পেটে ধর্ম হয় না। সপ্তম ত্বরমাণ, যে তাড়াতাড়ি করে। অষ্টম, লুব্ধ, লোভী মানুষ ধর্মের কথা শুনতে পারেনা। নবম ভীত, যারা ভয়ান্ত, কোন কারণে খুব ভয়ে আছে তাকে ধর্ম কথা বললে তার কানে যাবে না। আর শেষ হচ্ছে কামী, কোন জিনিষের প্রতি যদি খুব কাম ভাব থাকে সে ধর্ম কথা নিতে পারেনা। এই দশ রকমের লোক ধর্ম তত্ত্ব জানতে পারেনা। সেইজন্য বলা হয় ধর্ম তত্ত্ব সবার জন্য নয়।

এবারে বলছেন শ্রেষ্ঠ পুরুষ কারা। **ন বৈরমুদীপয়তি প্রশান্তং ন দর্পমারোহতি নাস্তমেতি। ন দুর্গতোহস্মীতি করোতাকার্য্যং তমার্য্যশীলং পরমাহুর্য্য্যঃ।।৫/৩৩/১১৯।** প্রথম যারা পুরনো বিবাদকে তুলতে দেয় না। একজনের সাথে অনেক দিনের একটা পুরনো ঝগড়া আছে, সেটা এখন শান্ত হয়ে গেছে, যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ তিনি সেই ঝগড়াকে নতুন করে তুলে আনেন না। আমাদের জীবনে কত লোকের সাথেই কত রকমের অশান্তি হয় কিন্তু একটা অবস্থার পর সেই অশান্তিকে লাইন টেনে দিতে হয়। কেননা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিনিয়ত পাল্টে যাচ্ছে, সেটা ভালো হোক মন্দই হোক, নতুন করে সেই অশান্তি বিবাদকে তুলতে নেই। শ্রেষ্ঠ পুরুষ নিজের ব্যাপারে কখন গর্ব করেনা। কিন্তু তার থেকেও বেশী **নাস্তমেতি**, শ্রেষ্ঠ পুরুষ হীনভাব প্রদর্শন করেন না। হীন ভাব দেখানো হল, কারুর সঙ্গে যখন কোন কিছু নিয়ে বিবাদ বা কথা কাটাকাটি হয় তখন অভিমান করে বলতে থাকে ‘হ্যাঁ, আমি তো মুর্থ, আমি নিকৃষ্ট, আমি পাপী তাই এত কথা আমাকে বলতে পারলেন’। হীন ভাব বা দীন ভাব মনের মধ্যে নিয়ে আসাটা অত্যন্ত খারাপ। যারা বলে আমার কি সেই ভাগ্য আছে, আমার কি সেই বিদ্যা আছে, এই ধরনের কথা যারা বলে বুঝতে হবে এর ভেতরে শক্তির অভাব আছে। শ্রেষ্ঠ পুরুষ যারা, তারা বিপদে পড়লেও কখন ভুল কাজ করে না। যেমন মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, এখন যাও বা একটা জায়গায় বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে কিন্তু প্রচুর পণ চাইছে। তখন মেয়ের বাবা ঘুষ নিতে শুরু করে। কিছু দিন আগে আমেরিকার নিউজ পেপারে ভারতের একটা খবর বেরিয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের কোন এক জেলার স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বদল হয়েছে। নতুন ম্যানেজার এসে স্ট্রিং রুম খুলে দেখতে চাইলেন কত ক্যাশ আছে। ব্যাঙ্কের ক্যাশ বুকে দেখাচ্ছে ব্যাঙ্কে এক কোটি টাকা স্ট্রিং রুমে রাখা আছে। কিন্তু স্ট্রিং রুম খুলে দেখছে কিছুই নেই, কয়েকটি মাটির গুড়ো শুধু রাখা আছে। বলছে উঁই পোকা নাকি সব টাকা খেয়ে নিয়েছে। এক কোটি টাকার একটা টুকরো পর্যন্ত নেই। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সঙ্গে সঙ্গে

পুলিশে খবর দিয়েছে। আমরা মনে করি মানুষ লোভে পড়ে ঘুষ নেয় কিন্তু বেশীর ভাগ সময় মানুষ বিপদে পড়ে ঘুষ নেয়। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে কিন্তু পণের টাকা জোগাড় হচ্ছে না বলে বিয়ে দিতে পারছে না। হিন্দী বেলেট তো প্রচুর টাকার পণ দিতে হয়, কুড়ি লাখ পঁচিশ লাখ দিয়ে শুরু হয়। অত টাকা কোথা থেকে দেবে তখন বাধ্য হয়ে ঘুষ নিতে হয়। যাদের থেকে ঘুষ নিয়েছে তারা আবার অন্য জায়গায় ঘুষ নিচ্ছে এইভাবে শেষে গরীব লোকদের ভুগতে হয়। এখানে তাই বলছেন বিপদে পড়লেও তারা কখন ভুল কাজ করে না।

সব থেকে শ্রেষ্ঠ নীতি কি? *সমৈর্বিবাহং কুরুতে হিনৈঃ সমৈঃ সখ্যং ব্যবহারং কথাধঃ। গুণৈর্বিশিষ্টাংশ্চ পুরো দধাতি বিপশ্চিতস্তস্য নয়াঃ সুনীতাঃ। ১৩৫/৩৩/১২৪।* বিবাহ, মিত্রতা, সম্পর্ক ও কথাবার্তা এই চারটে সমানে সমানে করাটাই শ্রেষ্ঠ নীতি। যখন কিছু শেখার থাকে তখন আমাকে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের কাছে গিয়েই শিখতে হয়, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু যখন কথাবার্তা বলা হবে তখন সমানে সমানে বলতে হয়। কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে, যেমন মালিকের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে আমাকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, বিদূরনীতি অনুযায়ী কিন্তু আমার কখনই ঐ অনুষ্ঠানে যাওয়া উচিত হবে না, কারণ ঐ প্রাচুর্যের মাঝখানে নিজেকে বেমানান লাগবে আর এতে আমারও কুণ্ঠা বোধ হবে। সেইজন্য কোন ভাবে এই ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানকে কায়দা করে এড়িয়ে যেতে হয়। শুধু এই সামাজিক অনুষ্ঠানের কথাই বলা হচ্ছে না, এই চারটে জিনিষ সমানে সমানে না হলে কখন করতে নেই, বিবাহ, বন্ধুত্ব, সম্পর্ক ও কথাবার্তা। বিদূর বলছেন তোমার থেকে যারা নীচু ও হীন পুরুষ তাদের সাথেও এই চারটে জিনিষ করবে না। যারা তোমার থেকে বেশী সঙ্গুণের অধিকারী তাদেরকে সব সময় তোমার সামনে রাখবে আর চেষ্টা করবে তাদের থেকে কিছু শিখে নিতে। কিন্তু সেখানেও সমান সমান হবে না, তারা আবার তোমার সাথে কথাবার্তা বলতে চাইবে না। তখন তাদের গুরু রূপে তাদের সম্মান দিয়ে সামনে রাখবে। আমাকেও তো বড় হতে হবে! তাই আমার থেকে যারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাদেরকে আমার সামনে রাখতে হবে। এই নীতিটাই শ্রেষ্ঠ নীতি।

এবার লজ্জাশীলদের নিয়ে বলছেন। এখানে লজ্জা মানে, একটা ভুল কাজ করে ফেললাম তখন সেই ভুল কাজের জন্য আমার একটা কুণ্ঠা বোধ হচ্ছে, কুণ্ঠা ভাবের জন্য আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি। নারীর আভূষণই হল হ্রী, লজ্জা আর হ্রী একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। নিজের মুখ আর শরীরের অঙ্গ সবাইকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, সবার সামনে চটাং চটাং কথা বলছে, এতে মেয়েদের লজ্জা ভাবটা চলে যায়। আধুনিক প্রজন্মে মেয়েদের যা সাজ-পোষাক, আদব কায়দা এতে বোঝাই যাচ্ছে তাদের হ্রীটা হারিয়ে গেছে। এখানে অবশ্য মেয়েদের কথা বলা হচ্ছে না, পুরুষের কথা বলা হচ্ছে। পুরুষের মধ্যে যখন লজ্জার অভাব থাকে তখন অনেক কিছুই তার নাশ হয়ে যায়। যেমন একজন ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি লজ্জার ভাব থাকে তখন সে মদের দোকানে গিয়ে মাতলামো করতে পারবে না, কিংবা নাচ গান হৈছল্লোড় করবে না। এই ধরনের কাজ করার আগে সে ভাববে কেউ দেখে নিলে কি হবে, সবাই ছ্যা ছ্যা করবে। বাচ্চারা যখন কোন অন্যায় করে তখন চারিদিকে তাকিয়ে দেখে কেউ তাকে দেখছে কিনা, কারণ তার লজ্জার ভাব আছে। বড় হতে হতে লজ্জা ভয়টা কেটে যেতে থাকে, তখনই সে বিনাশের দিকে এগিয়ে যায়। বিদূর বলছেন *য আত্মনাপত্রপতে ভৃশং নরঃ স সর্বলোকস্য গুরুর্ভবত্বাতে। অনন্ততেজাঃ সুমনাঃ সমাহিতাঃ স তেজসা সূর্য্য ইবাবভাসতে। ১৫/৩৩/১২৮।* মানুষ যখন লজ্জাশীল হয় তখন তাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। মনের মধ্যে যদি লজ্জা ভাব থাকে তাহলে তিনটে জিনিষ হয় – হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যায়, তেজ অনন্ত গুণে বেড়ে যায় আর একাগ্রতা লাভ করে। যখনই মানুষ নির্লজ্জ হয়ে কোন কাজ করে তখন তার একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়, হৃদয়ের শুদ্ধিটা চলে যায় আর তেজটাও হারিয়ে যায়।

*অপ্যন্যুত্তাং প্রলপতো বালাচ্চ পরিজল্পিতাঃ। সর্বতঃ সারমাদদ্যাদশাভ্য ইব কাঞ্চনম্। ১৫/৩৪/৩৩।* অনেক সময় পাগল, বাচ্চারা নিরর্থক বক্ বক্ করে যাচ্ছে, কিন্তু এদের থেকেও সার কথা গ্রহণ করতে হয়। যারা বিদ্যা অর্জন করতে চায়, জীবনে অনেক কিছু শিখতে চায় তার সব কিছু থেকেই শিক্ষা নিতে চেষ্টা করে। আমরা মনে করি ওতো পাগল ওর কথা কি শুনবো, ওতো বাচ্চা ও আর কি বলবে। কিন্তু না, তাদের কথাও শুনতে হয়, ঐ অনর্থক কথা বলার মধ্যেও এরা অনেক মূল্যবান কাজের কথা বলে দেয়, সেইজন্য তাদের কথাও শুনতে হয়। *গন্ধেন গাবঃ পশ্যন্তি বেদৈঃ ব্রাহ্মণাঃ। চারৈ পশ্যন্তি রাজানসচক্ষুভ্যামিতরে জনাঃ। ১৫/৩৪/৩৫।* সাধারণ মানুষ চোখ দিয়ে দেখে, পশু গন্ধ দ্বারা দেখে, ব্রাহ্মণ বেদ দিয়ে দেখে, রাজা গুণ্ডচরদের দ্বারা দেখে। এখানে বলতে চাইছেন, সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুকে জানতে পারে, পশুরা গন্ধ দিয়ে বস্তুটা কি বুঝে নেয়, আর রাজা যিনি তিনি সব কিছু জানতে পারেন তার নিজস্ব

গোয়েন্দাদের দ্বারা। কিন্তু ব্রাহ্মণ যাঁরা তাঁরা বেদের মাধ্যমেই সব কিছুকে জানতে পারেন। ব্রাহ্মণের কাজ হল নিজেকে শুধু ঈশ্বরের ব্যাপারে, ব্রহ্মের ব্যাপারে, জ্ঞানের ব্যাপারে, ভক্তির ব্যাপারে পরিব্যাপ্ত রাখা। ব্রাহ্মণ এগুলো কি দিয়ে দেখবে? চোখ দিয়ে দেখা যাবে না, গন্ধ শুকেও বলতে পারবে না। যুক্তিবাদীরা বলে ভগবান বলে যদি কেউ থাকেন তাহলে আমাকে চোখ দিয়ে দেখান হোক? তাকে কে দেখাবে চোখ দিয়ে? তাহলে ভগবানকে কোথা দিয়ে দেখব? বেদ থেকে। ইন্দ্রিয় দিয়ে, তর্ক দিয়ে ভগবানের কথা, ব্রহ্মের কথা জানা যায় না, জানা যায় একমাত্র বেদ থেকে। বেদ যদি আমরা মানি, শাস্ত্রে যদি বিশ্বাস করি তবেই এই সব কথা আমরা মানব। আর বেদ যদি আমরা না মানি তাহলে এই কথাগুলো আমাদের জন্য নয়। একজন সন্ন্যাসীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ‘আপনি ঠাকুরকে বিশ্বাস করেন?’ সন্ন্যাসী বলবে ‘হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি’। ‘কেন বিশ্বাস করেন?’ ‘কারণ আমি কথামৃতকে বিশ্বাস করি। এর বাইরে আর অন্য কোন কারণ নেই। কথামৃত যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমার জীবনটাও মিথ্যা’। একজন সন্ন্যাসীকে যখন ধর্মের ব্যাপারে, অধ্যাত্ম ব্যাপারে কোন কথা বলতে হয় তখন তিনি বলবেন কথামৃতে এই রকম আছে। সন্ন্যাসী কথামৃত ছাড়া আর কিছু জানেন না, কথামৃতই তাঁর কাছে বেদ। সেইজন্য বলছেন সাধারণ মানুষ দেখে চোখ দিয়ে, পশু দেখে গন্ধ দিয়ে, রাজা দেখে গোয়েন্দা দিয়ে কিন্তু ব্রাহ্মণ দেখে বেদ দিয়ে। তাই ব্রাহ্মণের বেদ অধ্যয়ণ খুব জরুরী। জীবনের উচ্চতমো তত্ত্বগুলি বেদ ছাড়া জানা যায় না। সন্ন্যাসীদের কেন গীতা পড়তে হয়? কারণ গীতা বেদের সার। আমরা যে এখানে উপনিষদ, গীতা অধ্যয়ণ করতে আসছি, কেন আসছি? কারণ মহাভারত বলছে যদি আধ্যাত্মিক ব্যাপার জানতে চাও তাহলে বেদ থেকেই জানতে পারবে, বেদ দিয়েই ব্রাহ্মণরা তাই দেখেন।

বলছেন সত্যেন রক্ষ্যতে ধর্মো বিদ্যা যোগেন রক্ষ্যতে। মৃজয়া রক্ষ্যতে রূপং কুলং বৃত্তেন রক্ষ্যতে। ৫/৩৪/৪০। ধর্মের রক্ষা হয় সত্য কথা দিয়ে। সত্য যদি না হয় তাহলে ধর্মের রক্ষা হবে না। বিদ্যা যোগেন রক্ষ্যতে, যে কোন বিদ্যা বিশেষ করে অধ্যাত্ম বিদ্যা যোগ অনুশীলনের দ্বারা রক্ষিত হয় অর্থাৎ যোগশক্তি থাকলেই বিদ্যাকে ধরে রাখতে পারা যাবে, যোগশক্তি না থাকলে বিদ্যা হারিয়ে যায়। মৃজয়া রক্ষ্যতে রূপং আগেকার দিনে সাবান ছিল না বলে স্নানের সময় শরীরে মাটি মেখে স্নান করত। এই মাটি অনেক রকমের হত, গঙ্গামাটি, মূলতানি মাটি, বলা হয় মূলতানি মাটি মাখলে নাকি ফর্সা হয়। যখন স্নানাদি করা হয় তখন এইসব মাটি দ্বারা রূপের রক্ষা হয়। আর কুলং বৃত্তেন রক্ষ্যতে, কুলের রক্ষা হয় সদাচার থেকে, সদাচার না থাকলে বংশের সুনামটা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে কলঙ্ক চেপে যায়।

বিদুর বলছেন গতিরা ত্ববতাং সন্তঃ সন্ত এব সতাং গতিঃ। অসতাপ্তঃ গতিঃ সন্তো ন তু সন্তঃ সতাং গতিঃ। ৫/৩৪/৪৭। মনস্বী, মনীষি, যাঁরা সজ্জন তাঁদের গতি হল সাধুরা, মানে মনস্বীদের সহায়তা করেন সন্ত পুরুষরা। আর সাধুদের গতি কে? সাধুরাই। যারা অসৎ লোক তাদেরও গতি সাধুরাই। তাই সাধুরা তিন ধরণের মানুষকে আশ্রয় দেন – সৎ পুরুষ, অসৎ পুরুষ আর মনীষি। কিন্তু দুষ্ট পুরুষরা কখনই সাধুপুরুষকে আশ্রয় দেয় না। সাধুদের কাছে আনাগোনা করছে বলে সেও সৎ লোক নয়, কারণ এখানে বলছেন সাধুদের কাছে মনীষিরাও আসেন আবার অসৎ পুরুষ, দুষ্ট লোকেরাও আসে।

চারটে জিনিষ থেকে চার ধরণ লোকের বল হয়। হিংসা বলমসাধুনাং রাজ্ঞাং দণ্ডবিধির্বলম্। শুশ্রূষা তু বলং স্ত্রীণাং ক্ষমা গুণবতাং বলম্। ৫/৩৪/৭৬। দুষ্ট পুরুষের বল হিংসা, এই হিংসা মানে হিংসুটে না, আঘাত করার অর্থে বলা হচ্ছে। রাজার যে বল সেটা হল তার দণ্ড দান প্রয়োগ করার ক্ষমতাবল। নারীর বল শুশ্রূষা বা সেবা, নারী যে কাউকে জয় করে সেটা সেবা দিয়েই করে। ক্ষমাং গুণবতাং বলং, যারা গুণী পুরুষ তাদের শক্তি হল ক্ষমা। আবার অন্য ধরণের প্রসঙ্গেও বলছেন, দেবতারা যখন কাউকে পরাজিত করতে চাইছেন বা তার বিনাশ চাইছেন তখন আগে তার বুদ্ধিটাকে খারাপ করে দেন। বুদ্ধি খারাপ হলে তখন নীচ কর্মের দিকে তার মনটা চলে যায়। নীচ কর্ম করতে করতে সে বিনাশের দিকে চলে যায়। ন দেবা দণ্ডমাদায় রক্ষন্তি পশুপালবৎ। যং তু রক্ষিতুমিচ্ছন্তি বুদ্ধ্যা সংযোজয়ন্তি তম্। ৫/৩৫/৪২। গোয়ালারা যেমন ডাঙা মেরে গরুগুলোকে ঠিক রাখে দেবতারা ঐভাবে মানুষকে সাহায্য করে না। দেবতারা যাকে ভালো করতে চান তাকে সৎ বুদ্ধি দিয়ে দেন। যেমন যেমন মানুষ শুভ কাজে বা ভালোর দিকে মন দিতে থাকে তেমন তেমন তার অভিষ্ট সিদ্ধি হতে থাকে। নৈনং হৃদ্যাংসি ব্রজিনাতারয়ন্তি মায়াবিনং মায়ায়া বর্তমানম্। নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাং হৃদ্যাংস্যনং প্রজহত্যন্তকালে। ৫/৩৫/৪৪। যারা কপটতা ও ছলচাতুরি করে তারা যতই

বেদ অধ্যয়ণ করুক না কেন, আপদ বিপদ এলে পাখির ছানার ডানা গজালে সে যেমন নীড় ছেড়ে উড়ে চলে যায় সেই রকম তার সব বিদ্যা উড়ে বেরিয়ে যায়। সেইজন্য কপট আচরণ করতে নেই। *শ্রীমঙ্গলাৎ প্রভবতি প্রাগল্ভ্যাৎ সম্প্রবর্দ্ধতে। দাক্ষ্যাত্ত কুরুতে মূলং সংযমাৎ প্রতিতিষ্ঠতি।* ১৫/৩৫/৫৪। শুভ কর্ম করলে লক্ষ্মী জন্ম গ্রহণ করেন, মানে আর্থিক সমৃদ্ধি হয়। *প্রাগল্ভ্যাৎ সম্প্রবর্দ্ধতে*, যখন কথাবার্তার মধ্যে চাতুরিতা থাকে তখন ঐ লক্ষ্মীই বড় হতে থাকে। *দাক্ষ্যাত্ত কুরুতে মূলং*, যখন দক্ষ মানে কর্মে কুশলতা ও পারদর্শিতা হয় তখন লক্ষ্মী শেকড় ছড়ায়। আর সংযম যদি থাকে তখন লক্ষ্মী চিরস্থায়ী হয়ে বসে যাবেন। বাড়িতে যদি ধন সম্পদের সমৃদ্ধি করতে হয় তাহলে চারটে জিনিষ করতে হবে। প্রথমে শুভ কর্ম করা শুরু করতে হবে, শুভ কর্ম করতে থাকলে সেই বাড়িতে লক্ষ্মী জন্ম নেবেন। ইনফোসিসের নারায়ণ মূর্তির ঠিক এই রকম কাহিনী, তিনি আইআইটি কানপুরে পড়তেন, কিভাবে তার মধ্যে একটা আদর্শ মাথার মধ্যে এসে গিয়েছিল, কিভাবে কম্পিউটারে গেলেন, শুভ কর্ম করে তাঁর লক্ষ্মী জন্ম নিল। প্রগলভতা, কথার মধ্যে চাতুর্য থাকবে, নারায়ণ মূর্তিকে কতবার তার বিরোধিরা অন্যায় ভাবে কিনে নেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু মূর্তি নিজের বুদ্ধির সাহায্যে আর কথাবার্তার মধ্যে চাতুর্যতা ও নানা রকমের ব্যবসায়িক লেনদেনের কথা বলে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। এই প্রগলভতা যদি থাকে তখন লক্ষ্মী বাড়তে শুরু করে। আর কাজে কর্মে যদি দক্ষতা থাকে, চৌখস যদি হয় তখন লক্ষ্মী শুধু বাড়তেই থাকবে না, এবার লক্ষ্মী শেকড় গেড়ে নেয়। এর উপর সংযম যদি থাকে তখন লক্ষ্মী এবার জাঁকিয়ে বসে যাবে আর ওখান থেকে নড়বে না।

*পূর্বে বয়সি তৎ কুর্যাদ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ। যাবজ্জীবন্ত তৎ কুর্যাদ যেন প্রত্য সুখং বসেৎ।* ১৫/৩৫/৭১। জীবনের প্রথম অবস্থায়, অর্থাৎ বয়স থাকতে থাকতে আর শরীরের জোর থাকতে থাকতে এমন কাজ করবে যাতে বৃদ্ধ অবস্থায় সুখে থাকতে পারবে। আর সারা জীবন এমন কাজ করে যাবে যেটা মৃত্যুর পরেও সুখ দিতে থাকবে। এর মূল অর্থ আছে যখন কর্মক্ষমতা থাকবে, যৌবন থাকতে থাকতে এমন অর্থ ও কাম সঞ্চয় করে নেবে যাতে বৃদ্ধ বয়সে কোন ঝামেলায় না পড়তে হয়। বৃদ্ধ বয়সে প্রত্যেকেরই নানান অসুবিধা হবেই হবে, সেইজন্য আগে থাকতেই অর্থ সঞ্চয় এমন ভাবে করে রাখতে হবে যে অর্থ সংস্থানের কোন অসুবিধা না হয়। সারা জীবন ভালো কাজ, শুভ কাজ করে যেতে হবে, এই কাজই মৃত্যুর পর মানুষকে সুখ দেবে। এইভাবে প্রচুর নীতির কথা বিদুর বলে যাচ্ছেন, সব কথা আলোচনা সম্ভব নয় কিন্তু এইটুকু আলোচনাতে একটা ধারণা করা গেল এনারা জীবন ও জগৎকে কিভাবে দেখতেন। এই প্রস্তুতি গুলি হয়ে গিয়ে মন যখন পরিষ্কার হয়ে যায়, কাজকর্ম গুলো যখন সঠিক ভাবে করা হয় তারপরই মানুষ ঠিক ঠিক ধর্ম ও অধ্যাত্মের দিকে এগোতে সক্ষম হয়। এগুলো হল লক্ষ্যের দিকে এগোবার প্রস্তুতি।

### সনৎসুজাতীয় সংবাদ

বিদুর নীতি জাগতিক ব্যাপারগুলোর উপর আধারিত, জীবন কিভাবে চালাতে হবে, একটা মানুষ কিভাবে তার মানব জীবনকে সার্থক করতে পারে তার বিস্তারিত দিকগুলিকে নিয়ে বিদুর নীতিতে আলোকপাত করা হয়েছে। এরপর মহাভারতের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আসছে। এই অধ্যায়ের নাম সনৎসুজাতীয় সংবাদ। দর্শনের দিক থেকে গীতার পরেই সনৎসুজাতীয় সংবাদের স্থান। কিন্তু যারা ঘোর অদ্বৈতবাদী তাদের কাছে সনৎসুজাতীয় সংবাদের স্থান গীতারও উপরে। যাই বলা হোক না কেন গীতা হল পূর্ণ দর্শন শাস্ত্র, সেই দিক দিয়ে সনৎসুজাতীয় সংবাদ একাঙ্গী শাস্ত্র, একাঙ্গী মানে একটা বিষয়কেই নিয়ে এগিয়ে গেছে।

সনৎসুজাতীয় সংবাদ আলোচনা শুরু করার আগে একটা ছোট ভূমিকা দেওয়া উচিত। ব্রহ্মাকে যখন ভগবান সৃষ্টি করার আদেশ দিয়েছেন তখন ব্রহ্মা কিভাবে তিনি সৃষ্টি করবেন ঠিক করার জন্য ধ্যানে বসে গেলেন। হাজার বছর ধ্যান করার পর তিনি আদেশ পেলেন এর আগের কল্পে যেভাবে সৃষ্টি হয়েছিল ঠিক সেইভাবেই সৃষ্টি হবে। হিন্দু পরম্পরায় নতুন ভাবে কিছু সৃষ্টি হয় না, আগের কল্পে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটিই এই কল্পেও হবে। এই ধারণাই হিন্দু পরম্পরাতে চলে আসছে। দেখা যায় যে সম্প্রদায় তাদের পরম্পরাকে রক্ষা করে চলে সেই সম্প্রদায়ই যুগ যুগ ধরে টিকে থাকে, যারা পরম্পরাকে ধরে রাখতে পারেনা তারা হারিয়ে যায়। এই ঘটনা ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত, এখানে আমার আপনার মতের কোন ব্যাপার নেই। ব্রহ্মা যখন দেখলেন এর আগের কল্পে যা ছিল সেটাই সৃষ্টি করতে হবে, ব্রহ্মাও তাই হোক বলে সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত হলেন। এতদিন জপ-ধ্যান করে ব্রহ্মার শরীর মন একেবারে শুদ্ধ সত্ত্ব হয়ে গিয়েছে। প্রথমে ব্রহ্মা নিজের মন থেকে সৃষ্টি করতে শুরু করলেন। ব্রহ্মা মন থেকে প্রথম সৃষ্টি করলেন চারজোন কুমারকে। এই চার কুমারের নাম সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। ব্রহ্মার শুদ্ধ মন থেকে প্রথম সৃষ্টি বলে এনারা এত শুদ্ধ সত্ত্ব মন নিয়ে জন্ম নিয়েছেন যার

ফলে এঁদের কারুর ভেতর সাংসারিকতার কোন রকম ছাপ ছিল না। বাবা-মার পুণ্যে সন্তান ভালো হয়, বাবা-মায়ের পুণ্য যদি না থাকে সন্তান গোলমেলে হয়। ভাগবতে এটাই আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এই চারজোন কুমার জন্ম নিতেই কৌপিন পড়ে আর কমণ্ডলু হাতে নিয়ে তপস্যায় বেরিয়ে গেলেন। জগতের কোন কিছুতেই ওনাদের কোন আগ্রহ নেই। ব্রহ্মা দেখলেন হাজার বছর তপস্যা করে প্রথম সৃষ্টিটাই বৃথা হয়ে গেল। যাঁদের সৃষ্টি করলাম তাঁরা ঈশ্বর চিন্তা করার জন্য তপস্যায় চলে গেলেন। তার ফলে সৃষ্টিটা থমকে গেল। ব্রহ্মা তখন আবার তপস্যায় বসে গেলেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্মার সত্ত্বগুণও আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে। এরপর এই সপ্ত ঋষিদের সৃষ্টি হল। ব্রহ্মা দেখলেন এভাবে কয়েক হাজার বছর ধরে ধ্যান করার পর মন থেকে সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াটা অনেক দীর্ঘকালীন, সৃষ্টির গতিও অনেক শ্লথ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে তো হবে না। এবার তিনি অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করে নিজেকে পুরুষ নারীতে বিভক্ত করে দিলেন। সেই থেকে পুরুষ ও নারীর সংযোগ থেকে সৃষ্টির প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল।

এই চারজোন কুমার সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমাররা জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তিতে একেবারে পরিপূর্ণ। শুদ্ধ সত্ত্ব অবস্থাতে তাঁরা সদা সর্বদা প্রতিষ্ঠিত, এখান থেকে এনাদের মন কখনই বিচ্যুত হয় না। আমাদের আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের ইতিহাসে কোথাও এতটুকু বর্ণনা নেই যে এনারা শুদ্ধ সত্ত্ব অবস্থা থেকে কখন এক চুলও নড়ে গিয়েছিলেন। এই চার কুমারের বৈশিষ্ট্য হল এনারা পুরোপুরি নির্গুণ নিরাকারের সাধনায় রত অন্য দিকে আবার ভগবান বিষ্ণুরও ভক্ত। পৌরানিক কাহিনীতে আছে এনারা চারজোন এক সঙ্গে একবার বৈকুণ্ঠে ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। এই চার ভাই সব সময় একই সঙ্গে চলাফেরা করেন। ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে যখন দেখা করতে গেছেন সেই সময় বিষ্ণু তাঁর কক্ষে বিশ্রাম করছিলেন। চার ভাইকে আসতে দেখেই ভগবান বিষ্ণুর দ্বারপাল জয় বিজয় পথ রোধ করেছেন। জয় বিজয়ের ব্যবহারটা ভালো ছিল না বলে এনারা অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। চার ভাই বললেন ‘একি! তোমরা অসুরদের মত আচরণ করছ! যাও তোমরা রাক্ষস হয়ে জন্ম নাও’। বলা হয় জয় বিজয়ই পরে রাবণ, কুম্ভকর্ণাদি হয়ে জন্ম নিয়েছিল। এই চার কুমারের রাগ ঘেঁষ বলে কিছু ছিল না, সব সময়ই ঈশ্বর জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত।

এখন বিদুর আর ধৃতরাষ্ট্র বসে আছেন। বিদুরনীতি ধৃতরাষ্ট্রকে বলা হয়ে গেছে। কিন্তু তবু ধৃতরাষ্ট্রের ঘুম আসছে না, কারণ প্রতিনিয়ত খবর আসছে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে দু পক্ষই জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। তখন বিদুর মনে মনে সনৎকুমারকে প্রার্থনা করলেন। সনৎকুমারের আরেকটি নাম সনৎসুজাত। বিদুর প্রার্থনা করতেই সনৎসুজাত এসে হাজির হয়ে গেলেন ধৃতরাষ্ট্রকে কিছু ধর্মের উপদেশ দেবার জন্য। এত বড় ঋষি এসেছেন, ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আপ্যায়ন করে প্রণামাদি করলেন। এখানে ধৃতরাষ্ট্র কিছু প্রশ্ন করছেন আর সনৎসুজাত তার উত্তর দিচ্ছেন। এগুলো হল সেই সময়কার কিছু দার্শনিক তত্ত্বের চিন্তা ধারা যেগুলোকে ব্যাসদেব মহাভারতে কাহিনীর মাধ্যমে নিয়ে এসেছেন। মাঝ রাতে সনৎকুমারের মত একজন এত বিরাট ঋষি ধৃতরাষ্ট্রের মত একজন পুত্র স্নেহে অন্ধ ব্যক্তিকে এত গভীর উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের উপদেশ দিতে হাজির হয়ে যাচ্ছেন এটা ঠিক যুক্তি দিকে দিয়ে মেলান যায় না। গ্রন্থকারকে দর্শনের এই তত্ত্বগুলোকে পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে, এখন তার একটা প্রেক্ষাপট আবশ্যিক, তাই এইভাবে সনৎকুমারকে মাঝ রাতে ধৃতরাষ্ট্রের সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। যাই হোক ধৃতরাষ্ট্র এখন প্রশ্ন করছেন *সনৎসুজাতাহিমিমং শৃণোমি ন মৃত্যুরন্তীতি তব প্রবাদম্। দেবাসুরা হ্যাচরন্ ব্রহ্মচর্যমমৃত্যবে তৎ কতরন্মু সত্যম্।।৫/৪২/২।।* ‘বিদুরের কাছে আমি আপনার ব্যাপারে শুনেছি, আপনি নাকি বলেন মৃত্যু বলে কোন কিছু নেই’। সমস্ত ধর্মপ্রচারকদের কিছু কিছু নিজস্ব মত থাকে, আর সেই মত অনুসারে পণ্ডিতরা তাদের কাছে নানা রকম প্রশ্ন করে। ভগবান বুদ্ধকেও অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন করত। একজন যেমন ভগবান বুদ্ধকে প্রশ্ন করছে ‘ঈশ্বর আছেন কি?’ ভগবান বুদ্ধ বলছেন ‘আমি কি বলেছি ঈশ্বর আছেন?’ ‘ও তার মানে ঈশ্বর নেই?’ ভগবান বুদ্ধ আবার বলছেন ‘আমি কি বলেছি ঈশ্বর নেই?’ মানুষ এই রকম নানান রকমের প্রশ্ন করে জানতে চায় এই ব্যাপারে আপনার কি মত। ধৃতরাষ্ট্রও ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন করছেন ‘আপনি নাকি বলেন মৃত্যু বলে কিছু নেই?’ ধৃতরাষ্ট্র আরও বলছেন ‘আমি শুনেছি দেবতা আর অসুররা মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করেছিল’। ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্নটা পরিষ্কার করবার জন্য বলতে চাইছেন পরম্পরাতে একদিকে বলা হচ্ছে মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়েছিল, তার মানে মৃত্যু আছে। আমরা এখন অসুর বলতে যে খারাপ অর্থে বুঝি তখনকার দিনে সেই অর্থে অসুরদের খারাপ মনে করা হত না। অসুর বলতে বোঝাচ্ছে যারা খুব শক্তিমান কিন্তু ঈশ্বরীয় ব্যাপারে আগ্রহ কম। যেমন বর্তমান ভারত পুরো অসুর হয়ে যাচ্ছে, আধ্যাত্মিক দিকে যে নিষ্ঠা থাকার কথা সেটা দ্রুত গতিতে নীচের দিকে নেমে

যাচ্ছে। আমেরিকা, ইংল্যান্ড এদের শক্তি প্রচণ্ড বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু আধ্যাত্মিকতা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। বলছেন, দেবতারাও তপস্যা করেছিলেন আবার অসুররাও তপস্যা করেছিলেন। কিসের জন্য? যাতে মৃত্যু থেকে বাঁচা যায়। অথচ আপনি বলে বেড়ান মৃত্যু বলে কিছু নেই। পরম্পরার কথাকে তো বাদ দেওয়া যায় না, অন্য দিকে আপনি এত বড় ঋষি তাই আপনার কথাকেও বাদ দেওয়া যায় না। আপনি আমাকে ঠিক করে বুঝিয়ে দিন ব্যাপারটা কি।

ধ্যান-ধারণা করে করে নিজের বিচার ধারাকে ঠেলতে ঠেলতে খুব গভীরে কেউ যখন চলে যান তখন সেখান থেকে এমন এমন তত্ত্ব বা সত্য তাঁর সামনে উদ্ভাসিত হয় যেটা চিন্তা করলে অন্যদের মাথা খারাপ হয়ে যাবার উপক্রম হতে পারে। ধ্যানের গভীরে গিয়ে যিনি দেখছেন তাঁর কিছুই হবে না। অন্য দিকে যখন তাঁদের উপলব্ধির কথা আমাদের বলেন তখন আমরা হয় বুঝতে পারিনা নয়তো মানতে চাইনা। ঠাকুর যেমন মৃত্যুকে নিয়ে বলছেন খাপ থেকে যেন তলোয়ার বেরিয়ে এলো, ঠাকুরের এই উপলব্ধি আমাদের দেখা মৃত্যুর সঙ্গে মিলবে না। আবার তিনি বলছেন সচ্চিদানন্দই আছেন, তার ফলে তিনি দক্ষিণেশ্বরে কালী মন্দিরে বলি হওয়ার সময় দেখছেন যে ছাগকে বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যিনি বলি দিতে যাচ্ছেন, যে খড়া দিয়ে বলি দেওয়া হবে, আর বলিকাঠ যেটাতে বলি দেওয়া হবে, সবটাই সেই সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দকে বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সচ্চিদানন্দ সচ্চিদানন্দকে সচ্চিদানন্দ দিয়ে সচ্চিদানন্দের উপর বলি দেবেন। ঠাকুরের এই দর্শন যদি সত্য হয়, তাহলে মৃত্যু আছে কি নেই? এটাই হল সেই গভীর তত্ত্ব, যা আমাদের মত সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারেনা। কিন্তু শাস্ত্র পড়ে, গুরুমুখে, আচার্যদের কাছে শুনে যতটুকু আমরা বুঝেছি যখন জ্ঞান উপলব্ধি হয় তখন তাঁরা দেখতে পান আমার যে সত্তা, আমি বলতে ঠিক ঠিক যেটা বোঝায় সেটাই আত্মা বা ঈশ্বর। তিনি যেভাবে সাধনা করেছেন সেইভাবেই তিনি আত্মা বা ঈশ্বরকে দেখবেন। যদি ভক্তিমার্গে সাধনা করে থাকেন তাহলে দেখবেন ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, আবার যিনি জ্ঞানমার্গে সাধনা করেছেন তিনি দেখবেন আত্মা ছাড়া কিছুই নেই। খুব নিষ্ঠাবান মুসলমান সাধনার সিদ্ধিতে দেখবেন আত্মা ছাড়া কিছুই নেই। আমাদের পরম্পরাতে বলা হয় যদি ভগবানই একমাত্র সত্য হন, ভগবান ছাড়া কিছু নেই তাহলে যে কোন ধরনের দ্বৈতই অর্থহীন, জন্ম মৃত্যুটাও মিথ্যে হয়ে যায়, দেহ, জগৎ সব কিছুই অর্থহীন। সব ধর্মই মানছে যে প্রথমে ঈশ্বর ছিলেন, সেন্ট জনের বাইবেলে বলছে In the beginning there was word and word was with God and word was God প্রথমে শব্দ ছিল, শব্দ ভগবানের সঙ্গে ছিল আর শব্দই ভগবান ছিল। হিন্দুরাও একই কথা বলছে, সেইজন্য বেদকে বলছে শব্দ ব্রহ্ম, মুসলমানরা তাই কোরানকে এত উচ্চ স্থান দেয়। শব্দই ভগবান ছিল যখন বলছে তার মানে ভগবান ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। চরম সত্য হিসাবে ভগবান ছাড়া যদি কিছু না থাকে তাহলে জন্ম মৃত্যু বলেও কিছু নেই। বেদান্তীরা এই তত্ত্বকেই আরও এগিয়ে নিয়ে বলেন, জন্ম মৃত্যু বলে যে কিছু নেই এটাকে তুমি যে মৃত্যুর পরে গিয়ে দেখবে তা নয়, তোমার জীবিত অবস্থায় সাধনা করে যদি সেই অবস্থায় পৌঁছে যাও তখন তুমি দেখবে, যে কোন ধরনের দ্বৈত বলতে যা কিছু আছে তার কোন অস্তিত্বই নেই। তখন দেখে জন্ম-মৃত্যুর কোন অস্তিত্ব নেই, পাপ-পুণ্যের কোন অস্তিত্ব নেই, ধর্ম-অধর্মের কোন অস্তিত্ব নেই। যে কোন ধরনের দ্বৈতই হোক না কেন, যেটা আছে তার উল্টোটাও থাকতে হবে এই ধরনের কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। এর অস্তিত্ব তাহলে কার জন্য আছে? যারা আমি বলতে শরীর, মন, বুদ্ধিকে বোঝে তাদের জন্য এগুলোর অস্তিত্ব আছে। কিন্তু যে আমি বলতে সেই শুদ্ধ চৈতন্যকে বুঝে নিয়েছে, আমি বলতে ঈশ্বরকে বুঝেছে তার এই দ্বৈত বোধটা উড়ে যায়। ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক অনুভূতি হলে এটাই দেখে, তখন এদের আর কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তখনই বলতে পারে *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*, তাঁর গলা যদি কেউ কেটে দেয় তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না, অপরের গলা যদি তিনি কেটে দেন তাতেও তাঁর কিছু আসে যায় না। আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়? আমার বাড়িতে যদি কেউ খাওয়ার জন্য আসে তখন আমি বলব তুমি তো সেই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা তোমার আবার ক্ষুধা তৃষ্ণা কিসের। আমি যখন কারুর বাড়িতে খেতে যাব তখন তারা যদি খেতে না দেয় তখন তাকে অভিশাপ দিয়ে তার আদ্যপান্ত শ্রাদ্ধ করব, জানেনা কাকে অবহেলা করছে, ইত্যাদি। স্বামীজী তাঁর ভাববার কথাতে এই জিনিষগুলো নিয়েই আলোচনা করেছেন।

যাঁরা ঘোর অদ্বৈতবাদী তাঁরা মৃত্যু বলে কিছু নেই এই কথাও বলবেন না, তাঁরা আরও উচ্চ সিদ্ধান্ত দিলেন। এই সিদ্ধান্তের নাম অজাতবাদ। অজাতবাদ সিদ্ধান্ত খুব নামকরা সিদ্ধান্ত, মাণ্ডুক্য উপনিষদে আর মাণ্ডুক্যকারিকাতে এর খুব সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদের পুরোটাই অজাতবাদকে নিয়ে লেখা। এরা বলছে, মৃত্যুতো দূরের কথা সৃষ্টিই হয়নি, জন্মই যার হয়নি তার মৃত্যু কি করে হবে। এই চার কুমাররা হলে এই অজাতবাদ দলের ঋষি। সৃষ্টি বলতে আমরা বুঝি একটা জিনিষ থেকে আরেকটা জিনিষের জন্ম হওয়া, যেমন দুধ থেকে দই হল, এখানে একটা সৃষ্টি হল। অনেকে একে বলে পরিণাম, দুধে যদি কিছু জিনিষ মিশিয়ে দেওয়া তখন দুধের একটা পরিণাম হয়। এইভাবে সৃষ্টির



অনেক রকম নাম হয় পরিণামবাদ, সৎকার্যবাদ ইত্যাদি। সৃষ্টিকে আমাদের পরম্পরাতে অনেক ভাবে দেখা হয়। কিন্তু অজাতবাদীরা বলবেন সৃষ্টি আদৌ হয়নি। আমি স্বপ্নে অনেক কিছুই দেখছি, কখন মারামারি করছি, কখন ভালোবাসছি। এগুলো আদৌ সৃষ্টি হচ্ছে কি? আমার তখন মনে হচ্ছে যে সৃষ্টি হচ্ছে, ঘুম ভেঙে গেলে দেখছি বাস্তবে এগুলো কিছুই সৃষ্টি হয়নি। ঠিক তেমনি তুমি যেটা মনে করছ সৃষ্টি হয়েছে সেটা তোমার মনের ভুল আসলে সৃষ্টি বলে কিছু নেই। অজাতবাদ, জাত মানে জন্ম নিয়েছে, অজাত মানে যার জন্মই হয়নি। যার জন্মই হয়নি তার আবার মৃত্যু কিসের। যার আদি নেই অন্ত নেই তার মধ্য কোথেকে আসবে! আমাদের ঋষি মুনিদের জীবন যাত্রায় চাহিদা বলে কিছুই ছিল না, সামান্য একটু আহার আর বাসস্থানের জন্য একটা ছোট্ট কুঠিয়া, তার সাথে পোশাক বলতে ছিল একটা কৌপিন। কোন কিছুর চাহিদা না থাকাতে তাদের সময় ছিল প্রচুর আর যে কোন একটা বিষয়ের উপর চিন্তন করতে সারাটা দিন, সারাটা সপ্তাহ, মাস বছর কাটিয়ে দিতেন। এখন কেউ যদি ঠিক করে নেয়, যে কোন একটা বিষয়কে, যেমন ভগবানের কৃপা আছে কি নেই, শুধু এই জিনিষটাকে নিয়ে আমি সাতদিন ধরে বিচার করতে শুরু করব। সাতদিন ধরে আর কোন চিন্তা করছি না, শুধু ঈশ্বরের কৃপা আছে কি নেই এই নিয়ে বিচার করে যাচ্ছি। কিছু দিনের মধ্যে এমন এমন তত্ত্ব আমার সামনে আসবে যে আমি চমকে উঠব। ঋষিদের বিশেষ কোন কাজকর্ম থাকত না, টাকা-পয়সারও কোন প্রয়োজন হত না, কোন সুখ সুবিধার দিকে নজর থাকত না, সাদা-সিধে জীবন, ফলে এনারা একটা জিনিষের উপরই পুরো চিন্তা শক্তি লাগিয়ে দিতেন বলে অনেক উচ্চ তত্ত্ব এদের সামনে চলে আসত, আর সেই উচ্চ তত্ত্বগুলিকে এনারা আমাদের জন্য পরম্পরাতে রেখে দিলেন।

নামকরা পদার্থ বিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যানের ব্যাপারে একটা মজার কাহিনী আছে, তিনি নোবেল প্রাইজও পেয়েছিলেন। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগেই ফিজিক্সের অধ্যাপক হিসাবে তাঁর খুব সুনাম হয়ে গিয়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে উনি অধ্যাপনা করতেন। অন্য এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে একটা অফার দিয়ে বলল আপনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিন তার জন্য আমরা আপনাকে বছরে এক হাজার ডলার বেশী দেব। উনি খুব খুশী হয়ে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়কে বলতেই তারা বলে দিল আপনাকে অন্য কোথাও যেতে হবে না, ওরা যত বেশী দেবে তার থেকে আরও এক হাজার ডলার আপনাকে বেশী আমরা দেব। উনি তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাতে তারা বলে দিল আমরা আপনার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরও এক হাজার ডলার বেশী দেব। এইভাবে রিচার্ড ফাইনম্যানকে নিয়ে দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রীতিমত টানাটানি শুরু হয়ে গেছে। আর ফাইনম্যানের বয়স তখন মাত্র সাতাশ আটাশ হবে। এই টানাটানিতে যখন কুড়ি হাজার ডলারে পৌঁছে গেছে তখন হঠাৎ ওনার মনে হল এত টাকা নিয়ে আমি করবটা কি! এত টাকা হলে কালকেই আমি একটা গার্ল ফ্রেন্ড রাখব, তাকে বাড়িতে রেখে দেব আর সারাটা দিন আমার মাথায় ঘুরবে মেয়েটি ভালো ভাবে আছে কিনা, অন্য কিছু করছে কিনা, তার এই জিনিষ ঐ জিনিষ দরকার কিনা। তারপর আমার ফিজিক্সের সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। আমি তো এখানে আছি ফিজিক্সের নতুন নতুন গবেষণা করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়কে বলে দিল আমাদের একটা পয়সাও বেশী দিতে হবে না, যেমনটি পাচ্ছি তেমনটিই আমাকে দেবেন। আর ওদেরকে বলে দিলেন আমি যাচ্ছি না। সেই দশ হাজার ডলারেই তিনি থেকে গেলেন। অর্থ বেশী হয়ে গেলেই মনের মধ্যে নানা রকমের ভোগের চিন্তা আসবে, সেই ভোগের চিন্তার ফলে সব পাণ্ডিত্য, সব উচ্চ চিন্তা গঙ্গার জলে বিসর্জন হয়ে যাবে। কথামতে এই নিয়ে ঠাকুর খুব সুন্দর একটা গল্প বলছেন – একজনের এক ভাগবত পণ্ডিতের দরকার হয়েছিল। অনেক খোঁজ খবর করার পড় একজন ভাগবত পণ্ডিত পাওয়া গেল কিন্তু সেই পণ্ডিতের আবার চারটে হেলে গরু আছে। যার ভাগবতের পণ্ডিতের দরকার হয়েছিল সে শুনে বলল ওরকম ভাগবত পণ্ডিত নিয়ে আমার কোন কাজ নেই। যেমনি পণ্ডিত লাঙল, হেলে গরু বা ট্রাক্টর রেখে দিল তার দ্বারা আর ভাগবত পাঠ হবে না। যে কোন সাধুর শেষ পরীক্ষা হচ্ছে এই কামিনী-কাঞ্চন। যে সাধু বা বাবাজীর ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা আছে আর রাত দিন ভক্তরা সেবা করে যাচ্ছে বুঝে নিতে হবে তার সাধু জীবন শেষ। খ্রীষ্টানদের মধ্যে ডেজার্ট ফাদারদের খুব নাম ছিল। ফাদাররা একবার রোমে আপ্যায়িত হয়ে গেছেন। সেখানে তাঁদের চার্চের ফাদাররা খুব সুন্দর টেবিলে রূপের থালা বাটিতে ভালো ভালো খাবার দিয়ে ডেজার্ট ফাদারদের আপ্যায়ন করেছেন। রোমের পোপ তাঁদের বলছেন ‘ফাদার! আমাদের আর সেই দুর্দিন নেই, এক সময় আমরা খেতে পেতাম না, এখন আমাদের খাওয়া-পড়ার কোন অভাব নেই’। ডেজার্ট ফাদাররা বলছেন ‘Gone are the days when you say to a laim get up and walk and he used to walk’ একটা খঞ্জ যার চলার কোন শক্তি নেই, কিন্তু যিশু তাকে একবার বলে দিলেন ‘হে খঞ্জ! তুমি উঠে দাঁড়াও আর চলতে থাক’। যিশুর এমন যোগশক্তি সেই খঞ্জ দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করে দিল। পোপ যখন বলছেন আমাদের খাওয়া-পড়ার সেই দুর্দিন চলে গেছে, তখন ডেজার্ট ফাদাররা বলছেন আপনার আধ্যাত্মিক শক্তির দিন গুলিও চলে গেছে।

জাগতিক ভোগ আর আধ্যাত্মিক যোগশক্তি দুটো পরস্পর বিরোধী। জাগতিক ভোগ যত সুখ সাচ্ছন্দ নিয়ে আসবে তত তার আধ্যাত্মিক যোগশক্তি কমতে থাকবে। যেসব মধ্যবিত্ত পরিবারে হঠাৎ প্রচুর টাকা-পয়সা হয়, দেখা যায় সেই ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় বেশী এগোতে পারেনা। ঠিক ঠিক বড়লোক বাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার কোন সমস্যা হয় না। মধ্যবিত্ত ঘরে যারা তাদের প্রজন্মে প্রথম যদি কেউ অফিসার হয়ে যায়, তার ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার প্রচণ্ড সমস্যা হয়ে যায়। কারণ এদের যে একটা মানসিক শক্তি ছিল আমাকে কষ্ট করে বড় হতে হবে, সেই মানসিক শক্তিটা ভোগের মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়। আর তার উপর যদি কেউ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, অসৎ ভাবে উপার্জিত অর্থ যদি তার হাতে চলে আসে, তাহলে তো নিশ্চিত এদের ছেলেমেয়েরা একেবারেই বখাটে আর বাউণ্ডুলে হয়ে যেতে বাধ্য, কেউ বাঁচাতে পারবে না। কারণ হল এদের সেই মানসিক শক্তিটা হারিয়ে যায় তার ফলে নানা রকমের দুর্বলতা এসে তাদের গ্রাস করে নেয়। আমাদের মুনি ঋষিরা তাগ তপস্যা আর জাগতিক সব রকম সুখ সাচ্ছন্দ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে দূরে রাখতেন বলে এই যোগশক্তিকে নিজেদের মধ্যে ধরে রাখতে সক্ষম হতেন। এই যোগশক্তি ছিল বলে তাঁদের বিদ্যাটা অনেক উপরে চলে গিয়েছিল। সেই বিদ্যা থেকেই এসেছিল এই অজাতবাদ।

সনৎকুমার এই অজাতবাদকেই অন্য ভাবে বিদুরের মাধ্যমে ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন। সনৎকুমার বলছেন অমৃত্যুঃ কর্মণা কেচিন্মৃত্যুর্নাস্তীতি চাপরে। শৃণু মে ব্রুবতো রাজন্! যথৈতন্মা বিশিক্ষিতাঃ।। উভে সত্যে ক্ষত্রিয়াদ্যপ্রবৃত্তে মোহো মৃত্যুঃ সমাতো যঃ কবীনাং। প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি সদাহপ্রমাদয়মমৃতত্বং ব্রবীমি।।৫/৪২/৩-৪। ‘হে ধৃতরাষ্ট্র! তুমি ঠিকই বলেছ, কেউ বলে মৃত্যু নেই আবার কেউ কেউ মনে করে ব্রহ্মচর্য ও তপস্যা দ্বারা মৃত্যুকে জয় করা যায়। এই জিনিষটা যে ভাবে আমাদের পরস্পরাতে চলে আসছে আমি তোমাকে সেই ভাবেই বলছি আর এতে তুমি কোন সংশয় রেখো না। প্রমাদই হল মৃত্যু। কিছু কিছু পণ্ডিতরা মোহ বশতঃ ও প্রমাদ বশতঃ অজ্ঞানে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর সত্তাকে গ্রহণ করেছেন’। প্রমাদ হল অজ্ঞান জড়িত কারণে মনের মধ্যে নানা রকমের আবর্জনা জমে তার ফলে যেটা যেমন সেটাকে তেমন দেখতে পায় না। মানুষের ঠিক ঠিক স্বভাব হল দিব্য স্বভাব। প্রত্যেকটি ধর্ম বলছে ভগবানই আছেন, ভগবান ছাড়া কিছু নেই কিন্তু এত কিছু তাহলে কোথেকে এল? হিন্দুরা বলে এটাই অজ্ঞান। আমরা জানিনা কেন কিভাবে এক সত্তার মধ্যে বহু সত্তা আসছে। কিন্তু কোথা থেকে যেন একটা অজ্ঞান এসে যায় আর তার ফলে আমি কে, আমার কি স্বরূপ এটা ভুল হয়ে যায়। এটাই অজ্ঞান, এইখান থেকে আস্তে আস্তে তার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে পতন হয়ে যায়। খ্রীষ্টানরা একেই বলে আদিম পাপ, আদম আর ইভ গোলমাল করেছিল আর সেইখান থেকে তাদের পতন হয়ে গেল, আর মুসলমানরা বলে গাফ্লা, একটা ভুল হয়ে গেছে। এই তিনটে কথা, অজ্ঞান, আদিম পাপ আর গাফ্লা একই। এখন প্রশ্ন এটা কি বাস্তবিক না কল্পনা? আমরা সাধারণ মানুষ বুঝি এটা বাস্তবিক। কিন্তু সনৎকুমার বলবেন না, এটা তোমার কল্পনাতে হচ্ছে। সেইজন্য এনারা বলেন যখন জ্ঞান হয় তখন মনে হয় যেন আমার ঘুম ভাঙলো। যোগশাস্ত্রেও ঠিক একই কথা বলছে। যোগশাস্ত্রে বলছে পুরুষ যিনি চৈতন্য, যিনি আমার ভেতরে আছেন, তাঁর সামনে প্রকৃতি খেলা করে যাচ্ছে। প্রকৃতি যেমন যেমন নাচ করতে থাকে, কখন লোভনীয়, কখন আকর্ষণীয় দৃশ্য, কখন ভয়ানক দৃশ্য, সবটোতেই পুরুষ মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি এই রকম খেলা দেখিয়েই যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতিরও তো একটা সীমা আছে, কত দিন সে দেখাতে থাকবে! একটা অবস্থা থেকে তার পুনরাবৃত্তি শুরু হয়ে যায়, কেননা প্রকৃতির খেলার ভাঙারও সীমিত। বন্ধুর বাড়িতে গেলে বন্ধু তার বাচ্চা মেয়েকে বলবে ‘মামনি, কাকুকে তোমার কবিতাটা শুনিয়ে দাওতো মা’। মেয়ে এখন কবিতা বলছে আতা গাছে তোতা পাখি। একমাস পর আবার গেছেন বন্ধুর বাড়ি, বন্ধু তার মেয়েকে বলছে কাকুকে একটা কবিতা শুনিয়ে দাও, মামনি আবার শোনাতে লাগল আতা গাছে তোতা পাখি, কারণ মামনি এখন ঐ একটা-দুটো কবিতাই শিখেছে। আরও বড় হলে হয়তো একশটা কবিতা শিখবে, একটা সময়ের পর সেই একশটা কবিতা থেকেই পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে। প্রকৃতির ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়, এই নাচ, সেই নাচ দেখিয়ে দেখিয়ে যখন সব নাচ দেখানো হয়ে গেল তারপর সে কি নাচ দেখাবে! তখন পুনরাবৃত্তি শুরু করে, পুরুষও তখন বলে এসব আমার সব দেখা আছে, আমার আর কিছু দেখতে হবে না। পুরুষ তখন কৈবল্যপদ লাভ করে, মানে মুক্ত হয়ে যায়। কৈবল্য হয়ে যাওয়ার পর পুরুষ ভাবে আরে আমি এতক্ষণ কি করছিলাম! একটা বোকা নাচ এতক্ষণ দেখছিলাম! সনৎকুমার এইটাই বলছেন, অনেক পণ্ডিতরা মোহবশাৎ মৃত্যুর সত্তাকে গ্রহণ করেছেন।

সনৎকুমার বলছেন অভিধ্যা বৈ প্রথমং হস্তি চৈনং কামক্ৰোধৌ গৃহ্য চৈনঞ্চ পশ্চাৎ। এতান্ বালান্ মৃত্যবে প্রাপয়ন্তি ধীরাস্তু ধৈর্য্যেণ তরন্তি মৃত্যুম্।।৫/৪২/১১। মানুষতো প্রথমে বিষয় চিন্তা করেই আধমরা হয়ে যায়।

এরপর কাম-ক্রোধ এসে তাকে আঘাত করতে থাকে। মানুষের যত অশান্তি এই বিষয় চিন্তা থেকেই। এই বিষয় চিন্তা থেকেই জন্ম নেয় কাম ক্রোধ, যদি বিষয় গুলি পেয়ে যাই তাহলেও কষ্ট হয় আর যদি না পাই তাতেও কষ্ট। এই তিনটে একত্রিত হয়ে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। সনৎকুমার বলছেন *সোহভিধ্যায়মুৎপতিতান্ নিহন্যদনাদরেণা প্রতিবুধ্যমানঃ। নৈনং মৃত্যুমৃত্যুরিবাতি ভুত্ব এবং বিদ্বান্ যো বিনিহন্তি কামান্।।৫/৪২/১২।* ‘এই তিনটে জিনিষ বিষয় চিন্তা, কাম আর ক্রোধ একত্রিত হয়ে বিবেকহীন পুরুষকে মৃত্যুর দিকে ত্বরান্বিত করে এগিয়ে দেয়। যে মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে চাইছে তাকে সেই পরমপিতা, পরমাত্মা, যিনি ঈশ্বর যাকে সে চেতন্য সত্তা বলে জেনেছে তাঁর ধ্যান করতে হবে। সেই পরমাত্মার ধ্যান করার সময় যত বিষয় বাসনা আছে সেগুলিকে তুচ্ছ ভেবে, এগুলোর কোন দাম নেই মনে করে একেবারে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। এই ভাবে যে মানুষ বিষয় বাসনাকে পুরো ফেলে দেয় আর নিজের ধ্যান চিন্তনকে পুরোপুরি সেই পরমাত্মা ঈশ্বরের উপর লাগিয়ে দেয় সেই মানুষই মৃত্যুকে জয় করতে পারে’। আমাদের পরম্পরাতে বিশ্বাস যে হনুমান এখনও বেঁচে আছেন। হনুমান কি করে বেঁচে আছেন? কারণ হনুমানের কোন বিষয় চিন্তা নেই, ঈশ্বর ছাড়া তাঁর আর কোন ধ্যানই নেই। হিন্দুদের পরম্পরাতে এটাকে মেনে নেওয়া হয়েছে যে অনেক মুনি ঋষিরা আছেন যাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছেন, এখনও তপস্যা করেই যাচ্ছেন। এগুলো শুনে হিন্দুরা কেউ অবাক হয় না। কারণ এখানেও সেই একই কারণ, এনাদের কোন বিষয় চিন্তাই নেই, বিষয় চিন্তা যখন নেই আর কাম ক্রোধের যখন কোন চিহ্নই নেই তখন এঁদের মারবে কে!

সনৎকুমার বলছেন ‘হে ধৃতরাষ্ট্র! তোমার ভেতরে যিনি অন্তরাত্মা আছেন, যখন কোন মোহের কারণ হয়, যখন আসক্তি হয় তখন সেই অন্তরাত্মা লোভ, ক্রোধের পাল্লায় পড়ে গিয়ে মৃত্যুধর্মা হয়ে যায়, এটাই তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। যখন তাঁর এই শরীর জীর্ণ হয়ে যায়, যখন দেখে এই শরীর দিয়ে কোন আসক্তিকে পূরণ করা যাবে না তখন অন্তরাত্মা এই শরীরটাকে ফেলে দিয়ে আরেকটা শরীর গ্রহণ করে অপূর্ণ কামনা বাসনাগুলো মেটাতে থাকেন’। যার প্রচুর টাকা আছে সে একটা ভালো মডেলের গাড়ি কিনবে। যখন শুনলো এই মডেলের থেকে আরও ভালো মডেলের গাড়ি এসেছে তখন সে আরও টাকা দিয়ে সেই মডেলের গাড়ি কিনতে যাবে। কিছু দিন আগে কাগজে বেরিয়েছে ভারতে রোলস্ রয়েসের নতুন গাড়ি বাজারে না আসতেই সব গাড়ি বিক্রী হয়ে গেছে, একেকটা গাড়ির দাম দু কোটি থেকে শুরু হয়ে চার কোটি টাকা পর্যন্ত। এরপর যদি দশ কোটি টাকা দামের গাড়ি আসে তখনও এই একই জিনিষ হবে। আমার ভেতরে যিনি আছেন সেই অন্তরাত্মা এই ভোগায়তন শরীরকে নিয়েই চলেন, যখন দেখেন এই শরীর চলছে না তখন তিনি এই শরীরটাকে ফেলে দেন। তাঁর আরও সুখভোগ দরকার, এই শরীরটাকে দিয়ে আর সুখভোগ হচ্ছে না, তখন এই শরীরটাকে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যান। কিভাবে অন্তরাত্মা এই শরীরকে ফেলে দেন? নানা রকমের অসুখের আশ্রয় নেয়, দুর্ঘটনার আশ্রয় নেয়, এই ধরনের অনেক কিছুর আশ্রয় নিয়ে তিনি এই শরীরটাকে ফেলে দিয়ে আরেকটা শরীর নিয়ে সুখভোগ করতে থাকে। আমরা ভাবছি লোকটি মরে গেল। আমাদের হিন্দুদের এটাই দৃঢ় মত যে অন্তরাত্মা যতক্ষণ না চাইছেন ততক্ষণ মৃত্যু কোন ভাবেই আসতে পারবে না। কিন্তু আমরা চলি আমাদের মন, বুদ্ধি দিয়ে, এই মন বুদ্ধি তো কোন দিন বুঝতে পারবে না অন্তরাত্মা কিভাবে চলছেন, অন্তরাত্মা দেখে নিল এই শরীর দিয়ে চলছে না, সে তখন শরীরটাকে ফেলে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু অনেক অন্তরাত্মার আবার ঐ শরীরটার প্রতিই আসক্ত, সেইজন্য দেখা যায় বুড়ো হয়ে গেছে, জীর্ণ হয়ে গেছে তবুও শরীরটাকে ধরে রেখেছে। কিন্তু মৃত্যু তারও হবে, একটা অবস্থার পর সেও থাকবে না।

যখন প্রারন্ধ আসে, প্রারন্ধ হল এর আগের আগের জন্ম যা যা কর্ম করা হয়েছিল সেই কর্মের ফল যেগুলি এখন ফলপ্রসূ হয়নি, আর আগের আগের জন্মের যত কামনা-বাসনা ক্রোধ জমে আছে সব মিলিয়ে প্রারন্ধ। এই প্রারন্ধ যখন আসে তখন অন্তরাত্মা একেকটা করে যখন কর্মের উদয় হয় তখন সে সেই সেই রকম ভোগ খুঁজতে শুরু করে। গৃহীদের থেকে সন্ন্যাসীদের জীবনে এটা বেশী ভালো বোঝা যায়, সন্ন্যাসীকে এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলতে হয় যে তাঁদের মনে কামনা বাসনা থাকলেও তাঁরা কিছু করতে পারবেন না, এই কারণে তাঁদের কামনা-বাসনাগুলো অনেক দমে যায়। এর ফলে সন্ন্যাসীদের প্রারন্ধটা খুব তাড়াতাড়ি কাটতে শুরু হয়। সাধারণ ক্ষেত্রে যেখানে পাঁচ কি ছয় জন্ম লাগতো কাটতে সেটা সন্ন্যাসীদের এক জন্মের উপর দিয়েই বেরিয়ে যায়। বেলুড় মঠে এই নিয়ে একটা কাহিনীও আছে। একবার স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ একজন সন্ন্যাসীকে ইঙ্গিত করে তিনটে আঙুল দেখাচ্ছেন, সেই মহারাজ আবার একটা আঙুল রাজা মহারাজকে দেখাচ্ছেন। রাজা মহারাজ যতবার তিনটে আঙুল দেখাচ্ছেন, ঐ মহারাজও ততই একটা আঙুল দেখাচ্ছেন। তিন চারবার বলার পর রাজা মহারাজ বললেন ‘আচ্ছা একই থাকল’। ওখানে কেউ ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে। পরে সেই

মহারাজকে জিজ্ঞেস করা হল কি ব্যাপার। তখন তিনি বলছেন ‘রাজা মহারাজ আমাকে বলছিলেন যে আমার আরও তিন জন্ম আসতে হবে, তখন আমি বলছিলাম না এটাই আমার শেষ জন্ম, রাজা মহারাজ কিছুতেই মানতে চাইছেন না, তারপর তিনি বলে দিলেন ঠিক আছে এই এক জন্মই’। তারপরে সবাই দেখতে পেলেন ঐ মহারাজের উপর কত রকমের ঝামেলা আরম্ভ হয়ে গেল। আজকে এই অসুখ তো কাল থেকে আরেক অসুখ ধরে নিচ্ছে, এই অসুখ ভালো হচ্ছে তো অন্য কোন একটা বিরাট ঝামেলা এসে গেল। এত ঝামেলা আর অসুখ হতে থাকল যে ভাবাই যায় না, ঐ তিন জন্মের প্রারম্ভ এই এক জন্মের উপর দিয়ে বার করে দিলেন। এটাই সনৎকুমার বলছেন, ভেতরে থেকে যেমন যেমন প্রারম্ভ ক্ষয় হতে শুরু করবে তেমন তেমন তাকে দিয়ে সব কাজ করাতে শুরু করবে। এই শরীরটা হল অত্যন্ত জঘন্য আর নিম্নমানের একটা যন্ত্র। সব থেকে নিকৃষ্ট হল গয়না-গাঁটি, গয়না-গাঁটির থেকে কম নিকৃষ্ট হল পোষাক, জামা কাপড়ের পরেই এই শরীরের স্থান। এই শরীরের পরে আসে মন। আমরা যেমন ঝাঁটা দিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করি অন্তরাত্মা ঠিক সেইভাবে এই শরীর দিয়ে মন দিয়ে আমাদের যত প্রারম্ভগুলোকে পরিষ্কার করতে থাকেন। যখন দেখে ঝাঁটাটা পুরনো হয়ে গেল তখন আরেকটা নতুন ঝাঁটা দিয়ে প্রারম্ভগুলোকে ঝাঁটিয়ে বিদেয় করতে থাকে। অন্তরাত্মার এই শরীরের প্রতি কোন আগ্রহ নেই, যেমন যেমন প্রারম্ভ আসতে থাকেবে সেগুলোকে ফেলে দিতে থাকবে। কিভাবে? এই শরীরের বিভিন্ন ভোগের মাধ্যমে। আগে যখন কলেরা বা প্লেগের মহামারি হত তখন এত লোক মরত কিন্তু সবাইতো মারা যেত না। যাদের প্রারম্ভ টেনে নিচ্ছে তাদের মেরে ফেলে দিচ্ছে। এগুলো আমরা মানতে চাইনা, যারা মানে তারা আবার বুঝতে পারেনা, কিন্তু প্রারম্ভ এইভাবেই কাজ করে।

সনৎকুমার বলছেন ‘এই প্রারম্ভের কারণে সে নতুন নতুন শরীর ধারণ করে নতুন নতুন যোনিতে নতুন নতুন লোকে জন্ম নিতে থাকে, আর এটা এইভাবেই চলতে থাকে। ধৃতরাষ্ট্র তুমি মনে রেখো ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, যা কিছু তুমি দেখছ সবই ঈশ্বরেরই প্রকাশ’। খ্রীশ্চান ধর্মে বলছে ভগবান ইচ্ছে করলেন এই সৃষ্টি হোক, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়ে গেল। যেটা সৃষ্টি হল সেটাওতো ভগবানেরই, ভগবানের বাইরে তো সেটা হতে পারেনা। ঈশ্বরের ইচ্ছাতে যেটা হবে সেটাতো তাঁর বাইরে তো হতে পারলো না। এগুলো খুব গভীর তত্ত্ব, অনেকেই বুঝতে চাননা। সৃষ্টির আগে কিছুই ছিল না ভগবানই একমাত্র ছিলেন, তাহলে ভগবান যখন বললেন সৃষ্টি হোক, তিনি ইচ্ছা করলেন আর ইচ্ছা মাত্রই সৃষ্টি হয়ে গেল তাহলে সেই সৃষ্টি কি ভগবানের থেকে আলাদা হবে নাকি! আমাদের মুনি, ঋষিরা, আমাদের যত শাস্ত্র আছে সবাই বলছেন ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই।

ধৃতরাষ্ট্রও আমাদের মতই একজন অতি সাধারণ মানুষ। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞেস করছেন ‘যদি পরমাত্মাই সব কিছু হয়ে থাকেন, সব কিছুকে শাসন করার জন্য একজন থাকেন কিন্তু সেই পরমাত্মাকে কে শাসন করছেন?’ ধৃতরাষ্ট্রের বক্তব্য হল, যিনি ভগবান তিনিই যদি সব কিছু হয়ে থাকেন তাহলে শাসন করার জন্য একজনই আছেন। যেখানে একের অধিক সেখানে একজন শাসনকর্তা থাকবেন। আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাইকে চালাচ্ছেন ভাইস চ্যান্সেলার মহারাজ, ভাইস চ্যান্সেলার সহ সব মহারাজকে চালাচ্ছেন মঠের সেক্রেটারি, সেক্রেটারিকে চালাচ্ছেন আমাদের মঠের প্রেসিডেন্ট। এই ভারতের এত লোক এদের সবাইকে প্রধানমন্ত্রী চালাচ্ছেন, আর এত দেশের যত প্রধানমন্ত্রী আছেন সবাইকে ভগবান চালাচ্ছেন। এই যে ভগবান সবাইকে চালাচ্ছেন এই ভগবানকে কে চালাচ্ছেন? তখন সনৎকুমার ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন *দোষো মহানত্র বিভেদযোগে হ্যনাদিযোগেন ভবন্তি নিত্যঃ। তথাহস্য নাধিক্যমপৈতি কিঞ্চিদনাদিযোগেন ভবন্তি পুংসঃ।।৫/৪২/২০।* ‘তুমি যে এই প্রশ্ন করলে এতে জীব আর ব্রহ্মের বিশেষ ভেদ এসে যাচ্ছে *দোষো মহানত্র বিভেদ*, এতে মহান দোষ এসে যায়, বেদবিরোধী রূপ গুরুতর দোষ হয়’। এই জায়গাটাতে দর্শনের একটা খুব গূঢ় তত্ত্বকে আমাদের বুঝতে হবে। যে ধর্ম বা সম্প্রদায় দ্বৈতবাদ দর্শনের দ্বারা পরিপুষ্ট এবং যারা দুটো সত্তাকে মেনে নেয় তাদের অনেক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। দ্বৈতবাদীদের বিরুদ্ধে খুব নামকরা একটা আপত্তি হল – ভগবান আলাদা আর তাঁর সৃষ্টিকে যদি আলাদা বলে মনে করা হয়, তাহলে তিনি যে পদার্থ দিয়ে সৃষ্টি করবেন সেই পদার্থ আর ভগবান কি আলাদা? কুমোররা যেমন মাটি দিয়ে হাড়ি কলসি বানায়, সেখানে কুমোর আলাদা আর মাটি আলাদা বলে দুটো সত্তা এসে যাচ্ছে। কুমোর আর তার হাড়ি কলসি কখনই এক নয়। তাহলে ভগবানের কাছে যে পদার্থ ছিল যেখান থেকে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে সেই পদার্থ কি ভগবানের নিয়ন্ত্রণে ছিল আর সে পদার্থের সত্তা কি ভগবানের বাইরের সত্তা কিনা? যদি ভগবানের বাইরের সত্তা হয় তাহলে ভগবানের সত্তা সীমিত হয়ে গেল। তাহলে যে ভগবানের সীমিত সত্তা সেই ভগবান কিসের ভগবান! আর সেই পদার্থ যদি ভগবানের সাথে এক থাকে তাহলে দুই এলো কোথেকে? যে কোন দ্বৈতবাদে, খ্রীশ্চান বলুন,

ইসলাম বলুন আমাদের মাধ্বাচার্যী বলুন, বৈষ্ণব ধর্ম বলুন সব দ্বৈতবাদে এই ধরণের নানান রকমের সমস্যা আসে। অদ্বৈতেও নানান রকমের সমস্যা আসে, কিন্তু অদ্বৈতের একটা জায়গাকে বুঝে নিলে সেই সমস্যা থাকে না, সেটা হল জীবব্রহ্মক্য। জীব আর ব্রহ্মের ঐক্যকে আর মায়ায় যদি মেনে নিই তাহলে অন্য কোন সমস্যা থাকবে না। কিন্তু দ্বৈতবাদে প্রচুর সমস্যা আসে। দ্বৈতবাদীকে যদি প্রশ্ন করা হয় ভগবান কি সর্বশক্তিমান? দ্বৈতবাদী বলবে –‘হ্যাঁ, ভগবান সর্বশক্তিমান’। তখন অনেক দার্শনিকরা হেঁয়ালি করে প্রশ্ন করেন ‘আচ্ছা ভগবান এমন কোন পাথর কি সৃষ্টি করতে পারবেন যেটা তিনি তুলতে পারবেন না’? যদি বলে তিনি সৃষ্টি করতে পারবেন, তার মানে তিনি তুলতে পারবেন না, আর যদি তুলতে না পারেন তাহলে তিনি সর্বশক্তিমান নন। আর এমন পাথর যদি তিনি সৃষ্টি নাই করতে পারলেন তাহলে তিনি কিসের সর্বশক্তিমান হলেন।

দ্বৈতবাদীদের যতই সমালোচনা করা হোক না কেন, আমাদের ব্যবহারিক জীবন দ্বৈত সত্তা ছাড়া চলতে পারেনা। সেইজন্য শঙ্করাচার্যও দুটো সত্তাকেই মেনেছিলেন – পারমার্থিক সত্তা আর ব্যবহারিক সত্তা। পরমার্থতঃ ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে দুটো সত্তাকে নিয়েই সব কর্ম চলে। দ্বৈতে আবার পরমার্থ সত্তা বলে কিছু নেই। কিন্তু আমরা এই বহু দেখাটা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি, মেনে নিলে আমাদের জীবন যাত্রাটা সুগম হয়, এই সুগম হওয়াটাই আমাকে অদ্বৈত তত্ত্বে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। সেইজন্য অদ্বৈতবাদীরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে বলেন। আমি চোখের সামনে দেখছি আমি আলাদা তুমি আলাদা এই আলাদাটাকে কি করে এক দেখবো, বহু দেখা কি করে বন্ধ হবে? তখন বলেন এই দ্বৈত দিয়েই দ্বৈতকে পার করতে হবে, ভগবানের সত্তাকে মেনে নিয়ে পার করতে হবে। পার করে কোথায় যাবো? যেখানে দুটো কাঁটাকেই ফেলে দেওয়া যায়, তার মানে অদ্বৈতে। সনৎকুমার এইটাই বলছেন জীব আর ব্রহ্ম এক। আমাদের সমস্যা আমরা মনে করি আমাদের ভেতরে অন্তর্যামী আছেন আর উপরে আলাদা ভগবান একজন বসে আছেন, তিনি একটা সুপার কম্পিউটার নিয়ে সব কিছু চালাচ্ছেন। আমাদের কাছে জীবাত্মা আলাদা আর উপরে পরমাত্মা আলাদা। আর এই ধারণাটাকেই আঁকড়ে রেখে বলি ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে। মুসলমানরা বলছেন আল্লাহ মজি। আমাদের সাধারণ জীবন এই ভাবেই চলেছে। কিন্তু পরমার্থতঃ যিনি জীব তিনিই ব্রহ্ম তিনিই ঈশ্বর। ঠাকুর বলছেন – অধম ভক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে ঈশ্বর ঐ হোথা, মানে ঈশ্বর আকাশে। সেও ভক্ত কিন্তু অধম। তারা বলে গরম কেন পড়েছে? ঠাকুরের ইচ্ছায়। আমার ঘুম কেন পাচ্ছে? ঠাকুরের এটাই ইচ্ছা যে আমার এখন ঘুম পাবে। মধ্যম ভক্ত বলে ঈশ্বর হৃদয়ে বিরাজমান। আর উত্তম ভক্ত বলে তিনিই সব কিছু হয়েছেন। যখনই বলছে যা কিছু আছে সব তিনিই হয়েছেন তখন সেটাই অদ্বৈত। এই তিনজনই ঈশ্বরের ভক্ত। যখনই আমি বলব জীব আর ব্রহ্ম আলাদা তখন আমি অধম ভক্ত হয়ে গেলাম। আমাদের সাধারণ জীবন এই অধম ভক্তদের মতই চলে। সনৎকুমার ধৃতরাষ্ট্রকে তাই বলছেন তুমি যেটা বলছ এটা ভুল কিছু বলছ না, কিন্তু এটা নিম্ন সত্য।

গীতা বাদে মহাভারতে ব্রহ্ম ও মায়ার ব্যাপারে খুব কমই বলা হয়েছে, সেইজন্য অনেকে মনে করেন সনৎসুজাতীয় সংবাদ পরের দিকে লেখা হয়েছিল। এরপর সনৎকুমার বলছেন ভগবান হলেন নিত্যস্বরূপ, তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। সেই পরব্রহ্ম তাঁর মায়ার সাহায্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। এই মায়াই তাঁর শক্তি। মায়া, শক্তি আর প্রকৃতি একই, কিন্তু তিনটে দর্শন এই তিনটে পরিভাষা দিয়ে এই তিনটেকে পরিভাষিত করেছে। সাংখ্য দর্শন বলছে প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকেই বেদান্ত বলছে মায়া। এই মায়াকেই তন্ত্রে বলছে শক্তি। যিনি প্রকৃতি, তিনিই মায়া আবার তিনিই শক্তি। বিভিন্ন ভাবে একই জিনিসকে উপস্থাপিত করা হয়। এই তিনটে খ্রীস্টান ধর্মে গিয়ে হয়ে যায় ভগবানের ইচ্ছা শক্তি। শক্তি দুই রকমের হয় ইচ্ছা শক্তি আর ক্রিয়া শক্তি। ইচ্ছা শক্তি হল, ব্রহ্মা মনে মনে সঙ্কল্প করলেন আমার চারটি সন্তান হোক, এটাই ইচ্ছা শক্তি। আবার কাজের মাধ্যমে যখন কিছু হচ্ছে তখন তাকে ক্রিয়া শক্তি বলছে। ভগবানের এই মায়া ইচ্ছা শক্তি কিনা বা ক্রিয়া শক্তি কিনা এই নিয়ে বেদান্ত খুব বেশী আলোচনা করবে না, শুধু বলে দেয় শক্তি। ঠাকুর বেদান্তের এই তত্ত্বকে খুব সহজ করে বলছেন, অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি। অগ্নি বললে তার দাহিকা শক্তিকে বোঝায়, দাহিকা শক্তি বলতে অগ্নিকে বোঝায়। ঠিক তেমনি ভগবান আর তাঁর সৃষ্টির শক্তি দুটো এক। যখন আগুনের দরকার তখন আমরা বলি না একটু দাহিকা শক্তি নিয়ে এস, আমরা বলি একটু আগুন নিয়ে এস। আগুন মানেই দাহিকা শক্তি, আগুনের সঙ্গে দাহিকা শক্তি জড়িয়ে আছে। সেইজন্য যারা শান্ত বা তন্ত্র মতে চলে তারা ব্রহ্ম শব্দ বেশী ব্যবহার করে না, তার বদলে তারা শক্তি বলে। সনৎকুমার বলছেন এটা বেদ প্রমাণ যে ভগবান ছাড়া কিছু নেই, আর এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এটা হল তাঁর মায়ার খেলা।

বিভিন্ন ধর্মের ব্যাপারে প্রশ্নের পর ধৃতরাষ্ট্র খুব আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করছেন মৌন কাকে বলে। ধৃতরাষ্ট্র বলছেন ‘আমি শুনেছি মৌন দ্বারা পরমাত্মাকে পাওয়া যায়’। স্বামীজীও এক জায়গায় বলছেন ‘Silence is the name of God’ মৌন ভগবানেরই একটি নাম। সনৎকুমার তখন বলছেন *যতো না বেদা মনসা সহৈ নমনুপ্রবিশন্তি ততোহথ মৌনম্। যত্রোথিতো বেদশব্দস্তথাহয়ং স তন্ময়ত্বেন বিভাতি রাজন্।* ১৫/৪৩/২। স্বামী শিবানন্দ মহারাজের সময় এক মহারাজের কোন কারণে ইচ্ছে হল এক বছর হিমালয়ে গিয়ে তপস্যায় কাটাবেন। তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে গিয়ে বলেছেন ‘মহারাজ, আমি এক বছর হিমালয়ে গিয়ে তপস্যায় কাটাব’। মহাপুরুষ মহারাজ শুনে বললেন ‘খুব ভালো’। মহাপুরুষ মহারাজের কথা শুনে মহারাজ যেন খুব একটা উৎসাহিত হতে পারলেন না, ভেবেছিলেন উনি আরও কিছু প্রশংসা সূচক কথা বলবেন। তখন উনি বলছেন ‘মহারাজ! আমি কিন্তু এই এক বছর মৌন হয়ে থাকব’। শুনে মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন ‘ভেতরটাও’। মানে, তুমি মুখটাই শুধু বন্ধ রেখে মৌন থাকবে তা নয়, ভেতরটাও বন্ধ রাখবে। যার ভেতরটা বন্ধ হয়ে গেছে সেতো ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গেল। লীলাপ্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ যেখানে ঠাকুরের বিভিন্ন সাধনার কথা বর্ণনা করেছেন সেখানে এই ব্যাপারটা খুব সুন্দর দেখান হয়েছে। সাধনার শেষ অবস্থায় ঠাকুরের জীবনে তোতাপুরীর আবির্ভাব হয়েছে। তিনি ঠাকুরকে বেদান্ত মতে অদ্বৈত জ্ঞানের শিক্ষা দিতে এসেছেন। ঠাকুরকে তিনি নিষ্ঠুর নিরাকারের ধ্যান করতে বলছেন। ঠাকুর ধ্যান করতে বসেছেন। কিন্তু ধ্যান করতে গিয়ে বারবার যখন মা কালীর মূর্তি ধ্যানের মধ্যে চলে আসছিল তখন তিনি জ্ঞান খড়া দিয়ে সেই মূর্তিকে খণ্ডিত করে দিলেন। তারপরে ঠাকুরের কি হল তার বর্ণনা কিন্তু নেই। কেন বর্ণনা নেই? যদি আমাদের বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিল্ডিংটাকে হাত দিয়ে মাপতে। তারপর আমাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় বিল্ডিংটা কত বড়, তখন আমি কি করে বোঝাব বিল্ডিংটা কত বড়। আমাদের শুধু দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে বলতে হবে ‘এই এত বড়’। বোঝাবে যদি মিষ্টি খাইয়ে জিজ্ঞেস করা হয় কেমন লাগল, সে ‘অঁ অঁ’ ছাড়া কিছুই বলতে পারবে না। এখানে ঠিক সেই অবস্থার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থায় যখন কেউ পৌঁছে যান তখন তাঁর মনতো ওখানে পৌঁছাতেই পারছে না, তখন বাণী আর তাঁকে কি করে প্রকাশ করবে। তাই বাণী চুপ মেরে যায়। উপনিষদে এই অবস্থার কথা গল্পচ্ছলে বলা হচ্ছে – এক ব্রাহ্মণের দুই ছেলে গেছে গুরুর কাছে শাস্ত্র চর্চা করতে। গুরুগৃহ থেকে যখন দুই ভাই ফিরে এসেছে তখন বাবা বড় ছেলেকে বলছেন ‘তুমি তো অনেক কিছু শিখে এলে তা আত্মার ব্যাপারে কিছু বল’। বড় ছেলে তখন শাস্ত্রের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে আত্মা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলতে শুরু করেছে। ছোট ছেলেকেও বাবা যখন আত্মার ব্যাপারে কিছু বলতে বলল, ছোট ছেলেটি তখন চুপ হয়ে গেছে। বাবা তখন তাকে বলছে ‘তুমিই বাপু আত্মাকে ঠিক ঠিক বুঝেছ’। আত্মাকে বুঝতে গিয়ে মন তাঁকে ধারণা করতে পারেনা, মন ধারণা করতে পারেনা বলে বাণীরও কোন প্রকাশ থাকে না। মন ও বাণী যখন ধারণাই করতে পারল না তখন সে চুপ মেরে যায়। এইটাই ঠিক ঠিক মৌন। আর কথা বলা বন্ধ করে মুখটাকে গায়ের জোরে বন্ধ করে রাখাটা কখনই মৌন নয়। সেই বিরাতের যখন উপলব্ধি হয় তখন সাধক চুপ মেরে যায়, এটাই মৌন।

ঐ জায়গাতে গিয়ে কি হয় বলতে গিয়ে সনৎকুমার বলছেন *যত্রোথিতো বেদশব্দস্তথাহয়ং*, যেখান থেকে বেদের শব্দ জন্ম নেয়। আমরা জানি শব্দের জন্ম তিন ভাবে হয়। এক রকম হল শব্দ থেকে শব্দের জন্ম হয়। কথা কাটাকাটি চলছে, আমি একটা কথা বললাম আপনিও একটি কথা বললেন। দ্বিতীয় মৌন থেকে শব্দের জন্ম হচ্ছে। যাঁরা বড় বড় সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী বৈজ্ঞানিক এনারা সব সময় মৌন থাকেন। খালিজ ইব্রাহিম একজন খুব নামকরা লেখক, ‘প্রফেট’ নামে একটা খুব বিখ্যাত বই তাঁর রচনা। উনি একটা কথা বলতেন যে, মৌন ছাড়া কোন সাহিত্য রচনা করা যায় না। উনি খুব দুঃখ করে বলছেন ‘আমার অনেক বন্ধুরা আছেন, তাঁরা মৌন অভ্যাস করেন না, তা সত্ত্বেও তাঁরা লিখে যাচ্ছেন, আর আমি অবাক হয়ে ভাবি তাঁরা লেখেন কি করে’! মৌন ছাড়া কখন কোন সৃজনশীল কাজ হয় না। মৌন থেকে যে সাহিত্য রচনা হয় সেই সাহিত্যের শব্দের অনেক দাম হয়ে যায়। তৃতীয় ভাবে শব্দের উৎপত্তি হয় যখন কেউ ধ্যানের গভীরে চলে যান। ধ্যানের গভীরে কিছু কিছু আধ্যাত্মিক সত্য উদ্ভাসিত হতে শুরু করে। ধ্যানের আরও গভীরতমো অবস্থা হল যেখানে বেদ সৃষ্টি হয়। ধ্যানের গভীরে যেখানে গিয়ে দ্বৈতবোধ শেষ হয়ে অখণ্ডে লীন হয়ে যাচ্ছে, তার মানে তখন একদিকে দ্বৈত আর তার ওপারে অখণ্ড। এই অখণ্ড আর খণ্ডের মাঝখানে যে সীমারেখাটা আছে, এটা আসলে হল শব্দের সীমা। কোরান, বাইবেল যেটা বেরিয়েছে সেটা এই সীমা থেকেই বেরিয়েছে। আর বেদের জন্মও এখান থেকেই, তাই এই শব্দগুলো খুব পবিত্র। যার জন্য যদি খুব খতিয়ে পড়া হয় তখন দেখা যায় বেদ, বাইবেল, কোরান এরা আলাদা কিছু বলছে না। আধ্যাত্মিক সত্যের ব্যাপারে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে সেগুলো সবাই একই কথা বলছে, ভগবান বুকের কথাও এই একই কথা। খণ্ড আর অখণ্ডকে যে রেখাটা আলাদা করছে ঐ রেখাটাই বেদের রেখা। এইখান থেকেই ওঁ এর উৎপত্তি। সেইজন্য

প্রথম শব্দ ওঁ। বাকি যা কিছু শব্দ সব ওঁ এর পরেই আসে। ‘অ’ ‘উ’ ‘ম’ এই তিনটে শব্দ দিয়ে ওঁ। ‘অ’ ধ্বনি আমাদের মুখের সব থেকে অগ্র ভাগ থেকে তৈরী হয়। তাই প্রত্যেক ভাষার প্রথম অক্ষর ‘অ’। সংস্কৃত ভাষা খুব বিজ্ঞান সম্মত ভাষা, সংস্কৃতে ধ্বনি ‘অ’ দিয়ে শুরু হয়ে ‘ম’ তে গিয়ে শেষ হয়, গলা থেকে শুরু হয়ে ঠোঁটে এসে শেষ হচ্ছে। ‘অ’ আর ‘ম’ এর মাঝখানে বাকি সব ধ্বনি। মাঝখানটাকে দেখানোর জন্য ‘উ’ বলা হয়। ‘অ’ ‘উ’ আর ‘ম’ বললে সব ধ্বনিকে বোঝাচ্ছে। যেমন CO<sup>2</sup> বললে কার্বনডাই অক্সাইডের যত প্রপারটিস আছে সব জানা হয়ে যায়। ঠিক তেমনি ‘ওঁ’ এর মধ্যে বিশ্বের যে কোন শব্দ, যে কোন ভাষা বাঁধা হয়ে আছে। ওঁ এর বাইরে কোন শব্দ যেতেই পারবে না, কারণ ‘অ’ দিয়ে শুরু আর ‘ম’ দিয়ে শেষ আর মাঝখানে ‘উ’তে বাকি সব ধ্বনি ঘুরপাক খাচ্ছে। ফলে ওঁ এর বাইরে কোন ধ্বনি যেতে পারেনা। তাই ওঁ কে অক্ষর রূপে দেখা হয় না, ওঁ হল ধ্বনি। বলছেন যে, এই ওঁ এর পরে বেদের আগমন শুরু হয়। বেদ হল আধ্যাত্মিক সত্যের তত্ত্ব। যেমন গায়ত্রী মন্ত্র, একটা আধ্যাত্মিক সত্য এই গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্য দিয়ে রূপ পাচ্ছে, এটাই বেদ। ওঁ এর ওপারে অখণ্ডের রাজ্য, অখণ্ডের রাজ্যে শব্দ বলে কিছু নেই। স্বামীজীও এক জায়গায় বর্ণনা করছেন যে, ধ্যানের গভীরে গিয়ে মন যখন অখণ্ডে লীন হতে যাচ্ছে তখন শেষ মুহূর্তে একটা ঘন্টা ধ্বনির মত ঢং শব্দ হয়, ওঁ আর ঘন্টার ঢং দুটো একই রকমের ধ্বনি। ঠিক তেমনি, অখণ্ড থেকে মন যখন বাহ্য জগতে নামতে থাকে তখনও প্রথম যে ধ্বনি শুনতে পান সেটাও হল ঐ ঘন্টার ঢং ধ্বনি। এই জায়গাটাই বেদের উৎপত্তির স্থান। যে কোন ধর্মের ধর্মগ্রন্থের ঐটাই উৎপত্তির স্থান, তার কারণ ওর ওপারে অখণ্ডের ঘরে কোন ধ্বনি যাবে না।

ধৃতরাষ্ট্র এরপর প্রশ্ন করছেন – যিনি বেদ জানেন, তপস্যাদি করেন, তিনি যদি পাপ কর্ম করেন তখন বেদ কি তাঁকে রক্ষা করেন? সনৎসুজাত বলছেন *ন হিন্দাংসি ব্রজিনাভারয়ন্তি মায়াবিনং মায়ায়া বর্তমানম্। নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাং হিন্দাংসেনং প্রজহত্যন্তকালে।* ১৫/৪৩/৫। ‘পাপীকে কোন বেদ রক্ষা করতে পারেনা। তুমি যদি সব বেদ জেনে থাক, সব বেদ যদি তোমার মুখস্থ থাকে তারপর তুমি যদি পাপ কর তখন বেদ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। যেমন পাখীর ডানা গজিয়ে গেলে সে তার বাসা ছেড়ে উড়ে চলে যায় ঠিক তেমনি যদি কোন বেদ জানা লোক পাপ করে তখন বেদ তাকে ছেড়ে উড়ে বেরিয়ে যায়’।

সনৎসুজাত বলছেন যারা তপস্যাদি করছে এই তপস্যা থেকে তার বারো রকমের দোষ হয়। তেরো রকমের নৃশংস মানুষ হয়। ব্রাহ্মণের বারোটি ধর্ম। তপস্যাতে যে বারো রকম দোষের কথা বলছেন এগুলো হল আমাদের যে মূল্যবোধগুলো রয়েছে সেগুলোকেই সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে। *ক্লোথকামৌ লোভমোহৌ বিধিৎসাহকৃপয়াহসূয়ে মানশোকৌ স্পৃহা চ। ঈর্ষ্যা জুগুপ্সা চ মনুষ্যদোষঃ বজ্র্যাঃ সদা দ্বাদশৈতে নরাণাম্।। একৈকঃ পুরুষপাস্তে হ মনুষ্যান্ মনুজর্ষভ। লিপ্সমানোহন্তরং তেষাং মৃগাণামিব লুদ্ধকঃ।* ১৫/৪৩/১৭-১৮। এই বারো রকমের দোষ হল কাম, ক্লোথ, লোভ, মোহ, বিধিৎসা বা অতৃপ্তির ভাব, নির্দয়তা, অসূয়া, মান, শোক, স্পৃহা, ঈর্ষ্যা ও জুগুপ্সা বা নিন্দা। এই বারোটি দোষকে সব সময় ত্যাগ করে দিতে হয়। যেমন শিকারী পশুপাখীকে বধ করার জন্য ফাঁক খোঁজে, ঠিক তেমনি এই দোষগুলো মানুষকে বধ করার জন্য ফাঁক খোঁজে। এর আগেও আমরা সন্তাপ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। মানুষের মধ্যে যখন যে কোন সন্তাপ আসে সেই সন্তাপ মানুষকে দুই দিক দিয়ে মারে। সন্তাপ শরীরকেও খারাপ করে দেয় আর মৃত্যুকেও কাছে নিয়ে আসে। সেইজন্য কখন সন্তাপ করতে নেই। ছয় রকমের পাপধর্মী মানুষ হয়। *বিকথনঃ স্পৃহালুর্মনস্বী বিভ্রং কোপং চপলোহরক্ষণশ্চ। এতান্ পাপাঃ যত্তরাঃ পাপধর্মান্ প্রকুব্বতে নো ব্রহ্মসন্তঃ সুদুর্গে।* ১৫/৪৩/১৯। প্রথম *বিকথনঃ*, যে নিজের খুব প্রশংসা করে বেড়ায়, আত্মশ্লাঘা, অর্থাৎ নিজের ঢাক নিজেই পেটাচ্ছে, আমি করেছি, আমার মত কেউ নেই, আমি বলেছি ইত্যাদি। দ্বিতীয় যে নিজের অপমান কিছুতেই সহ্য করতে পারেনা। তৃতীয় সব সময় ক্লোথী। চতুর্থ সর্বদা মনটা চঞ্চল। পঞ্চম যে আশ্রিতকে রক্ষা দেয় না। ষষ্ঠ পরদারদিভোগেচ্ছা। এইভাবে সনৎসুজাত নানা রকমের দোষের কথা বলছেন। এগুলোই আবার অন্যান্য শাস্ত্রেও বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আবার বেদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। আগেকার ঋষিরা, যেমন অথর্বা মুনি বা অন্যান্য মহর্ষি সমুদয় যেটা গান করেছিলেন সেটাই বেদ। যদিও আমরা প্রায়ই বলি বেদ ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়েছে কিন্তু এখানে মহাভারত পরিষ্কার বলছে ঋষিরা যেটা গান করেছিলেন ঐটাই ওনাদের ধ্যানের গভীরে উদ্ভাসিত সত্য। সনৎসুজাত বলছেন, যে সমস্ত বেদ মুখস্থ করে নিয়েছে সে কিন্তু কখনই বেদের পণ্ডিত নয়। কিন্তু বেদ দিয়ে যেটাকে জানা যায়, সেই পরমার্থ তত্ত্ব, এই পরমার্থ তত্ত্বকে যিনি বেদ দিয়ে জেনেছেন তিনিই ঠিক ঠিক বেদের পণ্ডিত। ঠাকুরের সন্তান স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের সাথে

কয়েকজন বেদের পণ্ডিতদের পরিচয় করান হয়েছিল। যখন পরিচয় করান হচ্ছিল তখন স্বামী অভেদানন্দজীকে বলা হল এনারা সবাই বেদের পণ্ডিত। শুনে মহারাজের মুখ চোখ লাল হয়ে গেল, তিনি বলছেন ‘এরা কখনই বেদের পণ্ডিত হতে পারেনা, আমরাই হলাম বেদের পণ্ডিত, আমরাই ঠিক ঠিক বেদজ্ঞ’। পরস্পরাতে বেদজ্ঞ তাঁকেই বলা যাবে যিনি বেদের যেটা প্রতিপাদ্য, বেদ যাঁর দিকে ইঙ্গিত করছে, তাঁকে যিনি জেনেছেন তিনিই বেদজ্ঞ। তোতাপাখির মত বেদ মুখস্থ করলেই বেদজ্ঞ হওয়া যায় না। উপনিষদেও এই নিয়ে আলোচনা করা হয়, যতক্ষণ তুমি না বুঝে থাক বেদ কি বলতে চাইছে ততক্ষণ তুমি যতই পাঠ করে যাও, মুখস্থ করে যাও এগুলোর কোন দাম নেই। যে বিষয়কে নিয়ে বলছে ঐটাকে যখন তুমি উপলব্ধি করেছ তখনই তার দাম দেওয়া হয়।

এরপর সর্বজ্ঞ নিয়ে বলছেন। সর্বজ্ঞ শব্দটি আমাদের পরস্পরাতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। *প্রত্যক্ষদর্শি লোকানাং সর্বদর্শী ভবেন্নরঃ। সত্যে বৈ ব্রাহ্মণস্তিষ্ঠংস্তদ্বিদ্বান্ সর্ববিদুবেৎ।* ১৫/৪৩/৬৩। যে যোগী সমস্ত লোককে প্রত্যক্ষ দেখে নিয়েছেন তাঁকে বলা হয় দ্রষ্টা। যোগ সাধনাতে ইন্দ্রিয়ের শক্তি প্রচণ্ড বেড়ে যায়। গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ঠিক এই কথাই বলছেন সর্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন প্রকাশ উপজায়তে, সাধনা করতে করতে যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায় তখন ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি অনেক বেড়ে গিয়ে ইন্দ্রিয়গুলি প্রখর হয়ে যায়। এখন আমি চোখ দিয়ে ঘরের দেওয়াল পর্যন্ত দেখতে পারছি। কিন্তু যোগ সাধনা করে করে যদি সত্ত্বগুণ খুব বেড়ে যায়, তখন এখানে বসেই আমি চাঁদে কি হচ্ছে, সূর্যে কি হচ্ছে সব স্পষ্ট দেখতে পারব। স্বামীজীও বলেছেন যোগীরা দূরের জিনিষ দেখতে পান, দূরের কথা শুনতে পান। এই ধরনের যোগীদের বলা হয় দ্রষ্টা। কিন্তু যিনি সত্য স্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত একমাত্র তিনিই হলেন সর্বজ্ঞ। এই সর্বজ্ঞকে নিয়ে মুণ্ডকোপনিষদেও কিছু আলোচনা আছে, গীতাতেও কিছু উল্লেখ আছে কিন্তু শঙ্করাচার্য সর্বজ্ঞের ব্যাপারে খুব পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন – যিনি পরমার্থ স্বরূপকে জানেন তিনিই একমাত্র সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ ভগবানকে যিনি জেনেছেন তিনিই সর্বজ্ঞ। কিন্তু পরের দিকের বিভিন্ন কাহিনীতে সর্বজ্ঞ বলতে বোঝান হয়েছে যিনি ঠিক ঠিক সব কিছুই জানেন। সর্বজ্ঞকে যে কোন প্রশ্নই করা হোক না কেন তিনি সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবেন। অন্য দিকে আমাদের শাস্ত্রে সর্বজ্ঞের অর্থ হচ্ছে যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন। এর আগে যেমন বলছেন যাঁরা সম্পূর্ণ লোককে দেখতে পান তাঁরা দ্রষ্টা তাঁদেরও সর্বজ্ঞ বলা হচ্ছে না। সর্বজ্ঞের সর্ব শব্দের একটা অর্থ ভগবান।

ধৃতরাষ্ট্র নানা রকমের কথা শুনছেন আবার প্রশ্নও করছেন। আবার বলছেন আপনি ব্রহ্ম নিয়ে কত সুন্দর কথা বলছেন ইচ্ছে হচ্ছে আবার পুরো কথাগুলো শুন। সনৎসুজাত খুব সুন্দর বলছে ‘প্রশ্ন করার সময় তুমি যে মাঝে মাঝে খুব হর্ষিত হয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠছ, এইভাবে তড়বড় করলে কিন্তু ব্রহ্ম উপলব্ধি হয় না। ধর্ম কথা এভাবে এগোতে পারেনা’। ধর্ম কথা জানতে চাওয়া মানেই গুরু দরজায় কুকুরের মত পড়ে থাকতে হবে। গুরুর দুয়ারে পড়ে থাকতে থাকতে মন যখন শান্ত হয়ে যাবে তখন গুরু একটি কি দুটো কথা বলে দেবেন সেই একটি দুটি কথাই হৃদয়কে জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত করে দেবে। আমরা এখানে যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসছি, সবাই কিছু না কিছু শাস্ত্রের কথা শুনেছি বা পড়েছি কিন্তু তাও আমাদের জ্ঞান হচ্ছে না কেন? গীতা আর উপনিষদের কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া যায়, সংস্কৃতে বলে আমরা অনেকেই পড়তে পারিনা। কিন্তু কথামৃত বাংলায় পড়ছি আর গীতা, উপনিষদের কথা আর কথামৃতের কথা একই, কিন্তু এততো কথামৃত পড়ছি কিন্তু তা সত্ত্বও ভগবানের জ্ঞান কেন হচ্ছে না? কারণ একটাই, আমাদের মন এখন শান্ত হয়নি। খুব উচ্চ স্তরের সাধকের কাছে যদি আমরা কোন প্রশ্ন নিয়ে যাই তখন আমাদের মন যদি প্রস্তুত না হয়ে থাকে, মন যদি শান্ত না হয়ে থাকে, তাঁরা কোন কথার উত্তরই দেবেন না। জমুর কাছে একজন সুফি মহাত্মা ছিলেন। জমুতে তাঁর খুব নাম ডাক ছিল। একবার কয়েকজন সন্ন্যাসী সেই সুফী মহাত্মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন ‘ভক্তি কিভাবে হয়?’ তখন সেই সুফী মহাত্মা খুব সুন্দর একটা কথা বললেন ‘জমিদারি যেভাবে পরিশ্রম করে অর্জন করতে হয়, ঠিক সেইভাবে ভক্তিকে অর্জন করতে হয়’। আমাদের অনেকের ধারণা যে ভক্তি হয়, কিন্তু তা না, ভক্তিকে অর্জন করতে হয়। ধৃতরাষ্ট্রকে সনৎসুজাত বলছেন ‘তুমি যেভাবে ছটফট করছ এতে কিছুই জ্ঞান হবে না। তোমার মনের মধ্যে সব সময় চেউ উঠছে। যখন মনের সমস্ত চেউ ওঠা বন্ধ হয়ে মন শান্ত হয়ে যায় তখনই মনে ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হয়’। কি করে ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হচ্ছে? যখন যিনি যেটাকে অবলম্বন করে ধ্যান করছেন, যেমন কেউ একজন ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ মন্ত্র জপ করতে করতে শুধু শিবের ধ্যান করে যাচ্ছেন। এখন মনের মধ্যে যখনই অন্য কোন ভাব উঠছে সেটাকে কেটে দিচ্ছেন। কি দিয়ে কাটছেন? শিবের ভাবনা দিয়ে। এইভাবে ভাবনাগুলো কাটতে কাটতে একটা সময় সব রকমের বৃত্তি ওঠাটা বন্ধ হয়ে মাত্র একটি ভাবনা থেকে যায়, সেই একটি ভাবনা হল শুধু শিব। ঠিক তেমনি,



যিনি শ্রীরামের বা শ্রীকৃষ্ণের বা চৈতন্য মহাপ্রভুর চিন্তা করছেন, তাঁদেরও ঠিক একই পদ্ধতিতে সব বৃত্তি ওঠা বন্ধ হয়ে একটি বৃত্তি থেকে যায়। সব বৃত্তি ওঠা যখন বন্ধ হয়ে গেল, মনের সব রকম ভাব ওঠা বন্ধ হয়ে শান্ত হয়ে গেল তখন ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হয়। ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হওয়া মানে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেল না, ব্রহ্ম বলতে কি বলতে চাইছে এই বোধটা এসে যায়। তাই মন যতক্ষণ না শান্ত হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু কোন জ্ঞানই হয় না। সেইজন্য আগে পাপকর্ম, দুষ্কর্ম থেকে মনটাকে সরিয়ে আনতে বলা হয়। পাপকর্ম থেকে মনকে সরিয়ে আনার পর ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতাকে শান্ত করতে হয়, ইন্দ্রিয়কে শান্ত করে মনের চঞ্চলতাকে প্রশমিত করতে হয়। সব শেষে আসে সাধনার ফল নিয়ে দুশ্চিন্তা, আমার কবে সমাধি হবে, কবে উপলব্ধি হবে, এই চিন্তাকেও শেষে উড়িয়ে দিতে হয়। তারপর ঠিক সময়ে ঐ ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হয়, তার আগে কিছুই হয় না। ঠাকুরও বলছেন – যখন পাঁচটা জিনিষকে জানবার ইচ্ছে হয় তার মানে এখনও তার জ্ঞান উদয় হয়নি। এক জানার নাম জ্ঞান, বহু জানার নাম অজ্ঞান। এর দু রকমের অর্থ হতে পারে, একটা অর্থ যখন আমি জেনে গেলাম তিনিই আছেন এটা হল জ্ঞান। আবার যখন আমার বহু বোধ হচ্ছে তখন এটাই অজ্ঞান, বহু জিনিষকে জানতে ইচ্ছে করছে এটাও অজ্ঞান।

সনৎসুজাত বলছেন *গৃহ্যন্তি সর্পা ইব গহুরাণি স্বশিক্ষয়া স্বেন ব্রতেন মর্ত্যাঃ। তেষু প্রমূহ্যন্তি জনা বিমূঢ়া যথাধ্বানং মোহয়ন্তে ভয়ায়। যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্।* ১৫/৪৬/২২। সাপ যেমন হাঁদুরের গর্তে গিয়ে লুকিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি যে অহঙ্কারী সে তার শিক্ষা আর ব্যবহারকে মুখোশ করে আড়ালে তার অহঙ্কারটাকে লুকিয়ে রাখে। যারা ভগবান লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মের পথকে অনুসরণ করে চলেন তাদেরকে এই অহঙ্কারী পুরুষরা সেই পথ থেকে সরিয়ে নেয়। কিভাবে সরিয়ে নেয়? যাদের বেশী জাগতিক বুদ্ধি আর নিজেদের যুক্তিবাদী বলে মনে করে তারা বিভিন্ন কথার মারপ্যাঁচে এদের চিন্তাভাবনাকে বিভ্রান্ত করে দিয়ে পথভ্রষ্ট করে দেয়। এদের সব কথাই যে ঠিক তা নয়। সেইজন্য যারা পরমাত্মার পথে ভক্তির পথকে আশ্রয় করে নেয় তাদের এই ধরণের লোকদের থেকে খুব সাবধান থাকতে হয়। এরা যখন ঠিক ঠিক পরমাত্মার পথে একটু এগিয়ে যায় তখন ভগবানের কৃপায় তারা সঠিক পথে এগোতে থাকে।

নাহং সদাহসৎকৃতঃ স্যাং ন মৃত্যুর্ন চামৃত্যুরমৃতং মে কুতঃ স্যাৎ। সত্যান্তে সত্যসমানবন্ধে সতশ্চ যোনিরসতশ্চৈব এক। যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্। ১৫/৪৩/২৩। সনৎসুজাত বলছেন আমি কখন কারুর অসৎকারের পাত্র হই না। সনৎকুমারের মন এত উচ্চ অবস্থায় তাঁকে কে আর অসৎকার করবে। সেইজন্য আমার মৃত্যুও নেই জন্মও নেই। আমি যেখানে কারুর অবজ্ঞা বা অসৎকারের পাত্র হইনা সেখানে আমার আবার মৃত্যুই বা কি আমার জন্মই বা কি। খুব সাধারণ জিনিষও আমাকে ছুঁতে পারেনা। নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত ব্রহ্মের সঙ্গে আমার এক বোধ, সেইজন্য আমার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। তাই আমার বন্ধনও নেই মুক্তিও নেই, সৎ অসৎ সব কিছুতেই আমার সমান বোধ। সত্যান্তে সত্যসমানবন্ধে সতশ্চ যোনিরসতশ্চৈব এক। যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্। যেখান থেকে সৎ আর অসৎএর উৎপত্তি হয় আমি সেই জায়গাতে গিয়ে এক হয়ে আছি। সৎ মানে যেটা আছে আর অসৎ মানে যেটা নেই। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে বলা হয়, সৎ মানে যে জিনিষটার উপলব্ধি হয়, অসৎ মানে যেটার উপলব্ধি হয় না। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় যে জিনিষকে ধরতে পারে সেটাই সৎ, যেমন এই বই, এই গ্লাস এগুলো সৎ কারণ আমি এগুলো ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখতে পারছি। কিন্তু কেউ এসে যদি বলে আকাশকুসুম বা বক্ষ্যাপুত্র, আকাশকুসুম আমি দেখতে পাচ্ছি না আর বক্ষ্যার তো কোন সন্তান হয় না, তাই এই দুটো অসৎ। কিন্তু ব্রহ্ম এই সৎ আর অসৎএর পারে। কেন ব্রহ্ম সৎ আর অসৎএর পারে? কারণ ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না তাই ব্রহ্ম অসৎ আবার ব্রহ্ম যে নেই এটাও বলা যায় না কারণ আমার আমি বোধটা আছে তাই ব্রহ্ম অসৎ নন। একদিকে তিনি সৎ নন অন্য দিকে তিনি অসৎও নন। জাগতিক বস্তু আর ভগবানের মধ্যে এখানেই পার্থক্য, জাগতিক বস্তু হয় সৎ হবে আর তা নাহলে অসৎ হবে। যদি পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় তাহলে সেটা সৎ, ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটা জানা যায় না সেটা অসৎ। যেমন আমার যিনি প্রপিতামহ ছিলেন তিনি এখন আমার কাছে অসৎ, তিনি এখন যে লোকেই থাকুন না কেন আমার এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করা যাবে না। অথচ তিনি এক সময় ছিলেন কিন্তু এখন তিনি অসৎ হয়ে গেছেন। আবার বর্তমানে আমার বাড়িতে যারা আছে তারা সবাই সৎ, কারণ আমি তাদের সবাইকে পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানতে পারছি। ভগবানের ক্ষেত্রে এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে কখনই তাঁকে জানা যাবে না, তাই এই অর্থে তিনি সৎ নন। আবার তিনি যে নেই এটাও বলা যাবে না, কারণ ধ্যানের গভীরে তাঁকে দর্শন করা যায়। ঋষিরা বলে গেছেন তিনি আছেন। শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা এক, বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ভাবে তাঁকে জানা যায়, তাই একেবারেই যে ভগবানকে জানা যায় না তাও নয়। এই ভাবে জানা যাচ্ছে তাই ভগবান অসৎ নন। সেইজন্য

বলা হয় ভগবান, ঈশ্বর, ব্রহ্ম একদিকে সৎ নন অন্য দিকে তিনি অসৎও নন, এটি হিন্দু দর্শনের খুব বিখ্যাত একটা মৌলিক তত্ত্ব। বৌদ্ধ দর্শনে ভগবান হয়ে যান অসৎ, যার জন্য একে বলা হয় শূন্য বা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ, এঁরা বলেন তিনি বলে কিছু নেই, এইভাবে প্রায় অসৎএর দিকে নিয়ে যান। আবার দ্বৈতবাদী ধর্মগুলো ভগবানকে সৎ এর দিকে নিয়ে যায়, তারা বলে আমি ভগবানকে দেখার চেষ্টা করছি, আমি তাঁকে জানার চেষ্টা করছি। কিন্তু ঠিক ঠিক হিন্দু দর্শন বলবে ভগবান সৎও নন অসৎও নন, তিনি সৎ ও অসৎএর পার।

এর আগে আমরা যেখানে খণ্ড অখণ্ডের বিভাজন রেখার কথা বলেছিলাম সেই বিভাজন রেখার ঐপারে ভগবানের অখণ্ড রাজ্য আর খণ্ডের যেখানটা বিভাজন রেখা আসছে সেখান থেকে অনেক কিছু শুরু হচ্ছে, এই বিভাজন রেখা থেকেই পাপ-পুণ্য, সৎ-অসৎ, ধর্ম-অধর্ম শুরু হয়, বেদের শুরুও এইখান থেকে। সনৎসুজাত বলছেন ‘আমি ঐ জায়গাটাতে অবস্থিত যেখান থেকে সৎ আর অসৎ শুরু হয়, আমি সৎ অসৎএর পারে’। মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের খেলা শুরু হয়েছে। যদি জিজ্ঞেস করা হয় কটা গোল হয়েছে? এখনও গোল হয়নি, শূন্য শূন্য। আর খেলা এখনও শুরুই হয়নি, তখন যদি জিজ্ঞেস করা হয় কটা গোল হয়েছে? এই প্রশ্ন ওঠেই না। খেলা যখন শুরু হবে তখন হারজিতের প্রশ্ন আসবে। খেলাই শুরু হয়নি তাহলে হারজিতের প্রশ্ন কোথেকে আসবে। রেফারি যখন হুইসেল বাজাল তখন হারাজেতার কথা আসবে, হুইসেল মারতেই খেলা শূন্য শূন্য থেকে শুরু হয়। সনৎসুজাত বলছেন আমি ঐ জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে আছি যেখান থেকে সৎ অসৎ শুরু হয়, তাই আমার আবার জীবন-মৃত্যুর কি আছে!

‘হে ধৃতরাষ্ট্র! পরমাত্মা যিনি তাঁর সঙ্গে যেমন সাধু-পুরুষের কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি অসাধুর সঙ্গেও কোন সম্পর্ক নেই। তিনি সব সময় নির্লিপ্ত। ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, জীবন-মৃত্যু এগুলো হল দেহাভিমানী পুরুষের জন্য’। ধৃতরাষ্ট্রের মূল প্রশ্ন ছিল মৃত্যু বলে কিছু আছে কি নেই। সনৎসুজাত বলছেন দেহাভিমানী পুরুষের জন্য মৃত্যু আছে। তাহলে সনৎসুজাত যে বলছেন মৃত্যু বলে কিছু নেই, তিনি কি কিছু ভুল বলছেন? একেবারেই ভুল বলছেন না, কারণ তাঁর দেহাভিমান নেই, তিনি নিজেকে আত্মা বলেই জানেন। যিনি সর্বব্যাপী, অনন্ত, নিত্য তাঁর মৃত্যু হবে কি করে! এই জিনিষটাকে বোঝাবার জন্য নানা রকমের উপমা দেওয়া হয়। একটা বাচ্চার জামা ধরে যদি টানি তাহলে সে খুব চেষ্টায়ে বলতে থাকবে ‘তুমি আমাকে কেন টানলে’? যতই বলি আমি তো তোমার জামাটা টেনেছি তোমাকে তো টানিনি। বাচ্চা মনে করছে সে আর তার জামা এক। ঠিক তেমনি জাগতিক দৃষ্টিতে যারা খুব কাঁচা তারা মনে করে আমার শরীর আর আমি এক। এর ওপরে যাঁরা তাঁরা বলেন আমি আমার ঘর-বাড়ি নয়, আমি আমার জামা-কাপড়ও না, আমি আমার শরীরও নই, আমি হলাম সেই শুদ্ধ আত্মা। ঘরবাড়ি যেমন একদিন ভেঙে যাবে, গাড়ি পনের বছর পুরনো হয়ে গেলে স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডে ফেলে আসতে হবে ঠিক তেমনি একটা সময়ে এই শরীরটাও শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আত্মা যেমন ছিল তেমনটিই থাকবে। এখানেই মৃত্যু আছে কি নেই বোঝা যায়, যদি মনে করি আমি হলাম এই দেহ তাহলে মৃত্যু আছে, তখন আমাকে তপস্যা করতে হবে কিভাবে মৃত্যুকে জয় করা যায়। আর যদি আমি নিজেকে সেই আত্মা বলে মনে করি তাহলে মৃত্যু নেই। ধৃতরাষ্ট্র যে বলছিলেন পরম্পরাতে তিনি শুনে এসেছেন দেবতারা আর অসুররা ব্রহ্মচর্য ও তপস্যা করেছিল মৃত্যুকে জয় করার জন্য, সেটাও ঠিক, কারণ তারা নিজেদের দেহের সঙ্গে জুড়ে রেখেছে।

সনৎসুজাত বলছেন, পরমাত্মার সঙ্গে সৎ কর্মের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক নেই অসৎ কর্মের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক নেই। সৎ কর্ম আর অসৎ কর্মে ভগবানের কিছুই আসে যায় না। আমাকে যদি মৃত্যুর পর নরকে যেতে হয় তাহলে অসুবিধার কি আছে! ভগবান ছাড়া কিছুই নেই। তাই যদি হয় তাহলে নরকটা কি ভগবানের বাইরে হবে! ঠাকুর বলছেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে, কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনও তো ভগবানের, তাহলে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কি আছে! সত্যিই তাই, নরককেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই আর কামিনী-কাঞ্চনের ত্যাগেরও কিছুই নেই। কিন্তু কামিনী-কাঞ্চন আর নাম-যশের পেছনে মানুষ যখন ছুটতে থাকে তখন কিছু সমস্যা আসে। বেশী টাকা-পয়সা হয়ে গেলে ইনকাম ট্যাক্সের ভয় আসবে। কৃষকিশোর বলত আমি খ, মানে আমি শুদ্ধ আত্মা। অন্য দিকে কৃষকিশোরেরও ট্যাক্সওয়ালাকে ভয়, বাড়িতে এসে ঘটিবাটি নিয়ে যাবে। কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে পড়ে থাকলে সব সময় দুশ্চিন্তা লেগে থাকবে। নাম-যশ নিয়ে থাকলেও একই জিনিষ হবে, নাম-যশ হলে তখন খুব সতর্ক হয়ে চলতে হবে, একটু কিছু এদিক সেদিক হয়ে গেলে বদনাম হয়ে যাবে। কামিনী-কাঞ্চনও ঈশ্বরের কিন্তু কামিনীর জন্য কাঞ্চন চাই, আর কাঞ্চনের জন্য প্রাণান্তক পরিশ্রম। এখন আমি ঐ পরিশ্রম করতে চাইছি কি চাইছি না? না, আমি ঐ বেদম খাটনি খাটতে পারবো না। তাহলে আমাকে কাঞ্চন ছাড়তে হবে। কাঞ্চন ছাড়লে আমাকে কামিনীর আশা ত্যাগ করতে হবে। তার মানে ভগবানের যে কামিনী-কাঞ্চন রূপ, ভগবানের সেই রূপ আমি চাইনা। ঠাকুরের ঐ

রূপের জন্য যেটা আমাকে দিতে হবে সেটা দিতে আমি রাজী নই। তাহলে ঠাকুরের কোন রূপটা আমার চাই? ঠাকুরের যে জ্ঞান, ভক্তি, ত্যাগের রূপ সেটা আমার চাই। আরেকজন হয়তো বলবে আমি ঠাকুরের কামিনী-কাঞ্চন রূপ চাই। তাহলে সেটা নাও, কে বারণ করছে তোমাকে! ছেলে যখন উদ্ভট কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চায় বাবা-মা ছেলেকে অনেক করে বোঝায় যাতে ঐ মেয়েকে বিয়ে না করে। ছেলে যখন কিছুতেই বাবা-মার কথা শুনতে রাজী হয় না তখন বাবা-মা বলে, পরে যখন কাঁদবে তখন আমাদের কাছে এসে দুঃখ করবে না। ঠাকুরের কামিনী-কাঞ্চনের রূপের পেছনে যখন আমি দৌড়াচ্ছি, তারপর আমি যখন কাঁদবো আর তখনও যদি বলি, না এইটাও তো ঠাকুরের রূপ তখন তাতে কারুর আপত্তি থাকবে না। আমি যদি মনে করি কাল্মারও একটা সুখ আছে। যেমন সফ্রেটিসের সময় গ্রীক সাহিত্যের লেখকরা সব ট্রাজেডি লিখতেন, যদিও সেক্সপিয়র পরের দিকে ট্রাজেডির উপর অনেক সাহিত্য রচনা করেছেন কিন্তু গ্রীকদের মত ট্রাজেডি সাহিত্য কেউ তৈরী করতে পারেনি। গ্রীক দেশের লেখকরা তখন বলত লোকেরা কাল্মাকাটি করার জন্য আমাদের পয়সা দেয়। যদি চোখের জল ফেলতে তোমার ভালো লাগে তাহলে ঠাকুরের কামিনী-কাঞ্চন রূপকে নিয়ে থাক। কিন্তু যদি তুমি মনে কর তোমার কষ্ট হবে তাহলে ঠাকুরের ঐ রূপটা নিও না। নরকটাও ঠাকুরের বাইরে নয়, কিন্তু আমার ঐ রূপটা লাগবে না। যদি কেউ বলে নরকে গিয়েও যদি আমার ঠাকুরের বোধটা থাকে তাহলে আমি নরকেও যেতে রাজী আছি তখন তার নরকে গিয়েও কিছু আসবে যাবে না। স্বর্গকেও হিন্দুরা কেন চায় না? কারণ স্বর্গে গিয়ে ঈশ্বরের জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্যের রূপটা চলে যাবে। সেইজন্য হিন্দুধর্ম বলে আমি নরকও চাইনা স্বর্গও চাইনা, কামিনী-কাঞ্চনও চাইনা নাম-যশও চাইনা, কারণ সেখানে ঠাকুরের জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্যের রূপটা থাকে না। কিন্তু যারা বলে আমি ঠাকুরকে কামিনী-কাঞ্চন নাম-যশের মধ্যেই দেখছি, সেটা এদের মুখের কথা, ঐভাবে তারা দেখে না। যদি তাই দেখত তাহলে এগুলো থেকে যখন কষ্ট পায় তখন কেঁদে ভাসাত না।

সনৎসুজাত বলছেন, এই ধরনের ব্রহ্মবেত্তাদের কোন কথা কাউকে কোন সন্তাপ দেয় না, আবার কারুর কথাতেও তাঁদের মধ্যে কোন সন্তাপ সৃষ্টি হয় না। ব্রহ্মবিদরা বিধি-নিষেধের পারে চলে যান। বিধি মানে আমাকে এই এই করতে হবে, এই ধরনের কোন নিয়মের মধ্যে থাকেন না। ঠিক তেমনি কোন ধরনের নিষেধ তাঁদের উপর প্রযোজ্য হয় না। যদি ব্রহ্মবেত্তা, ব্রহ্মজ্ঞানীকে নিষিদ্ধ কিছু খেতে দেয় তিনি খেয়ে নেবেন, যদি বলেন আপনি এটা খাবেন না, উনি তখন খাবেন না। ব্রহ্মজ্ঞানীর কোন কিছুতেই কিছু আসে যায় না। তুমি এটা কর তাতেও তাঁর কোন আপত্তি নেই, তুমি এটা করবে না তাতেও কোন আপত্তি থাকবে না। কেউ যদি তাঁর নিন্দা করে, উনি বুঝতেই পারবেন না যে তাঁর নিন্দা করা হচ্ছে। ব্রহ্মবিদরা নিন্দা স্তুতির পারে চলে যান। সব কিছুর পারে গিয়ে তাঁদের বুদ্ধিটা একেবারে স্থির হয়ে যায়। বলছেন – যে মানুষ এইভাবে সমস্ত ভূতে পরমাত্মাকে দর্শন করছেন, তিনি তখন কি নিয়েই বা শোক করবেন আর কোন জিনিষকে নিয়ে উৎফুল্ল হবেন। ঠাকুর যেমন বলছেন – আমি দেখছি সবটাই সচ্চিদানন্দ। ঠাকুর দেখছেন যে ছাগকে বলি দেওয়া হবে সেও সচ্চিদানন্দ আর যে বলি দিচ্ছে সেও সচ্চিদানন্দ। সেই ছাগকে যখন বলি দেওয়া হল তখন কি থাকল? সেই সচ্চিদানন্দই থাকলেন, তখন তিনি কার জন্য শোক করবেন! অন্য দিকে বিষয়াসক্ত যারা তারা মূঢ়, এই মূঢ়রা কি বলল তাতে ব্রহ্মবিদের কিছুই আসে যায় না। পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা যদি আমাকে বলে ‘কাকু তুমি একটা মুর্থ’। বাচ্চার এই কথাতে আমি কি নিজেকে অপমানিত বোধ করব? কিন্তু আমার বন্ধু যদি আমাকে মুর্থ বলে তখন আমি রেগে যাব, কারণ আমি আমার বন্ধুকে আমার সমান সমান দেখছি। ব্রহ্মজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে তাঁরা এত উঁচুতে চলে যান সেখান থেকে তাঁরা এই বিষয়াসক্ত মানুষদের দেখেন পাঁচ বছরের বাচ্চার মত। পাঁচ বছরের বাচ্চা যদি আমাকে বলে ‘কাকু তুমি কত কিছু জান’! আমি কি বাচ্চার কথায় অহঙ্কারে ফুলে উঠবো? ব্রহ্মজ্ঞানীরা এত উঁচুতে চলে যান সেখানে কোন নিন্দা স্তুতি পৌঁছাতে পারেনা, এগুলোর কোন বোধই হয় না। এর খুব জ্বলজ্যন্ত নিদর্শন ঠাকুরের জীবনেই দেখতে পাই। দক্ষিণেশ্বরে হৃদয়রাম কি একটা ভুল কাজ করেছিল বলে কর্তৃপক্ষরা তাকে জানিয়ে দিল দক্ষিণেশ্বর মন্দির ছেড়ে চলে যেতে হবে। ঠাকুরের কাছে কি করে ভুল খবর এসেছে ঠাকুরকেও নাকি দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে চলে যেতে বলা হয়েছে। শুনে ঠাকুর কাঁধে একটা গামছা ফেলে দিয়ে সোজা গেটের বাইরের দিকে বেরিয়ে যেতে থাকলেন। কর্তৃপক্ষের কাছে খবর চলে গেছে যে ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে যেতে বলা হয়েছে শুনে ঠাকুর সোজা গেট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরকে গিয়ে বলা হল, আপনাকে চলে যেতে বলা হয়নি। উনি আবার ঘরে ফিরে যথারীতি ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন।

ব্রহ্মজ্ঞান যখন হয় তখন কি হয়? এর আগে দেবযানী-শর্মিষ্ঠা কাহিনীতে গুক্রাচার্য যেভাবে বলেছিলেন ঠিক সেইভাবে সনৎসুজাত বলছেন *অহমেব স্মাতো মাতা পিতা পুত্রোহস্ম্যহং পুনঃ। আত্মাহমপি সর্বস্য যচ্চ নাস্তি*

যদন্তি চ।।৫/৪৬/২৯। ‘আমি সবারই মা, আমি সবারই বাবা, আমিই আবার সবারই পুত্র আমি সবারই আত্মা, যা কিছু আছে সেটা আমিই, যা নেই সেটাও আমি, আমার বাইরে কিছু নেই। যার অস্তিত্ব আছে সেটাও আমি, যার অস্তিত্ব নেই সেটাও আমি’। অস্তিত্ব না হলেও ঐ জিনিষটার বোধ থাকে। যেমন বক্ষ্যাপুত্র বলছি, কিন্তু বক্ষ্যাপুত্র বলে কিছু হতে পারেনা, এই অভাববোধটাও পরমাত্মার মধ্যেই থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে ঠিক একই কথা বলছেন – পিতাহমস্যা জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। এই জগতের আমিই বাবা, আমিই মা, আমিই ধাত্রী আবার আমিই জগতের ঠাকুর্দা। গুণ্ডাচার্য ঠিক এই একই কথা বলেছিলেন, আর এখানে সনৎসুজাত সেই একই কথা বলছেন। পরের দিকে হিন্দু ধর্মের দর্শনের বিকাশ যাঁদের দ্বারা হয়েছিল তাঁরা অনেকেই গীতাকে ভাগবত ধর্ম বলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন আমিই জগতের মা, আমিই জগতের ধাতা, আমিই জগতের বাবা আবার ঠাকুর্দাও। এই একই কথা গুণ্ডাচার্য আর সনৎসুজাতও বলছেন। যিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন তিনি সেই পরম সত্তার সঙ্গে এক হয়ে যান। পরম সত্তার সঙ্গে যখন এক বোধ হয়ে যায় তখন তিনি দেখেন যা কিছু আছে সবটাই তিনি নিজে। মন্দও আমি ভালোটাও আমি, জন্ম আমার থেকে মৃত্যুও আমার থেকে। মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে, আমার থেকেই সব কিছু বেরোচ্ছে।

ধৃতরাষ্ট্র! আমি হলাম পিতামহোহস্মি স্ববিরঃ পিতা পুত্রশ্চ ভারত। মমৈব যুয়মাভ্রা ন মে যুয়ং ন বোহপ্যহম্।।৫/৪৬/৩০। আমি হলাম তোমার বুড়ো ঠাকুর্দা, আর তোমার পিতা, পুত্র সবই আমি। তোমার সব কিছু আমার আত্মায় অবস্থিত কিন্তু আবার তুমি আমার নও আমিও তোমার নই। এগুলো হল মহাভারতের কূট শ্লোক। এগুলোকে বোঝার জন্য গভীর আধ্যাত্মিক মননশীলতার প্রয়োজন। আত্মার দৃষ্টিতে তিনি সব কিছুকে এক দেখছেন কিন্তু দেহের দৃষ্টিতে তিনি আলাদা। ব্রহ্ম দৃষ্টিতে সব এক কিন্তু বস্তুর দৃষ্টিতে আলাদা। বলছেন, কেন আমার জন্ম নেই কেন আমার মৃত্যু নেই? কারণ আত্মৈব স্থানং মম জন্ম চ আত্মা। আত্মাই আমার স্থান আত্মাই আমার জন্ম। আমি সব কিছুতে ওতপ্রোত হয়ে আছি। যেমন বৃষ্টির জল আর মাটিতে মিশে কদমাক্ত হয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে, যেখানেই মাটি খুঁড়বে সেখানে ভেজা। ঠিক তেমনি আমি সবার মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছি। আমি অজর ও নিত্য নতুন মহিমাতে সব সময় প্রকাশিত হয়ে চলেছি। এই যে আমার স্বরূপ, আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, আমি সর্বব্যাপী, এই জিনিষটাকে যে বুঝে নিতে পারে সেই জ্ঞানী সুখ লাভ করে – মাং বিজ্ঞায় কবিঃ আস্তে প্রসন্নঃ। মানুষ কখন খুশী হয়? আমার এই স্বরূপটাকে জেনে। কারণ আমি যখনই সনৎসুজাতের স্বরূপকে জেনে গেলাম তখন কিন্তু আমিও আমার স্বরূপকে আস্তে আস্তে জানতে শুরু করে দেব। ভগবানের স্বরূপকে জানলেই জীবনে প্রকৃত শান্তি আসতে শুরু করে। এই হচ্ছে সনৎসুজাত সংবাদ।

এই অধ্যায়ের মূল বক্তব্য হল – আত্মজ্ঞানী, যিনি আত্মার স্বরূপের সাথে একাত্ম বোধ করছেন, তিনি দেখেন তাঁর জন্মও হয় না মৃত্যুও হয় না। আর তিনি দেখেন যা কিছু এই জগতে আছে সব কিছুর মধ্যে তিনি ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন। যেটা নেই সেটাও তিনি, যেটা আছে সেটাও তিনি। যেটা আগে হয়ে গেছে সেটাও তিনি, যেটা এখন হচ্ছে সেটাও তিনি আর ভবিষ্যতে যেটা হবে সেটাও তিনি। তাঁর বাইরে কিছুই নেই। হিন্দুধর্মের এটাই বৈশিষ্ট্য, অন্য কোন ধর্মে এই ভাব দেখা যাবে না। এমনকি হিন্দুধর্মের মধ্যে যে দ্বৈতভাব সেখানেও এই ভাব পাওয়া যাবে না। হিন্দুধর্মের মূল ভাবই হল অদ্বৈতভাব। অদ্বৈতকে হিন্দুধর্ম থেকে সরিয়ে দিলে ইসলাম, খ্রীস্টান, জুদাইজম, জরাথ্রাস্ট্র যত ধর্ম আছে সব ধর্মের সাথে হিন্দু ধর্ম এক হয়ে যাবে। অদ্বৈত ভাব মুনি ঋষিদের কোন চিন্তা ভাবনা প্রসূত নয়, উপলব্ধির জায়গায় গিয়ে তাঁরা এইটাই প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। এই অদ্বৈত তত্ত্ব কি শুধু হিন্দু ধর্মের মুনি ঋষিদের কাছেই সত্য? না, এটাই একমাত্র সত্য, বিশ্বের যে কোন ধর্মের সাধক যাঁরা ধ্যান ধারণা করেন তাঁরাই এই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। খ্রীস্টানদের মধ্যে কিছু সাধক ছিলেন তাঁরাও এই একই সত্যকে উপলব্ধির কথা বলে গেছেন। ইসলাম ধর্মে যাঁরা সুফি সাধক তাঁদের মধ্যেও অনেকেই খুব জোরের সাথে বলছেন আমি সেই পরম সত্যের সাথে এক। সুফির শেষ কথা আর অদ্বৈতের সত্য এক। সেইজন্য অনেক ঐতিহাসিক বলে সুফি মতাদর্শ বেদান্ত থেকে প্রভাবিত হয়েছিল। আবার অনেকে বলেন মহম্মদ দুই রকমের শিক্ষা দিয়েছিলেন, সাধারণের জন্য এক ধরনের শিক্ষা দিয়েছিলেন আর কিছু দরবেশ ছিল, যাঁরা মহম্মদের বাড়ির চাতালে থাকতেন, তাঁদেরকে তিনি আলাদা ভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন। যদি এইভাবে সুফিদের পরম্পরাকে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে এটাই বেদের প্রতীকমার্গ আর নিবৃত্তিমার্গ হয়ে যায়। কিন্তু যারা একেবারে গোঁড়া মুসলিম তাঁরা এটাকে একেবারেই মানবে না। যার জন্য সুফিদের নির্বিচারে গলা কেটে সমস্যা মিটিয়ে দিল। জুদাইজিমের কাছে আবার অদ্বৈতের এই ভাবকে চিন্তা করা মহা পাপ। বৌদ্ধ ধর্ম আবার অদ্বৈতকে পুরোপুরি মানছে। বৌদ্ধ ধর্মও বলছে সাধনা করে আমিও বুদ্ধ হয়ে যেতে পারি, আর ঐ অবস্থায় গিয়ে আমার একই উপলব্ধি হবে। একমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই যে শুধু অদ্বৈত মতাদর্শ আছে তা নয়।

হিন্দুদের কাছে অদ্বৈতই চরম উদ্দেশ্য। হিন্দু দর্শনে অদ্বৈত তত্ত্বে যত জোর দেওয়া হয়, অন্যান্য ধর্মে অদ্বৈতের উপর এত জোর দেওয়া হয় না। অদ্বৈতের কথা ঋষিরা বহু ভাবে বলে গেছেন। যখনই কোন ঋষি অদ্বৈতের চরম অবস্থায় পৌঁছে যান সেখানে তিনি এই কথাই বলতে থাকেন আমিই সব কিছু হয়েছি, আমিই সব কিছু করছি। গীতাতে নানা রকমের ভাবকে সমন্বয় করা হয়েছে কিন্তু এখানে সনৎসুজাত একেবারে ঘোর অদ্বৈতের কথাই বলে গেছেন। আর ঘোর অদ্বৈত যে শুধু সনৎকুমারকে নিয়েই বলা হচ্ছে তা নয়, এটা সবার জন্যই বলা হচ্ছে। এই অদ্বৈতের কথা অবশ্য গীতাতেও আছে কিন্তু অদ্বৈত তত্ত্বের সাথে গীতাতে আরও অন্যান্য মত ও তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে, যেটা সনৎসুজাতীয় সংবাদে নেই।

### শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নামের অর্থ

এখান থেকে আমরা আবার মহাভারতের মূল কাহিনীতে চলে যাচ্ছি। একদিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণও চেষ্টা করছেন যাতে যুদ্ধটাকে আটকানো যায়। শুধু শ্রীকৃষ্ণই নয় আরও অনেকেই চাইছেন আলোচনার মাধ্যমে যদি কোন সমস্যার সমাধান বেরিয়ে আসে। এর আগে সঞ্জয় পাণ্ডবদের সাথে এক প্রস্থ আলোচনা করে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে সব খবর দিয়ে বলছেন ‘আমরা যে কাজ করতে যাচ্ছি এগুলো কিন্তু আমরা ঠিক করছি না, আপনার আদেশ মত আপনাদের যা বক্তব্য ছিল আমি পাণ্ডবদের জানিয়ে দিয়েছি। সেই বক্তব্যের উত্তরে পাণ্ডবরাও খুব কড়া সন্দেহ দিয়েছে’।

হস্তিনাপুরের রাজসভায় আলোচনা চলছে, আর সেখানে সঞ্জয় সব খবরাখবর পেশ করার পর ভীষ্ম বলছেন ‘তোমরা জেনে রাখো এই অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ হল নর ও নারায়ণ ঋষি, জগতের মঙ্গলের জন্য এই দুই ঋষি মানব শরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন। তোমরা এই দুজনের সাথে কখনই যুদ্ধ করে পারবে না। তোমাদের যুদ্ধের পরিকল্পনা মাথা থেকে নামিয়ে দিয়ে একটা সন্ধি করে নাও। যুদ্ধ করতে যেও না’। ভীষ্ম বারবার যুদ্ধ করতে বারণ করছেন। এইসব শোনার পর ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলছেন ‘হে সঞ্জয়! শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে ভীষ্ম কিছু কথা বলছেন, দ্রোণাচার্য কিছু বলছেন আবার দুর্যোধন অন্য রকম কথা বলছেন, কিন্তু তুমি তো শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে অনেক কিছুই জানো। তাই তুমি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কি শুনেছ, কি জেনেছ আমাকে একটু বিস্তারিত ভাবে বলতো’। তখন সঞ্জয় বলছেন ‘আমি শ্রীকৃষ্ণের নামের অনেক মহিমা শুনেছি, কিন্তু তার মহিমা এত বিশাল যে সব কিছু আমার সব সময় মনেও থাকে না, তবে আমি যতটা জানি বলছি’। এখানে সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নামের মহিমা কীর্তন করছেন।

সঞ্জয় বলছে – শ্রীকৃষ্ণ, তিনি হচ্ছেন সর্বপ্রাণীর বাসস্থান, আবার তিনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বাস করেন, সেইজন্য তিনি হচ্ছেন বসু। সমস্ত দেবতাদের তিনি উৎপত্তি স্থান, সমস্ত দেবতারা তার মধ্যে, তাই তিনি হলেন দেব। এই দুটো ‘বসু’ আর ‘দেব’ মিলিয়ে শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম বাসুদেব। সর্ব প্রাণি আর সর্ব দেবতাদের বাস তাঁর মধ্যে।

তিনি যেহেতু বৃহৎ, তাই তাঁর নাম বিষ্ণু। অবশ্য বিষ্ণু নামের আরো অনেক ব্যাখ্যা আছে। ব্রহ্ম হচ্ছে বৃহৎ, যার থেকে বড় আর কিছু নেই অথবা যার বাইরে আর কিছু নেই। মৌন, ধ্যান ও যোগ এগুলির দ্বারা তাঁকে বোধ করা হয় সেই হেতু তাঁর আরেকটি নাম মাধব।

মধুর অর্থ পৃথিবী, আর তার যত উপাদান, সেই সব কিছুর অধিষ্ঠান হচ্ছেন তিনি, সেইজন্য তাঁর নাম মধুসূদন। এর অন্য একটা অর্থও আছে। মধু নামে এক দৈত্যকে তিনি বধ করেছিলেন বলে তাঁর নাম মধুসূদন। কিন্তু এখানে সংস্কৃত শ্লোকের যে অর্থ করা হয়েছে তার মানে এটাই হবে – মধু মানে পৃথিবী – এর যত তত্ত্ব আছে সব কিছু তিনি ময়। তাঁর মধ্যই সব তত্ত্ব রয়েছে। কিসের? মধুর। কৃষ ধাতুর অর্থ হল সত্তা – সৎ, চিৎ ও আনন্দ। ‘ণ’ হচ্ছে আনন্দ বাচক। এই দুটোকে যখন মিলিয়ে দিলেন, অর্থাৎ সৎ থেকে শুরু করে আনন্দ পর্যন্ত যা কিছু আছে কৃষ ধাতু, আর শেষে ‘ণ’ - সৎ, চিৎ ও আনন্দ কে? কাকে দেখাচ্ছে? কৃষ্ণকে। যিনি আছেন তাঁকে বলা হচ্ছে কৃষ্ণ। কৃষি কাজ যেটা হয় আর যেটা আছে – হয় থেকে আছে পর্যন্ত সব তিনিই, যিনি নিত্য, অক্ষয়, অবিনাশী।

আর পরম ভগবৎ ধাম যেটা তাকে বলা হয় পুণ্ডরীক। পুণ্ডরীক মানে হল ভগবানের নিত্য ধাম, সেখানে যিনি স্থিত হয়ে, অক্ষত ভাবে অবস্থান করেন বলে তাঁর আরেকটি নাম পুণ্ডরীকাক্ষ। এর আরেকটা অর্থ হল – পুণ্ডরীক মানে পদ্ম, যাঁর পদ্ম ফুলের মত চোখ তাঁকে পুণ্ডরীকাক্ষ বলে। যারা দুষ্ট লোক, তাদেরকে তিনি ত্রাস দেন, ভয় দেন তাই তাঁর নাম

জনদর্শন। সত্য থেকে তিনি কখন চ্যুত হননা, তাই তাঁর নাম হল সত্যত। শ্রীকৃষ্ণের আরেকটি নাম আর্ষভ। আর্ষ মানে বেদ, আর্ষপ্রিয়, ঋষিদের কাছে বেদ প্রিয়। বেদে তিনি ভাষিত, বেদের দ্বারা তাঁকে জানা যায় সেইজন্য তাঁর আরেকটা নাম হল আর্ষভ। আবার ব্যাকরণের কিছু নিয়ম আছে, সেই নিয়ম দিয়ে যখন আর্ষভ শব্দকে ব্যবহার করা হয় তখন তাঁর নামে হয়ে যায় বৃষবিক্ষণ, বৃষভ মানে ষাঁড়, আর এক্ষণ।

তাঁর আরেকটা নাম হল অজ। যদিও বলা হয় ‘যশোদা গর্ভ সম্ভবা’। কিন্তু তিনি মানুষের গর্ভে জন্ম নেন না, ভগবান কিনা, সেইজন্য তাঁর নাম অজ। তিনি হচ্ছেন স্বয়ং প্রকাশ। তিনি যদি না জানান তাহলে তাঁকে জানা যাবে না। তাই তিনি উৎকৃষ্ট রূপে প্রকাশিত। যে কোন জিনিষকে অন্য কোন আলো উদ্ভাসিত করবে। যেমন এখানে এই বইটা আছে। এখানে টিউব লাইটের আলো পড়ছে বলেই আমি বইটাকে দেখতে পারছি। কিন্তু যেটা স্বয়ং প্রকাশ, brilliant light, সেটা নিজেই জ্বলছে। টিউব লাইটের আলোটাও অন্য কিছুর জন্য জ্বলছে। কিসের জন্য? বিদ্যুতের জন্য। বিদ্যুত কোথা থেকে আসছে? এই রকম পেছোতে পেছোতে আমরা সূর্যে পৌঁছে যাব। সূর্যকে কে প্রকাশ করছে? সেখানে নানান ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও বিকিরণ চলছে, সেগুলো কে করছে? স্বয়ং প্রকাশতো তাহলে কেউ হলো না। একমাত্র ঈশ্বরই হলেন স্বয়ং প্রকাশ। স্বয়ং প্রকাশ হবার জন্য তিনি হলেন উৎকৃষ্ট – সেইজন্য তার আরেকটা নাম হল উদর। এমনিতে উদর মানে পেট। পেট হল উৎকৃষ্ট। মানুষ এই পেটের জন্যইতো বেঁচে আছে। তাই মানুষের উদর হল উৎকৃষ্ট। আর তিনি হলেন ‘দম’ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযমে অবস্থিত। আবার ঐদিকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ – এই দম আর উদর মিলিয়ে হয়ে গেল দামোদর। তাই শ্রীকৃষ্ণের আরেকটা নাম হল দামোদর। তিনি সব সময়ই ইন্দ্রিয় সংযমে অবস্থিত আর অন্য দিকে তিনি স্বয়ং প্রকাশ, সেইজন্য তিনি হলেন উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট বলে তিনি উদর – এই ‘দম’ আর ‘উদর’ দুটোকে মিলিয়ে শব্দটা হল দামোদর। দামোদরের আরেকটা অর্থও আছে। তাঁকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল বলে তাঁকে দামোদর বলে। এগুলি হচ্ছে বিভিন্ন শব্দের খেলা। আর বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু মহাভারতে এইভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তিনি সব সময় আনন্দে থাকেন, তাই সব সময় তিনি হর্ষিত, ওনার দুঃখ বলে কিছু নেই। আর সব কিছুর তিনি হচ্ছেন ঈশ, ঈশ্ শব্দের মানে হল মালিক, ভগবান। হর্ষ যুক্ত আর ঈশ্ একসঙ্গে হয়ে তাঁর নাম হল হর্ষিকেশ। ঈশ্ হচ্ছে যিনি শাসন করেন। ভগবান সব কিছুর শাসন করেন। ঈশা শব্দটা এইখান থেকেই এসেছে। খ্রীস্টানরা যিশুকে বলে Jesus কিন্তু আমরা বলি ঈশা। ঈশোপনিষদের প্রথম লাইনটাই হচ্ছে ‘ঈশাবাস্যমিদং সর্বং’ – তিনি সব কিছুকে নিয়মন করেন।

তিনি দুই হাত দিয়ে পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ধরে আছেন সেইজন্য তাঁর আরেক নাম মহাবাহু। শ্রীকৃষ্ণ যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থা থেকে তাঁর কখনই পতন হয়না। আমরা যেমন আগে একটা অবস্থায় ছিলাম, সেখান থেকে আমাদের অনেক ক্ষয় হয়ে এখন যে অবস্থায় এসেছি সেটা আগের অবস্থা থেকে ক্ষয় হতে হতে ক্ষীণ অবস্থায় আমাদের পতন হয়েছে। লোকে বলে পঁচিশ তিরিশ বছরের পর থেকে শরীরটা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে অবস্থায় আছেন সেখান থেকে তিনি কখন ক্ষীণ হন না, তাঁর কখন পতন হয় না। সেইজন্য তাঁর আরেক নাম হল অধোকসজ্জ, অধোক ও উৎসজ্জ। অধোক মানে অধ অর্থাৎ নীচের দিকে, মানে শ্রীকৃষ্ণের যে স্বরূপ সেখান থেকে কখন তাঁর কখন নীচের দিকে পতন হয়না। আর সব জীবের তিনি আয়ণ - আয়ণ, মানে আশ্রয়। সেইজন্য তাঁর আরেক নাম নারায়ণ, নরান্য আয়ণ। নর মানে মানুষ আর তাদের সবার আশ্রয়, তাই থেকে নারায়ণ।

তিনি সর্বত্র পরিপূর্ণ – infinite – মানে তাঁর বাইরে আর কিছু নেই। তিনি সবারই নিবাস স্থান, অর্থাৎ আশ্রয়, সেইজন্য তাঁর নাম হচ্ছে পুরুষ। পুরুষ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ সদনাং চাপি। পুর মানে সবটা, সদনাং মানে আশ্রয়। আর সব মানুষের মধ্যে তিনি উত্তম সেইজন্য তাঁর নাম পুরুষোত্তম। তিনিই হচ্ছেন সেই স্থান যেখান থেকে সৎ আর অসৎ এই দুটোর উৎপত্তি হয়। সৎ আর অসৎ শব্দ দুটি খুব জটিল, আর শাস্ত্রে এই দুটো শব্দকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে নেওয়া হয়েছে। যেই যেই পরিপ্রেক্ষিতে এই দুটো শব্দ দুটো যখন আসবে তখন সেই অনুসারে এর ব্যাখ্যা করে দেওয়া হবে। এখন শুধু জেনে নিই সৎ মানে যেটা আছে আর অসৎ মানে যেটা নেই। কিন্তু অনেক সময় সৎ এর অর্থ ভগবান অর্থে বলবে আবার কখন মায়ার অর্থেও বলবে। আবার অসৎ মায়ার অর্থেও নেয় আবার যে জিনিষটা নেই সেই অর্থেও নেয়। মূল কথা হল যেটা আছে সেটা সৎ আর যেটা নেই সেটা অসৎ - আর দুটোরই নিবাসস্থান শ্রীকৃষ্ণ, তাই তাঁর নাম সর্ব। বিষ্ণু সহস্রনামে সর্ব শর্বঃ বলছে, ‘স’ও আছে আবার ‘শ’ ও আছে, কিন্তু এখানে ‘স’ কে আনা হয়েছে।

তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত আর সত্য তাঁতে প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য তাঁর একটি নাম সত্য। তিনি যখন বামন অবতারণা করেছিলেন তখন তাঁর দুই চরণ দিয়ে পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন, তৃতীয় চরণ কোথায় রাখবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। এই যে বিক্রমণ, মানে যা কিছু আছে সব কিছুকে অতিক্রম করে যাওয়া, সেইজন্য তাঁর নাম হচ্ছে বিষ্ণু। বিষ্ণু নাম কেন হল? তিনি সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছেন। অথচ আমরা যখন শাস্ত্র পড়ব তখন বিষ্ণু শব্দের অন্য অর্থ পাবো। একই শব্দের অনেক অর্থ আসবে। আপনি এভাবেও ব্যাখ্যা করতে পারেন আবার ওভাবেও ব্যাখ্যা করতে পারেন। আগেকার দিনে যেসব কথাকাররা ছিলেন, বিশেষ করে ভাগবতাদির পণ্ডিতরা ভাগবতে এসে নিজেদের পাণ্ডিত্য দেখার সুযোগ পেয়ে যান। ভাগবতেই পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য পরীক্ষা হত। একটি শব্দকে পঁচিশ ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারা যায়। আর যে যত ভালো ব্যাখ্যা করতো তার প্রবচন ততো ভালো বলত। এগুলো সবই পুরোপুরি সংস্কৃত ভাষার খেলা। যে যত বড় জ্ঞানী হবেন, তিনি তত বেশী ব্যাখ্যা করবেন। মাধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদীর দার্শনিক, তিনি সংস্কৃতে বিশাল পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভাগবতের উপর একটা ভাষ্য লিখেছেন। তিনি বলছেন যে প্রত্যেকটি শ্লোকের নাকি ছত্রিশ ভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। এখানেই আগে যে বিষ্ণুর ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেটার অর্থ হচ্ছে বৃহৎ - বৃহত্তাৎ বিষ্ণোচ্চ্যতে। তাঁর থেকে বড় কিছু নেই। আর এখানে বলছে তিনি সব কিছুকে অতিক্রম করে যাচ্ছেন। এর অর্থ একই।

আর সবারই উপর তিনি বিজয় পান তাই তাঁর নাম বিষ্ণু – শব্দটা হচ্ছে জয়নাদ - সবারই উপর তিনি জয় পান। শাস্ত্রাত্মক - তিনি শাস্ত্র, চিরদিন আছেন তাই তাঁর নাম অনন্ত। ভগবান চিরদিন আছেন। তিনি গুরুগুলোকে জানেন, গো কে জানেন বলে তাঁর নাম হচ্ছে গোবিন্দ। আমাদের যে চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ত্বক এগুলিকে বলা হয় গোলক। তবে এগুলি ঠিক ঠিক ইন্দ্রিয় নয়, প্রকৃত ইন্দ্রিয় হচ্ছে এইগুলির পেছনে যে মস্তিষ্কে subtle power রয়েছে সেটা। গোচর – যেখানে গুরু বিচরণ করে, চরে বেড়ায়। ইন্দ্রিয় জগৎটা হচ্ছে গোচর। শ্রীকৃষ্ণ গুরু চরাতেন এর তাৎপর্য হল আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলি আছে, সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন ভগবান নিজে। তাঁর ইচ্ছাতেই ইন্দ্রিয়গুলি চলে। কোথায় চরে বেড়ায়? আপনার মন এক সময় একদিকে যায় আবার অন্য সময় আরেক দিকে যায়। মন চারণ করছে। আর তাকে চারণ করাচ্ছেন ভগবান – সেইজন্য তাঁর নাম গোবিন্দ। হিন্দুদের যেটা মত তাতে বলছে আমাদের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। সেই দেবতার জন্য ইন্দ্রিয়গুলি ঐভাবে চলে। যেমন চোখের দেবতা হচ্ছেন আদিত্য। সূর্য দেবতা যেমনটি চাইবেন চোখ সেই রকমটি দেখবে। এখন আদিত্যের প্রশংসা করে যদি খুব স্তুতি করে বলা হয় – হে আদিত্য আমার ভালো জিনিষ দেখার স্পৃহা যেন শেষ হয়ে যায়। তা তিনি ইন্দ্রিয়কে এমন করে দেবেন, ভালো জিনিষ নজরে পড়লেও তাতে আর আকৃষ্ট হবে না। ঠিক তেমনি মনের দেবতা হচ্ছেন চন্দ্রমা। তা চন্দ্রমার কাছেও প্রার্থনা করা যেতে পারে। পূর্ণিমা অমাবস্যাতে অনেকের পাগলামোটা বেড়ে যায়। এদের বলে lunatic patient, lunar থেকে এসেছে। এই চন্দ্রমা হলেন মনের দেবতা। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের যত দেবতা আছেন, সবার আবার মালিক হলেন ভগবান। সেইজন্য যাকে গোলক বলছে, অর্থাৎ যেখানে গো চাড়ণ হয়, গুরুগুলো চড়তে যায়, সেই গুরুগুলিকে চালান বলে তাঁর নাম গোবিন্দ।

সঞ্জয় যে শ্রীকৃষ্ণের এত মহিমার কথা শোনালেন, এর উদ্দেশ্যই হল সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে শ্রীকৃষ্ণ হলেন ভগবান, সেইজন্য এই মারামারি কাটাকাটি না করে সব কিছু মিটমাট করে নেওয়াটাই সবার পক্ষে মঙ্গল, বিশেষ করে কৌরবদের জন্য। ধৃতরাষ্ট্রের মনের মধ্যেও একটা ভয় ঢুকে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি ঠিক করতে পারছিলেন না কি করবেন, একদিকে বুঝতে পারছেন শ্রীকৃষ্ণ যে পক্ষে থাকবেন সেই পক্ষের বিজয় নিশ্চিত আবার অন্য দিকে পুত্র স্নেহে দুর্যোধনের কথাকেও অগ্রাহ্য করে বিপরীত কিছু বলতে পারছেন না। পরের দিকে এক জায়গায় ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বলবেন, ‘দেখো আমার তো রাজা হওয়ার কথাই ছিল না, যেহেতু আমি অন্ধ। আমি যদি রাজা নাই হতে পারতাম তাহলে তুমি এই যে কেবল রাজা, রাজত্ব নিয়ে এত উন্মত্ত হয়ে উঠেছ, এগুলোর তো কোন প্রশ্নই তোমার জীবনে থাকত না’। একদিকে ধৃতরাষ্ট্রের এই সমস্যা ছিল আবার অন্য দিকে এটাও ধৃতরাষ্ট্রের মাথায় ছিল যুধিষ্ঠির যদি রাজা হয়ে যায় তাহলে উনি আর কিছুই থাকবেন না, দুর্যোধনরাও একেবারে সাধারণ কিছু হয়ে যাবে, এই দুশ্চিন্তাটাও তাঁর ছিল। অর্থ আর ধর্মের মধ্যে যখন সজ্ঞাত বেঁধে যায় তখন খুব জটিল সমস্যা হয়ে যায়। আমাদের মনে অনেক রকম ইচ্ছা থাকলেও করতে পারিনা। ধৃতরাষ্ট্র শারীরিক দিক দিয়েও অন্ধ ছিলেন আবার মোহেও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারছেন এগুলো ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু মোহের জন্য কিছু করতে পারছেন না। একদিকে সন্তানের প্রতি মোহ অন্য দিকে নিজেরও রাজসিংহাসনের প্রতি যে লোভ ছিল সেই লোভ থেকে বেরোতে পারছেন না।

এদিকে পাণ্ডবদের শিবির থেকে যুধিষ্ঠিরের দূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ শান্তির বার্তা নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের দরবারে এসেছেন, শেষ একটা চেষ্টা করতে যাতে যুদ্ধকে আটকে দিয়ে একটা সর্বসম্মত সমাধান খুঁজে বার করা যায়।

এরপর শুধুই যুদ্ধের কথা আসবে। যুদ্ধের কথাতে আমাদের খুব একটা প্রয়োজন নেই। আমরা এখানে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে জানতে এসেছি। যেখানে যেখানে ধর্ম, অর্থ ও কামের কথা আসবে সেখানে একটু জোর দিয়ে আলোচনা করা হবে, যদিও এখন আর মোক্ষের কথা আসবে না। আমরা হিন্দু সমাজের বর্তমান চিন্তাধারাতে বড় হয়েছি, এই চিন্তাধারা আর আমাদের পরম্পরা চিন্তাধারা এক নয়। কোথায় এক নয় সেগুলোকে আমাদের বুঝতে হবে। বর্তমান চিন্তাধারা হচ্ছে অর্থের প্রতি লোভ করবে না, ভোগের দিকে যাবে না। কিন্তু হিন্দুরা কখনই অর্থ বিমুখ আর ভোগ বর্জিত ছিলেন না। মহাভারতে এই অর্থ বিমুখতা আর ভোগ বর্জিত ধারণার উপর বারবার আঘাত করা হয়েছে। কারণ গৃহস্থের পক্ষে ধর্ম, অর্থ আর কাম খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সন্ন্যাসীদের জন্য একমাত্র মোক্ষ। এখন সব উল্টো হয়ে গেছে, গৃহস্থরা সন্ন্যাসীর ধর্ম নিচ্ছে আর সন্ন্যাসীরা গৃহস্থের ধর্ম নিচ্ছে। এই ব্যাপারে একটা মজার ঘটনা আছে। ঠাকুরের মহাসমাধির পর স্বামীজী মঠ স্থাপন করলেন। রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) মঠের প্রথম অধ্যক্ষ হয়েছেন। একদিন তাঁরই এক গুরুভাই দৌড়ে এসে রাজা মহারাজকে খবর দিচ্ছেন ‘মহারাজ! অমুক লোকের স্ত্রী মারা গেছে, তার আর কোন কিছুতে মন নেই। এখন এই লোকটি বিরাট অঙ্কের টাকা সব মঠকে দান করে দিতে চাইছে’। এটা একটা ভালো খবর লোকটার মধ্যে বৈরাগ্য এসেছে। রাজা মহারাজ শুনে বললেন ‘হ্যাঁ দাদা! এই লোকটি আমাদের মত সন্ন্যাসীদের সঙ্গে থেকে থেকে বৈরাগ্যবান হয়ে গেল, আর আপনি গৃহস্থদের সঙ্গে থেকে থেকে আপনার গৃহস্থ বুদ্ধি হয়ে গেছে’।

যুধিষ্ঠির এবার পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভাবে যুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে। যা যা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যুদ্ধকে এড়ান যাবে না। যুধিষ্ঠির এখন খুব দুঃখের মধ্যে পড়ে গেছেন, কারণ যুদ্ধ যখন শুরু হবে তখন কত প্রাণ হানি হবে, কত আত্মীয়-স্বজনদের হারাতে হবে কেউ ভাবতেই পারছে না। আবার যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন পথও নেই। এই ধরনের পরিস্থিতি আমাদের জীবনেও অনেক সময় আসে, আমার খুব ঘনিষ্ঠ কারুর খুব মারাত্মক কোন দুর্ঘটনা হয়েছে এখন তাকে বাঁচাতে হলে তার একটা অঙ্গহানি হয়ে যাবে, সেই সময় আমরা সত্যিই অসহায় হয়ে যাই, কিছুই করার থাকে না।

### দারিদ্রতার অভিশাপ ও পরিণাম – যুধিষ্ঠিরের আক্ষেপ

শ্রীকৃষ্ণ আর কিছুক্ষণ পর পাণ্ডবদের শান্তিদূত হয়ে কৌরবদের রাজদরবারে যাবেন। তাঁর আগে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর দুঃখের কথা বলছেন। ‘হে শ্রীকৃষ্ণ! মানুষ যখন পতিত হয়ে যায় তখন তার কাছ থেকে সমাজের লোকেরা সরে যায়। মৃত্যুর সময় প্রাণ যেমন প্রাণির দেহকে ছেড়ে বেরিয়ে যায়, ঠিক তেমনি যারা প্রাচুর্যের অবস্থা থেকে পড়ে গিয়ে দরিদ্র অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তার যত সম্বন্ধী, জ্ঞাতীভাইরা তাকে ছেড়ে চলে যায়, এটা মৃত্যু থেকেও জঘন্য’। প্রাচীন কালে শম্বর নামে এক ঋষি ছিলেন। যুধিষ্ঠির বলছেন ‘শম্বর ঋষি বলেছিলেন *নাভঃ পাপীয়সীং কাঞ্চিদবস্থাং শম্বরোহব্রবীৎ। যত্র নৈবাদ্য ন প্রভোজনং প্রতিদৃশ্যতে।* ১৫/৬৭/৩০। দারিদ্র অপেক্ষা কষ্টজনক কোন অবস্থাই নেই। সব থেকে দুঃখজনক কথা হল আজ কি খাব ঠিক নেই আর কাল কি খাব ঠিক নেই, এর থেকে দূরবস্থা কারুর হতে পারেনা। এমন আছে যে আজকে হয়তো খাবার দাবার নেই কিন্তু জানি কাল ঠিক জুটে যাবে। কিন্তু আজকেও খাবার ঠিক নেই কালও খাবার জুটবে কিনা কোন ঠিক নেই, এর থেকে দুঃখের কিছু নেই’। যুধিষ্ঠির বলছেন ‘*ধনমাহুঃ পরং ধর্মং ধনে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্। জীবন্তি ধনিনো লোকে মৃতা যে ত্বধনা নরাঃ।* ১৫/৬৭/৩১। বিচক্ষণ লোকেরা বলে ধনই প্রধান ধর্মসাধক। মানে টাকা পয়সাতেই পরম ধর্ম, টাকা পয়সাতেই পরম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। যাদের টাকা পয়সা আছে তারাই ধর্ম করতে পারে’। এখানে জপ-ধ্যান, গঙ্গান্নান করাকে ধর্ম বলা হচ্ছে না। এখানে ধর্ম মানে যজ্ঞ-যাগ করা। মহাভারতের সময় সবে বেদের যজ্ঞের প্রভাব থেকে সরে আসতে শুরু হয়েছে। একটার সাথে আরেকটাকে মিলিয়ে না দেখা হলে মহাভারত বুঝতে অসুবিধা হয়ে যাবে। বর্তমান যুগে ধর্মের পরিভাষা হল জপ-ধ্যান করা, উপোস করা, মন্দিরে যাওয়া, বিগ্রহকে ফুল চন্দন দিয়ে সাজান। এগুলোই ধর্ম। কিন্তু এখানে যুধিষ্ঠির ধর্ম বলতে তা বলছে না। ধর্ম মানে প্রথম যজ্ঞ-যাগ করতে হবে, দ্বিতীয় তীর্থাদি করতে হবে আর তৃতীয় দান করতে হবে। এই তিনটেই ধর্মের প্রধান অঙ্গ। যুধিষ্ঠির বলছেন যার টাকাই নেই সে যজ্ঞ কি করে করবে, তীর্থাদি কি দিয়ে করবে আর দানই বা কোথেকে করতে পারবে। সেইজন্য বলছেন ধর্ম টাকা পয়সাতেই প্রতিষ্ঠিত। এখন পাণ্ডবদের কিছুই নেই, বিরাট রাজ্যে সবাই বসে আছে আর বিরাট রাজা খেতে দিচ্ছে বলে খেতে পাচ্ছে।



গতকাল তুমি যত বড়ই রাজা থেকে থাক আজকে তোমার কিছুই নেই। সেইজন্য যুধিষ্ঠির খুব দুঃখ করে শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলছেন।

জীবন্তি ধনিনো লোকে মৃত্যু য়ে তুধনা নরাঃ। যুধিষ্ঠির বলছেন, যাদের কাছে টাকা পয়সা আছে তারা ই জীবন্ত মানুষ, যাদের টাকা পয়সা নেই তারা বেঁচে থেকেও মৃত। এইটাই ভারতের ঠিক ঠিক পরম্পরা ধর্ম, এগুলোকে কেউ সামনেই নিয়ে আসেনা, আর মহাভারতও কেউ পড়ে না। যাদের কাছে ক্ষমতা আছে, আর যখন নিজের ঐ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থেকে কোন মানুষের টাকা-পয়সাকে যদি কোন রকমে নষ্ট করে দিতে পারে, তাহলে বুঝে নিন তার অর্থতো গেলই সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মটাও গেল আর কামটাও গেল। গৃহস্থের তিনটে পুরুষার্থ, ধর্ম, অর্থ আর কাম। মোক্ষ কখনই গৃহস্থের পুরুষার্থ হতে পারেনা। এখন গৃহস্থের অর্থকে যদি কোন রকমে নাশ করে দেওয়া যায় তাহলে তার তিনটে পুরুষার্থই নষ্ট হয়ে যাবে। ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটেই যদি কারুর চলে যায় তাহলে তার মানব জীবনটাই নিষ্ফল হয়ে গেল। এইটাই হল বাস্তব চিত্র।

যুধিষ্ঠির বলছেন ‘এতমাবস্থাং প্রাপ্যৈকে মরণং ব্রিরে জনাঃ। গ্রামায়ৈকে বনায়ৈকে নাশায়ৈকে প্রব্রজুঃ।।৫/৬৭/৩৩। সেইজন্য কেউ যখন নির্ধন অবস্থায় চলে গিয়ে দরিদ্র হয়ে যায় তখন অনেকেই নিজের বাসস্থান ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়ে দেশ ছাড়া হয়ে যায়। অনেকে জঙ্গলে চলে যায়। কেউ কেউ নিজের প্রাণকেও বিসর্জন দিয়ে দেয়’। একজন ব্রিটিশ লেখক, প্রথম জীবনে তিনি ডাক্তার ছিলেন, পরের দিকে অনেক ভালো ভালো বই লেখেন। একদিন মাঝ রাত্রে কোন রুগীকে দেখতে গিয়ে দেখেন একটা অল্প বয়সী ছেলে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। ছেলেটি অফিস থেকে টাকা-পয়সা চুরি করে রেসে লাগাতো। রেসে সব টাকাই সে হেরে যেত। শেষে কুড়ি পাউণ্ডের মত ছেলেটির ধার দেনা হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটিকে ডাক্তার আত্মহত্যা করা থেকে জোর করে তুলে ছেলেটির বাড়িতে নিয়ে গেছেন। সেই সময় পুলিশও ধার দেনার জন্য ছেলেটিকে ধরতে এসেছে। তখন ডাক্তার খুব দুঃখ করে ভাবছেন এই কুড়ি পাউণ্ডের জন্য একটা ছেলে নিজের জীবন দিয়ে দিচ্ছিল! মানুষের একটা জীবনের দাম মাত্র কুড়ি পাউণ্ড! ডাক্তারের নিজেরও সেই রকম ভালো পসার ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পুলিশকে বললেন এই টাকাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি যাতে ওর ধার দেনাটা মিটে যায়। বাড়িওয়ালাও বলল আমি আর দু মাস এর থেকে বাড়িভাড়া নেব না। আর পুলিশও বলল আমি আর কেসটা লিখবো না। ওখানেই সব কিছু মিটে গেল। এই ঘটনার অনেক বছর পর ডাক্তার জাহাজে করে আমেরিকায় যাচ্ছিলেন। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখছেন দূর থেকে একটা হ্যাণ্ডসাম লোক বারবার ডাক্তারের দিকে তাকাচ্ছে আর তার বউকে ডাক্তারের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। শেষে লোকটি কাছে এসে ডাক্তারকে বলছে ‘স্যার! আমাকে আপনার মনে আছে? সেই রাতে আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন’। টাকার অভাবে ধার দেনায় ডুবে গিয়ে যে ছেলেটি একদিন আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল তাকে এই ডাক্তার টাকা দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন। সেই ছেলে তারপর রেস খেলা বন্ধ করে দিয়ে ভালো ও সুস্থ জীবন যাপন করতে শুরু করে। ইতিমধ্যে বিয়ে করে এখন আমেরিকায় যাচ্ছে। মানুষ যখন অভাবে পড়ে তখন মনে করে জীবনে আর কিছু নেই। যুধিষ্ঠির ঠিক এই কথাই শ্রীকৃষ্ণকে বোঝাচ্ছেন। বলছেন ‘উন্মাদমেকে পুষ্যন্তি যান্ত্রান্যে দ্বিষতাং বশম্। তাস্যামেকে চ গচ্ছন্তি পরেষামর্থকারণাৎ।।৫/৬৭/৩৪। কত লোক অভাবে পড়ে দৃষ্টিভ্রান্ত হয়ে যায়। টাকা-পয়সার অভাবে এমনও হয় যারা তার শত্রু, যাদের সঙ্গে সে কোন দিন কথা বলবে না বলে ঠিক করে রেখেছিল, তাদের কাছেও হাতজোড় করে দাঁড়ায়। অনেকে আবার অপরের দাসত্ব গ্রহণ করতেও কোন কুণ্ঠা বোধ করেনা’। দ্রোণাচার্যেরও এই একই অবস্থা হয়েছিল। টাকা-পয়সা নেই, ছেলেকে একটু দুধ খাওয়াবার সামর্থ্যও নেই, তখন এত বড় গুণী লোক হয়েও দাসত্ব করবার জন্য ভীষ্মের দরবারে গিয়ে হাত পাততে হয়েছে। যুধিষ্ঠির নির্ধনদের নিয়ে এই রকম অনেক কথা বলে যাচ্ছেন।

যুধিষ্ঠির শেষের দিকে খুব মূল্যবান একটা কথা বলছেন ‘ন তথা বাধ্যতে কৃষ্ণ! প্রকৃত্য নির্ধনো জনঃ। যথা ভদ্রাং শ্রিয়ং প্রাপ্য তয়া হীনঃ সুখৈধিতঃ।।৫/৬৭/৩৭। হে কৃষ্ণ! যারা জন্ম থেকেই দারিদ্রতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে আসছে তারা অত কষ্ট পায়না। কিন্তু যারা একবার সুখ ভোগ করেছে, জীবনে স্বচ্ছন্দ দেখেছে, প্রচুর সম্পত্তি ছিল, শ্রী ছিল কিন্তু সব ধন সম্পদ নষ্ট হওয়ার পর তাদেরকে অনেক বেশী কষ্ট পেতে হয়’। সেইজন্য বলে জীবনে বড় হওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। ছেঁড়া কাঁথা থেকে বড় হওয়াতে আহামরি কিছু নেই। ধনী থেকে যারা ছেঁড়া কাঁথায় চলে যায় তাদের কাহিনীই ঠিক ঠিক কাহিনী। জর্জ বার্নার্ড শ খুব উচ্চ বংশের লোক ছিলেন। কিন্তু তাদের বংশের নিয়ম ছিল

যখন সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা হত তখন বড় ছেলেই সিংহ ভাগটা পেতে, তার পরের ছেলেদের কপালে বিশেষ কিছু জুটত না। এই ধারাটা ব্রিটেনেই তখন ছিল। জর্জ বার্গাড'শও একদিন দেখছেন তার ভাগে কিছুই নেই। তারপর তিনি নিজের বাসস্থান ছেড়ে আয়ারল্যান্ডে থাকতে শুরু করলেন, সেখান থেকে আবার ইংল্যান্ডে এলেন, খুব লড়াই করে তাঁকে বড় হতে হয়েছিল। তারপর তো তিনি লড়াই করতে করতে লেখক হিসাবে খুব নাম করলেন। তিনিও এই কথাই বলছেন – আমরা শুনি জর্জ ওয়াশিংটন সামান্য একটা খামার বাড়ির ছেলে, সেখান থেকে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, এটা এমন কিছুই নয়। কিন্তু যারা ওপরের দিকে ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যের কারণে তাদের পতন হয়ে গেছে, আবার সেখান থেকে যারা ওপরে উঠে এসেছে এরাই ঠিক ঠিক গ্রেট।

ধনী যখন নির্ধন হয়ে যায়, ওপর থেকে নীচে পড়ে যায় তখন তার ভেতরে ক্রোধ জন্ম নেয়। ক্রোধ জন্মালেই মোহগ্রস্ত হয়ে যাবে। ব্যাসদেবের এটা খুব দৃঢ় মত, ক্রোধ হলেই মোহ আসবে। আমরাও এটা বুঝতে পারি, ক্রোধ হলে নিজের উপর আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেলে তার বিবেকশক্তিও নষ্ট হয়ে যায়, তখন সে নানা রকমের ক্রুর কর্ম করতে শুরু করে। গরীব লোকরা কখনই ক্রুর কর্ম করে না, কিন্তু যারা এক সময় টাকা পয়সা দেখেছে, এখন খারাপ অবস্থায় পড়ে গেছে, আর নিজেকে সামলাতে পারছে না, তখনই তারা ডান দিক বাঁ দিক করতে থাকে। ইদানিং খবরের কাগজে প্রায়ই দেখা যায় দিল্লী, মুম্বাইয়ের অনেক বড় বাড়ির ছেলেরা আজকাল প্রচুর গোলমাল করছে, কিডন্যাপিং করছে, খুন করছে, ছিনতাই করছে। কারণ এক সময় হাতে কাঁচা টাকা এসে গিয়েছিল, এখন কোন কারণে সেই টাকার যোগানটা বন্ধ হয়ে গেছে তাই ভুল পথে চলে গিয়ে অর্থের যোগানটাকে বজায় রাখতে চাইছে।

যুধিষ্ঠির এখানে দুটি শ্লোকে খুব সুন্দর বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছেন মানুষ কখন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। *প্রজ্ঞালাভে হি পুরুষঃ শাস্ত্রাণ্যেবাব্যবেক্ষতে। শাস্ত্রনিষ্ঠঃ পুনর্ধর্মং তস্য হ্রীরঙ্গমুত্তমম্। হ্রীমান্ হি পাপং প্রদোষ্টি তস্য শ্রীরভিবর্দ্ধতে। শ্রীমান্ স যাবত্তবতি তাবত্তবতি পুরুষঃ।।৫/৬৭/৪৩-৪৪।* মানুষের যখন ঠিক মত ধন সম্পদ থাকে এবং সাথে ধর্মও যদি থাকে তখন তার মধ্যে প্রজ্ঞা আসে, প্রজ্ঞা মানে ঠিক ঠিক বিবেক বিচার, যেখানে মোহ বলে কিছু থাকে না। প্রজ্ঞা থেকে শাস্ত্র কথায় বিশ্বাস জন্মায়, অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা আসে। কেউ যদি আমাদের মজা করে প্রশ্ন করে – এই যে আপনারা এত শাস্ত্র আলোচনা শুনতে যান, আচ্ছা আপনারদের কখন মনে হয় না যে শাস্ত্রে আধ্যাত্মিক ব্যাপারে, ধর্মের ব্যাপারে ও মুক্তির সম্বন্ধে যেসব কথা বলা হয়েছে সবই ধাপ্পা ও আজগুবি। তখন তাকে বলতে হয় – যে মন দিয়ে আমি বলব এগুলো সব ধাপ্পা ও আজগুবি সেই মনই তো আবার বলছে শাস্ত্রটা ঠিক। তাহলে এর তো কোন দিন মীমাংসা হবে না। সেইজন্য কোথাও বিশ্বাসটাকে স্থির করে রাখতে হয়। কোথাও একটা বিশ্বাস রাখতে হবে, হয় শ্রীকৃষ্ণের কথায় বা শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় আর তা নাহলে নিজের বুদ্ধিতে। যারা আসুরিক বৃত্তি সম্পন্ন তারা বলে ‘আমি বিশ্বাস করি আমার উপর’। এখানেও এক জায়গায় বিশ্বাস রাখতে হচ্ছে। কোথায়? নিজের বুদ্ধিতে। কিন্তু বুদ্ধি আজকে একদিকে যাচ্ছে কাল আবার আরেক দিকে চলে যাবে, এই সমস্যা থেকে যাবে। যারা আরও বুদ্ধিমান তারা নিজের বুদ্ধির উপর ভরসা করে না। তখনই আসে, গীতায় যেটা বলছে *তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে*, শাস্ত্রে যেটা বলা হয়েছে সেটাকে বিশ্বাস কর। কারণ তোমার বুদ্ধি ঠিক নেই, একটা ছেলে আজকে বলছে আমি এই মেয়েকে বিয়ে করব, কালকে বলবে আমি ঐ মেয়েকে বিয়ে করব পরশু অন্য মেয়েকে বিয়ে করব বলবে। এদের তো বুদ্ধির কোন ঠিক নেই, তখন তাদের বলা হয় তোমার বাবা-মা যা ঠিক করবে তাই করতে হবে। এই সব ব্যাপারে আমাদেরও ঠিক তাই করতে হবে। আমাদের কথা মত ধর্ম বিচার করা যাবে না, ধর্মগ্রন্থ যেটা বলছে সেটাই আমাদের মানতে হবে। এই বুদ্ধি যখন এল, আমি শাস্ত্রকেই মানব, এখন আমি গীতা মানছি না কোরান মানছি সেটা কোন গুরুত্ব নয়, একটা শাস্ত্রে নিজেকে স্থিত করে সেখানেই বুদ্ধিটাকে লাগিয়ে রাখাটাই একমাত্র গুরুত্ব। পাশ্চাত্যের লোকদের এই জায়গাটাতে স্বামীজী আমেরিকায় নিন্দা করে বলছেন যে, বৈজ্ঞানিকরা মনে করে মনই হল সব কিছু। কিন্তু মনের তো কোন ঠিক নেই, আজকে এক রকম আচরণ করবে কাল অন্য রকম আচরণ করবে। কিন্তু শাস্ত্র একটাতেই স্থিত হয়ে আছে। গীতার কথা তিন হাজার বছর ধরে চলে আসছে কোথাও তার কোন পরিবর্তন নেই। যখন থেকে আমি বলে দিলাম গীতা আমার মূল গ্রন্থ, এটাই হয়ে গেল প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা মানে বিবেক শক্তিটা জাগ্রত হয়ে গেল। প্রজ্ঞা জাগ্রত হলে ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায়। মুসলমানদের দেখুন তাদের কোরানের প্রতি কি প্রচণ্ড শ্রদ্ধা, কোরানের কোন কথাতে যদি অযৌক্তিক বলে দেওয়া হয় তখন তারা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে যাবে। শাস্ত্রে যখন নিষ্ঠা হয় তখন মানুষ ধর্মের কার্যগুলো করতে থাকে। ধর্মের উত্তম অঙ্গ হল লজ্জা। এখানে লজ্জার আসল সংস্কৃত শব্দ হল হ্রী। আমরা সাধারণ ভাবে লজ্জা বলতে যেটা বুঝি হ্রী বলতে ঠিক সেই লজ্জাকে বোঝায় না, হ্রী এই লজ্জার আরেকটু উপরে। হ্রী

থেকে হয় পাপ নিবৃত্তি। পাপ নিবৃত্তি থেকে হয় শ্রী বৃদ্ধি। শ্রী বৃদ্ধি থেকে আসে শ্রেষ্ঠত্ব, সমাজে তাকে সবাই শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে সম্মান করবে। সংস্কৃত শ্লোকে বলা হচ্ছে *শ্রীমান্ স যাবদ্ব্যবতি তাবদ্ব্যবতি পুরুষঃ*। মানুষ তখনই মানুষ হয় যখন সে শ্রীমান হয়। যিনি শ্রীমান, যারা ধন সম্পদ থেকে শুরু করে সব আছে তিনিই পুরুষ। যুধিষ্ঠির বলতে চাইছেন যার ধন সম্পদ থাকে তার এক এক করে এইভাবে হতে থাকে - ধন সম্পদ → ধর্ম → প্রজ্ঞা → শাস্ত্রে শ্রদ্ধা → ধর্ম কার্যে প্রবৃত্তি → হ্রী (লজ্জা) → পাপ নিবৃত্তি → শ্রী বৃদ্ধি → শ্রেষ্ঠত্ব।

যতক্ষণ টাকা-পয়সা আছে ততক্ষণই সম্মান ততক্ষণই সে শ্রীমান। আমাদের পরম্পরাতে নামের আগে এই কারণেই শ্রী ব্যবহার করা হয়। আসলে বড়দের ক্ষেত্রে শ্রী আর বাচ্চাদের বেলায় শ্রীমান যদিও ব্যবহার করা হয় কিন্তু শ্রীমানটাই ঠিক ঠিক শব্দ, শ্রীমান মানে যার শ্রী আছে। মৃত ব্যক্তিদের কখন শ্রী দিয়ে সম্বোধন করা হয় না। স্বামীজীর বাবা মারা যাবার পর স্বামীজীর পরিবারের সদস্যদের কি তীব্র আর্থিক সঙ্কটে পড়তে হয়েছিল তার ওপর জ্ঞাতিদের মামলা মোকদ্দমাতে জর্জরিত স্বামীজীদের দুবেলা খাবারও জুটত না। সেই সময় স্বামীজী একদিন ঈশ্বরের নামগুণগান করছিলেন, স্বামীজীর মা শুনতেই রেগে গিয়ে বলছেন ‘বন্ধ কর তোর ঐ গান, কি করল তোর ঈশ্বর আমাদের জন্য’! যিনি বিশ্বনাথের আরাধনা করে শিবের বর রূপে নরেন্দ্রনাথ দত্তকে পেয়েছিলেন তিনিই এখন ভগবানকে গালাগাল দিচ্ছেন! মানুষ যখন শ্রী হীন হয়ে যায়, সব টাকা-পয়সা চলে যায় তখন সব কিছুই চলে যায়। ভগবদ্ভক্তি চলে যায়, আর ক্রোধ জন্মায়, ক্রোধ থেকে প্রজ্ঞা হারিয়ে যায়। আর্থিক কষ্টে পড়লে মানুষ কোথায় চলে যেতে পারে তার সব থেকে প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বামীজীর মা। যিনি নাকি একজন ধর্মপরায়ণা মহিলা, স্বামীজী বলছেন ‘আমি যা কিছু পেয়েছি আমার মার কাছ থেকে পেয়েছি’। যিনি কাশীতে বিশ্বনাথের কাছে বিশেষ আরাধনা করে বর রূপে স্বামীজীকে পেয়েছিলেন সেই তিনি বলছেন ‘রাখ তোর ঈশ্বর, আমাকে আর জ্বালাস না’। ঈশ্বরে ভক্তি ধরে রাখা খুব কঠিন। ধর্মগ্রন্থের পাঠ এই জন্যই করতে বলা হয়, ঈশ্বরে ভক্তিটা ধরে রাখার জন্য।

এইসব বলার পর যুধিষ্ঠির বলছেন ‘*ধর্মনিত্যঃ প্রশান্তাত্মা কার্যায়োগবহঃ সদা। নাধর্মে কুরুতে বুদ্ধিং ন চ পাপে প্রবর্ততে।*’ ১৫/৬৭/৪৫। যারা সব সময় ধর্মের অনুশীলন করে যায় তারা কখনই পাপ কর্মের দিকে যায় না। যারা পাট টাইম ধর্ম করে তারাই গোলমাল করে বসে’। এর আগে যুধিষ্ঠির হ্রীর কথা বলেছিল। হ্রী হল লজ্জার ভাব। যারা মদ খায় তারা মদ খেয়ে কি করবে কোন কিছুর ঠিক থাকে না আর তার বোধও থাকে না। আমাদের যদি জামা কাপড় খুলে দিতে বলা হয়, আমরা কখন জামা কাপড় খুলবো না, কারণ আমাদের লজ্জার বোধ আছে। কিন্তু যে মদ খেয়ে আছে তাকে যদি বলা হয় সে খুলে দেবে। হ্রী কাদের থাকে না? যারা বাচ্চা, বাচ্চাদের যদি বলে তোমার জামাটা খুলে দাও তো সে তক্ষুণি হয়তো খুলে দেবে, যে মদ খেয়ে আছে তারও হ্রী থাকে না আর যে নির্লজ্জ। ভদ্রবাড়ি, সুসংস্কৃত বাড়ির ছেলেরা কখনই মেয়েদের দেখে টিটকিরি দেবে না, কিন্তু পাড়ার মস্তানরা দিন রাত এটাই করছে, কারণ এদের হ্রী চলে গেছে। *অহ্রীকো বা প্রমূঢ়ো বা নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্। নাস্যাধিকারো ধর্মোহস্তি যথা শূদ্রস্তথৈব সং।* ১৫/৬৭/৪৬। মানে চোখের লজ্জা যার চলে গেছে আর বিমূঢ়, মানে মোহগ্রস্ত এরা নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্, এরা নারীও না পুরুষও না। বলতে চাইছেন সাবালক যদি চক্ষু লজ্জাহীন হয় আর মোহগ্রস্ত বা মূর্খ হয় তাহলে সে নারীও না পুরুষও না। *নাস্যাধিকারো ধর্মোহস্তি* এদের ধর্মে কোন অধিকার নেই, মানে এরা কোন ধর্মই করতে পারে না। পুরুষের কিছু ধর্ম আছে আর নারীরও কিছু ধর্ম আছে, এখন এরা পুরুষও না নারীও না তাই এরা কিসের ধর্ম করবে? যথা *শূদ্রস্তথৈব সং*, এরাই শূদ্র। তাহলে শূদ্র কারা? যারা মোহগ্রস্ত ও অহ্রীক। আগেকার দিনে যারা শূদ্র ছিল তাদের যদি হ্রী বোধ থাকে আর তারা যদি মোহগ্রস্ত না থাকে তাহলে আদপেই তাদের শূদ্র বলা যাবে না। আসলে মহাভারতের সময় যারা ধর্মকর্ম করত না তাদেরকেই শূদ্র বলা হত। ধর্মকর্ম করতে হলে কি দরকার? ধর্মগ্রন্থে শ্রদ্ধা। ধর্মগ্রন্থে শ্রদ্ধা আনতে কি দরকার? প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা কিভাবে হবে ধর্ম কার্যে প্রবৃত্তি থাকতে হবে। এতগুলো শর্ত জড়িয়ে আছে। সত্যি সত্যিই ধর্ম কার্য করা অত সোজা নয়। হিন্দুদের বিশেষত্ব এটাই, যারা সাধারণ মানুষ, ‘অ’ ‘আ’ ‘ক’ ‘খ’ পড়তে পারেনা, তাদেরকেও ঐ উচ্চ স্তরে নিয়ে যাচ্ছে। এই হল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য, যদি শ্রীকৃষ্ণ কোন ভাবে দুর্যোধনকে রাজী করিয়ে পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেয় তাহলে পাণ্ডবরা এই আর্থিক সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পেয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারে।

### দূত রূপে শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর আগমন

শ্রীকৃষ্ণ এখন দূত হয়ে কৌরবদের রাজ দরবারে যাবেন। যাওয়ার আগে পাঁচ ভাই আলাদা ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে নানান কথা বলছেন। এদিকে কৌরবদের কাছেও খবর এসে গেছে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দূত হয়ে হস্তিনাপুর আসছেন। হস্তিনাপুরেও

রাজসভায় যুদ্ধের ব্যাপারে সর্বদা আলোচনা চলছে। শ্রীকৃষ্ণের আগমনের খবর পাওয়ার পর অনেকে অনেক রকম কথা বলে যাচ্ছেন। তারমধ্যে দুর্যোধন বলছে শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের কোন গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই এবং আরও অযৌক্তিক কথা শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বলছেন। দুর্যোধনের কথা শুনে পিতামহ ভীষ্ম বলছেন ‘শ্রীকৃষ্ণ এমনই এক ব্যক্তিত্বের যে তাঁকে সম্মান দাও আর সম্মান নাই দাও তাতে তাঁর কিছুই আসে যায় না। তবে তিনি অসম্মানের যোগ্য নন তাই এই ভুল যেন না করা হয়’। আসলে যে কোন মানুষই যখন চেতনার অনেক উচ্চ স্তরে উঠে যান তখন জগতের সব কিছুই তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ হয়ে যায়, সেই অবস্থায় কে তাঁকে মান দিল আর কে তাঁকে মান দিল না তাতে তাঁর কিছুই প্রক্ষেপ হয় না। ঠাকুরও এই কথা বলছেন – ঈশ্বরে যাঁর মন একেবারে গত হয়ে যায় তখন কে তাকে মানল আর কে তাকে মানল না ঐ দিকে তার মন একেবারেই যায় না, কোন কিছুকেই সে আর তোয়াক্কা করে না। ভীষ্ম দ্বিতীয় কথা বলছেন ‘শ্রীকৃষ্ণ যেটা করবেন বলে ঠিক করে নিয়েছেন তিনি সেটা করেই ছাড়বেন তখন এই জগতের কোন শক্তিই তাঁকে আটকাতে পারবে না’। শ্রীকৃষ্ণের জীবন এক অদ্ভুত জীবন। স্বামীজী বলছেন তুমি তোমার পথটাকে ঠিক রাখ তাহলে তুমি লক্ষ্যে ঠিক পৌঁছে যাবে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে কিন্তু উল্টো, তিনি লক্ষ্যটাকে ঠিক রেখেছেন পথের ব্যাপারে তার কিছু আসে যায় না। এর মধ্যে পার্থক্যটা হল, সমাজে যখন আমি চলছি তখন আমার সামনে দুষ্টি অসুর প্রবৃত্তির লোকও চলবে। তারা যদি আমার পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখন আমাকেও ঐভাবে কিছু একটা করে এগোতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের সময় কত ডান দিক বাঁ দিক করেছেন, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে আমাকে ধর্মরাজ্য স্থাপন করতে হবে। সেই শ্রীকৃষ্ণকেই আবার গান্ধারী যখন বললেন আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি তোমার পুরো যদু বংশ কৌরব বংশের মত ধ্বংস হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঠিক আছে। শ্রীকৃষ্ণের ভাব হল আমি ঠিক কাজ করেছি এতে আমার কোন খেদ নেই, তোমার যদি অভিশাপ দিতে হয় দাও তাতেও আমার কিছু যায় আসে না, এইটাই হল পরমহংসের লক্ষণ। আমেরিকা যেভাবে আন্তর্জাতিক আইনকে উল্লঙ্ঘন করে লাদেনকে খুন করল, এর জন্য যদি ওবামাকে বলা হয় এর জন্য তোমার জ্ঞাতীদের মেরে উড়িয়ে দেওয়া হবে। ওবামা কি তাতে রাজী হবে? কখনই সে রাজী হবে না। এগুলোই হল শঠতা। এই ধরণের লোকেরা যখন শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করতে আসে এগুলো এদের মুখে সাজে না। শ্রীকৃষ্ণ হলেন একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ। যে কোন আধ্যাত্মিক পুরুষই সমস্ত বিধি নিষেধের পারে চলে যান, কোন নিয়ম কানুন তাঁর উপর আর প্রযোজ্য হবে না। কোন কাজ করার আগে যদি বলা হয় আপনি এটা করবেন না তখন তিনি বলবেন করবো না, বন্ধ করে দেব। আপনি যদি বলেন এই কাজ করলে আপনাকে ভুগতে হবে, তিনিও বলবেন ভুগতে হলে ভুগব। সব ক্ষেত্রেই তিনি সব কিছুর পারে চলে যান, তাঁর নিজের জীবন, নিজের প্রিয়জনের জীবন কোনটার প্রতিই তাঁর আর আকর্ষণ থাকে না, সবটাই উড়ে যায়। এঁরাই বলতে পারে আমি যেটা ঠিক করেছি আমি সেটাই করব। ভীষ্মও এই একই কথা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলছেন, তিনি যেটা নিজে ঠিক করে রেখেছেন, যে কোন উপায়ে তিনি এটাই করবেন। এই ধরণের চরিত্র আমরা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জীবনেই পাই, তাঁর কাছে ডান দিক বাঁ দিক বলে কিছু নেই, আমাকে এটা করতে হবে আমি এটাই করব। যুদ্ধ ক্ষেত্রে এই ধরণের ঘটনা অনেকবার আসবে। একবার অর্জুনকে বলে দিলেন ‘এটা তোমার দ্বারা হবে না, দেখো আমি কিভাবে করছি’। শ্রীকৃষ্ণ সেটাই করলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই ধরণের আচরণকে যদি ঠিক ঠিক আচার্য বুঝিয়ে না দেন তাহলে সাধারণ মানুষের ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে। এই দুজনের জীবন, শ্রীকৃষ্ণের জীবন আর প্রফেট মহম্মদের জীবন যদি উপযুক্ত আচার্যের কাছে না শোনা হয় তাহলে এই দুটো জীবনকে ভুল বোঝার প্রচণ্ড অবকাশ থেকে যাবে। কারণ সাধারণ মানুষরা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন। এদেরকে কিছু কিছু কথা বলা শাস্ত্রেই নিষেধ করা আছে, যেমন ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, ভাগবত বলেই দিচ্ছে এই রাসলীলা একমাত্র যারা খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পন্ন তাদেরই একমাত্র শোনার অধিকার, বাকীদের শোনার অধিকারই নেই। আর তাছাড়া এনারা জাগতিক সব কিছুর উর্দে চলে গেছেন, এখন এঁদের উপর কোন বিধি নিষেধ খাটবে না। আমরা হলাম বিধি নিষেধের মধ্যে বাঁধা। আমরা শ্রীকৃষ্ণের অনেক কিছুই বুঝতে পারবো না, বুঝতে না পারাটা ঠিক আছে, কিন্তু অন্য রকম বুঝে গোলমাল করে ফেললে সেটা কিন্তু আরো মারাত্মক খারাপ। শ্রীকৃষ্ণের মত ব্যক্তিত্ব যখন কারুর সাথে থাকেন তখন তার ভালো মন্দও তিনি নিজের কাঁধে নিয়ে নেন। যে মানুষ জীবন-মৃত্যুকে অতিক্রম করে গেছেন, মান-সম্মানকে পার করে গেছেন আর তার মধ্যে শক্তি যদি থাকে তখন সেই মানুষকেই পরমহংস বলা যায়।

পিতামহ ভীষ্ম পরিস্কার বলে দিলেন শ্রীকৃষ্ণকে সম্মান ও আপ্যায়নে যেন কোন রকম তচ্ছিল্য ভাব দেখান না হয়। দুর্যোধন শুনে বলছেন, তত দিনে দুর্যোধন খুব ক্ষমতালালী হয়ে গেছে, কর্ণ সাথে আছে কিনা, বলছেন ‘আপনারা যদি মনে করে থাকেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আমি এই সম্পত্তি ভাগাভাগি করে ভোগ করব তাহলে শুনে রাখুন এর কোন সম্ভাবনা নেই। এও আপনাদের বলে দিচ্ছি, কৃষ্ণকে আসতে দিন, এখানে এলেই আমরা ওকে বন্দী করে সব ঝামেলা মিটিয়ে দেব। কৃষ্ণকে নিয়ে পাণ্ডবেরা যত লাফালাফি করছে ঐ দিনেই সব লাফালাফি শেষ হয়ে যাবে’। দুর্যোধনের কথা শুনতেই ধৃতরাষ্ট্র

সহ মন্ত্রী পরিষদের সবাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এদেরও কিছুই করার নেই কেননা দুর্যোধন এখন প্রচণ্ড ক্ষমতাবান হয়ে গেছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্ররা কেউ দুর্যোধনকে আটকাতে পারছে না। ধৃতরাষ্ট্র খুব ভেঙে পড়ে অথচ তিনি এখনও রাজা, কাতর হয়ে বলছেন ‘এটা সনাতন ধর্ম নয়’। হিন্দু ধর্মের আগে নাম ছিল সনাতন ধর্ম, সনাতন মানে চিরন্তন। হিন্দু ধর্ম কখন কোন ব্যক্তি বিশেষের কথার উপর দাঁড়িয়ে নেই, কতকগুলো সনাতন মূল তত্ত্ব ও নীতির উপর হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সনাতন নীতি কি? যিনি দূত হয়ে আসছেন তাঁকে কখন এইভাবে বন্দী করা যায় না। সনাতন ধর্মের গুরুত্ব কিসের উপর? আমাদের যে লৌকিক ও জাগতিক ব্যবহার সেটাও ধর্মের মধ্যেই পড়ে। এইগুলোই মনুস্মৃতি আদি গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। সেইজন্য যে কোন ধর্মের চারটি অঙ্গ হয় – দর্শন, পুরান, তন্ত্র ও রীতি নীতি। সনাতন ধর্মের রীতি বলছে দূতকে তুমি কখনই ছল করে বন্দী করতে পারো না। ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ করে আরও বলছেন ‘দেখো দুর্যোধন একেই তিনি শ্রীকৃষ্ণ, তিনি আবার দূত, তার উপর তিনি আবার আমাদের সম্বন্ধী। ছল করে শ্রীকৃষ্ণকে কি কখন বন্দী করা যায়’! ভীষ্ম খুব রেগে গিয়ে বলছেন ‘এই দুর্যোধন ধর্মকে ত্যাগ করেছে, তাই সে পাপী। দুর্যোধন হল পাপী ও ক্রুর আর এর সব কথাই অনর্থ। আমি আর কোন কথা শুনতে চাইনা, আমি চললাম’। এই বলে ভীষ্ম রেগেমেগে সভা ছেড়ে চলে গেলেন। দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসনরা আগে থাকতেই ছক করে নিয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণ এখানে এলেই তাঁকে বন্দী করে সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে হবে।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুর এসেছেন। তিনি দুর্যোধনের কাছে গেলেনই না, সোজা বিদুরের বাড়িতে চলে গেলেন। দুর্যোধনদের কোন রাজকীয় আপ্যায়ন গ্রহণই করলেন না। বিদুরের কাছে কুন্তী রয়েছেন, তিনি সরাসরি সব কিছু প্রত্যাখ্যান করে বিদুরের কাছে চলে গেলেন। তারপর সভাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করার পর দুর্যোধন ঔদ্ধত দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করে বলছে ‘আপনার জন্য আমরা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলাম, উত্তম শয্যার ও পানীয়ের ব্যবস্থা করে রাখলাম, আর আপনি আমাদের কিছুই গ্রহণ করলেন না, এটা আপনার কি রকম আচরণ’! শ্রীকৃষ্ণ তখন বলছেন *কৃতার্থী ভুঞ্জতে দূতাঃ পূজাং গৃহ্ণন্তি চৈব হ। কৃতার্থং মাং সহামাত্যং সমর্চিষ্যসি ভারত।* ১৫/১০৪/১৯ দুর্যোধন, আমি হলাম দূত, দূতের কাজ হল, তার প্রয়োজন সিদ্ধি হয়ে যাওয়ার পরেই দূত গৃহকর্তার সম্মান ও আপ্যায়নকে গ্রহণ করে খাওয়া-দাওয়া করে। যতক্ষণ না কার্য সিদ্ধি হয় ততক্ষণ দূত খাওয়া-দাওয়া গ্রহণ করে না, *পূজা গৃহ্ণন্তি*, সম্মান গ্রহণ করে না’। দুর্যোধন বলছে ‘হে মধুসূদন! আপনার এই ধরনের অনুচিত কথা বলাটা ঠিক হয়নি, আপনি কৃতার্থই হন আর অকৃতার্থই হন আমরা আপনাকে সম্মান জানাতে সব সময়ই প্রস্তুত। তাছাড়া আপনার প্রতি আমাদের কোন বৈরী ভাবও নেই আর কোন কলহও নেই। তাহলে কেন আপনার নিমিত্ত আমাদের আয়োজনকে গ্রহণ করতে চাইছেন না’? শ্রীকৃষ্ণ তখন একটু হেসে দুর্যোধনকে বলছেন *নাহং কামান্ন সংরস্তান্ন দেষান্নার্থকারণাৎ। ন হেতুবাদাল্লোভাদ্বা ধর্মং জহ্যাং কথঞ্চন।* ১৫/১০৪/২৫। ‘দেখো দুর্যোধন! কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, স্বার্থ, চালাকি, লোভ এর কোন কিছুতে পড়ে আমি কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করিনা’। ধর্ম ত্যাগের কারণ শুধু এই কটিই নয়। কিন্তু মানুষ কখন নিজের ধর্ম ত্যাগ করে? কামনা, ক্রোধ মানে রেগে গেলে গুরুজনদের অপমান করে দিল, তখন সে ধর্ম ত্যাগ করে দিল, স্বার্থ, যেখানে সত্যি কথা বলার ছিল কিন্তু স্বার্থের হানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে মিথ্যে কথা বলে দিল, কাম আর স্বার্থের এই জায়গাতে কিছুটা মিল হলেও কামে দীর্ঘকালীন ব্যাপার থাকে আর স্বার্থে স্বল্পকালীন ব্যাপার থাকে। তারপর চালাকি করার জন্য আর লোভে পরে মানুষ নিজের ধর্ম ত্যাগ করে। কাম, স্বার্থ আর লোভ এই শব্দগুলো একই রকমের কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রূপ নেই।

শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনকে বলছেন ‘দুর্যোধন! অন্ন কার বাড়িতে গ্রহণ করা হয়? যাকে ভালোবাসে তার বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করে আর বিপদে পড়ে কারুর বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করে। এই দুটো অবস্থা ছাড়া আর কোন অবস্থায় কারুর বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করা হয় না। আমি তো কোন বিপদে পড়িনি আর আমার প্রতি তো তোমার ভালোবাসা একটুও নেই। তাই তোমার ঘরে আমি কেন অন্ন গ্রহণ করতে যাব। আর তুমি শুনে রাখ, আমি আর পাণ্ডবরা এক, যে পাণ্ডবদের ভালোবাসে সে আমাকেও ভালোবাসে, পাণ্ডবদের প্রতি যার দ্বেষ সে আমাকেও দ্বেষ করে। তুমি পাণ্ডবদের দ্বেষ কর তাই আমাকেও তুমি দ্বেষ কর বলে আমি তোমার অন্নজল গ্রহণ করতে পারিনা। *সর্বমেতন্ ভোক্তব্যমন্মং দুষ্টাভিসংহিতম্। ক্ষতুরেকস্য ভোক্তব্যমিতি মে ধীয়তে মতিঃ।* ১৫/১০৪/৩৪। তুমি যত অন্নজলের আয়োজন করেছ এগুলো সব *দুষ্টাভিসংহিতম্*, মানে তুমি কোন দুরভিসন্ধি করে আমাকে ভোজন করতে অনুরোধ করছ। এই অন্ন আমি গ্রহণ করতে পারিনা তাই আমি বিদুরের কাছে অন্নজল গ্রহণ করতে যাচ্ছি।

শ্রীকৃষ্ণ তখন সবাইকে বোঝাতে প্রয়াসী হয়ে বলছেন ‘আমি জানি দুর্যোধন এখন বেপোরয়া আর ঔদ্ধত হয়ে দুষ্ট পুরুষে পরিণত হয়েছে, তবুও আমি সন্ধির অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছি। আপনারা একটা কথা জেনে রাখবেন কোন বন্ধু যদি বন্ধুকে তার চুল ধরেও পাপ কাজ থেকে আটকায় সেই বন্ধু কিন্তু কখনই নিন্দার পাত্র হয় না। আপনারা যা করতে যাচ্ছেন এতে সবারই বিনাশকে ডেকে আনছেন, সেইজন্য আমিও চেষ্টা করছি যাতে এই কাজ আপনার বন্ধ করেন। যদি দরকার হয় আপনারা দুর্যোধনকে বন্দী করে দিন। হে ধৃতরাষ্ট্র আমি আপনাকে বারবার বলছি আপনি রাজা এই ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশকে আপনি আটকান’। শ্রীকৃষ্ণ খুব মিষ্টি করে বলছেন *কৃপানুকম্পা কারুণ্যমানুশংস্যধঃ ভারত। তথার্জবং ক্ষমা সত্যং কুরুষ্বেতদ্বিশিষ্যতে।।৫/১০৮/৮।* ‘আপনাদের কুরুবংশে অনেক গুণ আছে, সেই গুণগুলো আপনার মধ্যেও স্বাভাবিক ভাবেই এসে গেছে। আপনার মধ্যে এই গুণগুলো আছে কৃপা (কৃপা মানে অপরকে সুখ দেওয়া), অনুকম্পা, (পরের দুঃখ দেখে দ্রবিত হওয়া) করুণা, (পরের দুঃখকে যখন দূর করার চেষ্টা করা হয়) অনূশংসতা (ক্রুরতার অভাব), সরলতা, ক্ষমা ও সত্য’। যার হাতে ক্ষমতা থাকে তার মধ্যে এই সাতটি গুণ থাকতে হয়। ক্ষমতাবান বলতে আগেকার দিনে রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি আর এখনকার দিনে যাদের হাতে প্রশাসনের ভার থাকে তাদের প্রচুর ক্ষমতা থাকে। কোন প্রশাসককে যদি সুদক্ষ ও সবার প্রিয় হতে হয় তাহলে তার মধ্যে এই সাতটি গুণ থাকতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে বারবার সন্ধি করার জন্য বুঝিয়ে যাচ্ছেন। ‘আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, আপনার আর কোন কিছু লোভ বা আসক্তি নেই। আপনার মধ্যে কৃপা আছে, আপনার সন্তানদের প্রতি যেমন আপনার কৃপা আছে পাণ্ডবদের প্রতিও সেই কৃপা বর্ষণ করুন, কারণ পাণ্ডবরাও আপনারই সন্তান। অর্থকে অনর্থ আর অনর্থকে অর্থ মনে করে আপনি সবাইকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেবেন না’। শ্রীকৃষ্ণ খুব নরম ও মিষ্টি করেই ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য হল কুরুবংশকে রক্ষা করুন, কুরুবংশের এই গুণগুলো আছে, পাণ্ডবরাও আপনার সন্তান। মহাভারতের এই অংশটা তাদেরকে দেখাতে হয় যারা বলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করেছিলেন, ইচ্ছে করলে শ্রীকৃষ্ণ এই যুদ্ধকে আটকে দিতে পারতেন। এদের এই বক্তব্য আদর্শে ঠিক নয়, শ্রীকৃষ্ণ কত ভাবে চেষ্টা করেছিলেন এই যুদ্ধটা যাতে না হয়। ধৃতরাষ্ট্রকে কত করে বোঝাচ্ছেন আপনার কুরুবংশের কত গুণ আছে, ভারতের ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ হতে যাচ্ছে, পাণ্ডবরাও আপনার সন্তান। সব রকম ভাবে শ্রীকৃষ্ণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, ধৃতরাষ্ট্রও মনে মনে চাইছেন যুদ্ধের প্রস্তুতি এখানেই সমাপ্ত হয়ে যাক। কিন্তু দুর্যোধন কোন ভাবেই রাজী হচ্ছে না।

সেই সময় কিভাবে কিভাবে কৌরবদের সভাতে পরশুরাম এসে উপস্থিত হয়েছেন। পরশুরামও ধৃতরাষ্ট্র আর অন্যান্য কৌরবদের বলছেন ‘তোমরা সব ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে নাও, এই যুদ্ধ করতে যেও না। কারণ এই অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ হলেন নর নারায়ণ ঋষি’। এই সব বলে পরশুরাম একটা কাহিনী বলছেন। দস্তোভব নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিল। রাজা সবার উপর বিজয় করার পর দেখছে আর কারুর উপর বিজয় পাওয়ার নেই, তখন ব্রাহ্মণদের উপরও আধিপত্য কায়েম করতে চাইছিল। সেই সময় ব্রাহ্মণরা বললেন ‘আমাদের উপর কেন এই নিপীড়ন করছেন, আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, আমাদের উপর বিজয় পাওয়ার কি আছে! আপনি হিমালয়ে বদ্রিকাক্রমে যান ওখানে নর ও নারায়ণ ঋষি আছেন, ওনারা ওখানে তপস্যা করছেন ওঁদের সঙ্গে গিয়ে যুদ্ধ করুন’। সেই রাজা এখন সব সৈন্য সামন্ত নিয়ে হিমালয়ে এসে দেখছে দুজন শীর্ণকার ঋষি ধ্যান করছেন। তাঁদেরকে বারবার বলছে তোমরা আমার সাথে যুদ্ধ কর। নর নারায়ণ ঋষিরা বলছেন ‘দেখো ভাই আমরা এখানে তপস্যা করছি, কেন আমাদের জ্বালাতন করছ, আর আমরা কি তোমার সাথে যুদ্ধ করে পারব! রাজা ঋষিদের কথায় কোন কর্ণপাত না করে খালি বলে যাচ্ছে যুদ্ধ কর। তখন নর ঋষি, যিনি পরে অর্জুন হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন, ঠাকুর নরেনকে বলছেন – নরেন হল নর ঋষির অবতার। সেই নর ঋষি প্রচণ্ড রেগে গেছেন। রেগে গিয়ে নর ঋষি বলছেন ‘হে ক্ষত্রিয়! তুমি আমাদের সাথে অনেক যুদ্ধ চাইছ তো। ঠিক আছে তোমার সব সৈন্যবল নিয়ে এসো। আর এই নাও’। এই বলে নর ঋষি একটা কুশ ঘাসের টুকরোকে হাতের মধ্যে নিয়ে মন্ত্র সিদ্ধ করে রাজার দিকে ছেড়ে দিয়েছেন। সেই ঘাসের টুকরোকে তিনি ঐশিকা অস্ত্রে রূপান্তরিত করে দিলেন। সেই মুহূর্তে ঐ একটা ঘাসের টুকরো থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ঐশিকা অস্ত্র বেরোতে শুরু করে দিয়েছে। আর যত সৈন্য, হাতি, ঘোড়া ছিল সবার শরীরে যত লোমকূপ ছিল ঐ লক্ষ লক্ষ ঘাসের টুকরো প্রতিটি লোমকূপের মধ্যে ঢুকে গেছে। শরীরের কোন ছিদ্র বাকি নেই, সব ছিদ্রের মধ্যে ছুঁচের মত ঘাসের টুকরো ঢুকে গেছে। সব সৈন্য, হাতি, ঘোড়া যন্ত্রণায় বিভৎস ভাবে চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছে। তখন সেই রাজা আর সৈন্যরা প্রাণ ছেড়ে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচে। এই কাহিনী বলে পরশুরাম কৌরবদের সাবধান করে বলছেন ‘সেই নর নারায়ণ ঋষিই অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ রূপে শরীর ধারণ করে এসেছেন, তোমাদের ভালোর জন্য বলছি তোমরা এই যুদ্ধ করতে যেও না’।

এর মধ্যে অনেক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। সব কিছু বলা হয়ে যাওয়ার পর দুর্যোধন বলছেন ‘হে কৃষ্ণ! তখন থেকে আমি তোমার সব কথা শুনে যাচ্ছি, আর তোমার কথাতে মনে হচ্ছে সব দোষ যেন আমার, আর পাণ্ডবরা যেন পুরোপুরি নির্দোষ। যুধিষ্ঠিরের তো নিজেরই জুয়া খেলার নেশা ছিল, আর আমার মামা শকুনি যদি জুয়া খেলাতে সব বাজী জিতে নিয়ে থাকে তাতে আমার দোষটা কি করে হল। জুয়া খেলার সময় আমরা সবাই সেখানে ছিলাম, তা যুধিষ্ঠির নিজেই মামা শকুনিকে বেছে নিয়েছিল, আমাদের কাউকে সে বেছে নেয়নি কেন’? আসলে যুধিষ্ঠির যতই ধর্মজ্ঞ হোন না কেন, জুয়া খেলার ব্যাপারে তাঁর ভেতরে ভেতরে অহঙ্কার ছিল। দুর্যোধন বলছে ‘যুধিষ্ঠির তো নিজে ন্যায় সঙ্গত ভাবেই হেরে গিয়েছিল, এখানে আমাদের দোষ কোথায়। হে কৃষ্ণ! যদি আপনি আমাকে ভয় দেখিয়ে থাকেন তাহলে জেনে নিন আমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় ভয় বলে কিছু জানে না, আপনি সরে দাঁড়ান, আমার মধ্যে সেই দম আছে যা দিয়ে আমি সব কটা পাণ্ডবদের দেখে নিতে পারব। আর আমি যদি এতে মরেও যাই আমি স্বর্গে যাব, এতে আমার কি আর আসবে যাবে। তার জন্য আমি সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দিতে যাব না। আপনি শুনে রাখুন, আমার বাবা বর্তমান থাকতেই এই রাজ্য তিনি আমাকে দিয়েছেন, আমি যত দিন বেঁচে থাকব এই রাজ্য আর কেউ ভোগ করতে পারবে না। এর আগে আমার বাবা আমাদের সাম্রাজ্যের অর্ধেক অংশ পাণ্ডবদের দিয়েছিলেন, তখন আমার বয়স নিতান্তই কম ছিল, আমার তখন কিছু বোঝবার কোন অবকাশ ছিল না আর আমার হাতে তখন ক্ষমতাও ছিল না। তাই আমি তখন মেনে নিয়েছিলাম যদিও জানতাম যে অংশটা বাবা পাণ্ডবদের দিচ্ছে এটা আমারই। কিন্তু এখন আর কোন প্রশ্ন নেই, একবার যখন আমার অংশ হাতে এসে গেছে আর আমি ফেরত দিচ্ছি না। যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধেদগ্রেণ মাধব। তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্ণঃ পাণ্ডবান্ প্রতি।।৫/১১৮/২৬। মহাভারতে এটি দুর্যোধনের খুব নামকরা উক্তি ‘আমি বেঁচে থাকতে ছুঁচের অগ্রভাগে যতটুকু মাটি উঠবে ততটুকুও পাণ্ডবরা পাবে না’। দুর্যোধন এখানে তিনটে যুক্তি দেখাচ্ছে। আমার মামা শকুনি এই জুয়া খেলায় জয় লাভ করেছেন তাই এই সাম্রাজ্য আমার অধীন হয়ে গেছে, যুধিষ্ঠির কেন আমার সঙ্গেই খেলতে গেলেন, আগে যখন পাণ্ডবদের অর্ধেক সাম্রাজ্য দেওয়া হয়েছিল তখন আমি বাচ্চা ছিলাম, অবুঝ ছিলাম, তখন অর্ধেক সাম্রাজ্য চলে গিয়েছিল কিন্তু এখন এই অবস্থায় আর ফেরত দেওয়া যাবে না। আর আমি যত দিন বেঁচে থাকব এক টুকরো মাটিও পাণ্ডবরা ফেরত পাবে না’। একটু যদি বিচার করে দেখা হয় তাহলে কিন্তু মনে হবে দুর্যোধনের সেই ধরণের মারাত্মক কোন দোষ ছিল না, আর দুর্যোধনের যদি দোষ থাকত তাহলে তারা এগার অক্ষৌহিণী সেনা জোগাড় করতে পারত না।

শ্রীকৃষ্ণ এইবার দুর্যোধনের কথার উত্তর দিচ্ছেন ‘তুমি তো বলছ তুমি কোন পাপ করো নি। ঠিক আছে এবার আমিও তোমাকে বলছি তুমি কি কি পাপ কাজ করছে’। এবার শ্রীকৃষ্ণ পর পর কিছু ঘটনাকে তুলে দেখাচ্ছেন দুর্যোধন কি কি পাপ কাজ করেছিল। তুমি, দুঃশাসন, আর কর্ণ মিলে পাণ্ডবদের বারণাবতে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিলে, ছোটবেলায় ভীমকে তুমি বিষ খাইয়ে জলে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করেছিলে। যখন পাণ্ডবরা বনবাসে ছিল তখনও তোমরা ওদের বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা করেছিলে’। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ পরপর অনেক ঘটনা বলে যাচ্ছেন। এই সব বলে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ‘তুমি এতগুলো অপরাধ করার পরও বলে যাচ্ছ আমি নির্দোষ, এখনও তোমাকে বলছি সন্ধি করে নাও, আর এখন যে তোমার কাছে ভিক্ষের মত সাম্রাজ্য ফেরত চাওয়া হচ্ছে তাও তুমি দিচ্ছ না, কিন্তু রণভূমিতে যখন তুমি ধরাশায়ী হবে তখন এই সাম্রাজ্যই তোমার কাছে থেকে কেড়ে নেওয়া হবে’। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে দুর্যোধন প্রচণ্ড ক্রোধে বশীভূত হয়ে রেগে সবাইকে অসম্মান করে সভা থেকে ফোঁস ফোঁস করতে করতে বেরিয়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ তখন পরিষ্কার করে ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন ‘হে রাজন! এই দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন আর শকুনিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে আপনি পাণ্ডবদের হাতে তুলে দিন’। এই বলে শ্রীকৃষ্ণ সেই বিখ্যাত শ্লোকটাই বলছেন যেটা আমরা মনুস্মৃতিতে পাই ত্যাজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রাম্যস্যার্থে কুলং ত্যাজেৎ। গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যাজেৎ।।৫/১১৯/৪৯। এর আগে দেবযানী-শর্মিষ্ঠা সংবাদেও এই শ্লোকটা এসেছিল। বংশের মঙ্গলের জন্য যদি একজনকে বহিষ্কার করতে হয় তাহলে তাকে বহিষ্কার করে দাও। একটা গ্রামের ভালোর জন্য দরকার হলে একটা পরিবারকে সরিয়ে দাও। জনপদকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে একটা গ্রামকে ত্যাগ করে দাও। কিন্তু নিজের কল্যাণের জন্য জগতের সব কিছুকে ত্যাগ করে দাও। হিন্দুধর্মে এটা খুব নামকরা কথা। তখন গান্ধারী নিজের সন্তানকে খুব তিরস্কার করছেন, ধৃতরাষ্ট্রও খুব করে দুর্যোধনকে বোঝাচ্ছেন কিন্তু দুর্যোধন কোন কথাই শুনবে না।

এদিকে দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ আর শকুনি মিলে গোপনে শলাপরামর্শ করে ঠিক করে নিল শ্রীকৃষ্ণ যখন সভা থেকে বেরিয়ে আসবেন তখন তাঁকে বেঁধে বন্দী বানিয়ে দাও, কৃষ্ণ যতই চেষ্টাচেষ্টা করুক আর যাই করুক ওকে বেঁধে রাখা হবে। শ্রীকৃষ্ণের সাথে সাত্যকি আর কৃতবর্মা এই দুজন যাদব সেনাপতি হস্তিনাপুরে এসেছিলেন। মহাভারত যুদ্ধ এমনই দুর্ভাগ্যজনক যে যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনা কৌরবদের পক্ষে চলে গিয়েছিল তাই কৃতবর্মা চলে গেলে কৌরবদের দিকে। কিন্তু সাত্যকি বললেন আমি অর্জুনের বিরুদ্ধে যাব না। একই সেনাদলের দুই সেনাপতি দু দিকে চলে গেল, সত্যিই কি দুর্ভাগ্যের যে কল্পনাই করা যায় না। যাই হক, সাত্যকি টের পেয়ে গিয়েছিলেন যে দুর্যোধনদের মতলব ভালো নয়। সাত্যকি সঙ্গে সঙ্গে কৃতবর্মাকেও সজাগ থাকতে বলে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কানে ফিসফিস করে বলে দিলেন যে আপনাকে বন্দী করতে যাচ্ছে। এটা শুনতেই শ্রীকৃষ্ণ রেগে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র আর অন্যান্যদের বললেন ‘এই দেখুন আপনার সন্তানরা কি দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা করছে। আমিও ওদের আহ্বান জানাচ্ছি, এই আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, ওদের যদি সাহস থাকে আমাকে বন্দী করুক। হে রাজন! মনে রাখবেন আমি যদি রেগে যাই আপনার পুরো কৌরবদের আমি একাই বেঁধে নিয়ে চলে যাব। আর এইভাবে যদি বেঁধে নিয়ে আমি চলে যাই তাহলে সব সমস্যাই মিটে যাবে। কিন্তু আমি এই ধরণের কাজ করতে যাব না। কারণ, হে ধৃতরাষ্ট্র আপনি আমার থেকে বয়সে বড়, আপনি আমার গুরুজন আপনার সামনে আমি ক্রোধ দেখাতে পারিনা কিন্তু আমি যদি আমার ক্রোধকে ডেকে আনি তাহলে আমি আপনাদের সবাইকে বেঁধে নিয়ে চলে যাব আর সব ঝামেলাই মিটে যাবে, আর কোন যুদ্ধ করতে হবে না’। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বললেন **ইদম্ভ ন প্রবর্তেয়ং নিন্দিতং কর্ম ভারত। সন্নিধৌ তে মহারাজ! ক্রোধজং পাপবুদ্ধিজম্।।৫/১২১/৩০।** আপনারা আমার গুরুজন আপনাদের সামনে আমি ক্রোধ করব না, কারণ ক্রোধ হলে মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে যায়, মোহগ্রস্ত হয়ে গেলে লঘুগুরু জ্ঞান হারিয়ে যায়। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিশ্বরূপ ধারণ করলেন। অনেক মনে করেন পরের দিকে মহাভারতে এই বিশ্বরূপ দর্শনটা ঢোকান হয়েছিল। তবে ঠাকুর বললেন – ঠাকুর দুর্যোধনকেও বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। দুর্যোধন বলছিল কৃষ্ণ এগুলো মায়া করছে। বিশ্বরূপের ঐ মূর্তি দেখে চারিদিকে সবার থরহরি কম্প লেগে গেছে। সবার মধ্যে আতঙ্ক এসে গেছে। কিন্তু তাতেও দুর্যোধনের কোন রকম পরিবর্তন হল না। সব শেষে শ্রীকৃষ্ণ গটগট করতে করতে আরামসে দরজা দিয়ে বেরিয়ে নিজের রথে চেপে গেলেন। দুর্যোধন আর কিছু করার সাহস দেখাতে পারল না। ওখান থেকে উনি বিদুরের গৃহে কুন্তীর কাছে চলে গেলেন। বারো আর এক এই তেরো বছর পাণ্ডবরা মাকে দেখেনি, মাও তেরো বছর নিজের সন্তানদের থেকে দূরে রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এখন কুন্তীর কাছে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীকে গিয়ে বললেন ‘যুদ্ধ তো এবার হবেই, আপনার সন্তানদের প্রতি যদি আপনার কোন নির্দেশ থাকে তাহলে আমাকে বলুন আমি পাণ্ডবদের কাছে পৌঁছে দেব’। কুন্তী তখন খুব নামকরা এক রানীর কাহিনী শ্রীকৃষ্ণকে বললেন।

### বিদুলোপাখ্যান এবং পুত্রদের প্রতি কুন্তীদেবীর বার্তা

এই কাহিনীর নাম বিদুলোপাখ্যান। বিদুলা ছিলেন এক বিদূষী রানী। তার ছেলেই এখন রাজা হয়ে রাজত্ব করছে। রাজা একেই ছেলেমানুষ তার ওপর সে একটু ভীতুও ছিল। একবার সিদ্ধুরাজের সঙ্গে একটা যুদ্ধে সে হেরে যায়। হারার পর প্রাণের ভয়ে বাড়িতে পালিয়ে এসে ঘরে ঢুকে সিঁদিয়ে রয়েছে দেখে মা প্রচণ্ড রেগে গেছে। মা তাকে খুব গালাগালি, বকাঝকা করছে। বকাঝকা করার পর অনেক উপদেশ ও ধর্ম কথা বলে ছেলেকে আবার যুদ্ধে পাঠালেন। কুন্তীদেবী সরাসরি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন না যে এখন পাণ্ডবরা কি করবে – সন্ধি করবে নাকি যুদ্ধের জন্য সোজা হয়ে দাঁড়াবে, কেননা শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিসির কাছে জানতে চেয়েছেন – এখন উপায় কি। কুন্তীদেবী কিছু না বলে বিদুলার কাহিনী শুনিয়ে বলে দিলেন – এই কাহিনীটা তুমি আমার তরফ থেকে আমার ছেলেদের শুনিয়ে দেবে। বিদুলা যেভাবে তার ছেলেকে উপদেশ দিয়েছিল, সেটাই শ্রীকৃষ্ণকে বলে বললেন ‘এই বার্তাটাই তোমাদের আমার পিসির তরফ থেকে দিলাম’। বিদুলোপাখ্যানের কাহিনী আসলে ক্ষত্রিয় ধর্মের উপর আধারিত, ক্ষত্রিয় ধর্মকে মাতা ও পুত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে রাখা হচ্ছে।

বিদুলা যখন দেখছে তার ছেলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে ঘরে এসে ঘুমোচ্ছে, তখন ছেলেকে জোর করে তুলে বলছে **উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ! মা শৌন্যৈবং পরাজিতঃ। অমিত্রান্ নন্দয়ন্ সর্বান্ নির্মানো বন্ধুশোকদঃ।।৫/১২৪/৮।** ‘ওরে কাপুরুষ ওঠ, যুদ্ধ থেকে পালিয়ে এসে এভাবে ঘরে শুয়ে আছিস! আর এইভাবে পালিয়ে এসে তুই তোর শত্রুদের আনন্দ দিচ্ছিস! তুই নিজের মান প্রতিষ্ঠা থেকে বঞ্চিত হয়ে তোর বন্ধু বান্ধবকেও শোক দিচ্ছিস, তোর লজ্জা করছে না ঘুমিয়ে থাকতে! ওঠ, বজ্রপাত হলে মানুষ যেভাবে উলটে পড়ে থাকে, তুইও সেই রকম মরার মত নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে আছিস, এমন কি হয়েছে তোর? মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়া আর শত্রুর সঙ্গে গিয়ে যুদ্ধ কর। তুই দীন আর কাপুরুষের মত



একটুতেই অস্তমিত হয়ে যাস না। তোর যে শৌর্য, বীর্য, কর্ম সেটা কাজে লাগিয়ে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ কর। আর মধ্যম, অধম ও নিকৃষ্ট ভাবকে তুই গ্রহণ করবি না বরং যুদ্ধভূমিতে সিংহনাদ করে ঝাঁপিয়ে পড়’। বিদুলা তিন্দুক কাঠের সঙ্গে তুলনা করছেন। তিন্দুক এক রকম কাঠ, যাতে আগুন লাগলেই হুস্ করে জ্বলে শেষ হয়ে যায়, পাট কিংবা শণের মত। বলছেন *অলাতং তিন্দুকস্যেব মুহূর্তমপি হি জ্বল। মা তুষাঘ্নিরিবানর্চির্ধুমায়স্ব জিজীবিষুঃ।।৫/১২৪/১৪।* ‘তিন্দুক কাঠের মত একটু সময়ের জন্যও তুই খুব জোর জ্বলে ওঠ, কিন্তু ভূমির মত, গরু যেটা খায়, তার মত জ্বলিস না, আগুন নেই, শুধু ধোঁয়াই দিয়ে যায়, ঐ রকমটি তুই হতে যাস না। ধর্মকে সামনে রেখে তুই তোর পরাক্রম দেখা, আর তা যদি না পারিস তাহলে ধর্মের নামে সেই গতি প্রাপ্ত কর যেটা প্রাণিদের নিশ্চিত গতি, অর্থাৎ মৃত্যুকে বরণ করে নে’। রামানুজম বিরটি বড় গণিতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর কুষ্টিতে ছিল, হয় তিনি দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকবেন আর সাধারণ জীবন যাপন করবেন, আর তা নাহলে বিশ্ব বিখ্যাত হবেন কিন্তু অল্প দিন বাঁচবেন। ঠিক তাই হল, তিনি বিশ্ব বিখ্যাত হলেন আর তার দু বছরের মধ্যেই মারা গেলেন। বিদুলা এটাই বলছেন, তুমি মরে যাও তাতে আমার কিছু আসে যায় না কিন্তু তুমি যশ নিয়ে মর। *মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ো ন চ ধুমায়িতং চিরম্। মা হ স্ম কস্যচিদ্গেহে জনি রাজ্ঞঃ খরো মৃদুঃ।।৫/১২৪/১৫।* সারা জীবন ধুরোর মত জীবন কাটানোর থেকে বরং দু মিনিটের জন্যও তিন্দুক কাঠের মত জ্বলে ওঠ। হয় নিজের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাক আর নাহলে মরে যা, এর মাঝামাঝি কোন ব্যাপার নেই। গীতাতেও এটাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন ‘হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্’। দুটোই আছে – হয় ধর্ম নয়তো মৃত্যু, এই দুটোর মাঝখানে কিছু নেই। ঔরঙ্গজেবের এক রাজপুত ক্ষত্রিয় সেনাপতি ছিল। একবার এক যুদ্ধে সবাই হেরে যাচ্ছিল, তখন তাকে বলা হয় সবাইকে এখন পালিয়ে যেতে হবে তা নাহলে সবাই মারা যাবে। সেই ক্ষত্রিয় সেনাপতিও পালিয়ে তার রাজস্থানের কেল্লায় ফিরে যাচ্ছে। সেনাপতি পালিয়ে আসছে খবর পেয়ে তার রানী কেল্লার দরজাই খুললো না। রানী ঠিক করে নিল আমি সতী হব, আমার স্বামী যখনই যুদ্ধে হেরে পালিয়ে এসেছে তখনই আমি বিধবা হয়ে গেছি। রাজমাতা আর অন্যান্যরা বহু কষ্টে সেদিন রানীকে সতী হওয়া থেকে আটকে দিয়েছিল। যাই হোক, দরজা খুলে দেওয়া হল, কিন্তু রানী কোন দিন একবারের জন্যও তার স্বামীর সাথে কথাও বলল না আর কাছেও গেল না। শেষে সেই সেনাপতি বলল আমি এর বদলা নেব। পরে আবার সে যুদ্ধে যোগ দিল, শেষ পর্যন্ত সে রণভূমিতে মারাই গেল। রানীর তাতে কোন বিকার নেই। এটা হল ধর্ম। তুমি যুদ্ধে মরে যাও তাতে আমার কোন দুঃখ হবে না, কিন্তু মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে এসেছ এটাকে কিছুতেই মানা যাবে না।

বিদুলা ছেলেকে বলছেন ‘যারা বিদ্বান পুরুষ, জ্ঞানী পুরুষ, তারা অভিষ্ট ফল পান আর নাই পান লেগে থাকেন। চেষ্টা যদি না করে থাক তাহলে তোমার সব কিছু শেষ হয়ে যাবে’। ঠাকুর বলছেন, একজন কুয়ো খুঁড়বে, এক জায়গায় কিছুটা খোঁড়ার পর দেখছে বালি বেরোচ্ছে। তখন সেখান থেকে ছেড়ে আরেক জায়গায় গেল সেখানে পাথর বেরোল, সেখান থেকে আরেক জায়গায় গেল। বিদুলা বলছেন এইটা যেন না হয়। তুমি ফল পাও না পাও, তোমাকে লেগে থাকতে হবে। এটাই ঠিক ঠিক কর্মযোগ। আমার যেটা ধর্ম, আমি ফল পাই আর নাই পাই, সেই ধর্মকে ছেড়ে আমি অন্যথা কিছু করতে পারি না। আমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ এসে গেলে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে, এটাই আমার ধর্ম।

রে কাপুরুষ, *ইষ্টাপূর্তং হি তে ক্লীব!* কীর্তিঞ্চ সকলা হতা। *বিচ্ছিন্নং ভোগমূলং তে কিং নিমিত্তং হি জীবসি।।৫/১২৪/১৯।* নিজের ছেলেকে বলছে বিদুলা – রে ক্লীব, তোর ইষ্ট আর পূর্তি কর্ম নষ্ট হয়ে গেছে। তুই ভালো যা কিছু করেছিলি তোর সব কীর্তি মাটিতে মিশে গেছে। আর ভোগের যে মূল সাধন, সাম্রাজ্য, সেটাও তোর হাত থেকে চলে গেছে, তুই এখন আর কি ভোগ করবি! *শত্রুর্নিমজ্জতা গ্রাহ্যো জজ্জায়াং প্রপতিষ্যতা। বিপরিচ্ছিন্নমূলোহপি ন বিবীদেৎ কথঞ্চন। উদ্যম্য ধুরমুৎকর্ষেদাজানেয়কৃতং স্মরন্।।৫/১২৪/২০।* মানুষ যখন ডুবে যেতে থাকে বা উপর থেকে পড়ে যেতে থাকে সেই সময়ও নিজের শত্রুর একটা ঠ্যাং ধরে নেয়, তুমি মরবে কিন্তু একটাকে নিয়ে মরবে। তুমি ডুবেও যদি যাও তখনও একটাকে মেরে শেষ হয়ে যাও’। এটাই হচ্ছে ক্ষত্রিয় ধর্ম। ‘আর মনে রাখবি তাই করতে গিয়ে যদি তোর মূল উচ্ছেদ হয়ে যায়তো হয়ে যাক, জানবি এটাই তোর ধর্ম’। যেগুলো ভালো জাতের ঘোড়া হয় সেইসব ঘোড়া কখনও পরিশ্রান্তও হয়না শিথিলও হয়ে পড়ে না। ঘোড়ারা কখন বসে ঘুমোয় না। ঘোড়া যদি একবার বসে পড়ে তাহলে সে ঘোড়া শেষ। ‘তুই তোর স্বাভিমানকে অবলম্বন কর, আর তুই যে এই বংশকে ডুবিয়ে দিলি সেই বংশকে তোকেই উদ্ধার করতে হবে’।

দানে তপসি শৌর্যে চ যস্য নোচ্চরিতং যশঃ। বিদ্যায়ামর্থলাভে বা মাতুরুচ্চার এব সং। ৫/১২৪/২৩। দান, তপস্যা, সত্যবচন, বিদ্যা ও ধন উপার্জন এই পাঁচটিতে যার সুযশ সর্বত্র বর্ণনা করা না হয়, এই পাঁচটিতে যদি তার সম্মান না হয় তবে সে নিজের মায়ের সন্তান তো নয়ই, সে নিজের মায়ের মল মূত্র মাত্র – মাতুরুচ্চার এব সং। দেখুন কি কঠোর কথা – মহাভারত আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি সন্তান যদি দুশ্চরিত্র, কুলাঙ্গার বা অধর্ম পরায়ণ হয় তাহলে বলে ঐ সন্তান মায়ের কলঙ্ক, মায়ের কুসন্তান, কিন্তু এখানে মহাভারত কলঙ্ক বা কুসন্তান বলছে না, বলছে সে মায়ের মল মূত্র মাত্র। মহাভারত যখন যেটা বলবে তখন সেটাকে খুব বলিষ্ঠ ভাব নিয়ে বলবে।

মা ছেলেকে বলছে ‘হিজড়ে, কাপালিক, ত্রুর, কাপুরুষ এদের যে কাজ অর্থাৎ শিক্ষা করা, এদের জন্য ঠিক আছে, কিন্তু অন্যের পক্ষে এটা কলঙ্কদায়ক’। অনেক ফেরী ঘাটে নোটিস টাঙানো থাকে – ‘অন্ধ, খঞ্জ, পাগল, ভিখারী আর সাধুদের ভাড়া লাগিবে না’। ঐ রকম, যারা হিজড়ে, কাপালিক, ত্রুর, ভিত্তু কাপুরুষ এরা শিক্ষা করুক, এদের জন্য ঠিক আছে কিন্তু অন্যদের শিক্ষা করার অনুমতি শাস্ত্রে নেই। বিদুলা ছেলেকে খুব সুন্দর বলছেন। যদেনমভিনন্দেয়ুরমিত্রাঃ পুরুষং কৃশম্। লোকস্য সমবজ্রাতং নিহীনাসনবাসসম্।। অহো লাভকরং হীনমল্লজীবনমল্লপকম্। নেদৃশং বন্ধুমাঙ্গাদ্য বান্ধবঃ সুখমেধতে। ৫/১২৪/২৬-২৭। যে দুর্বল মানুষকে শত্রু পক্ষ অভিনন্দিত করে, আর যে সব মানুষের কাছে অপমানিত হয়, যার আসন বসন নিকৃষ্ট শ্রেণীর, যে একটু লাভ হলেই বিস্ময় প্রকাশ করে, আর যে সব রকম ভাবে হীন, যার জীবনটা ক্ষুদ্র, যার নীচ স্বভাব মানে ছোটলোকের মত, হীন প্রকৃতির – এই ধরনের বন্ধুকে পেয়ে কোন মানুষ কখন সুখী থাকতে পারেনা।

এখানে দুটো জিনিষকে লক্ষ্য করার মত। মহাভারতের কি সুন্দর পর্যবেক্ষণ। প্রথম হচ্ছে, যে দুর্বল মানুষকে শত্রু পক্ষ অভিনন্দন করে, আর দ্বিতীয়, একটু পেয়েই যে মনে করে ‘উরেঃ বাপ! কত পেলাম’। এখানে মনে রাখতে হবে এই কথাগুলো সাংসারিক লোকেদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, সন্ন্যাসীদের এগুলোর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। মারিও কুজোর বই ‘গড্ ফাদার’ ও হিন্দীতে ‘ধর্মান্দ্রা’ বলে অনেক আগে একটা সিনেমা হয়েছিল। ‘গড্ ফাদার’ খুবই অনুভূতিশীল ছবি। তারমধ্যে যিনি গড্ ফাদার আসলে তিনি ছিলেন king of under world। গড্ ফাদারের তিন ছেলে, আর এক মেয়ে। মেয়ে ছিল গড্ ফাদারের প্রচণ্ড আদরিণী। তিন দাদাও বোনকে ভীষণ ভালোবাসত। আর বড়দা, সেতো বোনকে নিয়ে পাগল। আর বোনটা ছিল ততটাই stupid, কাহিনীতে আছে গড্ ফাদারের সঙ্গে অন্য একটা rival gang এর সাথে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া হওয়ার জন্য চুক্তি হবে। ইতিমধ্যে বোনটি একটি খুব সাধারণ গরীব ছেলেকে বিয়ে করেছে। ছেলেটির চরিত্র হচ্ছে, বিদুলার ছেলের যা চরিত্র ঠিক সেই রকম। যখন সন্ধির জন্য মিটিং চলছে সেখানে নিজের জামাইকেও গড্ ফাদার ডেকে এনেছেন। মিটিং চলছে। শেষ পর্যন্ত দু পক্ষের মধ্যে একটা চুক্তি হচ্ছে যেখানে rival gang এর নেতা গড্ ফাদারকে বলছে ‘আপনাদের যে এলাকা গুলো ছেড়ে দেবেন তার জন্য আমরা দশ লাখ ডলার দেব’। এই অঙ্কটা শুনেই মেয়েটির স্বামী বলে উঠছে ‘এত টাকা’! সে তো জীবনে এত টাকা দেখেনি। জামাই ঐ কথা বলা মাত্র গড্ ফাদার বলে উঠলেন ‘This treaty is cancelled’। On the spot ঐ চুক্তি বাতিল করে দিলেন। বিরোধী গ্যাংএর লোকেরা বলতে লাগলো ‘স্যার, আপনি একবার ভালো করে ভেবে ঠিক করুন, এত টাকা কেউ দেবে না’। গড্ ফাদার ওদের কোন কথাই শুনবেন না, তার শুধু একটাই কথা – this treaty is cancelled. প্রথম প্রথম সিনেমাতে এই দৃশ্য দেখে বুঝতে পারা যায়না। কিন্তু পরে যখন গড্ ফাদারের দলের লোকেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে তখন বোঝা গেলো ব্যাপারটা। যে লোক এই সামান্য টাকাতে এত উৎফুল্ল হয়ে যায়, বুঝতে হবে এর মধ্যে কোন দম নেই যে কোন মুহূর্তে যে কেউ একে কিনে নিতে পারবে।

মারিও কুজোর মূল কাহিনীতে ঠিক এটাই হচ্ছে। Opposition বুঝে গেছে যে এই জামাইটাকে পয়সা দিয়ে কিনে নেওয়া যায়, কেননা সে দশ লাখ ডলারকেই বিরাট বলে ধরে নিয়েছে। এরাই পরে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে। বিদুলা বলছিল না – শত্রু পক্ষ যাকে দেখে আনন্দিত হয় – এরাও ঠিক গড্ ফাদারের জামাইকে দেখে আনন্দিত হয়েছে। একদিন গড্ ফাদারের জামাইকে বলছে ‘তুমি তোমার বউকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দাও’। তারজান্য এরা একটা মোটা টাকা ওর জন্য ঠিক করে দিয়েছে। ঐ টাকার লোভে ছেলেটা গিয়ে মেয়েটাকে খুব করে পিটিয়ে দিয়েছে। গড্ ফাদারের আদরের মেয়ে, বড়দার প্রাণের বোন, তাদের এই আদরের সোনামণিকে জামাই পেটাচ্ছে। স্বামীর হাতে মার খেয়ে মেয়েটি কেঁদে কেঁদে বড়দাকে ফোন করছে ‘দাদা ও আমাকে খুব মেরেছে’। দাদা এই খবর শোনা মাত্র বাড়িতে কিছু না বলে বেরিয়ে

গেল, বোনকে এতো ভালোবাসে যে কোন বডিগার্ড না নিয়েই সোজা বোনের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছে। আর সেইখানে আগে থাকতেই শত্রুপক্ষ গুঁত পেতে রয়েছে। গাড়ী থেকে নেমেছে, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে দাদাকে শেষ করে দিল।

এটাই এখানে বলছে – যদি এই রকম বন্ধু জুটে যায় তাহলে জেনে নাও তুমি শেষ। বিদুলা বলছে ‘আমি তোমার মত এই কলি নামে এক পুরুষকে জন্ম দিয়েছি! সংসারে কোন নারী যাতে এই রকম পুত্রের জন্ম না দেয়। যে অমরশূন্য, অমরশূন্য মানে যার মধ্যে তেজের লেশ মাত্র নেই, উৎসাহ নেই, শক্তি নেই, বল পরাক্রম নেই, আর এই ধরণের অমরশূন্য ব্যক্তি শত্রুকেই আনন্দ দেয়’। সব শুনে তখন পুত্র বলছে ‘মা, আমি যদি মরেই যাই আর তুমি যদি সারা পৃথিবীও পেয়ে যাও, তাতে তুমি কি সুখ পাবে? তুমি কি ধরণের মা! তুমি আমার কিসের মা? টাকা, পয়সা, গয়না-গাঁটি, ধন-সম্পদ নিয়ে তুমি কি করবে যদি আমিই না বেঁচে থাকি’।

তখন মা আরো রেগে গিয়ে বলছে ‘সঞ্জয়! যে ভৃত্যহীন, যার বাড়িতে চাকর বাকর নেই, অপরের অম্মের উপরে আশ্রয় করে আছে, দীন দুর্বল মানুষ, এই রকম বৃত্তির অনুসরণ করতে তুমি যেওনা’। বিদুলা তো তারপর আরো গালাগালি দিয়ে তিরস্কার করছেন। ছেলে মার তিরস্কারের উত্তরে ওর এক কথা বলে যাচ্ছে ‘তুমি কেমন মা! তুমি কি চাও আমি মরে যাই’? এতে বিদুলা আরো বেশি করে তিরস্কার করছে। শেষ পর্যন্ত ছেলে মার কাছে হার স্বীকার করে বলছে ‘ঠিক আছে, তুমি বল আমি কিভাবে শত্রু পক্ষের মোকাবিলা করব’। বিদুলা তখন তাকে কিছু tips দিলো, তুমি নিত্য প্রাতঃ কালে শয্যা ত্যাগ করবে। সর্বদা প্রিয় বাক্য বলবে আর তুমি যুদ্ধে নিজের প্রাণ দিয়ে দেওয়ার জন্য বাজী ধরে যুদ্ধ করবে, তখন দেখবে তোমার সৈন্যরাও নিজেদের প্রাণ দেওয়ার জন্য ঝাপিয়ে পড়বে। এতে শত্রু পক্ষরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত ছেলে আবার শত্রুর মুখোমুখি হতে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে গেল, আর যুদ্ধে শত্রু পক্ষের সব কটাকেই শেষ করে দিল।

কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন ‘তুমি এই কাহিনীটাই আমার হয়ে আমার ছেলেদের শোনাতে, আর বলবে বিদুলা রানী নিজের পুত্রকে যে উপদেশ দিয়েছিল আমিও তোমাদের সেই উপদেশ দিচ্ছি’। মানে তোমরা যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে এসো না।

### শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কর্ণকে কর্ণের পরিচয় প্রদান

কুন্তীর সন্দেশ নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এসেছেন। এদিকে ভীষ্ম দ্রোণ আবার দুর্যোধনকে অনেক ভাবে বোঝাচ্ছেন, কিন্তু দুর্যোধন কোন কথাই শুনবে না। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এখনো ছাড়ছেন না, চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যুদ্ধটাকে যদি কোনভাবে আটকানো যায়। কুন্তীদেবীর কাছ থেকে বেরিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের বাড়িতে গিয়ে নিভূতে তার সঙ্গে দেখা করে বলছেন ‘কর্ণ, তুমি কুন্তীর প্রথম সন্তান, আর এটাই সত্য। তুমি পাণ্ডবদের কাছে চল। যুধিষ্ঠির জানতে পারলে তোমার পায়ের তলায় তাঁর সব কিছু ফেলে দেবে, কেননা তুমি যুধিষ্ঠিরের দাদা। আর তোমার জোরেই দুর্যোধন এই নর-সংহার করবার জন্য লাফাচ্ছে। তুমি এই অবশ্যস্তুবি ক্ষত্রিয় কুলের বিনাশ থেকে ক্ষত্রিয়দের বাঁচাও। যে মুহূর্তে তোমার পরিচয় পেয়ে যাবে, সেই মুহূর্তে দ্রৌপদী সহ পঞ্চ পাণ্ডব, আর তাদের পাঁচ পুত্র সবাই এসে তোমার পায়ে পরে যাবে। তুমি দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন, ক্রুর ভাবাপন্ন দুর্যোধনের সঙ্গে ত্যাগ কর’।

কর্ণ তখন তার মনের অভিপ্রায় শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন। এই মুহূর্তগুলি মহাভারতের খুব আবেগময় মুহূর্ত। মহাভারতে যত কাব্যাত্মক বর্ণনা আছে তার মধ্যে এটি একটি অন্যতম কাব্যিক অধ্যায়। এই দৃশ্যগুলিকে নিয়ে পরে যারা উপন্যাস, কাব্য সাহিত্য রচনা করেছেন, সেখানে কর্ণের কথাগুলোকে প্রচণ্ড highlight করেছেন। সিনেমা, থিয়েটারে যতই কবিত্ব ও আবেগপূর্ণ দৃশ্যের পরিবেশ তৈরী করার চেষ্টা করুক না কেন ব্যাসদেবের মূল মহাভারতের এই অংশের কবিত্ব অনন্য, এর সাথে কোন সাহিত্যকেই তুলনা করা যাবে না।

এটা নিশ্চিত ভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কর্ণকে যখন শ্রীকৃষ্ণ তার জন্মবৃত্তান্ত বলেছেন, তার আগে পর্যন্ত কর্ণ জানতো না যে সে কুন্তীর প্রথম সন্তান। এই প্রথম শুনলো। কেননা, এর পরে কুন্তী যখন কর্ণের কাছে তার পরিচয় দিতে এসেছিলেন তখন কর্ণ কুন্তীকে বলেছিল ‘আমাকে আগেই শ্রীকৃষ্ণ আমার জন্মবৃত্তান্ত বলে গেছেন’। সব শেষে ভীষ্মও কর্ণকে বলবেন ‘দ্যাখো, তুমি কুন্তীর প্রথম সন্তান, তাই আমি প্রথম থেকেই তোমাকে আটকাছিলাম যাতে তুমি এদিকে না যাও, যদি কোন রকমে এই যুদ্ধটাকে আটকানো যায়’।

যাই হোক এখানে শ্রীকৃষ্ণকে কর্ণ বলছে ‘হে শ্রীকৃষ্ণ! আমার জন্ম যখন এভাবে হয়েছে, সেই অনুসারে আমিও ধর্মতঃ পাণ্ডু পুত্র, আর সেই কারণে আমি পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমি পাণ্ডবদের দাদা, এতে কোন সন্দেহ নেই’। কর্ণ কেন বললেন ধর্মতঃ পাণ্ডু পুত্র? মনুস্মৃতিতে এই ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, বিয়ের আগে কুমারী অবস্থায় যদি সন্তান হয়ে যায়, বিয়ের পর তারই সন্তান বলে গ্রহণ করা হয়। কর্ণ সূর্য পুত্র, আর বাকিরাও অন্যান্য দেবতাদের থেকে এসেছেন, সেই দিক থেকে কর্ণ সবার দাদা। কর্ণ বলছে ‘কিন্তু আমার মা আমাকে জন্ম দিয়েই ত্যাগ করে দিয়েছিলেন লোকলজ্জার ভয়ে। সন্তান নয় লজ্জাই প্রাধান্য পেয়েছিল আমার মার কাছে। আমারতো বেঁচে থাকার কোন কথাই ছিলনা, যদি না অধিরথ আমাকে তুলে এনে বাড়িতে নিয়ে এসে লালন পালন করত। আমি জ্ঞানাবধি অধিরথ আর রাধাকেই আমার বাবা মা বলে জেনে এসেছি। বড় হবার পর সূত জাতির অনেক মেয়েদের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছে। ওদের থেকে আমার অনেক সন্তান আবার অনেক নাতি-নাতনীও হয়ে গেছে। শুধু তাই না, ওদের প্রতি আমার সত্যিকারের কাম ভাব আছে, সত্যিকারের ভালোবাসা আছে। আর এখন আপনি যদি বলেন আমি ক্ষত্রিয়, তাই বলে কি আমি আমার এই সূত জাতির সবাইকে ছেড়ে দেব! আর সমস্ত পৃথিবীকে যদি পেয়ে যাই, জগতের সমস্ত সুবর্ণ ধনরাশি যদি আমার কাছে চলে আসে আর সেই আনন্দের আতিশায়ে বা কোন ধরণের ভয়ের কারণে ওদের সাথে যে আমার দৃঢ় সম্বন্ধ হয়ে আছে, তাকেতো আর মিথ্যা করে দিতে পারবো না, আর তা আমি কখনই করব না। এরা নীচু জাতি, এরা আমাকে জীবন দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, বড় করেছে, এদের অনেককে আমি বিয়ে করেছি, তাদের থেকে আমার অনেক সন্তানাদি হয়েছে তদুপারি এদের সবার প্রতি আমার মমত্ব ও ভালোবাস রয়েছে। এটা গেল আমার একটা দিক। দ্বিতীয়তঃ, দুর্যোধনের সাহায্য পেয়ে আমি তেরো বছর অকটক ভাবে অঙ্গ রাজ্য ভোগ করেছি। আর ওখানে আমার সূত জাতির আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে আমি অনেক যজ্ঞ করেছি, কূলধর্ম পালন করেছি, বৈবাহিক কার্যাদি সম্পন্ন করেছি। আজ আমার বীরত্বে, আমার শক্তির উপর ভরসা রেখে দুর্যোধন পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সাহস পেয়েছে। সেইজন্য, হে অচ্যুত, আমার পক্ষে তোমার এই অনুরোধকে রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। হে জনার্দন, আমি মৃত্যু ভয়, আমাকে কেউ বেঁধে ফেলবে সেই ভয়, লোভের ভয়, কোন ভয়েই আমি আর এখান থেকে সরে আসতে পারিনা। আর আপনিতো আমার ভালোর জন্যইতো এই সংবাদ দিলেন, আমারও একটা অনুরোধ আছে আপনার প্রতি – আপনি কোন ভাবেই যুধিষ্ঠিরকে আমার জন্ম বৃত্তান্ত বলবেন না, কারণ সে যদি একবার এই ব্যাপারটা জেনে যায়, তাহলে আর কোন মতেই যুধিষ্ঠির রাজ্য গ্রহণ করবে না। এই যুদ্ধ এখন হবেই। আমার রেষারেষি যুধিষ্ঠিরের সাথে নয়, আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অর্জুনের সঙ্গে’। কর্ণ পরে কুন্তীকেও বলবেন, তোমার তো কোন চিন্তা নেই তোমার পাঁচটা সন্তান, পাঁচটা সন্তানই থাকবে, কারণ অর্জুন ছাড়া আমি আর কাউকেই বধ করব না। যখন আমার কেউ ছিল না তখন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে আর আজকে তুমি আমার পরিচয় দিয়ে নিজের সন্তানদের বাঁচাতে এসেছ, এ জিনিষ হয় না।

### যুদ্ধকে কর্ণের যজ্ঞের সাথে তুলনা

কর্ণ যুদ্ধকে একটা যজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করছে। ব্যাসদেব খুব কাব্যিক শৈলীতে লিখছেন – *ধার্তরাষ্ট্রস্য বার্ষ্ণেয়! শস্ত্রযজ্ঞো ভবিষ্যতি। অস্য যজ্ঞস্য বেত্তা ত্বং ভবিষ্যসি জনার্দন। আধ্বর্যধ্বং তে কৃষ্ণ! ক্রতাবসিন্ ভবিষ্যতি।। হোতা চৈবাত্র বীভৎসুঃ সন্নদ্ধঃ স কপিধ্বজঃ। গাণ্ডীবং ব্রুক তথা চাজ্যং বীর্য্যং পুংসাং ভবিষ্যতি।। ঐন্দ্রং পাণ্ডপতং ব্রাহ্মণং জ্ঞণাকর্ণধ্বং মাধব। মন্ত্রাস্তত্র ভবিষ্যন্তি প্রযুক্তাঃ সব্যসাচিনা।।৫/১৩২/২৯-৩১।* ‘হে শ্রীকৃষ্ণ! দুর্যোধনের এখানে এক বিরাট বড় যজ্ঞ হবে, এটা হবে শস্ত্রযজ্ঞ। যার সাক্ষী হবেন আপনি’। সাক্ষী হচ্ছেন ভগবান। আমরা যা কিছুই করি, জগতে যা কিছু হচ্ছে, ভগবান তার সাক্ষী। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না, তিনি সাক্ষী স্বরূপ হয়ে থাকবেন। যেখানে যজ্ঞ হয় সেখানে একজন তন্ত্রধারক থাকেন। তাঁর পাশে একজন বসে থাকেন তাঁকে বলা হয় ব্রহ্মা। সে কিছু করেনা, চুপচাপ বসে থাকে আর লক্ষ্য রাখে কোথাও কোন গোলমাল বা ভুলভাল কিছু হচ্ছে কিনা। এই যজ্ঞের অদ্বর্জর কাজ আপনি করবেন। আর কপিধ্বজ কবচাদির সঙ্গে সুসজ্জিত অর্জুন এই যজ্ঞের হোতা হবে – হোতা হচ্ছে যজ্ঞের যিনি মূল, মানে তিনিই আহুতিটা অর্পণ করেন। অর্জুন হোতা হবে আর আপনি হবেন অদ্বর্জর, অদ্বর্জর মানে হচ্ছে supervisor। গাণ্ডীব ধনুক আর তীর সুবার কাজ করবে, সুবা হচ্ছে কোশাকুশি, বিপক্ষ বীরের পরাক্রম যেটা সেটাই হবে হবনীয় ঘট। অর্থাৎ, ক্ষত্রিয়দের পরাক্রম যেটা, এটাই হবে ঘট। অর্জুন ঐন্দ্র, পাণ্ডপত, ব্রহ্মাস্ত্র ইত্যাদি যে সব অস্ত্র ব্যবহার করবে এটাই হবে বেদ মন্ত্র। যজ্ঞের সঙ্গে যুদ্ধের তুলনা করা হচ্ছে। যজ্ঞে যেমন পুরোহিত থাকে, কুণ্ড থাকে, কোশাকুশি, পাত্র থাকে, বেল পাতা, ঘট থাকে, যজ্ঞের একেকটা জিনিষের সঙ্গে কর্ণ যুদ্ধের একেকটা অঙ্গের তুলনা করে বর্ণনা করছে।

অভিমন্যু এই শত্ৰুযজ্ঞের উদ্গাত্রীর কাজ করবে। উদ্গাত্রী হচ্ছে যিনি যজ্ঞের সময় বেদের স্তোত্র গান করেন, অভিমন্যু স্তোত্র গান করবে। আগেকার দিনে যখন বৈদিক যজ্ঞ হত তখন একজন থাকত যিনি সাম গান করতেন। এরা আহুতি দেবে না, শুধুই সাম গান করে যাবে। শঙ্খ, ভেরী, এটাই হবে সুরব্রক্ষন নাদ – সুরব্রক্ষন নাদ হচ্ছে – ভোরবেলা যে সানাইয়ের ধ্বনি হয় তাকে সুরব্রক্ষন নাদ বলে। যজ্ঞ যেখানে থাকে সেখানে একটা যূপ থাকে তাকে ধ্বজ স্তম্ভ বলে। রথের উপরে যে ধ্বজা গুলো থাকবে সেগুলিই হবে যজ্ঞের যূপ। যূপে বলি দেওয়া হয়। আর হবিষ্য কোনটা হবে? যজ্ঞের খড়া হবে কপাল, মস্তক হবে পুরোডাশ, রুধির হবে হবিষ্য। এগুলো হচ্ছে যজ্ঞের প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক। পুরোডাশ হল চাল, ডাল সব একসঙ্গে যজ্ঞে যেটা অর্পণ করা হয়। আর হবিষ্যটাই পরে সবাইকে প্রসাদ রূপে দেওয়া হয়। গান্ধীবধারী অর্জুন, দ্রোণাচার্য, অশ্বথামা ইত্যাদির উপর যে তীরগুলি নিক্ষেপ করা হবে, সেই বাণ গুলি যজ্ঞের চারিদিকে ছড়ান কুশ ঘাসের মত কাজ করবে। যখন আপনি দেখবেন অর্জুনের হাতে আমি মারা গেছি তখন বুঝবেন এই যজ্ঞের পুনর্নিত্তি কর্ম সম্পন্ন হল। পুনর্নিত্তি হল, যজ্ঞ যখন শেষ হয় তখন যজ্ঞের একটা বিশেষ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ভীমসেন যখন ভীমানাদ করে দুঃশাসনের রক্ত পান করবে তখন বুঝবেন যজ্ঞের সোম অভিষেক কর্ম পূর্ণ হল। যজ্ঞ যখন শেষ হতে থাকে তখন একটা পর্বের পরে পান করা হয়, সেটাকেই সোম অভিষেক কর্ম বলে। যজ্ঞ যখন হয় তখন মাঝে মাঝে একটু বিরতি দেওয়া হয় – যখন দ্রোণাচার্য ভীষ্ম এনারা মারা যাবেন তখন ঐগুলিই হবে যজ্ঞের অবসান। এখানে অবসান মানে শেষ নয় – যজ্ঞের মাঝে মাঝে যে বিরতি দেওয়া হয় সেটাকেই বোঝাচ্ছে। এটাই হচ্ছে real poetry of our Mahabharata. কর্ণ এখানে ধরে নিচ্ছে এরা এভাবে মরবে। কিন্তু এটাতো সম্ভব নয়। ব্যাসদেব এই অংশ পরে রচনা করেছেন। কর্ণ আর শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা চলছিল যে সময়, সেখানেতো ব্যাসদেব উপস্থিত থেকে ডায়েরিতে সব নোট করে রাখেননি। এটাই একটি কাব্যিক রচনা। পরে যখন মহাভারত রচিত হয়েছে তখন কর্ণের মুখে ঐ শব্দগুলো বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা একটা দিক। আরেকটা দিক হল – কর্ণ ক্ষত্রিয় হয়েও যজ্ঞের এতো কিছু জানলেন কি করে? তাও অসম্ভব নয় কারণ কর্ণ রাজা ছিলেন, তাঁর তত্ত্বাবধানে তো প্রতিনিয়ত যজ্ঞ হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের সব কথা শোনার পর বলছেন ‘ঠিক আছে, আমার আর কিছু বলার নেই। এখন শরৎকাল, নদী, জলাশয় সব জলে পরিপূর্ণ, মাঠে এখন প্রচুর তৃণও হয়ে আছে। দুর্যোধনকে তাহলে বলে দিও অমুক দিন তার সব সৈন্যদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হতে আর এদিক থেকে পাণ্ডবরাও তাদের সৈন্যদের একত্রিত করে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হবে। কুরুক্ষেত্রের পাশ দিয়েই গঙ্গা প্রবাহিত তাই জলের সুবিধা আছে আর মাঠ ঘাট এখন সমান তাই রথাদির গতি মসৃণ হবে আর মাঠে প্রচুর ঘাস হয়ে থাকতে ঘোড়া হাতিদের খাদ্যের কোন অসুবিধা হবে না’।

### রুক্মী রাজার কথা

সেই সময় রুক্মী নামে এক রাজা যিনি ভোজদেশ ও দাক্ষিণাত্য দেশের অধিপতি ছিলেন, যার কাছে মাহেন্দ্র ধনুক ছিল আর প্রচুর হাতি ছিল, সে প্রথমে গেল অর্জুনের কাছে। *উবাচ মধ্যে বীরাণাং কুন্তীপুত্রং ধনঞ্জয়ম্। সহায়োহসি স্থিতো যুদ্ধে যদি ভীতোহসি পাণ্ডব।।৫/১৪৭/২১।* অর্জুনকে গিয়ে বলছে ‘আমি এসে গেছি, তোমার আর কোন ভয় নেই। তুমি যদি ভয় পেয়ে থাকো তাহলে তুমি কোন চিন্তা করো না আমি একাই সব দেখে নেব’। ভারতীয়দের এই একটা জাতিগত দোষ, বড্ড বেশী হামবড়া ভাব, সোজা বাংলায় বললে যদি বলতে হয় তা হল বাতেলা বাজ। এখনও এই রোগটা চলছে। কুন্তীপুত্র অর্জুন শুনে হাতজোড় করে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব নিয়ে বলছেন *কৌরবাণাং কুলে জাতঃ পাণ্ডোঃ পুত্রো বিশেষতঃ। দ্রোণং ব্যপদিশন্ শিষ্যো বাসুদেবসহায়বান্।।৫/১৪৭/২৭।* বিখ্যাত কুরুবংশে আমার জন্ম, বিশেষতঃ আমি পাণ্ডুর পুত্র, দ্রোণাচার্যের শিষ্য, শ্রীকৃষ্ণ সর্বক্ষণের সহায় রূপে আমার পাশে থাকেন এবং আমি গান্ধীবধারী, সুতরাং আপনাকে আমি কি করে বলতে পারি যে আমি ভীত হয়েছি। *নাস্মি ভীতো মহাবাহো! সহায়ার্থশ্চ নাস্তি মে। হে রুক্মী! আমি ভীতও হইনি আর কারুর সহায়েরও প্রয়োজন নেই। তাই আপনি যথাকামং যথাযোগং গচ্ছ বাহুদ্রৈব তিষ্ঠ বা।।৫/১৪৭/৩৫।* তাই আপনি যেমন ইচ্ছে করুন, যদি ইচ্ছে হয় তাহলে চলে যান আর যদি ইচ্ছে হয় এইখানেই থাকুন। রুক্মী তখন দুর্যোধনের কাছে গেছে। দুর্যোধনকে গিয়ে এই একই কথা বলছে ‘দুর্যোধন! তুমি যদি ভয় পেয়ে থাক তাহলে আমি আছি, তোমার ভয়ের কিছু নেই’। দুর্যোধনও বলে দিল ‘না, আমি ভয় পেয়ে নেই, আপনি আসতে পারেন’। এই রুক্মীই হল একমাত্র রাজা যে যুদ্ধ করতে এসে যুদ্ধে ভাগ নিতে পারল না। বলরামও যুদ্ধে ভাগ নেননি। কিন্তু তিনি দেখলেন এই যুদ্ধটা ন্যায় সঙ্গত হচ্ছে না, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধবরা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে মরবে আমি নিজের

চোখে দেখতে পারব না। তিনি তাই তীর্থ করতে বেরিয়ে গেলেন। রুব্বী অন্য কারণে যুদ্ধ অংশ নিতে পারল না, সে এস দুই পক্ষকেই বলল তোমরা যদি ভয় পেয়ে থাক, কিন্তু কেউই কাউকে ভয় পাচ্ছে না। সারা দেশে এই দুজনই একমাত্র নামকরা রাজা যারা যুদ্ধ করেনি। মহাভারতের যুদ্ধ হল ধর্মযুদ্ধ, আমরা এখানে কেউ ভয় পেয়ে যুদ্ধ করতে আসিনি। আপনার যে পক্ষকে ঠিক বলে মনে হবে তাহলে সেই পক্ষের সমর্থনে যুদ্ধ করুন।

## ভীষ্মপর্ব

এরপর দু পক্ষই মুখোমুখি এস দাঁড়াবে। সঞ্জয়, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে নানান রকমের শলাপরামর্শ চলছে। যা হয়, যুদ্ধের পরিণতি কি হবে সবাই বুঝে গেছেন বা আন্দাজ করতে পারছেন। একটা যুদ্ধ হওয়ার আগে প্রচুর আলোচনাও চলতে থাকে। এদের মধ্যেও অনেক রকম আলোচনা চলছে। এদিকে দুর্যোধন উলূক নামে একজনকে দূত করে যুধিষ্ঠিরের কাছে পাঠিয়েছে। দুর্যোধনের একমাত্র উদ্দেশ্য উলূককে দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করা। উলূক যুধিষ্ঠিরকে গালাগাল দিয়ে অনেক কথা বলে যাচ্ছে ‘যুধিষ্ঠির! তুমি জুয়াতে হেরেছ, তোমাদের স্ত্রীকে আমরা সভাতে এনে দাঁড় করিয়ে ছেড়েছি তাতেও তোমার কোন লজ্জা হয়নি, তোমার মধ্যে কোন পৌরুষ নেই, তুমি হলে একটা ক্লীব’। ততক্ষণে সবাই যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে গেছে, এমনিতেই যুদ্ধ হবে তাও উলূক বলে যাচ্ছে ‘যদি তোমার মধ্যে পৌরুষত্বের দম থাকে তাহলে এসো যুদ্ধে, লৌহ নির্মিত যত অস্ত্র তীর, তলোয়ার, বর্শা সব তৈরী। কুরুক্ষেত্রের কর্দম সব শুকিয়ে গেছে, রাষ্ট্রা পরিস্কার, আর তোমারও ঘোড়া হাতি সব কিছু মনে হয় তৈরীই আছে। তাই কাল সকালে এসো তখন যুদ্ধ শুরু করা যাবে’। পাণ্ডবরা শুনে মনে মনে খুব রেগে গেলেও মুখে কিছু বলল না।

### শিখণ্ডীর কাহিনী

সব কিছু প্রস্তুত হয়ে গেছে। দু পক্ষের শিবিরে নানা রকম আলোচনা চলছে। এরমধ্যে অম্বার কাহিনী আসে। ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যা অম্বা, অম্বিকা আর অম্বালিকাকে স্বয়ম্বর সভা থেকে জোর করে তুলে নিয়ে এসেছিলেন বিচিত্রবীর্যের সাথে বিয়ে দেবার জন্য। অম্বা কিন্তু পরে ভীষ্মকে বলেছিল ‘আমি শাল্যপতিকে নিজের পতি রূপে মনে মনে গ্রহণ করেছি, আর তিনিও পিতার অজ্ঞাতসারে আমাকে বরণ করেছিলেন’। ভীষ্ম তখন অম্বাকে মুক্তি দিয়ে বলে দিলেন তুমি শাল্যপতির কাছেই যাও। অম্বা শাল্যের কাছে ফিরে এলে শাল্য অম্বাকে বলে দিল ‘আমি তো তোমাকে আর গ্রহণ করতে পারিনি, কারণ তুমি অপরের দ্বারা অধিকৃত হয়েছ, মহাবীর ভীষ্ম তোমাকে জয় করে নিয়েছে তাই তুমি ভীষ্মের কাছেই যাও’। শাল্যের কাছে অপমানিত হয়ে অম্বা মনে করল তার জীবনের এই মর্মান্তিক পরিণতির একমাত্র কারণ ভীষ্ম। ভীষ্ম আমাকে একদিকে জোর করে তুলে নিয়ে এসেছে অথচ আমাকে বিয়েও করবে না, অন্য দিকে শাল্যও ভীষ্ম দ্বারা যেহেতু আমি অধিকৃত হয়েছি সেইজন্য সেও আর আমাকে বিয়ে করতে চাইছে না। ভীষ্মের জন্যই আজ আমার এই দূর্বস্থা। ভীষ্মকে আমি যেভাবেই হোক নাশ করব। তখন অম্বা শিবের তপস্যা করতে চলে গেল। তপস্যায় ভগবান শিবকে সন্তুষ্ট করার পর শিব এসে অম্বাকে বললেন ‘তুমি তো ভীষ্মকে সরাসরি মারতে পারবে না, কিন্তু ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হবে তুমি’। এই অম্বা পরে রাজা দ্রুপদের কন্যা হয়ে জন্ম নিয়েছে। দ্রুপদ রাজার স্ত্রী শিবের কাছে তপস্যা করে বর রূপে একটি পুত্র সন্তান চেয়েছিল। কিন্তু যে জন্ম নিল আসলে সে একটি নপুংসক। কিন্তু এরা একে ছেলে বলেই চালিয়ে দিয়েছে। সবাই জানে এই সন্তানটি দ্রুপদ রাজার ছেলে, এর নাম শিখণ্ডী। শিখণ্ডীকে ছেলে হিসাবে বিয়ে দিয়েছে। রাত্রে রাজকুমারী এসে দেখে আমার সাথে একটা মেয়ের বিয়ে হয়েছে। রাজকুমারী তো হৈচৈ মাচিয়ে দিয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসেছে। দ্রুপদ রাজপরিবারের সবাই লজ্জায় পড়ে গেছে। দ্রৌপদীর থেকে শিখণ্ডী আবার ছোট। শিখণ্ডী তখন মনের দুঃখে আবার শিবের তপস্যায় চলে গেছে। তখন শিব নাকি তাকে ছেলে বানিয়ে দিয়েছিলেন। মূল কথা হল শিখণ্ডী ক্লীব হয়ে জন্মেছিল, ভীষ্মও জানতো শিখণ্ডীই অম্বা আর সে মেয়ে হয়েই জন্মেছে। ভীষ্ম বলে দিয়েছিলেন ‘আমি কোন মেয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করব না। শিখণ্ডী আসলে মেয়ে যদিও সে রাজকুমার হয়ে যুদ্ধ করতে আসছে কিন্তু এর সামনে আমি যুদ্ধ করব না’। শিখণ্ডী কোন ভাবে ক্লীব ছিল আর ভীষ্মের উপর তার রাগটাও ছিল। দ্রুপদতো দ্রৌণের উপর আগে থাকতে রেগে ছিল, দ্রুপদ, দ্রৌপদী, ধৃষ্টদ্যুম্ন এদের সবারই কৌরবদের প্রতি বিদ্বেষ থেকেই গিয়েছিল। দ্রৌপদী আর ধৃষ্টদ্যুম্নই দ্রুপদের সন্তান বলে আমার জানি কিন্তু শিখণ্ডীও যে দ্রুপদের সন্তান অনেকেই জানে না। মহাভারতেও শিখণ্ডীকে বেশী সামনে নিয়ে আসা হয়নি, শুধু ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ রূপেই দেখান হয়েছে।

### অক্ষৌহিণীর বিবরণ

এরপর শুরু হবে সেনাপতি নির্বাচন। এদিকে কর্ণ বলে দিয়েছে ভীষ্ম যত দিন বেঁচে আছেন আমি তত দিন অস্ত্র ধারণ করব না। শ্রীকৃষ্ণ তখন শেষবারের মত কর্ণকে বাজিয়ে দেখে নেবেন। কর্ণকে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ‘তুমি তো বলে দিয়েছ যত দিন ভীষ্ম বেঁচে আছেন তত দিন তুমি অস্ত্র ধারণ করবে না। এই কদিন না হয় তুমি পাণ্ডবদের হয়েই যুদ্ধ করে তুমি ক্ষত্রিয়ের শৌর্যকে প্রকাশ কর’। কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের ঐ প্রস্তাবটাও না করে দিয়েছে। কৌরবদের সেনাপতি হলেন ভীষ্ম আর ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডব পক্ষের সেনাপতি। এখানে বর্ণনা করছেন বেগবতী গঙ্গার প্রবাহের মত পাণ্ডবদের সৈন্যদের দেখাচ্ছে। এইভাবে পরের পর দুটো পক্ষ মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। দুই পক্ষ মিলিয়ে মোট আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্য কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে সমবেত হয়েছিল। এখনকার সেনাবাহিনীতে যেমন প্লাটুন, ব্যাটালিয়ান, রেজিমেন্ট হয় তখনকার দিকে এইগুলোকেই বলা হত মহতী, চমু, গীতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম দিকে চমুর উল্লেখ পাই। বলা হয় তিরিশটা চমুতে এক অক্ষৌহিণী।

এক অক্ষৌহিণীতে ২১,৮৭০টি রথ, ২১,৮৭০টি হাতি, ৬৫,৬১০টি ঘোড়া আর ১,০৯,৩৫০টি পদাতিক। যদি আমরা সব কিছুকে মিলিয়ে মানুষ, ঘোড়া, হাতি একসাথে নিয়ে দেখি, যেমন একটি রথে সাধারণত চারটে ঘোড়া থাকত, তাহলে এক অক্ষৌহিণীতে মানুষ পশু মিলিয়ে ৬,৩৪,২৪৩টি প্রাণি থাকত। তাহলে আঠারোটি অক্ষৌহিণীতে ৩,৯৩,৬৬০টি হাতি, ২৭,৫৫,৬২০টি ঘোড়া, ৮২,৬৭,০৯৪ জন মানুষ। এর মধ্যে কিছু হিসেব মিলবে না, তার কারণ একটা হাতি যখন চলত তখন হাতিতে একজন যোদ্ধাই থাকত, কিন্তু হাতিকে চালাবার জন্য হাতির সামনে একজন আর পেছনে একজন থাকত, তার মানে হাতি পিছু তিন জন মানুষ। কিন্তু রথের হিসেবে খুব গোলমাল হত। সাধারণ যোদ্ধারা কেউ রথে বসে যুদ্ধ করত না, কেননা রথে বসে যুদ্ধ করাটা একটা আলাদা কৌশল, সবার দ্বারা এই কৌশল আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। রথের দুই পাশে দুজন করে থাকত, এদের বলা হয় চক্ররক্ষক, রথের চাকাকে রক্ষা করা ছিল তাদের কাজ। খুব শক্তিমান যোদ্ধাকেই চক্ররক্ষক করা হত। ভীমকেও কয়েকবার চক্ররক্ষক করা হয়েছিল। মূল যুদ্ধ রথে বসে মুখোমুখি হচ্ছে কিন্তু পাশ থেকে যাতে কেউ আক্রমণ করতে না পারে সেইজন্য চক্ররক্ষক রাখা হত। রথের পেছনের দিকেও একজন যোদ্ধা থাকত তাকে বলা হত পার্শ্বরক্ষক, এরও কাজ ছিল পেছন থেকে কেউ যেন অতর্কিত ভাবে আক্রমণ না করে বসে। একটি রথে মোট পাঁচ জন করে যোদ্ধা থাকত। এক মহাভারতের যুদ্ধেই কত লোক জড়িয়ে পড়েছিল, সব মিলিয়ে প্রায় এক কোটি লোকের কাছাকাছি। অনেকে বলে এগুলো অতিরঞ্জিত, কিন্তু এই হিসেবকে আজ পর্যন্ত কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেনি। এমনকি মুসলিম ঐতিহাসিক আল বিরুনি, দশম শতাব্দীতে ভারতে এসেছিলেন, তিনিও এই হিসেব যেমনটি আছে ঠিক তেমনটিই লিখেছেন, যদিও উনি মহাভারতের অনেক কিছু নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছেন কিন্তু যুদ্ধ নিয়ে কোন প্রশ্ন করেননি।

এখানে যে বিরামি লক্ষ লোকের হিসেব দেওয়া হয়েছে, বিরামি লক্ষের সাথে আরও পনের কুড়ি লক্ষ লোক বাড়িয়ে দিতে হবে, এরা সবাই ছিল সরবরাহ কাজে নিযুক্ত। ঘোড়া হাতির খাবার-দাবার প্রত্যেক দিন যুদ্ধের মাঝখানে সরবরাহ করা হত, কিন্তু হাতি-ঘোড়ারা যে ঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া করতে পারত বলে মনে হয় না, কারণ কখন কোন যুদ্ধে লেগে আছে আর কতক্ষণ ধরে যুদ্ধ করবে কিছু বলা যেত না। এক জায়গায় শুধু একটা উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, আমাদের ঘোড়াগুলো খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওদের একটু জল খাওয়ার দরকার। টানা যুদ্ধ যে হত তা নয়, দু-তিন ঘণ্টা যুদ্ধ করে আবার সরে যেত। যুদ্ধভূমিতে অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করা হত গরুগাড়ী করে।

অর্জুন যখন যুদ্ধ করছেন তখন অর্জুন একাই যুদ্ধ করছেন না। ধরুন অর্জুনের সাথে দুর্যোধনের লড়াই চলছে, তখন অর্জুনের রথে অর্জুন ছাড়া আরও চার জন আছে, তার সাথে প্রত্যেকের একজন করে দেহরক্ষী দেওয়া আছে, অর্জুনকে একটা বিশেষ সৈন্যবাহিনী দেওয়া আছে। এখন অর্জুন এই পুরো গ্রুপটার কমান্ডার, অর্জুন যেদিকে যাবে অর্জুনের পুরো বাহিনী, দশ হাজার, কুড়ি হাজার যত সৈন্যই থাকুক, সবাই একসাথে অর্জুনের দিকে ঘুরে যাবে। যেমনি অর্জুন ডান দিকে ঘুরে গেল পুরো গ্রুপটা ডান দিকে ঘুরে যাবে। অর্জুনের রথে পতাকা থাকত, সবাই ঐ পতাকাটাকে লক্ষ্য রেখে অনুসরণ করত। যখনই বলা হয় অর্জুন দ্রোণাচার্যের সাথে লড়াই করছেন, তার মানে অর্জুন একা লড়াই করছে না তার সাথে কুড়ি হাজার সৈন্য আছে আবার ঐদিকে দ্রোণাচার্যেরও কুড়ি হাজার সৈন্য আছে, কিন্তু নাম হত কমান্ডারের। এর ব্যতিক্রম দেখা যায় অভিমন্যুর ক্ষেত্রে, চক্রব্যূহতে অভিমন্যু যখন প্রবেশ করে গিয়েছিল তখন সে একাই ঢুকে গিয়েছিল। আর অর্জুন যখন জয়দ্রথকে বধ করতে গিয়েছিল তখন অর্জুন একাই চলে গিয়েছিল। কিন্তু একা চলে গেলেও পরে ভীম আর সাত্যকিকে পাঠানো হয়েছিল। ভীম আর সাত্যকি একা চলে গেলেও ওদের সাথে দেহরক্ষী আর আরও অনেক লোক থাকবে। আমরা প্রায়ই যে মনে করি অর্জুন ভীম এরা একা একজনের সাথে লড়াই করছে তা নয়, তাদের পুরো সৈন্য

বাহিনী তাদের সাথে থাকত। এখন এই সৈন্যদের খাবার-দাবার, জল আরও আনুষঙ্গিক জিনিষ পত্র সরবরাহ করার জন্য একটা আলাদা সরবরাহ লাইন থাকত, রথের মধ্যেও জল ও অন্যান্য খাবার-দাবার রাখা থাকত, কিন্তু অর্জুনতো একা যুদ্ধ করছে না, তার সাথে হয়তো কুড়ি হাজার সৈন্য রয়েছে। এদের যারা সব কিছু সরবরাহ করত এদের কাছে খবর চলে যেত এখন কোথায় এরা যুদ্ধ করছে, সেখানে উট গাড়ী বা গরুগাড়ী করে সব কিছু পৌঁছে দিত। এর মধ্যে এরা আবার কিছুক্ষণ বিশ্রামও করে নিত।

### ধর্মযুদ্ধের নিয়ম কানুন নিরূপণ

যুদ্ধ শুরু আগের কৌরব আর পাণ্ডব পক্ষের কয়েকজন নামকরা যোদ্ধারা যুদ্ধের নিয়ম-কানুন ঠিক করতে আলোচনায় বসে গেলেন। এইটাই ধর্মযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য। ধর্মযুদ্ধে আমার তোমার মধ্যে এমনিতে কোন ঝগড়া বিবাদ নেই, একটা সমস্যা হয়ে গেছে এটাকে অন্য কোন উপায়ে মেটানো যাচ্ছে না তাই লড়াই করে মীমাংসা করে নেওয়া হোক কে ঠিক। প্রথম নিয়ম করলেন, সূর্যাস্তের পর যুদ্ধ যখন শেষ বলে ঘোষণা করা হবে তখন আমাদের যেমন বন্ধুত্ব তেমনই থাকবে। সেই সময় কোন ধরনের শত্রুপূর্ণ আচরণ বা উত্তেজনা মূলক কথাবার্তা করা যাবে না। যার জন্য দেখা গেছে চিকিৎসার জন্য এই পক্ষের বৈদ্য বিরোধী পক্ষের যোদ্ধার কাছে গিয়ে শুশ্রূষা করছে। দিনের মত যুদ্ধ যখনই শেষ হত তখন আমরা যেমন বন্ধু তেমন বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবই বজায় থাকবে। যেমন আমরা পরে দেখতে পাই যুধিষ্ঠির ভীষ্মের শিবিরে পৌঁছে গেছেন জিজ্ঞেস করতে আপনাকে কিভাবে বধ করা যাবে। আরেকটা নিয়ম হল, যে বাকযুদ্ধে প্রবৃত্ত তার সঙ্গে বাকযুদ্ধই করতে হবে। যে সেনা দলের বাইরে চলে আসবে তার সঙ্গে আর যুদ্ধ করা যাবে না। অনেক সময় দেখা গেছে ভীষ্ম বা দ্রোণ কোন কারণে যুদ্ধ থেকে সরে এসেছেন তখন আর তাঁদের সাথে যুদ্ধ করা হত না। যে ব্যূহ রচিত হয়েছে সেই ব্যূহের বাইরে আর যুদ্ধ করা যাবে না। আর সমানে সমানে লড়াই হবে, রথী রথীর সাথে, হাতি হাতির সঙ্গে, পদাতিক পদাতিকের সঙ্গে। ব্যূহটা এমন ভাবে তৈরী করা হয় যাতে এক অপরকে হারিয়ে না দেয়। ব্যূহ রচনাটাও একটা বিজ্ঞান। এক পক্ষ দেখে নিত তার বিরোধী পক্ষ কি ব্যূহ রচনা করেছে। যখন দেখল এরা সর্পব্যূহ তৈরী করেছে, সর্পব্যূহ মানে লম্বা একটা লাইন চলে গেছে। অন্যরা তখন একটা বাজপাখীর ব্যূহ রচনা করবে। যুদ্ধে এই ব্যূহ রচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আলেকজান্দার যে যুদ্ধ জিতেছিল শুধু মাত্র এই ব্যূহ রচনার কৌশলের জোরে। নেপোলিয়নও ব্যূহ রচনায় খুব দক্ষ ছিলেন। নেপোলিয়ন একবার তার শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করে বলছে তোমরা এক্ষুণি আত্মসমর্পণ কর। শত্রুপক্ষের যে কমান্ডার সে নেপোলিয়নকে বলছে ‘তোমার মাত্র তিরিশ হাজার সৈন্য আর আমাদের নব্বুই হাজার, এই নব্বুই হাজার সৈন্য তোমাদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে’। নেপোলিয়ন বলছে ‘আমাকে তুমি ভুলে গেছে, আমি একাই এক লাখ, আমরা তাই এক লাখ তিরিশ হাজার’। ওরা তো নেপোলিয়নকে মানবে না। যুদ্ধ হল। নেপোলিয়ন তাদের একাই পিটিয়ে দিল শুধু এই ব্যূহ রচনার জোরে। মহাভারতের যুদ্ধেও এই ব্যূহ রচনার উপরে খুব জোর দেওয়া হয়েছিল। যদি দেখত কাজ হচ্ছে না সঙ্গে সঙ্গে ব্যূহটাকে পাল্টে দিতেন। দ্রোণাচার্য যখন দেখলেন অর্জুন জয়দ্রথকে মারতে যাবে তক্ষুণি তিনি শকটব্যূহ তৈরী করে দিলেন। যদি ওপর থেকে ছবি নেওয়া হয় মনে হবে যেন একটা রথ দাঁড়িয়ে আছে আর ঐ রথের একেবারে পেছনে একটা ছুঁচের মত ব্যূহ করলেন, সেই ছুঁচের যেখানে ফুটো থাকে সেখানে জয়দ্রথকে বসিয়ে রেখেছেন। জয়দ্রথের কাছে যদি পৌঁছাতে হয় তাহলে এই পুরো রথকে পার করে ঐ ছুঁচের কাছে যেতে হবে, সেখানে আবার ঐ ছুঁচকে পার করে তার ছেঁদার কাছে যেতে হবে, তবে গিয়ে জয়দ্রথের নাগাল পাবে। আবার যখন চক্রব্যূহ তৈরী হচ্ছে তখন পুরো কাঠামোটা গোল হয়ে যাচ্ছে, আর সাত খানা প্রবেশদ্বার করে দেওয়া হচ্ছে। যে একবার ঢুকে পড়বে সে পথ খুঁজে না পেয়ে একেবারে গোলকধাঁধার মত ঘুরতে থাকবে। আমি কি চাইছি আর শত্রুর ব্যূহ কি রকম হয়েছে সেই দেখে ব্যূহ রচনা পাল্টাতে থাকে।

আরেকটা নিয়ম হল যার যেমন ক্ষমতা সে সেই রকম লোক দেখেই লড়াই করবে। একটা শীর্ণকায় সৈন্যকে অর্জুন কখনই আক্রমণ করতে পারবেন না। সাবধান না করে কারুর উপর আক্রমণ করা যাবে না, তার নজর আগে তোমার দিকে নিয়ে এসে তারপর তাকে মারবে, তার আগে মারা যাবে না। যে অসাবধান বা ঘাবড়ে আছে তার উপর আক্রমণ করা যাবে না। যখন একজন একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে তখন অন্য কেউ গিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। লড়াই সব সময় একজনের সাথেই হবে। যে শরণাগত হয়ে গেছে তাকে কিছু করা যাবে না। যে যুদ্ধভূমি থেকে পালিয়ে যাচ্ছে তাকে আক্রমণ করা যাবে না। যার অস্ত্র-শস্ত্র শেষ হয়ে গেছে তাকে আর আক্রমণ করা যাবে না। যারা ঘোড়া হাতির সেবা করছে, যারা সরবরাহ করছে, মাল বহন করছে, যারা শঙ্খ ধ্বনি করছে তাদের উপর কোন আক্রমণ করা চলবে না। সব নিয়ম-কানুন তৈরী হয়ে যাওয়ার পর সবাই খুব খুশী হয়ে গেলেন। আমাদের ভারতীয় পরম্পরা এইভাবে ছিল। লড়াই শুরু



করার আগে ঠিক করে নিতে হবে আমরা কিভাবে লড়াই করব। তাই আলেকজান্দার যখন ভারতের উপর আক্রমণ চালাল তখন ভারতীয়রা ঠিক বুঝতে পারেনি এটা কি ধরনের লড়াই হচ্ছে। আর মুসলমানদের আক্রমণের সময় সবাই হতবাক হয়ে গিয়েছিল। বিদেশীরা তো এই সব নিয়ম-কানুন কিছু মানবে না। মুসলমানদের উদ্দেশ্যই ছিল ইসলাম ধর্ম ভারতে প্রতিষ্ঠিত করা আর এই দেশের ধন সম্পদ লুট করা। ফলে যখন হিন্দুরা কেউ পালিয়ে যাচ্ছে মুসলমানরা তাদেরও গলা কেটে দিচ্ছে। শ্রীলঙ্কাতে যখন ভারতের শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানো হয়েছিল তখনও ঠিক এই ঝামেলা হয়েছিল। প্রভাকরণের এলটিটি বাহিনীরা যুদ্ধের কোন নিয়ম-কানুনকে তোয়াক্কা করত না। জেনেভা চুক্তিতে নিয়মই করা হয়েছিল বন্দীদের সাথে অন্য ধরনের ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু শ্রীলঙ্কার এলটিটিরা এসব কিছুই মানতো না, এগুলো হল বর্বরতা। যার জন্য ভারতকে শান্তিরক্ষা বাহিনীকে তুলে নিতে হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে যদি কাউকে বন্দী করা হয় এরপর তাকে যদি বলা হয় তোমার একটা একটা করে আঙুল কাটবো, এই ধরনের বর্বরতা হলে কেউ যুদ্ধ করতে যাবেই না। লড়াই যখন হচ্ছে তখন আমি মরে যাব ঠিক আছে, কিন্তু একবার যখন আত্মসমর্পণ হয়ে গেছে, বন্দী হয়ে গেলে এই ধরনের বর্বরতা চলে না।

### ভীষ্মের শরশয্যার খবর নিয়ে সঞ্জয়ের ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আগমন

যুদ্ধের নিয়ম-কানুনও সব তৈরী হয়ে গেল। কাল সকাল হলেই যুদ্ধ শুরু হবে। এদিকে ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধে কি হবে ভেবে ছটফট করছে। তখন ব্যাসদেব এসে ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য দৃষ্টি দিতে চাইলেন, যাতে যুদ্ধের সব কিছু দেখতে পায়। ধৃতরাষ্ট্র তখন বলছেন ‘আমার দিব্য দৃষ্টি চাইনা, এই নরসংহার আমি নিজের চোখে দেখতে পারবো না’। তারপর সঞ্জয়কে ব্যাসদেব দিব্য দৃষ্টি দিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে যা কিছু হচ্ছে সঞ্জয় ইচ্ছে করলে সব কিছুই জানতে পারবে। সঞ্জয় আসলে রণভূমিতেই থাকত, মাঝে মাঝে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে সব খবরাখবর দিয়ে যেত।

সঞ্জয়কে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে ব্যাসদেব চলে গেছেন। এখান থেকে দুম্ করে একেবারে যুদ্ধের দশ দিন পরের এক বড় খবর নিয়ে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেছে। খুব দুঃখ করে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন *কুরুদং সর্বযোধানাং ধাম সর্বধনুঘ্নতাম্। শরতল্পগতঃ সোহদ্য শেতে কুরুপিতামহঃ।।৬/১৩/৪।* ‘সমস্ত যোদ্ধার মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত ধনুর্ধরগণের গৌরবের পাত্র ছিলেন, সেই কুরুপিতামহ ভীষ্ম আজ শরশয্যায় শায়িত হয়ে আছেন’। খবর সবই ধৃতরাষ্ট্র পেয়ে যেতেন, টানা দশ দিন ধরে যুদ্ধ চলছে কোন খবরই ধৃতরাষ্ট্র পাবেন না এটা ঠিক মানা যায় না, যেখানে হস্তিনাপুর আর কুরুক্ষেত্রের মধ্যে দূরত্ব খুব বেশী নয়। সঞ্জয় রণভূমিতেই থাকত, দিন দশেক পরে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে খবর দিলেন ভীষ্ম শরশয্যায় পড়ে আছেন। খবর পেয়েই ধৃতরাষ্ট্র খুব ভেঙে পড়েছেন, চোখের জল ফেলছেন। যিনি দেবতাদের কাছেও অপরাজিত, যাঁর ইচ্ছামৃত্যু তাঁর কিভাবে পতন হল!

সঞ্জয় তখন ধৃতরাষ্ট্রকে বলছে ‘আপনি তখন থেকে কেন প্রশ্ন করে যাচ্ছেন পিতামহ ভীষ্মের কি করে পতন হয়ে গেল। কি করে হয়ে গেল মানে? যে মানুষ দুষ্কর্ম করে তখন সে পাপকর্মের ফল পায়, আর তখন যে আপনি ভাববেন আপনার পাপের ফল অপরের জন্য হচ্ছে তা নয়, নিজের পাপের ফল আপনি নিজেই নিন। এতদিন ধরে আপনিই সব গোলমাল করিয়েছেন। কি করে হয়ে গেল যে তখন থেকে বলে যাচ্ছেন! যা কিছু হয়েছে আপনার জন্যই হয়েছে। *য আত্মনো দুষ্টচরিতাদশুভং প্রপুয়ান্নরঃ। এনসা তেন নান্যং স উপাশঙ্কিতুমহতঃ।।৬/১৫/২।* কারণ যে লোক নিজের দোষে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে লোক অন্যকে কোন ভাবেই দোষী বলে আশঙ্কা করতে পারে না।

### অর্জুনের দুর্গাশ্রুতি ও অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের গীতার উপদেশ দান

সঞ্জয় একটু খবর দিয়ে দু-চারটে কথা বলার পর ধৃতরাষ্ট্র বলছেন ‘তুমি আমাকে সংক্ষেপে না বলে একটু বিস্তারিত ভাবে প্রথম থেকে বল এই দশ দিন কি কি হয়েছে’। ধৃতরাষ্ট্র এই সব বলার পর সঞ্জয় বলে যাচ্ছেন, বলছেন *যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ* আবার বলছেন *যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ*। দুটো শ্লোককে এক করে কৃষ্ণ আর ধর্ম এই দুটোকে এক করে দিচ্ছে। প্রথমে বলছে যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। তারপরের শ্লোকেই বলছেন যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়। তারপর আবার বলছেন *গুণভূতো জয়ঃ কৃষ্ণে পৃষ্ঠতোহভ্যোতি মাধবম্। তদ্যথা বিজয়শাস্য সন্নতিশ্যাপরো গুণঃ।। ৬/২১/১৩।* জয় হল শ্রীকৃষ্ণেরই একটি রূপ। শ্রীকৃষ্ণ যে পথ দিয়ে যাবেন জয় তাঁর পেছনে অনুসরণ করতে থাকবে। সেইজন্য এখন আর আফশোষ করে কিছু লাভ নেই। সঞ্জয় একটু খাপছাড়া খাপছাড়া করে বলছে আর ধৃতরাষ্ট্রও বলছেন তুমি সব কিছু খুলে আমাকে বল। তখন সঞ্জয় আবার বলছে ‘যখন যুদ্ধ শুরু হবে তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন ‘হে

অর্জুন! তুমি মা দুর্গার স্তুতি কর'। শ্রীকৃষ্ণ বলাতে অর্জুন মা দুর্গার মূর্তি গড়ে পূজা করলেন। চণ্ডীতে যেমন দেবীর স্তুতি আছে সেই রকম এখানেও অর্জুন মা দুর্গার স্তুতি করছেন।

নমস্তে সিদ্ধসেনানি! আর্যো! মন্দরবাসিনি। কুমারি! কালি! কাপালি! কপিলে! কৃষ্ণপিজলে।।  
 ভদ্রকালি! নমস্তভ্যং মহাকালি! নমোহস্ততে। চণ্ডি! চণ্ডে! নমস্তভ্যং তারিণি! বরবর্ণিনি।।  
 কাত্যায়নি! মহাভাগে! করালি! বিজয়ে! জয়ে। শিখিপিচ্ছধ্বজধরে! নানাভরণভূষিতে।।  
 অটুশূলপ্রহরণে! খড়্গাখটকধারিণি। গোপেন্দ্রাস্যানুজে! জ্যেষ্ঠে! নন্দগোপকুলোদ্ভবে।।  
 মহিষাসৃকপ্রিয়ে! নিত্যং কৌশিকি! পীতবাসিনি। অটুহাসে! কাকমুখি! নমস্তেহস্ত রণপ্রিয়ে।।  
 উমে! শাকমুরি! শ্বেতে! কৃষ্ণে! কৈটভনাশিনি। হিরণ্যাক্ষি! বিরূপাক্ষি! সুধুম্রাক্ষি! নমোহস্ত তে।।  
 বেদশ্রুতিমহাপূণ্যে! ব্রহ্মণ্যে! জাতবেদসি। জম্বুকটকচৈত্রেয়শ্চ নিত্যং সন্নিহিতালয়ে।।  
 তুং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্। ঋন্দমাতর্ভগবতি! দুর্গে! কান্তারবাসিনি।।  
 স্বাহাকারঃ স্বধা চৈব কলা কাষ্ঠা সরস্বতী। সাবিদ্রী বেদমাতা চ তথা বেদান্ত উচ্যসে।।  
 স্তুতাসি তুং মহাদেবি! বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা। জয়ো ভবতু মে নিত্যং তুং প্রসাদাদ্রণাজিরে।।  
 কান্তারভয়দুর্গেশু ভক্তানাং মালয়েশু চ। নিত্যং বসসি পাতালে যুদ্ধে জয়সি দানবান্।।  
 তুং জম্বনী মোহিনী চ মায়া হ্রীঃ শ্রীশ্চৈব চ। সঙ্ক্যা প্রভাবতী চৈব সাবিদ্রী জননী তথা।।  
 তুষ্টিঃ পুষ্টির্ধৃতিদীপ্তিশ্চন্দ্রাদিত্যবিবর্দ্ধিনী। ভূতিভূতিমতাং সংখ্যে বীক্ষ্যসে সিদ্ধচারণৈঃ।। ৬/২৩/৪-১৬

স্তুতির পর মা দুর্গা খুশী হয়ে অর্জুনকে আশীর্বাদ দিয়ে বললেন ‘তোমার চিন্তার কিছু নেই, তোমারই জয় হবে’। ধৃতরাষ্ট্রও আবার বলছেন তুমি একেবারে প্রথম থেকে বল। এইবার সঞ্জয় প্রথম থেকে বলতে শুরু করলেন। এইখানেই গীতা শুরু হচ্ছে। গীতার বিশদ আলোচনা আমরা যেহেতু অন্য জায়গায় করেছি সেইজন্য আলাদা করে গীতার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে না।

### যুদ্ধের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীষ্ম-দ্রোণাদির আশীর্বাদ প্রার্থনা

অর্জুন প্রথমে মোহগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপদেশ দেওয়ার পর অর্জুনের মোহ দূরীভূত হয়েছে। অর্জুন এখন আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। এইবার যুদ্ধ যখন ঠিক শুরু হতে যাচ্ছে তখন সবাই দেখছে যুধিষ্ঠির হঠাৎ রথ থেকে নেমে কৌরবদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। যুধিষ্ঠিরের ঐ কাণ্ড দেখে কৌরবদের সব সেনারা হাহা হিহি করে বিদ্রূপাত্মক হাসি হাসতে শুরু করেছে। এই যুধিষ্ঠির হল কাপুরুষ, ভয়ে দুর্যোধনের কাছে শরণ নিতে আসছে। কৌরবদের এগারো অক্ষৌহিণী আর পাণ্ডবদের সাত অক্ষৌহিণী, সেই কারণে যুধিষ্ঠির ভয় পেয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণও কিছু বুঝতে পারছেন না, অর্জুনও বুঝতে পারছে না কি করতে চাইছেন যুধিষ্ঠির। শ্রীকৃষ্ণ একটু পরেই বুঝতে পারলেন। যুধিষ্ঠির সোজা হাঁটতে হাঁটতে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য আর মামা শল্যকে গিয়ে প্রণাম করে বললেন ‘আশীর্বাদ করুন যাতে আমরা জয়ী হই’। চারজোনই যুধিষ্ঠিরকে একই কথা বললেন, এটি খুব বিখ্যাত কথা অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্তররতগী ন কস্যচিৎ। ইত সত্যং মহারাজ বন্ধোহসম্যর্থেন কৌরবৈঃ।। ৫/৪৩/৫১ ‘মানুষ অর্থেরই দাস হয়, অর্থ কখনই মানুষের দাস হয় না। আমি কৌরবদের কাছে অর্থ দিয়ে বাঁধা, তাই তোমার হয়ে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কি চাও তাই বল’। এই জায়গাটা আমাদের কাছে খুবই আশ্চর্যজনক মনে হয়। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনকে রক্ষা করবেন কিন্তু তিনি কেন এইভাবে দুর্যোধনের অর্থের দাস বলছেন বোঝা যায় না। দ্রোণাচার্যের ব্যাপারে না হয় বলা যেতে পারে তিনি হস্তিনাপুরের রাজ পরিবারের একজন বেতনভূক শিক্ষক আর তাছাড়া দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বথামার সাথে দুর্যোধনের বন্ধুত্ব ছিল, তাই অশ্বথামা যедিকে থাকবে দ্রোণাচার্যও সেই দিকেই থাকবেন। আর দ্রোণাচার্য ও অশ্বথামা যедিকে থাকে কৃপাচার্যও সেদিকেই থাকবেন। কারণ কৃপাচার্য হলেন অশ্বথামার মামা। শল্যকে দুর্যোধন কায়দা করে কৌরবদের দিকে টেনে নিয়েছেন। কিন্তু চারজোন যুধিষ্ঠিরকে একই কথা বলছেন। যুধিষ্ঠির আশীর্বাদ চাইলে ভীষ্ম বলছেন আমি অপরাজেয় আমাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না, দ্রোণাচার্যও বলছে যতক্ষণ আমার হাতে অস্ত্র আছে আমাকে কেউ হারাতে পারবে না আর কৃপাচার্য বলছেন দেখো ভাই আমি হল্যম অবধ্য আমাকে কেউ বধ করতে পারবে না। কৃপাচার্য কিন্তু সত্যিই শেষ

পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। আরেকটি কথা এই চারজোনই যুধিষ্ঠিরকে বলছেন ‘তুমি যদি আমার আশীর্বাদ না নিতে আসতে তাহলে আমি অভিশাপ দিয়ে দিতাম। তুমি এইভাবে আশীর্বাদ নিতে এসেছ বলে আমি খুব খুশী হয়েছি’।

### ভীষ্ম বধার্থে শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র হস্তে রথ থেকে অবতরণ

যুধিষ্ঠির সবার আশীর্বাদ নিয়ে নিজের শিবিরে ফিরে আসার পর শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে আঠারো দিনের ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশকারী এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ঘোষণা করা হল। যুদ্ধ শুরু হতেই একের পর মানুষের মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়ে গেল। এইভাবে এক দিন কেটে গেল, দুই দিন কেটে গেল কিন্তু পাণ্ডবদের কোন ভাবেই পর্যুদস্ত করা যাচ্ছে না, উপরন্তু কৌরবদের সৈন্যই যেন বেশী ক্ষয় হতে লাগল। দুর্যোধন এতে ভীষ্মের উপর খুব রেগে গিয়ে বলছে ‘পাণ্ডবদের প্রতি আপনার অতিরিক্ত স্নেহ বলেই আপনি ইচ্ছে করে নিজের পুরো শক্তিকে যুদ্ধে প্রয়োগ করছেন না’। তখন ভীষ্ম বললেন ‘ঠিক আছে কাল তুমি আমার প্রতাপ দেখতে পাবে’। তৃতীয় দিন ভীষ্ম এত তেজ প্রকাশ করতে লাগলেন যে পাণ্ডবদের প্রচুর সৈন্য ক্ষয় হতে থাকল। ভীষ্ম বিরাট নর সংহার করতে থাকলেন। এই দিনই অর্জুন ঠিক ঠিক ভীষ্মের মুখোমুখি হয়েছেন। অর্জুনের মনেও একটু অবসাদের ছায়া এসে গেছে ‘তিনি আমার প্রপিতামহ, আমাকে কত স্নেহ করতেন, তাঁর সঙ্গে এই যুদ্ধ আমি কি করে করব’। অর্জুন যুদ্ধ করছেন কিন্তু তাঁর তীর যেন চলছে না, আর এদিকে ভীষ্ম একের পর এক বধ করে যাচ্ছেন। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বারংবার বলে যাচ্ছেন ‘কি হচ্ছে অর্জুন! কোথায় গেল তোমার সেই পরাক্রম’! অর্জুনের ভেতরে কিন্তু কিছুতেই সেই শক্তি আসছে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের এই দুর্বলতা দেখে খুব রেগে গিয়ে বলছেন ‘তুমি আমার সব কার্যক্রমকে নষ্ট করে দিলে। আমি যুধিষ্ঠিরকে কথা দিয়েছি তাঁকে রাজসিংহাসনে বসাব। তোমার উপর নির্ভর করেই আমি যুধিষ্ঠিরকে কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন তোমার উপর আর আমি নির্ভর করে থাকতে পারছি না। এই দেখো আমিই এবার ভীষ্মকে শেষ করে দিচ্ছি’। এই বলে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করলেন। স্মরণ করা মাত্রই সুদর্শন চক্র শ্রীকৃষ্ণের আঙুলে এসে হাজির হয়ে গেল। এখানে সুদর্শন চক্রের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে তৎ কৃষ্ণকোপোদয়সূর্য্যবুদ্ধং ক্ষুরান্ততীক্ষ্ণাগ্রসূজাতপত্রম্। তসৈব দেহোরুসরঃপ্রকটং ররাজ নারায়ণবাহুনালাম্।। ততঃ সূনাভং বসুদেবপুত্রঃ সূর্য্যপ্রভং বজ্রসহস্রতুল্যম্। ক্ষুরান্তমুদ্রাম্য ভুজেন চক্রং রথাদবপ্ল্যত্য বিসৃজ্য বাহান্।। ৬/৫৯/৮৯-৯০। মনে হচ্ছে যেন শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ-রূপ সূর্য্য কর্তৃক প্রকাশিত এই চক্র। চক্রের গায়ে হলুদ বর্ণের খণ্ড আকাশের গায়ে মেঘের মত শোভা দিচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের তেজের মতই এই চক্র সূর্য্যের কিরণ সাদৃশ্য ঔজ্জ্বলে দীপ্তমান। পুরোটাই লোহার নির্মিত এই চক্র আর তার চারিদিকে বড় বড় ক্ষুরধার লোহার ফলা। চক্রকে ডান হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে শ্রীকৃষ্ণ রথ থেকে নেমে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হয়েছেন।

সুদর্শন চক্র নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে এগিয়ে আসতে দেখেই ভীষ্ম অস্ত্র রথের উপর রেখে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে পড়েছেন। ভীষ্ম বলছেন ‘আমি তো এইটাই চাইছিলাম, আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন অস্ত্র ধারণ করবেন না সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হোক’। ভীষ্ম খুব সুন্দর স্তুতি করে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন এহ্যেহি দেবেশ জগন্নিবাস নমোহস্ত তে মাধব চক্রপাণে।। ৬/৫৯/৯৬। হে দেবেশ্বর! হে জগতের আশ্রয়! আসুন আসুন, মাধব! চক্রপাণি! আপনাকে নমস্কার করি। হে মধুসূদন! প্রসহ্যং মাং পাতয় লোকনাথ রথোত্তমাং সর্বশরণ্য সংখ্যে। ত্বয়া হতস্যাপি মমাদ্য কৃষ্ণ শ্রেয়ঃ পরস্মিন্হি চৈব লোকে। সম্ভাবিতোহস্মাক্কবক্ষিণাথ লোকৈস্ত্রিভিবীরঃ তবাভিয়ানাৎ।। ৬/৫৯/৯৭। হে জগদীশ্বর! আপনি আমাকে রথ থেকে নিপাতিত করুন। আমি যদি আপনার হস্তে নিহত হই তাহলে তিন লোকে আমার গৌরব বৃদ্ধি হয়ে যাবে। কারণ আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে আমাকে বধ করবার জন্য ধাবিত হয়ে এসেছেন’। শ্রীকৃষ্ণকে ঐভাবে চক্র নিয়ে ধাবিত দেখে অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে রথ থেকে লাফিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পেছনে ছুটে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণও রথে নেই এখন অর্জুনও রথ ছেড়ে চলে গেছেন, রথের ঘোড়াগুলোর তো পালিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেটার বর্ণনা এখানে নেই। তবে পার্শ্বরক্ষক যারা ছিল তারাই হয়তো রথকে সামলে রেখেছিল। শ্রীকৃষ্ণ খুব রেগে আছেন, শরীরেও প্রচণ্ড শক্তি, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ধরে রাখতে পারছেন না দেখে তিনিও শ্রীকৃষ্ণের পা দুটোকে জাপটে ধরে রেখেছেন। তাও এখানে বলছে বলান্নিজগ্রাহ হরিং কিরীটি পদেহথ রাজন্ দশমে কথঞ্চিৎ।। ৬/৫৯/১০০। ঐ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দশম পাদক্ষেপ পর্যন্ত টেনে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। অর্জুন খুব করে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন ‘আপনি এইভাবে আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন না, আপনি আমার উপর ভরসা রাখুন, দেখুন এবার আমি কি করি, আমার পরাক্রমকে এবার সবাই টের পাবে’। এইভাবে অনেক করে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। তারপর অর্জুন এমন যুদ্ধ শুরু করলেন যে

পিতামহ ভীষ্মকে বাধ্য হয়ে যুদ্ধভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হল। সেইজন্য বলা হয় একমাত্র অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কখন কারুর কাছে পরাজিত হননি।

### ভীষ্মের পতন

এরপর এর সাথে ওর, ওর সাথে এর যুদ্ধ, শুধুই যুদ্ধের বর্ণনা চলছে। ভীষ্ম যেভাবে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে যেন এই যুদ্ধের কোন দিন মীমাংসা হবে না, কিন্তু দিনে দিনে পাণ্ডবদের সৈন্য কুল নাশ হয়ে যাবে। আর ভীষ্মের পতনের কোন উপায়ও বার করা যাচ্ছে না। তখন শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন তিনি যেন কৌরব শিবিরে গিয়ে ভীষ্মকে জিজ্ঞেস করেন আপনার পতনের কি উপায়। যুধিষ্ঠির ভীষ্মের শিবিরে এসে ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করাতে ভীষ্ম বললেন *সত্যমেতন্মহারাজ যথা বদসি পাণ্ডব। নাহং শক্যো রণে জেতুং সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।* ১৬/১০৩/৭৬। ‘দেখো এটা খুবই সত্যি যে আমি যদি অস্ত্র ধারণ করি তাহলে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা আর কোন অসুর আমাকে পরাজিত করতে পারবে না। তবে আমি এই কয়েকজনের সামনে অস্ত্র ধারণ করিনা’। তখন তিনি শিখণ্ডীর কথা বললেন *অর্জুনঃ সমরে শূরঃ পুরস্কৃত্য শিখণ্ডিনম্। মামেব বিশিষ্টৈস্তীক্ষ্ণৈরভিদ্রবতু দংশিতঃ।* ১৬/১০৩/৮৩। ‘অর্জুন যদি শিখণ্ডীকে সামনে রেখে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাহলে আমি কোন অস্ত্র চালাব না, কারণ শিখণ্ডী স্ত্রী থেকে এই পুরুষ রূপ ধারণ করেছে। তখন অর্জুন আমার উপর তীক্ষ্ণ বাণ প্রয়োগ করে আমার পতনকে সম্ভব করতে পারবে’। দশম দিনের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মের মুখোমুখি হয়েছেন। অর্জুন তখন প্রচণ্ড শক্তিতে এমন তীর মারতে শুরু করেছেন যা দেখে ভীষ্ম বলছেন ‘শিখণ্ডী মহারথী হতে পারে, কিন্তু তার বাণের এমন শক্তি নেই যে আমার কবচকে ভেদ করে শরীরকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে’। বড় বড় মহারথীদের কবচ খুব ভারী ও অভেদ্য হয়, কিন্তু এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে অর্জুনের বাণ এতো শক্তিশালী যে ভীষ্মের অভেদ্য কবচকে ভেদ করে দিচ্ছে আর শরীরের এক ইঞ্চি জায়গা নেই যেটা অর্জুন বাদ রেখেছে। ভীষ্ম পরিষ্কার বুঝতে পারছেন আমার কবচকে ভেদ করে শরীরে ঢুকে যাবে এই শক্তি অর্জুনের বাণ ছাড়া আর কারুর বাণে নেই, ভীষ্মের শরীরের কোন অংশ ছাড়েননি। ভীষ্মের ছিল ইচ্ছামৃত্যু। অন্য কেউ হলে এখানে তার মৃত্যু হয়ে যেত। ভীষ্মের যেহেতু ইচ্ছামৃত্যু ছিল তাই তিনি আর রথে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেলেন।

পিতামহ ভীষ্ম রথ থেকে পড়ে যেতেই চারিদিকে তুমুল আলোড়ন পড়ে গেছে। সবাই ছুটে এসেছে। ইতিমধ্যে সন্দ্বীপ হয়ে এসেছে। অর্জুনের মনের অবস্থা এখানে সব থেকে বেদনাদায়ক। যাঁর কোলে পিঠে অর্জুন বড় হয়েছিল, কত স্নেহ এই পিতামহের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, অর্জুনের কত আবদার তিনি সহ্য করেছিলেন। আজ তাঁকেই অর্জুনের বাণে শরশয্যায় শায়িত হতে হল। অর্জুনের সব এক এক করে মনে পড়তে শুরু হয়েছে। ভীষ্ম যেন অর্জুনের জন্যই নিজের পতনের কারণটা যুধিষ্ঠিরকে বলে দিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির যখন তাঁকে কিভাবে পরাস্ত করা যেতে পারে জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন ভীষ্ম বলেছিলেন ‘শ্রীকৃষ্ণ সবই জানেন, আমি কোন নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করিনা, তোমাদের সাথে যে শিখণ্ডী আছে আসলে তাকে আমি নারী বলেই জানি’। এই বলে ভীষ্ম যেন পাণ্ডবদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন।

ভীষ্ম যেখানে রথ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন সেখান থেকে তাঁকে অন্যত্র সরান হয়নি, ওখানেই মৃত্যু অবধি পড়ে রইলেন। মাটিতে পুরো শরীরটা তীরের উপর শায়িত হয়ে আছে। মাথাটা ঝুলে রয়েছে দেখে দুর্যোধন সঙ্গে সঙ্গে বালিশ নিয়ে এলেন। ভীষ্ম কিন্তু সেই বালিশ ফিরিয়ে দিলেন। তিনি অর্জুনকে ডাকালেন। অর্জুন এমনভাবে তীর মারলেন যে দুটো তীরের কোণাকুণি ক্রসিং পয়েন্টে মাথাটা আটকে থেকে বালিশের কাজ করল। ভীষ্ম ঐ অবস্থাতেই বলছেন ‘এই দ্যাখো, এই হচ্ছে বীরের উপযুক্ত শয্যা’। ভীষ্ম এরপর আবার জল খেত চাইলেন। দুর্যোধনরা দৌড়ে সুস্বাদু মিষ্টি জল নিয়ে এল। কিন্তু ভীষ্ম সেই জল গ্রহণ না করে আবার অর্জুনকে ডাকালেন। অর্জুন বুঝে গেলেন পিতামহ কি চাইছেন। অর্জুন একটা তীর ছুঁড়তেই সেটা পৃথিবীর মাটি ভেদ করে গর্তের মত করে দিল আর সেই গর্ত দিয়ে জলের ফোয়ারা হয়ে ভীষ্মের ঠিক মুখে গিয়ে পড়তে লাগল। ভীষ্ম বললেন ‘এইটাই হচ্ছে অর্জুনের বীরত্ব’। আসলে এটা ছিল দিব্যাস্ত্র।

সবাই ভীষ্মের চারিপাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভীষ্ম সবার সামনে অর্জুনকে বললেন ‘হে পার্থ, এই পৃথিবীতে কেউ তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। তুমিই বিজয়ী হবে, কিছু করার নেই, আমি, বিদুর, শ্রীকৃষ্ণ, পরাশর, দ্রোণাচার্য, সঞ্জয় সবাই মিলে বারবার দুর্যোধনকে বুঝিয়েছি, কিন্তু দুর্যোধন আমাদের কারুর কথা শুনলো না। দুর্যোধনের বুদ্ধি বিপরীত হয়ে গেছে। আমাদের কথাতো গ্রাহ্যই করে না, উপরন্তু শাস্ত্রকে উল্লঙ্ঘন করে চলে, সেইজন্য খুব শীঘ্রই ওর

পতন হবে’। দুর্যোধন ওখানে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে। দুর্যোধনকে ভীষ্ম বলছেন ‘দুর্যোধন, এতদিন আমি তোমাকে রক্ষা করে এসেছি এখন তুমি আমার কথা শোন, এখনো সময় আছে, আমার পতন হয়ে গেছে, তুমি এখন শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জুনের সঙ্গে সন্ধি করে নাও। আর তা যদি না কর, তাহলে তুমি ততক্ষণই যুদ্ধভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকবে, যতক্ষণ না অর্জুনের বাণ তোমার সৈন্যদের শেষ না করে দিচ্ছে আর ভীমের গদাঘাতে যতক্ষণ না তোমার পতন হচ্ছে। তোমাকে আমি বারবার বলছি, আমি মরে গেলেও যদি তোমাদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গিয়ে বন্ধুত্ব হয়ে যায়, তুমি সেটা মেনে নাও। আমি ছিলাম তোমাদের প্রধান সেনাপতি, সেই প্রধান সেনাপতির এখন পতন হয়ে গেছে তাই আবার আমি বলছি তুমি এই যুদ্ধ এখানেই বন্ধ করে সন্ধি করে নাও। তোমার মনে মোহ ঢুকে আছে, তোমার বোকামির জন্য তুমি আমার কথা শুনছো না। কিন্তু তোমার এই মুখামির জন্য তোমার বংশের নাশ হয়ে যাবে, তুমি এই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্তি নিয়ে নাও’। দুর্যোধন সব শুনে তার মনটা যদিও একটু খারাপ হয়ে গেল কিন্তু ভীষ্মের কথাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলো না।

### ভীষ্ম ও কর্ণের সংলাপ

সবাই ভীষ্মের কাছ থেকে সরে আসার পর, কর্ণ একান্তে ভীষ্মের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কর্ণকেও ভীষ্ম বলছেন ‘দেখো কর্ণ তুমি হলে আসলে কুন্তি পুত্র’। কর্ণও বলছে ‘হ্যাঁ, আমি জানি পিতামহ, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সব বলেছেন’। ভীষ্ম তখন বলছেন ‘দেখো, ক্ষত্রিয়কুল নাশ হতে চলেছে, তুমি যদি এখনও দুর্যোধনকে ছেড়ে দাও সন্ধি হয়ে যাবে, আমি মরে গেলেও এরা যদি সবাই মিলে সন্ধি করে নেয়, তাহলে কত ভালো হয়’। কর্ণকে তিনি বোঝালেন যে তুমি দ্যাখো যদি কোন ভাবে সন্ধি করে এই যুদ্ধের এখানেই ইতি করা যায়। কর্ণ তখন খুব সুন্দর করে ভীষ্মকে বলছে *বসুদেবসুতো যদ্বৎ পাণ্ডবায় দৃঢ়তঃ। বসু চৈব শরীরঞ্চ পুত্রদারাক্তথা মম।। সর্বং দুর্যোধনস্যার্থে ত্যক্তং মে ভুরিদক্ষিণ। মা চৈতদ্ব্যধিমরণং ক্ষত্রং স্যাদিতি কৌরব।। কোপিতাঃ পাণ্ডবা নিতাং ময়াশ্রিত্য সুযোধনম্। অবশ্যস্তাবি হ্যর্থো যো ন স শক্যো নিবর্তিতুম্।। ৬/১১৭/২৫-২৭।* ‘শ্রীকৃষ্ণ যেমন পাণ্ডবদের সাহায্য করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ঠিক সেইভাবে আমার সম্পত্তি, আমার স্ত্রী-পুত্র, আমার বল বীর্য, আমার যশ, সব কিছু দুর্যোধনের প্রতি সমর্পিত। আমি দুর্যোধনকে সাহায্য করে যাচ্ছি ঠিকই, আর এও জানি যদি কোন অঘটন ঘটে তাহলে দুর্যোধন এই রণভূমিতে মারা যাবে, তাতে সে বীর গতি প্রাপ্ত হোক, তাও ভালো কিন্তু আমি ওকে আমার সাহায্য থেকে বঞ্চিত কখনই করতে পারবো না। দৈবকে কখনো পুরুষার্থ দিয়ে আটকানো যায়না’। কর্ণ আরো বলছে ‘এই যুদ্ধ অবশ্যস্তাবি একে এড়ান যাবে না, আমি সরে গেলে কিংবা আপনি মরে গেলেও এই যুদ্ধটা থামবে না। আরেকটা যেটা খুব দুর্ভাগ্য যে, আমাদের আর পাণ্ডবদের মধ্যে যে শত্রুতা সেটা এখন ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে। কোন সন্ধি বা চুক্তি এই শত্রুতাকে মিটিয়ে দিতে পারবে না। আমার আর অর্জুনের মধ্যে যে লড়াই আমার মৃত্যুর পরেই শান্ত হবে’। ভীষ্ম তখন বলছেন ‘কর্ণ, এই যে ভয়ঙ্কর শত্রুতার কথা তুমি বলছ, এই শত্রুতা যদি কখনই শেষ না হয়, আমি তোমাকে আজ্ঞা দিচ্ছি, আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, তোমার মধ্যে অন্য কোন লোভ রেখে তুমি যুদ্ধ করো না, তোমার প্রতিও আমার একই স্নেহ যেমন পাণ্ডব আর কৌরবদের প্রতি, কারণ তুমি কুন্তীপুত্র তাই তুমি স্বর্গপ্রাপ্তির ইচ্ছাতেই শুধু এই যুদ্ধ কর’। ভীষ্মও জানেন যে এই যুদ্ধকে এড়িয়ে ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশকে আটকানো গেল না, তাই তুমি তোমাকে শেষ কথা বলছি, সত্যি বলছি আমি দীর্ঘকাল চেষ্টা করেছি পাণ্ডব আর কৌরবদের মধ্যে শান্তি ভাব আনবার জন্য, কিন্তু আমি পারলাম না’। কর্ণ আর কিছু না বলে তারপর ভীষ্মকে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

অন্য একটা মত আছে যে ভীষ্ম কর্ণকে বলেছিলেন ‘কর্ণ, আমি তোমাকে বারবার অপমান করেছিলাম যাতে তুমি কোন রকমে দুর্যোধনকে ছেড়ে দাও, তুমি দুর্যোধনকে ছেড়ে চলে গেলে সে আর বেশী লাফালাফি করত না, কারণ একমাত্র তোমার শক্তির উপরই ভরসা করে দুর্যোধন এত বড় যুদ্ধে নামতে সাহস করেছে’। যাই হোক ভীষ্ম এখন শরশয্যা। পরের দিন থেকে কর্ণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন আর দ্রোণাচার্য হবেন Commander in Chief। এইবার কর্ণ দশ দিন পর প্রথম অস্ত্র ধারণ করবে।

### দ্রোণপর্ব

ভীষ্মপর্বের পর শুরু হচ্ছে দ্রোণপর্ব। দ্রোণপর্বে দ্রোণাচার্য কৌরবদের প্রধান সেনাপতি। ভীষ্ম-কর্ণ সংবাদ দিয়েই শুরু হচ্ছে। ভীষ্ম প্রথম থেকেই মনে প্রাণে চাইছিলেন কিভাবে ক্ষত্রিয় বংশগুলিকে রক্ষা করা যায়, কিন্তু তা আর করা গেল না। এইসব বলে কর্ণকে ভীষ্ম বলছেন ‘যখন এই যুদ্ধকে এড়িয়ে ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশকে আটকানো গেল না, তাই তুমি যাও দুর্যোধনের হয়ে যুদ্ধ করে যতটা পার তার জয়ের চেষ্টায় লেগে যাও। সত্যি কথা বলতে দুর্যোধন যেমন আমার পৌত্র

তুমিও সেইভাবে আমার পৌত্র। সেইজন্য আমি দুর্যোধনেরও হিতৈষী তোমারও হিতৈষী। যৌনাৎ সম্বন্ধকাল্লোকে বিশিষ্টং সঙ্গতং সতাম্। সঙ্গিঃ সহ নরব্যাস্ত্র প্রবদন্তি মনীষিণঃ। ১৭/৩/৩৬। মনীষিরা বলেন কুটুম্ব সম্পর্ক, পারবারিক সম্পর্ক, যৌন সম্পর্ক এই ধরনের সম্বন্ধের থেকেও শ্রেষ্ঠ সাধুপুরুষের সাথে যে সম্বন্ধ হয়। কারণ কুটুম্ব, জ্ঞাতিভাই বা যাদের সাথে বিবাহ সম্পর্কে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে কোন স্বার্থের সজ্জাত হলে সে সম্বন্ধ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সাধুপুরুষের সাথে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় সেখানে কোন স্বার্থ থাকে না বলে সম্বন্ধ চিরদিন অটুট থাকে। আসলে কর্ণ হল যুধিষ্ঠিরের বড় ভাই, যেটা আস্তে আস্তে প্রকাশিত হচ্ছে। এখানে ভীষ্ম কর্ণকে এটাই বলতে চাইছেন যে, তুমি দুর্যোধনের বন্ধু, তুমি নিজেও খুব ভালো মানুষ তাই তোমাকে বলছি সৎ পুরুষের সঙ্গে যে সম্পর্ক হয় সেটাই বেশী স্থায়ী হয়, এই ভাবটা মাথায় রেখে তুমি এখন কৌরবদের রক্ষা করার চেষ্টা কর। এই আশীর্বাদ দিয়ে ভীষ্ম কর্ণকে বিদায় দিলেন। এদিকে দ্রোণাচার্য হয়ে গেলেন প্রধান সেনাপতি। এই খবরটা নিয়ে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়েছিল।

### শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের থেকে ধৃতরাষ্ট্রের আশঙ্কা ও ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন

এর কিছু দিন পর সঞ্জয় আবার একটা খবর নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেছে, খবরটা হল দ্রোণাচার্য মারা গেছেন। আবার ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করছেন, এটা কি করে সম্ভব হল। সবটাই ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হচ্ছে। আগেও আমরা বলেছি যে সঞ্জয় ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। মাঝে মাঝে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে একটা বড় কোন খবর দিয়ে যাচ্ছে। দ্রোণাচার্যের মৃত্যু খবর শুনে ধৃতরাষ্ট্র খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন কথং সঞ্জয় দুর্দ্ব্যমনাধ্ব্যষশোবলম্। পশ্যতাং পুরুষেন্দ্রাণাং সমরে পার্ষতোহবধীৎ। ১৭/৭/৩৭। ‘সঞ্জয়! কি হয়েছিল তুমি বিস্তারিত ভাবে বল। কারণ দ্রোণাচার্য ছিলেন আশীর্বাদ ধন্য যতক্ষণ তাঁর হাতে অস্ত্র থাকেবে ততক্ষণ তাঁকে কেউ কিছু করতে পারবে না। কিন্তু কর্ণ প্রভৃতি পুরুষশ্রেষ্ঠগণের সমক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্ন কি করে যুদ্ধে দ্রোণাচার্যকে বধ করতে পারল?’ এটাই মহাভারতের বিশেষত্ব, আমাদের অনেক কিছুর ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু কোথাও এমন একটা ফাঁক রেখে দেব, যে ফাঁকটার জন্য এমন কিছু একটা ঘটে যাবে যখন আমার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমাকে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হবে। ধৃতরাষ্ট্র খুব দুঃখ করে বলছেন यस্য যন্তা হৃষিকেশো যোদ্ধা यस্য ধনঞ্জয়ঃ। রথস্য তস্য কঃ সংখ্যে প্রত্যানীকো ভবেদ্রথঃ। ১৭/৯/৩৬ যাঁর নিয়ন্তা সারথি শ্রীকৃষ্ণ আর যোদ্ধা যার অর্জুন যুদ্ধে কোন্ রথ সেই রথের প্রতিপক্ষ হবে। আর অর্জুনঃ কেশবস্যা ত্রা কৃষ্ণোহপ্যাত্রা কিরীটনঃ। অর্জুনে বিজয়ো নিত্যং কৃষ্ণে কীর্তিচ্চ শাস্তি। ১৭/৯/৩৮। এই একটি ভাব বারংবার মহাভারতে ঘুরে ঘুরে আসবে। গীতাতে এই ভাবটাই একটু অন্য ভাবে আসে। এখানে বলছেন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের আত্মা আর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের আত্মা। আর অর্জুনের মধ্যে সব সময় জয় এবং শ্রীকৃষ্ণে সর্বদা কীর্তি। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনেকবার বলছেন যে আমার ভক্ত সে আমার আত্মা। সেখানে বলছেন তস্যাহং ন প্রশ্যামি স চ নে ম প্রশ্যতি, আমি কখন আমার ভক্তকে ভুলে যাই না, আমার ভক্তও কখন আমাকে ভোলে না। ভক্তের দিক থেকে দেখতে গেল অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সব থেকে বড় ভক্ত। আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে বলছেন কোন গুরু যখন নিজের শিক্ষাটা তার উত্তম শিষ্যকে দেন তখন তাঁর শিক্ষার প্রসার ও প্রচার খুব ভালো হয় আর এই শিক্ষার অনেক সুদূর প্রসারী বিস্তার হয়। সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকেই বেছে নিয়েছিলেন। মহাভারত যতক্ষণ পড়া না হয় ততক্ষণ গীতার অর্থ পরিষ্কার হয় না। আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে এত বড় বড় মনীষিরা থাকতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকেই কেন গীতার উপদেশ দিলেন। এই শ্লোকেই এর উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে। আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতা ভাষ্যে এই কথাই বলছেন, গুরু যখন উত্তম শিষ্যের মধ্যে তাঁর নিজের ভাব ও শিক্ষাকে ঢুকিয়ে দেন তখন সেই ভাব ও শিক্ষার প্রসার ও প্রচার খুব ভালো হয়। অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কি সম্পর্ক সেটা আমরা গীতায় পাইনা, কিন্তু মহাভারতে পাওয়া যাবে। দুজনের মধ্যে কি সম্পর্ক? অর্জুনঃ কেশবস্যা ত্রা কৃষ্ণোহপ্যাত্রা কিরীটনঃ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের আত্মা আর অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের আত্মা। সেই সময় ভীষ্ম থেকে গুরু করে অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন কিন্তু অর্জুনই একমাত্র যিনি শ্রীকৃষ্ণের আত্মা। সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা হওয়া সত্ত্বেও অর্জুনের এত প্রশ্ন মনের মধ্যে উদ্ভিত হয়েছিল, গীতা যদি অন্য কারকে বলা হত তাহলে সেতো ধারণাই করতে পারত না। ধৃতরাষ্ট্র এটাই বলছেন অর্জুনে বিজয়ো নিত্যং কৃষ্ণে কীর্তিচ্চ শাস্তি। অর্জুনের মধ্যে বিজয় সর্বদা প্রতিষ্ঠিত, যেখানে যাবে সেখানেই তাঁর বিজয় হবে আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কীর্তি সব সময় প্রতিষ্ঠিত, শ্রীকৃষ্ণ যেখানেই থাকবে সেখানেই কীর্তি থাকবে। অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ যেখানে মিলে যাবেন সেখানে বিজয় আর কীর্তি এই দুটো এক সঙ্গেই চলতে থাকবে, তাই কিছু করার নেই।

ধৃতরাষ্ট্র খুব দুঃখ আর হতাশা নিয়ে সঞ্জয়কে বলে যাচ্ছেন ‘দুর্যোধন মোহে পড়ে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে পারছে না তাই এখন সে মৃত্যুর ফাঁসে ফাঁসে গেছে। আর তুমি যাই বল এত দিন যাবৎ আমি যা দেখলাম তাতে বুঝতে পারছি *ন হ্যেব ব্রহ্মচর্যেণ ন বেদাধ্যয়নেন চ। ন ক্রিয়াভির্ন চাত্রেণ মৃত্যোঃ কশ্চিন্নিবার্যতে।।৭/৯/৪৪।* তুমি যতই ব্রহ্মচর্য পালন কর, বেদ অধ্যয়ন কর আর অস্ত্র প্রয়োগ কর, আর তুমি যত যাই করে থাক মৃত্যুকে কেউ অতিক্রম করতে পারেনা। দুর্যোধনকে দেখে এখন তাই মনে হচ্ছে’। এখানে এই শ্লোকটির বিশেষ তাৎপর্য আছে, ধৃতরাষ্ট্র এমন কিছু জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন না যে খুব জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব কথা বলতে যাবেন। কি বলছেন? যারা ব্রহ্মচর্য পালন করেছে সেও মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারেনা, এখানে ভীষ্মের কথা বলা হচ্ছে। ভীষ্ম আজীবন অবিবাহিত থেকে গেলেন, কিন্তু তিনিও পতনের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। দ্রোণাচার্য এত বড় অস্ত্র বিশারদ ও অস্ত্র চালনায় কুশল তিনিও বাঁচতে পারলেন না, যুদ্ধে অনেক ব্রাহ্মণ ছিলেন যাঁরা বেদ অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাও মারা যাচ্ছেন, কর্ণ এত দানধ্যান করেছে মৃত্যুকে সেও অতিক্রম করতে পারলো না। এখানে সাধারণ মৃত্যুর কথা বলা হচ্ছে না, যুদ্ধে মৃত্যুর কথা ধৃতরাষ্ট্র বলছেন। আর সাধারণ মানুষকে নিয়ে বলছেন না, যাঁরা শ্রেষ্ঠ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এঁদেরকে নিয়ে বলছেন, এঁদের প্রত্যেকরই একটা করে বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করলেন আমি চিরকুমার থাকব, সেখান থেকে তিনি এক বিশেষ শক্তি পেলেন। দ্রোণাচার্যের অস্ত্রের উপর এক বিশেষ ক্ষমতা, অস্ত্র হাতে থাকলে কেউ দ্রোণাচার্যকে কিছু করতে পারবে না। অন্যান্য অনেকে ছিলেন যাঁরা বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন, আবার অনেক প্রচুর দান করে গেছেন। কিন্তু এনাদের এত ক্ষমতা ও শক্তি কোন কাজেই এলো না। মৃত্যুতো সবারই হবে, এখানে সেই মৃত্যুকে বলা হচ্ছে না। একটা বিশেষ মুহূর্তে তোমার এই শক্তি কোন কাজ দিল না বলে ঐ সময় তোমরা কেউই মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারলে না।

### কর্মবাদের উপর ধৃতরাষ্ট্রের মতামত

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলছেন ‘আমরা এত দিন পাণ্ডবদের হিংসাই করে এসেছি, হিংসায় বশীভূত হয়ে পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠিয়ে আমরা কত আনন্দ পেয়েছিলাম, আর ভীষ্মের পতন আর দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর খবর সেই আনন্দের ফলে কটু ফল ভক্ষণ করতে হচ্ছে’। একটু পরেই ধৃতরাষ্ট্র বলবেন কিছু দিন আগেও যে পাণ্ডবরা ভিখারীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন কেউ কি ভেবেছিল আজকে তারাই রথে বসে আমার সন্তানদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। সেইজন্য বলা হয় কর্মের গতি কেউ বুঝতে পারেনা। মহাভারত পড়লে কর্মের এই দুরভিগম্য গতিকে ঠিক ঠিক বোঝা যায়। ইন্দ্রপ্রস্থে যে রাজারা কত ঐশ্বর্যে আর সুখে দিন কাটাচ্ছিল, সেখান থেকে কিভাবে রাতারাতি জঙ্গলে গিয়ে ভিক্ষা করতে নেমে যেতে হল, আবার সেখান থেকে এখন রথে বসে সৈন্য সামন্ত নিয়ে রাজাদের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। সঞ্জয়কে ধৃতরাষ্ট্র বলছেন মানুষ দৈব দ্বারাই প্রেরিত হয়। দৈব একটা অদৃশ্য কারণ। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কারের আগে গাছ থেকে একটা ফল পড়তে দেখে কোন বাচ্চা যদি মাকে জিজ্ঞেস করে ‘মা ফলটা নীচে কেন পড়ল, ওপরে কেন চলে গেল না’? মা এর কি উত্তর দেবে? হয় বলবে এটা এই রকমই হয় আর তা নাহলে বলবে ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঈশ্বরের ইচ্ছা যখন বলা হল তার মানে তার উত্তর জানা নেই। এখন যদি জিজ্ঞেস করা হয় কেন ফলটা নীচে পড়ল তখন বলবে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের জন্য। ঠাকুর বলছেন তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না। আমরা জানি বাতাসের জন্য গাছের পাতা নড়ছে। বাতাস কেন বইছে? ঠাকুর তখনও বলবেন তাঁর ইচ্ছাতেই বাতাস বইছে। যখন মানুষ বুঝে নেয় ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, চৈতন্যই একমাত্র আছে আর সব কিছুতেই দেখে ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না, তখন সে হয়ে গেল আধ্যাত্মিক পুরুষ। কিন্তু যারা কিছু ব্যাপারে ঈশ্বরের ইচ্ছা দেখেন আর নিজের কিছু ব্যাপারে আমার ও আমি লাগিয়ে দিয়ে বলে এটা আমি করলাম, আমার জন্যই এটা হল এরা হল মহা প্রবঞ্চক। আবার অনেকে আছেন যাঁরা কিছু ব্যাপারে বলেন আমি এটা জানিনা বলে ঠাকুরের ইচ্ছা বলে চালিয়ে দিচ্ছি। এই না জানা ব্যাপারটা, আমি জানি না, এইটাকে অনেক ভাবে বলা হয়। এর একটাকে কখন বলা হয় ঠাকুরের ইচ্ছা, কখন বলা হয় কপাল আবার কখন বলা হয় দৈব। আগেকার দিনে দৈবই বেশী বলা হত। আমি জানি না, কোন কারণ নেই, এটা হবার কথা নয় কিন্তু তাও হয়ে গেল, এগুলোকে অনেক ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু যখন অনেক কারণ আর তার ব্যাখ্যাকে নিয়ে বিচার করতে যায় তখন মানুষ খেই হারিয়ে ফেলে। তাই কতকগুলি বিশেষ শব্দ দিয়ে এক কথায় মনকে সন্তুষ্ট করে দেওয়া হয়, যেমন দৈব, কর্ম, তাঁর ইচ্ছা। যার যেমন মানসিকতা সে সেই রকম শব্দ দিয়ে মনকে শান্ত করে নেয়। যে ভগবানে বেশী বিশ্বাস করে সে বলবে তাঁর ইচ্ছা, যে যোগ বেশী করে সে বলবে আমার কর্মে ছিল তাই এই রকম হয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ বা যাঁরা ধর্ম জীবন পালন করেন তাঁরা সব কিছুতে অত কিছু বিচার করতে যান না। ঠাকুর যেমন বলছেন, বেড়ালের ছাকে বেড়ালের মা কখন হেঁসেলে রাখছে কখন বিছানায় রাখে। এক কথায় পরিস্কার করে দেওয়া হল। ঠাকুর আবার এও বলছেন যে পুরোপুরি বুঝে গেল তাঁর ইচ্ছাতেই

সব কিছু হচ্ছে সেতো জীবনমুক্ত পুরুষ হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তা হয় না, আমরা কিছু ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছা দেখি কিছু ক্ষেত্রে সেটা মানিনা। ধৃতরাষ্ট্র বলছেন ‘প্রত্যেক মানুষের যে মনের ইচ্ছা এটা পুরোপুরি দৈবের উপরে নির্ভর করে চলে’। এই মতবাদটি আমাদের খুব পুরনো মতবাদ। আমি গতকাল যা করেছি তার ফল আজকে দিচ্ছে, আর আজকে যেটা করছি তার ফল ভবিষ্যতে গিয়ে দেবে। এইটাই দৈব। আমরা ভাবি যেমনটি আমি ভেবেছি বা যেমনটি আমি চেষ্টা করেছি তেমনটি ফল পাব, কার্যক্ষেত্রে গিয়ে সব সময় কিন্তু তা হয় না। ফল সব সময় একটু কম বেশী হয়, এই যে ফল কম বেশী হচ্ছে এটাকেই বলছে কর্ম বা দৈব বা তাঁর ইচ্ছা। বক্তব্য হল যেটা আশা করা হয়েছিল সেটা হয়নি। ধৃতরাষ্ট্রও বলছেন যা কিছু হয় সব দৈবের উপরই নির্ভর করে। এই দৈবের কারণেই যুধিষ্ঠির চর্ম বন্ধল পরিধান করে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, অজ্ঞাতবাসে ছিল আর আজ সেই যুধিষ্ঠির এই বিশাল সেনা নিয়ে আমার সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দাঁড়িয়েছে। মানুষ ভাগ্যের সাথে যুক্ত হয়েছে জন্ম গ্রহণ করে আর এই ভাগ্যই তাকে টেনে নিয়ে এমন অবস্থায় নিয়ে যায় যেখানে সে যেতে চায় না, তাও তাকে সেখানে নিয়ে চলে যায়।

আমরা যদি আমাদের ফেলে আসা জীবনের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে দেখতে পাবো, আমার সাথে যা কিছু হয়েছে, ভালোই হোক বা মন্দ হোক, মনে হবে আমি এই জিনিষটা ঠিক চাইনি। একটা খারাপ কিছু আমার সাথে হয়েছিল আমি কিন্তু চাইনি যে খারাপটা হোক, কিন্তু তাও হয়েছে। আর ভালো যেটা হয়েছে, যখন আশা করেছিলাম তখন ভালোটা আসেনি, কিন্তু যখন কোন আশাই ছিল না তখন হঠাৎ করে ভালো অনেক কিছু হয়ে গেল। আবার এমনও হয় যেমনটি চাইছি তেমনটিই হয়ে চলেছে। এই সব কারণে এনারা কর্মকে খুব বেশী মানেন। সাধারণ মানুষ মনে করে আমি পড়াশোনা ভালো করলে ভালো নম্বর পাব, কিন্তু যত নম্বর পাবে আশা করেছে সেটা পাবে না। কারণ তার আগে অনেকগুলো কারণ এর মধ্যে কাজ করেছে, সব কারণের সমষ্টি ফলই ঠিক করে দেয় কি হবে। মহাভারতের এটি একটি খুব বলিষ্ঠ মতবাদ। এইখানে এসে হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে যায়। অন্য ধর্মে বলা হয় ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে। সব কিছু যখন তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে বলা হয় তখন অনেকগুলো প্রশ্ন এসে যায়। কিন্তু যখন দৈবকে নিয়ে আসা হয় তখন পুরো ব্যাপারটাই আমার উপর বর্তাবে, এগুলো আমারই করা বাইরে থেকে কেউ কিছু করে দিচ্ছে না। আমি আগে ভালো কিছু করেছিলাম সেই ভালোর ফল এখন পাচ্ছি, আমি খারাপ কিছু করেছিলাম সেইজন্য খারাপ ফল পাচ্ছি। সবটাকে মিলিয়ে বলছে দৈব। আগের আগের জন্মে কত পড়াশোনা করেছিলাম, কত পুণ্য করেছিলাম, কত দান করেছি, এই নানা রকমের কারণগুল জমে আছে, এগুলোও এক ভাবে ঠেলেছে, এই ঠেলাটাকে আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু যে কারণগুলো এখন দেখা যাচ্ছে এটাই Seen force যে কারণ গুলোকে দেখা যাচ্ছে না সেটাকে বলছে unseen force, seen force আর unseen force ও অনেক আছে, এই দুটো নিয়েই আমাদের সব কিছু চলছে। ভালো যা কিছু হচ্ছে আবার খারাপ যা কিছু হচ্ছে সবের জন্য আমিই দায়ী।

ধৃতরাষ্ট্র বলছেন ‘জুয়া খেলার সময় কত রকম ভাবে পাণ্ডবদের আমরা লাঞ্ছনা করেছি। আর আজ দেখো এত বছর জঙ্গলে থাকা সত্ত্বেও কিভাবে পাণ্ডবরা এত সৈন্য সংগ্রহ করে নিল। তারপর এমন যুদ্ধ করল যে পিতামহ ভীষ্মের মত অত বড় বীরকেও ধরাশায়ী হতে হল আর দ্রোণাচার্যের মত এত বড় অস্ত্রবিদকে মৃত্যু বরণ করে নিতে হল’। মহাভারত ঠিক মত পড়ে একটু বোঝার চেষ্টা না করলে মানব জীবনের গতি প্রকৃতিকে ধারণা করা যায় না। জগতে এত রকমের কিছু আছে যেগুলো আমাদের জীবনের ওঠা নামাকে প্রভাবিত করে। ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ করে বলছেন ‘দুর্যোধন আমাকে বলেছিল আমাদের পক্ষে এত এত সব বড় বড় রাজা মহারথীরা এসে গেছে, দুদিনেই পাণ্ডবদের শেষ করে দেব, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আর আজ দেখ কি হয়ে গেল’।

### ভগদত্ত বধ

এখন শুধু যুদ্ধের বর্ণনাই চলছে। এর মধ্য থেকে আমরা কয়েকটি যুদ্ধকে বর্ণনা করছি। কৌরবদের পক্ষে ভগদত্ত নামে একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। তাঁকে প্রাগজ্যোতিষেশ্বর বলা হত। তিনি হাতির ব্যাপারে খুব দক্ষ ছিলেন এবং নিজেও হাতির পিঠে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন, আর তাঁর প্রচণ্ড শক্তি ছিল। ভগদত্তের আবার বৈষ্ণবাস্ত্র ছিল। অর্জুনের সঙ্গে ভগদত্তের প্রচণ্ড লড়াই চলছিল। একে একে অর্জুন তীর মেরে ভগদত্তের হাতির বর্ম, ভগদত্তের ছত্র ও পতাকাকে ছেদন করে দিলেন। ভগদত্ত তখন একটা অঙ্কুশকে নিয়ে সেটাকে বৈষ্ণবাস্ত্র মন্ত্রে অভিশক্ত করে অর্জুনের উপর নিক্ষেপ করেছেন। বৈষ্ণবাস্ত্র যখন অর্জুনের দিকে ছুটে আসছে শ্রীকৃষ্ণ তখন চকিতে রথের উপর দাঁড়িয়ে ঐ বৈষ্ণবাস্ত্রকে নিজের বুকের মধ্যে নিয়ে নিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বুকের মধ্যে পড়তেই বৈষ্ণবাস্ত্র ফুলের মালা হয়ে গেল আর সেই মালা থেকে দিব্য আভা বিচ্ছুরিত হতে লাগল।



শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবে বুক পেতে অস্ত্র গ্রহণ করাতে অর্জুন দুঃখ করে বলছেন ‘হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি তো প্রতিজ্ঞা করেছিলেন রথ চালনা ছাড়া আপনি কিছু করবেন না, কিন্তু আপনি এই অস্ত্রকে কেন নিজের বুক নিয়ে নিলেন। আমি যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি, এখন লড়াইয়ের মধ্যে আছি তা সত্ত্বেও আপনি কেন এই অস্ত্রকে বুকের মধ্যে নিয়ে নিলেন’। শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বলছেন ‘এই যে অস্ত্রটা তোমার উপর ভগদত্ত নিষ্কেপ করেছিল এটা তোমার উপর এসে পড়লে তুমি বাঁচতে না, তাই আমি এটাকে আমার উপর নিয়ে নিয়েছি। কেন নিয়েছি জান? *শৃণু গুহ্যমিদং পার্থ পুরাবৃত্তং যথানঘ।। চতুর্মূর্তিরহং শশ্বল্লোকত্রাণার্থমুদ্যতঃ। আত্মানং প্রবিভজ্যেহ লোকানাং হিতমাদদেহ।।* ৭/২৭/২৪।। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ‘আমি তোমাকে অতি গুহ্য কথা বলছি শোন। লোকের হিতসাধন ও পরিত্রাণের নিমিত্ত আমি নিজের মূর্তিকে চারটি অংশে বিভক্ত করেছি। আমি বদ্রিকাশ্রমে নর-নারায়ণ রূপে তপস্যা করি’। তিনি নর-নারায়ণ রূপে তপস্যা করছেন বলে জগতে যা কিছু মঙ্গল হচ্ছে। দ্বিতীয় মূর্তি পরমাত্মা রূপে তিনি সবার শুভ ও অশুভ কর্মের সাক্ষী। এখানে শ্লোকটা হচ্ছে *একা মূর্তিস্তপশ্চর্যাং কুরুতে মে ভুবি স্থিতা। অপরা পশ্যতি জগৎ কুর্বাণাং সাধ্বসাধুনী।।* ৭/২৭/২৫।। মানুষ সাধু অসাধু যা কাজ করে সেই কাজগুলিকে তিনি সাক্ষীরূপে দেখতে থাকেন। পরমাত্মার এই রূপটাই বিধাতা। বিধাতা আছেন বলেই আমার কর্মফল আর কারুর কাছে চলে যাচ্ছে না, আর অন্যের কর্মফলটা আমার কাছে চলে আসবে না। তৃতীয় রূপ মর্তলোকে তিনি নররূপ ধারণ করে নানান রকম কর্ম করেন, যেমন এখন শ্রীকৃষ্ণ রূপে কর্ম করে যাচ্ছেন, শ্রীরামচন্দ্র রূপে তিনি অনেক কর্ম করেছেন। তাঁর চতুর্থ মূর্তি অনন্তশয়নম্। ক্ষীরসাগরে অনন্ত নাগের উপর যিনি শুয়ে নিদ্রাসুখ অনুভব করছেন। ভগবানের এই চারটে রূপ। এই চতুর্থ রূপ, যেটা অনন্তশয়নে বলা হচ্ছে, তিনি এখানে যোগনিদ্রায় অবস্থান করে থাকেন। যোগনিদ্রা থেকে যখন তিনি উত্থিত হন তখন ভক্তরা যে যা চায় তিনি সেটা তাদের দেন। যার জন্য পুরানাদিতে দেখা যায় যখন দেবতাদের কোন সমস্যা হয় তখন তাঁরা ব্রহ্মাকে নিয়ে ক্ষীরসাগরের তীরে গিয়ে ভগবানের স্তুতি করতে শুরু করেন। স্তুতিতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে স্তুতির কারণ জিজ্ঞেস করেন। দেবতাদের হয়ে ব্রহ্মা তখন বলেন এই এই সমস্যা হয়েছে। ভগবান তখন তাঁদের সেই সমস্যা সমাধান করে দেন। এইটাই হল ভগবানের চতুর্থ মূর্তি। আমরা যে প্রার্থনাদি করি আর প্রার্থনার যে ফল পাই, এই ফলটা ভগবান এই চতুর্থ রূপে দেন। কারণ যিনি নর-নারায়ণ রূপে তপস্যা করছেন তিনি এসবের মধ্যে নেই, যিনি পরমাত্মা তিনি সাক্ষী, নররূপে তিনি লীলা করে বেড়াচ্ছেন তার বাইরে তিনি যাবেন না। ভগবান তাই এই চতুর্থ রূপে ভক্তদের যাবতীয় প্রার্থনা পূরণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে আবার একটা পৌরাণিক কাহিনী বলছেন। পৃথিবী ভগবানের হয়ে খুব ভালো কাজ করে যাচ্ছে। পৃথিবীর নরকাসুর নামে এক পুত্র ছিল। ভালো কাজ করার জন্য পৃথিবী একবার ভগবানের কাছে তার সন্তানের জন্য একটা বর প্রার্থনা করে বলেছিলেন ‘হে ভগবান, আমার পুত্র যেন বৈষ্ণবাস্ত্র প্রাপ্ত করে, আর তাকে যেন কেউ হারাতে না পারে’। এরপর এই কাহিনী সেই কাহিনী হতে হতে বৈষ্ণবাস্ত্র এর থেকে ওর কাছে ওর থেকে এর কাছে ঘুরে ঘুরে ভগদত্তের কাছে এসেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ‘এই যে ভগদত্ত, এ হল নরকাসুরের অবতার। আর ওর কাছে যে বৈষ্ণবাস্ত্র আছে এই অস্ত্রকে কেউ আটকাতে পারবে না, যার উপর প্রয়োগ করা হবে তার মৃত্যু অবধারিত। তোমার উপর এসে পড়লে তুমিও বাঁচতে না। আসলে বৈষ্ণবাস্ত্র আমারই অস্ত্র কিনা তাই আমার কাছে এসে শান্ত হয়ে যাবে’। ডোভারম্যান কুকুরগুলো যেমন অপরিচিত কাউকে দেখলে একেবারে ছিঁড়ে ফিলবে কিন্তু নিজের মালিকের সামনে পুরো শান্ত হয়ে যায়। দিব্য অস্ত্রগুলোও ঠিক তাই। দিব্যাস্ত্র যদি কারুর উপর চালিয়ে দেয় সে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু সেই দিব্যাস্ত্রের মালিকের কিছুই হবে না, যেমন শিবের পাশুপত অস্ত্র, এই অস্ত্র শিবের উপর চালালে শিবের কিছুই হবে না কিন্তু অন্য কারুর উপর চালালে সে শেষ। ঠিক তেমনি বৈষ্ণবাস্ত্র, শ্রীকৃষ্ণই এই অস্ত্রের একমাত্র প্রভু। শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে বৈষ্ণবাস্ত্র শান্ত হয়ে গেল।

সব শোনার পর অর্জুন একটা শক্তিশালী বাণ ভগদত্তের হাতির উপর চালাতেই হাতি আর চলতে চাইছে না। এমনতে বলা হয় ভগদত্তের হাতি নাকি বিশাল পাহাড়ের মত। হাতির কবচ ভেদ করে হাতির কুন্তল্লে বাণ ঢুকে গেছে। হাতি এখন ভগদত্তের কোন আজ্ঞাই পালন করছে না। ভগদত্তও বারংবার হাতির উপর অঙ্কুশ দিয়ে আঘাত করে যাচ্ছে কিন্তু হাতি কোন কথাই শুনছে না। দুষ্ঠা নারী যেমন তার দরিদ্র স্বামীর কথা শোনে না ঠিক তেমনি ভগদত্তের হাতি তাঁর আর কোন কথাই শুনছে না। ব্যাসদেবের কি পর্যবেক্ষণ! স্বামীর কথা না শোনা মানেই স্ত্রী দুষ্ঠা নারী হয়ে গেল। নারী কোন স্বামীর কথা শোনে না? যে স্বামীর টাকা-পয়সা চলে গিয়ে দরিদ্র হয়ে গেছে। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন ‘শোন অর্জুন, এই ভগদত্তের কথা তোমাকে বলছি। ভগদত্তের অনেক বয়স হয়েছে। অনেক বয়স হওয়াতে এর কপালের চামড়াটা ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়েছে। চোখের উপর এসে যাতে না পড়ে সেইজন্য ভগদত্ত কাপড় দিয়ে চামড়াটাকে টেনে পেছনের দিকে

বেঁধে রাখে। এই ভগদত্তকে যদি মারতে হয় তাহলে একটাই উপায়। তুমি এমন বাণ মার যাতে ঐ কাপড়টা যেটা দিয়ে চামড়াটা বাঁধা আছে সেটা খুলে আলাগা হয়ে পড়ে যায়। কাপড়টা যদি আলাগা হয়ে পড়ে যায় তখন চামড়াটা চোখের উপর এসে ঝুলে যাবে। চোখে উপর চামড়াটা ঝুলে গেলে ভগদত্ত আর কিছুই দেখতে পারবে না, তখন তুমি ওকে বধ করে দিতে পারবে। যতক্ষণ ওর চোখ খোলা থাকবে আর হাতির উপর বসে থাকবে ততক্ষণ তুমি ভগদত্তকে কিছুই করতে পারবে না’। শ্রীকৃষ্ণ বলতেই অর্জুন বাণ মেরে ভগদত্তের কাপড়ের পট্টাটা কেটে উড়িয়ে দিয়েছেন। ভগদত্তও বুঝতেই পারছিল না, হঠাৎ অর্জুন বুকে না মেরে মাথার দিকে কেন তীর মারতে শুরু করেছে। অর্জুন পট্টাটা উড়িয়ে দিতেই চোখের উপর চামড়াটা এসে পড়ে চোখ দুটোকে ঢেকে দিয়েছে। এখন ভগদত্ত চোখ সামলাবে না তীর ছুঁড়বে বুঝতেই পারছিল না। ঐ সুযোগে অর্জুন ভগদত্তকে বধ করে দিল। শ্রীকৃষ্ণ কত ভাবে যে অর্জুনকে পদে পদে রক্ষা করছিল তারই একটা ঝলক দেখান হল। ভগদত্ত এরা একেকজন বিরাট বীর আর শুধু বীরই নয় এদের নানান রকম বর পাওয়া আছে।

যুদ্ধে নিয়ম ছিল কোন যোদ্ধা যদি কাউকে দ্বৈত সমরে আহ্বাণ করে তখন তাকে তার সাথেই যুদ্ধ করতে হত। কৌরবরা জানে যদি কোন ভাবে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে নেওয়া যায় তাহলেই সব খেলা শেষ। যুধিষ্ঠিরই রাজা, রাজাকে যদি বন্দী করে নেওয়া হয় তাহলে আর যুদ্ধের কোন প্রয়োজন হবে না। দ্রোণাচার্য দুর্যোধনদের বলছেন যতক্ষণ অর্জুন থাকবে ততক্ষণ যুধিষ্ঠিরকে কোন ভাবেই বন্দী করা যাবে না। আর অর্জুন সর্বক্ষণ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করে যাচ্ছে। তাই অর্জুনকে যদি কোন ভাবে যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয় তাহলেই যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করা সম্ভব হবে। কৌরবরা ঠিক করল সংশপ্তক বাহিনী দিয়ে অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বাণ জানান হবে। সংশপ্তক হল এখনকার দিনের আত্মঘাতী মানববোমার মত এক ধরনের সৈন্য। সংশপ্তক বাহিনীকে বলা হতে তারা বলে দিল কাল সকাল সকাল আমরা গিয়ে অর্জুনকে আহ্বাণ করে বলব তুমি আজ আমাদের সাথে যুদ্ধ কর, আমরা না মরা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে যাব। আহ্বাণ করে দিলে অর্জুন আর না করতে পারবে না। এই সংশপ্তক বাহিনী যুদ্ধ করতে করতে কায়দা করে পিছোতে পিছোতে অর্জুনকে মূল যুদ্ধভূমি থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে। তখন যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করা সহজ হবে।

### অভিমন্যু বধ

সকাল হতেই সংশপ্তক বাহিনী এসে অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বাণ জানিয়ে দিয়েছে। অর্জুনের এখন এদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন গতি নেই। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন কিছু একটা রহস্য আছে। শ্রীকৃষ্ণও দ্রোণাচার্যের পরিকল্পনাটা ধরতে পারেননি। এরা এখন অর্জুনকে টানতে টানতে অনেক দূর চলে এসেছে। দ্রোণাচার্য বলে দিয়েছেন অর্জুন থাকতে যুধিষ্ঠিরকে কোন ভাবেই বন্দী করা যাবে না, অর্জুনকে যে কোন উপায়ে সরিয়ে দাও। সেদিন দ্রোণাচার্য আবার দেবতাদেরও দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ রচনা করেছেন। শক্রপক্ষ ব্যূহ রচনা করে যখন এগিয়ে আসবে তখন বিপক্ষকে সেই ব্যূহকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে হবে তা নাহলে বিপক্ষকে শেষ করে দেব। আমাদের যে মারার জন্য এগিয়ে আসছে আগে তাকে মেরে টুকরো টুকরো করে দিতে হবে। ব্যূহকে ভাঙতে হলে আগে আক্রমণ করতে হবে। যে কোন ব্যূহের কিছু না কিছু ফাঁক ফোকর ও দুর্বলতা থাকবেই, আক্রমণ করতে হলে ঐ দুর্বলতার জায়গাটাতে আগে আক্রমণ করতে হবে। প্রত্যেকরই নিজস্ব সরবরাহ লাইন আছে যেখান দিয়ে পেছন থেকে খাওয়া, দাওয়া, জল, অস্ত্র-শস্ত্র সব কিছু আসছে। সেটার জন্য কিছুটা অংশ ফাঁকা রাখতে হবে। কত রকমের যে ব্যূহ রচনা হত আর তার যে কোথায় কি ফাঁক থাকবে এই সব কিছুকে মাথায় রাখা সম্ভব ছিল না। এই চক্রব্যূহের রচনা করতে মাত্র কয়েকজনই জানত, কারণ চক্রব্যূহ খুব জটিল ব্যূহ। চক্রব্যূহ দেখেই যুধিষ্ঠিররা খুব ঘাবড়ে গেছে। চক্রব্যূহ রচনা যেমন সবার দ্বারা সম্ভব নয় ঠিক তেমনি এই চক্রব্যূহকে ভেদ করে একে ছিন্নভিন্ন করতেও সবাই পারবে না। চক্রব্যূহকে ছিন্নভিন্ন করতে পাণ্ডবদের তরফ থেকে একমাত্র অর্জুন, অভিমন্যু, শ্রীকৃষ্ণ আর প্রদ্যুম্ন জানত। শ্রীকৃষ্ণের সন্তান প্রদ্যুম্ন আবার যুদ্ধে অংশ নেয়নি, কেন নেয়নি সেটা জানা নেই। যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে বলছেন ‘এই চক্রব্যূহকে যদি না ছিন্নভিন্ন করা হয় তাহলে আমরা সবাই আজকে মারা পড়ব। অর্জুন আবার এখানে নেই’।

অভিমন্যু তখন নেহাৎই বাচ্চা। যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে খুব উৎসাহ নিয়ে বলছে ‘আপনি কোন চিন্তা করবেন না, আমি এর মধ্যে ঢুকে পড়ছি। তবে আমার বাবা আমাকে এই চক্রব্যূহ ভেদ করাটা শিখিয়েছিলেন কিন্তু বেরোনার কৌশলটা আমার জানা নেই’। অনেক কাহিনীতে বলা হয় অভিমন্যু মায়ের গর্ভেই চক্রব্যূহ ভেদ করাটা শিখে নিয়েছিল। কিন্তু মূল মহাভারতে কোথাও এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। অর্জুনের কাছেই অভিমন্যু পরে শিখেছিল। এগুলো হল পৌরাণিক আখ্যায়িকা, আখ্যায়িকা মানেই হল কাহিনী যত খুশী বাড়ান যায়, কাহিনীর কোন সীমা নেই। অভিমন্যু ভেদ করতে পারে শুনেই যুধিষ্ঠির বলছেন ‘তুমি চিন্তা করো না, একবার তুমি ঢুকে পড়লে আমাদের সবাই সেখান দিয়ে ঢুকে যাবে। তারপর

তো আমরা সবাই মিলে এই ব্যুহকে ছিন্নভিন্ন করে দেব। একবার শুধু আমাদের ফাঁকটা যদি দেখিয়ে দাও তাহলেই হবে’। রাজস্থানে যত কেপ্লা আছে তার প্রধান ফটক যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে কেপ্লাতে আর কেউ ঢুকতে পারতো না। কিন্তু আলেকজান্দার এই রকম অনেক কেপ্লা দখল করেছিল। কিভাবে শত্রুপক্ষ কেপ্লাগুলো দখল করত? একটা হত শত্রুপক্ষ খুঁজে দেখত কেপ্লার পেছন দিকে কোন দরজা আছে কিনা কিংবা কোন নালি বা নর্দমা আছে কিনা যেখান দিয়ে কেপ্লার আবর্জনা বেরোয়। কোন কোন কেপ্লাতে একটাই দরজা থাকত পেছনের দিকেও কিছু থাকত না। শত্রুপক্ষ যদিও বা ঢুকে পড়ত কিন্তু কেপ্লার মধ্যে চারিদিক দিয়ে ঘিরে ধরলে পালানোটা একটা সমস্যা হয়ে যেত। অভিমন্যুরও এই সমস্যা হয়েছিল, সে ঢুকে যেতে পারবে কিন্তু পালাবার কৌশলটা জানা ছিল না। এমনিতেও অভিমন্যুর তখন বয়স খুবই কম, মাত্র পনের ষোল বছর হবে। যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে এটাই বলছেন তুমি কোন রকমে চক্রব্যুহকে ভেদ করে দাও তারপর তো আমরা সবাই আছি। ভীমসেনও বলছেন ‘তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি তোমার পাশে আছি আর আমার সাথে থাকবেন ধৃষ্টদ্যুম্ন আর সাত্যকি। এরা সবাই বড় বড় বীর যোদ্ধা। একবার যদি তুমি ঢুকে যেতে পার তারপর আমাদের এই মহারথীরা ঢুকে গিয়ে ওদের প্রধান যোদ্ধাদের মেরে রাষ্ট্রটাকে বড় করে দেবে, আর তাদের পেছনে আমাদের সেনারাও ঢুকে যাবে’।

সবাই অভিমন্যুকে খুব করে তাঁতিয়ে দিয়েছে, আর বয়স অল্প বলে সেও খুব অত্যোৎসাহী হয়ে গেছে। অভিমন্যু যখন রথ নিয়ে এগোচ্ছে তখন তার সারথি তাকে খুব সুন্দর কথা বলছেন ‘আয়ুজ্ঞান! আপনার জ্যাঠা কাকারা আপনার উপর বড় বংশী গুরু দায়িত্ব দিয়ে ফেলেছেন। আপনি একবার শান্ত মনে চিন্তা করে নিন এই কাজটা আপনি করবেন কিনা’। কারণ সারথি জানে অভিমন্যু বাঁচবে না। শুধু অভিমন্যুই তো মরবে না এই সারথিও তো মারা যাবে তার সাথে। তার সঙ্গে রথের পার্শ্বরক্ষক আর চক্ররক্ষক এরাও মরবে। সারথি তাই অভিমন্যুকে আটকাবার চেষ্টা করছে। সারথি বারে বারে বোঝাচ্ছে আপনি দ্রোণাচার্যের সাথে যুদ্ধে পারবেন না, তিনি অনেক অভিজ্ঞ ও অস্ত্র বিশারদ, আর দ্রোণাচার্য বয়সের তুলনায় আপনি নেহাতই শিশু, আপনি একবার ভেবে দেখুন এই কাজটা আপনি করবেন কিনা’। অভিমন্যুর বয়স অল্প, রক্ত একটুতেই গরম হয়ে যায়, অতি উৎসাহে একেবারে টগবগ করে লাফাচ্ছে আর সারথিকে বলছে ‘আপনি এ কি ধরনের কথা বলছেন! আমি আমার মামা ও বাবার কাছে যা শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছি তাতে আমি জানি এদের সবাইকেই আজ শেষ করে দেব’। অভিমন্যু তার সারথিকে বলে দিল আপনি রথ নিয়ে এগিয়ে চলুন। দ্রোণাচার্য দূর থেকে সব দেখে যাচ্ছেন। চক্রব্যুহের মূল প্রবেশদ্বারে জয়দ্রথ পাহার দিচ্ছিল। দ্রোণাচার্য দেখছেন অভিমন্যু এসে জয়দ্রথকে পিটিয়ে প্রবেশদ্বারের কাছে যত সৈন্য ঘিরে রেখেছিল তাদেরকে মেরে একেবারে তছনছ করে দিয়েছে।

এর আগে জয়দ্রথ একবার পাণ্ডবদের কাছে অপমানিত হয়ে শিবের তপস্যা করে শিবকে সন্তুষ্ট করে বর চেয়েছিল আমি যেন অর্জুনকে পরাজিত করতে পারি। শিব বলে দিয়েছিলেন, অর্জুনের কাছে আমার পাণ্ডপত অস্ত্র আছে তাই অর্জুনকে হারান যাবে না, কিন্তু একদিনের জন্য তুমি পাণ্ডবদের বাকি চারজোনকে হারতে পারবে। শিবের ঐ বরকে জয়দ্রথ আজকের দিনটার জন্য রেখে দিয়েছিলেন। অভিমন্যু পঞ্চ পাণ্ডবদের মধ্যে পড়েছে না, তাই সে জয়দ্রথকে পিটিয়ে দিয়ে চক্রব্যুহে ঢুকে পড়েছে। অভিমন্যু ঢুকে যাওয়ার পর যখন যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল আর সহদেব ঢুকবে বলে এগিয়েছে। জয়দ্রথ তখন চারজোনকেই আটকে দিয়েছে। বিশেষ করে ভীমকেই প্রথমে আটকে দিয়েছে কারণ ভীমকে আটকানো খুব কঠিন ছিল। অভিমন্যু ঢুকে যাওয়ার পর দরজাটা যেটা অভিমন্যু খুলে দিয়েছিল, জয়দ্রথ সবাইকে একাই আটকে দেওয়াতে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেছে। অভিমন্যু ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পর আর কেউ ঢুকতেই পারলো না। অভিমন্যু পেছনে ফিরে দেখলেও না যে কি পরিস্থিতি হয়ে গেছে, ভেবেছে তার পেছনে বাকিরাও ঢুকবে।

অভিমন্যু তো খুব উৎসাহের সাথে ভেতরে অনেকটা ঢুকে গেছে, সে জানে যে তার পেছনে বাকিরাও আসছে, কিন্তু তারা যে কেউই ঢুকতে পারেনি সেটা বুঝতেই পারল না। শুধু তাই নয় কখন যে কৌরবরা অভিমন্যুর কয়েকজন পার্শ্বরক্ষক আর চক্ররক্ষককে মেরে দিয়েছে সেটাও টের পায়নি। অভিমন্যু এখন হয়ে গেছে একা। আর রথের মধ্যে যে অস্ত্র মজুত আছে সেটাও এক সময় শেষ হয়ে যাবে কারণ তার পেছনে যে সরবরাহ লাইন থাকার কথা সেটাতো বন্ধ হয়ে গেছে। যুদ্ধে যে নিয়ম করা হয়েছিল রথী রথীর সঙ্গে যুদ্ধ করবে, পদাতিক পদাতিকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। অভিমন্যু এখন একজন একজন করে সবাইকেই হারিয়ে দিচ্ছে। এই হারার তালিকায় দ্রোণাচার্যও আছেন। সবাই তখন আতঙ্কিত হয়ে গেছে। অভিমন্যু যে ভাবে যুদ্ধ করছে এই ভাবে যুদ্ধ করলে সে একাই সবাইকে এক এক করে মেরে দেবে। একটা কিছু করতে হবে। কর্ণও হেরে গিয়ে দ্রোণাচার্যকে জিজ্ঞেস করছে ‘ছেলেটাকে আটকানো যাবে কিভাবে’। দ্রোণাচার্য অনেক ভেবে

বললেন ‘এই বাচ্চা ছেলেটা যেভাবে যুদ্ধ করছে ওর কোথাও এতটুকু ফাঁক দেখা যাচ্ছে না’। অর্থাৎ একটা যে ফাঁক পাওয়া যাবে আর সেই ফাঁকটাতে যে মারব সেই ফাঁকটুকুও পাওয়া যাচ্ছে না। দ্রোণাচার্য তখন বললেন ‘এখন একটাই উপায়, এক সঙ্গে ছয় জন মহারথী মিলে ওর উপর যদি আক্রমণ করা হয় তাহলে একে কিছু করা যাবে, তা নাহলে আর কোন ভাবেই বাঁচার পথ নেই’। কর্ণ বললেন ‘তার আগে একটা কিছু করে ওর শরীরটাকে জখম করে দিলে কি হয় দেখা যাক’। দ্রোণাচার্য হেসে কর্ণকে বললেন ‘অভিমন্যু যে কবচটা পড়ে এসেছে সেটা অভেদ্য’। এই অভেদ্য কবচের যে কি রহস্য বলা খুব মুশকিল, মহাভারতের যুদ্ধে অভেদ্য কবচের কথা অনেকবার এসেছে। যোদ্ধারা শরীরে যেটা বর্মের মত পড়ত সেটা চামড়া বা লোহার হত। কবচকে শরীরের সাথে বাঁধার অনেক রকম কৌশল ছিল, অনেক সময় মন্ত্রপূত করেও বাঁধা হত। এর মধ্যে কিছু কবচ ছিল অভেদ্য। দুর্যোধনের একদিন খুব ইচ্ছে হয়েছিল অর্জুনকে আজকের যুদ্ধে যেন হারাতে পারে। দ্রোণাচার্য তখন বললেন ঠিক আছে আমি তোমাকে অভেদ্য কবচ বেঁধে দিচ্ছি, এর রহস্য খুব কম লোকই জানে, এই কবচ বেঁধে দিলে তোমাকে আর কেউ হারাতে পারবে না। দুর্যোধন যখন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছে, অর্জুন দেখেই বলছে দুর্যোধনকে তো আজকে মারা যাবে না, এতো অভেদ্য কবচ পড়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন বললেন ‘তবে কি জানেন অভেদ্য কবচ পড়ার পর কিছু কিছু অনুষ্ঠান করতে হয়, দুর্যোধন সেটা করেনি, দুর্যোধনকে আজকে আমি শিক্ষা দিচ্ছি, ওর ফাঁক আমি ঠিক বার করে নিচ্ছি’। অভেদ্য কবচ শুধু পড়লেই হবে না, এর জন্য কিছু কিছু অনুষ্ঠান করতে হয়।

দ্রোণাচার্য বললেন ‘এই অভেদ্য কবচ পড়া আমি অর্জুনকে শিখিয়েছিলাম, অর্জুন আবার সেটা তার ছেলেকে শিখিয়েছে। এর শরীরকে তোমরা কিছুই করতে পারবে না। তবে খুব মনযোগ দিয়ে কেউ যদি এর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাহলে কিন্তু ওর ধনুকের দড়িটাকে কেটে দেওয়া যেতে পারে। তার সাথে সাথে ঘোড়ার লাগামের দড়িটাকে কেটে দেওয়া যেতে পারে’। এরপর দ্রোণাচার্যরা অভিমন্যুকে চারিদিক থেকে এমন ভাবে সবাই মিলে ঘিরে নিয়েছে যে অভিমন্যুকে এখন চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তীর চালাতে হচ্ছে। আর অভিমন্যুর বাকি যে কজন পার্শ্বরক্ষক আর চক্ররক্ষক ছিল এরাতো আর অতটা দক্ষ নয় যে কর্ণের মত যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এরা এখন অভিমন্যুর সব পার্শ্বরক্ষক চক্ররক্ষককে মেরে দিয়েছে। এরপর ঘোড়ার দড়িগুলো কেটে দেওয়া হয়েছে, দড়ি কেটে যেতেই ঘোড়াগুলো ছিটকে বেরিয়ে গেছে। এখন চারিদিক থেকে অভিমন্যুর উপর আক্রমণ আসছে। একা রথের উপর বসে কতক্ষণ যুদ্ধ করবে। একটা সময় তার অস্ত্রও সব শেষ হয়ে গেছে। অস্ত্র শেষ হয়ে যেতেই অভিমন্যু ঢাল তলোয়ার নিয়ে নেমে পড়েছে। কর্ণ ঢাল তলোয়ারও কেটে দিয়েছে। তখন অভিমন্যু গদা নিয়ে লড়তে শুরু করেছে। গদা নিয়ে নামতেই দুঃশাসনের ছেলে গদা নিয়ে অভিমন্যুকে মারতে এসেছে। দুজনের মধ্যে লড়াই চলছে। অভিমন্যু এমনিতেই পরিশ্রান্ত ছিল। কিভাবে দুজনেই পা পিছলে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। অভিমন্যু উঠতে একটু দেরী করতেই মুহূর্তের মধ্যেই দুঃশাসনের ছেলে উঠে পড়ে গদা দিয়ে অভিমন্যুর মাথায় জোর একটা আঘাত করেছে। ঐ আঘাতেই অভিমন্যুর মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। একজনের বিরুদ্ধে ছয় জন মহারথী আর তার সাথে তাদের সেনারা মিলে একজন মাত্র যোদ্ধার উপর যেভাবে আক্রমণ করে তাকে হত্যা করা হল, বলা হয় দশ দিন যুদ্ধ পার হয়ে যাওয়ার পর এই প্রথম কৌরবরা অধর্ম যুদ্ধ করতে শুরু করল। এই যে অধর্ম শুরু হল এরপর আর কেউ কাউকে আটকাচ্ছে না, সবাই অধর্ম করতে শুরু করে দিল।

### মৃত্যুর জন্ম কাহিনী

এখনও কিন্তু অর্জুন কিছুই জানেনা। যুধিষ্ঠির খুব কান্নাকাটি করছে, কি মুখে আমরা অর্জুনকে এই দুঃসংবাদ দেব। গভীর শোকের পরিবেশে পাণ্ডবদের শিবির মুহমান। সেই সময় যুধিষ্ঠিরের কাছে ব্যাসদেব এসে উপস্থিত হয়েছেন। ব্যাসদেব কুরুক্ষেত্রের পাশেই কোথাও থাকতেন। ব্যাসদেবকে আসতে দেখে যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন *নিশ্চেষ্টা নিরভীমানাঃ শূরাঃ শত্রবশং গতাঃ। রাজপুত্রাশ সংরক্ষা বৈশ্বানরমুখং গতাঃ। অত্র মে সংশয়ঃ প্রাপ্তঃ কুতঃ সংজ্ঞা মৃত্যু ইত।। কস্য মৃত্যুঃ কুতো মৃত্যুঃ কেন মৃত্যুরিমাঃ প্রজাঃ। হরতমরসঙ্কশ তন্মো ব্রহ্ম পিতামহ।। ৭/৪৫/১৭-১৮।* ‘হে মুনিবর! এই যে যুদ্ধে এত বড় বড় যোদ্ধারা শায়িত হয়ে আছেন এদেরকে এখন বলা হচ্ছে মৃত। এই মৃত্যু কার হয় আর মৃত্যুর উৎপত্তি কিভাবে হল? কেন হল?’ মৃত্যুর ব্যাপারে সবাইই অনুসন্ধিৎসা থাকে। ব্যাসদেব তখন বললেন ‘এই মৃত্যুর একটা ইতিহাস আছে, সেই ইতিহাসটা আমি তোমাদের বলছি। ব্রহ্মা এক সময় সমস্ত প্রাণির সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি করার পর জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। একদিকে জনসংখ্যা যেটা বেড়ে যাচ্ছে সেটা আর নষ্ট হচ্ছে না আবার এদিকে সৃষ্টিও হয়ে চলেছে, যার ফলে পৃথিবীর উপর চাপ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ব্রহ্মা তখন রেগে গিয়ে ঠিক করলেন আমি সব সংহার করে দেব। সংহার করতে যাবেন সেই সময় রুদ্র মানে শিব এসে ব্রহ্মাকে বাধা দিয়েছেন ‘আপনি এটা কি

করছেন! আপনি নিজেই এই প্রাণিদের সৃষ্টি করেছেন আবার আপনি নিজেই কেন নিজের সৃষ্টিকে সংহার করতে চাইছেন? ব্রহ্মা বলছেন ‘জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে বলে পৃথিবীর উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে, আমি কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না কিভাবে এই জনসংখ্যাকে কমাব’। শিব তখন বলছেন ‘আপনি এই ভাবে সব প্রাণিকে বিনাশ করবেন না। তব প্রসাদাঙ্গবন্নিদং বর্তেত্রিধা জগৎ। অনাগতমোতীতঞ্চ যচ্চ সম্প্রতি বর্ততে। ১৭/৪৫/৫২। আপনি এই জগতের স্রষ্টা এইভাবে আপনি জগতকে বিনাশ করতে পারেন না। আপনারই অনুগ্রহে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত তিন ভাগে এই জগতকে যেন বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছে’। এইখানেই কালের বিভাজন হয়, বলা হয় তার আগে কাল এক ছিল। সৃষ্টি যখন একবার হয়ে গেছে যখন তখন সেই সৃষ্টিটাই থাকবে। শিব ব্রহ্মাকে বলছেন আপনি এই কালের দ্বারা তিন ভাগে জগতকে বিভাজন করে দিয়েছেন, ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। এই তিন কালে বিভাজন করে দিলে যারা মরে গেল তার ভূত মানে অতীতে চলে গেল, যারা এখন আসেনি তারা ভবিষ্যত হয়ে থাকবে।

‘ব্রহ্মা তখন নিজের ভেতরে ক্রোধ সৃষ্টি করলেন। ততোহগ্নিমুপসংহত্য ভগবন্ লোকসংকৃতঃ। প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কল্পয়ামাস বৈ প্রভুঃ। ১৭/৪৫/৬১। ক্রোধ সৃষ্টি করে ব্রহ্মা সেই ক্রোধকে উপসংহার করে মানুষকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুটো পথের শিক্ষা দিলেন। প্রবৃত্তি হল, মানুষ যখন জাগতিক কর্মের দ্বারা ক্রমশ উপরের দিকে উঠতে থাকে। নিবৃত্তি হল, মানুষ যখন ত্যাগের পথ অবলম্বন করে মুক্তির দিকে এগোয়। ব্রহ্মার ঐ ক্রোধের তেজ থেকে এক নারী জন্ম নিল। কৃষ্ণা রক্তা তথা পিঙ্গা রক্তজিহ্বাস্যলোচনা। কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ রাজেন্দ্র তণ্ডাভ্যাং তণ্ডভূষণা। ১৭/৪৫/৬৩। সেই নারী লাল আর কালো বর্ণের। নারীর জিহ্বা, চোখ আর মুখ হলুদ আর লাল বর্ণের। কর্ণে তার সুবর্ণ কুণ্ডল। তার যত বস্ত্র সবই সুবর্ণ নির্মিত। এই নারীর নাম কৃত্যা, মৃত্যুরই একটা রূপ নিয়ে কৃত্যার আবির্ভাব হল। ব্রহ্মা এই নারীকে বললেন ‘তুমি আমার সংহার-বুদ্ধি প্রভাবে যে ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছিল, সেই ক্রোধের তেজ থেকে জন্ম নিয়েছ, অতএব তুমি আমার আদেশে কি জড়, কি পণ্ডিত, কি মুর্থ, কি রূপবান, কি কুৎসিৎ এই পৃথিবীর সমস্ত প্রজাদের সংহার করতে থাক। আমি তোমাকে এই কাজে নিয়োগ করলাম’। ব্রহ্মার এই আদেশ শুনে সেই নারী করুণ স্বরে ক্রন্দন করতে শুরু করেছে। কেঁদে কেঁদে নারী বলছে ‘ভগবন্! আপনি কেন আমার মত এক পাপীকে জন্ম দিলেন? এই যে আমি অহিতকর ক্রুর কর্ম করব, যাদের একান্ত প্রিয়জন, ভালোবাসার পাত্র সেই পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা, পিতা, মা, স্ত্রী, স্বামীদের আমি বিনাশ করতে শুরু করব, সেই দুঃখে তারা যে অশ্রুপাত করবে তাতে আমার পাপ লাগবে। তারা আমার কিছু ক্ষতি করেনি অথচ তাদের ভালোবাসার লোকদের সংহার করতে থাকলে তারা আমার অনিষ্ট চিন্তা করবে এতে তো আমার পাপ লাগবে। তাদের চোখ থেকে যে অশ্রু নির্গত হবে সেই অশ্রুপাতের জন্য আমি শঙ্কিত। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কিছুতেই এই কাজ করতে পারবো না’। ব্রহ্মাকে এই কথা বলে ব্রহ্মার অনুমতি প্রার্থনা করে বলল ‘আমার নিতান্ত বাসনা যে এই ক্রুর কর্ম করার দায়িত্ব অর্পণ না করে বরং আমাকে অনুমতি দিন আমি যেন ধেনুকাশ্রমে গিয়ে কঠোর তপস্যাতে মগ্ন হয়ে যাই। আপনি আমাকে অধর্ম থেকে রক্ষা করুন’। ব্রহ্মা তাও বলে যাচ্ছেন মৃত্যো সঙ্কল্পিতাসি ত্বং প্রজাসংহারহেতুনা। গচ্ছ সংহর সর্বাঙ্গং প্রজা মা তে বিচারণা।। ভবিতা ত্বৈতদেবং হি নৈতজ্জাতন্যথা ভবেৎ। ভব অনিন্দিতা লোকে কুরক্ষ্ম বচনং মম। ১৭/৪৬/৯-১০। ‘তোমার সৃষ্টিই হয়েছে এই প্রজাকুলের বিনাশের জন্য, এর বাইরে তুমি অন্য কিছু বিচার করতে যেও না। লোকক্ষয় হবেই এর অন্যথা হবার নয়, অতএব তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর আর এর জন্য কেউ তোমার কোন নিন্দা করবে না’।

‘এরপর সেই নারী ধেনুকাশ্রমে গিয়ে তপস্যায় রত হয়ে গেল। তপস্যা থেকে ফিরে আসার পর আবার ব্রহ্মাকে বলছে ‘মানুষ সব কাঁদছে এদেরকে বধ করার দায়িত্ব আমাকে দেবেন না’। তখন ব্রহ্মা সেই নারীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন ‘আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তুমি যদি ধর্মপূর্বক সমস্ত প্রাণিকে বধ করতে থাক তাহলে তোমার কোন পাপ লাগবে না। মানুষকে সংহার করার এই কাজে তোমাকে কয়েকজন সাহায্য করবে। প্রথমে তোমাকে লোকপালরা সাহায্য করবে’। লোকপাল হল যারা মানুষকে পালন করেন, কিছুটা দেবতাদের শ্রেণীভুক্ত। ‘লোকপাল ছাড়া আর কারা তোমাকে সাহায্য করবে? যমরাজ আর নানা রকমের রোগ-ব্যাদি। এই কজন তোমাকে সব সময় সাহায্য করে যাবে। আর তোমার রূপটা সব সময় নির্মল হবে। তোমার কোন পাপই লাগবে না’। মৃত্যুরূপা নারী বলছে ‘ঠিক আছে আমাকে একটা বর দিন, এই আটটা অস্ত্র যেন মানুষকে আগে থাকতেই ভেদ করে দেয়’। কিভাবে কিভাবে মৃত্যু হবে এখানে সেটা বলা হচ্ছে। লোভঃ ক্রোধোহব্যসূয়েষ্যা দ্রোহ মোহশ্চ দেহিনাম্। অহ্রীশ্চান্যোন্যপরুষা দেহান্ ভিন্দ্যঃ পৃথগ্বিধাঃ। ১৭/৪৬/৩৭। এই

আটটি অস্ত্র হল – লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, অসূয়া পিণ্ডন বৃত্তি বা পরছিদ্রাশ্বেশীর মধ্যে পড়ে, মানে কারুর পেছনে তার নিন্দা করা, ঈর্ষা, দ্রোহ, দ্রোহ হল ঈর্ষারই আরেকটা বড় রূপ, যদি কারুর ভালো দেখে আমার মনে বিকার আসছে সেটা হল ঈর্ষা, আর দ্রোহ হল তোমার এই ভালো হয়েছে, আমার হয়নি! ঠিক আছে আমি তোমাকে শেষ করে ছাড়ব, এটা হয়ে গেল দ্রোহ, এরপর মোহ, নির্লজ্জতা, নির্লজ্জতা হল অহ্রী আর শেষে পারুষ্য বচন, মানে কঠোর বচন। লোভ আর ক্রোধ হিংসারই দুটো রূপ আর অসূয়া, ঈর্ষা আর দ্রোহ খুব কাছাকাছি। এই আটটা বৃত্তির কোন একটা যদি মানুষের মধ্যে থাকে তাহলে সেটা মানুষকে আন্তে আন্তে ফোঁপড়া করে দেবে, এইভাবে এগুলো মানুষকে মৃত্যুর কাছে নিয়ে এসে শেষে ভেদ করে দেবে। ইংরাজীতে একটা ব্যাখ্যা সব সময় দেওয়া হয়, যার মধ্যে sense of violence প্রবল ভাবে থাকে, ক্রোধ, অসূয়া, ঈর্ষা, দ্রোহ আর কঠোর বচন এর সব কটিই হল sense of violence, sense of violence যার মধ্যে যত বেশী থাকে তার কিন্তু মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবার সম্ভবনা অনেক বেড়ে যায়। যার মধ্যে এই sense of violence থাকে তার শরীরে নানান রকমের সমস্যা আসে, ব্লাড প্রেসার, ডাইবেটিস, ক্যান্সার এই ধরনের রোগ তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলবে, ফেলতে বাধ্য। যারা এই ধরনের রোগে মারা যায় তাদের ব্যক্তিত্বটাকে আমরা যদি খুব গভীর ভাবে কোন বিচার করি তাহলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে তার মনের মধ্যে কোন না কোন ভাবে inner violence ছিল বা যাদের মধ্যে এই ধরনের violence থাকে তাদের শরীরে মারাত্মক ব্যাধি আসে। শান্ত শিষ্ট মানুষদের এই ধরনের রোগের আক্রমণ খুব কম হয়। আসল কথা মানুষের মনের মধ্যে কি ধরনের বৃত্তি আছে আমরা স্পষ্ট জানিনা, এখানে আরেকটা যেমন বৃত্তির কথা বলা হয়েছে ‘লোভ’, কার মনের মধ্যে কিসের লোভ আছে আমরা কোন দিন জানতে পারবো না। তাছাড়া অহ্রী মানে নির্লজ্জতা বা মোহ তার মধ্যে আছে কিনা কোন দিন জানতে পারবো না। আমি একজনের সঙ্গে সারা জীবন কাটিয়ে দিলেও কোন দিন জানতে পারবো না যে ওর মনে কোন জিনিষের প্রতি মোহ আছে কিনা। এক দম্পতি একসাথে অনেক দিন ঘর সংসার করে আসছে। স্ত্রীর মৃত্যুর সময় সে তার এক বান্ধবীকে বলছে ‘আমরা দুজনে ঘর সংসার করেছি ঠিকই কিন্তু ওর প্রতি আমার কোন ভালোবাসা ছিল না, আমি আরেকজনকে ভালোবাসতাম’। এই যে একজনের প্রতি তার মোহ ছিল এটা কেউ কোন দিন জানতে পারবে না। এগুলোই হল মানসিক দুর্বলতা, এই দুর্বলতাকে দিনের পর দিন পুষে রাখলে এগুলোই মানুষকে ভেতরে ভেতরে বাঁঝড়া করতে থাকে।

মৃত্যু বলছে আমাকে তো বললেন লোকপাল, যমরাজ আর রোগ-ব্যাধি আমাকে সাহায্য করবে কিন্তু আমাকে আপনি বর দিন যাতে এই আটটা জিনিষ লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ, নির্লজ্জতা আর পারুষ্য বচন আগে থাকতেই মানুষকে যেন বাঁঝড়া করে দেয়। এতে আমার তখন পাপ লাগবে না। তখন ব্রহ্মা বললেন *যান্যশ্রবিন্দুনি করে মমাসংস্তে ব্যাধয়ঃ প্রাণিনামাত্মজাতাঃ। তে মারয়িষ্যন্তি নরান্ গতাসূন্ নাধর্মস্তে ভবিতা মাস্মা ভৈবীঃ।। না ধর্মস্তে ভবিতা প্রাণিনাঞ্চ ত্বং বৈ ধর্মস্তু ধর্মস্য চেশা। ধর্ম্যা ভূত্বা ধর্মনিত্যা ধরিত্রী তস্মাৎ প্রাণিনঃ সর্বতেমান্ নিয়চ্ছ।।* ৭/৪৬/৩৯-৪০। ‘ঠিক আছে তাই হবে’। ব্রহ্মা বললেন ‘এই যে মানুষের প্রিয়জনক হারানোর কষ্টের জন্য তোমার যে চোখের জল পড়েছিল সেটাকে আমি সংগ্রহিত করে রেখেছি। এখন তোমার এই চোখের জলকে ছেড়ে দিচ্ছি, এই চোখের জল এখন নানা রকমের ব্যাধি হয়ে মানুষের শরীরে বাস করে তাদের আয়ুকে কমিয়ে দেবে। হে নারী! তুমি নিশ্চিন্তে তোমার ধর্ম পালন করে যাও, তোমার কোন চিন্তা নেই মানুষ নিজেই মিথ্যার আশ্রয় করে নিজেকে পাপকর্মের মধ্যে ভাসিয়ে দেবে আর নিজের মৃত্যুকে নিজেই ডেকে আনবে, কারুর মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী থাকবে না’। এইসব বলে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বললেন ‘এরপর থেকেই মৃত্যু জগতের মাঝে বিচরণ করতে শুরু করে দিল। মানুষের মধ্যে যে কাম আর ক্রোধ আছে এই কাম আর ক্রোধই মানুষের কালকে হরণ করে নেয়। মানুষের মৃত্যুর আসল কারণ কাম আর ক্রোধ’। ব্যাসদেব ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন এই কাম আর ক্রোধই মানুষের মৃত্যুর কারণ, এর থেকেই ব্যাধির জন্ম হয়, ব্যাধি মানে রোগ *মৃত্যুস্তেষাং ব্যাধয়ঃ স্বপ্রসূতা ব্যাধী রোগো রুজ্যতে এন জন্তুঃ। সর্বেষাং বৈ প্রাণিনাং প্রায়ণান্তে তস্মাচ্ছোকং মা কৃথা নিষ্কলং ত্বম্।।* ৭/৪৬/৪৪। অর্থাৎ যেটা থেকে মানুষ রুগ্ন হয় সেটাকে বলা হয় রোগ, রোগই হল ব্যাধি। এইভাবে মানুষের আয়ু কমতে কমতে এক সময় শেষ হয়ে যায়। মূল কথা হল আগেকার দিনে মানুষের কাম ক্রোধ ছিল না বলে তাদের মৃত্যুও ছিল না। পরে মানুষের মনের মধ্যে যেমন যেমন কাম আর ক্রোধের প্রাদুর্ভাব হতে থাকল সেখান থেকেই তার মধ্যে নানা রকমের ব্যাধির জন্ম নিল, ব্যাধির সাথে সাথে তার শরীরটাও ক্ষয় হতে থাকে, সেখান থেকেই তার মৃত্যু এসে যায়। অভিমন্যুর মৃত্যু হওয়ার পর যুধিষ্ঠির মৃত্যুর ব্যাপারে প্রশ্ন করাতে ব্যাসদেব এইভাবে মৃত্যুর ব্যাখ্যা করলেন। মহাভারতের এটাই অভূতপূর্ব বিশেষত্ব, কোথায় এতক্ষণ এত যুদ্ধের বর্ণনা চলছিল, চক্রবাহ, অধর্ম যুদ্ধ, অভিমন্যু বধ, আবার সেখান থেকে আমাদের আন্তে করে অজান্তে একটা গভীর দার্শনিক তত্ত্বের দিকে নিয়ে চলে গেল।

### অর্জুনের প্রতিজ্ঞা

ব্যাসদেব এতক্ষণ যুধিষ্ঠিরকে ব্যাখ্যা করলেন মৃত্যু কিভাবে আসে, কেন আসে। মৃত্যুর ব্যাপারে বলার পর ব্যাসদেব এখন যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, সান্ত্বনা দিতে গিয়ে ব্যাসদেব এর আগের আগের রাজাদেরও এই ধরনের কত দুঃখজনক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তখন সেই সব রাজারা কিভাবে কিভাবে সেই দুঃখজনক ঘটনাকে অতিক্রম করে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিলেন বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে অর্জুন ফিরে এসেছেন। ফিরতেই অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদ অর্জুনকে দেওয়া হয়েছে। পুত্রশোক অর্জুন কাতর হয়ে ভেঙে পড়ছে। অর্জুন তখন হঠাৎ একটা প্রতিজ্ঞা করে বসলেন *যদ্যস্মিন্নহতে পাপে সূর্যোহস্তমুপযাস্যতি। ইহৈব সংপ্রবেষ্টাস্মি জ্বলিতং জাতবেদসম্*। ৭/৬৫/৩৯। ‘আগামীকাল সূর্যাস্তের আগেই আমি জয়দ্রথকে বধ করব, যদি বধ না করতে পারি তাহলে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করে যাব’। কিন্তু অর্জুন কেন জয়দ্রথকে বধের প্রতিজ্ঞা করলেন এটা ঠিক পরিষ্কার নয়। কারণ জয়দ্রথকে চক্রব্যূহের প্রধান প্রবেশদ্বার রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, অভিমন্যুকে আটকাতে পারেনি কিন্তু বাকিদের সবাইকে আটকে দিয়েছে। অর্জুন কি চাইছে বোঝা যায় না। অর্জুন কি চাইছে যে জয়দ্রথ তার দায়িত্ব থেকে সরে এসে শক্রপক্ষের সবাইকে বলবে ‘এসো তোমরা সবাই এখান দিয়ে প্রবেশ করে যাও’। জয়দ্রথ শুধু যে তার কর্তব্য পালন করবে বলেই আটকেছে তা নয়, তার ক্ষমতা ছিল বলেই আটকেছে, ক্ষমতা দেখানোর জন্যইতো যুদ্ধ। আর অভিমন্যুকে এইভাবে বধ করতে জয়দ্রথ কাউকে যে কু পরামর্শ দিয়েছে তাও না। অর্জুন যে কেন একমাত্র জয়দ্রথকেই অভিমন্যুর মৃত্যুর জন্য দায়ী করল বোঝা খুব মুশকিল।

### অর্জুনের মুখে বিভিন্ন পাপকর্মের বর্ণনা

যাই হোক অর্জুন এখন প্রতিজ্ঞা করে বলছে আগামীকাল সূর্যাস্তের আগে যদি আমি জয়দ্রথকে বধ না করতে পারি তাহলে আমি আগুনে প্রবেশ করে যাব, আর তার সাথে আরও অনেক পাপ যেন তার লেগে যায়। এই বলে কি কি পাপ লাগবে তার একটা বিরাট তালিকা দিচ্ছেন। সূত্র গ্রন্থে বলা হয় কোনটা করতে হয় আর কোনটা করতে নেই, কি কি জিনিষ করলে কি পরিমাণ পাপ লাগে, তার কি কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে সব বলা হয়। অর্জুনও এখানে বলছেন এই পাপ কাজ করে তাদের যা পাপ লাগে সেই পাপ আমারও যেন লাগে। যেমন বলছেন *যে লোকা মাতৃহত্যাং যে চাপি পিতৃঘাতিনাম্। গুরুদাররতানাং যে পিশুনানাঞ্চ যে তথা।। সাধূনসূয়তাং যে চ যে চাপি পরিবাদিনাম্। যে চ নিক্ষেপহর্ত্যাং যে চ বিশ্বাসঘাতিনাম্*। ৭/৬৫/২৫-২৬। কাল সূর্যাস্তের আগে যদি জয়দ্রথকে বধ না করতে পারি তাহলে বাবা-মাকে হত্যা করে তারা যে লোক পায় আমিও যেন সেই লোক পাই। সেই রকম বলছেন গুরুপত্নীগামী, আগেকার দিনে এটাকে গুরুতর পাপ বলে ধরা হত। সাধারণত ব্রাহ্মণরা বেশী বয়সে বিয়ে করতেন আর তাঁদের বউরাও ছিল কম বয়সী। ব্রাহ্মণদের কাছে যেসব শিষ্যরা বেদ অধ্যয়ন করতে আসত তারাও সব অল্প বয়সের। গুরুদের মনে এই ভয়টাও সব সময় থাকত যে তাঁর অল্প বয়সী বউগুলো শিষ্যের সাথে পালিয়ে না যায়। সেইজন্য সূতিকাররা বলে রেখেছিলেন গুরুপত্নীগামী, মানে গুরুর স্ত্রীর সাথে যদি সঙ্গ করা হয় তাহলে তার বিরাট পাপ লাগবে। মনুস্মৃতিতে এটাকেই বলা হচ্ছে গুরুতল্পবাসী, গুরুর বিছানায় শোয়া নিষেধ করা হচ্ছে, গুরু বিছানায় শয়ন মানে গুরুর স্ত্রীর সঙ্গ করা। অর্জুন বলছেন গুরুপত্নীগামীর যে পাপ হয় সেই পাপ আমার যেন লাগে। যারা পিঠ পেছন অপরের নিন্দা করে অর্থাৎ যারা পরনিন্দা পরচর্চা করে তাদের যে পাপ সেই পাপ আমারও যেন হয়। আমাদের শাস্ত্র প্রাচীনকাল থেকে এই পরনিন্দাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ বলে আসছে। মা-বাবাকে বধ করা আর গুরুপত্নীগামীর সাথে পরনিন্দাকে এক করে দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে অর্জুন বলে যাচ্ছে যারা সাধুপুরুষদের নিন্দা করে, অপরের নামে যারা মিথ্যা কলঙ্ক দেয়, অপরে যে জিনিষটা রাখতে দিয়েছে সেটাকে যারা আত্মসাৎ করে দেয়। ভারতীয়দের মধ্যে আগে এই ধরনের গোলমাল ছিল, ছিল বলেই এখানে বলা হচ্ছে যাতে এগুলো না করা হয়। একবার এক বণিক তার বন্ধুর কাছে একটা লোহার দাড়িপাল্লা রেখে বিদেশে বাণিজ্য করতে গেছে। বণিক অনেক দিন বিদেশে বাণিজ্য করে দেশে ফিরে এসে বন্ধুর কাছে গিয়ে দাড়িপাল্লাটা ফেরত চেয়েছে। বন্ধুটি বলছে ‘আর ভাই, তোমার এই দাড়িপাল্লাটা খুব সামলে রেখেছিলাম কিন্তু কিছু দিনে আগে সেটাকে ইঁদুরে খেয়ে নিয়েছে’। বণিক আর কি বলবে সে বুঝে গেছে বন্ধুটি কি রকম ‘ইঁদুরে খেয়ে নিয়েছে, ও ঠিক আছে এ রকমতো হতেই পারে। আমি নদীতে স্নান করতে যাব তোমার ছেলেকে আমার সাথে একটু দাও নদীর পারে আমার জামা কাপড় গুলো একটু ধরে থাকবে’। বন্ধুও ছেলেটিকে দিয়েছে বণিকের সাথে। বণিক তার ছেলেকে উধাও করে গুম্ব করে দিয়ে স্নান করে বন্ধুর বাড়ি ফিরে এসেছে। ছেলে কোথায় জিজ্ঞেস করতেই বণিক বলছে ‘আরে ভাই কি বলব তোমাকে! তোমার ছেলেকে বাজপাখী ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে’। এখন বন্ধুটি জজসাহেবের কাছে নালিশ করেছে এই বণিক আমার ছেলেকে গুম্ব করে দিয়ে বলছে বাজপাখীতে নিয়ে গেছে। জজসাহেব বণিককে প্রশ্ন করতেই বণিক বলছে ‘যদি ইঁদুরে লোহার দাড়িপাল্লা

খেয়ে নিতে পারে তাহলে বাজপাখী কেন ছেলেকে নিয়ে যেতে পারবে না’! ভারতে এই ধরনের সমস্যা অনেক আগে থাকতেই ছিল। অর্জুন বলছেন, যারা অপরের স্ত্রীকে ভোগ করে, যারা পাপের কথা আলোচনা করে, যারা ব্রাহ্মণ হত্যা করে, গোহত্যা করে, যারা পঞ্চ মহাযজ্ঞ না করে খাওয়া-দাওয়া করে এদের যা পাপ লাগবে আমারও এই একই পাপ যেন লাগে। কাল সূর্যাস্তের আগে যদি জয়দ্রথকে আমি বধ না করতে পারি তাহলে এই ধরনের লোকেরা যে লোক প্রাপ্ত হয় আমিও যেন সেই লোক প্রাপ্ত হই।

এরপর দ্বিতীয় শ্রেণীর পাপ বলতে গিয়ে বলছেন, যারা বেদের স্বাধ্যায় করে না, এটা অবশ্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যেই পড়ছে অর্থাৎ নিয়মিত যারা শাস্ত্র চর্চা করে না, যারা বড়দের অসম্মান করে, গুরুজন ও সাধুপুরুষদের অপমান করে এরা যে নরকে গিয়ে পড়ে আমিও যেন সেই নরকে গিয়ে পড়ি। ব্রাহ্মণ, গরু আর অগ্নি এই তিনটেকে যারা পা দিয়ে স্পর্শ করে তাদের যা পাপ হয় সেই পাপ যেন আমারও হয়। আগেকার দিনে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীটা কেমন ছিল এখান থেকে বোঝা যায়। এখানে বলা হচ্ছে স্পর্শতো ব্রাহ্মণান্ গাশ্চ পাদেনাগ্নি যা ভবেৎ। অঙ্গু শ্লেষ্মপূরীষং বা মুত্রং বা মুঞ্চতাং গতিঃ। তাং গচ্ছেয়ং গতিং ঘোরাং ন চেদ্রন্যাং জয়দ্রথম্। ১৭/৬৫/৩০। ব্রাহ্মণের গায়ে যদি পা দিয়ে স্পর্শ হয়ে যায়, গরুর গায়ে যদি পা লেগে যায় তাহলে সেটা কিন্তু পাপ। তার সাথে বলছেন অগ্নিকে যদি পা দিয়ে স্পর্শ করা হয় সেটাও এই একই পাপ। লোকেরা সিগারেট খাওয়ার পর নীচে ফেলে জুতো দিয়ে চেপে ঐ আগুনটাকে নিবিয়ে দেয়, এগুলো আমাদের নিষেধ ছিল। এরপর বলছেন যারা নদীতে, পুকুরে জলাশয়ে থুতু ফেলে, প্রস্রাব করে তাদের যা পাপ সেই পাপ যেন আমারও লাগে। মনুস্মৃতিতেও এই ব্যাপারে নিষেধ করা আছে। নদীতে কাপড় ছেড়ে স্নান করাটাও পাপ কর্মের মধ্যে ধরা হত, এটাও অবশ্য অর্জুন এখানে বলছেন নগ্নস্য স্নায়মানস্য। তারপর বলছেন যারা অতিথিদের আপ্যায়ন করে না খাইয়ে ও বিনা দক্ষিণাতে বিদায় করে, যারা ঘুষ নেয়, যারা অসত্যবাদী, যারা অপরকে ঠকাই, যার অপরকে মিথ্যে আরোপ দেয়, যারা চাকর-বাকরদের কথায় ওঠবোস করে, যারা নিজের স্ত্রী সন্তানদের সঙ্গে ভাগ না করে একাই খাওয়া-দাওয়া করে এরা যে ধরনের নরকে যায় জয়দ্রথকে না মারতে পারলে আমিও যেন সেই নরকে যাই। যে উপকারীর নিন্দা করে, যারা শ্রাদ্ধের সময় প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে না বা শ্রাদ্ধের অন্ন অপাত্রে দেয় বা শূদ্রা স্ত্রীর ব্রাহ্মণ স্বামীকে শ্রাদ্ধের অন্ন দেয়। মহাভারতে শূদ্রা স্ত্রীর ব্যাপারটা কয়েকবার আসবে। ব্রাহ্মণ যদি কোন শূদ্রা নারীকে বিয়ে করে তাহলে সেই ব্রাহ্মণকে তারা ব্রাহ্মণ বলে মানতেন না। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণদের প্রচুর অসবর্ণ বিবাহ করতে দেখা যেত। তারপরে বলছেন যারা মদ খায়, ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘন করে, কৃতঘ্ন, স্বামীর নিন্দা করে এই ধরনের লোকদের যা পাপ হয় সেই পাপ আমারও যেন হয়। নরকে কারা কারা যায় তার উপর আবার একটা ছোট তালিকা দিচ্ছেন, বাঁ হাতে যারা খাওয়া-দাওয়া করে, কোলের মধ্যে রেখে যারা খায়, রেলের থ্রী টিয়ারে যারা যায় তাদের কোলে রেখেই খেতে হয়, তাহলে এদের নরক বাস অবধারিত, পলাশ ফুলের আসনে যারা বসে, তিন্দুক গাছের ডাল দিয়ে যারা দন্ত মার্জন করে, উষা কালে যারা ঘুমোয় এরা সবাই নরকে যায়। উষাকালের পরে ঘুমোয় মানে ভোর পাঁচটার পরেও যারা ঘুমোয়। অর্জুন বলছেন এই ধরনের লোকেরা যে নরকে যায় আমিও যেন সেই নরকে যাই। উষাকালের পরেও যারা ঘুমোয় তাদের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে যারা মা-বাপের হত্যা করেছে। হিন্দুদের কাছে উষাকালে ওঠাটা কত গুরুত্ব এখানে বোঝা যায়। অর্জুন এখনও পাপের বর্ণনা করে যাচ্ছেন, বলছেন ব্রাহ্মণ হয়ে যে শীতকে ভয় পায় আর ক্ষত্রিয় হয়ে যে যুদ্ধকে ভয় পায় এরা সবাই নরকে যায়। রামকৃষ্ণ মঠের ছাপড়া আশ্রমে এক সাফাইওয়ালার ছেলে শীতকালে ভোরে স্নান করছিল, তার বাবা দেখতে পেয়ে ভোজপুরী ভাষায় গালাগাল দিয়ে বলছে ‘শালা, শীতের সময় সকালবেলা স্নান করছিস, মরে ব্রাহ্মণ হবি আর স্নান করতে করতে মরবি’। ছেলেকে বাবা অভিশাপ দিচ্ছে। শীত হোক গ্রীষ্ম হোক ব্রাহ্মণকে ভোরবেলাতে স্নান করতে হবে। রামানুজম এত বড় গণিতজ্ঞ ছিলেন কিন্তু প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইংল্যান্ডে যখন তিনি ছিলেন সেখানকার ঐ ঠাণ্ডাতেও তিনি দিনে তিনবার স্নান করতেন, এমন আচারি ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইংল্যান্ডের বেশীর ভাগ লোক স্নানই করেনা। অর্জুন বলছেন যে গ্রামে বেদধ্বণী হয় না, একই কুয়োর জল যে গ্রামের সবাই মিলে পান করে, শাস্ত্রের যারা নিন্দা করে, দিনের বেলায় যারা নারী সঙ্গ করে, অপরের বাড়িতে আগুন লাগায়, অপরকে বিষ দেয়, টাকা নিয়ে মেয়েকে যারা বিক্রী করে পাপ করে তারা যে নরকে যায় আমারও যেন সেই পাপ লাগে আর আমিও যেন সেই নরকে যাই। শেষে অর্জুন বলছেন ‘আমি যত পাপের তালিকা দিলাম আর যে পাপের কথা আমি বলিনি’ মানে অর্জুন যে পাপের কথা জানে না তার সবটাই যেন তার লাগে যদি জয়দ্রথকে কাল সূর্যাস্তের আগে বধ না করতে পারে।



### অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণের অসন্তোষ এবং পরে দারুণকে একান্তে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ

অর্জুনের এই প্রতিজ্ঞার বহর শুনে পরে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ খুব রেগে গিয়েছিলেন। অর্জুনকে বলছেন অসংমত্ৰা ময়া সাক্ষ্মমতিভারোহয়মুদ্যতঃ। কথং নু সর্বলোকস্য নাবহাস্যা ভবেম হি।।৭/৬৭/৩। ‘আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে তুমি এটা কি ধরনের প্রতিজ্ঞা করে নিলে। এতে সমস্ত লোকের কাছে আমরা উপহাসের পাত্র হব না তো’। চারিদিকে খবর হয়ে গেছে অর্জুন এই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করে বসেছে, তখন তো আর কোন লুকোচুরির কিছু ছিল না, এক অপরকে সব জানিয়ে দিত। জয়দ্রথের কাছে খবর চলে গেছে, অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনে জয়দ্রথ বলছে আমার আর যুদ্ধ করে কাজ নেই, আমি বাড়ি চললাম। অর্জুন যখন পণ করেছে আর যার পাশে শ্রীকৃষ্ণ আছেন, তার মানে আমার আর কোন বাঁচার রাস্তা নেই। দ্রোণাচার্য তখন জয়দ্রথকে সাহস দিয়ে বলছেন ‘তোমার কোন চিন্তা নেই, আগামীকাল আমি এমন এক ব্যুহ রচনা করব যাতে অর্জুন কোন ভাবেই তোমার কাছে পৌঁছাতে না পারে’। জয়দ্রথ কিছুই মানতে রাজী নয়। এদিকে দুর্যোধন, কর্ণ এরাও খুব করে জয়দ্রথকে বোঝাচ্ছে, অত সহজ নাকি, আমরা আছি না, তোমার কোন চিন্তা নেই।

পরের দিন দ্রোণাচার্য শকটব্যুহ রচনা করেছেন। শকটব্যুহ মানে গরুর গাড়ির মত দেখতে। মাঝখানে চাকা আর সামনে পেছনে লম্বাকারে বিস্তৃত। দ্রোণাচার্য একেই শকটব্যুহ রচনা করেছেন কিন্তু তার সাথে ব্যুহটাকে খুব জটিল আকারে তৈরী করেছেন। গরুর গাড়ির সামনের দিকটা লম্বা, মাঝখানে চাকা, চাকাটা হয়ে গেল চক্রব্যুহ। ঐ চক্রব্যুহের মধ্যে তিনি আবার একটা সূচীব্যুহ তৈরী করেছেন। ছুঁচের নীচে যে ফুটো থাকে ঐ জায়গাটাতে জয়দ্রথকে রেখে দিয়েছেন। জয়দ্রথকে এখন যদি মারতে হয় তাহলে তাকে আগে গরুর গাড়ির লম্বা অংশটাকে ভাঙতে হবে তারপর চক্রব্যুহকে ভেদ করে ঐ সূচীব্যুহের কাছে গিয়ে সেখানকার যোদ্ধাদের হারাতে হবে তারপর গিয়ে জয়দ্রথের নাগাল পাবে। এমন ভাবে সাজান হয়েছে যে জয়দ্রথকে মারা একেবারেই সম্ভব নয়, এরাও বুঝে গেছে জয়দ্রথকে মারা অসম্ভব।

সেদিন রাতে অর্জুন স্বপ্ন দেখছে – তার কাছে শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন। দুজনে মিলে কৈলাসে যাচ্ছেন। কৈলাসে গিয়ে আবার শিবের আরাধনা করছেন। আবার নতুন করে অর্জুনকে শিব পাশুপত অস্ত্র দিয়েছেন। শিব মন্ত্র দিয়ে অভিষিক্ত করে দিচ্ছেন আর শিখিয়ে দিলেন কিভাবে ব্যবহার করবে। সকালে ঘুম ভেঙ্গেছে। উঠে স্বপ্নের কথা মনে করতেই সে ধরে নিয়েছে যে – এই স্বপ্নটা বোঝাতে চাইছে যে আজকে আমি জয়দ্রথকে বধ করতে পারব। জয়দ্রথ ওদিকে ভয়ে কাঁপছে – আমার কি হবে! দ্রোণাচার্য বলছেন ‘তোমার কোন চিন্তা নেই, তোমাকে বাঁচালে অর্জুন মরবে, আমি তোমাকে রক্ষা করব, অর্জুন তোমাকে কিছুই করতে পারবে না’।

একই রাতে অর্জুন একদিকে স্বপ্ন দেখছে আরেক দিকে দৃষ্টিভ্রান্ত শ্রীকৃষ্ণের ঘুম আসছে না। শ্রীকৃষ্ণের এক চিন্তা জয়দ্রথকে কিভাবে অর্জুন মারবে। তিনি মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে তাঁর নিজস্ব সারথি দারুণকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ইন্দ্রের সারথি যেমন মাতলি, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের সারথি হচ্ছে দারুণ। দারুণ খুব দক্ষ সারথি। দারুণকে ডেকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ‘দারুণ, অর্জুন কি কাণ্ডটাই করে বসেছে, পুত্রশোকে কাতর হয়ে এমন একটা পণ করে নিয়েছে যে কাল জয়দ্রথকে সূর্যাস্তের পূর্বেই মারবে। আগামীকাল দুর্যোধনরা এমন সুরক্ষার ব্যবস্থা তৈরী করে নিশ্চিত করবে যে জয়দ্রথকে যেন অর্জুন কিছুতেই না মারতে পারে। কৌরবদের যত সৈন্য আছে তারা সবাই এককাটা হয়ে জয়দ্রথকে রক্ষা করবে, যাতে অর্জুন ওর নাগাল না পায়। দ্রোণাচার্য আর অশ্বত্থামা দুজনে মিলে জয়দ্রথকে বাঁচাবার জন্য আশ্রয় চেষ্টা চালাবে। ইন্দ্র হলেন ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ বীর, দেবতাদের রাজা, কিন্তু দ্রোণাচার্য যাকে রক্ষা করতে চাইবেন, তাকে ইন্দ্র মারাতো দূরে থাকুক স্পর্শও করতে পারবে না। জয়দ্রথকে বধ করা অর্জুনের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই আগামীকাল সম্পূর্ণ ভাবে আমাকে এমন চেষ্টা করতে হবে যাতে সূর্যাস্তের আগেই জয়দ্রথ মারা যায়। কারণ নহি দারা ন মিত্রাণি জ্ঞাতয়ো ন বান্ধবাঃ। কশ্চিদন্যঃ প্রিয়তমঃ কুন্তীপুত্রান্যামার্জুন।।৭/৭০/২৫। অর্জুন ছাড়া আমার প্রিয় বলতে আর কেউ নেই। আমার স্ত্রী, আমার বন্ধু-বান্ধব, আমার যে আত্মীয়-স্বজন কেউই অর্জুনের থেকে আমার প্রিয় নয় আমি অর্জুনকে কিছুতেই মরে যেতে দিতে পারবো না, অর্জুনকে আগামীকাল আমাকে বাঁচাতেই হবে। দারুণ, কাল যে যুদ্ধ হবে, এই ত্রিলোক আমার যুদ্ধের ক্ষমতা, আমার প্রভাব কাল প্রত্যক্ষ করবে। যদি আমি দেখি জয়দ্রথকে মারা যাচ্ছে না, আমি কিন্তু কাল আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে যুদ্ধে নেমে যাবো। আর এই যে হাজার হাজার রাজা আর তাদের রাজপুত্ররা যুদ্ধ করতে এসেছে, তাদের সবাইকেই আমি একাই কাল যমলোকে পাঠিয়ে দেবো। কারণ অর্জুনকে আমার বাঁচাতেই হবে। আর তুমি সাক্ষী থাকবে আমি কিভাবে আমার ক্রোধকে অবলম্বন করে আমার সুদর্শন চক্র দ্বারা কিরকম সংহার লীলা করি। শ্বঃ সদেবাঃ সগন্ধর্বাঃ

পিশাচোরগরাফসাঃ। জ্ঞাস্যন্তি লোকাঃ সৰ্বে মাং সুহৃদং সব্যসাচিনঃ। ১৭/৭০/৩১। আগামীকাল সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, সৃষ্টি, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ জানবে যে আমি অর্জুনের সত্যিকারের সুহৃৎ। আর যারা অর্জুনের দ্বেষকারী তারা আমারও দ্বেষ্টা। যারা অর্জুনের হিতৈষী তারাও জানতে পারবে যে, যারা অর্জুনের হিতৈষী তারা আমারও প্রিয়। সেইজন্য, দারুণক, তোমাকে বলছি তুমি কাল সকাল বেলাই আমার রথটাকে প্রস্তুত করে রাখবে। আর তুমি আমার পাশে পাশে থাকবে। যদি দেখি কিছু গোলমাল হচ্ছে, আমি অর্জুনকে ছেড়ে তোমার রথে উঠে পড়ব আর আমি নিজে যুদ্ধ করব। আর আমার কৌমদী গদা, দিব্য শক্তি, চক্র, ধনুষ, বাণ সব অস্ত্রগুলো রথের পেছনে মজুত করে রাখবে, আমার যে বিনতানন্দন গরুড়ের ধ্বজা, সেটাকেও তুমি রথে লাগিয়ে রাখবে। জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে। যদি দেখি আর হচ্ছে না, অর্জুন বাঁচবে না, যদি জয়দ্রথকে মারার কোন পথ আমি না বার করতে পারি, তাহলে কিন্তু অর্জুনকে ছেড়ে দিয়ে আমি নিজে যুদ্ধে নেমে যাব আর সবাইকে আমি একাই শেষ করে দেব। *পাঞ্চজন্যস্য নির্ঘোষমার্ষভেনৈব পূরিতম্। শ্রুত্বা সুভৈরবং নাদমুপযায়া জবেন মাম্। ১৭/৭০/৩৮।* পাঞ্চজন্য শব্দে যদি আমি ঋষভ স্বর বাজাই তাহলে তুমি আর দেবী না করে আমি যেখানেই থাকি না কেন, রথটাকে নিয়ে আমার কাছে চলে আসবে। তার মানে বুঝে নেবে আমি এবার যুদ্ধে নামছি’।

শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র লক্ষ্য অর্জুনকে রক্ষা করা, অর্জুনকে কিছুতেই তিনি মরতে দেবেন না, তাতে শ্রীকৃষ্ণের পণ ভঙ্গ হয়ে যাবে তো যাক। তারপর দারুণককে বলছেন ‘দারুণক, আমার রথের চারিদিকে যে জাল রয়েছে, যেটা বিশ্বকর্মা তৈরী করেছিলেন, ঐ জালটাকে রথে লাগিয়ে রেখো যাতে কোন তীর রথের গায়ে না লাগে। তুমি নিজেও কবচ পরিধান করে থাকবে’। এরপর শ্রীকৃষ্ণ চারটে বিশেষ ঘোড়ার নাম বলে দিলেন – বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও সুগ্রীব। এই চারটে ছিল শ্রীকৃষ্ণের সব থেকে সেরা ঘোড়া। শ্রীকৃষ্ণ আগে থেকেই পুরোপুরি প্রস্তুত হয়েই আছেন। জয়দ্রথকে মরতেই হবে। দারুণক তখন অর্জুনকে বলছে ‘আপনি যাঁর সারথি তাঁর তো পরাজয়ের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, তবে আপনি যেমন বললেন সেই ভাবে আপনার রথ কাল সকালে প্রস্তুত হয়ে থাকবে, আপনার পাঞ্চজন্যের ঋষভ স্বরধ্বনি শুনলেই আমি আপনার কাছে রথ নিয়ে পৌঁছে যাব’।

পরের দিন সকাল বেলাতে শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। দুজনে আবার আলোচনায় বসেছেন। অর্জুনের মধ্যে উৎসাহ পুরোদমে ফুটে উঠছে কিন্তু এদিকে শ্রীকৃষ্ণ নিজের ভেতরে চিন্তাকে গোপন করে কথা বলে যাচ্ছেন।

### জয়দ্রথের রক্ষার জন্য দ্রোণাচার্যের শকটব্যুহ রচনা

পরের দিন দ্রোণাচার্য জয়দ্রথকে বাঁচাবার জন্য আর অর্জুনকে আটকাবার জন্য শকটব্যুহ তৈরী করেছেন। শকট মানে হচ্ছে গরুগাড়ি। গরুগাড়ি যেমন লম্বা হয়, শকটব্যুহ ঠিক ঐ আকারে দেখতে হয়। গরুগাড়িকে যদি তিনটে ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে প্রথম দিকটা সরু কিন্তু দু পাশে থাকে দুটো বলদ, তারপরে মাঝখানে চাকা ঐ জায়গাটা গাড়ির সব থেকে চওড়া থাকে। ঐ চওড়াটাই বড় হতে হতে পেছনের দিকে অনেকটা লম্বা হয়ে বিস্তৃত থাকে। জয়দ্রথ ব্যুহের একেবারে লেজের দিকে বসে আছে। কৌরবদের সমস্ত সৈন্য যেভাবে দাঁড়িয়েছে, যদি অনেক উঁচু জায়গা থেকে দেখা হয় তখন মনে হবে যেন একটা গরুগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এখন কৌরবদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করতে যাবে তারা কোথায় কি পাবে ঠিক নেই। মহাভারতে বর্ণনা আছে যে এই ব্যুহ হচ্ছে চব্বিশ ক্রোশ লম্বা মানে আটচল্লিশ মাইল, আর পেছনের দিকে পাঁচ ক্রোশ চওড়া। পাঁচ ক্রোশ মানে দশ মাইল। অবশ্য এগুলো সবই কবির কল্পনা। করুক্ষেত্রে অত জায়গাই ছিল না। সে যাই হোক, পেছনের দিকে পদ্মফুলের মত আরেকটা গর্ভব্যুহ বানিয়েছে, যেটা অত্যন্ত দুর্ভেদ্য। পদ্মব্যুহের মাঝখানে আবার একটা সূচিব্যুহ বানিয়েছে। সেই সূচের ফুটোর মধ্যে জয়দ্রথ দাঁড়িয়ে আছে। জয়দ্রথকে এমন নিশ্চিন্দ নিরাপত্তায় রাখা হয়েছে যে অর্জুনের পক্ষে অসম্ভব জয়দ্রথকে বধ করা। প্রথমে গরুগাড়িকে ভাঙতে হবে, আবার সেই গরুগাড়ির মধ্যে মাঝে মাঝে নানা রকমের ব্যুহ বানিয়ে রাখা আছে। এতো বাধা অতিক্রম করে যদিও বা শেষ পর্যন্ত পেছনে পৌঁছে যায় সেখানে আবার পদ্মব্যুহ করা আছে। পদ্মব্যুহ মানে, পাপড়ির পর পাপড়ি। একটা পাপড়ি, মানে কয়েক হাজার সৈন্যকে পরাস্ত করে আবার আরেকটা পাপড়ির সামনে পড়তে হচ্ছে। আবার ঐ পদ্মব্যুহের মাঝখানে সূচিব্যুহ আছে, আর সেই সূচিব্যুহের সবার শেষে যে ফুটো আছে, জয়দ্রথ সেখানে বসে আছে। মোদ্দা কথা ঐ ব্যুহকে ভেদ করা যে কোন যোদ্ধার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এই ব্যুহ দেখে পাণ্ডবদের কপালে ভাঁজ পড়ে গেছে। একেই এই লম্বা ব্যুহ, তার ভেতরে আবার নানা ধরনের ব্যুহ। জয়দ্রথ বধের সময় যে ব্যুহটা করা হয়েছিল এটা ছিল এই যুদ্ধের সব থেকে জটিল ব্যুহ।

অর্জুন প্রথমেই দ্রোণাচার্যের সামনে পড়ে গেছে, সামনা সামনি হতেই এক অপরকে তীর মেরে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে এই তীর ছোঁড়াছুড়ি হতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ‘অর্জুন তোমরা গুরু-শিষ্য মিলে যেভাবে এক অপরকে তীর মেরে যাচ্ছ এতে একটা যুগ চলে যাবে কিন্তু তাতে কিছুই হবে না। দ্রোণাচার্য যেটা মারবে তুমি সেটা কাটবে আর তুমি যেটা মারবে সেটা তোমার গুরু কাটবে। এগুলো বন্ধ করে বরং একটা পথ বার কর যাতে তুমি সামনের দিকে এগোতে পার’। অর্জুন তখন দ্রোণাচার্যকে প্রণাম করে গুরুকে পরিক্রমা করতে শুরু করে দিলেন। দ্রোণাচার্য বুঝতে পেরেছেন অর্জুনের কি মতলব। কিন্তু উনি অর্জুনকে পথ করে দিলেন এগিয়ে যাবার। পরের দিকে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের বিরুদ্ধে খুব মারাত্মক অভিযোগ করেছিল ‘আপনি এইভাবে অর্জুনকে পথ দিয়ে এটা কি করলেন, আপনাকে অতিক্রম করে কি করে ভেতরের দিকে চলে যেতে পারল’? অর্জুন দ্রোণাচার্যের শ্রেষ্ঠ শিষ্য, অর্জুন গুরুর কাছে পরিক্রমা করে পথ চাইছে বলে দ্রোণাচার্য গুরুর মর্যাদা রক্ষা করার জন্য পথ দিয়ে দিলেন। হনুমান যখন সমুদ্র উল্লাঙ্গন করছিল তখন সুরসা হনুমানকে আটকে দিয়ে বলছে ‘আমার যা বর আছে তাতে তোমাকে আমার মুখে আসতেই হবে’। তখন হনুমান ক্রমশ নিজের শরীরটাকে বড় করতে করতে বিশাল আকার যখন করে নিয়েছে তখনই সে দুম্ করে মাছির মত শরীরটাকে ছোট করে সুরসার মুখের মধ্যে ঢুকেই বেরিয়ে এল। সুরসার কথা রক্ষা হয়ে গেল। দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের উপর খুব রেগে গিয়েছিল ‘আপনার মত একজন শ্রেষ্ঠ বীরকে লঙ্ঘন করে অর্জুন কি করে বেরিয়ে যেতে পারে। আপনার জীবিকা আমার জন্য চলছে, যাদের অর্থে আপনার জীবন চলছে আপনি তাদেরই অপ্রিয় কাজ করলেন! সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ কাল বাড়ি ফিরে চলে যাচ্ছিল, আমি আপনাদের উপর ভরসা করে তাকে এখানে আটকে রেখেছি, এখন দেখুন জয়দ্রথের কি হবে’!

অর্জুন দ্রোণাচার্যকে অতিক্রম করে একটু এগিয়েই দেখতে পাচ্ছে সে তার সমস্ত সৈন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অভিমন্যুর যেমন হয়েছিল, অভিমন্যু যখন ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল তখন তার পুরো সৈন্য পেছনে থেকে গিয়েছিল। এখানে অর্জুন দেখছে তার সৈন্য বাহিনী অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে। এখন শ্রীকৃষ্ণ চেষ্টা করছেন যে করেই হোক আমাকে গুরুর গাড়ির লেজে পৌঁছাতে হবে, যেখানে জয়দ্রথ লুকিয়ে আছে। কিন্তু তিনি ব্যুহ দেখে বুঝে গেছেন যে এটা একটা নিশ্চিত ব্যুহ তৈরী করা হয়েছে, কোন সুযোগই খুঁজে পাচ্ছেন না। এদিকে এই অবস্থা দেখে যুধিষ্ঠির ভীম এরা বলছে ‘আরে, এ যা অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে আমরা আজ শেষ হয়ে যাব, ঐদিকে অর্জুন একা ঢুকে গেছে, আর কালকেই এইভাবে অভিমন্যুকে আমরা হারিয়েছি, কিছু একটা কর’।

উত্তমৌজা আর যুধামন্যু ছিল অর্জুনের রথের পার্শ্বরক্ষক। এরা দুজনে কোন রকমে ভেতরে ঢুকেছিল। আর শেষের দিকে সাত্যকি, যে কিনা শ্রীকৃষ্ণের Commander এবং ভীম এরাও কোন রকমে মারামারি করে ঢুকেছে – যে করেই হোক ভেতরে ঢুকে অর্জুনকে আগে রক্ষা করতে হবে, তা নাহলে অভিমন্যুর মত অর্জুনও শেষ হয়ে যাবে, একা কতক্ষণ যুদ্ধ করবে। সাত্যকি আর ভীম দুজনে মিলে ওদের অনেক সাহায্য করেছিল ঐদিনকার যুদ্ধে। কেননা, অর্জুন একা, সে শ্রীকৃষ্ণ হোক আর যেই হোক, আর ঐ দুজন মাত্র পার্শ্ব চক্ররক্ষক, এরা কতক্ষণ যুদ্ধ করবে কৌরবদের এই বিশাল বাহিনীর সঙ্গে।

সারাদিন ধরে যুদ্ধ চলছে। দুপুর বেলাতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ‘অর্জুন, আমাদের রথের ঘোড়া গুলো খুব পরিশ্রান্ত ওদের একটু বিশ্রাম দরকার’। অন্যান্য দিন কি হয়, পুরো formation টা একসাথে লড়াই করে বলে মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম হয়ে যায়। কিন্তু এখানে অর্জুন একা পর পর একেকটা ব্যুহকে মেরে মেরে হারাচ্ছে আর এগোচ্ছে। মনে করুন অর্জুন দক্ষিণেশ্বর থেকে যুদ্ধ করতে করতে হাওড়ার দিকে এগোচ্ছে। অর্জুন বেলুড় মঠ পর্যন্ত মারতে মারতে এগিয়ে এসেছে। এখানে এসে সে ভাবছে হয়তো আমরা জিতে গেছি, কিন্তু ততক্ষণে যারা আগের সারিতে হেরে গিয়েছিল তারা আবার দৌড়ে গিয়ে পেছনের দিকে আবার formation করে নিয়েছে। যাকে হারিয়ে দিচ্ছে তাকে তো মেরে ফেলছে না। তারা পালিয়ে গিয়ে আবার তাদের ব্যুহের একেবারে পেছনে গিয়ে ব্যুহের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। আবার কৌরবদের অন্য একটা বড় বাহিনী পাণ্ডবদের বাকী সৈন্যদের আটকে রেখেছে, সেইজন্য পেছন থেকে অর্জুনকেও কেউ সাহায্যের জন্য অগ্রসর হতে পারছে না। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ‘অর্জুন, ঘোড়াগুলো আর পারছে না, কিছু একটা কর’। তখন অর্জুন বলছে ‘হে শ্রীকৃষ্ণ, এবার দেখুন আমার খেলা’। এই বলে এমন বাণ মারতে লাগল অর্জুন যে কৌরবদের চারিদিকে একটা কেপ্লার মত করে ওদের আটকে দিলো। সেই সময় অর্জুন বলল ‘এইখানে পনেরো মিনিট একটু বিশ্রাম করে নিন’। শ্রীকৃষ্ণ বলছে ‘ঘোড়া গুলোর খুব জল তৃষ্ণা পেয়েছে’। ‘ঠিক আছে’ বলে অর্জুন এমন বাণ মারল মাটির যে জায়গাটাকে বাণটা ভেদ করে দিল, ঐখান থেকে জল বেরিয়ে আসতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাড়াতাড়ি করে ঘোড়া গুলোর গায়ে যত তীর

লেগেছিল সেগুলো বার করে দিয়ে একটু দলাই মলাই করে, জল টল খাইয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যেই আবার ওদের তরতাজা করে তুললেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন ‘ঘোড়া গুলোর মধ্যে তেজ এসে গেছে চল এবার এগিয়ে যাওয়া যাক’।

### অর্জুনের অগ্রসরে দুর্যোধনের প্রতিরোধ

দুর্যোধন তখন আবার দ্রোণাচার্যকে বলছেন ‘দেখছেন অর্জুন কিভাবে ঢুকছে, আপনি কিছু একটা ব্যবস্থা করুন যাতে আমি অন্তত অর্জুনকে আটকাতে পারি’। তখন দ্রোণাচার্য বলছেন ‘ঠিক আছে, আমি তোমাকে অভ্যেদ্য কবচ বেঁধে দিচ্ছি, এটা ব্রহ্মার তৈরী কবচ, কোন তীর তোমাকে ভেদ করতে পারবে না’। অর্জুন যখন দুর্যোধনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন দুর্যোধনকে দেখে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন ‘আরে কি কাণ্ড! দুর্যোধন যে কবচ পড়ে এসেছে আমার বাণে তো সেই শক্তি নেই যে এই কবচকে ভেদ করবে। তবে কি জানেনে প্রভু, কবচ পড়ে নিয়েছে ঠিকই কিন্তু এই কবচ পরিধান করার জন্য যে কর্তব্যের বিধান দেওয়া আছে সেই কর্তব্যগুলো দুর্যোধন পালন করেনি। যেমন কোন নারী অপর নারীর অলঙ্কার পড়ে নেয় এও অপরের কবচ পড়ে এখানে এসেছে। কিন্তু সব অলঙ্কার সব নারীতে শোভা পায় না ঠিক তেমনি এই কবচও দুর্যোধন পড়ে এসেছে ঠিকই কিন্তু দুর্যোধনের বাকি সব কিছুই এই কবচের সাথে খাপ খাচ্ছে না। আর এর কবচের মধ্যেও অনেক ফাঁক থেকে গেছে, যেমন দুর্যোধনের হাতের আঙুলগুলো ফাঁকা’। তখনকার দিনে যোদ্ধারা যুদ্ধের সময় হাতে দস্তানা পড়ে নিতেন, দস্তানা গুলো সাধারণত পশুর চামড়া দিয়ে তৈরী হত বলে তীর মেরে দস্তানাগুলোকে ভেদ করা যেত না। দুর্যোধন কবচ পড়েছে ঠিকই কিন্তু হাত দুটো ফাঁকা, আঙুলের নখগুলো দেখা যাচ্ছে। অর্জুন তখন ঐ নখগুলোকে লক্ষ্য করে সূচিবাণ মারতে শুরু করেছে। একেকটা তীরের ডগায় সূচ লাগানো থাকত, অর্জুন নখের ডগা গুলোকে সূচিবাণ দিয়ে একেবারে ঢেকে দিয়েছে। আঙুলের ডগা, নখের গোড়া সূচি বাণে ভরে যেতে দুর্যোধন যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যুদ্ধভূমি থেকে পালিয়ে গেছে অথচ তার পুরো শরীর অভ্যেদ্য কবচ দিয়ে মোড়া। গ্রীক মাইথোলজিতে এচিলাস ইলি নামে একজন বড় গ্রীক যোদ্ধা ছিলেন, তার পুরো শরীরটাই একটা কবচের মত ছিল। কিন্তু তার পায়ের গোড়ালিতে একটু ফাঁক ছিল, ঐটাই তার শরীরের দুর্বল অংশ। একবার লড়াই চলছিল, সেই সময় এর দলের কেউ টাকার বিনিময়ে শত্রুপক্ষকে তার এই গোড়ালির কথাটা বলে দিয়েছিল। এবার শত্রুপক্ষ কায়দা করে এমন করে দিল যে এচিলাসের গোড়ালিটাকে সবার নজরে নিয়ে এসে গেছে। গোড়ালিটা নজরে আসতেই সেখানে তীর মেরে তাকে শেষ করে দিল। ঠিক সেই রকম দুর্যোধনের শরীরের সবটাই অভ্যেদ্য কবচ দিয়ে মোড়া কিন্তু হাতের নখগুলো খোলা। দুর্যোধন তখন সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

এখন অর্জুন পর পর যুদ্ধ করেই যাচ্ছেন। একজনকে হারাতে আরেকজন এসে যাচ্ছে, সে হেরে গেলে আরেকজন এসে যাচ্ছে। এইভাবে যুদ্ধ হয়েই চলেছে। সকাল থেকে যুদ্ধই চলছে আর অর্জুন ক্রমাগত সবাইকে হারিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দুর্যোধন আবার দ্রোণাচার্যকে গালাগাল দিতে শুরু করেছেন। তখন দ্রোণাচার্য দুর্যোধনকে বলছেন ‘সেই সময় তোমাকে আমরা সবাই এত করে বলেছিলাম জুয়া খেলো না, আজকে ঐ জুয়া খেলার পাপ তোমাকে সামলাতে হচ্ছে। তখন তো আমাদের কথায় কর্ণপাতও করেনি। শকুনি যখন পাশার দান দিচ্ছিল তখন মনে করছিল ওগুলো শুধু পাশা, কিন্তু তা নয়, ওগুলো তীক্ষ্ণ বাণ ছিল যেগুলো এখন তোমাদের মারছে। তাই তোমরা মনে করো না যে শুধু লড়াইয়ের জোরে অর্জুন এই যুদ্ধ করছে’।

এদিকে যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে ডেকে বলছেন ‘আমার ভাই অর্জুন একা অভিমন্যুর মত কৌরবদের সেনা ব্যূহের মধ্যে ঢুকে গেছে, তুমি এক্ষুণি অর্জুনের পাশে গিয়ে তাকে রক্ষা কর’। *স ত্বং ভ্রাতুর্বয়স্যস্য গুরোরপি চ সংযুগে। কুরু কৃষ্ণে সহায়ার্থমর্জুনস্য নরর্ষভ।।৭/৯৪/৪৭।* হে নরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি! অর্জুন তোমার ভ্রাতা, সখা এবং অস্ত্র শিক্ষক, অতএব তুমি অর্জুনের এই বিপদে সাহায্য কর। কিন্তু সাত্যকি বারবার বলছে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে আমাকে বলে গেছেন *অদ্য ম ধব রাজানমপ্রমত্তোহনুপালয়। আর্য্যাং যুদ্ধে মতিং কৃত্বা যাবদ্ধানি জয়দ্রথম্।।৭/৯৫/১১।* হে সাত্যকি! আমি যে পর্যন্ত জয়দ্রথকে বধ করছি সে পর্যন্ত আজ তুমি আর কোথাও না গিয়ে যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর। কিন্তু যাই হোক সাত্যকিকে যুধিষ্ঠির এক প্রকার জোর করেই পাঠিয়েছেন। ভীম যখন এগিয়েছে তখন সামনেই দ্রোণাচার্য এসে গেছেন। দ্রোণাচার্য তখন ভীমকে বলছেন *যদ্যসৌ তেহনুজঃ কৃষ্ণঃ প্ররিত্তোহনুমতে মম। অনীকং ন তু শক্যং মে প্রবেষ্টমিহ বৈ ত্বয়া।।৭/১১০/৮৯।* ‘অর্জুন যদিও আমাকে প্রণাম করে প্রদক্ষিণ করে আমার অনুমতিক্রমে প্রবেশ করেছিল তথাপি তুমি এই সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করতে সমর্থ হবে না’। দ্রোণাচার্য যেন বলতে চাইছেন তুমিও যদি আমাকে ঐ ভাবে

প্রণাম করে প্রদক্ষিণ কর তাহলে আমিও তোমাকে পথ দিয়ে দিতে পারি। ভীমও দ্রোণাচার্যকে বলছেন যেন বৈ পরমাং পূজাং কুবর্তা মানিতো হ্যসি। নার্জুনোহহং ঘৃণী দ্রোণ ভীমসেনোহস্মি তে রিপুঃ। ৭/১১০/৯২। ‘অর্জুনের মত আমি অত দয়ালু নই, আপনার কাছে পথ ভিক্ষা করে যাব না, আপনাকে পরাস্ত করার পরই আমি এগোব। আমি এখন আপনার শত্রু ভীমসেন’। ভীম এখন প্রচণ্ড রেগে আছে। ভীম কায়দা করে দ্রোণাচার্যকে এমন করে দিল যে গদা দিয়ে দ্রোণাচার্যের রথকে ভেঙে চুরমার করে বেরিয়ে গেছে। একটার পর একটা যুদ্ধ করে করে সাত্যকি আর ভীম কৌরব সৈন্যদের অতিক্রম করে চলেছে।

### ভুরিশ্রবা ও সাত্যকির লড়াই, অর্জুন কর্তৃক ভুরিশ্রবার দক্ষিণহস্ত ছেদন

সাত্যকি এবার ভুরিশ্রবার সামনে গিয়ে পড়েছে। ভুরিশ্রবা ছিল বৃহদাশ্বের পুত্র। বৃহদাশ্বও খুব বড় তপস্বী ছিলেন। ভুরিশ্রবাও এমনিতে বড় যোদ্ধা ছিল। এখন ভুরিশ্রবার সাথে সাত্যকির যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সাত্যকি আবার অর্জুনের শিষ্য। যুদ্ধ হতে হতে ভুরিশ্রবা এক সময় সাত্যকিকে বাগে পেয়ে খুব করে পিটিয়ে দিয়েছে আর সাত্যকির রথ ভেঙে দিয়ে এক হাতে তলোয়ার নিয়ে আরেক হাতে সাত্যকির চুলের মুঠিটা ধরে মাটির মধ্যে ঘোরাতে শুরু করেছে। মানে এইভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে সাত্যকির গলাটা এবার কাটবে। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন বহুভির্যস্ত সেনাভির্দুর্জয়ঃ সমরেহনথ। পশ্য বৃক্ষ্যাকব্যাং সৌমদন্তিবংশং গতম্।। পরিশ্রান্তং গতং ভূমৌ কৃতা কর্ম সুদুষ্করম্। তবাস্তেবাসিনং শূরং পালয়াজুন সাত্যকিম্। ৭/১২৩/৫২-৫৩। ‘অর্জুন! ঐ দেখো, তোমার বন্ধু ও শিষ্য সাত্যকির কি অবস্থা! যে সাত্যকি যুদ্ধে বহু সৈন্যেরও দুর্জয়, সেই বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের শ্রেষ্ঠ সাত্যকিকে ভুরিশ্রবা বধ করতে যাচ্ছে। তুমি সাত্যকিকে এক্ষুণি রক্ষা কর তা নাহলে সাত্যকি আর বাঁচবে না’! অর্জুন ঐটা দেখতেই সঙ্গে সঙ্গে একটা অর্ধচন্দ্রাকার বাণ মেরে ভুরিশ্রবার ডান হাতটা কেটে দিয়েছে। ভুরিশ্রবা তখন ডান হাতে তলোয়ার নিয়ে সাত্যকির গলাটা কাটতে যাচ্ছিল। ডান হাতটা কাটা পড়তেই বাঁ হাত যেটা সাত্যকির চুলের মুঠি ধরা ছিল সেই মুঠিটা ছেড়ে দিয়ে বলছে ‘অর্জুন! তুমি একি করলে! আমি তো তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম না। আমার মনযোগ অন্য দিকে ছিল, সেই সময় তুমি আমার হাত কি করে কেটে দিলে! কিং ন বক্ষ্যসি রাজানং ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্। কিং কুর্বাণো ময়া সংখ্যে হতো ভুরিশ্রবা ইতি।। ৭/১২৪/৫। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গিয়ে তুমি কি বলতে পারবে যে, ভুরিশ্রবা একজনের সাথে যুদ্ধ করছিল আর আমি তার হাত কেটে দিয়েছি? তুমি যে নিজেকে এত বিরাট যোদ্ধা বলে মনে কর, আর তুমি গর্ব করে বল আমি এই অস্ত্র সেই অস্ত্র বিশারদ, এখন তোমার ধর্মটা কোথায় রাখবে? এই যে যুদ্ধের সময় নিয়ম করা হয়েছিল যে অসাবধান, রথহীন, ভয় পেয়ে আছে, প্রাণের ভিক্ষা চাইছে, বিপদে আছে এদের উপর প্রহার করতে নেই। এই নিয়মকে তুমি কিভাবে উল্লঙ্ঘন করলে? আমি তো অসাবধান ছিলাম আর আমি অপরের সাথে যুদ্ধ করছিলাম। তোমার কাছে এই রকম নীচ কাজ আশা করা যায় না। তবে দেখা যায় যারা উচ্চবংশের লোক তারা যদি নীচ লোকের সঙ্গ করে তারাও নীচ হয়ে যায়। তুমি এই কৃষ্ণের সাথে আছ তো, এর মনে সব নীচ বুদ্ধি খেলা করে। এর সঙ্গ করে করে তোমার বুদ্ধিটাও নীচ হয়ে গেছে। তুমি এখন ক্ষত্রিয় ধর্ম ছেড়ে এই অধর্ম করছ। এই কৃষ্ণ এত রকমের নিন্দিত কর্ম করেছে যে বলে শেষ করা যাবে না, আর ঐখান থেকেই তোমার মধ্যে এই নীচ ভাবগুলো এসেছে’। এইভাবে ভুরিশ্রবা অর্জুনকে একটার পর একটা গালমন্দ করে যাচ্ছে। যুদ্ধে নিয়ম করা হয়েছিল একজন একজনের সাথে যুদ্ধ করবে। নিয়ম করা হয়েছিল ঠিকই অথচ গতকালই কৌরবরা ছয় মহারথী মিলে অভিমন্যুকে হত্যা করেছে।

অর্জুন তখন ভুরিশ্রবাকে বলছেন ‘মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন তার বুদ্ধিটাও ভোঁতা হয়ে যায়, তুমি এখন বুড়ো তাই তোমার বুদ্ধিটাও ভোঁতা হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ যিনি কিনা সবারই ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ সেই শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে তুমি কিছুই জানো না আর আমাকেও জানো না তাই এই রকম নিন্দা করছ। আমার ধর্ম অধর্ম নিয়ে তুমি যে প্রশ্ন করছ, তা তুমি একটা কথা জেনে নাও, যারা ক্ষত্রিয় তাদের নিজের ভাই, পিতা, সন্তান, সম্বন্ধী, বন্ধু এরা সবাই যুদ্ধের সময় সব সময় তার আশ্রিত হয়। এদের রক্ষা করার জন্য কোন ধর্ম অধর্ম হয় না’। এই ব্যাপারগুলো খুব জটিল, সেইজন্য বলা হয় মহাভারত না পড়লে মানব জীবনের গতি প্রকৃতি বোঝা যায় না। ভুরিশ্রবা এর আগে বলল, তোমরা নিজেরাই যুদ্ধের সব নিয়ম-কানুন ঠিক করে নিয়েছ আর এখানে সবাই বন্ধু বান্ধবরাই যুদ্ধ করছে অন্য দিকে অর্জুন বলছেন সাত্যকি তাঁর আশ্রিত কারণ সাত্যকি একাধারে অর্জুনের বন্ধু ও শিষ্য, অর্জুন সাত্যকিকে চোখের সামনে মরতে দেবে কি করে! অন্য দিকে এরাই আবার নিয়ম তৈরী করে নিয়েছে যে অসাবধান তাকে মারা যাবে না। অর্জুন বলছেন ‘তুমি নিজে রথে বসে যুদ্ধ করছিলে আর সাত্যকির রথ ভেঙে যাওয়াতে সে মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিল, আর সেই সময় তুমি নিজের কায়দা

দেখাচ্ছিলে, এগুলো কি অধর্ম নয়! আর এই সাত্যকি এতক্ষণ যুদ্ধ করতে করতে ভেতরে ঢুকেছে আর তোমাকে এতক্ষণ কোন যুদ্ধ করতে হয়নি বলে তুমি পুরো তরতাজা ছিলে, এটাতো অসম যুদ্ধ হয়ে গেল। তুমি আর অত ধর্মের কথা কেন বলছ গতকালই তোমরা ছ'জনে মিলে একা অভিমন্যুর উপর আক্রমণ করে অধর্ম উপায়ে তাকে বধ করেছ'। অর্জুন আরও অনেক কথা পর পর বলে গেছেন। অর্জুনের সব কথা বলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ভুরিশ্রবা আর একটি কথাও অর্জুনকে না বলে অর্জুনের বাণে কাটা ডান হাতটা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে অর্জুনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে অর্জুনকে চরম অপমান করে পাল্কি মেরে ঐ রণভূমির উপর উপবেশন করে পরব্রহ্মের ধ্যানে বসে গেল। ছোটবেলা থেকে কাহিনী শুনে আমরা মনে করি পাণ্ডবরা যা করেছিল সব ঠিকই করেছিল। কিন্তু তা নয়, উভয় পক্ষই অনেক গোলমাল করেছে। ইতিহাস সব সময় জয়ীদের হয়েই লেখা হয়।

অর্জুন এই ঘটনায় একটু বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। কারণ যুদ্ধ ছেড়ে এখন ভুরিশ্রবা মাটিতে বসে পড়েছে। তখন আবার অর্জুন নরম সুরে বলছেন 'আপনি আমার মিছিমিছি নিন্দা করছেন, সাত্যকি আমার আশ্রিত আমি তাকে কি করে মরতে দিতে পারি'। ভুরিশ্রবা কোন কথা বলছে না দেখে অর্জুন খুব ভেঙে পড়েছে। কারণ ভুরিশ্রবা খুব সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিল। অর্জুন তখন বলছেন 'এই ক্ষত্রিয় ধর্মে ধিক্, যে ধর্ম আপনার মত পুরুষকে এই দুরবস্থায় ফেলে দেয়'। ভুরিশ্রবার বাবা এত বড় তপস্বী, সে নিজেও তপস্বী, অর্জুনকে তাঁর মত লোকের হাত কাটতে হল! এখানে এক অপরের পরিচিত, সবাই সবাইকে সম্মান করত, সেখান থেকে পরিস্থিতি এমন হল যে তাদের সম্পর্ক এই তিক্ততায় পৌঁছে গেছে। অর্জুন বলছেন 'জয়দ্রথকে বধ করার পণ যদি আগে থাকতে না করা থাকত তাহলে কি আমি এই কাজ করতে পারতাম'!

ইতিমধ্যে সাত্যকি উঠে দাঁড়িয়েছে। ভুরিশ্রবা এখন অস্ত্র ত্যাগ করে ধ্যানে বসে গেছে। সাত্যকি উঠেই কেউ কিছু বোঝবার আগেই তলোয়ারটা নিয়ে সোজা ভুরিশ্রবার কাছে গিয়ে তার গলাটা কেটে দিয়েছে। সাত্যকি ভুরিশ্রবার গলাটা কাটতে যাচ্ছে সেই সময় কৌরবদের সবাই চৈঁচিয়ে বলছে এই অবস্থায় ভুরিশ্রবাকে মেরো না। সাত্যকিও কারুর কোন কথা কানেও নিল না। গলাটা কেটে দিয়ে সাত্যকি বলছে 'গতকালই যে তোমরা সবাই মিলে একটা বাচ্চা ছেলেকে নৃশংস ভাবে মেরেছিলে তখন তোমাদের ধর্ম কোথায় ছিল। আমার আগে থাকতেই পণ করা আছে যুদ্ধে আমাকে যে অপমান করবে আমি তাকে কিছুতেই ছাড়ব না। ভুরিশ্রবা আমার চুল ধরে অপমান করেছিল, আমি আর একে ছাড়ছি না'। এই সব বলতে বলতেই সাত্যকি ভুরিশ্রবার মুণ্ডটা কেটে উড়িয়ে দিয়েছে। সাত্যকি তখন বাল্মীকি রামায়ণ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছে *ন হস্তব্য্যাঃ স্ত্রিয়ঃ ইতি যদ্রবীষি প্লবঙ্গম্। পীড়াকরমমিত্রাণাং যৎ স্যাৎ কর্তব্যমেব তৎ।। ৭/১২৪/৪৯।* এর আগে শ্রীরামচন্দ্র যখন বালিকে বধ করেছিল তখন বালি শ্রীরামচন্দ্রকে বলেছিল – এটা আপনি কিসের ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করলে, আমি তো আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম না, আপনি লুকিয়ে আমাকে তীর মারলেন। তখন বাল্মীকি বলছেন, যদিও বাল্মীকি রামায়ণে এই শ্লোকটা কোথাও নেই, তখন নাকি শ্রীরামচন্দ্র বলেছিলেন 'বালি! তুমি যে বলছ এটা করতে নেই সেটা করতে নেই, কিন্তু জেনে রাখ যারা উদ্যোগী পুরুষ তাদের কাছে শত্রুকে সব রকম ভাবে কষ্ট দেওয়াটাই ধর্ম'। সাত্যকি যাই বলুক পরের দিকে এই ঘটনা নিয়ে অনেক বিতর্ক ও ঝামেলা হয়েছিল।

### জয়দ্রথ বধ

সাত্যকি আর ভীম এখন একজোট হয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করছে। আর এদিকে অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ এগিয়ে যাচ্ছে, তাঁদের পেছনেও এক এক করে সবাই এগিয়ে চলেছে। যত দিন শেষ হয়ে আসছে আর অর্জুন এমন তীব্র গতিতে বাণ চালাতে শুরু করেছে যে বোঝাই যাচ্ছে না কখন সন্ধান করছে আর কখন তীর চালাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন 'হে কুন্তিনন্দন! সূর্য আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অস্তমিত হয়ে যাবেন। যদিও আমরা এদের ঘিরে ফেলে জয়দ্রথের কাছে পৌঁছে গেছি কিন্তু জয়দ্রথকে এখন ছয়জন মহারথী ঘিরে রেখেছে। *এতাননির্জিত্য রণে যদ্র থান্ পুরুষষভ। ন শক্যঃ সৈন্ধবো হস্তঃ যত্তো নির্বাজমর্জুন।। যোগমত্র বিধাস্যামি সূর্য্যস্যাবরণং প্রতি। অস্তং গতমিবাব্যক্তং দ্রক্ষত্যর্কং স সিন্ধুরাট্।। ৭/১২৭/১৪-১৫।* এই ছয়জনকে না হারাতে পারলে তুমি কিন্তু জয়দ্রথের কাছে পৌঁছাতে পারবে না। আর পর পর ছয়জন মহারথীকেও তুমি কোন দিন এই অল্প সময়ের মধ্যে হারাতে পারবে না, এখন আমি যদি কোন কায়দা না করি তাহলে তোমাকেই আর বাঁচান যাবে না। তাই এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে সূর্যদেব অস্ত হয়ে যান'। এই বলে শ্রীকৃষ্ণ এক অঙ্ককারের সৃষ্টি করে দিলেন *সৃষ্টে তমোসি কৃষ্ণেন গতাহস্তিমিতি ভাস্করঃ। ত্বদীয়া জহন্যুর্যোধাঃ পার্থনাশান্নরাদিপ।। ৭/১২৭/১৯।* এমন একটা মায়া তৈরী করে দিলেন সবাই দেখল সূর্য যেন অস্ত হয়ে গেল। দিবাকর

অন্তিমিত হয়ে গেছে মনে করে এবং অর্জুন অগ্নিতে প্রবেশ করবে এই ভেবে কৌরবরা আনন্দ করতে শুরু করল। এই ঘটনাকে পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতরা নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সেদিন হয়ত সেই সময় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ছিল। তবে সেই রকম কোন গ্রহণ ছিল বলে মনে হয় না, কেননা তখনকার দিনে জ্যোতিষশাস্ত্র অনেক উন্নত হয়ে গিয়েছিল আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য জ্যোতিষশাস্ত্রে ভালোই অভিজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁদের জানানর কথা যে ঐ সময় সূর্যগ্রহণ হতে যাচ্ছে। মূল কথা হল এমন কিছু একটা হল যাতে সবার মনে হল সূর্য যেন অন্তিমিত হয়ে গেছে। আবার অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন সেই সময় এত ধুলো উড়ছিল যে ধুলোর জন্য মনে হল সূর্য যেন ডুবে গেছে। এদিকে জয়দ্রথ বারে বারে উঁকি মেরে দেখছে সূর্য অস্ত গেছে কিনা। যখন দেখল সূর্য অস্তে চলে গেছে তখন তার সব ভয় চলে গেছে। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে সবাই এখন আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বললেন অয়ং কালো মহাবাহো বধায়াস্য দুরাত্ননঃ। ছিক্তি মূর্দ্ধানমস্যাশু কুরু সাফল্যমাত্ননঃ।।৭/১২৭/২৩। ‘অর্জুন, এই উপযুক্ত সময় তুমি এবার জয়দ্রথের গলাটা কেটে দাও আর তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর’। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন স্কুপতেঃ প্রভঞ্জনসুতানুজ। উৎসঙ্গে পাতয়াদ্যাশু বৃদ্ধক্ষত্রস্য ভারত।। অথ ত্বমস্য মূর্দ্ধানং পাতয়িষ্যসি ভূতলে। তবাপি শতধা মূর্দ্ধা ফলিষ্যতি ন সংশয়ঃ।।৭/১২৭/৬৪-৬৫। আর তুমি এমন বাণ মার যাতে জয়দ্রথের কুণ্ডলযুক্ত মুণ্ডটা ওর বাবা বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে গিয়ে পড়ে, জয়দ্রথের মুণ্ডটা যদি মাটিতে পড়ে তাহলে তোমার মুণ্ডটাই সহস্র টুকরো হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে’। তখন অর্জুন একটা বিশেষ বাণকে দিব্যাস্ত্রে অভিষিক্ত করে সেই বাণকে জয়দ্রথের উপর চালাতেই জয়দ্রথের মুণ্ডটাকে কেটে নিয়ে বাজপাখীর মত উড়িয়ে জয়দ্রথের বাবা বৃদ্ধক্ষত্র যেখানে তপস্যা করছিলেন সেইখানে ঠিক তাঁর কোলের মধ্যে গিয়ে তীরটা মুণ্ডসহ পড়ল। বৃদ্ধক্ষত্র কোলের মধ্যে কি পড়েছে দেখতে গিয়ে মুণ্ডটা তুলে দেখেন তাঁরই ছেলে জয়দ্রথের মুণ্ড। দেখতেই তিনি মুণ্ডটা হাত থেকে ছেড়ে দিতেই মাটিতে গিয়ে পড়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে জয়দ্রথের বাবারই মুণ্ডটা সহস্র টুকরো হয়ে উড়ে গেল। মুণ্ডটা মাটিতে পড়তেই শ্রীকৃষ্ণ আবার তাঁর মায়াটা সরিয়ে নিয়েছেন। সবাই দেখছে সূর্য এখনও আকাশে জ্বলজ্বল করছে। আদর্শেই সূর্য ছিল কিনা আমরা কেউ বলতে পারবো না। এমনও হতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ সত্যি সত্যি সূর্যাস্তের পরই অর্জুনকে দিয়ে জয়দ্রথকে মারিয়ে দিয়ে সূর্যের আলো দেখিয়ে সবাইকে বোকা বানিয়ে দিয়েছেন। এগুলো বলা খুব মুশকিল, কারণ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে এত রকমের ছল চাতুরি করিয়েছেন যে কেউ ধরতেই পারতো না। শ্রীকৃষ্ণ নিজের দিক থেকে একেবারে পরিস্কার ছিলেন, উনি যাকে বলে দিতেন তাকে আমি এই সময় মারব তখন ধরে নিতে হবে সে মারাই গেছে। এরপর শ্রীকৃষ্ণ আর দেখবেন না এই কাজ করতে গিয়ে তিনি ডান দিক কি বাঁ দিক করেছেন। এখানে বলছেন ততো বিনিহতে রাজন্ সিন্ধুরাজে কিরীটিনা। তমোস্তদ্বাসুদেবেন সংহতং ভরতর্ষভ।।৭/১২৭/৭৯। শ্রীকৃষ্ণ যে অন্ধকারের সৃষ্টি করেছিলেন সূর্যকে ঢাকা দেওয়ার জন্য, জয়দ্রথের মুণ্ড তার বাবার কোলে পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই অন্ধকারকে সরিয়ে দিলেন, তখন আবার আকাশে সূর্যকে দেখা যাচ্ছে। সেইজন্য কারুর কোন অভিযোগ নেই।

### দুর্যোধনকে কর্ণের উপদেশ

আকাশে সূর্যকে দেখা যেতেই আবার নতুন করে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সেই সময় দুর্যোধন আর কর্ণের মধ্যে কথাবার্তা চলছে, কর্ণের কাছে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের নামে প্রচুর নিন্দাবাক্য বলে যাচ্ছে, দ্রোণাচার্যের জন্যই আজ আমাদের এই দুরবস্থা হয়েছে। কর্ণ তখন দুর্যোধনকে বলছে আচার্য্যং মা বিগর্হস্ব শক্ত্যাসৌ যুধ্যতে দ্বিজঃ। যথাবলং যথোৎসাহং ত্যক্তা জীবিতমাত্ননঃ।।৭/১৩২/১৪। ‘হে ভাই দুর্যোধন! তুমি আচার্যের নিন্দা করো না, তিনি একজন ব্রাহ্মণ আর তাও তিনি নিজের সব শক্তি লাগিয়ে আপ্রাণ আমাদের জয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অর্জুন যদি আমাদের সৈন্যবাহু ভেদ করে প্রবেশ করে থাকে এতে আশ্চর্য হওয়ার আর কি আছে, কারণ তার তো সব কিছুই আছে, আর তার অনেক রকম ক্ষমতা আছে’। কর্ণ আবার সেই দৈবকে নিয়ে আসছে ‘তুমি মনে রেখো দৈবকে কখনই উল্লঙ্ঘন করা যায় না, তোমার পেছন থেকে যে দৈবটা চলে আসছে সেটা বর্তমানে তুমি যেমন যেমন চেষ্টা করতে থাকবে সেই দৈবও সেইভাবে পাল্টাতে থাকবে। বর্তমানের প্রচেষ্টাতে যদি বেশী জোর থাকে তাহলেই পেছনের কর্মফলটা পাল্টাবে, তবে কি জান পেছনের কর্মফলের তোড়টা সব সময় বেশী থাকে। এই যে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ মারা গেল, তার প্রারব্ধই তাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে গেছে। এখন এই মৃত্যুকে বেশী গুরুত্ব না দিয়ে বর্তমান কর্তব্য কর্মে বেশী করে মন দাও। যখন লড়াই করে মানুষ জীবনে সফল হতে চায় তখন পরং যত্নং কুর্বাতিত্বং তয়া সার্কং রণাজিরে। হতাস্মাকং পৌরুষং বৈ দৈবং পশ্যাৎ করোতি নঃ। সততং চেষ্টামানানাং নিকৃত্যা বিক্রমেণ চ।।৭/১৩২/২৩। মানুষ যখন জীবনে সফল

হতে চায় তখন প্রথমে সে প্রাণপন চেষ্টা করে, দরকার হলে ছল কপট করে, মিথ্যে কথা বলে, পরাক্রম দেখায় সবই করে কিন্তু ফল অন্য রকম হয়। এই যে আমরা আমাদের শক্তি অনুসারে প্রাণপন যুদ্ধ করা সত্ত্বেও জয়দ্রথ নিহত হল এটাতেই বোঝা যায় দৈব বা প্রারব্ধ যেটা সেটাই শক্তিশালী। মহাভারতে এখানে কর্ণের এই উক্তিতে কিন্তু একমাত্র সত্য বলা যায় না। হিন্দুধর্ম কখনই একমাত্র দৈবের উপর নির্ভরতার কথা বলে না। হিন্দুধর্ম সব সময় বলবে, তুমি তোমার পেছনে সাথে করে কর্ণের একটা বড় বোচকাকে বয়ে নিয়ে চলেছ। যখন কিছু করলে, সেই কর্ণের ফল দেওয়ার সময় পেছনের ঐ বোচকার মধ্যে যা আছে তার হিসাবটা নিয়ে ফল দেবে। যেমন আগের ভালো কর্ণের মত কিছু ভালো কর্ম কর তাহলে সেই কর্ণের ফলটা খুব ভালো করে প্রস্ফুটিত করে দেবে। কিন্তু তার বিপরীতী কর্ম যদি থাকে তাহলে এই কর্ণের ফলটাকে দাবিয়ে দেবে। আমি অনেক দিন ধরে একটা ক্ষেত তৈরী করে রেখেছি, এবার যদি সেই ক্ষেতে বীজ, সার জল দিই তখন সেই বীজই ফসল হয়ে উঠবে। কিন্তু ক্ষেত যদি আগে থাকতে না তৈরী করা থাকে, তখন যখনই আমি বীজ, সার আর জল দেব তখনই পার্শ্বনিয়ামের মত আগাছা গুলো সার জল পেয়ে গজিয়ে উঠে বীজটাকে শেষ করে দেবে। আমি তো জানিনা আগে আগে আমার কি করা আছে। মানুষ বলে আগের জন্মের কথাতো আমাদের মনে নেই, আগের জন্মের কথা থাক এই জন্মেই আমি গতকাল এই সময় কি করেছি তাই মনে থাকে না। এই জন্মের আগে আমাদের কত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ জন্ম হয়েছে, সব জন্মের যত কর্ম আছে সব প্রস্তুত হয়ে থাকে, যখনই কর্ম করতে থাকে তখন আগের কর্মগুলোও তার মধ্যে চাড়া দিতে থাকে। একজন হয়তো সামান্য একটু দোষ করল আর তাতেই বিরাট ঝামেলার মধ্যে পড়ে যায়, আবার একজন হয়তো একটু কিছু ভালো করেছে তাতেই সে বিরাট ফল পাচ্ছে। এগুলোতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। ঠাকুর বলছেন – একজন লোক সারা রাত মদ খেয়ে গেছে, ভোরের দিকে এক গ্লাস মদ খেতেই উল্টে পড়েছে। সবাই বলছে এতটুকু মদ খেতেই এর মত লোক উল্টে গেল কি করে! একজন তখন বলছে, না সে সারা রাত মদ খেয়ে গেছে, সেটাই জমে আছে। কর্ণ বলছেন ‘যখন তুমি যুদ্ধ করতে এসেছে তখন তুমি দৈবকে ভুলে সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাও। এই চেষ্টা চালিয়ে চালিয়ে যেখানে শেষ পর্যন্ত যেটা দাঁড়াবে সেটাই তোমাকে মেনে নিতে হবে। জয়দ্রথের মৃত্যুকে তুমি বেশী গুরুত্ব দিও না। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে আমি পাণ্ডবদের এমন কিছু সুকৃতি দেখছি না যে যার জন্য আমরা পাণ্ডবদের উপর জয় পাবো না। জয়দ্রথ মারা গেছে ঠিক আছে, দ্রোণাচার্য হেরে গেছেন তাও তুমি কোন চিন্তা করো না, এখন এই মুহূর্তে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে’। এইসব বলে কর্ণ দুর্যোধনকে সান্ত্বনা দিয়ে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

### ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রশ্নে মূল্যবোধ

মহাভারতের যুদ্ধের দুর্ধর্ষ বর্ণনার অংশের মধ্যে এখন আমরা রয়েছি। যুদ্ধের বর্ণনাতে আমাদের খুব বিশেষ আগ্রহ নেই। কিন্তু এর মধ্যে এমন কিছু কিছু মূল্যবোধের প্রশ্ন উঠে এসেছে যেগুলো আমাদের ভালো করে অনুধাবন করা দরকার। কারণ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দর্শনে এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের বিকাশে মূল্যবোধ হল একটি আবশ্যিক অঙ্গ। মূল জীবন-দর্শনের দুটো প্রধান শেকড় ধর্ম ও মূল্যবোধ। তোমার জীবন-দর্শন যেমনটি হবে তোমার ধর্ম ও মূল্যবোধের শেকড়ও ঠিক তেমনটিই হবে। যেমন আমার কাছে যদি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান হন, আর আমার জীবনের উদ্দেশ্য যদি হয় শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাওয়া, তখন আমার ধর্মবোধ আর মূল্যবোধও সেই রকমই হবে। আবার যিনি দেখছেন সচ্চিদানন্দই সব, তিনিই সব কিছু হয়েছেন তাঁর মূল্যবোধ অন্য রকম হবে। আবার প্রত্যন্ত পার্বত্য প্রদেশের কোন আদিবাসী ভাবছে তার গ্রামের কোন প্রাচীন বৃক্ষের নীচে ছোট্ট একটা পাথরকে নিজের দেবতা বলে মনে করে তাকে একটু মুরগীর মাংস আর মদ নিবেদন করলে তিনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে অনেক কিছু থেকে রক্ষা করবেন। তখন তার কাছে তার মূল্যবোধ অন্য রকম হবে। আমাদের মত সাধারণ মানুষ সব সময় শাস্ত্রের উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে, বিশেষ করে ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক ভূমিটাকে ধারণা করতে পারিনা, ধারণা করলেও ধরে রাখতে পারিনা। মহাভারতের মত বইগুলো আমাকে দেখিয়ে দেয় আমরা আমাদের জীবন যখন চালাব তখন মূল্যবোধগুলো কিভাবে কাজ করে। আজকে যে হিন্দুধর্মকে আমরা দেখছি এই হিন্দুধর্ম মহাভারতের সময়েই মোটামুটি এই রূপটা নিয়ে নিয়েছিল। মহাভারতের পর থেকে ভারতের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারার মধ্যে খুব বেশী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। যুদ্ধের সময় দেখানো হচ্ছে মানুষ যখন ঝগড়া বিবাদ করে তখন মানুষের ভেতরে যত রকমের হিংস্রভাব জমে আছে সেগুলো সামনের দিকে চলে আসে। সাধারণ অবস্থায় মানুষ যখন ভদ্র সাজপোষাক পড়ে সমাজে ঘুরে বেড়ায় তখন তাকে চেনা যায় না। বেশীর ভাগ সময় মানুষ তার ভেতরকার রাগ, ক্ষোভ, হিংসা, লোভের মত রিপু গুলিকে ভেতরে চেপে রেখে দেয়। কিন্তু মানুষের স্বার্থে যখন ঘা পড়ে বা অন্য কোন কারণে হিংস্র হয়ে ওঠে তখন তার ভেতরে যা কিছু চেপে রাখা আছে, সব বেরিয়ে আসে। তখনই মানুষের আসল রূপটা বোঝা যায়। কোন মানুষের স্বরূপটা যদি দেখতে হয় তাহলে তাকে প্রচুর ক্ষমতা দিয়ে দিতে হয়, ক্ষমতা দিয়ে তাকে কোন ভাবে ক্রোধাধিত করে দিলেই তার আসল স্বরূপটা কি বোঝা যাবে। বিশ্বের সমস্ত দেশে যত সৈন্য আছে তাদের সবারই হাতে বন্দুক দেওয়া



থাকে, কিন্তু তাদের মূল প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বন্দুক কেন চালাতে নেই। ক্যারাতের যে ব্ল্যাক বেল্ট তার বউয়ের সাথে যখন বাগড়া হয় তখন সে যদি একটা চড় মারে তাতেই বউটা হয়তো মরে যাবে। কিন্তু সে কি কখন চড় মারে বউকে? কোন দিন কি আমরা কোথাও শুনেছি কোন পালোয়ান তার বউকে এক আছাড় দিয়ে মেরে ফেলেছে? কখনই শোনা যায় না। যখন ক্যারাতে শিখে শিখে বা কুস্তি করে করে এদের শক্তিটা বাড়তে থাকে তার সাথে সাথে নিজেকে ধরে রাখার ক্ষমতাটাও বেড়ে যায়। কিন্তু কাঁচা লোকের হাতে যদি ক্ষমতা চলে যায় আর তার মধ্যে যদি ক্রোধ এসে যায় তখনই সে আগ্রাসী হয়ে ওঠে। ক্ষমতা আর ক্রোধ এক সাথে যখন থাকবে তখন আমি কি রকম ব্যবহার করছি সেটাতেই বোঝা যাবে আমার মূল্যবোধটা কি রকম। মহাভারতের যুদ্ধের বর্ণনার মধ্যে বোঝা যায় কার কি রকম মূল্যবোধ। সবারই হাতে এখন মারত্মক ধরণের অস্ত্র আর সবাই গরম হয়ে আছে, এখন এদের আসল রূপটা বেরিয়ে আসবে। এর আগে যুদ্ধিষ্ঠির এক রকম বলছেন, ভীম এক রকম বলছেন, দ্রৌপদী এক রকম বলছেন, অর্জুনও আরেক রকম বলছে, কিন্তু যত যাই সবাই বলুক না কেন এগুলো সবই তাদের মুখের কথা। নিজের দর্শন যখন অপরকে শোনার সুযোগ পায়, অপরকে উপদেশ দেওয়ার সময় সবাই বিরাট ওস্তাদ। তুলসীদাসও রামচরিতমানসে বলছে, পরকে উপদেশ দেওয়াতে সবাই কুশল। কিন্তু কাজের সময় বিপরীত আচরণ করবে তা নাহলে কাজের সময় তাকে পাওয়াই যাবে না। কারণ তার মূল্যবোধ ভেতরেই ঢোকেনি। মহাভারতের যুদ্ধের বর্ণনা পড়লে বোঝা যায় এদের মূল্যবোধটা কি রকম ছিল।

### কর্ণের প্রতি কৃপাচার্যের দোষারোপ

জয়দ্রথ বধ হয়ে যাওয়ার পর দুর্যোধন খুব জোর আঘাত পেয়েছে। যে জয়দ্রথ মৃত্যু ভয়ে যুদ্ধ ছেড়ে নিজের রাজ্য সিংহু প্রদেশে ফিরে যাবে বলে ঠিক করেছিল সেই জয়দ্রথকে দ্রোণাচার্য কথা দিয়েছিলেন তিনি নিজে জয়দ্রথকে রক্ষা করবেন অথচ তাঁর চোখের সামনে অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করে দিতে সক্ষম হলেন। জয়দ্রথ শুধু যে দুর্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল তাই নয়, অন্য দিকে সে দুর্যোধনের একমাত্র বোন দুঃশলার স্বামী, দুর্যোধন কিছুতেই জয়দ্রথের মৃত্যুকে মেনে নিতে পারছে না। কর্ণ দুর্যোধনকে এইভাবে ভেঙে পড়তে দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন ‘বন্ধু! তুমি মন খারাপ করে ভেঙে পড়ো না, সর্বেষামেব পার্থানাং ফাল্গুনো বলবন্তরঃ। তস্যামোঘাং বিমোক্ষ্যামি শক্তিং শত্রুবির্মিতাম্॥৭/১৩৮/৮। পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুনই অধিক শক্তিদ্র, আমার কাছে যে শক্তি অস্ত্র আছে আজকেই আমি সেই অস্ত্র অর্জুনের উপর চালিয়ে দিচ্ছি। তস্মিন্ হতে মহেন্সাসে ভ্রাতরন্তস্য মানদ। তব বশ্যা ভবিষ্যন্তি বনং যাস্যন্তি বা পুনঃ॥৭/১৩৮/৯। মানী জনের সম্মানিত ও মহাধনুর্ধর অর্জুন যেই মারা পড়বে সেই মুহুর্তে এই ভাইগুলো হয় তোমার বশে চলে আসবে তা নাহলে আবার জঙ্গলে চলে যাবে। সেইজন্য তোমাকে অত ভেঙে পড়লে চলবে না’। এদিকে সবাই দ্রোণাচার্যের প্রচণ্ড নিন্দা করে নানা রকমে কুটুক্তি করে চলেছে। সেই সময় কৃপাচার্য, যিনি দ্রোণাচার্যের শ্যালক, খুব রেগে গিয়ে বলছেন বহুশঃ কথসে কর্ণ কৌরবস্য সমীপতঃ। ন তু তে বিক্রমঃ কশ্চিদৃশ্যতে ফলমেব বা॥ সমাগমঃ পাণ্ডুসুতৈর্দৃষ্টস্তে বহুশো যুধি। সর্বত্র নির্জিতশ্চাসি পাণ্ডবৈঃ সূতনন্দন॥৭/১৩৮/১৪-১৫। ‘কর্ণ! তুমি যখন নিজের কথা বলতে থাক তখন খুব বেশী বেশী করে বাড়িয়ে বলতে থাক। দুর্যোধনের কাছে তুমি তো অনেক আত্মশ্লাঘা করলে কিন্তু কাজের সময় তোমার কোন বিক্রম বা কোন বিক্রমপূর্ণ কথার একটাও ফল আজ পর্যন্ত দেখাতে পারোনি। যেমন এই কয়েক দিনের মধ্যে তুমি অনেকবার পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের মুখোমুখি হয়েছ কিন্তু এখনও পর্যন্ত তোমার কোন সাফল্য দেখতে পাইনি। যখন জঙ্গলে গন্ধর্বরা দুর্যোধনকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সবার আগে তুমিই নিজের প্রাণ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলে। বিরাট রাজার গোধন হরণের সময় অর্জুন একাই সবাইকে পিটিয়ে শেষ করে দিয়েছিল, তখনও তুমি কিছুই করতে পারোনি। আর এই যুদ্ধে অনেকবার তোমার সাথে অর্জুনের যুদ্ধ হয়েছে, এখনও পর্যন্ত তুমি অর্জুনের কিছুই করতে পারলে না। এরপরও তুমি বলে যাচ্ছ তুমি একাই অর্জুনকে উড়িয়ে দেবে, এইসব বড় বড় কথা বলা বন্ধ কর’। অবশ্য এরমধ্যে একটা পার্থক্য আছে এর আগের আগের যুদ্ধে কর্ণের হাতে শক্তি অস্ত্র ছিল না, এখন কিন্তু সেই অস্ত্র এসে গেছে। এই ধরণের কাহিনীর মধ্যে যদিও অনেক পৌরাণিক উপাদানের মিশ্রণ আছে, তবুও এটা ঠিক যে কর্ণের হাতে এখন যে শক্তি অস্ত্র আছে এটি অমোঘ যার উপর চালাবে তাকে শেষ না করে কখনই অস্ত্র বিফল হবে না, যার জোরে কর্ণ এখন হস্তিত্ব করছে। কর্ণও তো কোন সাধারণ যোদ্ধা ছিল না, কর্ণও কৃপাচার্যের কথাতে খুব রেগে গিয়ে বলছে ‘আপনি যেমন বলছে শূরা গর্জন্তি সততং প্রাবৃষীব বলাহকাঃ। ফলধ্বাশু প্রয়চ্ছন্তি বীজমুগ্ধম্ভারিব।৭/১৩৮/২৫। সুরবীর যারা হন তাঁরা বৃষ্টিকালের মেঘের মত গর্জন করে, আর ঠিক সময় যদি বীজ বপন করা হয় তাতে তার যে রকম ফল উৎপন্ন হয়, সুরবীররাও সেই রকম ঠিক সময়ে তাদের ফল দেখাতে থাকেন’। কৃপাচার্য বলতে চাইছিলেন কর্ণ যে গর্জন করছে এগুলো অসময়ের বীজ বপন করার মত, যেগুলো মাটিতেই পচে যায়। কর্ণ তখন বলছেন যাঁরা ঠিক ঠিক সুরবীর তাঁরা হলেন

বৃষ্টিকালের মেঘের মত, সেই মেঘের গর্জনে বৃষ্টি হবেই। কর্ণ বলছে ‘হে আচার্য! আরেকটি জিনিষ আপনি মনে রাখবেন যং ভারং পুরুষো বোচুং মনসা হি ব্যবস্যাতি। দৈবমস্য ধ্রুবং তত্র সাহায্যায়োপপদ্যতে।।৭/১৩৮/২৭। সুরবীররা যখন মন থেকে ঠিক করে নেয় আমি এই কাজটা করব তখন দৈব তাকে সাহায্য করবেই করবে’। ইংরাজীতেও একটা খুব নামকরা কথা আছে God helps those who help themselves। মানুষ যখন নিজেকে সাহায্য করে ভগবান তখন তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। উর্দুতেও একটা প্রবাদ আছে হিমাতে মর্দান মদতে খুদ।

### ঈশ্বরের ইচ্ছা আর শূন্য দিয়ে গুণ করা

আমরা যদি ঠিক ঠিক জগতের দিকে তাকাই, এতদিন যাবৎ আমার নিজের জীবনে যা কিছু দেখেছি, অপরের জীবনে যা কিছু দেখেছি, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা হিসাবে মেলাতে পারিনা, কেন এমনটিই হল। তবে যেটা প্রায়ই দেখা যায় যাদের ভেতরে সত্যিকারের শক্তি বা ক্ষমতা আছে, তারা যদি ঠিক করে নেয় আমি এটা করব, সেটা ভালো হোক মন্দ হোক, হঠাৎ করে দেখা যায় প্রকৃতি তার যত রকমের শক্তির উপাদান আছে সব শক্তি দিয়ে তাকে ধীরে ধীরে ঘিরে নিয়ে যেন তাকে সাহায্য করে এগিয়ে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু এখানে অর্জুনও সুরবীর আবার কর্ণও সুরবীর, অর্জুন ঠিক করে নিয়েছে কর্ণকে আমি বধ করব আবার কর্ণও ঠিক করে নিয়েছে আমি অর্জুনকে বধ করব। প্রকৃতি এখন কার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে? এখানে আমাদের সহজ সমাধান করতে বলা হচ্ছে না। সহজ সমাধান হল ভগবানের ইচ্ছা। ভগবানের ইচ্ছা যেই বলা হল তার মানে এই সমস্যার সমাধানের উত্তর আমার জানা নেই। ভগবানের ইচ্ছা, ইনসানাল্লাহা সব কিছুতে লাগিয়ে দিয়ে সহজ সমাধান করে দেওয়া যায়। অর্জুন কেন জিতল? ঠাকুরের ইচ্ছা। কর্ণ কেন মারা গেল? ঠাকুরের ইচ্ছা। যদি কর্ণ জিতে যেত, তাহলে কেন কর্ণ জিতল? তখনও ঠাকুরের ইচ্ছা। ঠাকুরের ইচ্ছা হল শূন্য দিয়ে গুণ করার মত। পাঁচকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্য হয়, সাতকেও শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্য হবে তাহলে পাঁচ সমান সাত হয়ে গেল কারণ দুটোই শূন্য। যদি জীবনকে আক্ষরিক ভাবে নিতে চাই তাহলে এই জিনিষটাকে সব সময় মাথায় রাখতে হবে। সহজ সমাধান দিয়ে কোন কিছুর সমস্যাকে মেটানো যায় না। শূন্য দিয়ে গুণ করে যে কোন দুটো সংখ্যাকে সমান করে দেওয়া যায়। জীবন এই শূন্য দিয়ে মেলানো যায় না।

এই যে কর্ণ আর অর্জুনের যুদ্ধ এমন একটা জায়গায় চলে গেছে এবং সত্যিই বিধাতা দুজনকেই সাহায্য করছেন কিন্তু একটা জায়গাতে একটু উনিশ-বিশের তফাতে এতটা পার্থক্য এসে যায়। এখানে দুজনেই জীবনকে বাজীতে লাগিয়ে দিয়েছে, দুজনের মধ্যে একজনকে মরতেই হবে, এইসব ক্ষেত্রে যেটাই হোক কোন ক্ষেত্রেই একটা কথা দিয়ে কিছুতেই সমাধান করা যাবে না। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে গেলে এটা পরিষ্কার যে কর্ণ অর্জুনকে একটা জোর লড়াইয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে আর অর্জুনও কর্ণকে কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। কর্ণের কাছে এত দিব্যাস্ত্র আছে কে তার সাথে লড়তে যাবে? অর্জুনের কাছেও অনেক দিব্যাস্ত্র আছে কে লড়তে যাবে অর্জুনের সাথে? এখানে দুজনেই ঠিক করে রেখেছে হয় জিতব না হয় মরব, যদি মারাও যাই তাহলে অত সহজে ছাড়বো না। সেইজন্য প্রকৃতিও দুজনকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে। এখন কে মরবে কে জিতবে কেউ জানে না। কর্ণ এই কথাই বলতে চাইছে মানুষ যখন ঠিক করে নেয় আমি এই কাজটা করব তখন দৈব তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। এই সাহায্য করতে এগিয়ে এসে দৈব এখন আমাকে কত দূর নিয়ে যাবে সেটা বলা খুব মুশকিল। কিন্তু আমাকে নিয়ে যাবে অনেক দূর। আমার মনে যদি কোন সদিচ্ছা খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে, আমার খুব ইচ্ছে হয়েছে অমরনাথ দর্শন করব কিন্তু অমরনাথ যাত্রা খুব কঠিন যাত্রা। কিন্তু খুব সৎ ভাবনা দিয়ে শরীর মনের সব প্রস্তুতি নিলাম যে আমি যাবই, তখন দেখা যাবে অমরনাথ যাত্রার প্রস্তুতির সব কিছু কোথা দিয়ে নিজে থেকেই হয়ে গেল। কিন্তু যখন বলব আমি অনেকদিন কোথাও ঘুরতে যাইনি, যাই একটু অমরনাথ ঘুরে আসি। তখন কি হবে কিছুই বলা যাবে না। কারণ এটা পিকনিক করার মনোভাব হয়ে গেল আর অমরনাথ পিকনিক করার জায়গাও নয়। তখন কি হবে বলা খুব মুশকিল।

### কর্ণ আর অশ্বখামার বিবাদ

কর্ণ বলছে ‘আমি যে কার্য করার সঙ্কল্প করেছি এই কাজে দৈব আমাকে সাহায্য করবেই, সাত্যকি আর কৃষ্ণ অর্জুনকে যতই রক্ষা করতে এগিয়ে আসুক অর্জুনকে আমি শেষ করবই’। এইভাবে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি চলছে। কৃপাচার্য বলছেন ‘কর্ণ তুমি যতই বল, তুমি কিন্তু অর্জুনকে হারাতে পারবে না’। কর্ণ তখন বলছে ‘আপনি পাণ্ডবদের ব্যাপারে যা বলছেন সব ঠিকই বলছেন, কিন্তু আপনি দেখতে থাকুন। আমার কাছে এই যে শক্তি অস্ত্র আছে এর হাত থেকে

অর্জুন কোন ভাবেই নিস্তার পাবে না। অর্জুনকে আমি শেষ করেই ছাড়ব’। কর্ণ, দুর্যোধনরা সবাই মিলে তখনও দ্রোণাচার্যকে খুবই বিদ্রূপ করে যাচ্ছে, কারণ দ্রোণাচার্য তখন প্রধান সেনাপতি। যারাই যুদ্ধে হেরে যায় সবাই সেনাপতিকেই দোষ দেয়। ওখানে অশ্বখামাও উপস্থিত ছিল। অশ্বখামা দেখছে তার বাবা দ্রোণাচার্য আর মামা কৃপাচার্যকে কর্ণ নিন্দা করেই যাচ্ছে, সে আর সহ্য না করতে পেরে রেগে গিয়ে দুর্যোধনের সামনেই কর্ণের গলা কেটে দেবে বলে কর্ণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অশ্বখামা বলছে *যদর্জুনগুণাংস্তথ্যান্ কীর্তয়ানং নরাধম্। শূরং দ্বেষাৎ সুদুর্বুদ্ধে ত্বং ভর্ৎসয়সি মাতুলম্।।৭।১৩৯।৩।* ‘আমার মামা কৃপাচার্য অর্জুনের যে প্রশংসা করছেন সেটা কোন ভুল কথা তিনি বলছেন না কিন্তু তুমি একমাত্র দ্বেষবশতঃ হিংসায় জ্বলে গিয়ে এই ধরনের আচরণ করছ, *এষ তেহদ্য শিরঃ কায়াদুদ্ধরামি সুদূর্মতে।।৭।১৩৯।৯।* আমি এক্ষুণি তোর দেহ থেকে মাথাটা আলাদা করে দিচ্ছি’। দুর্যোধন ঝাঁপিয়ে পড়ে অশ্বখামাকে আটকাতে গেছে দেখে কর্ণ বলছে *শূরোহয়ং সমরশ্লাঘী দুর্মতিশ্চ দ্বিজাধমঃ। আসাদয়তু মদ্বীর্য্যং মুধৈঃনং কুরুসত্তম।।৭।১৩৯।১১।* ‘দুর্যোধন! তুমি এই ব্রাহ্মণের অধম অশ্বখামাকে ছেড়ে দাও, আমার শক্তিটা দেখুক। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধটা পরে দেখা যাবে তার আগে আমাকে অশ্বখামার সাথে লড়াই করে ফয়সালা করে নিতে দাও, তারপর আমি যুদ্ধে যাব’। মানুষ যতটা ক্ষমতা পাওয়ার কথা তার থেকে বেশী ক্ষমতা যদি পেয়ে যায় তখন সে ঔদ্ধত হয়ে যায়। ঔদ্ধত হয়ে গেলে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল এই ব্যাপারে আর কোন হুঁশ থাকে না। এমন পরিস্থিতি হয়ে গেছে যে কাউকেই সামলান যাচ্ছে না। দুর্যোধন ও আর কয়েকজন মিলে বহু কষ্টে দুজনকে ছাড়ালেন। মহাভারত যুদ্ধে এগুলো নিত্যদিনের সমস্যা ছিল। আজকাল ম্যানেজমেন্টের কোর্সগুলোতে যে পেপার দেওয়া হয় তাতে দুর্যোধন কেন হেরে গেল বলতে গিয়ে একটাই কারণ দেখান হয়েছে – কৌরবদের মধ্যে একতা ও সমন্বয়ের অভাব ছিল। সি রাজাগোপালাচারির একটা বক্তৃতা আছে তাতে তিনি বলছেন ‘মহাভারতে কথায় কথায় বলে ‘যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ’ অথচ মহাভারতে সব সময় অধর্মই হয়ে গেছে। তাহলে ধর্মটা কি? এখানে ধর্মটা হল পাণ্ডবদের মধ্যে যে একতা ছিল কৌরবদের মধ্যে সেই একতা ছিল না’। যার উদাহরণ আমরা এই কিছুক্ষণ আগে দেখলাম। কিন্তু পাণ্ডবদের মধ্যেও প্রচুর ঝগড়া বিবাদ হত, একটু পরেই আমরা দেখতে পাব। এখানে এই ঘটনাটা বলা হল এই জন্যই যেখানে এত বড় যুদ্ধ চলছে, যে যুদ্ধ এত লোকের প্রাণ সংশয়ের মধ্যে রয়েছে সেখানে দুই মহারথী বলছে অর্জুনকে পরে দেখা যাবে আগে আমরা দুজনে লড়াই করে আমাদের মধ্যকার বিবাদের ফয়সালা করে নিই। একতার অভাব হিন্দুদের মধ্যে আদিমকাল থেকেই চলে আসছে।

### ঘটোৎকচের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং ঘটোৎকচের উপর কর্ণের শক্তি অস্ত্রের প্রয়োগ

কর্ণ আর অশ্বখামার লড়াইকে কোন রকমে থামিয়ে দিয়ে আবার সবাই যুদ্ধে নেমে পড়েছে। এদিকে পাণ্ডবরা সেদিন ঘটোৎকচকে একটা বিরাট দায়িত্ব দিয়ে লড়াইতে নামিয়ে দিয়েছে। এই জায়গাতে ঘটোৎকচের যুদ্ধের অনেক রকমের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। ঘটোৎকচ অনেক রকম মায়া তৈরী করে যুদ্ধ করছে। কর্ণ তখন সেই মায়াকে ছেদ করে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। দুর্যোধনের পক্ষে অলায়ুধ নামে একজন রাক্ষস ছিল যে এই রকম মায়া যুদ্ধ করতে জানত, দুর্যোধন এখন তাকেও যুদ্ধে নামিয়ে দিয়েছে। ভীমসেন অলায়ুধের মধ্যে যুদ্ধ চলছে, অন্য দিকে ঘটোৎকচের সাথে কৌরবদের ভীষণ যুদ্ধ চলছে। সেদিনকার যুদ্ধ এক ভীষানাকার রূপ ধারণ করেছে। যুদ্ধ চলতে চলতে সন্ধ্যাও হয়ে গেছে কিন্তু কেউই যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা করছে না। পাণ্ডবরা ঘটোৎকচকে বলে দিল তুমি যুদ্ধ চালিয়ে যাও। যত রাত হতে থাকছে ঘটোৎকচের আসুরিক শক্তিও অনেক বেড়ে গেছে। সন্ধ্যার পর থেকে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আসুরিক শক্তিটা বাড়তে থাকে। সেইজন্য সন্ধ্যার পর একমাত্র কাজ হল জপধ্যান করা। আমাদের পরম্পরাতে বলা হয় সন্ধ্যা হয়ে গেল, জপ-ধ্যান করে নাও, তারপর অল্প একটু যা পাবে খেয়ে নিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়, নাহলে আসুরিক শক্তি তোমাকে ঘিরে ফেলবে। যদের মদের নেশা আছে তারা কেউ সকাল বেলা মদ খায়না কিন্তু রাত যত হতে শুরু করে এরা সবাই মদ খাওয়া শুরু করে দেবে, কারণ রাত যত হতে থাকে ততই তাদের মধ্যে আসুরিক শক্তিটা জাগতে থাকে। সূর্যাস্তের পর থেকে আসুরিক শক্তি বাড়তে থাকে এটা আমাদের খুব পুরনো মত। সাধুপুরুষরা বেশী রাত পর্যন্ত জাগবেন না, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বেন আর অন্ধকার থাকতেই উঠে পড়ে জপ-ধ্যানে বসে যাবেন। এখানে এখন সূর্যাস্তের পর যুদ্ধ চলছে আর ঘটোৎকচের উপর পুরো যুদ্ধের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যত রাত বাড়ছে ঘটোৎকচের শক্তিও বাড়তে শুরু করেছে কারণ সেতো রাক্ষস, তাই তার আসুরিক শক্তিটা প্রচণ্ড ভাবে জেগে গেছে। ঘটোৎকচের এই শক্তির সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারছে না। মনে হচ্ছিল আজকেই ঘটোৎকচ কৌরবদের একাই শেষ করে দেব। দুর্যোধন তখন দৌড়ে গিয়ে কর্ণকে বলছে ‘এক্ষুণি তোমার শক্তি অস্ত্র এই ঘটোৎকচের উপর চালিয়ে দাও’। কর্ণ বলছে ‘শক্তি অস্ত্র আমি এর উপর চালাব না, কারণ এই অস্ত্র অর্জুনের জন্য রাখা আছে আর অর্জুনের উপরেই এটা চালান হবে’। শ্রীকৃষ্ণও এদিকে কায়দা করে কর্ণের কাছাকাছি থেকে অর্জুনের রথটাকে অন্য দিকে

নিয়ে গেছেন। কর্ণ দুর্যোধনকে যখন বোঝাচ্ছে যে এই অস্ত্র অর্জুনের জন্য তোলা আছে তখন দুর্যোধন বলছে ‘ঘটোৎকচ যদি আজকেই আমাদের শেষ করে দেয় তখন আর এই অস্ত্র রেখে তোমার আর কি লাভ হবে। তুমি বেঁচে থাকলেই তো অর্জুনকে মারতে পারবে, যদি ঘটোৎকচের হাতেই মরে যাও তাহলে আর অর্জুনকে মারার তো কোন সুযোগই পাবেনা’। ঘটোৎকচ এমন মায়ার সৃষ্টি করে দিয়েছে যে দুর্যোধনের সব সৈন্যরা রণভূমি থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি কর্ণ যে মায়াগুলো সৃষ্টি করছে সেগুলোও কোন কাজে আসছে, সব মায়া নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কর্ণ অনেকক্ষণ খুব চিন্তা ভাবনা করলেন। এখানে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে খুব সুন্দর করে বর্ণনা করছেন *যসৌ রাজন্ নিহিতা বর্ষপুগান্ বধায়াজৌ সৎকৃতা ফাল্পুনস্য। যাং বৈ প্রাদাৎ সূতপুত্রায় শক্রঃ শক্তিং শ্রেষ্ঠাং কুণ্ডলাভ্যাং নিনায়।।৭/১৫৪/৫৩।* ‘হে রাজা! অর্জুনকে বধ করার জন্য যে অস্ত্রকে কর্ণ এতদিন খুব সামলে রেখেছিল, যে অস্ত্রকে লাভ করার জন্য কর্ণ তার কবচ আর কুণ্ডল দান করে দিয়েছিল, এই মুহূর্তে তার সব কিছু মনে পড়তে লাগল’। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই। এইটাই ভগবানের মায়া। আমি ঠিক করেছি এই কাজটা করব, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছে নয় যে আমি এই কাজটা করি। তখন তিনি এমন একটা পরিস্থিতি তৈরী করে দেন তাতে আমার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঐ কাজটা আর কিছুতেই করতে সক্ষম হওয়া যায় না।

কর্ণ যখন শক্তি অস্ত্রটাকে বার করেছে তখন তিনটে লোকই তটস্থ হয়ে গেছে। অস্ত্রটা দেখে মনে হচ্ছে *তাং বৈ শক্তিং লেলিহানাং প্রদীপ্ত্যাং পাশৈর্যুক্তামন্তকস্যেব জিহ্বাম্। মৃত্যোঃ স্বসারং জ্বলিতামিবোদ্ধাং বৈকর্তনঃ প্রাহিণদ্রাক্ষসায়।।৭/১৫৪/৫৪।* জগতের সব কিছুকে লেহন করে নেবার জন্যই যেন বেরিয়ে এসেছে, যমরাজের জিহ্বার মত সব কিছু চেটে নিতে উদ্যত। মৃত্যুর জিহ্বা যাকে একবার ছুঁয়ে নেয় সে শেষ হয়ে গেল। একদিকে বলা হচ্ছে যেন যমরাজের জিহ্বা আবার বলছে এ যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর নিজের মন, জ্বলন্ত উষ্কার মত দীপ্যমান। শেষ পর্যন্ত কর্ণ শক্তি অস্ত্রকে মন্ত্রপূতঃ করে চালিয়ে দিয়েছে। ঘটোৎকচের উপর চালিয়ে দিতেই বুঝে গেছে যে এই অস্ত্র থেকে আমার নিস্তার নেই। তখন ঘটোৎকচ নিজের শরীরকে বড় করতে থাকল, বাড়তে বাড়তে বিশাল শরীর হয়ে গেছে। বলছে শক্তি অস্ত্র ঘটোৎকচের উপর আঘাত হতেই তার সেই বিশাল শরীর মাটিতে পড়ে গেল আর তার ঐ বিশাল শরীরের চাপেই কৌরবদের বিশাল সৈন্য বাহিনী মারা পড়ে গেল। এখানে আবার পৌরানিক উপাদান এসে গেছে। মূল কথা হল কর্ণের এতদিনের অর্জুনের জন্য রক্ষিত অস্ত্র তার হাত থেকে বেরিয়ে গেল। এর মূল তাৎপর্যটা কি বোঝা যায় না। তবে এই ধরণের কাহিনী পড়লে মনে হয় আমরা কেউই স্বাধীন নই, কোথায় কোন এক অদৃশ্য শক্তি আমাদের কেউ যেন কলের দড়ির মত নাচিয়ে যাচ্ছে, আমাদের কখন এদিকে নিয়ে যাচ্ছে কখন সেদিকে নিয়ে যাচ্ছে, ইচ্ছে করলেও কিছু করতে পারিনা। কর্ণের হাতে এত বড় শক্তি থাকতেও তার হাত থেকে সেটাকে বার করিয়ে দিলেন।

#### ঘটোৎকচের মৃত্যুতে শ্রীকৃষ্ণের স্বস্তির কারণের ব্যাখ্যা

ঘটোৎকচ মারা যেতেই এক দিকে দেখা যাচ্ছে যুধিষ্ঠির ভীম খুব কান্নাকাটি করছেন আর অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণ খুব আনন্দ করছেন, তিনি যেন খুব খুশী। শুধু তাই নয় *স বিনদ্য মহানাদমভীষুন্ সংনিয়ম্য চ। ননর্ত হর্ষসংবীতো বাতোদ্ধৃত ইব ক্রমঃ।।৭/১৫৫/৩।* আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে সিংহনাদ করতে থাকলেন আর অশ্রুজঙ্কুকে সংযমিত করে বায়ু সঞ্চালিত বৃক্ষের ন্যায় তিনি নৃত্য করতে লাগলেন। পাণ্ডবদের এই দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের খুশীর মেজাজ দেখে অর্জুনের খুব খারাপ লাগছে, অর্জুন বলছেন *অতিহর্ষোহয়মস্থানে তবাদ্য মধুসূদন। শোকস্থানে তু সংপ্রাপ্তে হৈড়মস্য বধেন বৈ।।৭/১৫৫/৬।* একি বাসুদেব! আমাদের এত বড় একজন যোদ্ধা মারা গেল, আর ঘটোৎকচ হল ভীমসেনের পুত্র আর আপনি তার মৃত্যুতে আনন্দ করছেন! শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ‘দেখো অর্জুন! এইটাই সত্যিকারের বিরাট আনন্দ করার সময়। এই ঘটনাতে আনন্দের দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ কর্ণের হাত থেকে শক্তি অস্ত্র ঘটোৎকচের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল এতে তোমার প্রাণ রক্ষা হয়ে গেল, এই অস্ত্র কর্ণের হাতে যদি থাকত তাহলে তোমার প্রাণ কোন ভাবেই রক্ষা হত না। আর দ্বিতীয় কথা জেনে রাখ *যদা প্রভৃতি কর্ণায় শক্তির্দত্তা মহাত্মনা বাসবেন মহাবাহো প্রাপ্তা যাসৌ ঘটোৎকচম্।। কুণ্ডলাভ্যাং নিনায়াথ দিব্যেন কবচেন চ তাং প্রাপ্যামন্যত বৃষঃ সততং ত্বাং হতং রণে।।৭/১৫৫/২১-২২।* কর্ণের শরীরের যদি কবচ আর কুণ্ডল এই দুটোও যদি থাকত তাহলে আমি আর তুমি মিলিয়েও কর্ণের সাথে যুদ্ধে জিততে পারতাম না। শক্তি অস্ত্র চলে যাওয়ার পরও কর্ণের এখনও যা ক্ষমতা আছে তাতে তুমি ছাড়া কর্ণকে কেউ কিছু করতে পারবে না। তার কারণ এমনিই কর্ণের মধ্যে যা ক্ষমতা ও শক্তি আছে তার উপর *ব্রহ্মণ্যঃ*

সত্যবাদী চ তপস্বী নিয়তব্রতঃ। রিপুয়পি দয়াবাংশ্চ তস্যাঃ কর্ণো বৃষঃ সূতঃ।।৭/১৫৫/২৪। সে ব্রাহ্মণদের সেবা করে, সত্যবাদী, তপস্যা করে, সর্বদা ব্রত পালন করে আর শত্রুর উপরেও সে দয়া করে। এই কারণে সবাই তাকে বৃষ বলে। যার এত গুণ আছে তাকে কেউ হারাতে পারবে না’। মানুষের শক্তি দুই রকমের, আসুরিক শক্তি আর দৈবী শক্তি। আসুরিক শক্তি নিজের প্রাণশক্তির উপর আধারিত, সেটাও বিরাট শক্তি এতে কোন সন্দেহই নেই কিন্তু এই আসুরিক শক্তিও দৈবী শক্তির সামনে দমে যায়। যদি কারুর মধ্যে বিরাট আসুরিক শক্তি থাকে আর সেই শক্তিকে যদি দৈবী শক্তির সাথে মিলিয়ে দেয় তখন তাকে পরাস্ত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। অর্জুনের মধ্যেও বিরাট আসুরিক শক্তি বিরাজমান, তার সঙ্গে সে দিব্য গুণেরও অনুশীলন করে যাচ্ছে। কি রকম দৈবী গুণের অনুশীলন করছে? অর্জুন সৎ, মিথ্যা কথা বলে না, তপস্যা করে যাচ্ছে। এখন সাংঘাতিক আসুরিক শক্তি যেটা আছে তার সঙ্গে দৈবী গুণগুলো এসে মিশে গেছে। জিলিপিকে কড়কড়ে ভাজার পর চিনির রসে ফেলে দেওয়া হয়, অর্জুনের শক্তিটা এই জিলিপির মত। আমাদের মধ্যে শুধু জিলিপির মশলা, না ভাজা হয়েছে, না রসে চোবানো হয়েছে। যাদের আসুরিক শক্তি তাদের শুধু তেলে ভাজাই হয়েছে, রসে চোবান হয়নি। অর্জুনের দুটোই হয়েছে, ভাজা যেমন হয়েছে তেমনি রসেও চোবান হয়েছে। আমাদের মধ্যে কোনটাই নেই।

শ্রীকৃষ্ণ বলছে ‘অর্জুন! তোমাকে আরেকটা ভেতরের কথা বলি। এই ঘটোৎকচ হল রাক্ষস বংশের, আমার জন্মই হয়েছে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য। জরাসন্ধ, শিশুপাল আর একলব্য এই তিনজন যদি এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে যেত তাহলে জগতের বিরাট বিনাশ হয়ে যেত। এরা সবাই আসুরিক ভাবাপন্ন, এদের মধ্যে দৈবী ভাবটা খুবই কম। সূতপুত্রো জরাসন্ধশ্চৈদিরাজো নিষাদজঃ। সুযোধনং সমাশ্রিত্য তপেয়ুঃ পৃথিবীমিমাম্।।৭/১৫৫/৩৭। কর্ণ, জরাসন্ধ, শিশুপাল আর একলব্য এই চারজোন যদি একত্রিত হয়ে দুর্যোধনের পাশে দাঁড়াত তাহলে দুর্যোধনকে হারান খুব কঠিন হয়ে যেত। এই চারজোনকে আশ্রয় করে দুর্যোধন সমগ্র পৃথিবীটাকে সন্তুষ্ট করত। সেইজন্য আগে থাকতেই আমি এক এক করে তিনজনকে মারিয়ে দিয়েছি। হিড়িম্ব, বক ও কিরমির এরা এই যুগের সব থেকে নামকরা অসুর। এরা সবাই যজ্ঞ বিধ্বংসকারী অসুর, ব্রাহ্মণদের এরা শত্রু। আমিই নানা কায়দা করে এদের সব কটাকে মারিয়ে দিয়েছি। এদেরই রক্ত ঘটোৎকচের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু এই ঘটোৎকচ আমাদের দলের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল বলে একে মারা খুব মুশকিল ছিল। আগের তিনটে রাক্ষসকে কায়দা করে ভীমকে দিয়ে মারিয়েছি আর আজ কর্ণকে দিয়ে ঘটোৎকচকে বধ করিয়ে দিলাম। এখন আমি নিশ্চিত, অনেক শান্তি পাচ্ছি। যে কটি আসুরিক শক্তি সম্পন্ন ছিল আর যাদের থেকে তোমার বিপদ হতে পারে তাদের সব কটিকেই শেষ করে দেওয়া হয়েছে, এখন শুধু থেকে গেছে কর্ণ। ঘটোৎকচ ভীমের পুত্র হলেও তার মা ছিল রাক্ষসী, তাই ঘটোৎকচের মধ্যে আসুরিক শক্তির প্রভাব বেশী ছিল। রাক্ষসী শক্তি যেদিকেই থাকুক, তোমাদের দিকেই থাকুক বা অপরের দিকেই থাকুক, রাক্ষসী শক্তি যে কোন সময় জগতের প্রচুর ক্ষতি করে দিতে পারে। সেইজন্য আমি কায়দা করে একে মারিয়ে দিয়েছি’। এরপর শ্রীকৃষ্ণ যেটা বলছেন মহাভারতে এই প্রথম শ্রীকৃষ্ণের জন্ম নেওয়ার কারণ আর শ্রীকৃষ্ণ যে নিজের অবতারত্বকে স্বীকার করেছেন সেটা তিনি নিজের মুখে বলছেন যে *হি ধর্মস্য লোপ্তারো বধ্যাস্তে মম পাণ্ডব। ধর্মসংস্থাপনার্থং হি প্রতিজ্ঞেয়া মমাব্যয়া।।৭/১৫৫/৫৯।* ‘দেখো অর্জুন! এই জগতে ধর্ম সংস্থাপনের জন্যই আমার আগমন, যারাই ধর্মের বিরোধিতা করে তারাই আমার বধ্য। আর আমি কোথায় কোথায় সুখ পূর্বক বাস করি তোমাকে বলছি ব্রহ্ম সত্যং দমঃ শৌচং ধর্মো হ্রীঃ শ্রীর্ধৃতিঃ ক্ষমা। যত্র তত্র রমে নিত্যমহং সত্যেন তে শপে।।৭/১৫৫/৬০। যেখানে বেদ পাঠ ও অধ্যয়ন হয়, যে সত্য কথা বলে আমি তার মধ্যে বাস করি, যার মধ্যে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ আছে, যার শৌচ আছে, যেখানে ধর্ম অবস্থিত থাকে, লজ্জা, শ্রী, ধৃতি আর ক্ষমার ভাব যেখানে থাকে সেখানেই আমি বাস করি’। এখানে লজ্জা বলতে হ্রীকে বোঝাচ্ছে, মানে চক্ষুলজ্জা, আজকালকার মেয়েরা যেমন অশালীন পোষাক পড়ে ঘুরে বেড়ায়, মানে তাদের হ্রীটা চলে গেছে, ছেলেরাও ঔদ্ধত হয়ে গেছে, কার সামনে কিভাবে কথা বলতে হয়, কি আচরণ করতে হয়ে সব হারিয়ে গেছে। পুরো সমাজ যে আসুরিক ভাবাপন্ন হয়ে যাচ্ছে এগুলো তার লক্ষণ। তারপর বলছেন শ্রী, বলা হয় হ্রী, শ্রী আর ধৃতি এই তিনটে একসাথে চলে। শ্রী সম্পন্ন মানে যেখানে দেখলেই মনে হয় এখানে যেন লক্ষ্মী বিরাজিতা, সন্তোষ হলে আলো জ্বালানো হল, ধূপ দীপ দেওয়া হল, ঘরদোর খুব ফিটফাট এগুলো হল শ্রীর লক্ষণ। শ্রী মানেই লক্ষ্মী, লক্ষ্মী কোথায় থাকেন? আলো বাতাস আছে, ধূপ দীপ নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে, ঘরদোর খুব পরিষ্কার, হয়তো দারিদ্র আছে কিন্তু দারিদ্রতার মধ্যেও একটা শ্রীর ভাব আছে। যার মধ্যে ধৃতি আছে সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন, ধৃতি হল লেগে থাকার ক্ষমতা। আর শেষে বলছেন যার মধ্যে ক্ষমার ভাব আছে আমি তার মধ্যে বাস করি। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন আমি এই জায়গাগুলোতে বাস করি। জরাসন্ধাদি যাদের নাম করা হল এদের মধ্যে এই গুণগুলো নেই, এদের মধ্যে ঈশ্বর বাস করেন না, তাই এদেরকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে।

### পূর্বেই অর্জুনের প্রতি কর্ণের শক্তি অস্ত্রের প্রয়োগ না করার কারণ

ধৃতরাষ্ট্র তখন সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করছেন একবীরবধে মোঘা শক্তিঃ সূতাত্বজে যদা। কস্মাৎ সর্বান্ সমুৎসৃজ্য স তাং পার্থে ন মুক্তবান্। ১৭/১৫৬/১। ‘আচ্ছা সঞ্জয়, এই যে কর্ণ ঘটোৎকচের উপর শক্তি অস্ত্র প্রয়োগ করল, কিন্তু এরা আগে আগেও তো কর্ণের সাথে অর্জুনের লড়াই হয়েছে। জয়দ্রথকে বধ করার সময়ই তো কর্ণ অর্জুনের মুখোমুখি হয়েছিল কিন্তু তুমি বলছ অর্জুন কর্ণকে খুব পিটিয়ে দিয়েছিল। প্রথম সাক্ষাতেই কর্ণ কেন অর্জুনের উপর এই শক্তি অস্ত্রকে চালিয়ে দেয়নি?’ সঞ্জয় তখন বলছে ‘এর আগে যখনই কর্ণ অর্জুনের মুখোমুখি হত তখনই কর্ণ ঠিক করে নিত আজকেই এই শক্তিটা অর্জুনের উপর চালিয়ে দেব কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হওয়াতে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে দেখেই কর্ণকে একটা প্রমাদ এসে ছেয়ে ফেলত। এই প্রমাদের জন্য আমি অর্জুনের উপর এই শক্তিটা চালাব এই ইচ্ছা শক্তিটা কর্ণের মন থেকে চলে যেত। অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণও কায়দা করে অর্জুনের রথটাকে কিছুতেই কর্ণের মুখোমুখি নিয়ে যেতেন না। সব সময়ই এড়িয়ে এড়িয়ে যেতেন আর অল্প কিছুক্ষণের জন্য যদিও বা মুখোমুখি হতেন কিন্তু কর্ণের মধ্যে কেমন একটা বিস্মৃতি চলে আসত। সেইজন্য সব সময় অন্যান্য বড় বড় মহারথীদের কায়দা করে কর্ণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ঠেলে দিতেন যাতে কোন রকমে কর্ণের এই শক্তি অস্ত্রটা বেরিয়ে যায়’।

### দ্রোণাচার্যের অস্ত্র ত্যাগ

এদিকে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে এতে গালাগালি দিয়েছে যে দ্রোণাচার্য রেগেমেগে প্রতিজ্ঞা করে বসলেন ঠিক আছে কাল থেকেই আমি পাণ্ডবদের সব সৈন্য পরীক্ষার করতে শুরু করে দেব। পরের দিন দ্রোণাচার্য ঠিক সেই ভাবেই যুদ্ধ করতে নেমে গেলেন। এমন দুর্ধর্ষ যুদ্ধ করতে শুরু করে দিলেন যে পাণ্ডবের কোন সৈন্য তাঁর সামনে দাঁড়াতেই পারছে না। শ্রীকৃষ্ণ সব দেখে বললেন ‘দ্রোণাচার্যকে বধ না করলে আজকেই যুদ্ধ শেষ। যেভাবেই হোক দ্রোণাচার্যকে বধ করতে হবে। আর তাকে বধ করবার একটাই উপায়। দ্রোণাচার্যের অশ্বখামার উপর প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে, উনি যা কিছু করেছেন সবই নিজের পুত্রের জন্যই করেছেন। অশ্বখামি হতে নৈষ যুধ্যোদিতি মতির্মম। তং হতং সংযুগে কশ্চিদস্মৈ শংসতু মানবঃ। ১৭/১৬৩/১২। এখন যদি কোন ভাবে রাষ্ট্র করে দেওয়া যায় যে অশ্বখামা হত হয়েছে দ্রোণাচার্য সেই খবর পেয়ে গেলে উনি আর যুদ্ধ করবেন না’। ভীমসেনকেও এই ব্যাপারটা জানান হল। ভীমসেন সব শুনে নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা হাতির মাথায় গদা মেরে হাতিটাকে মেরে দিয়েছে। হাতিটার আবার নাম ছিল অশ্বখামা। অশ্বখামা নামের হাতিকে মেরে দিয়ে ভীমসেন একটু লজ্জিত ভাবে দ্রোণাচার্যকে গিয়ে খুব সুন্দর করে বলছেন ভীমসেনস্ত সত্ৰীড়মুপেতা দ্রোণমাহবে। অশ্বখামা হত ইতি শব্দমুচ্চৈশ্চকার হ। ১৭/১৬৩/১৪। ভীমসেন দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে খুব জোরে জোরে বলছে কিন্তু বলতে লজ্জাও পাচ্ছে, নিজের গুরু কিনা তাই অশ্বখামা মারা গেছে এই মিথ্যা কথা বলতেও লজ্জা হচ্ছে। দ্রোণাচার্য শুনলেন, শুনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলো তার শিথিল হয়ে গেলেও কিন্তু মনে প্রাণে পুরোপুরি বিশ্বাসও করতে পারছেন না। ইতিমধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নও এসে দ্রোণাচার্যের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করেছে। আর ঐ সময় অনেক দিব্য ঋষি, মহর্ষিরা এসে দ্রোণাচার্যকে বলছেন ‘দ্রোণ, তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে এসব কি শুরু করেছ, তোমার অস্ত্রবিদ্যা আছে সেটা না হয় ঠিক আছে, কিন্তু সেই অস্ত্রবিদ্যার সাহায্যে ব্রাহ্মণ হয়ে এত লোকের প্রাণ সংহার করে চলেছ এতে ব্রাহ্মণ হয়ে তোমার লজ্জা করছে না! তুমি ব্রাহ্মণ বংশে জাত, তোমার ধর্মনীতি ব্রাহ্মণের রক্ত প্রবাহিত। অনেক হয়েছে এই ধরণের ক্রুর কর্ম এবার বন্ধ কর। সমস্ত অস্ত্র ত্যাগ করে এবার তুমি তোমার সনাতন মার্গে অবস্থিত হও। ব্রাহ্মণ হয়ে তুমি একটার পর একটা পাপকর্ম করে চলেছ। ব্রহ্মাস্ত্রেণ ত্বয়া দক্ষা অনস্ত্রজ্ঞা নরা যুধি। যদেতদীদৃশং বিপ্র কৃতং কর্ম ন সাধু তৎ। ১৭/১৬৪/৩০। যারা তোমার সমানে সমানে ছিল না তাদের উপর তুমি ব্রহ্মাস্ত্র চালিয়েছ, তোমারই শিষ্যের সন্তানকে তুমি অন্যায় ভাবে বধ করেছ’। ঋষিদের এই ধরণের কথা শোনার পর দ্রোণাচার্যে শক্তিটা আরও দমে গেল। একদিকে ভীমসেন এসে অশ্বখামার মৃত্যু সংবাদ দিয়েছে অন্য দিকে ঋষিরা এসে তাঁকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তাও তিনি যুদ্ধ থেকে পুরোপুরি নিবৃত্ত হতে পারছেন না, এখনও তিনি লড়াই করে যাচ্ছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন ‘হে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব! আপনি দ্রোণাচার্যকে গিয়ে অশ্বখামার হত হওয়ার খবর না দিলে উনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারবেন না। আপনাকে আরও বলি, আর অর্ধ দিবসও যদি দ্রোণাচার্য এইভাবে যুদ্ধ করেন তাহলে আমাদের কাহিনী আজকেই শেষ, আমাদের কাউকেই বাঁচান যাবে না’। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন স ভবাংস্ত্রাতু নো দ্রোণাং সত্যাজ্ঞ্যায়োহনতং ভবেৎ। অন্তং জীবিতস্যার্থে বদন ন স্পৃশ্যতেহনতৈঃ। ১৭/১৬৪/৩৮। এই সংস্কৃত শ্লোকটা একটু কঠিন। আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি কোন কোন পরিস্থিতিতে মিথ্যা কথা বলা যায়, মনুস্মৃতিতেও এই ব্যাপারে খুব পরীক্ষার করে বলা হয়েছে

আর এখানে শ্রীকৃষ্ণও বলছেন *অন্যতঃ জীবিতস্যার্থং*, নিজের জীবন বাঁচানোর সময় যদি মিথ্যা কথা বলা হয় তাহলে ঐ মিথ্যা কথা বলার জন্য তার পাপ লাগে না। এগুলো খুব বিতর্কের বিষয়। অন্য জায়গায় বলা হয়, না তারও পাপ লাগে। তবে পরে অন্য পূণ্যকর্ম দিয়ে এই পাপটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। আমাদের কর্মবাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল, আমি যে কর্মই করিনা কেন তার একটা ফল হবেই। তাই যখন আমি একটা মিথ্যা কথা বললাম তার একটা পাপ আমার লাগবে। কিন্তু মিথ্যে কথা বলতে আমার যে জীবনটা বেঁচে গেল তারপর আমি বেঁচে থেকে অনেক পূণ্যকর্ম করে ঐ পাপটাকে কাটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু ভগবান এখানে পরিস্কার বলে দিচ্ছেন *অন্যতঃ জীবিতস্যার্থং*, জীবন বাঁচানোর জন্য যদি আমি মিথ্যে কথা বলি তাহলে ঐ মিথ্যা কথা বলার জন্য যে পাপ হবে সেই পাপ আমাকে স্পর্শ করবে না।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বলে দিলেও যুধিষ্ঠির এই মিথ্যা কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না। মহাভারত এখানে একটা খুব কড়া কথা বলছে। যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যের দিকে এগোতে শুরু করেছেন, এখন তিনি একদিকে অসত্য ভাষণ করতে যাচ্ছে এই ভয়ে শঙ্কিত হয়ে আছেন, কারণ দ্রোণদীর বিয়ের সময় তিনি বলেছিলেন আমার মুখ দিয়ে কখন অসত্য ভাষণ বেরোয়নি, অন্য দিকে মহাভারত বলছে যুধিষ্ঠিরের মনে খুব আসক্তি ছিল কিভাবে রাজ্যটা ফেরত পাওয়া যাবে। সব কিছু মিলিয়ে যুধিষ্ঠির বলছেন, এখানে শ্লোকটি এই রকম – *অশ্বখামা হত ইতি শব্দমুচ্চৈশ্চকার হ। অব্যক্তমব্রবীদ্রাজন্ হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত।।৭/১৬৪/৪৫।* অশ্বখামা মারা গেছে তবে মানুষ না হাতি এটা পরিস্কার নয়। যুধিষ্ঠিরের মুখ থেকে যেই ‘মানুষ’ এই কথা বেরিয়েছে ততক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ আর অন্যান্যরা এমন জোর শঙ্খধ্বনি করে দিলেন পরে যুধিষ্ঠির যে কুঞ্জর বললেন সেটা আর শোনাই গেল না। এখানে মহাভারত আবার যোগ করে বলছে *তস্য পূর্বং রথঃ পৃথাস্তুরঙ্গলমুচ্ছিতনঃ। বভূবৈবস্তু তেনোক্তে তস্য বাহস্পর্শন মহীম্।।৭/১৬৪/৪৬।* এতদিন যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা জমি থেকে চার আঙুল উপর দিয়ে চলত, আর রথের ঘোড়াও মাটির চার আঙুল উপর দিয়ে যেত কিন্তু সেই দিন থেকে তাঁর রথের চাকা মাটিতে চলতে শুরু হয়ে গেল ঘোড়াগুলোও মাটি স্পর্শ করে চলতে থাকল।

### সত্য ভাষণ ও মিথ্যা ভাষণের দ্বন্দের বিশ্লেষণ

এই যে বলা হল যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা মাটি থেকে চার আঙুল উপর দিয়ে যেত, এটা কি আদৌ কখন সম্ভবপর। যারা পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছে তারা বলবে চাকার ঘর্ষণ যদি নাই হয় তাহলে চাকা ঘুরবে কি করে, মাটি সেই ঘর্ষণটা চাকাকে দিচ্ছে, তাহলে চাকা যদি মাটিতে না থাকে তাহলে চাকা ঘুরবে কি করে! পৌরানিক কাহিনীতে এই প্রশ্ন করা চলে না, কারণ পৌরানিক কাহিনী একটা সত্যকে বোঝানোর জন্য এমন অনেক কিছুকে নিয়ে আসে, যেগুলো আমাদের কাছে অবাস্তব বা অবাস্তব মনে হতে পারে। এখানে কি বোঝান হচ্ছে? যুধিষ্ঠির ছিলেন সত্যবাদী, তিনিও যখন মিথ্যে কথা বলেছেন তখন যে কোন কারণেই হোক তাঁর ধর্মের রথ সেটাও নীচু হয়ে গেল। এখানেও মিথ্যা কথা বলার পর বিপরীত প্রতিক্রিয়া এসে যাচ্ছে। প্রথমে বলা হল নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য যদি মিথ্যে কথা বলা হয় তাহলে সেই মিথ্যে কথা বলার জন্য যে পাপ হবে সেই পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না। এই কথা কে বলছেন? স্বয়ং ভগবান বলছেন আর ভগবান নিজে যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যে কথা বলতে আদেশ করছেন। বেচারি যুধিষ্ঠির সেই মিথ্যে কথাটাই বললেন। তারপরেই কি হল? যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা মাটিতে নেমে চলতে শুরু করল। এরপর আমরা ধর্মের কি ব্যাখ্যা করব? যুধিষ্ঠির ঠিক না ভুল করেছেন? এইটাই মহাভারতের সৌন্দর্য, মহাভারত কখনই বিচারকের ভূমিকায় গিয়ে বলে দেবে না এটা ঠিক এটা ভুল। উপনিষদ পরিস্কার বলে দিচ্ছে *সত্যং বদ ধর্মং চর*, সত্য কথা বলবে ধর্মে আচরণ করবে। মহাভারত এর কোনটাই বলছে না, মহাভারত বলছে অনেকের বা নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য যদি মিথ্যে কথা বলতে হয় মিথ্যে কথাই বল। এই কথা বলার পরেই দেখিয়ে দিল এত দিন যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা মাটি থেকে চার আঙুল উপর দিয়ে চলত, মিথ্যে কথা বলতেই তাঁর রথ মাটি দিয়ে চলতে শুরু করে দিল। উপনিষদের কথাকেও অগ্রাহ্য করা হল না, দেখিয়ে দিল ধর্মের আচরণ না করলে তোমার পতন হবে অন্য দিকে বাস্তব জীবন চালাতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে সেটাকেও দেখিয়ে দিল। এইজন্যই মহাভারত হল পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র, সেইজন্যই আমাদের সবাইকে জীবনে অন্তত একবার পুরো মহাভারত পড়া উচিত, মহাভারত না পড়লে পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র কাকে বলে আর আমাদের জীবনদর্শন কিভাবে চলে ঠিক ঠিক বোঝা যায় না। মহাভারতের এই অংশটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এখানে মহাভারত যে রকম বর্ণনা করেছে আমাদের বাস্তব জীবন আসলে এইভাবেই চলে। কোন সন্ন্যাসী যদি বলে আমাদের দিনে দশটি মিথ্যে কথা বলতে হয়, এখন দেখতে হবে তিনি মিথ্যে কথা কেন বলছেন, সন্ন্যাসীকে যদি মিথ্যে কথা বলতে হয় সেটা তিনি কখনই নিজের স্বার্থের জন্য বলছেন না, অপরের মঙ্গলের জন্যই তাঁকে বলতে হচ্ছে। কিন্তু অপরের মঙ্গলের জন্য মিথ্যে কথা বললেও এই মিথ্যের পাপটা তার লাগছে কিন্তু এর জন্য যে ভালোটা করছেন তার

পূণ্যটাও আসছে। জীবন এইভাবেই চলে। এখানে পাপ-পুণ্যের কাটাকাটি হবে না। শ্রীমা বলছেন যেখানে ফাল লাগার কথা সেখানে ছুঁচ ফুটবে। পাপ যেটা হবে সেটা আমাদের ভোগ করতেই হবে পুণ্য দিয়ে সেটাকে কাটান যাবে না। এগুলোকে যুক্তিতক্কো দিয়ে বোঝা যায় না। এখন যদি কেউ বলে কর্মফল বলে আদৌ কি কিছু আছে, পুনর্জন্ম, মুক্তি এগুলো আপনি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারবেন? আচার্য শঙ্কর তাই বলছেন আমাদের যত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে এর কিছুই মানুষ যুক্তিতক্কো দিয়ে বুঝতে পারবে না। কিন্তু শাস্ত্র বলেছে বলে আমাদের মনে নিতে হয়। পুনর্জন্মের কথা, ধর্মের কথা, কর্মফলের কথা, মুক্তির কথা এগুলো শাস্ত্রে বলেছে বলে আমাদের মানতে হয়। আচার্য শঙ্করের মত মহাপুরুষ তাঁর ভাষ্যাদিতে গীতা উপনিষদের তত্ত্বগুলিকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে গেছেন, কোথাও যুক্তির কোন ডানদিক বামদিক হতে দেননি, তিনিও বলছেন শাস্ত্রে বলেছে বলে আমাদের মনে নিতে হয়, এছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। আমি যদি আচার্যের কাছে গিয়ে বলি আপনি আমাকে যুক্তি দিয়ে বোঝান পুনর্জন্ম বলে কিছু আছে কিনা? আমাকে বোঝাতে তাঁর ভারি বয়ে গেছে! কেউ বোঝাতে যাবে না। তাই বলে কি আচার্য পুনর্জন্মবাদকে ফেলে দিতে বলছেন? না, ফেলে দেওয়া যাবে না। কেন ফেলে দেওয়া যাবে না? কারণ শাস্ত্র বলেছে পুনর্জন্ম আছে। আমি যদি বলি আমি শাস্ত্র মানিনা। আচার্য বলবেন তোমাকে শাস্ত্র মানতে হবে না, তুমি তোমার নিজের মত থাক, কেউ বারণ করছে না। কিন্তু যখন তুমি সংসারের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরবে, চারিদিক থেকে মার খেতে থাকবে, তখন কষ্টের জ্বালায় শেষ হয়ে তুমি যখন আমার কাছে এসে বলবে আমাকে পথ দেখান, আমি আর পারছি না। তখন আমি তোমাকে বলবে পথ হল এই। এই পথে চলতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? এই পথে চলতে গেলে তোমাকে কর্মফল মানতে হবে, পুনর্জন্ম মানতে হবে, স্বর্গ নরক সব কিছু মানতে হবে। যুক্তি দিয়ে দেখতে গিয়ে তুমি তো দেখলে জীবনটা কি রকম। তুমি যে ধর্মই অবলম্বন কর না কেন, তুমি যদি বল আমি খ্রীষ্টান ধর্মে সাধনা করতে চাই তাহলে খ্রীষ্টান ধর্মে যেমনটি বলা আছে, বাইবেলে যা বলা আছে তার প্রত্যেকটি কথা তোমাকে মানতে হবে। ঠিক সেই রকম আমি যদি বলি আমি ইসলাম ধর্মে সাধনা করব তাহলে যা কিছু কোরানে বলা আছে তার সব কথা আমাকে মানতে হবে। যদি আমি হিন্দুধর্ম মতে সাধনা করতে চাই তাহলে বেদ, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, পুরানে যা কিছু বলা আছে তার সবটাই মানতে হবে।

যিনি সত্যের সাধনে দৃঢ়, জগৎ পুড়ে যাক তবুও যিনি তাঁর সত্যকে ছাড়বেন না বলছেন, সেখানেও কিন্তু জগৎ যে পুড়ছে তার পাপটাও তাঁর লাগবে। অন্য দিকে আমার মিথ্যে কথা বলার জন্য জগৎ যদি ভস্ম হওয়া থেকে রক্ষা পায় তাহলে মিথ্যে কথা বলার পাপটা আমার লাগবে আর জগৎ রক্ষা পাওয়ার পূণ্যটাও আমার আসবে। আমার এখন কি সাধনা সেটা আমাকে দেখতে হবে। যদি বলি আমি ঠাকুরের পথের পথিক, ঠাকুর বলেছেন সত্য কথা কলির তপস্যা, আমি সত্য কথা থেকে কখনই সরে আসব না। খুব ভালো কথা, কিন্তু আমার সত্য কথার জন্য যদি কারুর বাড়িতে আগুন লাগে তার পাপটাও আমাকে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। শ্রীমাও মিথ্যে কথা বলে ঠাকুরকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। কোন ভক্ত প্রশ্ন করাতো শ্রীমা বলছেন রুগীকে, বাচ্চাকে যদি মিথ্যে কথা বলে খাওয়াতে হয় তাতে পাপ লাগে না। অপরের ভালোর জন্য মিথ্যে কথা বলার পর মনের মধ্যে যদি খুঁত খুঁত না করে তাহলে পাপ লাগবে না। এখানেও কাটাকাটির কথা আসছে না, কাটাকাটির হওয়ার আগেই এই পাপটা তাকে ধরতে পারেনা। যেমন একটা পাত্রে যদি ভালো করে তেল লাগিয়ে দিয়ে জল ঢালা হয় তখন পাত্রে ঐ জলটা ধরবেই না, জলটা তেলের স্পিয়ারির জন্য স্লিপ করে বেরিয়ে যাবে। মন যখন অনাসক্তির অবস্থায় পুরোপুরি চলে যায়, তখন ঐ অনাসক্তিটা তেল লাগানোর মত হয়ে গেল এখন ওতে কিছুই ধরবে না। আমাদের মত সাধারণ মানুষের মন এখনও অনাসক্তির অবস্থায় যায়নি, আমাদেরও অনেক রকম সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়, কখন কি করব কি করব না বুঝে উঠতে পারিনা। আমরা যে একেবারেই কিছু জানিনা বুঝিনা তাতো নয়, শাস্ত্রের কথা কিছুতো শুনেছি তাই কারুর ভালোর জন্য কিছু একটা করতে গিয়ে যদি একটা দুটো মিথ্যে কথা বলতেই হয় তার জন্য বেশী চিন্তা করতে নেই। আমাদের উদ্দেশ্যটা আগে পরীক্ষার করতে হবে, আমাদের উদ্দেশ্য যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় তখন এগুলোর দিকে নজর যাবেই না, তখন যদি মনে হয় এতে পাঁচ জনের ভালো হবে তখন সেটাই মানুষ করে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পুরুষরা সত্যি কথা বলা বা মিথ্যে কথা বলা, ধর্ম করা বা অধর্ম করা এগুলোর কোনটাই তাঁর কাছে কোন তাৎপর্য থাকে না। তাঁর কাছে একটাই তাৎপর্য – সর্বভূতহিতে রতাঃ, যেটা করলে পাঁচজনের মঙ্গল হবে। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে অনেক মামলা মোকদ্দমার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। প্রথম দিকে রামকৃষ্ণ মঠের সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে এই রকম একটা খুব নামকরা মামলা হয়েছিল। সেই সময় স্বামী শিবানন্দজী মঠের অধ্যক্ষ। দুই পক্ষের উকিলদের একটা মিটিংএ তিনি বলছেন ‘আমাদের বুদ্ধি একেবারেই পাঁচ বছরের বাচ্চার মত, সাংসারিক বুদ্ধিও অল্প, এই সব মামলা মোকদ্দমার কোন আইন-কানুন আমরা কিছুই জানিনা। তবে স্বামীজী এই রামকৃষ্ণ মঠ মিশন তৈরী করেছিলেন কিছু লোকের মঙ্গলের জন্য, আপনারা এমন একটা কিছু করুন যাতে এই মঠ মিশন বেঁচে যায়



আর পাঁচজনের মঙ্গল হয়’। অবতার আর তাঁর পার্শ্বদরা এইটাই করেন যাতে কিছু লোকের যেন মঙ্গল হয়। একেকজন অবতারের শিক্ষা একেক রকম, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সত্যস্বরূপ, যাই হয়ে যাক ঠাকুর কখনই মিথ্যা কথা বলবেন না। আবার শ্রীকৃষ্ণ নিজে সব সময় কায়দা করে যাচ্ছেন আবার অন্যকে দিয়েও মিথ্যা কথা বলিয়ে ছাড়ছেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যটা এক, অপরের যাতে মঙ্গল হয়।

### ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক দ্রোণাচার্য বধ

যুধিষ্ঠিরের মুখ থেকে অশ্বখামার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর দ্রোণাচার্য একেবারেই ভেঙে পড়েছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন যতই এগিয়ে আসছিলেন তিনিও অস্ত্র বার করে তাকে আক্রমণ করতে চাইছিলেন কিন্তু অস্ত্রকে যে টেনে বার করবেন এখন সেই ইচ্ছেও আর তাঁর হচ্ছে না। দ্রোণাচার্যের আর কোন ব্যাপারেই উৎসাহ নেই। এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন নানান কায়দা দেখিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দ্রোণাচার্য কোন কিছুতেই আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। তিনি পুরো হতাশ হয়ে সমস্ত অস্ত্র ত্যাগ করে রথ থেকে নেমে যুদ্ধভূমিতে ধ্যানে বসে পড়লেন। ধ্যানে বসে পড়ার পরও ভীমসেন এসে দ্রোণাচার্যকে কথা শুনিয়ে যাচ্ছেন ‘আপনি যদি নিজের স্বধর্ম ত্যাগ করে এই যুদ্ধ না করতেন তাহলে এই যুদ্ধ করার সাহস দুর্যোধন পেত না, আর এত ক্ষত্রিয়ের জীবনও নাশ হয়ে যেত না’। ভীমসেন অনেক কথা বলে যাচ্ছে কিন্তু দ্রোণাচার্যের কোন দিকেই দ্রষ্টি নেই, তিনি চুপচাপ বসে আছেন। আর ঐ সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন দৌড়ে এসে দ্রোণাচার্য মাটিতে বসে আছেন, তাঁর হাতে কোন অস্ত্র নেই, তিনি যুদ্ধও করছেন না, ঐ অবস্থায় তার গলার উপর তলোয়ারটা চালিয়ে দিতেই মুণ্ডুটা আলাদা হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ধর থেকে মুণ্ডুটা আলাদা হতেই তাঁর শরীর থেকে একটা বিরাট তেজঃপূর্ণ জ্যোতি নির্গত হয়ে চলে যাচ্ছে। এরপর অনেক রকমের বর্ণনা করা হচ্ছে।

অর্জুন ঐ দৃশ্যটা পুরো নিজের চোখে অবলোকন করেছে। অর্জুন দেখছেন দ্রোণাচার্য অস্ত্র ত্যাগ করে দিলেন, রথ থেকে নেমে এলেন, যুদ্ধভূমিতে বসে ধ্যানে বসে সব কিছু থেকে নিজের মনকে তুলে নিলেন। আর সেই সময় তাঁর শ্যালক ধৃষ্টদ্যুম্ন ছুটে আসছে তলোয়ার উঁচিয়ে দ্রোণাচার্যের গলা কাটার জন্য। অর্জুন তখন খুব জোর চিৎকার করছেন ‘ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি এই নৃশংস কাজ করো না, তুমি থাম’! কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন কোন কথাই শুনল না। সঞ্জয় তখন ধৃতরাষ্ট্রকে বলছে অহমেব তদাদ্রাক্ষাং দ্রোণস্য নিধনং নৃপ। ঋষেঃ প্রসাদাৎ কৃষ্ণস্য সত্যবত্যাঃ সূতস্য চ।। বিধুমামিব সংযাত্তীমুক্ষাং প্রজ্জলিতামিব। অপশ্যাম দিবং স্তন্ধা গচ্ছন্তং তং মহাদ্যুতিম্।।৭/১৬৪/৯৫-৯৬। ‘হে রাজন! দেখুন সত্যবতীর পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের আশীর্বাদ ছিল বলে এই দৃশ্যটাও আমি দেখতে পেলাম আর তাঁর শরীর থেকে তাঁর জীবাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ একটা তেজ উদ্ধার মত বেরিয়ে গেল সেটাও দেখতে পেলাম’। যাই হোক দ্রোণাচার্য ছিলেন কৌরবদের প্রধান সেনাপতি, সেনাপতিকে ঐভাবে মারা যেতেই সব সৈন্য যুদ্ধভূমি থেকে পালাতে শুরু করে দিল। তখন কৃপাচার্য আর অশ্বখামা দেখছেন যে সব সৈন্যরা পালিয়ে যাচ্ছে। সৈন্যরা এইভাবে পালাচ্ছে কেন জিজ্ঞাসা করাতে তারা জানতে পারলো যে দ্রোণাচার্যকে এইভাবে বধ করা হয়েছে।

### অশ্বখামার মতে মানুষ কখন অধর্ম করে

অশ্বখামার কাছে দ্রোণাচার্যের সমস্ত খবর চলে যাওয়ার পর ভেতরের রাগের আগুনে অশ্বখামার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছে। ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্মই হয়েছিল দ্রোণাচার্যকে বধ করার জন্য। দ্রোণাচার্যের চুল ধরে মুণ্ডুটা কেটে দিয়েছিল বলে অশ্বখামা বলছে ময়ি জীবতি মত্তাতঃ কেশগ্রহমবাপ্তবান্। কথমন্যে করিষ্যন্তি পুত্রৈভ্যাঃ পুত্রিমঃ স্পৃহাম্।। ৭/১৬৬/১০। আমার মত সন্তান বেঁচে থাকতেও আমার বাবার জীবিত অবস্থায় কেউ যদি তাঁর চুল ধরে নিতে পারে তাহলে মানুষ কিসের জন্য পুত্রের অভিশাপ করবে। অশ্বখামা বলতে চাইছে, তার মত এত বড় বীর সন্তান যেই বাবার, সেই সন্তান বেঁচে থাকতে তার বাবাকে কেউ অপমান যদি করতে পারে তাহলে সাধারণ মানুষ তাদের সন্তানদের থেকে আর কি আশা করতে পারে। আজকে প্রমাণ হয়ে গেল আমি বাবার এক অপদার্থ সন্তান, আমার বাবার কোন কাজেই লাগলাম না। এরপর অশ্বখামা বলছে মানুষ কখন ভুল কাজ বা অধর্ম করে। বলছেন কামাৎ ক্রোধাদবিজ্ঞানাদর্পাদ্বাল্যেন বা পুনঃ। বৈধর্মিকানি কুর্বন্তি তথা পরিভবেন চ।।৭/১৬৬/১১। যখন মানুষের কোন কাম-বাসনা থাকে, যখন ক্রোধ থাকে, যখন অজ্ঞান থাকে, যখন খুব হর্ষ হয়, হর্ষ মানে আনন্দ। ভারত পাকিস্তানের খেলাতে ভারত জিতেছে। এখন পাড়ার চ্যাংড়া ছেলেরা রাষ্ট্রায় নেমে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে খুব আনন্দ করছে, সেই সময় রাষ্ট্র দিয়ে কোন বয়স্ক লোক যাচ্ছে তাকেও বলবে ‘দাদু নাচুন আমাদের সাথে’। দাদুর যে এখন নাচ করবার বয়স নেই কে বুঝবে, কিন্তু পাড়ার মস্তানরা নাচছে দাদুকেও

নাচ করতে হবে। এটাও আনন্দ, কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে তাদের আর হুঁশ নেই কার সঙ্গে কি আচরণ করতে হয়। কিন্তু সব থেকে বেশী হয় *বাল্যে*, ছেলেমানুষিতে অধর্ম করে। এই কটি কারণে মানুষ ভুল বা অধর্ম রূপ কাজ করে বসে। অশ্বখামা এখানে একটা শব্দ ব্যবহার করেছে ‘*পরিভবেন*’, পরিভবেন মানে শ্রেষ্ঠ পুরুষের অপমান। কাম, ক্রোধ, অজ্ঞান, হর্ষ ও ছেলেমানুষি এই কটি কারণে মানুষ বিধর্ম করে বসে আর শ্রেষ্ঠ পুরুষের অপমান করে। যখনই কোথাও শ্রেষ্ঠ পুরুষের অপমান হতে দেখা যায় তখন সেখানে এই কটি কারণ থাকবে। হয় তার কোন কামনা-বাসনা আছে, কিছু চাইছে কিন্তু পেল না বলে তার ক্রোধ হয়ে গেছে, বা অজ্ঞান সে জানে না এই রকম করতে নেই আর হর্ষ এবং ছেলেমানুষির জন্য। ছেলেমানুষির জন্য মানুষ অনেক কিছু করে বসে, ছেলেমানুষি মানে তার মস্তিষ্ক এখনও পরিপক্ব হয়নি।

### অশ্বখামার নারায়ণাস্ত্রের প্রয়োগ, ভীমের নারায়ণাস্ত্রের উপক্ষা এবং অর্জুন কর্তৃক ভীমের রক্ষা

অশ্বখামা বলে চলেছে এই যে ধৃষ্টদ্যুম্ন এত নৃশংস অধর্ম কাজ করেছে সে ভুলে গেছে আমি কে। ধৃষ্টদ্যুম্নকে এর ফল এখন ভোগ করতে হবে। এই যে যুধিষ্ঠির সব সময় একটা ধর্মের জামা গায়ে দিয়ে নিজেকে ধর্মজ্ঞ বলে জাহির করে বেড়াচ্ছে, একটা মিথ্যে কথা বলে আমার বাবাকে হত্যা করাল, এর ফলও যুধিষ্ঠিরকে ভুগতে হবে। অশ্বখামার কিন্তু পাণ্ডবদের প্রতি বিশেষ কোন আক্রোশ কোন দিনই ছিল না। দুর্যোধনের সাথে অশ্বখামার বন্ধুত্ব ছিল ঠিকই কিন্তু যুধিষ্ঠির, অর্জুনদের সম্মানও করত। কিন্তু দ্রোণাচার্যের বধ হওয়ার পর থেকে পুরোপুরি ঘোর পাণ্ডব বিরোধী হয়ে গিয়েছিল। এত সব কথা বলে অশ্বখামা ঠিক করে নিল ‘আমি এইবার নারায়ণাস্ত্র বার করছি’। সাক্ষাৎ নারায়ণের এই অস্ত্র দ্রোণাচার্যের কাছে ছিল, দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে এখন অশ্বখামার কাছে এসেছে, এই অস্ত্র থেকে বাঁচার কোন পথ নেই। শত্রুকে বধ না করে নারায়ণাস্ত্র কখনই ফিরে আসে না। তবে ভগবান নারায়ণের যেই রকম স্বভাব এই অস্ত্রেরও ঠিক সেই রকম স্বভাব। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন যদি কেউ এই অস্ত্রের শরণাগতি নিয়ে নেয়, শরণাগতি মানে যদি কেউ রথ থেকে নেমে আসে, সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র যদি ছেড়ে দেয়, যদি অভয় যাচনা করে এই অস্ত্রের যদি কেউ শরণাগত হয়ে যায় তখন তার উপর নারায়ণাস্ত্র কোন কাজ করবে না। ভগবানের যে শরণ নিয়ে নেয় তার যেমন অবশ্যই ভালো হয়, ভগবানের এই অস্ত্র নারায়ণাস্ত্রেরও ঠিক একই বৈশিষ্ট্য। নারায়ণাস্ত্র যখন চালিয়ে দেওয়া হবে তখন এই অস্ত্র সবাইকে বধ করবেই, পুড়িয়ে ছাই করে দেবে কিন্তু কেউ শরণাপন্ন হয়ে হাত জোড় করে নিলে এই অস্ত্র তাকে স্পর্শ করবে না।

অশ্বখামা এখন মন্ত্রপূত করে নারায়ণাস্ত্র ছেড়ে দিয়েছেন। এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে তীরটা যখন ছোঁড়া হয়ে গেল তখন শীত শেষ হয়ে যখন গরমের আবহাওয়া আসে তখন প্রকৃতির সব কিছু শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, সেই সময় একটা স্ফুলিঙ্গ তাতে যদি কেউ ফেলে দেয় তখন দাবানল জ্বলে ওঠে। নারায়ণাস্ত্র ঠিক যেমন জঙ্গলের শুকনো কাঠে আগুন লেগে দাবানল জ্বলে ওঠে সেই রকম সব কিছুকে পোড়াতে শুরু করে দিয়েছে। যুধিষ্ঠির এই আগুন দেখে ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। অর্জুন কিন্তু নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে আছে। যুধিষ্ঠির সবাইকে চিৎকার করে বলছেন পালাও পালাও। যারা পালাচ্ছে তাকেও এই নারায়ণাস্ত্র ছাড়ছে না, তাকেও পুড়িয়ে মারছে। তখন শ্রীকৃষ্ণ দুই হাত তুলে সমস্ত সৈন্যকে নির্দেশ দিচ্ছে *শীঘ্রং ন্যস্যত শস্ত্রাণি বাহ্যেভ্যশ্চাবরোহত। এষ যোগোহত্র বিহিতঃ প্রতিঘাতে মহাত্মনা।।৭/১৬৮/৩৮।* ‘তোমরা সবাই যে যার বাহন, হাতি, ঘোড়া, রথ থেকে নেমে পড় আর তোমাদের সাথে যত অস্ত্র আছে সব হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে হাতজোড় করে শরণাগতির ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে যাও, তাহলে এই নারায়ণাস্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতিই করবে না। ভগবান বিষ্ণুর এটাই বিধান হয়ে আছে। কিন্তু মনে মনেও যদি তোমরা ভাব এই অস্ত্রের প্রতিরোধ করব তাহলেও এই অস্ত্র তোমাকে পোড়াতে শুরু করে দেবে, তুমি আর এর থেকে বাঁচতে পারবে না’। শ্রীকৃষ্ণ একদিকে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন অন্য দিকে ভীমসেন বলছেন ‘যারা বীরপুরুষ তারা কখনই এইভাবে শরণাগতি নেয় না, এই দেখ এক্ষুণি আমার তীর দিয়ে এই অস্ত্রকে আটকে দিচ্ছি’। ভীমসেন হলেন শক্তিমান পুরুষ, যাদের মধ্যে শারীরিক শক্তিটা বেশী থাকে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাদের বুদ্ধিটাও অনেকটা স্থূল হয়। ভীম বলে যাচ্ছেন ‘যদিও আজ পর্যন্ত নারায়ণাস্ত্রের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারেনি, কিন্তু আমি আজ আমার ক্ষমতা দিয়ে দেখিয়ে দেব কিভাবে এর সাথে লড়াই করতে হয়’। ভীম আবার অর্জুনকে বোঝাচ্ছেন ‘অর্জুন! আজ পর্যন্ত তুমি কোন যুদ্ধে হেরে যাওনি, কোন যুদ্ধে তুমি আজ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করোনি। এখন যদি তুমি তোমার গাণ্ডীবকে ছেড়ে দাও তাহলে চিরদিনের মত তুমি কলঙ্কিত হয়ে যাবে। তোমার কলঙ্ক যাতে না হয় তাই কর এবং গাণ্ডীবকে কখনই তুমি ছেড়ে দিও না। অর্জুন ভীমসেনকে বলছে ‘গাণ্ডীবকে যদি গরু, ব্রাহ্মণ আর নারায়ণাস্ত্রের সামনে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে এতে কোন পাপ লাগবে না আর কলঙ্কও হবে না’। যেমন রাজার নাতি আছে, সেই নাতির সঙ্গে খেলা করার জন্য সিংহাসন থেকে নেমে এলেন, কিংবা বড় কোন পণ্ডিত বা মহর্ষি রাজসভাতে এসেছেন তখন

তিনি সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে তাতে কোন দোষ হয় না, বরং রাজার মর্যাদাই বাড়ে। ঠিক তেমনি গরু বা ব্রাহ্মণের সামনে যদি গাণ্ডীবকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাতে কোন দোষ হয় না। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ এত করে বলা সত্ত্বেও ভীমসেন কোন গ্রাহ্যই করছে না, বলছে আমি একাই অশ্বখামার সাথে লড়াই করব। ভীম যুদ্ধ করতে নেমে পড়তেই ঐ নারায়ণাস্ত্র ভীমকে চারিদিক থেকে ঘিরে নিয়ে পোড়াতে শুরু করেছে, ভীমের পাশে আর কেউ নেই, একাই এখন রণক্ষেত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নারায়ণাস্ত্রের আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে জ্বলতে শুরু করেছে। ভীমসেনকে ঐভাবে জ্বলতে দেখে অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে বায়বাস্ত্র ছেড়েছেন যাতে জল হয়ে ঐ আগুনটা শান্ত হয়ে যায়। এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে ভীমসেন, তাঁর রথ আর রথের সারথি এবং রথের পার্শ্বরক্ষক আর চক্ররক্ষকদের নারায়ণাস্ত্রের আগুনের শিখা এমন ভাবে ঘিরে নিয়েছে যে ভীমসেনকে আর দেখাই যাচ্ছে না। নারায়ণাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যই হল যে শরণাগত হয়ে যাবে তার কাছে আগুন শান্ত হয়ে যাবে আর মনের মধ্যেও যদি হিংসা ভাব থাকে আগুন তাকে ঘিরে নেবে আর হিংসা যত বাড়তে থাকবে আগুনের তেজও ততো বাড়তে থাকবে। ভীমসেন ভাবছে আমি এই অস্ত্রকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব, আর যতই সে রেগে যাচ্ছে নারায়ণাস্ত্র ততই শক্তিশালী হচ্ছে। অস্ত্রের শক্তি ও তেজ বাড়তে বাড়তে এমন বেড়ে গেছে যে ভীমের শক্তিটাও কমতে শুরু করেছে। ভীমের শক্তি কমতে কমতে একটা সময় আগুনের তেজের জ্বালায় ভীম রথের মধ্যেই অচৈতন্যের মত হয়ে পড়ে গেছে। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রচণ্ড রেগে গেছেন। তিনি কোন রকমে ভীমসেনের রথের উপর উঠে টেনে ভীমসেনকে রথ থেকে নামিয়েছেন। ভীমসেনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ‘তোমাকে তখন থেকে নিষেধ করা হচ্ছে তাও তুমি কথা শুনছ না’। ভীমসেনকে রথ থেকে মাটিতে নামিয়ে নিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র সব ফেলে দেওয়াতে নারায়ণাস্ত্র আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অশ্বখামা নারায়ণাস্ত্র ছেড়েছে ঠিক আছে কিন্তু নারায়ণাস্ত্রের এই বৈশিষ্ট্যের এত কথা সে জানতো না। পাণ্ডবদের সবাইকে অক্ষত দেখে অশ্বখামা খুব চমকে উঠেছে, কি করে এরা বেঁচে উঠল! এদের তো বাঁচার কথা নয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণাস্ত্রের সব কিছু জানতেন বলে পাণ্ডবরা বেঁচে গেল। দুর্যোধন তখন অশ্বখামাকে বলছে ‘আরেকবার তুমি এই অস্ত্রটা চালিয়ে দাও’। অশ্বখামা তখন খুব দুঃখ করে বলছে নৈতদাবর্ততে রাজমন্ত্রং দ্বিনোপদ্যতে। আবৃতং হি নিহন্তোতং প্রয়োক্তারং ন সংশয়ঃ।। এবধগাস্ত্রপ্রতীঘাতং বাসুদেবঃ প্রযুক্তবান্। অন্যথা বিহিতঃ সংখ্যে বধঃ শত্রোর্জনাধিপ।।৭/১৬৮/৮৮-৮৯। ‘এই অস্ত্র একবারই চালান যায়, দ্বিতীয়বার চালান যায় না। আর দ্বিতীয়বার যদি চালান হয় তখন যে চালাচ্ছে তাকেই এই নারায়ণাস্ত্র শেষ করে দেবে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই এই অস্ত্র থেকে বাঁচার পথ কোথা থেকে জেনে নিয়েছিলেন বলে সবাই বেঁচে গেল, তা নাহলে আজকে এরা কেউই বাঁচত না। এখন আমাদের আর কিছু করার নেই, এই দিব্যাস্ত্র আমাদের হাত থেকে এখন বেরিয়ে গেছে’। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোন রকমে পাণ্ডবদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করলেন।

### নারায়ণাস্ত্র ব্যর্থ হওয়াতে অশ্বখামার হতাশা এবং ব্যাসদেব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন

এরপর অশ্বখামার সাথে ব্যাসদেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ব্যাসদেবের কুঠিয়া কুরুক্ষেত্রের কাছাকাছি কোথাও ছিল। ব্যাসদেবের সঙ্গে দেখা হতে অশ্বখামা খুব দুঃখ করে বলছেন, যদিও অশ্বখামা আগেই জেনে গিয়েছিল কিন্তু এখানে কাহিনীটাকে বাড়ান হচ্ছে। অশ্বখামা বলছেন ‘হে ঋষিবার! আপনি বলুন এই দিব্যাস্ত্র কি করে মিথ্যে হয়ে গেল, এই অস্ত্রে তো কারুরই বাঁচার কথা নয়। শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনকে আমার এই দিব্যাস্ত্র কিভাবে অব্যাহতি দিয়ে দিল ভেবে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি’। তখন ব্যাসদেব বলছেন, ব্যাসদেব এখানে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করছে ‘দেখো অশ্বখামা! তোমাকে কতকগুলি গুহ্য কথা বলছি, তুমি খুব মন দিয়ে শোন – যোহসৌ নারায়ণো নাম পূর্বেষামপি পূর্বজঃ। অজায়ত চ কার্যার্থং পুত্রো ধর্মস্য বিশ্বধ্বক্। স এষ দেবশ্চরতি মায়য়া মোহয়ন্ জগৎ।।৭/১৬৯/৫৪। নারায়ণ তিনি হলেন আমাদের পূর্বজদেরও পূর্বজ। জগতের পরিপালক সেই নারায়ণই জগতের কার্যসাধনের জন্য জন্ম গ্রহণ করেছেন, তিনিই কৃষ্ণ রূপে জগৎ মুক্ত করে বিচরণ করছেন। যোগশাস্ত্রে ভগবানকে বলা হচ্ছে স পূর্বেষামপি গুরুঃ যিনি গুরু তাঁরও গুরু তিনি, পরমগুরু তিনি। তিনি হচ্ছেন আদিদেব জগন্নাথ লোককর্তা স্বয়ং প্রভু। যিনি নারায়ণ তাঁর কি কি গুণ? তিনি আদিদেব, দেবতাদেরও আদি দেবতা, অনেক দেবতা আছে কিন্তু তিনি হলেন আসল দেবতা, তিনি সমস্ত জগতের নাথ, সমস্ত লোকের কর্তা আর তিনিই স্বয়ং প্রভু, স্বয়ং প্রভু মানে তিনি নিজেই সব কিছু করে নেন, কিছু করার জন্য তাঁকে কারুর অপেক্ষা রাখতে হয় না। তিনি আদ্যা সর্বস্য লোকস্য অনাদি নিধনোচ্যুতঃ, তাঁর আদিও নেই অন্তও নেই তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। তাঁর মর্যাদা থেকে তিনি কখন চ্যুত হন না, সেইজন্য তাঁর নাম অচ্যুত। যত মহর্ষিরা এর আগে আগে হয়েছেন, এখন যে মহর্ষিরা আছেন সবাই আর যত শ্রুতি আছে সবাই নারায়ণের যে তত্ত্ব সেটাকেই আলোচনা করেন। কিন্তু এই মন দিয়ে তাঁকে বোঝা যায় না, আমাদের যে শাস্ত্র পড়ার মন, আমাদের যে চিন্তা ভাবনার মন, যুক্তিবাদীদের মন, বৈজ্ঞানিকদের মন, এই মন দিয়ে ভগবানকে কিছুই বোঝা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ লেখাপড়া

না জানা একজন সামান্য পুরোহিত, কিন্তু তাঁর কাছেই আমরা ভগবানের তত্ত্ব পাই। তৎকালীন কলকাতার সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণের ধারে কাছে কেউ ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে আমরা বুঝতে পারি ঈশ্বর তত্ত্বের ধারণা করতে অন্য ধরণের একটা বুদ্ধির দরকার। যে বুদ্ধি দিয়ে আমরা জগতের জ্ঞানলাভ করছি, যে বুদ্ধি দিয়ে যুক্তিবাদীরা যুক্তি বিচার করছে ঈশ্বর তত্ত্বের ধারণার কাছে এই বুদ্ধি বেকার। মহর্ষি, ঋষি আর শ্রুতি মানে বেদ, উপনিষদ বা যাতে ঈশ্বরীয় তত্ত্ব নিরূপণ করা হয়েছে যেমন বাইবেল, কোরান এঁরাই ঈশ্বরের তত্ত্ব নিরূপণ করে দেয়। এনারা যেটা বলেছেন, বেদ যেটা বলে দিয়েছে সেটাই ভগবানের তত্ত্ব। আমাদের মন বুদ্ধি দিয়ে যেটা বিচার করা হচ্ছে সেটা কিছুই নয়, ঈশ্বরীয় তত্ত্বের ধারণার ক্ষেত্রে এই বুদ্ধিকে ফেলে দিতে হবে, এখানে এই বুদ্ধি কোন কাজে লাগবে না। একজন বড় কবি ঈশ্বরীয় একটা তত্ত্ব লিখলেন কিন্তু এর কোন দাম নেই, বেদ যেটা বলেছে এটাই থাকবে। ভগবানের তত্ত্ব কথা যখন হয় তখন তিনটে জিনিষকে এক সঙ্গে চলতে হবে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনটেতেই সমান ভাবে চলতে হবে। অতীতে ঋষিরা যেন এই রকম বলে থাকেন, বর্তমানে আমি বলছি আর ভবিষ্যতে যারা আসবেন তাঁরাও যেন এই রকম কথাই বলতে পারে। এর মধ্যে কোন একটা জায়গায় যদি মিল না থাকে তাহলে সেটা আর ঈশ্বরীয় তত্ত্ব হবে না। একেই বলা হচ্ছে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। আমার অনুভূতি হলেই হবে না, শ্রুতি মানে আগেও এই রকম অনুভূতির অভিজ্ঞতা কারুর হয়েছে কিনা। না এর আগে আর কারুর হয়নি আমারই হয়েছে, তাহলে ভাই আপনার কথা মানতে পারলাম না। এর পরেও এই অনুভূতি কারুর হবে কি? না না, আর কারুর হবে না। তাহলেও আপনার কথা মানতে পারলাম না। ন ভূতো ন ভবিষ্যতি, এই রকম আগেও কখন হয়নি এর পরেও কখন হবে না জাগতিক ব্যাপারে বলা যেতে পারে। আধ্যাত্মিক ব্যাপার যখন আসবে তখন এই কথা চলবে না। আমরা যদি বলি শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তাধারা, তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতি এর আগেও কখন কারুর হয়নি আর এর পরেও কখন কারুর হবে না, তাহলে প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের সব কিছুকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে আসতে হবে। স্বামীজী যখন মঠের নিয়মাবলী তৈরী করলেন তখন তিনি বলছেন – এই পথে চলে চলে এর পরে যে সাধুরা আসবেন তাঁরা যদি নতুন কোন পথ দেন তখন সেটাকেও ঠাকুরের পথ বলেই গ্রহণ করা হবে। স্বামীজী নিজের তৈরী নিয়মাবলীতেই লাইন টেনে দিয়ে বলছেন না যে এখানেই শেষ।

### ব্যাসদেব কর্তৃক অবতার তত্ত্বের নিরূপণ ও শিবের মহিমা কীর্তন

ব্যাসদেব অশ্বখামাকে বলে যাচ্ছেন ‘সেই ভগবান এক সময় কোন কারণে ধর্মের পুত্র রূপে জন্ম নিয়েছিলেন। জন্ম নেওয়ার পর তিনি হিমালয়ের বদ্রিকাশ্রমে নানান ভাবে তপস্যা করেছিলেন। তারমধ্যে দুবাহু তুলে পাঁচ হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন’। নানা রকম তপস্যার বর্ণনা করে বলছেন ‘এই যিনি ভগবান তিনি মানুষ রূপ ধারণ করে তপস্যা করছিলেন তার ফলে স তেন তপসা তাত ব্রহ্মভূতো যদাভবৎ। শ্লোকের এই লাইনটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যাসদেবের অবতার তত্ত্বের সব থেকে ভালো ব্যাখ্যা এই জায়গাতে যতটা করা হয়েছে শাস্ত্রে কোথাও অবতার তত্ত্বের এত ভালো ব্যাখ্যা নেই। আর ঠাকুরের জীবনী পুরোপুরি ঠিক এইভাবেই চলে। অবতার তত্ত্ব এইভাবেই বোঝা হয়। প্রথম ধাপ হল যোহসৌ নারায়ণো নাম পূর্বৈষামপি পূর্বজঃ সেই নারায়ণ পূর্বজেরও পূর্বজ। দ্বিতীয় ধাপ হল সেই ভগবান ধর্মের পুত্র হয়ে মানুষ রূপে এসেছেন। তাঁর কি নাম? নারায়ণ ঋষি। তৃতীয় ধাপ – তিনি একান্তে তপস্যা করলেন। চতুর্থ ধাপ – সেই তপস্যার দ্বারা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ স্থিতি, তিনিই যে সেই পূর্ণ ব্রহ্ম সেই স্থিতি। তারপর তিনি কি করছেন? সেখান থেকে তিনি জগতের যিনি ভগবান তাঁর দর্শন করলেন। এই জায়গাটা আবার রহস্যময়, তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, মানুষ হয়ে তিনি তপস্যা করে ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থান করে সেখান থেকে তিনি জগতের যিনি ভগবান তাঁর দর্শন করলেন। এখানে শিবের কথা বলা হচ্ছে, শিবের দর্শন হয়েছে। চারটে ধাপে প্রথম ধাপে বলা হচ্ছে তিনি সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ, দ্বিতীয় তিনি মানুষ রূপে জন্ম নিলেন, তৃতীয় তপস্যা করলেন, চতুর্থ ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থান। এখন এই চতুর্থ যে ধাপ ব্রহ্মজ্ঞান বা আমিই সেই পূর্ণ ব্রহ্ম এটা কিন্তু যে কোন লোকের হয়ে যেতে পারে। গুরুাচার্যের এই অবস্থা লাভ হয়েছিল, ঠাকুরের কাছে তোতাপুরি এসেছিলেন, তিনিও ব্রহ্মজ্ঞানী। কিন্তু গুরুাচার্য বা তোতাপুরি এনারা কেউ ভগবান নন। গুরুাচার্য ব্রহ্মজ্ঞান অবস্থায় বলতে পারেন – আমিই সব কিছুর নিয়ন্তা, আমিই সব কিছু চালাচ্ছি, আমিই মেঘ হয়ে বর্ষণ করছি আর আমিই বাতাস হয়ে প্রবাহিত হচ্ছি, সূর্য হয়ে জলকে টেনে মেঘ করছি, কিন্তু তিনি ভগবান নন। ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন তিনিও তখন ঠিক এইভাবেই আচরণ করেন। মানুষ রূপে জন্ম নেবেন, মানুষ রূপে সাধনা করবেন, আর ঐ সাধনা করে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি লাভ কিন্তু তিনি অবতার। অবতার আর ঋষির মধ্যে এই পার্থক্যটা থাকছে। আপাতদৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের যে ব্রহ্মজ্ঞান আর তোতাপুরির যে ব্রহ্মজ্ঞান সেখানে কোন পার্থক্য নেই। অথচ একজন হলেন ঋষি আরেকজন অবতার। আগমনটা কোথা থেকে হচ্ছে সেইখানে এসে পার্থক্যটা এসে যায়। তোতাপুরী কোথা থেকে এসেছেন? মানবলোক

থেকে তিনি ঘুরঘুর করছিলেন। ঠাকুর কোথা থেকে এসেছেন? বিষ্ণুলোক থেকে তিনি এসে ঘুরছেন, ফলে তিনি অবতার হয়েছেন। কিন্তু আমরা চিনব কি করে? চেনার কোন উপায় নেই। আত্মজ্ঞানী আর অবতারের মধ্যে পার্থক্য করা খুব মুশকিল। যাঁরা ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানী বা আত্মজ্ঞানী হন তাঁরা কখনই বলতে যাবেন না আমি ভগবান। কিন্তু আজকাল অনেকেই নিজেকে ভগবান বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, আসলে এরা কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীও হয়নি ভগবানতো দূরের কথা। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি কখনই নিজেকে ভগবান বলে প্রচার করবেনা। তাহলে ধাপ্পাটা কে মারবে? যার একটু জ্ঞান হয়েছে কিন্তু বিজ্ঞানী হয়নি তাঁরাই এই ধাপ্পাটা মারবে। অন্য দিকে যিনি অবতার তিনিও কিন্তু সবাইকে বলে বেড়াবেন না, তাঁর খুব অন্তরঙ্গ যাঁরা তাঁদের কাছে কথা প্রসঙ্গে ইসার করে বলবেন তাও সরাসরি বলে দেবেন না। ব্যাসদেব যেটা অশ্বখামাকে বোঝাচ্ছেন, এটাই অবতারকে জানার পথ। অশ্বখামা বিশ্বাস করে ব্যাসদেবকে। ব্যাসদেব বলে দিলেন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, ব্যাস দ্বিতীয় আর কোন কথা আসে না। তখনকার দিনে ব্যাসদেবকে কেউ ধাপ্পাবাজ বলে চিন্তাই করতে পারত না, ব্যাসদেবকে সবাই অত্যন্ত উচ্চমানের একজন ঋষি বলেই সম্মান করত। তিনি যখন বলছেন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান তখন এর পর আর কেউই কোন প্রশ্নই করতে পারত না। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জীবনে যা কিছু করেছেন, এই সব কিছু যদি তিনি না করতেন তাহলে স্বামীজীর কথা আজকে কে জানতে চাইত আর কেই বা শুনত। কিন্তু তাও স্বামীজী যখন আমেরিকা ইংল্যান্ড কাঁপিয়ে ভারতে এসে আলোড়ন ফেলে দিলেন তখন তিনি বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান। লোকে বিশ্বাস করে নিল শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান। সেইজন্য যিনি অবতার হয়ে আসেন তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্যের কার্যসিদ্ধির বড় অংশ নির্ভর করে তাঁর একজন অন্তরঙ্গ শিষ্যের উপর। ঠাকুর কেশবচন্দ্রকে বলছেন – তুমি লক্ষণ না দেখে শিষ্য কর বলে তোমার এই অবস্থা হয়। ঠাকুর কিন্তু আধার দেখে শিষ্য করতেন, আধার দেখে উপদেশ দিতেন।

ব্যাসদেব এখানে অশ্বখামাকে শিবের মহিমা বর্ণন করছেন। মহাভারতে অনেক জায়গাতে শিবের মহিমার কথা বলা হয়েছে। অনেকে মনে করেন এগুলো পরের দিকে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে আবার অনেকে মনে করে, না ব্যাসদেবই এগুলোর রচয়িতা। ব্যাসদেব এখানে দুটো জিনিষ বলছেন শিব হলেন ‘রু’, রু মানে যিনি দুঃখ দূর করেন, তাই তিনি রুদ্র। তিনি সবার থেকে শ্রেষ্ঠ। শিবকে হর বলা হচ্ছে কারণ তিনি পাপ হরণ করেন, শিবের ভক্তরা যেমন শিবের উদ্দেশ্যে আনন্দ ধ্বনি করে বলে হর হর ব্যোম ব্যোম, তিনি জটাজুটধারী, সবাইকে তিনি চেতনা দিচ্ছেন। এই যে কাল সব কিছুকে মেপে নিচ্ছে এই কাল তাঁরই একটি স্বরূপ। যারা ভালো মানুষ এবং তপস্যা করে তারাই তাঁর দর্শন পায়, দুরাচারীরা তাঁকে দেখতে পায় না। এই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ, যিনি মানুষ হয়ে তপস্যা করছিলেন, তাঁর শিবের দর্শন হয়েছিল। কি রকম দর্শন হয়েছিল? শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন মাকালীকে দর্শন করেছিলেন। পার্থক্য হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ মাকালীর দর্শন আগে করেছিলেন এবং ব্রহ্মস্থিতিতে পরে অবস্থান করেছিলেন। এই পার্থক্যে কিছু আসে যায় না। কারণ ঠাকুরের যখন ব্রহ্মস্থিতি লাভ হয়েছে তারপরেও তিনি সর্বদা মা মা করে আর্তনাদ করে যাচ্ছেন এবং তখনও তাঁর মায়ের দর্শন হচ্ছে। এখানে ব্যাসদেব নারায়ণ ঋষি যে ভাবে শিবের একটা বিরাট স্তুতি করেছিলেন তার বর্ণনা করে যাচ্ছেন। শিবের স্তুতি করার পর শিব নারায়ণ ঋষিকে বলছেন ‘এই যে তুমি নারায়ণ রূপে এসে তপস্যা করে আমার যেভাবে স্তুতি করলে তাই তোমার উপর কোন দিন কারুর কোন প্রভাব খাটবে না’। শিবের এই আশীর্বাদের পর নারায়ণ ঋষি এমন তপস্যা করতে থাকলেন যে ঐ তপস্যা সব কিছুর ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। সেখান থেকে আরেকটি শরীরের জন্ম নিল যাঁর নাম হল নর ঋষি। এখানে শ্লোকে বলছেন *তসৈব তপসো জাতং নরং নাম মহামুনিম্। তুল্যমেতেন দেবন তং জানীহ্যর্জুনং তথা।।৭/১৬৯/৫৫।* নারায়ণ ঋষি তপস্যা করে চলেছেন, তপস্যার এত জোর যে, সেই তপস্যার জোরে তাঁর শরীরটা যেন আরেকটা শরীর ধারণ করে নিল, সেই শরীরধারীর নাম হল নরঋষি। ঠাকুর নরেনকে বলতেন নরঋষি, ঠাকুরের যে তপস্যা সেই তপস্যা থেকে যেন আরেকটা শরীর জন্ম নিয়েছিল, *তপঃ কায়*, সেই শরীরটাই স্বামী বিবেকানন্দ। সেইজন্য এনারা দুজন সব সময় অভেদ। ঠাকুর আর স্বামীজী যেমন অভেদ, শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনও ঠিক তাই। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ ঋষি আর অর্জুন নরঋষি। নারায়ণ ঋষি রূপে এসে তিনি শিবের এমন পূজা করেছিলেন যে শিবের আত্মযোগ আর শাস্ত্রযোগ সবটাই শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিদ্যমান। সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনকে কেউ কিছু করতে পারবে না। ব্যাসদেব এইসব কথা বলে অশ্বখামাকে বোঝাচ্ছেন ‘তুমি যে মনে করছ এই করে সেই করে এঁদের দুজনকে পরাস্ত করে দেবে, তা তুমি কখনই পারবে না, কারণ এনারা হলে নর নারায়ণ ঋষির অবতার’।

ব্যাসদেব যেমন অশ্বখামাকে শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের রহস্য বলছেন, ঠিক তেমনি এরপরেই ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই মহর্ষিকে অর্জুন বলছেন *সংগ্রামে নিহনন্ শত্রুন্ শরৌঘৈর্বিমলৈরহম্। অগ্রতো লক্ষ্যে যান্তং পুরুষং পাবক*

প্রভম্।।৭/১৭০/৪। ‘আমি যখন যুদ্ধ করছিলাম তখন আমার যেন মনে হচ্ছিল আমার সামনে সামনে একজন দিব্য অগ্নির ন্যায় তেজস্বী পুরুষ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন’। এখানেও শিবের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। ব্যাসদেব আবার বলছেন ‘তিনিই জগতের উৎপত্তির স্থান, তিনিই সব কিছুর বীজ’। নারায়ণের নামে অন্যান্য পুরানে যে স্তুতি পাই মহাভারতে এখানে শিবের নামে সেই একই স্তুতি করা হচ্ছে। এখানেই মহাভারতে শিবকে নিয়ে আরেকটা ধারণা পাই যেখানে ব্যাসদেব বলছেন *তস্য পারিষদা দিব্যে রূপৈর্নানাবিধৈর্বিভোঃ। বামনা জটীলা মুণ্ডা হৃৎগ্রীবীবা মহোদরাঃ।।৭/১৭০/১৮।* ‘ভগবান শিবের দিব্য পার্শ্বদেব যাঁরা, তাঁরা বিভিন্ন রকমের। অনেকে খর্বকায়, অনেকে জটাধারী’ ইত্যাদি। যত রকমের বিকৃত রূপ হতে পারে শিবের দিব্য পার্শ্বদেবের মধ্যে সবটাই আছে। এই জিনিষটাকেই খুব সহজ ভাষায় বলা হচ্ছে শিব যখন পার্বতীকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন তখন তাঁর যে বরযাত্রীরা যাচ্ছে তাদের বর্ণনা করে তুলসীদাস বলছেন যেমন বর তেমন তার বরযাত্রী। কারুর পেট বড়, কারুর পেট নেই, কারুর মুখ নেই কারুর অনেকগুলো মুখ। সাহিত্যে এই ধরণের বর্ণনার শৈলী আমরা প্রথম পাই বাল্মীকি রামায়ণে। বাল্মীকি দুটো জিনিষের বর্ণনা খুব সুন্দর করেছেন। একটা জায়গায় ঋষি কত রকমের হয়, নানা রকমের ঋষির বর্ণনা বাল্মীকি রামায়ণেই প্রথম পাওয়া যায়। আবার যখন অসুরদের বর্ণনা করছেন তখন কত রকমের অসুর হতে পারে তার বিশদ বর্ণনা দিয়ে চলে গেছেন। এই দুটোকে সমন্বয় করে ব্যাসদেব এখানে বর্ণনা করছেন শিবের যারা পার্শ্বদেব তাদের আকৃতি বিকৃতি কত রকমের। তাদের যেমন বিচিত্র শরীরের আকৃতি আর তাদের বেশভূষাও তেমনই। এইভাবে শিবের এক বিশাল বর্ণনা করে যাচ্ছেন।

শিবের ব্যাপারে যেটা সব থেকে খুব রহস্যের তা হল কেউ বলে শিব অনার্যদের দেবতা, কেউ বলে শিব আদিদেবতা ইত্যাদি। কিন্তু পুরানে আমরা পাই যেখানে দক্ষ যখন যজ্ঞ করছিলেন তখন তিনি যজ্ঞের ভাগ শিবকে দিতেন না। শিবের স্ত্রী সতী সেই যজ্ঞে এসে অপমানিত হয়ে দেহত্যাগ করার পর শিব দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে প্রলয় শুরু করেছিলেন। এই কাহিনীগুলোর পেছনে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের সামনে চলে আসে। ভারতে অনেকগুলো পরম্পরা সমান্তরাল ভাবে চলে আসছিল। এর মধ্যে একটা হল বেদের পরম্পরা। বেদ মতে যারা চলছিলেন, তাঁরা যা কিছু রচনা করেছিলেন সেগুলোকে শিষ্য পরম্পরায় এক অপরকে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। এই ভাবে বেদের সব কিছু হাজার দু হাজার বছর ধরে সমান ভাবে চলে আসছিল বলে বেদের পরম্পরা দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল আর খুব সম্মান পেয়েছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে জিনিষগুলো চলে আসছিল, তাদেরও অনেক দেবতা ছিল, অনেক প্রথা রীতিনীতিও ছিল, কিন্তু তাদের বেদের মত এত শক্তিশালী পরম্পরাটা ছিল না বলে সেই সম্মানটা ছিল না। শিব ছিলেন এই সাধারণ জনগণের দেবতা, তাই সেই সম্মানটা শিবের ছিল না। বেদের যে পরম্পরাটা ছিল এরা এদেরকে গ্রাহ্য করত না। কিন্তু কোন একটা সময় হিন্দু সমাজ বেদের যারা ব্রাহ্মণ তাকেও মানত আবার যারা শিবের ভক্ত ব্রাহ্মণ তাকেও মানতে শুরু করেছে। এই মানামানি নিয়ে দুই পরম্পরাতে নানা রকমের ঝগড়া বিবাদ ছিল। এই ঝগড়া বিবাদকে পুরানের বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে নিয়ে এসে একটা সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। আজকের হিন্দু সমাজে এই ব্যাপারটা এখন পুরোপুরি মিশে গেছে। যেখানে বেদের পূজা হচ্ছে সেখানে আবার শিবেরও পূজা হচ্ছে। আবার শিবের পূজোতে যে মন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে সেগুলো বেদের মন্ত্র থেকেই নেওয়া হচ্ছে। পরম্পরার তফাৎ ছিল বলে এই কাহিনীগুলোকে এইভাবে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে এটা একটা মত।

মহাভারতের এই অংশে শিবের বিরাট বর্ণনা, এই জগতে যা কিছু আছে শিব রূপে বলা হচ্ছে। এত বিশাল বর্ণনার আলোচনা করা সম্ভব নয়। কয়েকটি মূল কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি – তিনিই হচ্ছেন রুদ্র, তিনিই শিব, তিনিই আবার অগ্নি, তিনি সর্বস্বরূপ। এখানে খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটা কথা বলছে *দে তনু তস্য দেবস্য বেদজ্ঞা ব্রাহ্মণা বিদুঃ। ঘোরা চান্যা শবা চান্যা তে তনু বহুধা পুনঃ।।৭/১৭০/৮৭।* যাঁরা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁরা বলেন শিবের দুটো রূপ একটা ঘোর রূপ আরেকটা শিব রূপ, শিব রূপ হল কল্যাণময় রূপ, মঙ্গলকারী শুভ রূপ, যিনি শান্তি নিয়ে আসেন। দুটো রূপই পৃথক পৃথক, এই দুটো রূপ থেকেই আবার অনেক রূপ বেরিয়ে আসে। *ঘোরা তু যা তনুস্তস্য সোহগ্নির্বিষ্ণুঃ স ভাস্করঃ। সৌম্যা তু পুনরেবাস্য আপো জ্যোতীর্ষি চন্দ্রমাঃ।।৭/১৭০/৮৮।* শিবের যে ঘোর রূপ সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে অগ্নি, বিষ্ণু, সূর্য আর তাঁর সৌম্য রূপ থেকে আসছে জল, গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্রমা। আল বেরুনি একজন মুসলিম ঐতিহাসিকের খুব ইচ্ছে হয়েছিল ভারতীয়দের চিন্তাভাবনা কি রকম জানার। তিনি মূলতঃ দর্শন আর জ্যোতিষ শাস্ত্রের ছাত্র ছিলেন। দশম শতাব্দীতে তিনি Al Biruni’s India নামে খুব নামকরা একটা বই লিখেছিলেন। ভারতের ধর্ম ও দর্শনের ব্যাপারে তিনি খুব প্রভাবিত হয়েছিলেন আবার কিছু কিছু ব্যাপারে বিরক্তিও প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন, হিন্দুদের একটা সমস্যা হল অমূর্ত কিছু দেখলে প্রথমেই তাকে একটা শরীর দিয়ে দেবে। শরীর দেওয়ার পর কিছু দিন পর একটা

মেয়ে জোগার করে তার একটা বিয়ে দিয়ে দেবে। বিয়ে দেওয়ার পর তাকে একটা সন্তানও দিয়ে দেবে। যেমন চন্দ্রমা, চন্দ্রমা একটা নক্ষত্র কিন্তু তাকে একটা প্রথমে শরীর দিয়ে দিল। এবার চন্দ্রমাকে বিয়ে দিতে হবে, যার তার সঙ্গে তো চন্দ্রমার বিয়ে দেওয়া যাবে না। তখন দিশা, দিশা হল দিক পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ, দিশা একটা অমূর্ত রূপ, একে একটা শরীর দিয়ে মেয়ে বানিয়ে দিয়ে চন্দ্রমার সাথে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল। চন্দ্রমা আর দিকের যখন বিয়ে হয়ে গেল তখন তাদের একটা সন্তান হতে হবে। সন্তানও সাধারণ কেউ হবে না, সন্তান হল বুধ। বুধও নৈর্ব্যক্তিক কিন্তু তাকে একটা ব্যক্তি রূপ দিয়ে দেওয়া হল। আবার ধর্ম, ধর্মও নৈর্ব্যক্তিক রূপ, তাকেও একটা শরীর দিয়ে যমরাজ বানিয়ে দেওয়া হল, তার আবার একটা বউ জোগার করে দেবে তার কন্যা হবে। যা কিছু নৈর্ব্যক্তিক ও অমূর্ত রূপ আছে সবাইকে একটা করে শরীর দিয়ে দেবে। বাতাস, যার কোন আকার নেই, শুধু যে তাকে শরীর দিয়ে দিল তাই নয় তাকে আবার উপপঞ্চাশটা শরীর দিয়ে দিল। হিন্দুদের এটা এক বিরাট সমস্যা। এখানেও শিবকে প্রথমে দুটো শরীর দিয়ে দিল, তার একটা শরীর থেকে আবার বেরিয়ে এল অগ্নি, বিষ্ণু আর সূর্য, এরা হয়ে গেলেন বেদের দেবতা। আর দ্বিতীয় শরীর থেকে বেরিয়ে এল জল, গ্রহ নক্ষত্র আর চন্দ্রমা, চন্দ্রমা আবার বেদের কোন দেবতা নয়। বৈদিক আর অবৈদিক এই দুটোকে সমন্বয় করে দিলেন।

এরপর ব্যাসদেব বলছেন *বেদাঃ সাক্ষোপনিষদঃ পুরানাধ্যাত্মনিষ্ঠয়াঃ। যদত্র পরমং গুহ্যং স বৈ দেবো মহেশ্বরঃ।।৭/১৭০/৮৯।* বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ, পুরান, অধ্যাত্ম শাস্ত্রে যত রকম সিদ্ধান্ত হয় সব হলেন ভগবান শিব। শিবই সাক্ষাৎ এই সব কিছু হয়েছেন, তিনিই বেদ হয়েছেন, তিনিই উপনিষদ হয়েছেন ইত্যাদি। সর্বভূতের তিনি ঈশ্বর সেইজন্য তাঁর নাম মহেশ্বর। এইভাবে নানান রূপে বহু রূপে পুরো বিশ্ব জুড়ে তিনি ব্যপ্ত হয়ে আছেন। ভগবান শিব কাশীধামে সর্বদা শাশানভূমিতে নিবাস করেন, সেইজন্য তাঁর একটা নাম বীরস্থানেশ্বর। যত রকমের পশু আছে তিনি তাদের অধিপতি সেই হেতু তাঁর নাম পশুপতি। ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব, অঙ্গরার উর্দ্ধলোকে যে লিঙ্গ বিগ্রহ আছে তাঁর পূজা করেন। যখন ঐ লিঙ্গের পূজা হয় তখন শিব খুশী হন। শিবলিঙ্গ হল প্রতীক। লিঙ্গের যখন পূজা করা হয় তখন সেই ইষ্টের প্রতীককেই পূজা করা হয়। বিদেশীরা লিঙ্গের অনুবাদ ঠিক ভাবে না করার জন্য আমাদের দেশের লোকেরাও লিঙ্গ সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা করে। অলিঙ্গ মানে যার কোন চিহ্ন নেই। কপালে চন্দন বা ভস্মের ফোঁটা দেখে বোঝা যায় সে কোন সম্প্রদায়ের। তুমি শৈব না বৈষ্ণব ভক্ত, না শাক্ত, না রামানুজ, কোন সম্প্রদায়ের, তোমার কি লিঙ্গ, মানে তুমি কি ছাপ লাগিয়েছ। যদি কিছু না লাগায় তাহলে হয়ে যায় অলিঙ্গ। আগেকার দিনে যাঁরা পরমহংস সন্ন্যাসী হতেন তাঁরাই কোন চিহ্ন লাগাতেন না, বাকি সবাই চিহ্ন লাগাত। আমার ইনি ইষ্ট দেবতা, যেমন ইষ্ট দেবতা তেমন চিহ্ন লাগাতেন। যে পাথর স্থাপন করে পূজা করা হয় সেটা শিবের প্রতীক। ঠিক তেমনি কামাখ্যাতে যে যোনির পূজা করা হয় সেটা আসলে প্রকৃতির প্রতীক, এই প্রকৃতি থেকে সব কিছু বেরিয়েছে, একেই বলা হয় মহাযোনি। কামাখ্যাতে সেই প্রকৃতিকে পূজা করা হচ্ছে যে প্রকৃতি থেকে সব কিছু বেরিয়েছে। কিছু কিছু বিদেশী পণ্ডিতরা এগুলোকে ভুল ব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে। এইসব বলে ব্যাসদেব অর্জুনকে বলছেন *গচ্ছ যুধ্যস্ব কৌন্তেয় ন তবাস্তি পরাজয়ঃ। যস্য মন্ত্রা চ গোপ্তা চ পার্শ্বতস্তে জনার্দনঃ।।৭/১৭০/১২২।* ‘আমি তোমাকে সব বলে দিলাম। এবার যাও যুদ্ধ কর, তোমার পরাজয় হবে না। কারণ স্বয়ং জনার্দন তোমার মন্ত্রী ও রক্ষক রূপে পাশে সর্বদা বিদ্যমান’। এখানে এসে দ্রোণপর্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে। দ্রোণাচার্য মারা যাবার পর কর্ণ কৌরবদের প্রধান সেনাপতি হয়েছেন। এই অধ্যায়ের নাম কর্ণপর্ব।

## কর্ণপর্ব

### জীবনে সাফল্যের জন্য চারটে গুণ

দ্রোণাচার্যকে যেভাবে বধ করা হয়েছে স্বাভাবিক ভাবে চারিদিকে খুব বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। একদিকে ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর খবর পেয়ে খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। মূল্যবোধের ব্যাপারে আমরা কিন্তু সবাই খুব সচেতন, কোন জিনিষটা করা ভালো, কোন জিনিষ করতে নেই এই ব্যাপারে মোটামুটি সবাই সজাগ কিন্তু তা সত্ত্বেও মূল্যবোধ থেকে সরে এসে আমরা ভুল কাজটাই করে বসি। এগুলো সব থেকে ভালো বোঝা যায় যখন মানুষ রেগে যায়। রেগে গেলে তার ভেতরের সব চুনোপুটি বেরিয়ে আসে। মহাভারতের যুদ্ধের মধ্যে এই জিনিষগুলো সব থেকে বেশী লক্ষ্য করা যায়। এখানে এসে বোঝা যায় এনাদের মূল্যবোধটা কি রকম ছিল। ধৃতরাষ্ট্র শুনছেন দ্রোণাচার্য মারা গেছেন। শুনে বললেন ‘দেখো সঞ্জয়! অর্জুন তো বিরাট রাজার যুদ্ধে আমাদের সবাইকেই একা হারিয়ে দিয়েছিল। আর এখানে তো অর্জুন আর একা নেই, শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা পাশে থেকে অর্জুনকে রক্ষা করছেন। এই অবস্থাতে আমাদের সৈন্যরা যে এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এতেই বলা যায় যে আমাদের সৈন্যরা নিন্দার পাত্র নয়’। ধৃতরাষ্ট্র তখন সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করছেন দ্রোণাচার্য মারা যাবার

পর কি হল আমাকে বল। সঞ্জয় বলছে ‘হে রাজন্! কর্ণ দুর্যোধনকে বলছেন যন্তো দৃঢ়শ্চ দক্ষশ্চ ধৃতিমানর্জুনঃ সদা। সংবোধয়তি চাপ্যেনং যথাকালমধোক্ষজঃ। ৮/২৫/৯। অর্জুন খুব সংযত ও সাবধান লোক। যুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে রেগে গিয়ে যে কিছু করে বসবে সেই স্বভাব অর্জুনের মধ্যে নেই। এছাড়া অর্জুন সব ব্যাপারেই দৃঢ়, মানে ধৃতি আছে আর তার সাথে খুব চতুর’। এই কটি গুণ যার মধ্যে থাকবে তার সাফল্য আসবেই, সাবধানকে এখানে সংস্কৃতে বলছেন যন্তঃ, যতি থেকে এসেছে, যতি মানে যারা যোগী তারা যখন ধ্যান করেন মনকে একটুও এদিকে ওদিকে যেতে দেন না। দ্বিতীয় গুণ দৃঢ়, যখন যেটা ঠিক করে নিল করব তখন সেটাই করবে। তৃতীয় গুণ দক্ষঃ, নিপুণ, কর্মে কুশল। চতুর্থ ধৃতিমান, যার মধ্যে লেগে থাকার ক্ষমতা আছে। এই চারটে গুণ (সাবধান, দৃঢ়, দক্ষ ও ধৃতি) যার মধ্যে থাকবে সে সব কাজেই সফল হবে। কর্ণ বলছেন ‘এই গুণগুলো তো অর্জুনের মধ্যে আছেই আর তার উপর শ্রীকৃষ্ণ থেকে থেকেই অর্জুনকে কর্তব্য ও অকর্তব্যের জ্ঞান দিয়ে সব রকম কাজে প্রেরিত করতে থাকেন’। ব্যাসদেব এই শ্লোকগুলোর মাধ্যমে খুব কৌশল করে মানুষের জীবনশৈলী কি রকম হবে দেখিয়ে দিচ্ছেন, জীবনে যদি সফল হতে চাও তাহলে এই চারটে গুণকে অর্জন করতে হবে আর তার সঙ্গে গুরুর কৃপাকে সাথে নিতে হবে। সদগুরুর সঙ্গ যদি থাকে বা ভালো লোকের সঙ্গ করলে তিনি থেকে থেকে সাবধান করে দেবেন। কর্ণ বলছেন ‘দেখো দুর্যোধন! শ্রীকৃষ্ণ এমন কায়দা করল যাতে শক্তি অস্ত্রটা আমার হাতে থেকে বেরিয়ে যায়, আর ঠিক সেটাই করিয়ে ছাড়লেন। ঠিক আছে তাতে আমার কোন অনুতাপ নেই, শক্তি অস্ত্র ছাড়াই আমি কাল অর্জুনকে দেখে নেব’।

কর্ণের কথাগুলো সঞ্জয়ের মুখ থেকে শোনার পর ধৃতরাষ্ট্র আবার সঞ্জয়কে বলছেন ‘সঞ্জয়! সেই যে দ্যুত ক্রীড়া হয়েছিল, কিভাবে পাণ্ডবদের এমনকি দ্রৌপদীকেও অপমান করা হয়েছিল, তার ফল এত দিনে আমরা পেতে শুরু করেছি। এত দিন ধরে আমরা যে পাণ্ডবদের এত দুঃখ কষ্ট দিয়েছি সেগুলো এখন শূল হয়ে আমাদের বিধছে। দুর্যোধন তখন শকুনি আর কর্ণকে বিরাট নীতিজ্ঞ মনে করেছিল, মনে করেছিল এরা দুজন আমাকে ঠিক ঠিক পরামর্শ দিচ্ছে, আর আজ দেখ তার কি ফল দুর্যোধনকে পেতে হচ্ছে’! ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে সঞ্জয় বলছে ‘হে রাজন্! যখন দ্যুত ক্রীড়া হচ্ছিল তখন আপনাকেও তো অনেক সাবধান করা হয়েছিল, সেই সময় আপনিও তো কারুর কথায় কর্ণপাত করেননি। তখন তো আপনি উল্টো কথাই বলছিলেন – এই যা খেলা হচ্ছে এতো ধর্ম পথেই হচ্ছে দুর্যোধনরা ভুলতো কিছু করছে না। আপনি একটা কথা মনে রাখবেন যদি কোন মানুষ অতীতের কথা মনে রাখে তাহলে তার বর্তমানের সিদ্ধি অবশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে’। এগুলো মহাভারতের অত্যন্ত মূল্যবান নীতিকথা। একে বলা হয় পশ্চাৎচিন্তা, সেখান থেকে এসেছে পশ্চাৎতাপ, যেটা হয়ে গেছে সেটাকে নিয়ে অনুশোচনা করা। আমি অনেক দিন আগে একটা কোন ভুল কাজ করেছিলাম, কিন্তু এখনও সেই ভুল কাজের চিন্তাটা আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, এই চিন্তাটা তখন একটাই কাজ করে, বর্তমানে আমার যে সিদ্ধিটা হওয়ার কথা সেটাকে নাশ করে দেয়। পশ্চাৎতাপের এই ক্ষমতা। আগে যেটা হয়ে গেছে পরে সেটাকে নিয়ে চিন্তা করে শরীরের যে তাপ সৃষ্টি হয় সেই তাপকে বলছে পশ্চাৎতাপ। এই তাপটা এখন যেটা ভালো হবার কথা সেটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, সেইজন্য কখনই পশ্চাৎতাপ করতে নেই। যেটা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, এখানেই শেষ, পরে আর টেনে আনতে নেই। সেইজন্য সঞ্জয় একবারও বলবে না যে কেন আপনারা দ্যুত ক্রীড়া করতে গেলেন, খেলেছিলেন খেলা হয়েছে এখানেই খেলা শেষ। সঞ্জয় তখন ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন ‘কর্ণ তখন দুর্যোধনকে বলল অর্জুন যতই লাফালাফি করুক আমি কিন্তু ঠিক ওকে পিটিয়ে দেব। তবে যদি আমারও একজন ভালো সারথি থাকে তাহলে অর্জুনকে শায়েস্তা করতে আমার বেশীক্ষণ লাগবে না’। কর্ণের সারথি কে হবে? শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ সারথি হতে পারেন একমাত্র শল্য।

### কর্ণের রথের সারথির ভূমিকায় শল্য

শল্য একজন রাজা। এক দিকে নকুল সহদেবের মামা, পাণ্ডুর স্ত্রী মাদ্রীর দাদা অন্য দিকে তিনি মদ্র দেশের রাজা, যদিও শল্যের এখন অনেক বয়স হয়ে গেছে। পাঞ্জাবের উত্তরাঞ্চল আর কাশ্মীর দক্ষিণাংশ মদ্র দেশ। শুধু যে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে শত্রুকে কাবু করা যাবে তা নয়, সারথিরও সেখানে একটা বিরাট ভূমিকা থাকে। সারথির উপর অনেক কিছু নির্ভর করত। এখন যে যুদ্ধ হবে এখানে সারথির ভূমিকাটা ঠিক ঠিক বোঝা যাবে। দুর্যোধনকে এখন বলা হল আপনি শল্যকে বলুন কর্ণের সারথি হবার জন্য। দুর্যোধন এখন রাজা, রাজা বলে সবাই তার অধীনে, সে যাকে যা বলবে তাকে সেটাই পালন করতে হবে। শল্যকে তখন বলা হল আপনি যদি দয়া করে কর্ণের রথের সারথির দায়িত্বটা সামলান। কর্ণের সারথি হওয়ার কথা শুনতেই শল্য প্রচণ্ড অপমানিত হয়ে রেগে গিয়ে দুর্যোধনকে বলছেন ‘দুর্যোধন! তুমি আমাকে কর্ণের সারথি হতে বলে অপমান করেছ। আমি একজন রাজা, কর্ণও রাজা হতে পারে কিন্তু সে একজন সূত পুত্র। সে একজন সারথির



ছেলে, তার সারথি হতে তুমি আমাকে অনুরোধ করছ! শুধু তাই না, তুমি কর্ণকে মনে করছ আমার থেকে শ্রেষ্ঠ তাই তুমি কর্ণকে সেনাপতি করে আমাকে তার সারথি বানাচ্ছ। পরে কিন্তু তাই হল। কর্ণ মারা যাওয়ার পর শল্যকেই সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করতে হয়েছিল, এত বড় যোদ্ধা তিনি ছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণও তো একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। কর্ণের কিন্তু স্থির বিশ্বাস শল্য যদি আমার রথ না চালায় তাহলে এই যুদ্ধ জয় করা যাবে না। আগেকার দিনের রাজারা কত কিছু জানতেন ভাবলে অবাক লাগে, একাধারে তীর চালাতে জানতেন, গদা চালাতে পারতেন তার সাথে রথ চালাতেও সুদক্ষ ছিলেন। সব কিছু তখনকার যোদ্ধাদের জানতে হত। শল্য পরিষ্কার বলে দিলেন ‘এই সারথির কাজ আমি করতে পারবো না, আমাকে যদি না পোষায় তাহলে আমি চললাম, আমি আর যুদ্ধে নেই’।

সব কথা বলে শল্যও আবার বোঝালেন আদিম কাল থেকে বিভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন কর্ম আগে থাকতেই কিভাবে ঠিক করা থাকে। ‘কিন্তু আমি এই কাজ করতে পারিনা, একেবারেই এই কাজ করা চলে না’। শল্যের এই মনোভাব দেখে দুর্যোধন দেখল সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল। শুধু যে কর্ণের সারথিই হচ্ছেন না তা নয়, এত বড় যোদ্ধা শল্যও যুদ্ধ ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন। তখন দুর্যোধন বলছে ‘আপনাকে আমরা ছোট করতে চাইছি না, আমি তো এই কৃষ্ণ থেকে আপনাকে সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। আপনি যা যজ্ঞ-যাগ করেছেন সেটাও তার থেকে বেশী, আপনার মধ্যে যে গুণগুলো আছে সেটাও তার থেকে বেশী। কর্ণতো অর্জুন থেকে অস্ত্রবিদ্যা থেকে বড় আর আপনি অস্ত্রবিদ্যা আর অস্ত্রবিদ্যা দুটোতেই শ্রেষ্ঠ’। যার থেকে কাজ আদায় করতে হবে তাকে মিষ্টি মিষ্টি কথা আর তার প্রশংসাই করতে হয়। শল্য তখন বলছেন ‘দুর্যোধন তুমি যে এত সৈন্যের মধ্যে আমাকে কৃষ্ণ থেকে শ্রেষ্ঠ বললে তাতে আমার মনটা একটু নরম হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে আমি কর্ণের সারথিই হব। কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে, আমি যখন যেমন খুশী কথা বলতে থাকব তাতে কর্ণ বা অন্য কেউ আপত্তি করতে পারবে না। যদি আপত্তি করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি রথ ছেড়ে বেরিয়ে যাব’। এখানে একটা কথা বলে দেওয়া দরকার। যুধিষ্ঠির যুদ্ধের আগেই শল্যকে বলে রেখেছিল ‘মামা! যেদিন ঠিক ঠিক যুদ্ধ হবে তখন কৌরবরা আপনাকে কর্ণের সারথি করতে চাইবে। আপনি তখন কথা বলে বলে কর্ণকে রাগিয়ে দেবেন যাতে তার শক্তিটা হ্রাস হয়ে যায়’। মানুষ যখন রেগে যায় তখন তার শক্তিটা কমে যায়। আমরা মনে করি রেগে গেলে তার শক্তি বেড়ে যায়। বেড়ে যায় ঠিকই, দ্রোণাচার্য যখন রেগে গিয়েছিলেন তখন প্রচুর সৈন্য ক্ষয় করছিলেন কিন্তু বিবেক শক্তিটা হারিয়ে গিয়েছিল। দ্রোণ মারা গেলেন একমাত্র এই কারণেই। একটু যদি বিবেক শক্তি থাকত তাহলে তিনি চিন্তা করলেই বুঝতে পারতেন যে অশ্বত্থামা মারা যেতে পারেনা, তিনি রেগে গিয়েছিলেন কিনা তাই তাঁর বিবেক শক্তিটাও হারিয়ে গিয়েছিল। যুধিষ্ঠিরও আগে থাকতেই মামা শল্যকে বলে রেখেছিল আপনার একটাই কাজ কর্ণকে কথা বলে রাগিয়ে দিতে হবে। রেগে গেলে তার একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যাবে তখন কর্ণকে হারিয়ে দেওয়াটা সহজ হয়ে যাবে।

ভগবান বুদ্ধের জীবনে খুব সুন্দর একটি গল্প আছে। ভগবান বুদ্ধ একবার এক ব্রাহ্মণ বাড়িতে ভিক্ষা করতে গিয়ে একটি রাতের জন্য আশ্রয় চেয়েছেন। ব্রাহ্মণ বলছেন আমার বাড়িতে একটা ভয়ঙ্কর বিষধর কাল সাপ আছে, তাই এখানে কেউ থাকতে পারেনা। ভগবান বুদ্ধ কিন্তু তাও থাকতে রাজী হয়ে গেলেন। রাত্রিবেলা ভগবান বুদ্ধ ধ্যানে বসে গেছেন। মাঝ রাত্রে তিনি শুনতে পাচ্ছেন ঘরের মধ্যে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ হচ্ছে। চোখ খুলে দেখেন এক কাল সাপ ঘরের মধ্যে এসে ফোঁস ফোঁস করছে। তিনি একেবারে নির্বিকার শান্ত, কোন বিকার তাঁর মধ্যে নেই। ঠাণ্ডা বলে ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালান আছে। রাগের চোটে নাগটা ছটফট করে চলেছে। ভগবান বুদ্ধ কাল নাগকে বলছেন ‘তুমি এত রাগ কর কেন’। তাতে সে আরও রেগে গেছে। কাল নাগ যত রেগে যাচ্ছে ভগবান বুদ্ধ তত শান্ত হয়ে আছেন। ভগবান যত ঠাণ্ডা হচ্ছেন সাপ তত রেগে উঠছে। শেষ পর্যন্ত রাগের তেজে ওর গায়ে আগুন লেগে গেছে আর সেই আগুনেই সাপটা পুড়ে মরে গেল। সকাল হতেই ব্রাহ্মণ ঘরে ঢুকে দেখেন ভগবান বুদ্ধ ধ্যানে মগ্ন। ব্রাহ্মণ খোঁজ নিচ্ছেন সাপটার কি হল। দেখেন সাপটা মরে পড়ে আছে। সেইজন্য কখন রাগকে উঠতে দিতে নেই। শত্রুকে যদি দুর্বল করে দিতে হয় তাহলে তাকে কোন ভাবে রাগিয়ে দিতে হবে। রাগ এসে গেলেই তার বিবেক হারিয়ে যাবে। মহাভারত কতগুলো ভাবকে আমাদের সামনে নিয়ে আসছে। ভাবকে সরাসরি বলে দিলে লোকে বুঝতে পারবে না, তাই একটা আখ্যায়িকার মাধ্যমে ভাব গুলিকে তুলে ধরা হচ্ছে। তুমি যদি রাগ দ্বেষ কর তাহলে তোমার জীবন সঙ্কুচিত হয়ে যাবে, এই ভাবটাকেই নানান ভাবে আখ্যায়িকার মাধ্যমে বলা হল।

শল্যের শর্তে কর্ণ রাজী হয়ে গেছে। এদিকে দুর্যোধনও কর্ণকে বলে দিল ‘তুমিও শল্যকে একটু প্রশংসা বাক্য দ্বারা খুশি রাখবে’। কর্ণও তখন খুব করে শল্যের প্রশংসা করেছে। শল্যকে কর্ণ বলছে ‘ভগবান শিব আর শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনের ভালোর জন্য সব রকম ভাবে উঠে পড়ে লেগে আছেন, আপনিও ঠিক সেই ভাবে আমার হিতের জন্য উঠে পড়ে

লেগে থাকুন’। শল্য তখন বলছেন *আত্মনিন্দাত্পূজা চ পরনিন্দা পরস্তবঃ। অনাচারিতমার্য্যাণাং বৃত্তমেতচ্চতুর্বিধম্।* ৮/২৯/৪৫। ‘চারটে জিনিষ মহাপুরুষরা কখন করেন না – নিজের নিন্দা, নিজের প্রশংসা, পরের নিন্দা আর পরের স্তুতি’। শল্যের প্রশংসা করছে বলে কর্ণকে শুনিতে দিলেন, ‘আপনার মত লোক হয় না, আপনার মত ক্ষমতা কারুর নেই, এই ধরণের কথা কক্ষণ বলবে না। ঠিক তেমনি নিজের নিন্দা আর নিজের প্রশংসা অপরের কাছে করতে নেই। কিন্তু তুমি যে কথাগুলো আমাকে বলেছ ভুল কিছু বলোনি। অশ্ব সঞ্চালনে আমি একমাত্র ইন্দ্রের সারথি মাতলির সমান’। মানুষকে প্রশংসা করে ফুলিয়ে দেওয়া খুবই সহজ। কাজ যদি আদায় করতে হয় তাহলে তাকে একটু তুলে দিলেই হবে। ভীষ্ম দশ দিন, দ্রোণাচার্য পাঁচ দিন, কর্ণ আড়াই দিন আর শল্য অর্ধেক দিনের জন্য সেনাপতি হয়েছিলেন, মোট আঠারো দিনের যুদ্ধ। এই আড়াই দিন শল্য বেশীর ভাগ সময় কর্ণকে শুধু নিন্দাই করে গেছেন।

যুদ্ধ শুরু হয়েছে। কর্ণ খুব দস্ত সহকারে বলছে ‘অর্জুনকে যে কেউ সাহায্য করতে আসুক না কেন আমি একাই অর্জুনকে পিটিয়ে দেব’। শল্য তখন বলছেন *বিরম বিরম কর্ণ কথনাদতিরভসোহতি চাপ্যযুক্তবাক্।* ৯ চ *হি নরবরো ধনঞ্জয়ঃ ক্ব পুনরহো পুরুষাধমো ভবান্।* ৮/৩০/৩৪। দেখো কর্ণ! তুমি অত বড় বড় কথা বল না। আত্মশ্লাঘা থেকে তুমি বিরত হও। অর্জুন হলেন নরবর, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর তুমি সেখানে কোথায়? নরাদম, তুমি কি কখন অর্জুনের সঙ্গে একা যুদ্ধ করে পারবে! তুমি একটা কথা জেনে রাখ দেবতারাও যদি যুদ্ধে নেমে পড়ে তারাও অর্জুনকে হারাতে পারবে না’। অর্জুনের প্রশংসা করতেই কর্ণ খুব রেগে গেছে ‘আপনি বড় বেশী কথা বলছেন, এত কথার কি আছে অর্জুন আমার মুখোমুখি হলেই দেখতে পারবেন কে নরবর’। শল্যও খুব উত্তেজিত হয়ে গেছে। এদিকে কর্ণ সবার সামনে চিৎকার করে বলছে ‘কেউ আমাকে দেখিয়ে দিক অর্জুন কোথায় আছে। যে আমাকে দেখিয়ে দেবে অর্জুন কোথায় যুদ্ধ করছে তাকে আমি বিশেষ পুরস্কার দেব’। কি দেবে কর্ণ? যে যত টাকা চাইবে তত টাকা দেব, যে রত্ন চাইবে তাকে রত্ন দেব, যে চাইবে একেকটি রথে অশ্বরদের মত সুন্দরীরা বসে থাকবে এই রকম যত রথ চাইবে তত রথ আমি তাকে দিয়ে দেব, এই ভাবে এক এক করে অনেক পুরস্কারের কথা বলে যাচ্ছে। কর্ণের পুরস্কারের কথা বলতে অনেকগুলো শ্লোক ব্যয় করে দিয়েছেন। আসলে শ্রীকৃষ্ণ খুব কায়দা করে অর্জুনকে কর্ণ থেকে একটু দূরে দূরে রাখছিলেন। কিন্তু সৈন্য সংখ্যাতো ক্রমশ কমে আসছে, আর আড়াল করে রাখা যাবে না, অর্জুনকে সামনে নিয়ে আসতেই হবে। কর্ণের পুরস্কার ঘোষণার কথা শুনে শল্য তখন হেসে বলছেন ‘তুমি অত চেষ্টাচ্ছ কেন, আর অত টাকা কেন খরচ করতে যাবে, আজকে এমনতেই তুমি অর্জুনকে দেখতে পাবে, তোমাকে অত চেষ্টায়ে পুরস্কারের কথা বলতে হবে না’। কাহিনীকে একটু রসাল করার জন্য এই ধরণের স্যাটিয়ারস নিয়ে আসা হয়। শল্য তখন বলছেন ‘কর্ণ! তুমি অত না চেষ্টায়ে বরং আগে একটা ভালো করে ব্যুহ রচনা কর আর তার মাঝখানে তুমি নিজেকে সুরক্ষিত করে অবস্থান কর তা নাহলে তোমার প্রাণ যাবে’। কর্ণ এতে আরও তেতে উঠেছে। শল্য বলেই চলেছেন ‘কর্ণ! যখন তোমার শরীরে এসে অর্জুনের বাণগুলো বিধ্বংস থাকবে তখন তুমি পশ্চাৎতাপ করবে কেন আমি বললাম অর্জুনকে দেখিয়ে দিতে। *মহামেঘং মহাঘোরং দদূরঃ প্রতিনর্দসি। বাণতোয়প্রদং লোকে নরপর্জন্যমর্জুনম্।* ৮/৩১/৫২। যখন বড় বড় মেঘের গর্জন হয় তখন মাটির গর্ত থেকে কোলা ব্যঙও মেঘের গর্জনের উত্তরে ডাক ছাড়ে। অর্জুনের হুঙ্কারের কাছে তোমার এই আশ্ফালন ঐ কোল ব্যঙের ডাকের মত’। এগুলো না পড়লে বোঝা যায় না কাব্য সাহিত্য আমাদের কত উন্নত ছিল। যেখানে একটা যুদ্ধের বর্ণনা চলছে সেখানে নিয়ে এলেন মেঘের গর্জনের উত্তরে কোলা ব্যঙের ডাক ছাড়াকে। কথামতে ঠিক এই ধরণের তুলনা পাওয়া যায়। ঠাকুর টাকা থাকলে কি রকম অহঙ্কার হয় বলতে গিয়ে বলছেন একটা কোলা ব্যঙের একটা টাকা ছিল, একদিন একটা হাতি ব্যঙের গর্ত ডিঙিয়ে যাবার পর হাতিকে লাথি দেখিয়ে ব্যঙ বলছে ‘তোমার এত দুঃসাহস আমার বাসাকে ডিঙিয়ে যাস’। কর্ণকে শল্য বলছেন *যাবদগাণ্ডীবনির্ঘোষং ন শৃণোসি মহাহবে। তান্বেব ত্বয়া কর্ণ শক্যং বজ্রং যথেষ্টসি।। রথশব্দধনুঃশব্দৈর্নাদয়ন্তং দিশো দশ। নর্দন্তমিব শাদূলং দৃষ্ট্বা ক্রোষ্ঠা ভবিষ্যসি।* ৮/৩১/৫৭-৫৮। ‘তুমি এখনও অর্জুনের গাণ্ডীবের টঙ্কার শোননি, যতক্ষণ অর্জুনের রথের শব্দ আর গাণ্ডীবের টঙ্কার না শুনছ ততক্ষণই তোমার এই তর্জন গর্জন। গাণ্ডীবের আওয়াজ শুনলেই তোমার এই আওয়াজ শেয়ালের হুঙ্কা হয় হয়ে যাবে’।

### কর্ণ ও শল্যের মধ্যে বাকযুদ্ধ

শল্যের মুখ থেকে এইসব কথা শোনার পর কর্ণ আর নিজের রাগকে বশে রাখতে পারল না। কর্ণ অঙ্গ দেশের রাজা, অঙ্গ দেশ মোটামুটি যতটা জানা যায় ভাগলপুরের কাছাকাছি, আর শল্য হলেন মদ্র দেশের রাজা। মদ্র দেশ

পাঞ্জাবের উত্তরে, সেইদিক থেকে মদ্র দেশ কুরুক্ষেত্রের কাছাকাছি। এখন কর্ণ আর শল্যের মধ্যে নিজেদের আঞ্চলিকতা নিয়ে বাকযুদ্ধ লেগে গেছে। কর্ণ মদ্র দেশের লোকদের নিয়ে খুব গালাগাল দিতে শুরু করেছে। এমন নোংরা নোংরা গালাগাল দিচ্ছে যে ছাপার অক্ষরে লেখা দূরে থাক আমরা মুখেও আনতে পারব না। মদ্র দেশের মেয়েদের নিয়ে, তাদের সাজপোশাক, ব্যবহার নিয়ে বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেতাই ভাবে গালাগাল দিচ্ছে। ইদানিং কালের কোন হিন্দী সিনেমাও এই ধরনের বর্ণনার ধারে কাছে দাঁড়াতে পারবে না। মদ্র দেশের মেয়েরা মদ্র খেয়ে কি কি করে শুনলে আমাদের মাথাও গুলিয়ে যাবে। আজ থেকে চার হাজার বছর আগেও যে মেয়েরা এই ধরনের নোংরা আচরণ করতে পারত ভাবলে আজকের দিনের মেয়েরাও লজ্জায় মুখ লুকোবে। কর্ণের এইসব নোংরা নোংরা কথা শোনার পর শল্য কিছুটা দমে গেছে। কয়েকটা মজার মজার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কর্ণ রেগেমেগে বলছে ‘দেখুন, আপনি তখন থেকে আমাকে অপমান করে যাচ্ছেন। এই দেখুন, আমার কাছে এই বাণগুলো আছে, অনেক বছর ধরে এগুলোকে চন্দনের গুঁড়ো দিয়ে রেখেছি। এই বাণ দিয়ে আমি অর্জুনকে মারব। এই বাণের এমন শক্তি যে পাহাড়কেও ছেঁদা করে দিতে পারে। আর আমাদের অঙ্গদেশে স্ত্রী, বাচ্চা, যারা খেলাধুলো করে, যারা স্বাধ্যায় করছে তারা মদ্র দেশের লোকেদের নামে কি কথা বলে খুব মন দিয়ে আপনি শুনুন’। শল্যকে মদ্র দেশের লোকেদের নামে বলছে অথচ শল্য ঐ দেশেরই রাজা। ‘মদ্র দেশের লোকেরা সব সময় মিত্রদ্রোহি হয়, ওদের বন্ধুত্ব বলে কিছু নেই। মদ্র দেশের লোকেরা অত্যন্ত অধম মানুষ আর তাদের ব্যবহার খুবই সন্ধীর্ণ। নাপি বৈরং ন সৌহাদং মদ্রকেণ সমাচরেৎ। মদ্রকে সঙ্গতং নাস্তি মদ্রকো হি সদামলঃ। ৮/৩২/২৯। মদ্রদেশের লোকেদের সাথে বন্ধুত্বও রাখতে নেই শত্রুতাও রাখতে নেই। কারণ মদ্রদেশের লোকদের সাথে কখনই মিলন হতে পারে না, কেন না মদ্রদেশীয়রা সব সময় পাপীই হয়’। এই কথাগুলো কর্ণ বলছে না, জনগণের মধ্যে এগুলো প্রচলিত, সবাই মদ্রদেশের লোকেদের নামে এই মন্তব্য করে। কর্ণ বলছে ‘অথর্ব বেদে একটা মন্ত্র আছে যেখানে বলছে যদি বিছে কামড়ায় তখন এই মন্ত্র বললে বিছের বিষ নেমে যায়’। আমাদের জানা নেই আদৌ এই মন্ত্র অথর্ব বেদে আছে কিনা, থাকতেও পারে। তবে অথর্ব বেদে এই ধরনের অনেক মন্ত্র আছে, সাপে কামড়ালে, কোন পশু, পাখি কামড়ালে সেই মন্ত্র পাঠ করলে বিষটা নাশ হয়ে যায়। কর্ণ বলছেন *আথর্বণেন মন্ত্রেণ যথা শান্তিঃ কৃতা ময়া। ইতি বৃশ্চিকদষ্টস্য বিষবেগহতস্য চ।। ৮/৩২/৩৩।* ‘ঐ মন্ত্রে বলছে হে বিছে! মদ্রবাসীর কাছে টাকা-পয়সা রাখলে যেমন নষ্ট হয়ে যায়, শৌচ আচার তাদের কাছে গেলে যেমন নষ্ট হয়ে যায়, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যেমন তাদের কাছে গেলে নষ্ট হয়ে যায় ঠিক তেমনি এই যে আমি মন্ত্র পাঠ করলাম তাতে তোমার বিষের প্রভাব নষ্ট হয়ে যাক’। কর্ণ বলছেন এই মন্ত্র বেদেই আছে, কর্ণ বলছেন মানে ব্যাসদেবই বলছেন, তার মানে বেদে আছে। কর্ণ বলছে ‘যারা বড় বড় নামকরা বৈদ্য তারা এই মন্ত্র দিয়ে বিছের বিষকে নষ্ট করেন’। এরপর একের পর এক শ্লোক ধরে মদ্র দেশের মেয়েদের নামে যাচ্ছেতাই ভাবে বলে যাচ্ছে। দেখাচ্ছে সেখানকার মেয়েরা নিজেদের নারী স্বাধীনতার নামে কত রকমের স্বৈচ্ছাচারীতা করে। মদ্র দেশের নামে নিন্দা করে কর্ণ শল্যকে বলছে ‘আপনার কথাগুলো শুনে মনে হচ্ছে পাণ্ডবরা জেনে বুঝেই আপনাকে আমাদের কাছে ঠেলে দিয়েছে যাতে আমাদের দুর্বলতাগুলো জেনে নিয়ে আমাদের নাশ করতে পারেন। এরপর আর একটি কথাও যদি বলেন তাহলে এই গদা দিয়ে আগে আপনার মাথাটা ফাটিয়ে দেব। দুর্যোধনকে আমি কথা দিয়েছি আর আমারও নিন্দা হবে বলে এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম, কিন্তু এরপর আর আমি সহ্য করব না, আর একটা কথা যদি বলেন তাহলে আগে আপনাকেই আমি শেষ করব।

কর্ণের এত কথা শোনার পরও কিন্তু শল্য থামেননি। শল্য তখন পাল্টা কর্ণের অঙ্গ দেশের নামে বলতে শুরু করেছেন। ‘শোন কর্ণ! তোমাকে আমি একটা কাক আর হাঁসের গল্প বলছি’। এই গল্পটা খুব নামকরা গল্প, এই গল্পটাকে পরের দিকে জৈনরা ও বৌদ্ধরাও নিয়েছে। সমুদ্রের ধারে এক শেঠজী থাকত। তার ছেলেরা তাদের উচ্ছিষ্ট খাবার দিয়ে একটা কাককে ভরণপোষণ করত। বৈশ্য পুত্রদের উচ্ছিষ্ট খাবার খেয়ে খেয়ে কাকটা গর্বিত হয়ে উঠেছে আর অন্য পাখিদের অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করেছে। একদিন সেই সমুদ্রের কাছ দিয়ে অনেক উপর দিয়ে আকাশের কোল ঘেঁসে কতকগুলি হাঁস নিশ্চিন্তে শান্ত চিন্তে উড়ে যাচ্ছিল। শেঠজীর ছেলেরা হাঁসের দিকে লক্ষ্য করে কাকটাকে বলছে পাখিদের মধ্যে তোমার মত কেউ নেই। ছেলেদের কথায় উচ্ছিষ্টভোজী আর অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন কাক হাঁসেদের অবজ্ঞা করে বলছে ‘এসো আমার সাথে আকাশে উড়ে দেখাও কে কত রকমের ওড়া জানে’। হাঁসেদের মধ্যে একজন তখন বলছে ‘দেখো আমরা হলাম মানস সরোবরবাসী হাঁস, আর অনায়াসে আমরা সমস্ত ভূমণ্ডলে সঞ্চরণ করে থাকি। আমরা বহু দূর গমন করে থাকি বলে সমস্ত পক্ষিকুল আমাদের অত্যন্ত সম্মান ও সৎকার করে থাকে। সুতরাং তুমি একটা নিকৃষ্ট কাক হয়ে আমাদের কি করে তোমার সাথে ওড়ার সঙ্কল্প করছ’। কিন্তু কাকটা কিছুতেই ছাড়বে না, নানা রকম কুটুক্তি করে হাঁসেদের অবজ্ঞা করে যাচ্ছে। কাকটা তখন নিজের কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। আমি একশ এক রকমের ওড়া জানি তুমি কত

রকম ভাবে উড়তে পার? হাঁস বলছে ‘আমরা তো ভাই অত রকমের ওড়া জানিনা, এই এক রকমের ওড়াই জানি, এই ভাবেই সারা ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে থাকি’। বিশ্বের অনেক গল্প উপন্যাসে পাখিদের নানা রকমের ওড়া নিয়ে অনেক কিছু বলা হয়, এ্যারোপ্লেনের ফাইটার প্লেন গুলোর ওড়া নিয়েও অনেক বর্ণনা দেওয়া হয় কিন্তু এখানে নাম দিয়েই পাখিদের একশ এক রকমের ওড়ার ভঙ্গির কথা বলা হচ্ছে। যেমন উড্ডীনম, অবডীনম, ডীন শব্দটা পাখির ডানা থেকে এসেছে। এ্যভিয়েশান মন্ত্রীকে বাংলায় বলে উড্ডয়ণ মন্ত্রী। শ্লোকে বলছে উড্ডীনমবডীনঞ্চ প্রডীনং ডীনমেব চ। নিডীনমথ সংডীনং সংডীনং তির্যগ্‌ডীনগতানি চ।। বিডীনং পরিডীনঞ্চ পরাডীনং সুডীনকম্। অতিডীনং মহাডীনং খডীনং পরিডীনকম্। ৮/৩৩/২৬-২৭। এক ডীন নিয়ে কত রকমের ওড়ার কথা বলা হচ্ছে। অবডীনং সুডীনঞ্চ সংডীনং ডীনডীনকম্। সংডীনোডীনডীনঞ্চ পুনডীনাবডীনকম্। ৮/৩৩/২৮। ডীন ডীন করেই যাচ্ছেন। প্রথম বলছেন উড্ডীনং মানে উঁচুর দিকে যাওয়া, অবডীনং নীচে নামা, প্রডীনং চারিদিকে ঘুরপাক খাওয়া, ডীন সোজা উড়ে যাওয়া, নিডীনং খুব ধীরে ধীরে উড়ে যাওয়া, সংডীনং একটা ছন্দে উড়ছে, তির্যকডীনং ব্যাঁকা যাওয়া। কাকের ওড়া লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কাকের মুখটা হয়তো বাঁদিকে রয়েছে কিন্তু উড়ছে ডানদিকে। শালিখ পাখিও এই ধরনের ওড়ে কিন্তু কাক বেশি এইভাবে ওড়ে। মশাও অনেক রকম ভাবে উড়তে পারে, মারতে গেলে বেকে উড়ে যায়। বিডীনং হল অপরের ওড়াকে নকল করা, পরাডীনং, পেছনের দিকে ওড়া, মশাকে মারতে গেলে পেছনের দিকে উড়ে চলে যায়, এই রকম অনেক রকমের ওড়ার বর্ণনা করা হচ্ছে, অতিডীনং ডানা না নেড়ে উড়ে যাওয়া। গরমের সময় ঠাণ্ডা বাতাস সব সময় নীচের দিকে নেমে আসে আর গরম বাতাস ওপরের দিকে চলে যায়, পাখিদের শরীর এত স্পর্শকাতর যে ওরা ধরতে পারে এই জায়গার বাতাস নীচের দিকে যাচ্ছে আর এই জায়গার বাতাস ওপরের দিকে যাচ্ছে। এটাকে বলে থার্মাল, পাখিরা থার্মালটাকে ধরে নেয়। থার্মাল একটা জায়গায় সিলিগারের মত হয়ে থাকে সেখান দিয়ে গরম বাতাস উপরের দিকে যেতে থাকে। পাখিরা যখন থার্মালের কাছে চলে আসে তখন ওদের শরীর এত হাল্কা যে ডানা বন্ধ থাকলেও থার্মালের জন্য উপরের দিকে চলে আসে।

কাক বলছে আজকে আমার শক্তি দেখাব। হাঁসদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ হাঁস এগিয়ে এসে বলছে দেখো ভাই তুমি তো একশ এক রকমের ওড়া জান কিন্তু আমি তো ভাই একটাই জানি, তা যখন বলছ চল। প্রতিযোগিতা যখন হবে তখন অনেক দূর পর্যন্ত উড়তে হবে। এবার এদের দুজনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। হাঁস তো এক রকমের ওড়াই জানে সে নিজের ওড়ার ছন্দে চলেছে। আর কাক চলার সময় নানা রকমের কায়দা দেখাতে শুরু করেছে। আর সব কাকেরা সমুদ্রের তীর থেকে কা কা করে খুব উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে উড়তে উড়তে সমুদ্রের অনেক ভেতরে চলে এসেছে, সমুদ্রের তীরে যারা ছিল তারা অনেক দূরে সরে গেছে তাদের আর দেখা যাচ্ছে না। অনেক দূর চলে এসেছে, কাকতো খুব কায়দা দেখাতে দেখাতে আসছে। কিন্তু কাকের ডানার তো আর হাঁসদের ডানার মত শক্তি নেই। কিছুক্ষণ পরে কাকের শক্তি শেষ হয়ে এসেছে, কাক আর উড়তে পারছে না। কাক এবার উপর থেকে পড়তে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে এখন গিয়ে সমুদ্রের জলে গোত্তা খাচ্ছে, গোত্তা খেয়ে আবার একটু উড়ছে, আবার গোত্তা খাচ্ছে। হাঁসটা কিছুক্ষণ পর ভাবছে কাকটাকে তো দেখছি না, কোথায় গেল কাকটা। পেছনে ফিরে দেখে কাকটা অনেক পেছনে পড়ে আছে আর মাঝে মাঝে সমুদ্রের জলে গোত্তা মারছে। হাঁসটা তখন কাকের কাছে ফিরে গিয়ে বলছে ‘ভাই! তুমি তো আমাদের একশ এক রকমের ওড়ার কথা বলেছ, কিন্তু এটা আবার কি ধরনের উড়ছ, এই কায়দাটাতো তোমার তালিকায় দাওনি যে থেকে থেকে জল খেয়ে উড়তে হয়, এই একশ দু নম্বর ওড়ার কথা তুমি আগে বলনি। বহুনি পতিতানি ত্বমাচক্ষাণো মুহুর্মুহ। পাতস্য ব্যাহরংশ্চদং ন নো গুহ্যং প্রভাষসে। ৮/৩৩/৫২। তুমি বারবার অনেক রকম ওড়ার কথা বললে কিন্তু এই গোপনীয় রহস্যের ওড়ার কথা তুমি তো একবারও আমাকে বললে না কিং নাম পতিতং কাক যত্বং পত সাম্প্রতম্। জলং স্পৃশাসি পক্ষাভ্যাং তুণ্ডেন চ পুনঃ পুনঃ। ৮/৩৩/৫৩। এই যে তুমি ওড়ার সময় বারবার ডানা আর চঞ্চু দিয়ে জলকে স্পর্শ করছ এই ধরনের ওড়া যে জান সেই কথাতো তুমি আগে আমাকে বলনি’।

কাক তখন বলছে ‘আরে আরে তুমি একি বলছ! অপরের উচ্ছিষ্ট খেয়ে খেয়ে আমার মাথাটা একেবারেই গোলমাল হয়ে গেছে। আমার খুব ভুল হয়ে গেছে। তোমার সাথে প্রতিযোগিতা করাতো এখন দূরের কথা, আমার ফিরে যাওয়াটাও সুদূর পরাহত। আমার প্রাণই এখন বাঁচবে না’। কাক খুব সুন্দর একটা কথা বলছে বয়ং কাকাঃ কৃতা নাম চরামঃ কাকরাবাসিকাঃ। হংস প্রাণৈঃ প্রপদ্যে ত্বামুদকান্তং নয়স্ব মাম্। ৮/৩৩/৫৭। হে হংস! বিধাতা আমাদের কাকপক্ষি রূপে সৃষ্টি করেছেন। আমরা কাকেরা বেকার সারাদিন কা কা করতেই থাকি, আমরা আর কি উড়বো ভাই,

আমার প্রাণ ভিক্ষা নিয়ে তোমার শরণে এলাম, ভাই তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমাকে কিনারায় নিয়ে চল’। হাঁস এতক্ষণে সব ব্যাপার বুঝে গেছে। হাঁস খুব মজা করে বলছে ‘কেন এই কথা বলছ! তুমি তো একশ এক রকমের ওড়ার কথা বলছিলে, তার একটা অন্তত মনে করে দেখো যেটা এখন কাজে লেগে যেতে পারে’। হাঁস মজা করছে দেখে কাক বলছে ‘ভাই! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার বন্ধুদের মিথ্যা প্রশংসায় আমি নিজেকে গরুড় বলে মনে করছিলাম, আমার এখন শিক্ষা হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমার করে আমার প্রাণটাকে বাঁচাও’। কাক যখন বেহুঁশ হয়ে পড়তে শুরু করেছে তখন হাঁস পায়ের নখ দিয়ে কাকটাকে ধরে ওপরের উড়ে গেছে। অনেকটা ওপরে উঠে কাককে পা থেকে ছেড়ে দিয়ে ডাইভ মেরে কাকের তলায় এসে নিজের কাঁধে বসিয়ে নিয়েছে। এইভাবে কাককে কাঁধে করে সমুদ্রের পারে ফিরে এসেছে। এইভাবে কাকের অহংকারটা চূর্ণ হল। এই গল্পটাকে যখন অন্যান্য কাহিনীর মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে তখন সেখানে আবার অন্য ভাবে শেষ করা হচ্ছে। সেখানে বলা হচ্ছে কাককে ঐভাবে কাঁধে করে নিয়ে আসার পর কাক অন্য কাকদের বলছে ‘হাঁস হেরে গিয়ে আমাকে বলল ভাই তোমার সঙ্গে পারব না, সেইজন্য আমাকে তার কাঁধে বসিয়ে ফেরত দিয়ে গেছে’। কিন্তু মহাভারতে এই অংশটা নেই, কাহিনী ওখানেই শেষ। কাক আর হাঁসের গল্প বলে শল্য কর্ণকে বলছেন ‘দেখো কর্ণ! দুর্যোধনের ঐঠো অন্ন খেয়ে খেয়ে তোমারও কাকের মত অবস্থা হয়ে গেছে। এখনও সময় আছে, অর্জুন হল সেই হাঁস, তুমি অর্জুনের শরণাপন্ন হয়ে যাও তাহলে তুমি কিন্তু বেঁচে যাবে’।

কর্ণের মনের মধ্যে একটা ব্যাপারে কিন্তু দৃষ্টিস্তা হয়ে চলেছে। এই দৃষ্টিস্তার পেছনেও আরেকটা নামকরা কাহিনী আছে। সংক্ষেপে কাহিনীটা হল, পরশুরামের কাছে কর্ণ গিয়েছিল ব্রহ্মাস্ত্র বিদ্যা শিখতে। পরশুরামের আবার প্রতিজ্ঞা ছিল তিনি কোন ক্ষত্রিয়কে অস্ত্র শিক্ষা দেবেন না, কারণ তিনি ক্ষত্রিয়দের বিরোধী ছিলেন। কর্ণ নিজেকে ব্রাহ্মণ সন্তান পরিচয় দেওয়াতে পরশুরাম তাকে অস্ত্র শিক্ষা দিয়ে দিলেন। একদিন পরশুরাম কর্ণের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সেই সময় একটা বিষাক্ত পোকা কর্ণের পায়ের মধ্যে কামড়াতে শুরু করেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই কর্ণের পা দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে, কর্ণ নড়ছেন না, নড়লে গুরুতর ঘুম ভেঙে যাবে। পোকাটাও ক্রমশ কর্ণের পায়ের চামড়াকে ভেদ করে ভেতরে ঢুকে মাংস খুঁবলাতে শুরু করে দিয়েছে। প্রচুর রক্ত বেরিয়েই যাচ্ছে। কর্ণ এমনতে প্রচণ্ড শক্তিশালী ছিল, কর্ণ সহ্য করে যাচ্ছে। হঠাৎ পরশুরামের ঘুম ভেঙে গেছে। তিনি দেখছেন জায়গাটা কেমন ভেজা ভেজা লাগছে। ভেজা কেন? দেখছেন জায়গাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কোথা থেকে এই রক্ত আসছে? তখন দেখছেন কর্ণের পা থেকে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে। কেন রক্ত বেরোচ্ছে? কর্ণ বলল পোকা এসে কেটেছে। প্রথমে পরশুরাম খুব খুশী হলেন গুরু ভক্তি দেখে। তারপরেই তিনি কর্ণকে বলছেন ‘কোন ব্রাহ্মণ সন্তানের এত শক্তি নেই যে এই তীব্র কষ্টে সে চুপ করে থাকবে আর চোঁচাবে না। তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান হতেই পারনা। সত্যি করে বল তুমি ক্ষত্রিয় কিনা, তা নাহলে আমি তোমাকে অভিশাপ দিয়ে দেব’। কর্ণ ভয় পেয়ে খুব ঘাবড়ে গিয়ে বলে দিয়েছে আমার নাম কর্ণ আমি ক্ষত্রিয় বংশের। পরশুরাম তো শুনেই খুব রেগে গেছেন, কারণ ব্রহ্মাস্ত্র যেটা শেখানোর ছিল তাতে শিখিয়ে দিয়েছেন। পরশুরাম তখন বলছেন ‘ঠিক আছে, আমি অভিশাপ দিচ্ছি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের সময় তুমি এর মন্ত্রটা ভুলে যাবে’। এগুলো সব আখ্যায়িকা, আসলে কর্ণ রেগে গিয়েছিল বলেই ভুলে গিয়েছিল। আরেকবার কর্ণ শব্দভেদী বাণ মারার অর্থাৎ শব্দ শুনে সন্ধান করা অনুশীলন করছিল। ঐ সময় ভুলবশতঃ শব্দভেদী বাণ একটা গরুকে মেরে দিয়েছে। গরুটা ছিল আবার এক ব্রাহ্মণের। ব্রাহ্মণ দেখলেন কর্ণ আমার গরুটাকে মেরে দিয়েছে, ব্রাহ্মণও রেগে গিয়ে কর্ণকে অভিশাপ দিয়েছে। আমার গরুটা পাঁকের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, সেই অবস্থায় তুমি একে বাণ দিয়ে মেরে দিলে, তোমারও এই একই অবস্থা হবে। তুমি যখন এই রকম পাঁকের মধ্যে গিয়ে পড়বে তখন তোমারও মৃত্যু হবে। কর্ণ অনেক করে ক্ষমা চাইল, কিন্তু ব্রাহ্মণ বলে দিল ক্ষমাটামা কিছু হবে না, আমি যেটা বলে দিয়েছি সেটাই হবে। এখন কর্ণের এই ঘটনাগুলো যত মনে পড়ছে ততই মনটা চঞ্চল হয়ে যাচ্ছে।

শল্য আর কর্ণের ঝগড়া এখনও শেষ হয়নি, কর্ণ আবার কি একটা বলে শল্যকে গালাগাল দিয়েছে। শেষে শল্য খুব নরম হয়ে বলছেন ‘দেখো ভালো লোক খারাপ লোক সব জায়গাতেই থাকে, তা মদ্র দেশেও ভালো খারাপ লোক যেমন আছে তোমার অঙ্গ দেশেও ভালো খারাপ সব রকম লোকই মিলিয়ে মিশিয়ে আছে, এই নিয়ে আর ঝগড়া করার দরকার নেই, চল আমরা আমাদের এই ঝগড়ার একটা মিটমাট করে নিই’। দুর্যোধনও দেখছিল এরা দুজনে ঝগড়া করেই চলেছে, ঝগড়া থামছেই না। তখন দুর্যোধন এসে হাতজোড় করে একবার একে ঠাণ্ডা করছে আরেকবার তাকে ঠাণ্ডা করে দুজনকে বলছে আপনার এবার যুদ্ধের দিকে নজর দিন। এরপর দুজনে যুদ্ধের দিকে এগোতে শুরু করলেন।

### অর্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ধিক্কার, অর্জুনের যুধিষ্ঠির বধের উদ্যোগ এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে নিবারণ

শল্য এখন কর্ণের রথ চালাচ্ছেন তাই কর্ণের মধ্যেও খুব জোশ এসে গেছে। প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে নেমে পড়েছেন। কর্ণ এবার সবাইকে খুব মারতে শুরু করে দিয়েছে। কুন্তীকে কথা দিয়েছিল যে তার লড়াইটা অর্জুনের সাথে তাই একে একে নকুল সহদেবকে হারিয়ে দিয়েছে, ভীমকেও হারিয়ে দিয়েছে। ভীমের মত যোদ্ধা কর্ণের কাছে হেরে গিয়ে খুব লজ্জায় পড়ে গেছে। যুধিষ্ঠিরকেও হারিয়ে দিয়ে একেবারে বাগ পেয়ে গিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির হল রাজা, রাজাকে কোন রকমে একবার বন্দী করে নিতে পারলে খেলা শেষ। কিন্তু এইসব ব্যাপারে কর্ণের একেবারেই আগ্রহ নেই, কর্ণ চাইছে অর্জুনকে, অর্জুনকে লড়াইতে না মারা পর্যন্ত কোন জয়ই তার কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে না। যুধিষ্ঠির কর্ণের হাতে এমন মার খেয়েছেন যে তিনি সোজা সেখান থেকে পালিয়ে নিজের শিবিরে চলে গেছেন। যুদ্ধে নিয়ম করা হয়েছিল যে পালিয়ে যাচ্ছে তাকে আর বধ করা যাবে না। শিবিরে সব রানীরাও ছিলেন, দ্রৌপদীও সেখানে ছিল। সবাই যুধিষ্ঠিরকে গুশ্রুশা করতে থাকল। সেদিন যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক ছিল নকুল আর সহদেব। নকুল ও সহদেব এরাও বড় যোদ্ধা, কিন্তু কর্ণ এদের সবাইকে হারিয়ে দিয়ে খুব মার মেরেছে। সবাই মার খেয়ে শিবিরে পালিয়ে এসেছে। এই খবরটা আবার চলে গেছে শ্রীকৃষ্ণের কাছে। অর্জুন যেই শুনল যুধিষ্ঠিরের এই অবস্থা, তক্ষুণি যুদ্ধভূমি ছেড়ে তাড়াতাড়ি শিবিরে চলে এসেছে দাদার খোঁজ নিতে। যুধিষ্ঠির একেই ঐভাবে মার খেয়ে এসেছেন তার ওপর হঠাৎ অর্জুনকে শিবিরে দেখতে পেয়ে ভাবছে অর্জুন নিশ্চয়ই কর্ণকে হারিয়ে দিয়ে আমাকে খবর দিতে এসেছে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করছেন ‘তুমি কি কর্ণকে হারিয়ে দিয়ে এসেছ’? অর্জুন বলছেন ‘কই নাতো’! শুনেই যুধিষ্ঠির প্রচণ্ড রেগে বলতে শুরু করেছেন ‘তুমিই যুদ্ধের আগে কত পণ করেছিল, এই করে দেব সেই করে দেব। কিন্তু কর্ণের বিরুদ্ধে তুমি কিছুই করতে পারলে না। কর্ণকে বধ করার শক্তি যদি তুমি নাই রাখ তাহলে তোমার এই গাণ্ডীব অন্য কাউকে দিয়ে দাও। তোমার এই গাণ্ডীব ধিক্কার, যার জন্য তুমি এতদিন লাফাচ্ছিলে’। একেই হেরে গেছেন তার ওপর ঐ মার খেয়ে এসেছেন তাতেই যুধিষ্ঠিরের মাথাটা গেছে খারাপ হয়ে। মানুষ যদি শারীরিক ভাবে কখন কারুর কাছে লাজ্জিত হয় তখন তার বুদ্ধি ঠিক থাকে না।

যুধিষ্ঠিরের ঐ কথা শুনে অর্জুনও প্রচণ্ড রেগে গেছেন। কারণ অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল অর্জুনের আশ্রিতকে আর তাঁর গাণ্ডীবকে যদি কেউ অপমান করে তাহলে তার শিরশ্ছেদ করে দেবে। অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার বার করে নিয়েছে যুধিষ্ঠিরের মাথাটা কেটে দেবে বলে। যেমনি তলোয়ার তুলেছেন সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ‘আরে! আরে! কি হল! হঠাৎ তলোয়ার কেন তুলছ! এখানে তো কোন যুদ্ধের পরিস্থিতি নেই। কর্ণের সাথে যুদ্ধ করে যুধিষ্ঠির যে বেঁচে আছেন তাতে তো তোমার আনন্দ হওয়া উচিত’। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু বুঝে গেছেন অর্জুন যুধিষ্ঠিরের গলা কাটতে যাচ্ছে। তখন অর্জুন বলছেন ‘আমি পণ করেছি আমার গাণ্ডীবকে যে অপমান করবে আমি তার মুণ্ডু কেটে দেব। এই যে আমি পণ করেছি এখন আমার দাদার মুণ্ডু কেটে দিতে পারলে আমার সেই পণ থেকে মুক্তি পাব। কিন্তু অন্য দিকে দাদার মুণ্ডু যদি আমি কেটে দিই তারপর আমারও আর বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না’। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলছেন *ইদানিং পার্থ জানামি ন বৃদ্ধাঃ সেবিতান্তয়া। অকালে পুরুষব্যাস্র সংরন্তং যদুবানগাৎ। ৮/৫১/১৫*। ‘অর্জুন তুমি গুরুজনদের সেবা করোনি তাই ভুল জায়গায় তোমার ক্রোধ এসে যায়’। গুরুজনদের যারা সেবা করে না তাদের নিজেদের মনের বিভিন্ন আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। মনের বিভিন্ন ধর্মের উপর কার নিয়ন্ত্রণ থাকে? যারা গুরুজনদের সেবা করেছে। ক্রোধ মনের একটা ধর্ম। যুদ্ধের সময় তোমার ক্রোধকে নিয়ে আসছ সেটা কোন দোষের নয় কিন্তু রাজমহলে এসে যুধিষ্ঠিরের উপর ক্রোধ করছ তার মানে তোমার ক্রোধের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, কারণ তুমি গুরুজনের সেবা করনি। গুরুজনের সেবা করা থাকলে তোমার এই দূরবস্থা হত না। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *অকার্য্যাণাং ক্রিয়াণাঞ্চ সংযোগং যঃ করোতি বৈ। কার্য্যাণামক্রিয়াণাঞ্চ স পার্থ পুরুষাধমঃ। ৮/৫১/১৬*। ‘যে করার যোগ্য হলেও অসাধ্য কাজ করে আর সাধ্য হলেও নিষিদ্ধ রূপ কার্য করে সেই লোকই অধম পুরুষ’। যেমন একজন রেলের সাধারণ কর্মচারী যদি বলে আমাকে রেলের জেনারেল ম্যানেজার হতে হবে। কিন্তু একজন কর্মচারী কখনই জেনারেল ম্যানেজার পদে যেতে পারবে না, কারণ একটা বিশেষ ক্যাডার থেকে জেনারেল পদে নিয়োগ করা হয়, সেই ক্যাডারের যোগ্যতা এই সাধারণ কর্মচারীর নেই। কিন্তু তাও যদি সে বলতে থাকে আমি রেলমন্ত্রী খুব কাছের লোক তাকে ধরে আমি জেনারেল ম্যানেজারের পদটা পেয়ে যাব বা যদি বলে আমি এই যজ্ঞ করব যাতে জেনারেল পদে যেতে পারি। রেলের জেনারেল পদে যাওয়াটা তার সাধ্য নয়, তার হওয়ার কথাও নয়। এটা কারা করে? অধম পুরুষরা করে। আর সাধ্য কিন্তু নিষিদ্ধ, যেমন মদ খেয়ে রাষ্ট্রায় মাতলাম আমি করতেই পারি কিন্তু এটা নিষিদ্ধ। এই

দুটো যারা করে তারা অধম। আবার একটা কাজ করার অনুমতি আমার আছে কিন্তু আমার পক্ষে কাজটা অসাধ্য। এই কাজের পেছনে ছোটটাও অধম পুরুষরাই করে। জানি আমার দ্বারা এই কাজটা হবে না, অথচ ঐ কাজের পেছনে আমার মনটাকে লাগিয়ে রেখেছি। শ্রীকৃষ্ণ আবার বলছেন ‘কর্তব্য অকর্তব্যের জ্ঞান শাস্ত্র থেকে হয়, তুমি শাস্ত্র পড়নি, শাস্ত্র তুমি জাননা। সেইজন্য তুমি বুঝতে পারছ না তুমি কি করতে যাচ্ছ। তুমি যে জিনিষটা করতে যাচ্ছ এতে যে হিংসা হচ্ছে সেই বোধও তোমার নেই’। এই কথা বলার পর শ্রীকৃষ্ণ খুব মূল্যবান একটা কথা বলছেন *প্রাণিনামবধস্তাত সর্বজ্যায়ান্ মতো মম। অন্তাতং বা বদেদ্বাচং ন তু হিংস্যাৎ কথঞ্চন।* ৮/৫১/২২। ‘প্রাণির হিংসা না করাটা শ্রেষ্ঠতমো ধর্ম। কারুর প্রাণ রক্ষার জন্য যদি মিথ্যে কথা বলতে হয় তাও বলবে। কিন্তু হিংসা কখনই করবে না’। আমাদের ধর্মের মূল থিম হচ্ছে অহিংসা পরমো ধর্ম। যে যাই বলুক সত্য সাধন এটা হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম নয়, শুধু হিন্দুদেরই নয় কারুরই ধর্ম নয়, অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, অহিংসা পরমো ধর্ম। তাহলে মহাভারতের যুদ্ধটাকে আমরা কি বলব? মহাভারতের যুদ্ধটা হিংসার মধ্যে পড়ে না। যাঁরা হিংসা আর অহিংসাকে ব্যাখ্যা করছেন তাঁরাই বলে দিচ্ছেন যারা আততায়ী তাদেরকে মেরে দাও, এটা তখন হিংসার মধ্যে পড়বে না। আরও আছে, একজনকে মেরে যদি দশ জনকে বাঁচান যায় তখন সেই মারাটাকেও অনুমতি দিয়ে দেয়।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন কোন কোন অবস্থায় মিথ্যে কথা বললে পাপ লাগবে না – *বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে। বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেত পঞ্চগনতান্যহুরপাতকানি।* ৮/৫১/৩৩। ছেলে বা মেয়ের বিয়ের কথা চলছে তখন মেয়ের বাবা যেমন বলে আমার মেয়ে দেখতে খুব সুন্দর, আমার ছেলে এত আয় করে, এটাকে দোষের মধ্যে ধরা হয় না। রতিকালে, যখন একজন পুরুষ একজন নারীকে ভালোবাসছে তখন সে বলতেই পারে তোমার মত সুন্দরী কেউ নেই, তার প্রশংসা করে যত খুশী মিথ্যে কথা বলা যায় তাতে দোষ হয় না। কারুর প্রাণ রক্ষার্তে বা নিজেকে বাঁচাবার জন্য যদি মিথ্যে কথা বলতে হয় তখনও তাতে কোন পাপ লাগে না। আবার বলছেন যারা ব্রাহ্মণ, ভালো লোক তাদের ভালোর জন্য কিছু করতে গিয়ে যদি মিথ্যে কথা বলতে হয় তখনও কোন দোষ লাগে না। কারুর সর্বস্ব অপহরণ হয়ে যাচ্ছে, সেই সময় একটা মিথ্যে কথা বলে দিলে যদি তার সম্পত্তি রক্ষা পেয়ে যায় তখন সেই মিথ্যে কথাতে তার কোন পাপ লাগে না। শ্রীমা ঠাকুরকে মিথ্যে কথা বলে খাওয়াচ্ছেন। তখন শ্রীমাও বলছেন বাচ্চা ও রুগীকে যদি মিথ্যে কথা বলে খাওয়ান হয় তাতে দোষ হয় না।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ দুটো কাহিনী বলছেন। বলাক নামে এক ব্যাধ একবার একটা অন্ধ মৃগকে মেরে দিয়েছিল। তাতে ব্যাধের কোন পাপ লাগেনি, কারণ অন্ধ মৃগের এত কষ্ট হচ্ছিল যার জন্য ব্যাধ মৃগটাকে মেরে দিয়েছিল। গান্ধীজীর জীবনে এই ধরনের ঘটনা আছে। গান্ধীজীর আশ্রমে একটা বাছুরের কি একটা অসুখ হয়েছিল তখন গান্ধীজী বলে দিলেন বাছুরটাকে মেরে ফেলতে। এই নিয়ে আবার গান্ধীজীর অনেক সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজী পরিস্কার, বাছুরটা এত কষ্ট পাচ্ছে তার চেয়ে বরং ওকে মেরে ফেল। কৌশিক মুনি নিজেকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। একজন পথিককে ডাকাতরা তাড়া করতেই পথিক কৌশিক মুনির আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিল। ডাকাতরা এসে কৌশিক মুনিকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি সত্যি কথা বলবেন বলে পথিককে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ডাকাতরা পথিককে মেরে দিয়েছিল বলে তার পাপটা কৌশিক মুনিরও লাগল। শ্রীকৃষ্ণ সত্য কথার উপর অনেক কথাই বলছেন ‘যদি দেখ সত্য কথা বললে অনেক ঝামেলা হয়ে যেতে পারে তাহলে মৌন থেকে যাও। যদি মৌন না থাকা যায় তাহলে যদি মিথ্যে কথা বললে তাতে কারুর প্রাণ বেঁচে যাবে কারুর অপহরণ হওয়া আটকান যাবে তাহলে পরিস্কার মিথ্যে কথা বলে দাও’।

অর্জুনের এখন সমস্যা হয়ে গেছে, একদিকে তাঁর পণ আছে, যে তাঁর গান্ধীবের অপমান করবে তাকে তিনি বধ করে দেবেন অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন দাদাকে বধ করা খুব অন্যায় কাজ। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলছেন *যদা মানং লভতে মাননাস্তদা স বৈ জীবতি জীবলোকে। যদাবমানং লভতে মহান্তং তদা জীবন্যুত ইত্যাচ্যতে সঃ।* ৮/৫১/৭৯। মানী লোক যখন সম্মান লাভ করেন তখনই তিনি জীবিত থাকেন, আর তিনি যখন গুরুতর অপমানিত বোধ করেন তখন তাঁকে জীবন্যুত বলা হয়। আমাদের শাস্ত্রে বিধান আছে যদি গুরুজনকে ‘তুই’ বলে সম্বোধন করে অপমানজনক কথা বলে দেওয়া হয় তখন সেটা গুরুজনকে হত্যার সমতুল্য বলে গণ্য করা হয়। তাহলে তোমার কথা থেকে গেল। আর তুমি যদি এমনি বধ করে দাও তাহলে সেটা অধর্ম হয়ে যাবে। অন্য দিকে যদি বধ না কর তাতেও অধর্ম হবে’। ব্যস্, অর্জুন দাদাকে বধ করা থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন। এবার অর্জুন শুরু করলেন যুধিষ্ঠির তুই বলে গালাগাল দিতে। বিরাট লম্বা

সেই গালাগালির তালিকা। আমরা এখানে কয়েকটি উল্লেখ করছি। যে যুধিষ্ঠিরকে এত দিন অর্জুন পা ছুঁয়ে প্রণাম করত আর ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করতেন এখন সেই যুধিষ্ঠিরকে অর্জুন ‘তুই’ বলে গালাগাল দিতে শুরু করেছে। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলছেন ‘লোকেরা বলে ক্ষত্রিয়ের বল তার বাহুতে কিন্তু তোর যত শক্তি জিহ্বাতে। তুই একটা নিষ্ঠুর লোক, তোর ভালোর জন্য আমি শিখণ্ডীকে সামনে রেখে পিতামহ ভীষ্মকে শরশয্যায় শায়িত করলাম। এগুলো আমাদের কেন করতে হয়েছে? কারণ তুই জুয়া খেলাতে আসক্ত বলে আমাদের সবাইকে নিন্দিত কর্ম করতে হচ্ছে। তোর জন্যই আজ আমাদের এত দুঃখ-কষ্ট, জীবনে তোর জন্য যদি একটুও সুখ পেতাম কিন্তু কোন সুখই পেলাম না। যা একটু সুখ পেয়েছি সেটাও আমাদের ক্ষমতার জন্য। আজ তোর জুয়ার প্রতি এই আসক্তির জন্য আমাদের এই দুর্গতি। আজকে যে এত ক্ষত্রিয় সেনা রণভূমিতে মরে পড়ে আছে আর বাকি যারা আছে তাদের কারুর হাত কেটে গেছে কারুর পা কেটে গেছে, চারিদিকে একটা ক্রন্দনের হাহাকারে কুরুক্ষেত্র শাশানে পরিণত হয়েছে এই সব হয়েছে তোর জুয়া খেলার জন্য। আর আজ দ্রৌপদীর বিছানায় বসে বসে বড় বড় ভাষণ দিচ্ছিস’। এইভাবে আরও অনেক কথা বলেই অর্জুন আবার তলোয়ার বার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলছেন ‘আবার কেন তলোয়ার বার করছো?’ অর্জুন বলছে ‘না, দাদাকে এই সব কথা বললাম বলে আমি এবার আমার নিজের গলাটা কেটে দেব। দাদাকে এইভাবে অপমান করলাম এটা বধের সমান আমিও তাই আর এই মুখ নিয়ে বাঁচতে চাইনা’। শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন ‘এসব করার কিছু দরকার হবে না, তুমি যদি আবার দাদার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও তাহলে সব অপরাধ মাফ হয়ে যাবে’। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন আবার যুধিষ্ঠিরের কাছে ক্ষমা চাইলেন।

অর্জুন এইভাবে বলার পর যুধিষ্ঠিরের চোখে জল এসে গেছে। সব শুনে যুধিষ্ঠির বলছেন ‘বুঝতে পারছি আমি অনেক অন্যায় করেছি, আমি সত্যিই একটা পাপী, অপদার্থ। তাই আমি চললাম এখানে থাকার যোগ্যতা আমার নেই। এই যুদ্ধে আমার আর কোন আগ্রহ নেই, আমার রাজ্যও চাইনা, আমি চললাম’। এতক্ষণে যুধিষ্ঠিরের মনে লেগেছে, তাঁর ভাইরা মনে মনে তাঁর সম্বন্ধে কি ভাবছে সেটাও তিনি বুঝে নিলেন। যুধিষ্ঠির বলছেন ‘তোমরা ভীমকে রাজা করে দাও, এই অপমান জনক কথা শোনার পর আমি আর বেঁচে থাকতে চাইনা, আমি চললাম’। এক ভয়ঙ্কর ও সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণকে আবার মধ্যস্থ্য করতে নেমে পড়তে হল। একবার যুধিষ্ঠিরকে বোঝাচ্ছেন আবার অর্জুনকে ডেকে এনে বোঝাচ্ছেন, তারপর সবাইকে একসাথে করে কোন রকমে মিটমাট করালেন। যুধিষ্ঠিরের মনে সারা জীবন এই কষ্টটা ছিল অর্জুন এইভাবে আমাদের অপমান করেছে। একটা সাধারণ জিনিষ থেকে কিভাবে কত কিছু হয়ে যেতে পারে মহাভারত এখানে সেটাও দেখিয়ে দিল।

আবার সবাই যুদ্ধভূমিতে ফিরে গিয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করলেন। অর্জুনও তাঁর রথ নিয়ে এগোচ্ছেন। শল্য আবার কর্ণকে উত্তেজিত করে রাগাবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন ‘দেখো কর্ণ! ঐ অর্জুন এগোচ্ছে। তুমি কিন্তু ভয় পেয়ো না, আমি তোমার পাশে আছি’। থেকে থেকে শল্য কর্ণকে বলেই যাচ্ছে ‘তুমি কিন্তু ভয় পেয়ো না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমি তোমার পাশে আছি’। কর্ণও ততই রেগে যাচ্ছে। সব সময় যে এই রকম করছে তা নয়, মাঝে মাঝে আবার কর্ণকে উৎসাহও দিচ্ছেন। যতই হোক শল্যকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেটাও তাঁর মাথায় আছে। শল্য আর কর্ণের সম্পর্কটা এই যুদ্ধে খুব জটিল।

### ভীমের দুঃশাসন বধ

এই কদিনে সেনা সংখ্যাও খুব কমে গেছে। এই অবস্থায় ভীম আর দুঃশাসন দুজনে মুখোমুখি হয়ে গেছে। ভীম এবার আর দুঃশাসনকে পালাবার সুযোগ না দিয়ে তাকে যুদ্ধে হারিয়ে বধ করে দিয়েছে। বধ করার পর ভীম একটা তলোয়ার নিয়ে দুঃশাসনের মুণ্ডটা কেটে দিয়েছে। গর্দান থেকে যে রক্ত বেরোচ্ছে ভীম দুই হাতের অঞ্জলিতে দুঃশাসনের রক্ত নিয়ে পান করতে শুরু করেছে। আর ঐ অবস্থায় ভীম বলতে শুরু করেছে ‘আমি যে মায়ের দুধ খেয়েছি, মধু আর ঘি খেয়েছি, স্বর্গীয় পানীয়, দুধ আর দই মিশ্রিত উত্তম পেয়দ্রব্য এবং মদ ও অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু রসযুক্ত অন্যান্য যে সকল পানীয় দ্রব্য জগতে আছে সব কিছুর থেকে আমি আজ শ্রেষ্ঠ পেয় পদার্থ দুঃশাসনের রক্ত পান করছি’। অথচ পরের দিকে ধৃতরাষ্ট্র যখন ভীমকে বলছিলেন ‘তুমি দুঃশাসনের রক্ত পান করেছিলে’। ভীমসেন তখন ভয়ে রীতিমত কাঁপছিল। ভয়ে ভয়ে ভীমসেন বলছিল ‘না না, আমি রক্ত পান করিনি, জিহ্বা দিয়ে শুধু স্পর্শ করেছিলাম, কারণ সভায় আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম দুঃশাসনের রক্ত আমি পান করব’। ভীম এখন কতটুকু খেয়েছিল আর আদৌ খেয়েছিল কিনা ভগবান জানেন কিন্তু পরে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বলেছিলেন আমি জিভ দিয়ে শুধু একটু স্পর্শ করেছিলাম। মহাভারতের এখানেও ভীমের রক্তপানের বর্ণনা করা হচ্ছে না, শুধু ভীমের উক্তিটুকু তুলে দেওয়া হয়েছে। ভীম এতদিন ধরে যে রাগটাকে ভেতরে জমিয়ে



রেখেছিল ভীমের এই উজ্জ্বল এসে সেই রাগটা মিটল। এখানেও ভীম তার রাগের বহিঃপ্রকাশটা এইভাবে বলছেন এতদিনে আমি যা খেয়েছি সবার থেকে এই রক্তই শ্রেষ্ঠ। পরের দিকে অনেক মহাভারতে বলা হয়েছে ভীম দুঃশাসনের বুকটা চিরে সেখান থেকে রক্ত নিয়ে পান করেছিলেন, কেননা ভীম সভাতে প্রতিজ্ঞা করেছিল আমি দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান না করা পর্যন্ত জীবনে শান্তি পাব না। অবশ্য মূল মহাভারতে বলা হচ্ছে ভীম দুঃশাসনের মুণ্ডটা তলোয়ার দিয়ে কেটে দিয়েছিলেন।

### অর্জুন আর কর্ণের সমুখ লড়াই ও কর্ণের পতন

এরপর কর্ণ আর অর্জুন শেষ বারের জন্য মুখোমুখি এসে গেছে। মহাভারতে এই জায়গাটাতে বর্ণনা করা হচ্ছে *কার্তবীর্য্যাসমৌ যুদ্ধে তথা দাশরথ্যেঃ সমৌ। বিষ্ণুবীর্য্যাসমৌ চোভৌ তথা ভবমসৌ যুধি।* ৮/৬৪/২৬। যুদ্ধে দুজনেই যেন শ্রীরামচন্দ্র, কার্তবীর্য অর্জুন, বিষ্ণু বা শিব। দুজনই সুরবীর, মহাভারত যখন লেখা হয়েছিল তখন জেনে বুঝেই কর্ণকে একটু ছোট করেই দেখানো হয়েছে, কিন্তু পরের দিকে মহাভারতকে আধার করে যত কাহিনী ও উপন্যাসাদি লেখা হয়েছে সেখানে মহাভারতের এই ঘটনটিকে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলছে যখন কর্ণ আর অর্জুনের যুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন যত রকমের দিব্য প্রাণি ছিল, এমনকি বেদ, উপনিষদ তার সাথে যত উপবেদ ছিল তাঁরাও শরীর ধারণ করে যুদ্ধভূমিতে এসে দেখতে শুরু করেছেন কর্ণ আর অর্জুনের যুদ্ধটা কেমন হচ্ছে। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই অর্জুনের জয় দেখতে চাইছিলেন। *বসবো মরুতঃ সাধ্যা রুদ্রা বিশ্বেশ্বিনৌ তথা। অগ্নিরিন্দ্রশ্চ সোমশ্চ পবনোহথ দিশো দশ।।* *ধনঞ্জয়স্য তে পক্ষে আদিত্যঃ কর্ণতোহভবন্* ৮/৬৪/৪৯। বসুগণ, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, মরুৎ, অগ্নিকুমার, অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু এবং দশ দিক্ এনারা সবাই অর্জুনের পক্ষে গেলেন আর আদিত্যগণ সবাই কর্ণের জয় দেখতে চাইছেন। দেবতাদের মধ্যেও দুটো ভাগ হয়ে গেছে। দেবতারাও আগে থেকে জানতেন না কর্ণ জিতবে না অর্জুন জিতবে। এখানে বিরাট তালিকা দেওয়া হয়েছে। যত রকমের মুনি, চারণ, সিদ্ধ, গরুড়, বেদ, ইতিহাস, পুরান এরা সবাই অর্জুনের পক্ষে অন্য দেবতারা সবাই কর্ণের পক্ষে। আবার বলছেন যত রকমের প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস এরা সব কর্ণের পক্ষে। এখানে দেখানো হচ্ছে জগতে যত রকমের দিব্য প্রাণি আছে সবাই দুটো দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। এদিকে সূর্য এসে বলছেন কর্ণই জিতবে, আবার ইন্দ্র এসে সূর্যকে বলছেন অর্জুনই জিতবে। গ্রীক পুরানে দেবতাদের বর্ণনা আমাদের দেবতাদের মতই করা হয়েছে। গ্রীক পুরানেও যখন কোন যুদ্ধ হয় দেবতারা এসে সেই যুদ্ধ দেখতে থাকেন। গ্রীক কাহিনীতে যত বড় বড় যোদ্ধা আছে তাদের বেশীর ভাগই কোন না কোন দেবতার সন্তান, যেমন কর্ণ সূর্যের, অর্জুন ইন্দ্রের। ওখানে একবার গ্রীক কোন দেবীর সন্তানের সাথে একজনের লড়াই চলছিল, সেও অন্য এক দেবীর সন্তান। দুই দেবীরই খুব ইচ্ছা যে তাঁর সন্তান যেন না হেরে যায়। দুই দেবীর সন্তানের মধ্যে লড়াই চলছে। তারমধ্যে এক দেবীর কি একটা বর ছিল, তিনি সেটা দিয়ে দেবতাদের রাজা জুপিটরকে যুদ্ধভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। এই রকম নানান কাহিনীর মধ্যে দেবতারা জড়িয়ে আছেন। দেবতারা হলেন মানুষেরই আরেকটু উচ্চশ্রেণীর প্রাণি। এখানে সব দিব্য প্রাণিরা উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন কর্ণ অর্জুনের এই যুদ্ধের কি পরণতি হয়। হয়তো বেটিংও চলছিল।

সেই সময় অশ্বখামা আবার শেষ বারের মত দুর্যোধনের কাছে গিয়ে বলছে ‘দুর্যোধন! এখনও সময় আছে এত ক্ষত্রিয়ের প্রাণ সংহার হয়ে গেছে, তুমি এখনও কিন্তু সন্ধি করে নাও। ভীষ্মের পতন হয়ে গেছে, আমার বাবা মারা গেছেন, যা হবার হয়ে গেছে সব ভুলে গিয়ে তুমি সন্ধি করে নাও। এই যুদ্ধে দেখতে তো পারছ কারুরই ভালো কিছু হচ্ছে না, দুপক্ষের লোকই শুধু মারা যাচ্ছে। আমি এখনও যদি তোমার বুড়ো বাবা ধৃতরাষ্ট্র, তোমার মা গান্ধারীর নাম করে যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে বলি সন্ধি করে নিতে সে কিন্তু রাজী হয়ে যাবে, তুমিও আর এই যুদ্ধকে এগোতে দিও না’। কিন্তু দুর্যোধন তো কিছুতেই শুনবে না। দুর্যোধন তখন যুদ্ধের অনেক ঘটনা বলে বলছে ‘এত কাণ্ড যখন হয়ে গেছে এর পর আর সন্ধি হতে পারেনা বিশেষ করে ভীম যেভাবে দুঃশাসনকে বধ করেছে এরপর তো কোন ভাবেই সন্ধি হতে পারেনা। আর তুমি একটু অপেক্ষা কর কর্ণ কিছুক্ষণ পরে অর্জুনকে বধ করে দেবে, কোন চিন্তা নেই’।

এদিকে কর্ণ আর অর্জুনের শেষ লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কর্ণের কাছে একটা মারাত্মক ধরনের বাণ ছিল যাকে বলা হয় সর্পবাণ। যখন খাণ্ডববন দাহন হয় তখন ওর মধ্যে তক্ষকের এক সন্তান অশ্বসেন বেঁচে গিয়েছিল। তক্ষকের এই সন্তান অশ্বসেন মনে মনে ঠিক করেছিল যুদ্ধে অর্জুনকে দংশন করে আমি এর বদলা নেব। এখন অশ্বসেন শরীরটাকে ক্ষুদ্র করে কর্ণের তীরের মধ্যে বসে গিয়েছিল। বাণটা যখন কর্ণ অর্জুনের দিকে মারবে তখন সে অর্জুনকে গিয়ে দংশন করবে।

একবার দংশন করে দিলে আর অর্জুন বাঁচতে পারবে না। সেই বাণটাকে কর্ণ চন্দনের মধ্যে রেখে নানা রকম ভাবে পূজা করেছিল। কর্ণ যখন বাণটা চালিয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ দেখেছেন বাণ যেটা আসছে একটু অন্য রকম মনে হচ্ছে। তিনি তখন হঠাৎ নিজের পায়ের জোরে রথের অগ্রভাগকে খুব জোরে চেপে দিয়েছেন। তিনি ভগবান কিনা তাঁর মধ্যে অনন্ত শক্তি। তিনি চেপে দিতেই রথের সামনের অংশটা মাটিতে বসে গেছে, রথটাও নীচু হয়ে গেছে। এখন বাণ যেটা আসছিল সেটা অর্জুনের মুকুটকে শুদ্ধ নিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেছে। অর্জুন এবারও বেঁচে গেল। অর্জুন বলছেন ‘হে বাসুদেব! আপনি হঠাৎ এটা কি করলেন’। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ‘এই যে বাণটা তোমার মাথাতে লক্ষ্য করে মারা হয়েছিল এই বাণ থেকে তোমার বাঁচার কথা নয়, এই বাণের মধ্যে সাপ বসে আছে। কোন রকমে তোমার গায়েও যদি স্পর্শ করত তাতেই তুমি মারা যেতে। এই বাণ থেকে তোমাকে কোন ভাবেই বাঁচান যেত না। সেইজন্য রথটাকে আমি নীচে দাবিয়ে দিয়েছি’। নাগ যখন দেখল অর্জুন বেঁচে গেছে তখন নাগ আবার কর্ণের কাছে ফিরে গেছে। কর্ণকে গিয়ে বলছে ‘কর্ণ! তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি আছি, তুমি আবার সন্ধান কর’। কর্ণ তখন বলল ‘কি ব্যাপার! আমি তো কিছু জানিনা যে তুমি আমার তীরের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলে’! নাগ সব ব্যাপার বলতে কর্ণ বলছে ‘যদি কোন একটা বাণ দিয়ে আমি একশটা অর্জুনকে মারতে পারি তাও যে বাণ আমার ব্যর্থ হয়ে গেছে সেই বাণ আমি দ্বিতীয়বার চালাব না। আর দ্বিতীয় কথা হল তোমার সাহায্য নিয়ে আমি অর্জুনকে জয় করতে চাই না, আমি আমার শক্তিতেই অর্জুনকে জয় করব’। তখনও কর্ণ নিজের শক্তি ও ক্ষমতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস, কর্ণ আসলে বড় সুরবীর কিনা। নাগ অর্জুনের উপর বদলা নিতে পারছে না বলে খুব রেগে গেছে। কর্ণ তাকে প্রত্যাখ্যান করে দেওয়াতে এবার সে সরাসরি অর্জুনকে আক্রমণ করেছে। অর্জুন দেখছে এটা আবার কোথা থেকে কি আসছে। অর্জুন তখন নাগকে মেরে উড়িয়ে দিয়েছে।

কর্ণ আর অর্জুনের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে চারিদিকে তুমুল লড়াই চলছে, সমস্ত জায়গা রক্তে ভেসে গিয়ে কদমাক্ত হয়ে গেছে। যুদ্ধও শেষের দিকে চলে আসছে। তখন কর্ণ ভাবছে এইবার পরশুরাম তাকে যে অস্ত্রটা শিক্ষা দিয়েছিলেন সেটাকে অর্জুনের উপর সন্ধান করবেন। কিন্তু সন্ধান করতে গিয়ে কিছুতেই মন্ত্রটা তার মনে পড়ছে না। অনেকে এই অস্ত্রটাকে ব্রহ্মাস্ত্র বলে কিন্তু এখানে বলছে ভার্গবাস্ত্র। একই ব্যাপার, সবটাই অমোঘ। এদিকে মন্ত্রটা কিছুতেই মনে পড়ছে না আর ঠিক সেই সময় তার রথের চাকাটাও মাটিতে বসে গেছে। শল্যকে চাকাটাকে তুলতে বলাতে শল্য বলছে ‘আমি এখন ঘোড়া সামলাচ্ছি, আমি কিছুতেই নীচে নামব না, তুমি নীচে যাও আর চাকাটাকে তোল। আমি যদি নামি তো ঘোড়াগুলো পালিয়ে যাবে’। কর্ণ তখন বাধ্য হয়ে রথ থেকে নেমেছে। কর্ণের হাতেতো এখন কোন অস্ত্র নেই কারণ তাকে চাকাটা আগে তুলতে হবে। অর্জুনকে তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ‘দেখো অর্জুন! এটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময়, এখনই কর্ণের উপর তীর চালাও’। রথ থেকে নামার আগে থাকতেই অর্জুন কর্ণকে ক্রমাগত বাণ মেরেই চলেছে, একটুও অবসর দিচ্ছে না কর্ণকে যে অস্ত্র রেখে রথ থেকে নেমে রথের চাকাটা আগে সরাবে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও বলে যাচ্ছেন তুমি একটুও থামবে না, তীর মারতেই থাক। কর্ণ তখন অর্জুনকে বলছে ‘অর্জুন! বাণ মারাটা একটু থামাও আমাকে আগে রথের চাকাটা বার করে নিতে দাও, আমার কপালের দোষে চাকাটা ঠিক এই সময়েই ফেঁসে গেছে’। কর্ণ তখন যুদ্ধের অনেকগুলো নিয়মের কথা উল্লেখ করে বলছে এই এই অবস্থায় যুদ্ধ করা নিষেধ ‘অর্জুন! তুমি এরকম করো না, এই অবস্থায় যদি তুমি আমার উপর বাণ চালাও তাহলে তোমার যে এত সুনাম, এত দিব্যাস্ত্র সব নাশ হয়ে যাবে। একটা কথা তুমি জেনে নাও আমি তোমাকেও ভয় পাইনা আর শ্রীকৃষ্ণকেও ভয় পাইনা কিন্তু আমাকে রথের চাকাটা বার করে নিতে দাও তারপর সমানে সমানে লড়াই হবে’।

শ্রীকৃষ্ণ তখন খুব সুন্দর ভাবে কর্ণকে বলতে লাগলেন ‘দেখো কর্ণ! কি ভাগ্যের কথা তোমার মুখ থেকে এখন ধর্মের কথা বেরোচ্ছে। যারা নীচ প্রকৃতির লোক তারা যখন বিপদে পড়ে তখন তারা দৈবকে নিন্দা করে, এর আগে আগে তারা যে দুষ্কর্ম করেছে সেগুলো ভুলে যায়। তুমি যে এখন ধর্মের কথা বলছ সেটা শুনেও ভালো লাগছে। দেখ কর্ণ! দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি যখন তোমার সমর্থনে একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে এসেছিল তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি চক্রান্ত করে তোমার অনুমোদনে অক্ষকীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে হারিয়ে দিয়েছিল তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? দুর্যোধন যখন তোমার মদতে ভীমকে বিষযুক্ত খাবার খাইয়েছিল তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবতে জতুগৃহে ঘুমন্ত পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার জন্য আগুন লাগিয়েছিলে তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? দুঃশাসন রজঃস্থলা দ্রৌপদীকে টেনে এনে সভার মধ্যে বস্ত্র হরণ করে অপমান করছিল তখন তুমি উপহাস করে বলেছিলে ‘তোমার স্বামীরা এখন নরকে চলে গেছে তুমি অন্য কোন পতিকে বরণ করে নাও’ তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি পাণ্ডবদের ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে রাজ্যলোভে শকুনিকে আশ্রয় করে পাণ্ডবদের দ্যুতক্রীড়ায় ডেকেছিলে তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সব বড় বড় মহারথীদের নিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে অভিমন্যুকে একা চারিদিক থেকে

ঘিরে নৃশংস ভাবে বধ করলে তখন তোমার এই ধর্ম কোথায় ছিল? এর আগে আগে তুমি এত অধর্ম করে এসেছ আর এখন ধর্মের কথা বলে বলে জিভের তালু শুকিয়ে ফেললে কি হবে?’ এইসব কথা শুনে কর্ণের মুখটা একেবারে নীচু হয়ে গেছে। এরপর আর কি বলবে, কিছুই বলার নেই। রথের চাকাও তুলতে হবে, আবার যুদ্ধও করতে হবে। কিন্তু দুটো কাজ তো এক সঙ্গে করা যাবে না। কর্ণ তাই প্রথমে প্রচুর মারাত্মক ধরনের অস্ত্র অর্জুনের দিকে নিক্ষেপ করেই নীচে নেমে রথের চাকা সরাতে লেগে গেল, ভেবেছিল অর্জুন যতক্ষণ তার অস্ত্রকে সামলাবে ততক্ষণে সেই চাকাটা উপরে তুলে দেবে। শ্রীকৃষ্ণ তখনই অর্জুনকে বলে দিলেন ‘অর্জুন! এই সুযোগ, কর্ণ রথে আরোহণ করার আগেই ওর মুণ্ডটা ছেদ করে দাও’। তখন অপরাহ্ন হয়ে এসেছে, শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ পেতেই অর্জুন অঞ্জলিক নামে এক বিশেষ বাণ নিয়ে গাণ্ডীবে রেখে সন্ধান করলেন। গাণ্ডীব থেকে অঞ্জলিক বাণ ছাড়তে সোজা গিয়ে কর্ণের শিরোচ্ছেদ করে দিল। কর্ণের মস্তক ছেদন হতেই চারিদিকে বিরাট সোরগোল হয়ে গেছে। এখানে ব্যাসদেব খুব কাব্যিক বর্ণনা দিচ্ছেন। *সহস্ররশ্মির্দীবসক্ষয়ে যথা তথাহপতৎ কর্ণশিরো বসুন্ধরাম্। ৮/৬৬/১৮১।* দিনাবসানে সূর্য যেমন অস্তাচলে অস্তমিত হয়, তেমনি কর্ণের মস্তকটি ভূতলে পতিত হল।

### শল্যপর্ব

কর্ণের মৃত্যুর পর কৌরব সেনারা ভয়ে যে যেদিকে পেরেছে সব পালাতে শুরু করেছে। দুর্যোধনাদিরা এখন কে সেনাপতি হবে এই নিয়ে আলোচনা করতে বসে গেছে। সাড়ে সতের দিন যুদ্ধ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত শল্যকে সেনাপতি করা হল। কিন্তু শল্য কাদের নিয়ে যুদ্ধ করবেন! প্রায় সব সেনারাই মারা গেছে না হয় পালিয়ে গেছে, বাকি সামান্য যেকজন ছিল তাদের নিয়ে শল্য বাকি অর্ধেক দিন যুদ্ধ করতে গিয়ে সেইদিনই আঠারো দিনের মাথায় মারা গেলেন। কৃপাচার্য তখনও দুর্যোধনকে বোঝাচ্ছেন ‘তুমি এখনও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সন্ধি করে নাও’। দুর্যোধনের সব সৈন্য শেষ হয়ে গেছে তাও দুর্যোধন কৃপাচার্যের কথা শুনতে রাজী হল না। কৃপাচার্য এটাই বোঝাচ্ছেন যে ‘বৃহস্পতির নীতিতেও বলে *হীয়মানেন বৈ সন্ধিঃ পর্যেষ্টব্যঃ সমেন বা। বিগ্রহো বর্দ্ধমানেন নীতিরেষা বৃহস্পতেঃ। ৯/৩/৪০।* যখন নিজের শক্তি কমে যায় বা সমান হয়ে যায় তখন সন্ধি করে নিতে হয়। আমরা প্রথমে এগারো অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিলাম, পাণ্ডবরা সেখানে সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছিল। এখন আমাদের তুলনায় ওদের সৈন্য অনেক বেশী হয়ে গেছে সেইজন্য বলছি এখনও সুযোগ আছে তুমি সন্ধি করে নাও’। দুর্যোধন তাও কোন কথা শুনবে না বলছে ‘যাই হয়ে যাক আমরা সন্ধি করতে যাবো না’।

শেষ দিন অর্থাৎ উনিশ দিনের সকালে পাণ্ডবরা সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হয়ে দেখছে কৌরবদের কেউই যুদ্ধ করতে আসেনি। কে আসবে যুদ্ধ করতে? কোন সৈন্যই এখন নেই। শুধু দুর্যোধন, কৃপাচার্য ও অশ্বখামা বেঁচে আছে কিন্তু এরাও কেউ যুদ্ধ করতে আসেনি। মাঠ ফাঁকা। সঞ্জয় যে এই কাহিনী ধৃতরাষ্ট্রকে বলছে, সে তখন যুদ্ধভূমির কোথাও ঘুরঘুর করছিল। সাত্যকি গিয়ে সঞ্জয়কে ধরেছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন বলছে একেও কেটে দাও। ব্যাসদেব এসে তখন সঞ্জয়কে বাঁচালেন।

### **দুর্যোধনের হ্রদ মধ্যে প্রবেশ, যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের উক্তি ও প্রত্যাভি, ভীম কর্তৃক গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ**

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছে ‘যুদ্ধের শেষে পাণ্ডবদের কাছে বিশাল সাত অক্ষৌহিণী বাহিনীর মধ্যে মাত্র দু হাজার রথ, সাতশ হাতি, পাঁচ হাজার ঘোড়া আর দশ হাজার সৈন্য ছিল। দুর্যোধনের তরফে দুর্যোধন একা। দুর্যোধন যখন দেখল সে একা হয়ে গেছে, তখন সে একটা হ্রদের মধ্যে গিয়ে জলের স্তম্ভন করে তার মধ্যে লুকিয়ে গেল, আসলে কুস্তক ক্রিয়ার দ্বারা জলের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। পাণ্ডবরা এসে দুর্যোধনকে খুঁজছে, তাকে তো এখনও কেউ বধ করেনি কিন্তু সে কোথায় যেতে পারে। কাছেই এক নিষাদ ছিল সে গিয়ে পাণ্ডবদের খবর দিয়েছে যে দুর্যোধন ঐ হ্রদের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে আছে। যুধিষ্ঠির গিয়ে দুর্যোধনকে আহ্বান করে বলছেন ‘একি! তোমার লোভকে চরিত্রার্থ করতে গিয়ে এত লোকের প্রাণ হরণ হয়ে গেল আর এখন তুমি যুদ্ধ না করে আত্মগোপন করে আছ, তুমি নিজের কুলের কলঙ্ক হতে যেও না’। যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে দুর্যোধন হ্রদের জল থেকে বেরিয়ে এসেছে। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে বলছে *নৈতচ্চিৎরং মহারাজা যজ্ঞীঃ প্রাণিনমাবিশেৎ। ন চ প্রাণভয়াভীতো ব্যপযাতোহস্মি ভারত। ৯/২৯/৩৬।* ‘কোন প্রাণির মনে ভয় ঢুকে যেতেই পারে, এটা কোন অস্বাভাবিক কিছু নয় কিন্তু আমি সেই প্রাণের ভয়েও রণস্থল থেকে পালিয়ে আসিনি’। পতঞ্জলী যোগসূত্রেও বলছে কোন প্রাণিই মরতে চায় না, যোগের ভাষায় একে বলা হয় অভিনিবেশ। দুর্যোধন বলছে ‘তবে এটা

তোমরা জেনে রাখ আমি প্রাণের ভয়ে এখানে লুকোতে আসিনি। আমার কাছে এখন কোন রথ নেই, আমার কাছে এখন কোন অস্ত্র নেই, আমার যে পার্শ্বরক্ষক তারাও নেই, আমার সেনাদের কেউ নেই, আমি একটু বিশ্রামের অভিলাশ নিয়ে এই হ্রদে আশ্রয় নিয়েছি। তোমরাও এখন একটু বিশ্রাম করে নাও, তারপর আমি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব’। তখন যুধিষ্ঠির বলছেন ‘হ্যাঁ ঠিকই বলছ তোমার তো এখন কিছুই নেই, এইভাবে তো আর লড়াই হয় না, তবে এক কাজ কর তুমি যে কোন একটা অস্ত্র বেছে নাও আর আমাদের পাঁচ জনের মধ্যে যে কোন একজনকে বেছে নিয়ে লড়াই হয়ে যাক। এখানে যে জিতবে সেই সাম্রাজ্য পাবে’। এখানেই বোঝা যায় যুধিষ্ঠিরের একেবারেই বাস্তব বুদ্ধি ছিল না, সোজা বাংলায় বলা যায় মাথামোটা লোক ছিলেন। এত বড় যুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর দুর্যোধন যদি বলত ঠিক আছে আমি নকুল কিংবা সহদেবকে বেছে নিচ্ছি। কিন্তু দুর্যোধন সেই পথে গেলই না, বলল ‘আমি তো তোমাদের চার ভাইকে হিসাবের মধ্যেই ধরি না। একমাত্র ভীমসেনই গদাযুদ্ধে আমার সমান সমান। ভীম এগিয়ে আসুক আমি ভীমের সাথেই লড়াই করি’। এই লড়াইটা যুদ্ধের আগেই করে নিলে এত লোক মরত না। আলেকজান্ডার যখন বিশ্ব জয়ে বেরিয়েছিল তখন এক রাজার যুদ্ধ হবার আগে আলেকজান্ডারকে গিয়ে বলল, এক কাজ কর তোমার যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আর আমার যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এদের দুজনের মধ্যে লড়াই হয়ে যাক, তাতে যে জিতবে সেই রাজ্য পাবে, তাহলে আর এত লোক মরবে না। সেই রাজার এক কুস্তিগির ছিল, বিশাল দৈত্যের মত চেহারা, তাকে নামিয়ে দিল লড়াই করতে, আর আলেকজান্ডারের তরফ থেকে একজনকে নামিয়ে দেওয়া হল। এবার দুজনে লড়াই শুরু হয়েছে, কিন্তু আলেকজান্ডারের লোকটি কিছুতেই ঐ কুস্তিগিরকে কাবু করতে পারছে না। আস্তে আস্তে তার দম ফুরিয়ে আসছে। তখন আলেকজান্ডারের একজন সেনাপতি সেখানে গিয়ে ওর হাতে একটা তলোয়ার দিয়ে দিল, সেই তলোয়ার দিয়ে কুস্তিগিরকে কেটে দিতেই মরে গেল। মরে গেল মানে হারা হয়ে গেল। আলেকজান্ডার হেরে গেলেও ছাড়তো না, সে ছাড়ার লোক নয়।

ভীম আর দুর্যোধনের লড়াই হবে। তার আগে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে খুব তিরস্কার করেছেন *কো নু সর্বান বিনির্জিত্য শত্রুশ্চেনৈবৈরিণা। কৃচ্ছ প্রাণেন চ তথা হারয়েদ্রাজ্যমগতম্। ৯/৩১/১০।* ‘কোন ব্যক্তি সমস্ত শত্রুকে জয় করার পর বিপদাপন্ন একজন শত্রু দ্বারা প্রায় হস্তগত রাজ্যকে হারায়? আমরা যুদ্ধ করে জিনিষটাকে এত দূর নিয়ে এলাম আর আপনার একটা কথাতেই সব নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে’। যাই হোক দুর্যোধন যখন ভীমকেই বেছে নিয়েছে তখন দুজনের মধ্যে এবার গদাযুদ্ধ হবে। ইতিমধ্যে সেখানে বলরামও হাজির হয়ে গেছেন। যিনি এই যুদ্ধ দেখবেন না বলে প্রভাসতীর্থে বেড়াতে চলে গিয়েছিলেন, তিনি এখন এসে উদয় হয়েছেন। বলরাম আবার দুজনেরই গুরু, দুর্যোধন আর ভীমকে তিনি গদাযুদ্ধ শিখিয়েছিলেন। লড়াই হবে, এখানে যে জিতবে সেই সাম্রাজ্য পাবে। অথচ দুর্যোধনের সব কটি ভাই মারা গেছে তার সঙ্গে তার একমাত্র বোন বিধবা হয়ে গেছে।

এরমধ্যে অনেক কাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে। আবার বলরাম অনেক তীর্থের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস নিয়ে অনেক কিছু বর্ণনা করছেন। অনেক কাহিনী বলার পর এবার দুজনের লড়াই শুরু হয়েছে। লড়াই শুরুর আগে দুর্যোধন আর ভীমের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ বাগ্যুদ্ধ চলল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে লড়াই চলছে। কেউ কাউকে কিছুই করতে পারছে না। ভীমও মার খাচ্ছে আবার দুর্যোধনো মার খাচ্ছে। সবাই দেখছে এইভাবে যদি লড়াই চলে তাহলে এতো শেষ হবে না। শ্রীকৃষ্ণ তখন ভীমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজের জানুতে চাপর দিয়ে ইঙ্গিত করছেন দুর্যোধনের জানুতে মারার জন্য। এ ওকে মারছে সে তাকে মারছে, দুজনেই লাফালাফি করে গদার আঘাত থেকে শরীরটাকে বাঁচাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিত দেখেই দুর্যোধন একবার যখন লাফিয়েছে ঐ সময় ভীমসেন তার জানুতে গদা মেরে দিয়েছে। গদাযুদ্ধের নিয়ম ছিল কোমরের নীচে গদা দিয়ে আঘাত করা যায় না। দুর্যোধন যখন লাফিয়েছে, দুর্যোধন জানে কোমরের নীচে মারতে পারবে না, কিন্তু সেই সময় জানুতে মারতেই দুর্যোধনের জানু গেছে ভেঙে। জানু ভেঙে যাওয়া মানে আর নড়তেও পারবে না। ঐভাবে জানুতে ভীম মারতেই বলরাম প্রচণ্ড রেগে গেছে ভীম গদাযুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করেছে বলে। রেগে গিয়ে বলরাম লাঙল তুলে ভীমকে মেরেই ফেলবেন ঠিক করে নিয়েছেন। লাঙলই ছিল বলরামের অস্ত্র। আবার সেই শ্রীকৃষ্ণ এগিয়ে এসে বলরামকে ঠাণ্ডা করতে শুরু করলেন। বলরাম তখন প্রচণ্ড চিৎকার করতে শুরু করেছেন। ভীমকে যাচ্ছেতাই ভাবে তিরস্কার করতে শুরু করেছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে বলছেন *আত্মবৃদ্ধির্মিএবৃদ্ধির্মিএমিত্রোদয়স্তথা। বিপরীতং দ্বিষৎস্বৈতৎ যড়বিধা বৃদ্ধিরাত্মনঃ। ৯/৫৬/১১।* ‘দাদা! নিজের উন্নতি ছয় রকম ভাবে হয় – নিজের উন্নতিতে, নিজের বন্ধুর উন্নতিতে, নিজের বন্ধুর বন্ধুর উন্নতিতে, শত্রুর অবনতিতে, শত্রুর বন্ধুর অবনতিতে আর শত্রুর বন্ধুর বন্ধুর অবনতিতে। কুস্তি হলেন আমাদের

পিসি তাই পাণ্ডবরা হল আমাদের নিজেদের লোক। এদের ভালো মানে আমাদেরও ভালো’। বলরাম খুব রেগে গেছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ খুব কায়দা করে বুঝিয়ে বাজিয়ে কোন রকমে শান্ত করেছেন।

### শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুর্যোধনের কুটুক্তি ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দুর্যোধনের বিভিন্ন অধর্ম কর্মের বিবরণ

এরপর সবাই দুর্যোধনকে ওখানেই ছেড়ে দিল মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে, জানু যখন ভেঙে গেছে আর বাঁচার আশা নেই। দুর্যোধন ঐ অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণকে খুব কটু মন্তব্য করছেন কংসদাসস্য দায়াদ ন তে লজ্জাস্ত্যনেন বৈ। অধর্মণ গদাযুদ্ধে যদহং বিনিপাতিতঃ। ১৯/৫৭/২৭। এই কংসের যে দাস তার ছেলে তুমি। তুমিই অধর্ম করে গদাযুদ্ধে আমাকে মারিয়েছ। তোমার না আছে কোন লজ্জা, না আছে তোমার কোন বাজে কর্মের ঘৃণা। ভীষ্ম যখন পাণ্ডবদের শেষ করে দিচ্ছিল তুমিই তখন শিখণ্ডীকে এগিয়ে দিলে, দ্রোণাচার্যকে মারার জন্য তুমি যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলালে, ঘটোটকচকে তুমি এগিয়ে দিলে, ভুরিশ্রবাকে তুমি এই রকম করলে, জয়দ্রথকে তুমি সূর্যাস্তের কৌশল করে মারিয়ে দিলে, তুমি অনার্য ভাবে, কুটিল মার্গ অবলম্বন করে এই সব কুকর্ম করে গেছ’। দুর্যোধন একের পর এক শ্রীকৃষ্ণের ছলচাতুরির কার্যকলাপ বলে যাচ্ছে, বিরাট লম্বা ফিরিস্তি। তখন শ্রীকৃষ্ণ আবার দুর্যোধনকে তিরস্কার করে বলছেন ‘হে গান্ধারিনন্দন! তুমি পাপের পথে পা রেখেছিলে। তুমি শুনে রাখ তোমার পাপের জন্যই তুমি ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব ও অনুচরদের সাথে নিহত হলে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এরা তোমার পাপের জন্যই মারা গেছে। শকুনির মত দুরাত্মার পরামর্শে তুমি চলেছিলে বলে আজকে তোমার এই অবস্থা। আমি যা কিছু করেছি ধর্মের নামেই করেছি তাই আমাকে এর কোন কিছুই স্পর্শ করবে না। তুমি ভীমকে বিষ খাইয়ে মারতে চেয়েছিলে। বারণাবতে তুমি কুন্তি সহ পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার জন্য ওদের বাসস্থানে অগ্নি সংযোগ করেছিলে। তোমার পরামর্শে দুঃশাসন একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে সভাতে নিয়ে তাকে অপমান করেছিলে। তুমিই জয়দ্রথকে বুদ্ধি দিয়ে জঙ্গলে পাঠিয়েছিলে দ্রৌপদীকে হেনস্থা করার জন্য। তোমারই পরামর্শে বহুসংখ্যক রথী একত্রিত হয়ে একটা বাচ্চা ছেলে অভিমন্যুকে বধ করেছিল। তুমি না শুনেছ বৃহস্পতির নীতির কথা না শুনেছ শুক্রাচার্যের নীতি কথা। আমার নামে যেসব কথা তুমি বলছ আমি এই করেছি সেই করেছি, তুমি মনে রেখ তোমার পাপের জন্যই আমাকে এসব করতে হয়েছে। তুমি ধর্মের কিছুই বোঝ না, তুমি যা বলছ ঠিকই বলছ এগুলি আমি সবই করেছি কিন্তু আমি সব কিছুই ধর্ম মতে করেছি’। দুর্যোধনও ছাড়ছে না ‘তুমি পাপ করেছ কিন্তু আমি যাই করিনা কেন, তুমি জেনে রেখো আমি ক্ষত্রিয় এবং আমি ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধে মারা গেছি আমি আমার সব ভাই, বন্ধুদের সাথে নিয়ে স্বর্গে চললাম। তোমরা এখানে সবাই দুঃখের জীবন-যাপন করতে থাক’। দুর্যোধন আরও অনেক কথা বলে যাচ্ছে।

ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিল আমি যুদ্ধভূমিতে দুর্যোধনের মাথায় পা রাখব। এখন দুর্যোধন মাটিতে পড়ে আছে। ভীম গিয়ে দুর্যোধনের মাথায় পা রাখতে গেছে। তখন শ্রীকৃষ্ণ গিয়ে ভীমকে আটকে দিয়েছেন ‘ভীম! তুমি মনে রেখ দুর্যোধন একজন মহান যোদ্ধা তদুপরি সে একজন রাজা। আর ঠিক ঠিক যুদ্ধ হলে তোমরা এর সঙ্গে কখনই পারতে না। দুর্যোধনের এখন উরু ভঙ্গ অবস্থায় পড়ে গেছে, এই অবস্থায় তুমি দুর্যোধনের মাথায় পা রেখো না। এরপর দুর্যোধন মারা গেল। সব খেলা শেষ হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বলছেন ‘অর্জুন! এবার এই রথকে তুমি ভুলে যাও, তুমি রথ থেকে নেমে এস’। অর্জুন রথ থেকে নেমে আসতেই রথটা দাউ দাউ করে জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে গেল। অর্জুন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছে ‘এটা কি হল?’ শ্রীকৃষ্ণ তখন বলছেন ‘এই আঠারো দিন এই রথের উপর এত অস্ত্র এসে পড়েছে, ব্রহ্মাস্ত্র থেকে শুরু করে কত রকমের অস্ত্র এর উপর পড়েছে, আমি এত দিন এই রথকে রক্ষা করে আসছিলাম, যুদ্ধের জন্য এই রথকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল, এখন যুদ্ধও শেষ তাই এরও প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তাই আর নয়, এর যা পরিণাম হওয়ার কথা সেটাই হল। এটা আগেই হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমি কোন রকমে এই রথকে ধরে রেখেছিলাম’। শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের দুজনের জন্যই এই রথ কাজ করেছে, যেমনি শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন মনে সঙ্কল্প নিয়ে নেমেছে, এই রথকে এখন ছাড়া হল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল রথের উপর যে একটা দিব্য বানর বসে থাকত, সেই বানরটা অদৃশ্য হয়ে গেল আর রথটা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এইখানে এসে যুদ্ধের কাহিনী শেষ।

## সৌপ্তিকপর্ব ও স্ত্রীপর্ব

রাতের অন্ধকারে পাণ্ডব শিবিরে হানা, পঞ্চ পাণ্ডবদের পুত্রদের বধ, অশ্বখামার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ ও নারদের হস্তক্ষেপ

এরপর শুরু হচ্ছে সৌপ্তিকপর্ব। এদিকে কৃপাচার্য, অশ্বখামা আর কৃতবর্মা এই তিনজনই শুধু কৌরবপক্ষের বেঁচে ছিল। কৃতবর্মা আবার শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশের একজন নামকরা সেনাপতি। দুর্যোধনকে যেভাবে মারা হয়েছে সেই খবর শুনে

এই তিনজন খুব ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তিনজন রাত্রিবেলা দুর্যোধনের কাছে গেছে। দুর্যোধনের পরাজয়কে এরা কিছুতেই মানতে পারছে না, যতই হোক একটা যুদ্ধকে এত দিন ধরে দুর্যোধন সামলে এসেছে আর এরা সব সময় দুর্যোধনের পাশে পাশেই থাকত। কোথায় একটা ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরা কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। এদের সমস্ত মানসিক যন্ত্রণা এখন সব পাণ্ডবদের উপর ক্রোধে পরিণত হয়ে গেছে। সেই সময় একটা পঁচা রাতের অন্ধকারে গাছের উপর একটা পাখির বাসাকে আক্রমণ করেছে। এই দৃশ্যটা দেখেই এদের প্রতিহিংসার আগুনটা দপ করে জ্বলে উঠেছে। এইভাবে রাতের অন্ধকারে গিয়ে পাণ্ডব শিবিরে আক্রমণ করতে হবে। দিনের বেলা পঁচা ভালো দেখতে পায়না, আর রাত্রে দেখতে পায়, পাখিরা আবার রাত্রে দেখতে পায়না। পঁচার রাত্রিবেলা সব পাখির বাসাতে গিয়ে ওদের মেরে খেয়ে নেয়। তিনজন দুর্যোধনের কাছে অনুমতি নিয়েছে। আর রাতের অন্ধকারে ওরা তিনজন চুপি চুপি পাণ্ডবদের শিবিরে ঢুকে গেছে। শিবিরে রাত্রিবেলা সবাই নিদ্রায় আচ্ছন্ন, পাশে কোন দেহরক্ষীও নেই। পাণ্ডবরাও কোন ধারণাই করতে পারেনি যে কেউ এইভাবে তাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। অশ্বথামার রাগ ছিল ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর তাই প্রথমে গিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের গলা কেটেছে। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র একটা শিবিরে শুয়ে ছিল। এরা ভেবেছে এরাই পঞ্চ পাণ্ডব, এদের পাঁচজনের গলাও কেটে দিয়েছে। এইভাবে এরা অনেকের গলা কেটে দিয়েছে। এইসব হতেই চারিদিকে চৈতামেচি চিৎকার শুরু হয়ে গেছে। চৈতামেচিতে পাণ্ডবদের ঘুম ভেঙে যেতেই দেখছে এক অমানবিক নৃশংস হত্যালীলা সংঘটিতে হয়ে গেছে। পাণ্ডবরা কিছু বুঝবার আগেই এরা তিনজন শিবির থেকে পালিয়ে গেছে। পালিয়ে যখন যাচ্ছে তখনও অশ্বথামার মনে শান্তি হয়নি, শান্তি না হওয়াতে তিনি চালিয়ে দিলেন ব্রহ্মাস্ত্র। পাণ্ডবদের নাশের জন্য অশ্বথামা ব্রহ্মাস্ত্র চালিয়ে যখন দিয়েছে তখন ঐ দেখে অর্জুনও চালিয়ে দিয়েছে ব্রহ্মাস্ত্র। তখন নারদ এসে এদের দুজনের মাঝখানে এসে হস্তক্ষেপ করলেন। নারদ এসে বলছেন ‘তোমরা একি শুরু করেছ! তোমরা দুজনেই পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্রহ্মাস্ত্র চালিয়ে দিলে! এক্ষুণি তোমরা তোমাদের ব্রহ্মাস্ত্রকে ফেরত নিয়ে নাও’। নারদ বলতেই অর্জুন নিজের ব্রহ্মাস্ত্রকে ফেরত নিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু অশ্বথামা বলছে ‘আমি তো চালাতে জানি কিন্তু ফেরত নেওয়ার মন্ত্র জানিনা’। এখন কি হবে? ব্রহ্মাস্ত্র যখন ছাড়া হয়ে যাবে তখন সে কিছু না কিছু করবেই। অশ্বথামা এখন পাণ্ডবদের নামে চালিয়েছে, পাণ্ডবদের কাউকে না কাউকে সে কিছু করবেই। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলে দিলেন ‘ঠিক আছে, উত্তরার গর্ভে অভিমন্যুর যে সন্তান আছে তার উপর চালিয়ে দাও’। শ্রীকৃষ্ণ তখন আবার উত্তরার গর্ভে গিয়ে ব্রহ্মাস্ত্র থেকে অভিমন্যুর সন্তানকে রক্ষা করেছেন। যার জন্য পরে এই সন্তানের নাম হয়েছিল পরীক্ষিৎ। সে যখন মায়ের গর্ভে রয়েছে তখন দেখছে একজন পুরুষ এসে ব্রহ্মাস্ত্রের পুরো তেজটা নিজের উপর টেনে নিচ্ছেন। যখন তার জন্ম হল তখন সে চারিদিকে চোখ তুলে দেখছিল কে সেই পুরুষ যে আমাকে গর্ভে রক্ষা করেছিলেন। সেই সন্তান জন্ম নিয়ে সবাইকে পরীক্ষা করছিল, সেই থেকে তার নাম পরীক্ষিৎ।

এই জঘন্য ঘৃণ্য কাজের জন্য সবাই অশ্বথামাকে ধরে নিয়ে এসেছে। অশ্বথামার মাথায় একটা মণি ছিল, সেই মণিটাকে ফেরত নিয়ে নেওয়া হল, তাতে তার ঐশ্বর্যের নাশ হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ বললেন ‘অশ্বথামা! তোমার উপর সব রকমের পাপ পড়বে, আর তিন হাজার বছর পর্যন্ত এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে, তুমি সব সময় অশান্তিতে ভুগবে এই অভিশাপ দিলাম’।

### ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুরের সাক্ষাৎ

এরপর শুরু হচ্ছে স্ত্রীপর্ব। যুদ্ধের সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর সবাই ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেছেন। ধৃতরাষ্ট্র এখন খুব শোকগ্রস্ত। বিদুরকে ডেকে আনা হয়েছে। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাচ্ছেন ‘হে রাজা! আপনি শোক করবেন না। এর আগে আগে আমরা হাজার হাজার কোটি কোটি বার জন্ম নিয়েছি, দেহধারণ করেছি। তখন আমাদের কত মা বাবা ছিল কত সন্তান বন্ধু বান্ধব ছিল, কিন্তু আমরা কজনকে মনে রেখেছি। সেইজন্য এগুলোতে খুব বেশী মন দিতে নেই আর কারুর জন্য বেশী শোকও করতে নেই। এই যে কাল, এর কারুর প্রতি ভালোবাসাও নেই কারুর প্রতি বিদ্বেষও নেই, কাল নিজের মত চলেছে’। ঠাকুর বলছেন সব তাঁর ইচ্ছাতেই চলে। এই যে কাল, কর্ম এগুলো নির্বিকার ভাবে চলতে থাকে, মাঝখান থেকে আমরাই শুধু ভেবে ভেবে মরি। এই নিয়ে ঠাকুর খুব সুন্দর একটা গল্প বলছেন – পাহাড়ের উপর একজনের একটা কুঁড়ে ঘর ছিল। একদিন জোর বাতাস চলতে শুরু করেছে, বাতাসে কুঁড়ে ঘরটা নড়বড় করতে শুরু করেছে। লোকটি খুব ভয় পেয়ে গেছে ভাবছে এই বুঝি বাড়িটা ভেঙে যাবে। লোকটি তখন ঘরটাকে বাঁচাবার জন্য বলছে – এটা কার বাড়ি? বাতাসের দেবতা বায়ু, বায়ুর পুত্র হনুমান, বলছে এটা হনুমানের বাড়ি। তাও নড়বড় করছে তখন ভাবছে হনুমান তো রামের ভক্ত, তখন বলছে রামের বাড়ি। তাও নড়বড় করছে তখন বলছে সীতার বাড়ি, তাও বাতাস থামছে না, তখন বলছে লক্ষ্মণের বাড়ি। এই করতে করতে কুঁড়ে ঘরটা হ্রমুর করে ভেঙে পড়ল। তখন বলছে শালার বাড়ি। রামের বাড়ি,

সীতার বাড়ি, লক্ষ্মণের বাড়ি বলতে বলতে বাড়িটা ভেঙে পড়ে গেল, তখন বলছে শালার বাড়ি। আসলে এটাই হয়, আমরা মনে করি সব কিছু আমাদের মত চলছে, কিন্তু তা নয়, সব কিছু নির্বিকার ভাবে চলছে। বিদুর বলছেন ‘যারা সাধারণ মানুষ ও মন্দ বুদ্ধির তারা যখনই অপ্রিয় সংযোগ অপ্রিয় বিয়োগ হয় তখনই তারা মানসিক যন্ত্রণায় দক্ষ হয়। আপনি এইভাবে দক্ষ হবেন না, এই ভাবে দক্ষ হতে থাকলে আপনি ধর্ম পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবেন’। ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর এইভাবে অনেক কথা বলে যাচ্ছেন।

### ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক ক্রোধবশাৎ ভীমের লৌহমূর্তি চূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণকে গান্ধারীর অভিশাপ

যুদ্ধ থেমে যাওয়া আর তার পরিণামের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। সব দিক থেকে স্ত্রীরা, রানীরা, মায়েরা এসে খোঁজ নিতে শুরু করেছে কোথায় কার স্বামী কার পুত্র মারা গেছে, কারা বেঁচে আছে। সবাই আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে কুরুক্ষেত্র সমারামের দিকে যাত্রা করেছে। ক্রন্দনরত সেইসব লোকদের সাথে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীও চলেছেন। পরিচিত দেহগুলোকে নিয়ে সব আত্মীয়স্বজনরা সৎকার করতে শুরু করে দিয়েছে। কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনা থেকে বেরিয়ে কুরুক্ষেত্রের দিকে আসছেন শুনে ছুটে এসেছে। তিনজন এসে ধৃতরাষ্ট্রকে খবর দিলেন সবাই মারা গেছে আমরা এই তিনজনই শুধু বেঁচে আছি। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করার পর তিনজন তিন দিকে প্রস্থান করে আলাদা হয়ে গেলেন। এদের প্রস্থানের পরেই পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে খবর গেছে পাণ্ডবরা দেখা করতে এসেছে। যুধিষ্ঠির এগিয়ে গেছেন ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করবার জন্য। ধৃতরাষ্ট্রও অপ্রসন্ন মনে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করে ভীমের খোঁজ নিতে শুরু করলেন। ভীমের কথা বলতেই ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে ক্রোধের আগুন প্রচণ্ড তেজে জ্বলে উঠেছে। ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু কাউকে ভীমের প্রতি তাঁর ভেতরের রাগটা জানতে না দিয়ে দেখাচ্ছেন যেন আমি ভীমকে বুকে জড়িয়ে অভিনন্দন জানাবো। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু আগে থাকতেই বুঝতে পেরে কোথা থেকে লোহার তৈরী ভীমের একটা প্রতিমা ধৃতরাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। অনেক সিরিয়ালে দেখান হয় দুর্যোধন ভীমের এই লোহার মূর্তি রেখে তার ওপর গদা চালিয়ে অনুশীলন করত। ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে ভীমের উপর এত রাগ জমে ছিল যে লোহার মূর্তিটাকে ভীম ভেবে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে এত জোড়ে চেপেছেন যে লোহার মূর্তিটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। লোহার মূর্তিকে অত জোরে চেপে ধরতে ধৃতরাষ্ট্রের বুক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। ধৃতরাষ্ট্র ভেবেছেন ভীম হয়তো মারা গেছে। ঐ ভেবে তিনিও ‘হা ভীম! হা ভীম!’ বলে কাঁদতে শুরু করেছেন। তখন তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হল ওটা একটা লোহার মূর্তি ছিল। এরপর শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক তিরস্কার করলেন ‘আপনার নিজের দোষে আজকে আপনার এই অবস্থা, নিজে দোষ করে কেন আপনি এই ধরণের ক্রোধ করছেন? আপনাকে আমি বুঝিয়েছিলাম, এমনকি ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও সঞ্জয় এনারাও আপনাকে বারবার করে বলেছিলেন সন্ধি করে নিতে কিন্তু আপনি সবার উপদেশকে অগ্রাহ্য করে দুর্মতি দুর্যোধনকেই গুরুত্ব দিলেন, এখন তার ফল ভোগ তো আপনাকেই করতে হবে, ভীমের উপর রাগ দেখিয়ে আপনি আরও অন্যায় করছেন’। এক এক করে সবার সাথে দেখা হচ্ছে। গান্ধারীর সঙ্গে দেখা করা হল। গান্ধারীও খুব শোকগ্রস্ত হয়ে আছে। ভীমও গান্ধারীর সাথে দেখা করতে খুব ভয় পাচ্ছে। গান্ধারীর সাথে দেখা হতেই ভীম বলছেন ‘মা! আপনি শোক করবেন না। দুঃশাসনের রক্ত আমার দাঁত আর ঠোঁটেই লেগেছে, দস্ত আর ওষ্ঠকে অতিক্রম করে রক্ত আমার উদরস্থ হয়নি, আর এই ব্যাপারটা সূর্যপুত্র কর্ণও জানতেন’। এখানে বলছে গান্ধারী ভেতরে ভেতরে এত রাগে জ্বলছিলেন যে তাঁর চোখ যে কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল তার নীচের একটু ফাঁক দিয়ে তাঁর দৃষ্টিটা যুধিষ্ঠিরের পায়ের উপর পড়েছিল তাতেই যুধিষ্ঠিরের পায়ের আঙটা জ্বলে গিয়ে চিরদিনের মত কালো হয়ে গিয়েছিল। গান্ধারী নানা ভাবে নিজের শোককে অভিব্যক্ত করছেন। সব রানীরাও শোকে বিলাপ করে চলেছে।

সবাই বিলাপ করে চলেছে। গান্ধারী এক এক করে নাম করে সবার জন্য বিলাপ করে চলেছেন। শ্রীকৃষ্ণও এখানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে গান্ধারী বলছেন ‘হে ভগবন! তুমি সবার থেকে শক্তিমান, তোমার কাছে সেই ক্ষমতা ছিল তুমি যদি চাইতে উভয় পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্ব করিয়ে দিতে পারতে’। শ্রীকৃষ্ণের নামে বারবার এই অভিযোগ করা হয় আর এখানে গান্ধারীও এই একই অভিযোগ করছেন শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে। কেন এই অভিযোগ আনা হয় বোঝা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ অনেক ভাবে চেষ্টা করেছিলেন কোন ভাবে সন্ধি করে যুদ্ধটাকে প্রতিহত করতে। গান্ধারী বলছেন ‘তুমি জেনে শুনেই কুরুবংশের বিনাশ করিয়ে দিলে, এর ফল তুমিও একদিন পাবে। তুমি যেভাবে এই কুরুবংশকে বিনাশ করিয়েছ তোমার যদুবংশও এভাবেই বিনাশ হয়ে যাবে। তোমার যদুবংশের স্ত্রীরা এইভাবেই কাঁদবে যেভাবে আজকে কুরুবংশের স্ত্রীরা আতর্জন করছে’। গান্ধারীর এই অভিশাপ শুনে নির্বিকার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি দিয়ে বলছেন ‘দেবি! আমার ব্যতিরেকে যদুবংশীয়দের বিনাশ করে এমন কেউই নেই। আমি যে যদুবংশ ধ্বংস করব তা আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছি। যাদবরা মনুষ্য বা দেবদানব কারুরই বধ্য নয়, সুতরাং তারা নিজেরাই লড়াই করে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। এটাই দৈব।

দৈবকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। আপনি যা কিছু বলেছেন তাতে আমার কোন ক্ষোভ নেই’। এই সব কথা বলেই শ্রীকৃষ্ণ আবার বলছেন ‘হে দেবি! আপনি এবার আপনার শোককে প্রশমিত করে উঠুন, আপনি আমাকে অভিষাপ দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু সব আপনার দোষেই হয়েছে। দুর্যোধন একটা দুরাত্মা, হিংসাপরায়ণ, পরশ্রীকাতর, নিষ্ঠুর, আত্মাভিমानी, শত্রুতার একটা মূর্তিমান রূপ, গুরুজনদের নিতান্ত অবাধ্য। আপনি দুর্যোধনের পাপাকার্যে সাধুবাদ প্রদান করতেন আর এখন নিজের দোষকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সব দোষ আমার উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন’।

## শান্তিপর্ব

এরপর পাণ্ডবরা মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিতে গেলেন। তখন কুন্তী এসে বললেন কর্ণের নামেও জলাঞ্জলি দিতে। পাণ্ডবরা বললেন কর্ণতো সূতপুত্র। তখন কুন্তী বললেন ‘না, কর্ণ আমারই সন্তান ছিল, সে তোমাদের জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা’। কুন্তীর মুখে এই কথা শুনেই যুধিষ্ঠির খুব বিস্মিত ও হতবাক হয়ে গেছে ‘কর্ণ আমার দাদা হয়, এই কথা তুমি আগে আমাদের কেন বলনি’। কুন্তী কর্ণের বিষয়ে গোপন করাতে যুধিষ্ঠির খুব দুঃখিত হয়ে মাকে বললেন ‘তুমি যদি এই গুহ্য কথা গোপন করে না রাখতে তাহলে এই এত বড় নরসংহার হত না। আমি তাই অভিষাপ দিচ্ছি *শশাপ চ মহাতেজাঃ সর্বলোকেষু যোষিতঃ। ন গুহ্যং ধারয়যন্তীত্যেবং দুঃখসমম্বিতঃ।* ১৩/৬/১০। আজ থেকে কোন স্ত্রী নিজের মনের ভেতরে কোন গুহ্য কথা রাখতে পারবে না, সব কথা তার পেট থেকে বেরিয়ে আসবে’।

আমরা মহাভারতের শান্তিপর্বের আলোচনা করতে যাচ্ছি। বলা হয় মহাভারতের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ শান্তিপর্ব। এই পর্বে কাহিনী খুব বেশী নেই, কাহিনী যেটুকুও বা আছে তাতেও একটা তত্ত্বকে নিয়ে আসার জন্যই কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। শান্তিপর্বে আধ্যাত্মিক দর্শন ও ধর্ম দর্শনের কথা যেমন আছে তেমনি রাজনীতি, ইতিহাস, নীতি, আচার ও আচরণের কথাও বলা হয়েছে। যাদের পুরো মহাভারত পড়ার সৌভাগ্য না হয় তারা যদি অন্ততঃ শান্তিপর্বটাও একবার পড়ে নেয় তাতেও অনেক কাজ হবে। আজকে হিন্দু ধর্ম যে চিন্তাধারার উপর ঠিক ঠিক দাঁড়িয়ে আছে তার বেশীর ভাগটাই এসেছে এই শান্তিপর্ব থেকে। এমন নয় যে ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেছেন বলেই হিন্দুধর্ম এই চিন্তা ভাবনা নিয়েছে। কারণ ব্যাসদেব যে চিন্তা ভাবনাগুলোকে তাঁর রচনার মধ্যে নিয়ে এসেছেন এগুলো আগে থাকতেই সমাজে অনুশীলিত হয়ে আসছিল। একটা জিনিষ অনেক দিন ধরে মানুষের মধ্যে অনুশীলিত হওয়ার পর সমাজ কতটা উন্নত হলে পরে মহর্ষিরা এগুলোকে লিপিবদ্ধ করে ভাবীকালের জন্য সংরক্ষিত করতে প্রয়াসী হন। একটা আদিম বর্বর সমাজে হঠাৎ দুম্ করে এই ধরণের উচ্চ দর্শন কখনই লেখা হবে না। মহাভারতে যা কিছু দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, সামাজিক রীতিনীতির কথা লেখা হয়েছে সেগুলো আগে থাকতেই সমাজে সবাই পালন করে আসছিলেন, ব্যাসদেব সেগুলোকে সংগ্রহ করে একটা জায়গাতে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, তার সঙ্গে কোথাও কোথাও তিনি তাঁর নিজস্ব মৌলিক চিন্তাধারাকেও ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

### **যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি ও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের ইচ্ছা, ব্যাসদেব কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ**

শান্তিপর্ব গুরুই হচ্ছে সমস্ত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার শেষে যুধিষ্ঠির রাজা হওয়ার পর থেকে। রাজা হয়ে যাওয়ার পরেও যুধিষ্ঠির খুব অনুশোচনা করে যাচ্ছেন। আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্য বাহিনীর কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। তার আগে যুধিষ্ঠির জানতে পারলেন কর্ণ তাঁদের জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা ছিলেন। কর্ণ বধ হওয়াতে যুধিষ্ঠির খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। তিনি জানতে চাইছেন কর্ণের কি এমন অভিষাপ ছিল যার ফলে তাঁকে নিজের গর্ভধারিণী মা আর ভাইদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা থাকতে হয়েছে। তখন যুধিষ্ঠিরকে কর্ণের জন্ম বৃত্তান্তের ইতিহাসাদি বলা হচ্ছে। সব শোনার পর ক্ষত্রিয় জীবনের উপর যুধিষ্ঠিরের এক তীব্র ধিক্কার এসে গেছে। তিনি ঠিক করলেন আমি আর রাজা হব না, সব কিছু ছেড়ে আমি বাণপ্রস্থ নিয়ে সন্ন্যাস জীবন অতিবাহিত করব। ক্ষত্রিয়ধর্ম, বল, পৌরুষ ও অমর্ষে ধিক্। যুধিষ্ঠিরের এই সিদ্ধান্তে ভীম, অর্জুনরা খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন। এটা কি কখন সম্ভব! এত কিছু হয়ে যাওয়ার পর এখন এইভাবে রাজ্যপাট ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা কোন ভাবেই উচিত নয়। তখন এনারা ইতিহাস থেকে বিভিন্ন কাহিনী এনে যুধিষ্ঠিরকে বোঝাচ্ছেন আপনার এই আচরণ শাস্ত্র ও নীতি বিরুদ্ধ। অর্জুন রাজা জনকের দৃষ্টান্ত দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বোঝাচ্ছেন রাজা জনক কিভাবে সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করে রাজার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। নকুল বোঝাচ্ছে, সহদেব বোঝাচ্ছে আবার দ্রৌপদীও উত্তেজিত হয়ে কিছু কথা যুধিষ্ঠিরকে শোনাচ্ছে। নানা ভাবে সবাই যুধিষ্ঠিরকে বোঝাচ্ছেন আপনি এই ভাবে রাজার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি



নিয়ে সন্ন্যাসীর মত ভিক্ষা করতে পারেন না। সবাই বোঝাবার পর ব্যাসদেবও যুধিষ্ঠিরকে বোঝাতে শুরু করলেন। ব্যাসদেবের মত ব্যক্তিত্ব কখনই সাধারণ যুক্তি দিয়ে বোঝাবেন না, তাঁর প্রত্যেকটি যুক্তি আবার খুব গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ।

### ধর্মের প্রমাণ ধর্ম

ব্যাসদেব বলছেন প্রজানাং পালনং ধর্মো রাজ্যাং রাজীবলোচনা। ধর্মঃ প্রমাণং লোকস্য নিত্যং ধর্মানুবর্তিনঃ। ১৩/৩২/২। ‘হে পদ্মনয়ন যুধিষ্ঠির! রাজার ধর্ম হল প্রজা পালন’। শ্লোকের দ্বিতীয় অংশটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ‘যারা ধর্মের অনুসরণ করে তাদের জন্য ধর্মই প্রমাণ’। প্রমাণ মানে একটা জিনিষকে যেটা দিয়ে জানা যায়, আমাদের শাস্ত্রে একটা জিনিষকে জানার জন্য ছটি প্রমাণের কথা বলা হয়। একে বলা হয় ঘটপ্রমাণ, ইংরাজীতে বলা হয় Methods of knowledge। হিন্দু শাস্ত্র যদিও ছয়টি প্রমাণের কথা বলা হয়, তবে সবাই যে ছটিকেই মানছে তা নয়, কিন্তু বেদান্ত ছটিকেই মানে। প্রথম প্রমাণ হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা দৃষ্ট প্রমাণ। আমি চোখের সামনে আপনাকে দেখছি, আপনি আমার সামনে ক্লাশে বসে আছেন। এখন কেউ এসে যদি বলে যে আজকের শাস্ত্র ক্লাশে আপনি আসেননি, আবার যুক্তি দিয়েও যদি বলা হয় আজকে ট্রেন চলনি, বাস চলনি সেইজন্য উনি আজ ক্লাশে আসতে পারেননি। তখন আমি কি বলব তাকে? আমি তো বলব ঐতো তিনি আমার সামনে বসে আছেন। সে বলল ওটা আপনার চোখের ভুল, উনি আজকে আসতেই পারবেন না। আমি কি বলব? আমি বলব – আমার চোখেরই ভুল হোক আর যাই হোক কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি ক্লাশে বসে আছেন। এটাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণকে যদিও উচ্চস্থান দেওয়া হয় কিন্তু চরম স্থান দেওয়া হয় না। ট্রেনে করে যখন যাচ্ছি তখন দেখছি বাইরের ঘর বাড়ি গাছপালা সব পেছনের দিকে সরে যাচ্ছে। এটাও আমি প্রত্যক্ষই দেখছি, কিন্তু আসলে কোন কিছুই তো পেছনের দিকে যাচ্ছে না, আমি সামনের দিকে যাচ্ছি। প্রত্যক্ষ প্রমাণে যে ভুল হতে পারে না তা নয়। আচার্য শঙ্কর তাই বারবার বলবেন – যে জিনিষটা আমি সাক্ষাৎ দেখছি তখন বেদে শত প্রমাণও যদি থাকে যে এটা ভুল, সেটাকে মানা চলবে না। অনেকে মনে করে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সজ্জাত হয়, আদর্শেই তা হয় না। এখন যত যুক্তি দিয়েই দেখানো হোক না কেন আপনি আজকে সত্যিই ক্লাশে আসেননি কিন্তু আমি চোখের সামনে আপনাকে দেখতে পাচ্ছি তখন আর কোন যুক্তিই খাটবে না। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি একটা লোক বাঁদরামো করছে, এখন কেউ বলল লোকটা নিজে করছে না, ঠাকুরের ইচ্ছায় বাঁদরামো করছে। আমি চোখে দেখে বুঝতে পারছি লোকটা বাঁদরামো করছে এর মধ্যে আবার ঠাকুরকে কেন নিয়ে আসা হচ্ছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের ক্ষেত্রে সচারচর কোন যুক্তি চলে না যতক্ষণ অন্য কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ না এসে বোঝান যায় যে এটা ভুল। যেমন আমি ট্রেনে করে যাচ্ছি একজন লোক বলল দেখুন গাছগুলো পেছনের দিকে যাচ্ছে, তখন আমাকে অন্য ভাবে বোঝাতে হবে আসলে এটা ঠিক নয়। তার জন্য আমাকে অন্য প্রমাণ আনতে হবে, প্রমাণ এনে দেখাতে হবে, গাছগুলো আদৌ পেছনের দিকে যাচ্ছে না। একেই বলা হয় প্রমাণ, মানে জিনিষটাকে কিভাবে জানা যাচ্ছে। প্রমাণের ব্যাপারে একটা ছোট ধারণা করার জন্য এটুকু বলা হল। এই রকম অনুমান প্রমাণ, উপমান প্রমাণ, শব্দ প্রমাণ, অভাব প্রমাণ এই ধরণের ছয়টি প্রমাণ আছে।

এখানে ব্যাসদেব বলছেন ধর্ম যারা অনুসরণ করছে, ধর্ম অনুসরণ করলে তাতে ধর্ম প্রমাণের ব্যাপারে কি বলতে চাইছেন? বলছেন ধর্মই প্রমাণ হবে। যদি বলা হয় আপনার ধর্মকে যুক্তি দিয়ে বোঝান যাবে? আপনার ধর্মকে বিজ্ঞান দিয়ে বোঝান যাবে? তখন বলতে হবে ধর্ম তোমাকে যুক্তি দিয়ে, বিজ্ঞান দিয়ে বোঝান যাবে না, কারণ ধর্মের প্রমাণ ধর্মই। বিজ্ঞানের প্রমাণ কে? বিজ্ঞানই বিজ্ঞানের প্রমাণ। সমস্যা হল, যখন গ্যালিলিওর সময় বিজ্ঞানের অগ্রগতি শুরু হল তখন খ্রীস্টান ফাদাররা বলতে আরম্ভ করলেন এই যে বিজ্ঞান এত কথা বলছে এগুলোর কি ধর্ম প্রমাণ আছে, ধর্মের সাথে কি এগুলো মেলে? না তো, ধর্মের সাথে এগুলো মিলবে না। খ্রীস্টান ফাদাররা বললেন তাহলে গ্যালিলিওর গলাটা কেটে দাও। কিন্তু আমাদের পূর্বজরা কত গভীর ভাবে সব কিছুকে চিন্তা ভাবনা করে জিনিষটাকে কোথায় নিয়ে গেছেন, ধর্মের প্রমাণ ধর্মই। কার কাছে? যে ধর্ম অনুসরণ করছে। একজন রিক্সাওয়ালাকে যদি আমি বোঝাতে যাই সে কিছুই বুঝবে না, তার জন্য এটা খাটবে না। কারণ, সে ধর্মকে অনুসরণ করছে না। এখন রিক্সাওয়ালার কোন পার্টির খাতায় নাম লিখিয়ে রেখেছে, পার্টি অফিস থেকে যদি বলে দেওয়া হয় ধর্ম সত্য তখন সে অনুসরণ করবে। তার প্রমাণ পার্টি অফিস। ঠিক তেমনি স্টিফেন হকিং যদি বলে স্বর্গ বলে কিছু নেই, নরক বলে কিছু নেই তখন আমি বলব আমার ধর্মই সত্য। স্টিফেন হকিং কেন বলছে? এগুলোর বিজ্ঞান প্রমাণ নেই। আমি বলছি ধর্মই সত্য। কেন বলছি? কারণ এগুলোতে বিজ্ঞান প্রমাণ লাগে না। এটাই ব্যাসদেব বলছেন ধর্মের জন্য বিজ্ঞান প্রমাণ লাগবে না। ধর্মের জন্য কি প্রমাণ লাগবে? ধর্মই প্রমাণ। কাদের জন্য এই কথা। যারা ধর্মকে অনুসরণ করছে। পদার্থ বিজ্ঞানের খুব জটিল ইকুয়েশনকে বুঝতে যে সূক্ষ্ম বুদ্ধির

দরকার ধর্ম বোঝার জন্য তার থেকে আরও খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। সেইজন্য অসংযত খাওয়া-দাওয়া, ইন্দ্রিয় সংযম না করেও বিজ্ঞানকে বোঝা যায় কিন্তু সংযত জীবন-যাপন না করে ধর্মকে বোঝা যায় না। ছোটবেলা থেকে দুইয়ে দুইয়ে চার হয় জানার মত বুদ্ধি নিয়ে আমরা যেভাবে বড় হয়ে এসেছি, বড় হয়ে দুম্ করে ধর্মের কথা বলে দিলে আমরা ধরতে পারব না। ধর্মের কথা বোঝার জন্য চাই অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি, যে বুদ্ধিকে আয়ত্ত করতে ছোটবেলা থেকেই বিশেষ প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ দরকার। ধর্মের সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো ধরা খুব কঠিন, তার উপর আমাদের মাথার মধ্যে এত বেশী জ্বল বিষয়গুলো ঢুকে আছে সেগুলোকে সরিয়ে দিয়ে ধর্মের সূক্ষ্ম জিনিষগুলোকে জায়গা করে দেবে আমাদের মস্তিষ্কের সেই ক্ষমতা নেই। যে কোন বিষয়ে যখন জ্ঞান লাভ করতে হয় তখন সেই বিষয়ের নিজস্ব একটা ধারা আছে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, প্রত্যেকটি বিষয়ের একটা নিজস্ব ধারা আছে, ঠিক তেমনি ধর্মেরও একটা নিজস্ব ধারা আছে। যেটাকেই আমরা ধরব সেটাকেই দৃঢ় মানসিকতার সাথে ধরে রাখতে হবে, একবার এদিক আরেকবার সেদিক করলে শেষ পর্যন্ত কোন কিছুই জ্ঞান আমাদের হবে না। কোন বিষয় ঠিক না ভুল বিচার করতে হলে সেই বিষয়ের অনুসারেই বিচার করতে হবে। যেখান থেকে বিষয়টা শুরু হয়েছে সেখান থেকেই বিষয়টাকে বিচার করতে হয়। আমরা বিজ্ঞানকে যখন বিচার করতে যাই তখন তাকে ধর্ম দিয়ে মাপতে যাই, আবার যখন ধর্মকে বিচার করতে যাই তখন তাকে বিজ্ঞান দিয়ে মাপি, সাহিত্যকে যখন মাপি তখন তাকে ধর্ম দিয়ে মাপি, ধর্মকে যখন বিচার করি তখন সাহিত্যের অনুভব দিয়ে বিচার করি। এইভাবে কোন দিনই কোন জিনিষকে সঠিক ভাবে জানা যায় না। সাহিত্যকে কি কখন যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করা যায়? কখনই যায় না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন ভাবের কোন দাম নেই। পুরো জগতের এটাই সমস্যা। যারা গ্রামের লোক, অশিক্ষিত এই অর্থে তারা অনেক উন্নত। তারা জানে আমার গুরুদেব বলে দিয়েছেন ভগবান আছে, এরপর আমি আর কিছু জানিনা। তারা এত কথা হয়তো জানে না কিন্তু এটাই জানে যে আমার ধর্মই প্রমাণ কারণ আমার গুরু বলে দিয়েছেন। যেটাকে বিচার করতে যাবে সেটাকে সেটা দিয়েই বিচার করতে হয়। ঠিক তেমনি ধর্মের প্রমাণ ধর্ম। যারা লেখাপড়া জানা লোক, সকালে খবরের কাগজ পড়ছে, যুক্তিতর্কে মজা পায় তাদের কাছে এই সমস্যা হয়। এরা কিছুটা এখন থেকে কিছুটা ওখান থেকে নিচ্ছে, ঘোড়া বানাতে গিয়ে তাকে মোষের সিং লাগিয়ে দিল মোষ বানাতে গিয়ে ঘোড়ার লেজ লাগিয়ে দিয়ে এক বিচিত্র জীব বানিয়ে দেবে। একটা শ্লোকের অর্ধেক অংশকে নিয়ে আমাদের কত আলোচনা করে বুঝতে হচ্ছে এটাই আমাদের দুর্বলতা। কিন্তু যার সূক্ষ্ম বুদ্ধি আছে সে একবার পড়েই বুঝে নিয়ে পরের শ্লোকের দিকে এগিয়ে যাবে। এখন আমি যদি বলি ব্যাসদেব যে বললেন ধর্মই ধর্মের প্রমাণ, এর কি কোন প্রমাণ আছে? তখন বুঝতে হবে ধর্ম আমার জন্য নয়, ধর্মের প্রয়োজন আমার কাছে শূন্যের পর্যায়ে। সেইজন্যই বলা হয়েছে ধর্ম অনুবর্তিনঃ, যারা ধর্মের অনুবর্তি নয় তাদের জন্য ধর্ম নয়। যারা ধর্মের অনুবর্তি তাদের কাছে ধর্মই প্রমাণ।

ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বোঝাচ্ছেন *ধর্মং বিনশ্যমানং হি যো ন রক্ষেৎ স ধর্মহা। তে ত্বয়া ধর্মহন্তারো নিহতাঃ সপদানুগাঃ।* ১৩/৩২/৮। ‘হে যুধিষ্ঠির! ধর্ম বিনষ্ট কালে যে ধর্মকে রক্ষা না করে সে ধর্মহন্তাই হয়। তুমি তো তাদেরই বধ করেছ যারা ধর্মের নাশ করছিল, আর তুমি যখন নিজের ধর্মে অবস্থিত থেকে এই কাজ করেছ তখন এই শোক করার কোন কারণ নেই। কেন মিছিমিছি শোক করছ? আর এটাই রাজাদের ধর্ম’। এর আগে আমরা যে শ্লোকের আলোচনা করছিলাম আর এখন যে শ্লোকটা আলোচনা করতে যাচ্ছি এই দুটো শ্লোকের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। এখন প্রশ্ন হল এই যে এত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব মারা গেছে এর জন্য যুধিষ্ঠিরের শোক করা উচিত কি উচিত নয়। যদি মানবিক মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করতে যাই তাহলে বলবে হিংসা ভালো নয় তাই এত লোকের প্রাণ সংহার করাটা কখনই উচিত হয়নি। কিন্তু এই শ্লোকে তা বলছে না। এখানে বলছেন তুমি যদি ধর্ম প্রমাণ নাও, তাহলে যারা ধর্ম নাশ করতে এসেছিল তুমি তাদের বধ করেছ, তাতে শোকের কিছু নেই। এখন যদি যুক্তিটাকে পাল্টে দেওয়া হয় তখন জিনিষটা অন্য রকম দাঁড়াবে। কিন্তু তুমি যখন ধর্মকে অনুসরণ করেছ তখন তোমার ধর্মই প্রমাণ থাকবে। ভারতে থেকে পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী বিচার করলে তো চলবে না, ভারতে থেকে ভারতের সংবিধান অনুযায়ীই বিচার করতে হবে।

### দায়বদ্ধতা নির্ধারণের তত্ত্ব

ব্যাসদেব আরও বলছেন *ঈশ্বরো বা ভবেৎ কর্তা পুরুষো বাপি ভারত। হঠো বা বর্ততে লোকে কর্মজং বা ফলং স্মৃতম্।* ১৩/৩২/১২। ‘যুধিষ্ঠির! এই যে এত নরহত্যা হল, এত লোকের বধ হল এর দায়বদ্ধতা নির্ধারণের জন্য চারটে তত্ত্বকে নিয়ে আসা যায় – ১) সব কাজেরই প্রেরক হলেন ঈশ্বর, এদের যে তোমায় বধ করতে হবে সেই প্রেরণাটা ঈশ্বর দিয়েছিলেন। যে প্রেরণা দেয় দোষটা তারই হয়। যদি তুমি মনে কর ঈশ্বরই তোমাকে এই কাজে প্রেরণা দিয়েছেন

তাহলে ঈশ্বরই দায়ী, তুমি আর কিভাবে এর মধ্যে জড়াবে। তবে তোমাকে সব ক্ষেত্রেই ঠিক ঠিক মনে করতে হবে আমি কিছুই না ঈশ্বরই সব কাজের প্রেরণা দেন, তাহলে কাজের শুভ অশুভ ফল যা হবে ঈশ্বরেরই হবে। আদালতের আইন-কানুনের ক্ষেত্রেও দেখা হয় এই বেআইনি কাজে তাকে কে প্ররোচিত করেছিল। সুপারি কিলারে শুধু যে খুন করেছে তাকেই ধরা হয় না, তাকে যে টাকাটা দিয়েছে তাকেও ধরে নিয়ে আসতে হয় ২) যিনি বধ করলেন তিনি কর্তা কিনা। কর্তা যদি ঈশ্বরই হন, সবাই বলে ঈশ্বরই কর্তা আমি নিমিত্ত মাত্র, ঠাকুরই সব করেন। তাহলে এই নরসংহার ঠাকুরই করেছেন তুমি এখানে কোথেকে আসছ, তোমার সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। ৩) নিজের জেদের জন্য মারা গেল কিনা। যদি কৌরবরা নিজেদের জেদের জন্য মারা গিয়ে থাকে, ওরা যদি হঠকারিতা করে মারা যায় তাহলেও তুমি দোষী নও। আর ৪) প্রারব্ধের জন্য মারা গেল কিনা। যারা মারা গেছে এদের আগের আগের জন্মে কোন পাপ ছিল, সেই পাপের ফলে তারা যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলেও তুমি দোষী হচ্ছে না। এই চারটি ভাবে কোন কাজের দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করা হয়। তবে যারা ঠিক ঠিক ধর্ম পথে চলে তাদের কিন্তু আমি বোধটা চলে যায়। তখন সে দেখে প্রেরণা ঈশ্বর দেন বা তিনিই সব কিছু করছেন বা প্রারব্ধ বশতঃ হচ্ছে বা দৈবাৎ। আমি ভাবনাটা কোথাও থাকে না। আর যখন উপলব্ধি হয় সে তখন দেখে ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন আর তা নাহলে দেখে আত্মাই সব কিছু হয়েছেন। কর্মের ব্যাপারেও ঠিক তাই হয়ে যায়। কর্মের ব্যাপারে দেখে ঈশ্বর এই কর্মের প্রেরক, ঈশ্বর চুম্বক আর লোহাটা ঘুরছে, তাহলে ঈশ্বর নিজেই করছেন। আর তা নাহলে দেখবে কর্মফলের জন্যই যা কিছু হচ্ছে। চতুর্থ বাই চান্স, তখন ঐ রকম পরিস্থিতি হয়েছিল তাই এই রকম হয়ে গেছে। কোথাও তো তোমার কোন কিছুতেই দোষ হচ্ছে না, তুমি নিজের উপর সব কিছু নিচ্ছ কেন। এই কথা কাকে বলা হচ্ছে? যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেব বলছেন। তাই বলে আমার আপনার উপর এই নিয়ম চলবে না কারণ যুধিষ্ঠির হলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, যিনি ধর্মপ্রাণ পুরুষ তাকেই এই কথা বলা যায়।

ব্যাসদেব বলছেন ‘যে ঠিক ঠিক বোধ করে ঈশ্বরই সব কিছু করছেন তখন তার আর কোন পাপ লাগে না, পুণ্যটাও পাবে না। ব্যাসদেব শেষে বলছেন ‘নিজের ধর্ম যদি দোষযুক্ত হয় তাও শরীর ত্যাগ করতে নেই’। তার মানে বলতে চাইছেন আমার যে ধর্ম সেই ধর্মও দোষযুক্ত হওয়ার সম্ভবনা আছে, দোষযুক্ত যদি হয়েও যায় তাও শরীর ত্যাগ করতে নেই। কারণ শরীর যদি থেকে যায় তাহলে প্রায়শ্চিত্ত করে সেই দোষকে কাটিয়ে দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। যেমন ধর্মব্যবধানের কাহিনীতে ধর্মব্যবধানের যে কর্ম সেটা দোষযুক্ত কর্ম, ঐ কর্মের মধ্যে হিংসা ভাবটা আছে। এখন যদি ধর্মব্যবধান বলে আমি এই হিংসা কর্ম করেছি তাই আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেব। তাহলে যে দোষযুক্ত কর্ম করেছিল সেটা তার থেকেই গেল। তাহলে এর উপায় কি? প্রায়শ্চিত্ত কর্ম কর, প্রায়শ্চিত্ত কর্ম করা হয়ে গেল আবার পুরোটাই খুলে গেল। সেইজন্য যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেব বলছেন ‘তুমি যে বলছ এত লোকের প্রাণ নিতে হয়েছে এর জন্য প্রাণ দিয়ে দেবে, এই কাজ তুমি কক্ষণ করতে যেও না’।

### কাল, কর্মবাদ, বিধাতা ও কালের পরিহাস

ব্যাসদেব আবার বলছেন *হেতুমাত্রমিদং তস্য বিহিতং ভরতর্ষভ। যদ্বন্তি ভূতৈর্ভূতানি তদস্য রূপমৈশ্বরম্।।১৩/৩৩/১৮।* ‘এই কাল যুদ্ধকে নিমিত্ত বানিয়েছে আর প্রাণি দিয়ে প্রাণিকে বধ করাটাও একটা ঈশ্বরীয় রূপ’। কালের দুটো অর্থ হয়, একটা অর্থ হল সময় আরেকটি অর্থ দৈব। এই শ্লোক যে ভাবকে প্রকাশ করেছে এটা অত্যন্ত উচ্চ ভাব। আমরা ছোটবেলা থেকে এত ধর্ম কথা শুনে আসছি যে অনেক কথা আমরা না বুঝেই গ্রহণ করে নিয়েছি। কিন্তু খুব উচ্চ অবস্থা না হলে এই শ্লোকের ভাবকে ঠিক ঠিক গ্রহণ করা যায় না। আর এই ভাবটা সত্যিই খুব উচ্চ অবস্থার। যুদ্ধকে নিমিত্ত করে কাল মানুষকে দিয়ে মানুষকে বধ করায় এটি অত্যন্ত উচ্চ অবস্থার কথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে ঠিক এই কথাই বলছেন – *কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎপ্রব্রুদো* – আমি হলাম কাল, মানুষের মধ্যে আসুরিক প্রবৃত্তির মাত্রা এত বৃদ্ধি পেয়ে গেছে যে এদের ক্ষয় করার জন্য আমাকে এখন এই বিশ্বরূপ ধারণ করতে হয়েছে। এখানে অন্য ভাবে বলছেন কাল এখন যুদ্ধকে নিমিত্ত করে এদেরকে বধ করছে, এটাই তাঁর ঈশ্বরীয় রূপ। কাল সাধারণতঃ বিমূর্ত, আমরা যখন এসেছিলাম তখন তিনটে বেজেছিল এখন চারটে বাজে, কাল এক ঘণ্টা এগিয়ে গেছে। কিন্তু এই কালেরই ঈশ্বরীয় রূপ হল যখন এক অপরকে দিয়ে বধ করাচ্ছে বা কাউকে দিয়ে আমার সম্বন্ধনা দিয়ে বিরাট কিছু বানিয়ে দেওয়া হল, এটাও তাঁর ঈশ্বরীয় রূপ। বিনাশ, সৃষ্টি, স্থিতি সবই ঈশ্বরীয় রূপ। এই ঈশ্বরীয় রূপকেই আমরা কখন বলছি কাল, কখন বলছি কপাল আবার কখন বলছি ভাগ্য। পুরো সংসারকে নিয়ে যে সৃষ্টি প্রলয় হয় সেটাকে বলা হয় কাল।

আলোচনার প্রথম দিকে বলা হয়েছিল মহাভারতে কর্মবাদের উপর খুব বেশী মাত্রায় জোর দেওয়া হয়েছে। এখানে বলছেন এই কাল জীবের পাপ-পুণ্যের সাক্ষী, কর্মের দড়ির সাহায্যে কাল জীবকে ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখ রূপী ফল দেয়। এর তাৎপর্য হল, আমি পাপ-পুণ্য যাই করে থাকি না কেন, এই পাপ-পুণ্যকে কে দেখছেন? কাল, ঈশ্বর দেখেন। ঈশ্বরের এই রূপকে বিধাতা বলা হয়। এই বিধাতাই সব ফল দেন। কিভাবে দেন? কর্মের দড়ি দিয়ে বাঁধা। আমি যা কিছুই করি না কেন, কর্মের দড়ির মাধ্যমে সেই কৃত কর্মটা বাঁধা হয়ে যাচ্ছে। কর্মমণ্ডল অ্যাক্সপ্রেসে এ২-৩৭ এ আমার সিট বুক করা আছে, হাওড়া স্টেশন থেকে এত ট্রেন ছাড়ছে ঢুকছে এত ভিড়ের মধ্যে আমার সিট ঠিক করা আছে। কিভাবে ঠিক হয়ে আছে? যখন টিকিট কাটা হল তখনই আমি কর্মের দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়ে গেলাম, যা কিছুই হয়ে যাক আমাকে ঐ সিটে ঠিক বসিয়ে দেবে। কর্মের দড়ির দৃষ্ট রূপ হল ঐ টিকিটটা। আর কর্মের ফলটা কি? হাওড়া স্টেশনে ঐ হাজার হাজার লোকের মধ্যে ঠেলাঠেলির মধ্যে দেখছি এসি কামরায় আমার বার্থটা রাখা আছে, এটাই হল কর্মফল। আর কর্ম যদি খারাপ হয়ে থাকে তাহলে দেখব আমার বার্থে আগে থাকতেই পাঁচজন বসে আছে। এই কাল সুখ-দুঃখ রূপে আমার পাপ-পুণ্যের ফল দেন। এই সংযোগটা কিভাবে হয়? কর্মের দড়ি দিয়ে বাঁধা। আমি যে রকমটি কর্ম করেছি সেই দড়ি দিয়েই সংযোগটা হবে। কর্মের এই তত্ত্ব ঠিক না ভুল আমাদের জানার কোন উপায় নেই। কিন্তু হিন্দুরা এই তত্ত্ব নিয়েই বড় হয়েছে, এই তত্ত্বকে মাথায় রেখেই বড় হচ্ছে। এর প্রমাণ কি? ধর্মই প্রমাণ, কারণ ধর্ম অনুবর্তনি যারা তাদের কাছে ধর্মই প্রমাণ।

ব্যাসদেব বলছেন *আত্মনশ্চ বিজানীহি নিয়তব্রতশীলতাম্। যদা তুমীদ্রশং কর্ম বিধিনাক্রম্য কারিতঃ।।* ১৩/৩৩/২১। ‘যুধিষ্ঠির তুমি নিজেকেই দেখো, তুমি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, তুমি একজন সাধুপুরুষ, শান্তিপ্রিয় কিন্তু তাও ঈশ্বর তোমাকে নিমিত্ত করে এত অপ্রিয় অশান্তিজনক স্বজনবিনাশের মত একটা কাজ করিয়ে নিলেন। সেইজন্য বলা হয় কালই সব থেকে বেশী বলবান’। কালের পরিহাস অত্যন্ত নির্মম। কি রকম? গান্ধীজী বললেন অহিংসার কথা, আর তিনি চাইলেন দেশের স্বাধীনতা। কিভাবে স্বাধীনতা আসবে? অহিংস আন্দোলনে। শেষ পর্যন্ত যখন ভারত পাকিস্তান ভাগ করে দেশের স্বাধীনতা এল তখন দেশ ভাগের ফলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় দশ লক্ষ লোক না কুড়ি লক্ষ লোক কাটা পড়ল তার কোন হিসেব নেই। কিন্তু যুদ্ধ যদি হত তাহলে এর থেকে অনেক কম লোক মারা যেত। আর ঘর ছাড়া হয়েছে কয়েক কোটি লোক। কালের কি ক্রুর পরিহাস, যে লোকটি অহিংসার কথা বলে এসেছেন, পুলিশ লাঠি মারতে এসেছে তিনি বলছেন ‘এই আমার মাথা থাকল তুমি লাঠি মারতে হয় মারো’ কোন প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করলেন না। সেই লোকের নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতা এলো ভারতকে তিনটে টুকরো করে। আর কয়েক দিনের মধ্যে দশ কি কুড়ি লাখ লোকের গলা কেটে দেওয়া হল, আজ পর্যন্ত যার হিসেব কেউ দিতে পারল না। তার সাথে কয়েক কোটি লোক দেশ ছাড়া হলেন। মানবজাতির ইতিহাসে এত বৃহত্তর বাস্তবচ্যুত ঘটনা আজ পর্যন্ত হয়নি। নেহেরু আরও মজার কাজ করলেন। তিনি বললেন ‘আমি গণতন্ত্র নিয়ে আসব, প্রজাতন্ত্রের মাধ্যমে ভারতকে আমি একসূত্রে বেঁধে দেব, আমি ধর্ম মানিনা, আমি জাত মানিনা, কে গরু খাচ্ছে, কে গরু খাচ্ছে না এগুলো আমি কিছুই মানিনা’। কিন্তু কালের এমনই পরিহাস আজকে ভারতে কটি টুকরো আছে কেউ জানেনা, আর সবারই আলাদা নিয়ম, মুসলিমদের আলাদা নিয়ম, শিখদের আলাদা নিয়ম, তফসিলী জাতিদের আলাদা নিয়ম, আদিবাসীদের জন্য আলাদা নিয়ম, মানে নেহেরু থাকতে থাকতেই হাজার জনের হাজার নিয়ম করে দেশটাকে হাজারটা টুকরো করা হয়ে গেল। নেহেরুই পরে বলে দিলেন মুসলিমদের জন্য আলাদা পার্সোনাল ল হবে, দলিতদের জন্য আলাদা সংরক্ষণ হবে, আদিবাসীদের জন্য আলাদা সংরক্ষণ হবে, কাশ্মীরের আলাদা নিয়ম হবে। আর তার ফল সারা ভারত এখন ভুগছে। এই হল কালের নির্মম পরিহাস। যুধিষ্ঠির এত শান্তিপ্রিয়, নীতিপ্রিয় লোক, তাকে দিয়ে যত রকমের অনীতি করিয়ে, অশান্তি ঘটিয়ে এক কোটি সৈন্যকে মারিয়ে তারপর বললেন এবার তুমি রাজা হও। কালের হাতে মানুষ অসহায়। তা সত্ত্বেও মানুষ যখন ক্ষমতার জোরে হস্তিত্ব করে তখন আমাদের হাসি পায়। তখন মনে হয় এরা কি কেউ মহাভারত পড়েনি! ইতিহাসে কি রকম হয়েছে একটু দেখো! কাল তোমাকে শক্তি দিয়ে যাবে, বড় করতে থাকবে তারপর তুমি যে যে জিনিষের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আছ কাল তোমাকে নাকে দড়ি দিয়ে সেই জিনিষগুলোই করিয়ে ছাড়বে। যে মুখ্যমন্ত্রী এতদিন তার বিরোধীদের নামে কত কি বলে গেছেন পরে সেই বিরোধীদের হাতে তাকে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে মুখ নীচু করে বেরিয়ে আসতে হল। ইন্দিরা গান্ধী বললেন আমি শিখদের উপর বেশী আস্থা রাখি, সেই শিখ দেহরক্ষীই গুলি করে তাঁর শরীরটাকে ঝাঁঝা করে দিল, এটাই কালের পরিহাস। কালকে যে এইভাবে দেখতে শিখবে তখন সে বুঝতে পারবে আমার নিজস্ব শক্তি বলতে কিছুই নেই। ব্যাসদেব এটাই বলছেন তুমি ধর্মপরায়ণ লোক কিন্তু কাল তোমাকে দিয়ে কি করিয়ে নিল! সেইজন্য যুধিষ্ঠির তোমাকে বলছি তুমি এভাবে নিজের উপর সব দোষ টেনে নিয়ে আত্মঘাতী হবার চিন্তাও করো না। তুমি তো এই যুদ্ধ চাইছিলে না, তুমি যদি যুদ্ধ চাইতে তাহলে সমস্যার কথা উঠত।

### কার পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান নেই

ব্যাসদেব এবার যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন ‘তোমার মনের মধ্যে যে এত পীড়া উঠছে এগুলোকে উঠতে দিও না, তার থেকে বরং তুমি যুদ্ধে যে এত লোক মারা গেছে তার জন্য তুমি একটা প্রায়শ্চিত্ত করে নাও তাতেই সব মিটে যাবে। অধর্মরূপো ধর্মো হি কশ্চিদস্তি নরাধিপ। ধর্মশ্চাধর্মরূপোহস্তি তচ্চ জ্ঞেয়ং বিপশ্চিতা। ১৩/৩৩/৩২। হে নরশ্রেষ্ঠ! কখন কখন অধর্মই ধর্ম রূপে আসে আবার কখন ধর্ম অধর্ম রূপে আসে’। মহাভারতের এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক। কৌশিক মুনির কাহিনী এর আগে আলোচনা হয়েছিল। তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকব। একবার এক পথিককে ডাকাতরা তাড়া করতেই সেই পথিক কৌশিক মুনির আশ্রমে গিয়ে লুকিয়েছিল। ডাকাতরা এসে কৌশিক মুনি পথিকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন। কৌশিক মুনি ঠিক করে আছে আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকব, তিনি ডাকাতদের দেখিয়ে দিয়েছেন। ডাকাতরা সেই পথিকের গলা কেটে দিয়ে সব কেড়ে নিল। তখন এই পাপটা কৌশিক মুনির উপরও লেগেছিল। তখন যদি তিনি সত্যি কথা না বলতেন তখন অধর্মটাই ধর্ম হয়ে যেত।

যে কোন পাপই কেউ করে থাকুক না কেন, সেই পাপের জন্য একটা প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া আছে। প্রায়শ্চিত্তের বিধান কার নেই? যো হি পাপসমারম্ভে কার্যো তদ্ভাবভাবিতঃ। কুর্বন্নপি তথৈব স্যাৎ কৃত্বা চ নিরপত্রপঃ।। তস্মিংশ্চ কলুষং সর্বং সমাপ্তমিতি শব্দিতম্। প্রায়শ্চিত্তং তস্যাস্তি হ্রাসো বা পাপকর্মণঃ।। ১৩/৩৩/৩৫-৩৬। বলছেন যখন ১) কাজ করার আগেও পাপের ভাবনা রেখে সব সময় পাপ কাজ করতে নেমে যাচ্ছে। ২) করার সময়ও এটা পাপ কাজ জেনেও সেই পাপ কাজই যে করতে থাকে। ৩) করার পরেও এই পাপ কাজের জন্য লজ্জিত হয় না। এই তিনটে ভাব যাদের মধ্যে থাকে তাদের মধ্যে পাপ পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, এদের জন্য কোন প্রায়শ্চিত্তের বিধান নেই। এরা যখনই কোন পাপকর্ম করে তখন তাদের হৃদয়ের মধ্যে ভেবে নিয়েই করে যে আমি পাপকর্ম করছি। যারা পেশাদারী খুনী হয় তারা ঠিকই করে নেয় যে আমি একে খুন করব। কেন খুন করব একে? একে মারার জন্য আমি দু লাখ টাকা পেয়েছি। এরাও কিন্তু বলে আমি কি করব আমার বউ বাচ্চার পেটা চালাবার জন্য করতে হচ্ছে, এতেও কিন্তু এরা বাঁচবে না। কারণ তুমি যে পাপকর্ম করতে যাচ্ছ তখন তোমার এই বোধ হচ্ছে কি যে আমি পাপকর্ম করতে যাচ্ছি। হ্যাঁ আমার সেই বোধ আছে, এটা গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় হল গুলি মারার সময় কি তোমার মনে হচ্ছে আমি পাপকর্ম করছি? হ্যাঁ সেটাও আছে। আর যখন লোকটা মরে গেল তখন কি আমি এই পাপকর্ম করলাম বলে আমার মধ্যে লজ্জা হচ্ছে কিনা? তখনও নেই। যার মধ্যে এই তিনটেই আছে সে পাপে পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে আর তার জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। প্রায়শ্চিত্তের বিধান যদিও থাকত তাহলেও সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইত না। কেউ কেউ করে। কি রকম করে? শনিবার কি মঙ্গলবার হনুমান মন্দিরে গিয়ে পাঁচ টাকার লাড্ডু চড়িয়ে বলবে যা করলাম হনুমানজী সব ক্ষমা করে দেবে। হনুমানজী এদের কি ক্ষমা করবেন তা হনুমানজীই জানেন।

তাই ব্যাসদেব বলছেন ‘যুধিষ্ঠির তোমার তো প্রথমেই মনে হয়েছিল এই যুদ্ধ করাটা ভুল, যুদ্ধ করার সময়েও মনে হচ্ছিল ভুল করছি আর এখনও তাই মনে হচ্ছে, তাই প্রায়শ্চিত্ত করে নাও সব অশান্তি মিটে যাবে’। আমরা অনেক সময় অনেক কিছুই করতে চাইনা কিন্তু বাধ্য হয়ে সেই কাজই করতে হয়, হয়তো ঐ কাজটা না করলে আমার প্রাণ চলে যাবে। প্রাণ দিয়ে দিলে তো কোন লাভ হবে না। তাই ঐ পাপ কাজটা করে প্রায়শ্চিত্ত করে নিলে সব মিটে যায়। যুধিষ্ঠির তখন জানতে চাইছেন প্রায়শ্চিত্তটা ব্যাপারটা কি? তখন ব্যাসদেব বলছেন ‘মানুষ যখন শাস্ত্রবিহিত কর্ম না করে নিষিদ্ধ কর্ম করে তখন সেই নিষিদ্ধ কর্ম করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়’। আমাদের সবাইকে কয়েক রকমের কর্ম করতে হয় ১) নিত্যকর্ম, যে কর্মগুলি প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে করতে হবে, যেমন স্নান করা, ঠাকুর পূজা করা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ করা, জপধ্যান করা। ২) নৈমিত্তিক কর্ম, নিমিত্ত থেকে নৈমিত্তিক এসেছে। কিছু কিছু বিশেষ দিনে কিছু বিশেষ কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন মহালয়ার দিন পিতৃপুরুষদের তর্পণ করতে হয়। ৩) কাম্য কর্ম, মনের মধ্যে কিছু কামনা আছে সেগুলোকে পূরণ করার জন্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা। যেমন আমার ছেলের একটা চাকরি হোক, বাড়িতে খুব অশান্তি চলছে সেই অশান্তিকে দূর করতে হবে, মেয়ের বিয়ে হোক, এই সব হবার জন্য শাস্ত্রবিহিত যে পূজা বা যজ্ঞ করাটা হল কাম্য কর্ম। ৪) নিষিদ্ধ কর্ম, যে কর্মগুলোকে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হচ্ছে এই এই কর্ম তুমি করবে না, হিংসা করবে না, মিথ্যা কথা বলবে না, চুরি করবে না। এগুলো সব নিষিদ্ধ কর্ম, এই কর্ম কখনই করতে পারবে না। আবার সংস্কৃতে খুব নামকরা কথা আছে ‘অকরণে প্রত্যবায়’, না করলে পাপ। যেমন নিত্যকর্ম না করলে পাপ, সকালে উঠে স্নান না করলে,

পূজো জপধ্যান না করলে, পঞ্চ যজ্ঞ না করলে পাপ। আবার নিষিদ্ধ কর্ম করলে পাপ। কিছু জিনিষ করলে পাপ আবার কিছু জিনিষ না করলে পাপ। প্রায়শ্চিত্ত হল যেটা করার কথা সেটা করছি না, তখন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

### কোন কোন কাজে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়

যুধিষ্ঠির জিহ্বেস করছেন পাপী কাকে বলে আর কি কি পাপ কাজ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। মহাভারতে এর উপর বিরাট লম্বা তালিকা দিচ্ছে। মনুস্মৃতি যদিও স্মৃতিগ্রন্থ কিন্তু তাতেও এত বড় তালিকা নেই। আমরা এখানে কয়েকটি শুধু উল্লেখ করে যাচ্ছি। দাদা অবিবাহিত থাকতে যদি ছোট ভাই বিয়ে করে নেয় তাতে পাপ হবে। যে ব্রহ্মহত্যা করে অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণকে হত্যা করে ও যে অপরের নিন্দা করে। অপরের নিন্দা করা আর ব্রহ্মহত্যাকে একসঙ্গে রাখা হয়েছে। ব্রহ্মহত্যাতে যে পাপ অপরের নিন্দা করলে একই পাপ হবে। ছোট বোনকে বিয়ে করার পর তারই বড় বোনকে পরে বিয়ে করা পাপ। তারপরই বলছেন বড় বোন থাকতে তার ছোট বোনকে যে বিয়ে করে। যে ব্রহ্মচারীর ব্রত নষ্ট হয়ে গেছে। যে অপাত্রকে দান করে। এরপরেই বলছেন সুপাত্র ব্রাহ্মণকে যদি স্বর্ণাদি দান না করা হয়। যে মাংস বিক্রী করে, যে অপরের বাড়িতে আগুন লাগায়। যে পয়সার বিনিময়ে বেদ পড়ায়। বেদ পড়ানোর ব্যাপারে আগেকার দিনে খুব সমস্যা ছিল, পয়সা নিয়ে বেদ তো পড়াতে পারবে না, তার উপর যাকে তাকে বিনা পয়সাতে বেদ পড়ানোও একটা বড় পাপ। মনুস্মৃতিতে বলাই আছে আগেকার দিনে শূদ্ররা অনেক কায়দা করে কিভাবে কিভাবে বেদ জেনে যেতে, তখন আবার যজ্ঞ-যাগ করতে হত। এরপর বলছেন যে স্ত্রীকে বধ করে। যে শূদ্রকে বধ করে। মহাভারতের সময় শূদ্রকে বধ করা বড় পাপ ছিল। যে মিথ্যে কথা বলে পেট চালায়, উকিলরা মিথ্যে কথা বলেই পয়সা রোজগার করে। যারা গুরুকে অপমান করে। যে নিজের ধর্মকে ত্যাগ করে অপরের ধর্মের আচরণ করে, মানে ব্রাহ্মণ হয়ে ক্ষত্রিয়ের মত আচরণ করছে। যে যজ্ঞের অধিকারী নয় তাকে দিয়ে যজ্ঞ করালে পাপ হবে। অভক্ষ খাদ্য খেলে পাপ লাগবে। অভক্ষের আবার বিরাট তালিকা দেওয়া হয়েছে যেমন বলছেন ন ভক্ষয়তে গ্রাম্য কুঙ্কটম্ মানে গ্রামের মুরগী খাবে না, অথচ এখন প্রচুর লোক মুরগী খাচ্ছে, খুব গোঁড়া ব্রাহ্মণরাই এখনও খায় না। হিন্দুদের প্রধানতঃ গরু আর মুরগী খেতে নিষেধ করে, এর বাইরে অন্য কিছু খাওয়ার নিষেধ খুব একটা নেই। তারপর বলছেন যে পশুপাখী বধ করে, অথচ ব্যাধগীতা মহাভারতেরই অংশ সেখানে যদিও ব্যাধ নিজে বধ করছে না, কিন্তু শিকারীরা মেরে এনে তার কাছে বিক্রী করছে। আবার বলছেন যে নিজের বাবার সাথে ঝগড়া করে। এই সব বলার পর বলছেন যদি কোন ব্রাহ্মণ আততায়ী হয়ে যায়, আততায়ীর আবার কতকগুলি শর্ত আছে, যারা অপরকে হত্যা করে, বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করে, পরস্পরী অপহরণ করছে ইত্যাদি, সেই ব্রাহ্মণকে তখন মেরে ফেললে কোন পাপ হয় না। অজান্তায় বা প্রাণ সঙ্কটে চিকিৎসার কারণেও যদি মদ পান করে থাকে তাহলে কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ হতে হবে। তারপরে পাঁচটা অবস্থা ব্যতিরেকে, মানে নিজের বা অপরের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ইত্যাদি যে পাঁচটি অবস্থার কথা বলা হয়েছিল, ওর বাইরে কখন মিথ্যে কথা বলা যাবে না। এখানে আবার আরেকটি অবস্থার কথা বলা হচ্ছে গুরুর কার্য সাধনের জন্যও মিথ্যা কথা বলা যাবে, আবার বলছেন স্ত্রীকে সুখী করার জন্য মিথ্যে কথা বললে তাতে পাপ হয় না।

প্রায়শ্চিত্তের কথা বলতে গিয়ে ব্যাসদেব বলছে তপসা কর্মণা চৈব প্রদানেন চ ভারত। পুনর্নতি পাপং পুরুষঃ পুনশ্চেন্ন প্রবর্ততে। ১৩/৩৫/১। বলছেন প্রায়শ্চিত্ত তিন ভাবে করা হয় – ১) তপস্যা, ২) যজ্ঞাদি কর্ম ও ৩) দান। কিন্তু এগুলো করার পর সে যেন পুনরায় পাপে না প্রবৃত্ত হয়। তখনকার দিনে প্রায়শ্চিত্তের যে সব বিধানগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলো এত কঠোর ছিল যে পালন করা খুবই দুষ্কর ছিল। যেমন ব্রহ্মহত্যা করলে তাকে প্রথমে বারো বছর ভিক্ষা করে একবেলা খেতে হবে, নিজের সব কাজ নিজেকেই করতে হবে আর হাতে সব সময় খাটিয়ার একটা পায়া এবং একটা মাটির পাত্র রাখতে হবে। আমি যে ব্রহ্মহত্যা করেছি এটা হল তার চিহ্ন। এর সাথে তাকে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে যেতে হবে, মাটিতে শোবে আর সবাইকে বলতে থাকবে আমি এই পাপ করেছি। এই রকম একেকটি পাপের জন্য বিভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের বিধানের কথা বলে যাচ্ছেন। যেমন একটা বলছেন, যে একবার মদ পান করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত হল আগুনের মত গরম করে মদকে আরেকবার খেতে হবে। যে গুরুপত্নির সাথে সমাগম করবে সে একটা লোহার পাত্রকে খুব গরম করবে আর তার উপর তাকে শুয়ে থাকতে হবে। এগুলো কিন্তু শূদ্রদের জন্য বলা হচ্ছে না, যারা উচ্চবর্ণের তাদের জন্য এই সব প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হচ্ছে। যে মিথ্যে কথা বলেছে তাহলে যাকে মিথ্যে কথা বলেছে তাকে যদি একটা ভালো উপহার দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তার ওতেই প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। কারুর যদি টাকা নিয়ে থাকে তাহলে খুব কায়দা করে ঐ টাকাটা ফেরত দিয়ে দিলে ঐ পাপটা পরীক্ষার হয়ে যাবে। শেষ যেটা প্রায়শ্চিত্তের কথা বলছেন সেটা হল – পবিত্র স্থানে অল্লাহারী হয়ে, রাগ-দ্বেষ, মান-অপমান শূন্য হয়ে মৌন ভাবে গায়ত্রী জপ করলে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

এখানে কিন্তু বলা হয়নি কত দিন এই ভাবে গায়ত্রী জপ করতে হবে। এখানে একটা শর্ত লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, পরে যেন আর সে এই পাপ না করে, পরে যদি আবার পাপ করে তাহলে আগের পাপটাও এখনকার পাপের সঙ্গে জুড়ে থাকবে। আসলে শেষ কথা এটাই, আমরা জান্তায় ও অজান্তায় অনেক পাপ করে থাকি, কিন্তু ইষ্টমন্ত্র জপ করলে সব পাপই পরিস্কার হয়ে যায়। আরেকটি কথা বলছেন, যে নিত্য শুভকর্মের অনুষ্ঠান করে, পাপকর্ম থেকে বিরত হয়ে প্রতিদিন যদি কিছু দান করতে থাকে তাহলেও সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এখানে বলছেন অজান্তায় যদি কোন পাপ কাজ করে ফেলে তাহলে তার পাপটাও কম লাগবে, কিন্তু জেনেশুনে পাপ কর্ম করলে তার পাপের ফলটাও বেশী লাগবে। বৌদ্ধদের একটা প্রচলিত কাহিনী আছে তাতে কিন্তু এর ঠিক উল্টো বলা হয়েছে। সেখানে বলছে জেনেশুনে পাপ করলে তার পাপটা কম হয়, অজান্তায় করলে পাপটা বেশী হয়। যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ডকে অজান্তায় কেউ ধরে তার হাতটা বেশী পুড়বে, কিন্তু জেনে ধরলে তার কম পুড়বে কারণ সে সাবধান হয়ে যাচ্ছে। তবে একজন যদি একটা ভুল কাজ করে ফেলেছে আরেকজন আগে থাকতেই পরিকল্পনা করেই পাপ কাজে নেমে পড়ে তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না।

### যুধিষ্ঠিরের কাছে চার্বাকের আবির্ভাব

এইভাবে অনেক কথা বলে বোঝানর পর যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে আসা হয়েছে হস্তিনাপুরে রাজা হওয়ার জন্য। যুধিষ্ঠির রাজা হওয়ার পর একদিন হঠাৎ এক ব্রাহ্মণ, এর নাম চার্বাক, এসে যুধিষ্ঠিরকে গায়ের জোরে বলছে ‘হে রাজা! এই যত ব্রাহ্মণ আছে আমি হলাম সবার মুখপাত্র। তুমি যে এত লোককে মেরেছে এতে তুমি বিরাট পাপ করেছ, সেইজন্য তোমার বেঁচে থাকাটা কোন ভাবেই মঙ্গল নয়, তুমি মরে গেলেই মঙ্গল’। এই চার্বাকের নামেই তখন একটা দর্শন প্রচলিত ছিল, যার নামই ছিল চার্বাক দর্শন। চার্বাকের মুখে এই কথা শুনেই ওখানে যত ব্রাহ্মণরা ছিল তারা হতবাক হয়ে গেছে, কারণ কোন ব্রাহ্মণই তাকে এই ধরনের কথা বলেননি, কেউ তাকে মুখপাত্রও করেননি। তখন ব্রাহ্মণরা বলছেন ‘হে যুধিষ্ঠির! এই যে একে দেখছ, এ হচ্ছে একটা রাক্ষস। এই চার্বাক আবার দুর্যোধনের বন্ধু। সন্ন্যাসীর বেশে এসে এই চার্বাক আমাদের অহিত করতে চাইছে আর তোমারও অহিত করতে চাইছে। আমাদের এই ধরনের কোন মত নেই, আপনিই রাজা হয়ে দীর্ঘ দিন রাজত্ব করুন’। এই কথা বলেই সব ব্রাহ্মণ একটা জোরে হুঙ্কার দিল। ঐ হুঙ্কার দিতেই চার্বাক ওখানেই মরে পড়ে গেল। চার্বাকের এই একটা উল্লেখ মহাভারতে আসছে পরের দিকে যেটা পৃথক একটা দর্শন রূপে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

**পিতামহ ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর** (পুরুষার্থ ও প্রারন্ধের প্রসঙ্গ—প্রজার স্বার্থে রাজার আচরণ—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের সামঞ্জস্য—সেবক ও কর্মচারীর প্রতি রাজার দৃষ্টিভঙ্গী—রাজা হওয়ার যোগ্যতা—রাজার ছয় ধরনের মানুষকে ত্যাগ)

যুধিষ্ঠির এখন রাজা হয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণও হস্তিনাপুরে এসেছেন। সেখান থেকে তিনি পিতামহ ভীষ্মকে দর্শন করতে গেছেন। ভীষ্ম এখনও শরশয্যায় শায়িত, তাতে তাঁর শারীরিক কিছু কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এমন একটা কিছু করে দিলেন তাতে ভীষ্মের সব কষ্টগুলো দূর হয়ে গেছে। ভীষ্ম বলছেন ‘আমি এখন ত্রিকালদর্শি হয়ে গেছি, কোথায় কি হচ্ছে সব দেখতে পাচ্ছি, যে জিনিষটা যেমন সেটাকে স্পষ্ট ভাবে দেখছি’। পিতামহ ভীষ্ম এখন খুব উচ্চ অবস্থায় বিচরণ করছেন। শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এসে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন ‘পিতামহ ভীষ্ম এখন খুব উচ্চ অবস্থায় রয়েছেন, তুমি পিতামহের কাছে চল, তাঁর কাছ থেকে তুমি অনেক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে’। তাই যুধিষ্ঠির এখন থেকে প্রায়ই হস্তিনাপুর থেকে কুরুক্ষেত্রে পিতামহ ভীষ্মের কাছে যাচ্ছেন, সেখানে গিয়ে যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে অনেক প্রশ্ন করছেন আর ভীষ্মও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। যুধিষ্ঠির প্রথমে পিতামহ ভীষ্মকে রাজধর্মের উপর প্রশ্ন করছেন।

যুধিষ্ঠির রাজধর্ম নিয়ে পিতামহ ভীষ্মকে কিছু প্রশ্ন করেছেন। মহাভারতে রাজা শুধু প্রশাসনের অধ্যক্ষই নন, তিনি সকল প্রজাকুলের পিতার মত, পিতা যেমন সন্তানকে আশ্রয় দিয়ে তাকে সব সময় রক্ষা করেন, রাজাও প্রজাদের সব দিক থেকে রক্ষা করেন। ভীষ্ম যদিও রাজধর্মের উপরই বেশী বলছেন কিন্তু এই ব্যাপার গুলো শুধু যে রাজাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে তা নয়, যারা গৃহস্থ রূপে সব কিছু সামলাবার দায়িত্বে আছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। ভীষ্ম বলছেন **উত্থানেন সদা পুত্র প্রযতেথা যুধিষ্ঠির। নহ্যথানমতে দৈবং রাজ্যমর্থং প্রসাধয়েৎ।।১৩/৫৫/১৪।** ‘পুত্র যুধিষ্ঠির তুমি সব সময় পুরুষার্থের জন্য লেগে থাকবে, পুরুষার্থ ছাড়া প্রারন্ধ রাজার কোন কাজে লাগে না’। এখানে কয়েকটি বিষয় বারবার আমাদের আলোচনার মধ্যে উঠে আসবে। তারমধ্যে দুটো হল পুরুষার্থ আর প্রারন্ধ। প্রারন্ধকে অনেক সময় বলা হয় দৈব আর পুরুষার্থকে অনেক সময় বলবে পুরুষকার। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে কোন কর্মই করিনা তাতে একটা নির্দিষ্ট ‘ক’ পরিমাণ প্রচেষ্টা করি আর নিয়মমত তার একটা নির্দিষ্ট ‘খ’ পরিমাণ ফল হওয়ার কথা। যেমন বলা হয়

কয়লার ইঞ্জিনে যদি একশ কিলো কয়লা দেওয়া হয় তার ৩০ শতাংশ ফল পাওয়া যাবে আবার ডিজেল ইঞ্জিনে একশ লিটার ডিজেল দিলে তার ৮০ শতাংশের বেশী ফল পাওয়া যাবে। কয়লার তুলনায় ডিজলে আড়াই থেকে তিন গুণ ফল বেশী পাওয়া যাবে। এবার আমি আর আমার দাদা একই কোম্পানীর একই মডেলের দুটো গাড়ী একই দিনে কিনলাম। আমরা দুই ভাই একই ভাবে চালাচ্ছি, দুজনেই সমান ভাবে গাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ করে যাচ্ছি। কিছু দিন পরে এক লিটার পেট্রোলে যেখানে পনেরো কিলোমিটার যাওয়ার কথা দুই ভাইয়ের ক্ষেত্রে গাড়ীর মাইলেজ অন্য রকম দিতে থাকবে। একজনের হয়ত পনের কিমি যাচ্ছে আরেকজনের সাড়ে চৌদ্দ কিমি হতে শুরু হয়ে গেছে। এই পার্থক্যটা কিছুতেই সমাধান করা যাবে না। যদি একজনের কপাল আরও খারাপ থাকে তাহলে হয়তো ট্যাক্স লিক হয়ে যাবে নয়তো ড্রাইভার তেল চুরি করবে, এই করে দেখা যাবে মাইলেজ বারো তেরোতে নেমে গেছে। তার মানে যে ‘খ’ পরিমাণ হওয়ার কথা সেটা পাচ্ছে না, পাচ্ছে ‘গ’ পরিমাণ মাইলেজ। এই ‘গ’ যেটা হয় সেটা হয় ‘ক’ আর ‘খ’ এর যোগ বিয়োগে যেটা দাঁড়াবে, হয় একটু বেশী পাবে নয়তো একটু কম পাবে। আমার কাছে এক বিঘে জমি আছে, আমি জানি এক বিঘেতে চাষ করলে আমি দু মণ ধান পাব। কিন্তু কোন বছরই আমি দু মণ ধান পাবো না। কোন বছর দু মণ থেকে হয়তো দশ সের বেশী পেলাম আবার কোন বছর দু মণ থেকে দশ সের কম পাব। দু মণ কখনই দেবে না। গত বছর যদি দু মণ দশ সের পেয়ে থাকি পরের বছর আর দু মণ দশ সের দেবে না, একটু কম বেশী হবেই। এই যে কিছুতেই একই পরিমাণ ফল দিচ্ছে না, এটা হয় দৈব বা প্রারন্ধের কারণে।

এই জন্য গৃহস্থকে বলা হয় তুমি চেষ্টা করে যাও, পুরুষার্থে লেগে থাক, প্রারন্ধ নিজের মত আসবে, সে তোমাকে হয় উপরে নিয়ে যাবে নয়তো নীচে নিয়ে যাবে। এই প্রারন্ধ তোমাকে যদি নীচে নিয়ে যায় বা উপরে নিয়ে যায় এই নিয়ে তুমি কখন দুষ্টিন্তা করবে না, কারণ এটাই তোমার প্রারন্ধ। কর্ম করার পর যেটা পাবে প্রারন্ধ মনে করে সেটাকে নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট হয়ে গিয়ে শান্ত হয়ে যাও। এটাই শাস্ত্রের বাণী। সাধু সন্ন্যাসীদের বলা হচ্ছে তুমি কোন চেষ্টা করতে যাবে না, তোমার কপালে যেটা আছে সেটা আপনা থেকেই তোমার কাছে এসে যাবে। কিন্তু সংসারীরা সবটাই করবে পুরুষার্থের উপর, তোমার ধর্ম কর্ম সব কিছুই হবে পুরুষার্থ। আর সাংসারিক ব্যাপারগুলোকে যতটা পারবে আশ্তে আশ্তে প্রারন্ধের দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু সেটা না করতে পারলেও পুরোটাই, ধর্ম কর্ম আর জাগতিক যা কিছু কর্ম হবে সবটাই পুরুষার্থের জন্য করবে। সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে এই নিয়মটা পাল্টে যায়। সন্ন্যাসীদের বলা হয় জাগতিক ব্যাপারে যা কিছু আছে তার পুরোটাই ছেড়ে দেবে প্রারন্ধের উপর আর আধ্যাত্মিক ব্যাপারটা পুরোপুরি পুরুষার্থের উপর রাখতে হবে। সংসারী যদি বলে টাকা-পয়সা যা আসার ঠাকুরই জুটিয়ে দেবেন আমি কিছু করতে যাব না, তাহলে কিন্তু সে বিপদে পড়ে যাবে। সংসারীর যদি এই মনোভাব হয় তাহলে তুমি সন্ন্যাসী হয়ে যাও। সংসারে থাকা মানেই জোর কদমে পুরুষার্থ করে যেতে হবে। আর সন্ন্যাসী যদি বলে জপ-ধ্যান যা করার ঠাকুরই করিয়ে নেবেন তাহলে সেই সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস জীবন শেষ হতে আর বাকি থাকবে না। ঠাকুরের কথাগুলো শুনে অনেকেই ভুল বোঝেন, ঠাকুর এই কথাগুলো বলেছিলেন অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পন্ন পুরুষদের। অন্য দিকে হাজরা মশাই নিষ্কর্মা হয়ে জপ করতেন বলে ঠাকুর তাকে ঢামনা শালা বলে গালাগাল দিচ্ছেন। বাড়িতে তাঁর বুড়িমা কাঁদছেন, কষ্টে পড়ে আছেন তাঁকে দেখছেন না। ঠাকুরের কাছে কোন ছোকড়া গেলেই আগে জিজ্ঞেস করতেন বাড়িতে সব ঠিকঠাক আছে কিনা, খাবার-দাবারের ব্যবস্থা আছে কিনা। ঠাকুরের উচ্চ আধ্যাত্মিক কথাগুলো এখন চলে গেছে সাধারণের হাতে তাই সবাই বলতে শুরু করে দিয়েছে কাজ করাটা জীবনের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মুখুরা বুঝতে পারছে না তোমার কাছে কাজকর্ম করাটাই এখন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। যার আছে হেথা তার আছে সেথা। যে এখানে কাঙাল সে মরেও পরলোকে কাঙাল। সেইজন্য বারবার বলা হচ্ছে মহাভারত হল পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র। মহাভারত না পড়লে ধর্ম বুঝতেই পারবে না। কেউ মহাভারত পড়ে না, তাই সন্ন্যাসীর ধর্ম গৃহস্থরা নিয়ে নিচ্ছে গৃহস্থের ধর্ম সন্ন্যাসীরা নিয়ে নিচ্ছে।

ভীষ্ম এই কথাই যুধিষ্ঠিরকে বলছেন ‘তুমি এখন রাজা, তুমি গৃহস্থামী, এখন তুমি আর প্রারন্ধের উপর নির্ভর করবে না, তোমার একমাত্র অবলম্বন পুরুষার্থ। তবে জানবে যে কোন কাজের সিদ্ধির জন্য পুরুষার্থ আর প্রারন্ধ এই দুটোই আবশ্যিক। কিন্তু আমি পুরুষার্থকেই প্রাধান্য দিতে বলছি। যাদের সব কাজকর্ম শেষ হয়ে গেছে আর উচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পন্ন হয়ে গেছেন তাঁরাই প্রারন্ধের জোরে সব কিছু পেয়ে যান। প্রারন্ধ সাধারণ লোকদের জন্য কখনই নয়। প্রারন্ধে যেটা আসার কথা সেটা নিশ্চিত হয়ে আছে, তুমি এটাই পাবে। সেইজন্য বিপুলে চ সমারন্তে সন্তাপং মাস্য বৈ কৃথাঃ। ঘটস্বৈবং সদাত্মানং রাজ্ঞামেষ পরো নয়ঃ। ১৩/৫৫/১৬। কোন কারণে যদি তোমার কার্যসিদ্ধি না হয় তাহলে মন



খারাপ করে কখনই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে না। আবার দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে পুরুষার্থে নেমে যাবে। এটাই রাজার প্রধান নীতি। কারণ তোমার প্রারন্ধে গোলমাল আছে। প্রারন্ধ আর পুরুষার্থ সিদ্ধির লক্ষ্যে উড়ে যাওয়ার দুটো ডানা। এইভাবে দ্বিগুণ উৎসাহে করতে করতে এক সময় এই যে চেষ্টা করে যাচ্ছি আর এর ফল যখন আসতে থাকবে তখন তাতে মন্দ প্রারন্ধটা ঠিকে হয়ে যাবে। প্রারন্ধ খারাপের জন্য যদি তুমি চেষ্টাই না কর তাহলে তো তোমার কোনটাই হবে না। সেইজন্য যুধিষ্ঠির! তুমি সব সময় সাবধান থাকবে, প্রারন্ধের উপর কখনই ভরসা করবে না’।

ভীষ্ম বলছেন ঋষীনামপি রাজেন্দ্র সত্যমেব পরং ধনম্। তথা রাজ্ঞাং পরং সত্যান্নান্যদ্বিশ্বাসকারণম্।। ১৩/৫৫/১৮। ঋষিদের জন্যে সত্যই হল পরম ধন আর রাজাদের জন্যও সত্যই পরম ধন, এই কথাটাকে তুমি মাথায় রেখে কখন মিথ্যাচার করবে না। রাজার সত্য ব্যতীত অপর কোন ব্যবহারই প্রজার বিশ্বাসের কারণ হয় না। আর ঐ যে বলা হয় নিজের প্রাণ রক্ষা অপরের প্রাণ রক্ষার জন্য মিথ্যে কথা বলবে, এগুলো রাজার উপর খাটে না। রাজা এখন ওপরে চলে গেছে তার জন্য এগুলো আর দরকার পড়ে না। তবে কোন রাজা যদি সবার সঙ্গে নরম ব্যবহার করে তখন লোকেরা সেই রাজাকে উল্লঙ্ঘন করতে শুরু করে। সেইজন্য তোমাকে এই ব্যাপারে খুব সজাগ থাকতে হবে। আবার সবার সঙ্গে যদি রাজা কঠোর ও নির্দয় ব্যবহার করে তখন সব লোক রাজাকে ভয় পেয়ে এড়িয়ে চলবে। তাই তোমাকে বলছি যখন দরকার তখন কঠোর হবে যখন প্রয়োজন হবে তখন নরম হবে’। আদর্শ মা সেইই হয়, যে মা নিজের সন্তানকে প্রচণ্ড ভালোবাসবে আবার প্রয়োজনে সন্তানের উপর প্রচণ্ড কড়া হবে। সব মায়েরাই নিজের সন্তানকে ভালোবাসবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু যে মা সন্তানের উপর একেবারেই কড়া মনোভাব না দেখিয়ে অন্যায় কাজে প্রশ্রয় দিয়ে যায় সেই ছেলেমেয়েরাই বড় হয়ে সমাজের অভিশাপ হয়। আবার যে মা সন্তানকে সব সময় শাসনই করে যাচ্ছে সেই ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ বরবাদ হয়। স্নেহ আর শাসনের মধ্যে সব সময় সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে।

ভীষ্ম একটা পুরনো শ্লোককে নিয়ে এসে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন অদ্যোহুগ্নির্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মানো লোহমুখিতম্। তেষাং সর্বত্রগং তেজঃ স্বাসু যোনিষু শাম্যতি।। ১৩/৫৫/২৪। অগ্নির জন্ম জল থেকে হয়, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ থেকে জন্ম নেয় আর লোহা পাথর থেকে জন্ম নেয়। সেইজন্য এক অপরের তেজ নাশ করে। উপনিষদে যেমন বলছে – আকাশ আকাশদ্বায়ে বায়োগ্নী অগ্নেঃ আপ। আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল। এখানে কিন্তু উল্টো বলা হচ্ছে – অদ্যোহুগ্নি। কোথাও কোথাও বলা হয় জল থেকে অগ্নির জন্ম। এখানে বলা হচ্ছে, যে জল থেকে অগ্নির জন্ম হচ্ছে সেই জল দিয়েই অগ্নিকে শান্ত করা হয় আবার অগ্নির তেজে জল বাষ্প হয়ে যায়, লোহা যেমন পাথরকে আটকে দেয় পাথর আবার লোহাকে আটকে দেয় ঠিক তেমনি ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় এক অপরের তেজকে হ্রাস করে দেয়। এই সব কথা শুনলে আমাদের অবাক হয়ে যেতে হয় আমাদের পূর্বজন্মের চিন্তাভাবনা কত গভীর আর সুদূর প্রসারী। দেখা গেছে যে সমাজ শক্তিকে কদর করে না, শক্তি সঞ্চয়ের যদি উদ্যোগী না হয় তাহলে সেই সমাজের বিনাশ হতে দেরী হয় না। ভারত এই ব্যাপারটা অনেক আগেই বুঝে নিয়েছিল, সেইজন্য আমাদের দেশ ক্ষত্রিয়কে অনেক উপরে নিয়ে চলে গেছে, ক্ষত্রিয়দের কাজই ছিল শক্তি সঞ্চয় করা আর সেই শক্তির লাগাম দিয়ে সামাজিক স্থিতিশীলতাকে ধরে রাখা। কিন্তু ক্ষত্রিয়কে যদি শক্তি সঞ্চয়ের ব্যাপারে লাগাম ছাড়া করে দেওয়া হয় তখন রোমান সাম্রাজ্যের জুলিয়াস সিজারের মত অবস্থা হয়ে যাবে। ক্ষত্রিয়ের এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্রাহ্মণদের এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তুমি রাজা হতে পার কিন্তু তোমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে ব্রাহ্মণরা। অন্য দিকে ব্রাহ্মণরা হত কাণ্ডাল, এই ভাবে এক অপরকে ঠিক রাখত। ভীষ্ম বলছেন সেইজন্য তুমি ব্রাহ্মণদের মুখোমুখি হলেই তাঁদের প্রণাম করে সম্মান দেখাবে। ব্রাহ্মণরাই তোমাকে সব দিক থেকে সংযত রাখবে।

খুব সুন্দর একটা শ্লোকে ভীষ্ম বলছেন যথা হি গর্ভিণী হিত্বা স্বং প্রিয়ং মনসোহনুগম্। গর্ভস্য হিতমাধত্তে তথা রাজ্ঞাপ্যসংশয়ম্।। বর্তিতব্যং কুরুশ্রেষ্ঠ সদা ধর্মানুবর্তিনা। স্বং প্রিয়ন্তু পরিত্যজ্য যদল্লোকহিতং ভবেৎ।। ১৩/৫৫/৪৫-৪৬। গর্ভিণী স্ত্রী মনে অনুকূল প্রিয় পতিকেও পরিত্যাগ করে গর্ভস্থ সন্তানের হিতসাধন করে। অন্তঃসত্ত্বা নারীর যদি কিছু খেতে ভালো লাগে, কিছু পরিধান করতে ভালো লাগে সে কিন্তু সেই রকম করে না, সে যা কিছু করে তার গর্ভস্থিত সন্তানের কথা মাথায় রেখেই সব কিছু করে। গর্ভবতী নারীর যদি কিছু খেতে ভালো লাগছে বলে সেটা খেতে চাইছে তখন তার শাণ্ডী তাকে খেতে নিষেধ করে, বউমা তুমি এখন এই খাবারটা খেও না, এতে তোমার গর্ভের শিশুর ক্ষতি হবে। তখন গর্ভিণী সেটা আর খায় না। রাজার ঠিক তাই কর্তব্য, রাজার নিজের যদি কিছু করতে ভালো লাগে তাও তাতে যদি সাধারণ প্রজার যদি কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে রাজা তখন সেটা করবে না। এক ভদ্রলোকের দুটো

ছেলে ছিল, দুজনেই অল্প বয়সের। ভদ্রলোক খুব পান খেতেন। একদিন বড়ছেলে বলছে বাবা আমি পান খাবো। বাবা বলছে না পান খেও না। ছেলে বলছে কেন খাবো না তুমিও তো পান খাও। বাবা বলছে বড়রা খেতে পারে। বড়ছেলে বলছে আমিও তো ভাইয়ের থেকে বড়, তাহলে আমি কেন খাবো না! ভদ্রলোক সেই দিন থেকে পান খাওয়া ছেড়ে দিলেন। বাড়ির মঙ্গলের জন্য নিজের ভালো লাগার জিনিষও ছেড়ে দিতে হয়। কারণ রাজা প্রজার দায়িত্ব নিয়েছে, যে গৃহকর্তা সেও বাড়ির সবার দায়িত্ব নিয়েছে। এই দায়িত্ব নেওয়ার জন্য রাজা বা গৃহকর্তা সম্মান পাচ্ছেন, কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। তখন তাঁকেও সবার মঙ্গলের জন্য তাঁর কিছু ভালো লাগার জিনিষকে ছেড়ে দিতে হয়। যেমন সন্ধ্যাসী, সেও কিছু দায়িত্ব নিয়েছে। তার কোন কিছুর ইচ্ছে থাকলেও করতে পারবে না। সন্ধ্যাসীকে এখন সমাজের স্বার্থে, লোকশিক্ষার জন্য অনেক কিছু করতে নেই। এখানে রাজা বলতে যে নেতা, যে নেতৃত্ব দিচ্ছে তার কথাও বলা হচ্ছে।

ভীষ্ম বলছেন ‘যুধিষ্ঠির! তুমি এখন রাজা হয়েছ, তোমার এখন অনেক সেবক হয়েছে, এদেরকে তুমি পয়সা দিয়ে নিযুক্ত করেছ। কিন্তু এদের সঙ্গে কখন বেশী বন্ধুত্ব করতে যাবে না’। ম্যানেজমেন্টের উপর খুব নামকরা একটা বই আছে What they did not teach me at the Harvard School of Management সেখানেও তারা বলছে, আপনার যে স্টাফ, যাদের আপনি মাইনে দিয়ে রেখেছেন, তাদের সাথে সামাজিক স্তরে কখন মেলামেশা করবেন না। সোশ্যালিস্টিক আইডিয়াতে অনেক বড় বড় কথা বলা হয়, আমি তুমি সবাই সমান। কিন্তু এখানে কেউই সমান নয় Inequality is the first law of human life। এই অসমানের মধ্যে আমি কোথায় অবস্থান করছি সেটা আমাকেই ভেবে চিন্তে বার করতে হবে। যারা এটা মানবে না তারা অশান্তিকেই বরণ করবে। হিন্দু সমাজ এটাকে প্রথম থেকেই মেনেছিল। সমান হবে ঠিকই, কিন্তু কোথায় গিয়ে সমান হবে? আত্মজ্ঞানে, ব্রহ্মজ্ঞানে গিয়ে সমানতা হয়। কিন্তু সমাজে কখনই সমানতা হয় না।

একটা গল্প আছে যাতে একটা খুব স্বাধীনচেতা ও প্রগতিবাদী মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। বিয়েতে এখন পার্টি হবে। মেয়েটি ঠিক করেছে পার্টিতে প্রথম সারিতে যে টেবিল পাতা হয়েছে তাতে যারা নিচু শ্রেণীর বা গরীব তাদের বসান হবে আর যারা খুব গণ্যমান্য ব্যক্তি তাদের পেছনের সারিতে বসান হবে। মেয়ের বাবা এই ব্যবস্থা মানবেন না, এই নিয়ে মেয়ের সাথে বিরাট ঝগড়া, মেয়ে বলছে এই ব্যবস্থাই থাকবে। মেয়েটি তখন তার গুরুর কাছে গেছে। গুরু বললেন – এটি করো না। কেন? এটি করলে তিনটে ঝামেলা হবে। প্রথম কথা, নিচুদের যদি সামনের দিকে বসায় তাহলে তারা সঙ্কোচের জন্য ভালোমত খেতেই পারবে না, দ্বিতীয় ঝামেলা তোমার বাড়ির লোকদের অস্বস্তি বোধ হবে, তৃতীয় ভিআইপি অতিথিরা তারা সবাই বড়লোক, মনে করবে তাদের অপমানিত করা হয়েছে। এটাই এর পরিণাম। যে প্রশাসনে বলা হয় মালিকও যা শ্রমিকও তাই, বুঝে নিতে হবে সেই প্রশাসন আর বেশী দিন চলবে না, ঝামেলা শুরু হল বলে। কথাগুলো শুনতে খুবই ভালো লাগে। যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁরা আবার এর মধ্যে তন্মাত্রার ব্যাপারটাকেও মাথায় রাখেন। যার তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা আধ্যাত্মিক পুরুষরা কখনই করবেন না। ভীষ্ম এটাই বলছেন ‘যখনই তুমি তোমার সেবকদের সাথে ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে থাকবে, তাদের সাথে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে থাকবে তখন কিন্তু তারা তোমাকে আর মর্যাদা দেবে না। এমন কি অনেক সময় তারা তাদের মর্যাদাকেও উল্ঙ্খন করে দেবে। যখন তুমি তাকে কোন কাজে পাঠাবে তখন প্রথমেই তোমার মুখের উপর বলে দেবে এই কাজ করা যাবে না, এতে তোমারও সন্দেহ হবে কাজটা ঠিক হবে কিনা। আর রাজার যেসব দোষ ত্রুটি আছে সেগুলোকে বাইরে প্রকাশ করতে শুরু করবে। যে জিনিষ রাজার কাছে চাওয়ার কথা নয় সেগুলোও সে রাজার কাছে চেয়ে বসবে। তাই না, রাজার জন্য যা কিছু রাখা থাকে সেগুলো নিজেরাই ব্যবহার করতে শুরু করে দেবে। রাজার জন্য যে খাবার রাখা আছে সেটা নিজেরাই আগে খেতে শুরু করে দেবে। এইভাবে তারা তাদের মর্যাদা রেখা অতিক্রম করতে শুরু করে দেয়। এদের তোমায় অসম্মান করতে বলা হচ্ছে না, নিশ্চয়ই সম্মান করবে কিন্তু একটা সীমারেখা পর্যন্ত সেই সম্মানটাকে বেঁধে রাখবে। এদেরকে যদি তুমি মাথায় তুলে দাও তখন এমন অনেক পরিস্থিতি আসবে যখন এরা তোমার মুখের উপর গালাগাল দিতে থাকবে, যদি গালাগাল নাও দেয় অন্য ভাবে তোমাকে অপমান করবে। রাজার সামনেই এরা নিজেদের রাগকে প্রকাশ করে ফেলে’। এত কিছু বলার পর অন্য দিকে আবার বলছেন ‘তুমি তাদের দেখাশোনা করবে। তুমি যদি এদের ঠিক ঠিক দেখাশোনা কর আর একটা দূরত্ব বজায় রেখে ব্যবহার করতে থাক তাহলে এদের কোন সাহস হবে না কোন ধরণের গোলমাল করার’।

‘যুধিষ্ঠির তুমি যদি এদেরকে বেশী প্রশ্রয় দাও তাহলে এরা একটা সময় ঘুষ নিতে শুরু করে দেবে’। ঘুষ নেওয়া, দুর্নীতি এগুলো ভারতের চিরন্তন সমস্যা। ভীষ্ম বলছে ‘রাজার কাছে বসে থাকার সময় এরা মুখ খুলে হাই তুলবে, আবার রাজার সামনেই থুতু ফেলবে’। মহাভারতেই দেখানো হচ্ছে কিভাবে ভদ্র আচার আচরণ করতে হয়, এখানে বলছে হাই

তোলা এগুলো খুব খারাপ আচরণ। এরা কত অভদ্র হয়ে যেতে পারে এগুলো তারই কিছু দৃষ্টান্ত। আবার প্রকাশ্যে প্রজাদের সামনেও রাজার সঙ্গে এরা বন্ধুর মত আচরণ করতে থাকবে। সবার সামনে রাজা হয়তো কিছু ঠিক করল সেই সময় এরা বলতে শুরু করবে যে রাজা এই কাজ তোমার দ্বারা হবে না। এই কারণেই বলা হচ্ছে চাকর-বাকর, কর্মচারী, অধঃস্তনদের একটা সীমার মধ্যে কখনই আসতে দিতে নেই। যারাই এদের নিয়ে আদিখ্যেতা দেখাবে তারাই মরবে। এদেরকে বোধগম্য করিয়ে দিতে হবে ইনি আমার মালিক আমার হিতৈষী, ভালো-মন্দ সব ব্যাপারে ইনি আমার পাশে আছেন, এর বাইরে আর কোন কিছুতে মাথা গলাতে দেবে না। ‘যুধিষ্ঠির তুমি যদি এইভাবে সেবকের সাথে সম্পর্ক না তৈরী করতে পার, বাচ্চারা যেমন পাখির পায়ে দড়ি বেঁধে নাচাতে থাকে ঠিক তেমনি এরা মালিককে নাচাতে থাকে’। এইভাবে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম বলতে গিয়ে সেবকদের সাথে রাজা কি ধরনের আচরণ করবে বলে সাবধান করে দিচ্ছেন। যদি কোন শিক্ষক বলে আমি সব ছাত্রকে সমান ভালোবাসি তাহলে বুঝতে হবে তিনি একজন অযোগ্য শিক্ষক। অযোগ্য শিক্ষকের এটাই সব থেকে বড় লক্ষণ, যে শিক্ষক বলে আমি আমার সব ছাত্রকে সমান ভালোবাসি। যিনি যোগ্য শিক্ষক তিনি সব সময় একজন দুজন ছাত্রকে বেশী ভালোবাসবেন। যে ছাত্রের মধ্যে মেধা, বুদ্ধি, ক্ষমতা বেশী তাকে শিক্ষক সব সময়ই একটু বেশী ভালোবাসবে, দ্রোণাচার্যেরও অর্জুন ছিল, ঠাকুরের নরেন ও রাখাল ছিল। আসলে যে শিক্ষক বলছেন আমি সব ছাত্রকে ভালোবাসি তাহলে বুঝতে হবে সেই শিক্ষক কাউকেই ভালোবাসেন না। কোন মাও তার পাঁচটা সন্তানকে সমান ভালোবাসতে পারেনা। এই কারণে বলা হয় Inequality is the first law of human life। অনেক লোক এইসব কথা শুনলে আঁতকে উঠবেন কিন্তু এইটাই বাস্তব।

অন্য দিকে রাজার কর্তব্যের ব্যাপারে বলতে গিয়ে ভীষ্ম বলছেন *গুরোরপ্যবলিগুস্য কার্যাকার্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য দণ্ডো ভবতি শাস্ততঃ।।১৩/৫৬/৭।* ‘যে মানুষ অহঙ্কারে মত্ত, কর্তব্য অকর্তব্যের ব্যাপারে তার তখন জ্ঞান থাকবে না, সে যদি গুরুজনও হয় তাকে তুমি দণ্ড দেবে’। এই কথাটা বলা হচ্ছে রাজাকে, আমার আপনার জন্য এই কথা নয়। এরপর বলছেন রাজা হওয়ার যোগ্যতা কার আছে। যে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, ক্রোধ জয় করেছে, শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলিকে যে ঠিক ঠিক জানে, যে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে এই চারটে পুরুষার্থে নিরন্তর প্রযত্নশীল, বেদের জ্ঞান আছে, নিজের মনের ভেতরে কি বিচার করেছে সেটাকে কখন বাইরের কাউকে জানতে দেয় না। এই ধরনের গুণ যার মধ্যে আছে সেই রাজা হওয়ার যোগ্য। রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? নিজের বাড়িতে শিশু যেমন নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়, যে রাজ্যে সাধারণ প্রজারা নির্ভয়ে বাস করে সেই রাজ্যের রাজাই শ্রেষ্ঠ।

এরপর রাজাকে কিছু কথা বলা হচ্ছে, রাজাকে বলতে গিয়ে এই কথাগুলো প্রত্যেক মানুষের জন্যই বলা হচ্ছে। *ষড়ৈতান্ পুরুষো জহ্যাতিহ্নাং নাবমিবার্ণবে। অপ্রবক্তারমাচার্য্যমনধীয়ানমৃতিজম্। অরক্ষিতারং রাজানং ভার্য্যাং চাপ্রিয়বাদিনীম্। গ্রামকামঞ্চ গোপালং বনকামঞ্চ নাপিতম্।।১৩/৫৬/৪৪-৪৫।* সমুদ্র যাত্রার সময় যে নৌকা ভেঙে যায় তখন সেই নৌকাকে ত্যাগ করে দিতে হয়। ঠিক তেমনি মানুষকে ছয় ধরনের লোককে ত্যাগ করতে হয় – ১) অপ্রবক্তারমাচার্য্যম্, যে আচার্য উপদেশ দেয় না। ২) অনধীয়ানমৃতিজম্, যে ঋত্বিক বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করে না, বেদ জানে অথচ বেদ মন্ত্রের উচ্চারণ করে না। ৩) অরক্ষিতারং রাজানম্, যে রাজা রক্ষা করতে পারেনা, আগেকার দিনে যখন প্রজারা দেখত রাজা তাদের রক্ষা করছে না তখন তারা সেই রাজ্য ছেড়ে চলে যেত। ৪) যে স্ত্রী কটু কথা বলে। ৫) যে গোয়ালী গ্রামে বসে থাকতে চায়, আসলে গবাদি পশুদের খাওয়ার জন্য গ্রামের বাইরে খোলা মাঠে-ঘাটে নিয়ে যেতে হয়, এখন যে গোয়ালী বলে আমি গ্রামের বাইরে যাব না তখন সেই গোয়ালীকে আর গ্রামে রাখা যাবে না। ৬) যে নাপিত বনে থাকতে চাইছে, মানে একা একা থাকতে চায়, তাহলে সেই নাপিতকে নিয়ে লোকের কি হবে যে নাপিত একা একা থাকতে চাইছে, চুলই কাটতে চাইছে না। এগুলো হল পুরনো সব প্রচল কথা।

এইভাবে রাজার অনেক কর্মের কথা বলে যাচ্ছেন। এরমধ্যে একটা খুব নামকরা কাহিনী রাজা বেণের কথা বলা হচ্ছে। রাজা বেণ ছিলেন খুব কঠোর রাজা। তখন মহর্ষিরা হুঙ্কার দিয়ে বেণকে মেরে দিয়েছে। রাজা এখন মরে গেছে, রাজা ছাড়া রাজ্য চলতে পারেনা। তখন মহর্ষিরা মৃত বেণ রাজার হাতকে দলাই মলাই করে মন্ত্রশক্তি দিয়ে সেখান থেকে এক সন্তানের উৎপত্তি করলেন, তার নাম হল পৃথু। পৃথু ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মপরায়ণ লোক ছিলেন। সেই পৃথু যখন রাজা হলেন তখন এই বসুন্ধরার সব কিছু ঠিক ঠিক চলতে শুরু করল। বলে এই পৃথুর নাম থেকেই বসুন্ধরার নাম পৃথিবী হয়েছে। পৃথু এই পৃথিবীর ভূমিটা যেটা কোথাও উঁচু পাহাড় বা ঢিপি ছিল, কোথাও নীচু ছিল সমস্ত জমিটাকে সমান

করলেন। গরু ঠিক ভাবে দুধ দিত না, বৃক্ষ সময়ে ফল দিত না। তিনি তাঁর ধনুর দ্বারা উঁচু জমিকে সমান করে দিলেন, যেটা নীচু ছিল সেই জায়গাটাকে ভরাট করে দিলেন। যার জন্য আমাদের লাঙলগুলো দেখতে অনেকটা ধনুর মতই হয়। সেই থেকেই কেউ কাহিনী তৈরী করে দিয়েছে।

### তৎকালীন সমাজের বর্ণধর্ম

ভীষ্ম অনেক কিছু বর্ণনা করার পর যুধিষ্ঠিরকে বর্ণধর্ম সম্বন্ধে বলছেন। বর্ণধর্ম বলতে গিয়ে ভীষ্ম নয়টি সাধারণ ধর্মের কথা বলছেন যেগুলো চারটি বর্ণের সবাইকে পালন করতে বলা হচ্ছে অক্রোধঃ সত্যবচনং সংবিভাগঃ ক্ষমা তথা। প্রজনঃ স্বেষু দারেষু শৌচমদ্রোহ এব চ। আর্জবং ভৃত্যভরণং নবৈতে সার্ববর্ণিকাঃ। ব্রাহ্মণস্য তু যো ধর্মস্তত্তে বক্ষ্যামি কেবলম্। ১৩/৫৯/৯-১০। ‘কারুর উপর ক্রোধ করবে না, সত্য কথা বলবে, টাকা-পয়সা যা আসবে তা মিলে মিশে ভোগ করবে, ক্ষমা ভাব রাখবে, নিজের স্ত্রীর সাথে রমণ, পবিত্রতা, কাহারও প্রতি দ্রোহ না করা, সরলতা এবং পোষ্যবর্ণের ভরণপোষণ করা। ব্রাহ্মণের চিরন্তন ধর্ম হল ইন্দ্রিয়দমন এবং বেদভ্যাস, সর্বদা শান্ত স্বভাব, প্রসন্নচিত্ত, যজ্ঞ করা আর ব্রাহ্মণ সমস্ত প্রাণীরই সুহৃৎ হবে’। যারা নিম্নশ্রেণীর লোক ছিল বিশেষ করে শূদ্রদের অনেক কিছু ব্যাপারে স্বাধীনতা ছিল। আমাদের জাতিপ্রথাকে নিয়ে বিদেশীরা যেমন নিন্দা করে, আমাদের দেশের অনেক বুদ্ধিজীবী, তাত্ত্বিক নেতারাও নিন্দা করে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনা বা বুঝতে চাইনা যে, যাদের তখন সম্মান দেওয়া হত তাদের থেকে অনেক কিছু ত্যাগেরও প্রত্যাশা করা হত। যেমন শূদ্র, তুমি সম্মান পাবে না কিন্তু স্বাধীনতা অনেক পাবে। ব্রাহ্মণকে বলাই হচ্ছে তুমি নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন নারীর দিকে দৃষ্টি দেবে না। কিন্তু এই ব্যাপারে শূদ্রের কোন বাধা নেই, তুমি যা খুশী করতে পার তোমাকে কেউ কিছু বলবে না কিন্তু সম্মানটাও তোমার কম থাকবে। এখন কি হচ্ছে? সবাই সব কিছুর স্বাধীনতা নিচ্ছে আবার সম্মানটাও চাইছে। তোমার যদি ত্যাগ না থাকে তাহলে তুমি কি করে সম্মান আশা করছ। বাড়িতে মায়ের সম্মান সবাই কেন করে? বাড়িতে সবার থেকে মায়ের ত্যাগ বেশী। যারা জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে দিনরাত গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে তারা বলছে আমি যা খুশী করব, মদ খাব, মাতলাম করব, আমি দশটা মেয়ের সঙ্গ করব, কিন্তু সম্মান আমাকে সবার থেকে বেশী করতে হবে। এইভাবে সমাজ চলতে পারেনা। ভারতের ইতিহাসে কত ঝড়-ঝাপটা এসেছে তাও ব্রাহ্মণরা নিজেদের আদর্শ থেকে এক চুলও সরে আসেনি কিন্তু এখন এক ভোগবাদের ধাক্কাতেই সব উড়ে গেছে। অবাধ হয়ে আমাদের এখন ভাবতে হয় ভারতের কি দিন আসছে! ভারতকে যারা ধরে রেখেছিলেন তাঁরা তাঁদের ত্যাগ তপস্যার জোরেই দেশটাকে ধরে রেখেছিলেন, তখন তাঁদের একটা আদর্শ ছিল। তখনকার দিনের যত বড় বড় পণ্ডিতরা ছিলেন তাঁরা কোন কামিনী-কাঞ্চনের দিকে তাঁদের মনকে যেতে দিতেন না।

ক্ষত্রিয়দের ধর্ম হল দান করবে কিন্তু কখন কোন কিছু যাচনা করবে না। ক্ষত্রিয় যজ্ঞ করতে পারে কিন্তু কখন যজ্ঞ করাতে পারবে না। অধ্যায়ণ করবে কিন্তু অধ্যাপনা করতে পারবে না। ক্ষত্রিয় সব ভাবে প্রজাদের রক্ষা করবে এবং নিজের শৌর্য বীর্য দেখাবে। বৈশ্যদেরও একই রকমের। শূদ্রদের নিয়েও অনেক কথা বলা হচ্ছে, এখানে শূদ্রদের নিয়ে অত কথায় না গিয়ে একটা কথা বলে দেওয়া যায়। আজকের দিনের শূদ্রের সাথে মহাভারতের সময়কার শূদ্রের অনেক তফাৎ আছে। সেই সময় যাদের মধ্যে কাম-বাসনা অত্যধিক ছিল তাদেরকে তারা শূদ্র করে দিত। দ্বিতীয় কথা হল যদিও আর্থীরা বাইরে থেকে ভারতে এসেছিল এই তথ্যকে কেউ মানে না, যাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক মনস্কতার অভাব ছিল ও আচার ব্যবহারের দিক থেকে যারা নিম্ন প্রকৃতির ছিল তাদেরকেই তারা শূদ্র বানিয়ে দিত। পরের দিকে তারা বলতে শুরু করলেন যারা খারাপ কর্ম করে তারা পরে গিয়ে শূদ্র হয়ে জন্মায়। তাঁরা দেখলেন যাদের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই তাকে যদি সব রকমের ভোগের সুযোগ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু সমাজের অধঃপতন হতে বাধ্য। একজন ব্রিটিশ লেখক ভারতে এসে নিজের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে একটা মজার বই লিখেছেন। তিনি সেখানে বলছেন যখনই আমি ভারতের কোন হোটেলে যেতাম, গিয়ে আগে খোঁজ নিতাম হোটেলের যারা কর্মচারী আছে এরা কোন জাতের, যদি দেখতাম খুব নীচু জাতের তাহলে আর আমি সেখানে থাকতে চাইতাম না। তাঁর ধারণাই হয়ে গিয়েছিল যে এরা হোটেলের জিনিষপত্র, বিছানা ঠিক মত পরিষ্কার করবে না। ব্রুটেনে গরীব থেকে বড়লোক সবার মধ্যেই পরিচ্ছন্নতার সংস্কারের প্রভাব কাজ করে, ভারতে যেমন ধর্মের প্রভাব। কিন্তু আমাদের মধ্যে অপরিচ্ছন্নতার প্রভাব কিছুতেই কাটতে চায় না, এখানকার মানুষ রাষ্ট্র দিয়ে যেতে যেতে যেখানে সেখানে থুতু ফেলবে, প্রস্রাব করবে। এগুলো যে কত নোংরা কাজ এই ব্যাপারে আমাদের সাধারণ মানুষ এখনও সজাগ হয়নি। কিন্তু যারা ঠিক ঠিক ভদ্রলোক তারা কখনই রাষ্ট্রায় থুতু ফেলবে না, যদিও ফেলে একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে ফেলবে। এই কারণে ব্রুটেনে বলাই হয় যারা এই সব নোংরা কাজ করবে তারা সমাজের থেকে দূরে থাকবে।

আমাদের মধ্যে এখনও অনেক উচ্চবংশের ব্রাহ্মণ পরিবার আছে যাদের কঠোর নিয়ম আছে যতক্ষণ পর্যন্ত না কারুর উপনয়ন হচ্ছে ততক্ষণ তাকে যে কোন ধর্ম কাজ থেকে দূরে রাখতে হবে। এ ছাড়া মহাভারতের সময় এদের কিছু নিজস্ব নিয়ম ছিল, যেমন বলছেন শূদ্রের নিজস্ব কোন টাকা-পয়সা, সম্পত্তি থাকবে না। আমেরিকাতে যে ক্রীতদাস ছিল তাদের সাথে তখনকার এই শূদ্রের সাথে কোথাও একটা ভাব মিলে যায়। এখানে বলছেন, শূদ্রের যে মালিক থাকত সেই মালিকই তার সব কিছু। শূদ্রের জন্য যজ্ঞ আবশ্যিক, অর্থাৎ যে শূদ্র তাকেও কিন্তু যজ্ঞ করতে হবে। এই কথা বলে বলছেন, তবে সেই যজ্ঞে বৈদিক মন্ত্র প্রয়োগ করার দরকার নেই। কিন্তু যজ্ঞ তোমাকে করতেই হবে। হিন্দু তুমি যখনই হয়েছ তখনই যজ্ঞ করা তোমার বাধ্যতামূলক। তবে তোমার বর্ণ অনুযায়ী তোমার যজ্ঞের বিধি নিষেধটাও পাল্টাতে থাকবে।

কে কে কোন্ কোন্ বেদ পালন করবে, কে কি কি রকমের যজ্ঞ করবে সেই সম্বন্ধে সব কিছু বলার পর বলছেন ‘তবে কি জান যুধিষ্ঠির! মানসিক সঙ্কল্প রূপী যে ভাবনাত্মক যজ্ঞ, অর্থাৎ ভাবের যে যজ্ঞ, সেই যজ্ঞের উপর সব বর্ণের সমান অধিকার। ভাবনাত্মক যজ্ঞে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই ধরনের কোন ভেদ নেই। ঠাকুর এই ভাবটাকেই খুব সহজ করে বলছেন – ভক্তের জাত নেই। ভক্ত মানে কি? এইটাই ভাবনাত্মক যজ্ঞ, ভাবের ঘরে যে যজ্ঞ হচ্ছে। সেখানে কোথাও বলছে না যে তুমি ওমুক বর্ণের লোক বলে কৃষ্ণভক্ত হতে পারবে না, তুমি শূদ্র বলে রামভক্ত হতে পারবে না। যেমন তোমাকে কিছু কিছু ক্ষমতা দেওয়া হবে না, কিছু কিছু যজ্ঞ করার অধিকার তোমাকে দেওয়া হবে না কিন্তু ভাবনাত্মক যজ্ঞ যদি তুমি কর তাতে তোমার উপর কোন বাধা নেই। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন ভক্তের কোন জাত নেই।

তারপর আশ্রমধর্ম সম্বন্ধে বলছেন, আশ্রমধর্ম চারটি, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম এবং সন্ন্যাসাশ্রম। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে গুরু গৃহে গিয়ে বেদ অধ্যয়ন করা, যদিও এখন ব্রহ্মচর্যাশ্রম উঠে গেছে। তবে এখানে একটা বলছেন চরিত্রব্রহ্মচর্যস্য ব্রাহ্মণস্য বিশাংপতে। বৈষ্ণবচর্যাস্বদীকারঃ প্রশস্ত ইহ মোক্ষিণঃ। ১৩/৬০/৭। ‘যদি কোন মোক্ষার্থী ব্রহ্মচারীর মনে ইচ্ছা জাগে সে মোক্ষ পথে এগিয়ে যাবে, তখন তার গৃহস্থ হওয়ার দরকার নেই, ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকেই সে সরাসরি সন্ন্যাসাশ্রমে চলে যেতে পারবে’। সন্ন্যাসী ইন্দ্রিয়সংযম করে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করবে, যা পাবে সেই অনুসারেই সে জীবন নির্বাহ করবে। সন্ন্যাসী এক জায়গায় থাকবে না, সব সময় ঘুরতে থাকবে। মনুস্মৃতিতে এগুলোকে আরও বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। বর্ণাশ্রমের বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, যে ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র, ধর্মহীন, শূদ্রানারী বা কুলটা নারীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, পিশুনীবৃত্তি করে, নাচগান করে, রাজসেবক হয়, মানে রাজার চাকরি করে, এই ধরনের বিপরীত আচরণ যে করে সে ব্রাহ্মণ হলেও শূদ্র। তখন শূদ্রের উপর এর আগে যে নিয়মগুলো বলা হয়েছে এর উপরেও প্রযোজ্য হবে। এই ধরনের ব্রাহ্মণ যদি বেদ জেনে থাকে, যজ্ঞ করিয়ে থাকে তাহলেও সে শূদ্রের সমান। যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে খাওয়ার সময় ব্রাহ্মণদের পণ্ডতিতে এদের বসার ব্যবস্থা করা চলবে না।

পিতামহ ভীষ্ম পর পর যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্মের কি বিশেষত্ব আর তার প্রচুর নিয়ম ও কর্তব্যের কথা বলে যাচ্ছেন। এই ধর্ম, সেই ধর্ম করে করে, সৈন্য সঞ্চালন কিভাবে করে, রাজাদের যুদ্ধ নীতি নিয়ে বলে বলে আপৎকালীন ধর্মের কথা বলছেন।

মহাভারতের এক লক্ষ শ্লোকের মধ্যে প্রচুর কাহিনী আছে তার সাথে সাথে মানব জীবনের যত রকমের দিক আছে সেগুলোকে এর মধ্যে প্রণালীবদ্ধ করে সাজান হয়েছে। এই বিশাল ব্যাপ্তির জন্য অনেক বিদ্বদজনরা বলেন মহাভারত মাত্র একজনের রচনা নয়। আমাদের জীবনের যত রকমের সমস্যা হতে পারে তার বাইরে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, আচার ব্যবহার, ইতিহাস, ভূগোল যত কিছু জানার বিষয় আছে সব কিছুকেই মহাভারত সবার জন্য তুলে নিয়ে এসেছে। শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্র করে রাজধর্মকে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। মহাভারতে অনেকবারই রাজধর্মকে খুব গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, কারণ রাজা যদি ঠিক থাকে তাহলে বাকি সব কিছুই ঠিক মত চলবে। শান্তিপর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সব বিষয়ের উপরেই উপদেশ দিচ্ছেন। এছাড়া সাধারণ জীবনে ধর্ম, অর্থ, কামকে নিয়ে, বর্ণাশ্রমকে নিয়ে, পাপ কাকে বলে, প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে হয়, একজন স্ত্রীর কি ধরনের আচরণ হবে ইত্যাদি যত রকমের ধর্ম হতে পারে সব ধর্ম নিয়েই আলোচনা করছে। মহাভারতে যিনি বলছেন তিনি যে সব সময় নিজের কথাই বলছেন তা নয়, প্রায়ই বলবেন নীতিতে এই রকম শোনা যায়। নীতিশাস্ত্র যে তখনও ছিল বা মহাভারতের আগে থাকতেই নীতিশাস্ত্রের ব্যবহার চলে আসছিল এই কথাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকে যদি কেউ বর্তমান যুগে বিজ্ঞানে কি হচ্ছে, সাহিত্যে কি হচ্ছে, ইতিহাসে কি আছে, ধর্ম, দর্শন থেকে গুরু করে রাজনীতি সব কিছুকে মিলিয়ে যদি কোন বই লেখা হয়, তাহলে একটা বিরাট বই হবে; সেটা যা হবে এই

মহাভারতেও ঠিক তাই। শুধু যে নিজের বক্তব্য আর মত দিয়ে চলে যাচ্ছেন তা নয়, মহাভারতের আগেও সমাজে যা যা ছিল অথচ লিখিত আকারে ছিল না, আবার যা কিছু লেখা ছিল কিন্তু অত জনপ্রিয় ছিল না, কারণ লেখাপড়া চিরদিন কম লোকই জানত, সবগুলোকে একত্রিত করে মহাভারতে রেখে দেওয়া হয়েছে। এইটাই শান্তিপর্বের বৈশিষ্ট্য। শান্তিপর্বে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যেমন আছে তার সাথে সেই জিনিষগুলোকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে জিনিষগুলো মানুষকে উপরের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। তাই শান্তিপর্বে কোথাও প্রেমকথা, হিংসার কথা বা প্রতিহিংসার কথা পাওয়া যায় না। শান্তিপর্বে দেখান হচ্ছে সাধারণ মানুষ এখন যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থা থেকে সে কিভাবে নিজেকে উত্তরণ করাবে, তাই বলে সাধারণ লোককে রাজা বানিয়ে দেবে না, যে রাজা আছে তাকে কাঙাল বানিয়ে দেবে না, শূদ্রকে ব্রাহ্মণ করে দেবে না। যেখানে যে অবস্থাতে আছে সেখানে থেকেই তাকে বড় করে দেবে। তার মানে সামাজিক যে অবস্থা হয়ে আছে তার পরিবর্তন কখন করতে যাবে না কিন্তু একজন ব্যক্তিসত্তার যে অস্তিত্ব সেই ব্যক্তিসত্তা থেকে তাকে আধ্যাত্মিক ভাবে কিভাবে উপরে নিয়ে এসে সমষ্টিসত্তার সাথে এক করে দেওয়া যায় তার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তোমার জীবনে যদি দুঃখ থেকে থাকে সেটাকে কাটিয়ে দেওয়া যাবে কিন্তু সামাজিক অবস্থাকে পাল্টানো যাবে না। তোমার জীবনে ভক্তি কিভাবে আসবে, তোমার জীবনের মূল্য কিভাবে আসবে এই জিনিষগুলোর দিকে নিয়ে যাবে। তাছাড়া আদি পরম্পরতে যে দেবতারা ছিলেন, যেসব ঋষিরা ছিলেন তাদের নিজেদের মধ্যে যে কথাবার্তা সেগুলোকেও এই শান্তিপর্বে সন্নিবেশ কর হয়েছে। রাজা যখন যে যে পরিস্থিতিতে যা যা কাজ করছে, যেমন যখন দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের সঙ্গে কাজ করছে তখন দুষ্ট স্বভাব নিয়ে কাজ করছে। সেখানে বলবেন দুষ্ট কাকে বলে, তাকে কিভাবে চিনবে, তার সাথে কি রকম ব্যবহার করবে। ইন্দ্র আর বৃহস্পতির সম্বন্ধে বলবেন। এগুলো সবই ভীষ্ম বলে যাচ্ছেন। ভীষ্ম শরশয্যা পড়ে আছেন, যুধিষ্ঠির প্রতিদিন হস্তিনাপুর থেকে তাঁর কাছে যাচ্ছেন, যেমন যেমন প্রসঙ্গ উঠছে ভীষ্ম সেইভাবে বলে যাচ্ছেন।

#### শত্রু বা বিরোধীদের প্রতি রাজার আচরণ প্রসঙ্গে বৃহস্পতি নীতি

ইন্দ্র বৃহস্পতিকে জিজ্ঞেস করেছেন শত্রুর প্রতি কি ধরনের আচরণ করতে হয়। একটা খুব সহজ প্রচলন নীতি হল শত্রুর মূল উচ্ছেদ করে দাও। কিন্তু এখানে বৃহস্পতি বলছেন শত্রুর মূল উচ্ছেদ না করে কিভাবে থাকা যায়। ইতিহাসে জাতিতে জাতিতে, উপজাতিতে উপজাতিতে, সমাজে সমাজে, দুই দেশে যত লড়াই আছে তাতে একটা পদ্ধতিতে বলা হয় প্রথমে যত কটা লোক আছে সব কটাকে কেটে শেষ করে দাও, তাহলে আর কোন ঝামেলাই থাকবে না। তুমি এবার একছত্র রাজ করতে থাক। কিন্তু এখানে অন্য একটা সমস্যা এসে যায়, তুমি জমিটা পেয়ে গেলে কিন্তু কাজ করার লোক পাবে না। ইন্দ্র তাই বৃহস্পতিকে জিজ্ঞেস করেছেন এদের পুরো উচ্ছেদ না করে কিভাবে সবাইকে দখলে রাখা যাবে। যদিও বৃহস্পতি নীতি পুরোটাই একটা আলাদা বই কিন্তু এখানে যা বলা হচ্ছে এটা বৃহস্পতি নীতির অঙ্গ হিসাবে বলা যাতে পারে। এই কথাগুলো রাজধর্মের মধ্যে পড়ছে, আমার আপনার জন্য এই কথাগুলো নয়। বৃহস্পতি ইন্দ্রকে বলছেন *ন শত্রুর্বিবৃতঃ কার্যো বধমস্যাভিকাঙ্ক্ষতা। ক্রোধঃ ভয়ঃ হর্ষঃ নিয়ম্য স্বয়মাত্মনি। ১৩/১০০/৮*। যদি তুমি শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে চাও, তাকে যদি বিব্রত করে চাও, তাহল ক্রোধ, ভয় আর হর্ষ বা আনন্দ এই তিনটেকে সব সময় মনের মধ্যে চেপে রাখবে এবং শত্রুকে কখন তোমার মনের এই তিনটে অবস্থাকে জানতে দেবে না। মহাভারতের এই রাজধর্মটাই এখনও রাজনৈতিক নেতারা অনুশীলন করে যাচ্ছে। আমাদের মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন আসে রাজনীতিতে কখনই সত্য বলে কি কিছু হয় না? সত্য হলে তাহলে আর সেটা রাজনীতি কি করে হবে। এর আগে রাজধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে ভীষ্ম বলছিলেন মনের কথা কখন বাইরে প্রকাশ করবে না। তুখোড় রাজনৈতিক নেতাকে যদি এক ঘণ্টা ইন্টারভিউ নেওয়া হয় তাও তার মনে কি আছে কিছুতেই আমাকে জানতে দেবে না। যেমন কোন রাজ্যে পুলিশের গুলিতে চারজোন মারা গেছে। এবার সেই রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের কোন বড় নেতাকে গিয়ে যদি জিজ্ঞেস করা হয় পুলিশ কি এটা ঠিক কাজ করেছে? নেতা সঙ্গে সঙ্গে বলবে ‘ও! তাই নাকি! কি হয়েছে?’ ‘পুলিশের গুলিতে চারজোন মারা গেছে’। ‘কই আমার কাছে তো সেই রকম কোন খবর আসেনি’। ‘কেন খবর কাগজে দেখেননি?’ ‘খবরের কাগজে দেখেছি কিন্তু এখন রাজ্যস্তর থেকে কোন কনফার্মড খবর আসেনি’। এই করে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা কথা বলে যাবে কিন্তু নিজে থেকে কোন মন্তব্য করবে না, কোন নেগেটিভ কথা বলবে না, ভেতরে তার কি চলছে কখনই সেটা কাউকে বুঝতে দেবে না। রাজা কখনই এমন কোন কথা বলতে যাবে না, যে কথাটা তার শত্রুর কানে চলে গিয়ে তার বিপদ ডেকে আনতে পারবে। তাই রাজা তার ক্রোধ, ভয় আর আনন্দ এই তিনটেকে কখন প্রকাশ করবে না, ভেতরে চেপে রাখতে হবে। প্রশাসনের জগতে একটা থিয়োরি আছে, যাকে বলা হয়ে প্রশাসনের ‘এ’ ‘বি’ ‘সি’ ‘ডি’। ‘এ’ হচ্ছে এভয়েড, কোন ইস্যু এলেই সেটাকে এভয়েড করে দাও – যেমন, ও! তাই নাকি! এই রকম হয়েছে! কে বলেছে? অমুক বলেছে। আচ্ছা দেখছি, তবে কি

জানেন সব কথাকে তো বিশ্বাসও করা যায় না, তবে আপনি যখন বলছেন তখন ঠিকই বলছেন, আমরা দেখছি। এইভাবে এভয়েড করে যাওয়া হয়। ‘বি’ হচ্ছে বাইপাস। যখনই কোন মিটিংএ কোন ব্যাপারকে আলোচনায় নিয়ে আসা হবে, তখনই বলবে ‘হ্যাঁ, আমার জানা আছে, ওটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, ঐ কাজটা মিটে যাক তারপর দেখা যাবে’। এইভাবে বাইপাস করে যাওয়া প্রশাসনের একটা রেওয়াজ। বাড়িতে কর্তারাও গিল্লীকে বাইপাস করবে ‘কিগো আমাক যে ঐ গয়নাটা দেবে বলেছিলে, কবে দেবে’। ‘এখন পর্দাটো লাগানো হয়েছে, চিন্তা নেই হয়ে যাবে’। আবার পরে বলবে এখন বাড়িটা রঙ করতে হবে, হয়ে যাবে তুমি চিন্তা করো না। ক্রমাগত কিছু না কিছু কারণ দেখিয়ে বাইপাস করতেই থাকবে। ‘সি’ হচ্ছে কমিটি। কিছু একটা হয়ে গেলে যদি দেখে কিছুই করতে পারবে না, তখন একটা কমিটি বা কমিশন বসিয়ে দিতে হয়। আমাদের ভারতে কত রকমের কমিটি আর কমিশন চলছে সরকারই জানে না। কোনটা এক বছরের কমিটি, কোনটা দশ বছরের কমিটি চলছে তো চলছেই। শেষে কমিটির রিপোর্টে যদি কিছু গোলমাল বেরিয়ে আসে আর তাই নিয়ে যদি বিরোধীরা চেষ্টামেচি করে তখন কমিটির রিপোর্টকে কার্যকর করতে ডিলে করে দাও, ‘ডি’ ফর ডিলে। এটাই হল প্রশাসনের ‘এ’ ‘বি’ ‘সি’ ‘ডি’।

অমিত্রমুপসেবেত বিশ্বস্তভবদবিশ্বসন। প্রিয়মেব বদেন্নিত্যং নাপ্রিয়ং কিঞ্চিদাচরেৎ। ১৩/১০০/৯। শত্রুকে তুমি ভেতর থেকে যদি বিশ্বাস নাও কর, তবুও বাইরে থেকে দেখাতে হবে তোমার মত আমি আর কারুর উপর নির্ভর করিনা। আর শুধুই মিষ্টি কথা বলে যেতে হবে, অপ্রিয় কথা কখনই বলতে যাবে না। অটলবিহারি বাজপেয়ী একবার এক রাজনৈতি নেতার সম্বন্ধে বলেছিলেন ‘ইন মে বহুত গুণ হ্যায় লেকিন চুপ রহনে কি কলাই ইনো নে নহি শিখি হ্যায়’। আর রাজনীতিতে কক্ষণ অপ্রিয় কথা বলতে নেই। সমুদ্রের ভেতরে যত যাওয়া যাবে তত তার আন্দাজ পাওয়া যায় না, সেই রকম যে রাজনৈতিক নেতাদের ভেতরের কোন কিছুই আন্দাজ করা যায় না সেই সব থেকে বড় রাজনৈতিক নেতা। যে রাজনৈতিক নেতা কথায় কথায় রেগে যায় সে কোন রাজনৈতিক নেতাই নয়। চিন্তা করা যায় না, রাজনীতির এই অ আ ক খ আমাদের দেশে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে লেখা হয়ে গেছে। তবে রাজধর্ম রাজনীতি থেকে অনেক উপরে। ভীষ্ম বলছেন শুষ্ক বৈর কখন রাখবে না। আমি আপনাকে পছন্দ করিনা, কিন্তু আপনাকে আমি কিছু করতেও পারব না, মিছিমিছি একটা শত্রুতা রেখে দিয়েছি, এটাকে বলছেন শুষ্ক শত্রুতা। এই ধরনের শুষ্ক শত্রুতা থেকে সব সময় দূরে থাকতে বলছেন। যেমন ভারতের সাথে চীনের শত্রুতা, ভারত চীনকে কিছুই করতে পারবে না, কিন্তু সবাই জানে এই দুই দেশের মধ্যে একটা শত্রুতার ভাব বজায় রয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যে ভারতের শত্রুতা, এই শত্রুতাকে শুষ্ক শত্রুতা বলা যাবে না, কারণ এদের দুজনের মধ্যে থেকে থেকেই বোমাবাজি হয়ে চলেছে। তারপর বলছেন কণ্ঠা বর্জ্যায়ং বর্ধয়ে। কণ্ঠের পীড়া হয় এই রকম বাগবিতণ্ডা করবে না। যদিও এগুলো রাজধর্মে বলা হচ্ছে কিন্তু আমাদের দৈনন্দীন জীবনেও সব সময় কাজে লাগবে। যার সাথে মনোমালিন্য আছে, কোন কারণ নেই শুধু রাষ্ট্রা দিয়ে তাকে আসতে দেখেই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলাম। এগুলোই হল শুষ্ক বৈরী, এই ভাবে মুখ ঘুরিয়ে শুষ্ক শত্রুতাকে ধরে রেখে আমার কি কোন স্বার্থ সিদ্ধি হচ্ছে? কিছুই হচ্ছে না কোন উদ্দেশ্যও সিদ্ধি হচ্ছে না। শুকনো ঝগড়া, যারা দ্বারা কারুরই কোন লাভ হচ্ছে না, আমিও তাকে মারতে যাব না, সেও আমাকে মারতে আসবে না অথচ বাক্যালাপ বন্ধ, এগুলো কক্ষণ করতে নেই। আর বলছেন শত্রুর সাথে অযথা তর্কাতর্কি করে গলা ব্যাথা করতে যেও না। ব্যাধ যখন পাখী শিকার করে তখন সে পাখীদের মতই কথা বলে খুব কায়দা করে পাখীটাকে ফাঁসিয়ে নেয় তারপর গলাটি কেটে দেয়। ঠিক সেই রকম শত্রুর মতই কথা বলে ফাঁসিয়ে দিয়ে গলাটি কেটে পরিষ্কার করে দেবে। জিম করবেট জঙ্গলে যত রকমের পশুপাখী হয় সবার ডাক নকল করতে পারতেন। এই নিয়ে জিম করবেটের অনেক কাহিনী আছে। একবার তিনি জঙ্গলে বাঘিনীর গলা নকল করে ডাকছেন, ডাকটা ছিল বাঘিনী যেন তার সঙ্গী বাঘকে মিলনের আহ্বান জানাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই দূরে বাঘের গর্জন শোনা গেল, তারপর জিম করবেটের বাঘিনীর ডাকের নকল আওয়াজটা শুনে কাছে চলে এসেছে। একবার তো জিম করবেট মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন। একদিন তিনি একটা বাঘকে মারতে গিয়েছিলেন, সেখানে সেই বাঘিনীর আওয়াজ দিয়েছেন। ওখানে আরও অন্য কিছু শিকারী ছিল তার জিম করবেটের করা বাঘের আওয়াজ শুনে গুলি চালিয়েছে, গুলিটা ওনার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়াতে কোন রকমে বেঁচে গিয়েছিলেন। রাজধর্মে এই কথাই বলা হচ্ছে, যারা দক্ষ প্রশাসক তারা ঠিক এইভাবেই শত্রুদের সাথে কথা বলে শত্রুকে কায়দা করে ফাঁসিয়ে দেয়।

আবার বলছেন, যে শত্রুকে সব সময় তিরস্কার করে সে কিন্তু কিছুতেই শান্তিতে ঘুমোতে পারেনা। তুমি যদি শুধু তিরস্কার করে অপমান করতে থাক, সে এক্ষুণি হয়তো তোমাকে কিছু করবে না, কিন্তু মনের মধ্যে গৈঁথে রাখবে, দশ বছর

কি কুড়ি বছর বসে থাকবে কিন্তু এই অপমানকে সে ভুলে যাবে না, অপমানের বদলা নেওয়ার সুযোগ সব সময় খুঁজতে থাকবে। সেইজন্য বলছেন শত্রুকে যে সব সময় তিরস্কার করে সে কিন্তু শান্তিতে থাকতে পারবে না। *ন সন্নিপাতঃ কর্তব্যঃ সামান্যে বিজয়ে সৎ। বিশ্বাস্যেবোপসন্নার্থো বশে কৃত্বা রিপুঃ প্রভো।।১৩/১০০/১৩।* যুদ্ধ করার আগে যদি বুঝতে পার এই যুদ্ধ জয় অনিশ্চিত আর যদিও জয় আসে তাতে সমান্য কিছু সুবিধা হবে, তখন কিন্তু সেই যুদ্ধ করতে যেও না। দরকার হলে শত্রুর সঙ্গে ভালো ভাবে বন্ধুত্ব করে তোমার প্রতি একটা মিথ্যা আশ্বা তৈরী করিয়ে তাকে বেকায়দায় ফেলে দেবে। এগুলো হল ঠিক ঠিক রাজধর্ম, আমাদের মত সাধারণের জন্য নয়। যদি শত্রু তোমাকে দুর্বল ভেবে কখন অপমানিত করে তাহলে সেই অপমানকে কখন মাথায় রেখো না। মানে ক্ষমতাবান লোকেরা যদি অপমান করে সেটা মাথায় রাখতে নেই। বলছেন, শুধু কয়েকজন মন্ত্রী আমলাকে সঙ্গে নিয়ে সব নিশ্চয় করে ওদের অবস্থা যখন খারাপ হবে তখন আক্রমণ করে বদলা নিয়ে নেবে। নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু ফৌস ফৌস করতে যাবে না। শত্রুর সঙ্গে কক্ষণ ফাকী রাখতে যাবে না। গুপ্তচর লাগিয়ে দূর থেকে যা করার করবে। সিআইএ, ‘র’য়ের মত এজেন্সি গুলো শত্রুর দেশের ভেতরে ঢুকে ওদের দিয়েই ভাঙচুর করায়। এমনকি ঘুষ দিয়ে শত্রু পক্ষের যারা গুরুত্বপূর্ণ লোক তাদের কিনে নেবার চেষ্টা করবে। সিআইএ ও কেজিবি’র যখন আমেরিকা আর রাশিয়াতে খুব রমরমা চলছিল তখন এই ধরনের ঘটনা প্রচুর হত। এমন এমন লোক ছিল যারা এদিক থেকেও ঘুষ নিত আবার ঐদিক থেকেও ঘুষ নিত। বলছেন, দরকার হলে বশে আনার জন্য ওষুধের ব্যবহার করবে, মানে বিষ খাইয়ে দেবে, ভাং খাইয়ে দেবে। এই সব কিছুই তখন রাজধর্মে অনুমোদিত ছিল। রাজধর্মের প্রধান নিয়মই হল শত্রুকে কক্ষণ শান্তিতে থাকতে দেবে না, সুযোগ পেলেই গলা কেটে দেবে। শত্রুকে কিভাবে নাশ করবে এটাই রাজধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য। সেইজন্য যারা মন্ত্রী হত তাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হত। রাজা তখনই জয়ী হত যখন তার মন্ত্রী আমলারা এই ভূমিকাটা খুব দক্ষতার সঙ্গে পালন করত। বলছেন, শত্রুর মনে বিশ্বাস না জাগিয়ে কক্ষণ মারতে যেও না। এই বিশ্বাসকে জাগাতে যদি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়, তাও করবে। বলছেন, শত্রুকে মারার সুযোগ তুমি সব সময় পাবে না, তাই যখনই সুযোগ পাবে তখনই তাকে মেরে দাও। আকবর যখন বারো বছর বয়সে দিল্লীর শাহেনশা হলেন তখন সবাই ভেবেছিল এই বারো বছরের বাচ্চা আর কি দেশ চালাবে, ওর দ্বারা কিছু হবে না। কিন্তু জন্ম থেকেই আকবর রাজা হওয়ার জন্য প্রস্তুত। তাঁর সব থেকে বড় বিরোধী ছিল তাঁর চাচা দইরুণ খাঁ। বাদশা হওয়ার কদিন পর চাচাকে আকবর বললেন ‘আপনার বয়স হয়ে গেছে এবার আপনি হজ করে আসুন’। বাদশা বলেছেন তাই না করতে পারছে না। হজ করতে যখন যায় তখন সবাই শ্রদ্ধা নিয়েই যায়। হজ করতে যাবে বলে আত্মা থেকে বেরিয়ে কিছু দূর যেতেই কয়েকটি গুপ্তা লাগিয়ে চাচাকে সেখানেই খুন করে দিয়েছে। কারণ একবার হজ করে যখন ফিরে আসবে তখন আর মারার সুযোগ পাবে না, তাই ওখানেই শেষ করে দিয়েছেন। বলে দিলেন লোকটা কত শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে হজ করতে যাচ্ছিল পথের মধ্যে কয়েকটা ডাকাত তাকে খুন করে দিল। সুযোগ পেলে শত্রুকে কক্ষণ ছাড়বে না। রাজাদের কাছে এগুলো কোন ব্যাপারই না। আপনি আমার শত্রু, আমি এমন ভাবে কায়দা করছি যে আপনি আমার খুব বিশ্বস্ত, আবার আপনি জানেন যে আমি কায়দা মারছি আবার আমিও জানি যে আপনি জানেন আমি কায়দা মারছি। কত জটিল ব্যাপার হয়ে যায় যে, ভাবা যায় না, আমার আপনার মত লোকেরা রাজা হলে একদিন দুদিন যেতেই রাতের ঘুমের বারোটা বেজে যাবে। কিন্তু রাজাদের কাছে এগুলো কোন ব্যাপারই নয়।

যত রকম ভাবে সম্ভব হবে সব কাজ গুহ্য ভাবে করবে। মন্ত্রীদের সাথেও যদি শলাপরামর্শ কর তাহলেও কথা বেরিয়ে যাবার সম্ভবনা থাকবে। বিন লাদেনকে মারার জন্য ওবামা যে পাকিস্তানের উপর আক্রমণ করেছিল, এই ব্যাপারটা বিদেশ দপ্তরের মন্ত্রীকেও জানতে দেননি। চুপচাপ নিঃশব্দে একটা অপারেশন করে দিলেন। কোথা দিয়ে যে কিভাবে লিক হয়ে সব খবর বেরিয়ে যাবে বুঝতেই পারবে না। রাজতন্ত্রের প্রথম নিয়মই হল তুমি যেটা করবে বলে ঠিক করে রেখেছ এই কথা যেন আগে থাকতে কেউ না জানতে পারে। বলছেন, যদি দেখো তোমার শত্রু বলবান, তাহলে একেবারে মাথা নত করে থাকবে তার কাছে। যখন সে অসাবধান থাকবে কিংবা কোন কারণে যদি দুর্বল হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাকে শেষ করে দাও। মহাভারত এইভাবে আমাদের রাজধর্ম শিখিয়েছে। মহাভারতে সব কিছুই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, পরে বিভিন্ন সাহিত্যিক, ঐতিহাসিকরা এর একেকটিকে নিয়ে আলাদা আলাদা বই লিখে দিলেন, তখন সে বইটাই খুব প্রসার পেয়ে যেতে লাগল, মাঝখান থেকে কিন্তু মহাভারত সেই রকম এতটা প্রসার পায়নি। কারণ সব কিছু জানতে গেলে আমাদের পুরো এই বিশাল মহাভারতটাই আগাগোড়া পড়ে যেতে হবে। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণরা মহাভারত খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন বলে তারা অনেক কিছু জানতেন আর সেইজন্য ব্রাহ্মণরা মন্ত্রী ও রাজাদের খুব দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালন করতেন। আর যার



মন্ত্রী যত বেশী জ্ঞানী হত আর সেটাকে কার্যে পরিণত করতে পারত তাদের রাজা প্রথম সারিতে রাখত, যার ভালো দৃষ্টান্ত চাণক্য।

### মানবজীবনে পিতা, মাতা ও গুরুর স্থান

এরপর বলছেন মা, বাবা ও গুরুর সেবা করার ব্যাপারে। যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞেস করছেন মহানয়ং ধর্মনপথো বহুশাখশ্চ ভারত। কিংস্বিদেবেহ ধর্মাণামনুষ্ঠেয়তমং মতম্।।১৩/১০৫/১। ‘হে পিতামহ! ধর্মের পথ বিরাট দীর্ঘ আর এর শাখা-প্রশাখা অনন্ত, ধর্মের এত কিছু মানুষ কি করে মাথায় ধরে রাখবে আর পালনই বা করবে কি করে? তাই সংক্ষেপে ধর্মের কথা কিছু বলুন যাতে খুব সহজ ভাবে ধর্মের অনুশীলন করা যায়। তখন ভীষ্ম বলছেন মাতাপিত্রোর্গুরুণাঞ্চ পূজা বহুমতা মম। ইহযুক্তো নরো লোকান্ যশশ্চ মহদশুতে।।১৩/১০৫/৩। খুব সংক্ষেপে যদি ধর্মের কথা বলতে হয় তাহলে মা, বাবা আর গুরু এই তিনজনের যদি পূজা করা হয় তাতেই প্রধান ধর্ম পালন করা হয়ে যায়। এত এব ত্রয়ো লোকা এত এবাশ্রমাস্ত্রয়ঃ। এত এবা ত্রয়ো বেদা এত এব ত্রয়োহগ্নয়ঃ।।১৩/১০৫/৬। তিনটে লোক – স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল। মা, বাবা আর গুরু এই তিনজন হলেন এই তিনটে লোক, এই তিন জনের বাইরে আর কিছু নেই। তুমি যে লোকই জয় করতে চাও, এঁদেরকে দিয়েই তুমি জয় পেয়ে যাবে। এই ত্রিবিধ গুরুওই তিন আশ্রম, এই ত্রিবিধ গুরুই তিন বেদ এবং এই ত্রিবিধ গুরুই তিন অগ্নি। পুরানে গণেশ আর কার্তিকের কাহিনীর মাধ্যমে ঠিক এই জিনিষটাই বর্ণনা করা হয়েছে। কার্তিক আর গণেশকে বলা হল যে আগে এই তিনটে লোক ঘুরে আসতে পারবে তাকে এই হার উপহার দেওয়া হবে। কার্তিক তার ময়ূরে করে বেরিয়ে পড়ল তিনটে লোক ঘুরে আসতে। গণেশ তার ইঁদুরের পিঠে চেপে মাকে একবার প্রদক্ষিণ করে এসে বলল, আমার তিনলোক পরিভ্রমণ করা হয়ে গেল। মা, বাবা আর গুরু তিনটি লোক, আর এঁরাই হচ্ছেন তিনটে আশ্রম – ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ। এঁদের পূজা করলে তিনটে আশ্রমের ফল এমনই পাওয়া যায়। তিনটে বেদ – ঋক্, সাম্ ও যজু। মা, বাবা আর গুরুই এই তিনটে বেদ। বেদে যে তিন ধরণের অগ্নির কথা বলা হয়েছে মা, বাবা ও গুরুই এই তিনটে অগ্নি। বেদে অনেক রকমের অগ্নির ব্যবহারের কথা বলা হয়, এর মধ্যে পঞ্চাগ্নি, অগ্নিত্রয়, যেমন গৃহস্থদের তিনটে আগুনের ব্যবহার করতে হত এবং আরও নানা সংখ্যার অগ্নির কথা আছে। মূল কথা হল এই জগতে যা কিছু শ্রেষ্ঠ আছে, এই তিনজনের যদি সেবা করা যায় তাহলেই শ্রেষ্ঠ সব কিছু এসে যায়। সেইজন্য হে যুধিষ্ঠির এই তিনজনের প্রতি সব সময় শ্রদ্ধা সম্মান বজায় রেখে চলবে। যুধিষ্ঠিরের তখন বাবা ছিলেন না কিন্তু মা আর গুরু ছিলেন। তুমি এই দুজনকে সব সময় সেবা করে যাবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন যুধিষ্ঠিরের উপর রেগে গিয়ে অর্জুন তলোয়ার বার করেছে দাদাকে কেটে ফেলবে বলে তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন ‘অর্জুন তুমি মনে হয় কোন দিন গুরুজনদের সেবা করনি, তা নাহলে এইভাবে তিড়িং করে লাফিয়ে দাদাকে কাটবার জন্য তলোয়ার বার করতে যেতে না’। একজন মৌলবী কোথাও যাচ্ছিলেন, যেতে যেতে নমাজের সময় হতেই তিনি আম বাগানের ভেতরে নমাজ পড়তে গুরু করে দিয়েছেন। নমাজ করার সময় যখন মৌলবী দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকেছে তখন একটি চ্যাংড়া ছেলে এসে তাকে পেছন থেকে ঠেলে দিয়েছে। মৌলবী সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। ছেলেটি হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে সেই সময় মৌলবী ঠিক করলেন একে একটু শিক্ষা দিতে হবে। মৌলবী পকেট থেকে একটি টাকা বার করে ছেলেটিকে দিয়ে দিলেন। ছেলেটি অবাক হয়ে গেছে, কিছু বুঝতে না পেরে খুশী হয়েই টাকাটা নিয়ে নিল, ভাবল ঠেলা মারার জন্যই হয়ত টাকাটা দিয়েছে। কদিন পর সেখান দিয়ে ঐ দেশের নবাব যাচ্ছিল। সেও এবার আম বাগানে নমাজ পড়তে বসেছে। ছেলেটি ভাবল মৌলবীকে ঠেলে দিয়ে এক টাকা পাওয়া গিয়েছিল, নবাবকে ঠেলে একশ টাকা পাওয়া যাবে। নবাব নমাজে যখন বসেছে চ্যাংড়া ছেলেটি গিয়ে মৌলবীর মতই ধাক্কা দিতেই নবাব মুখ থুবড়ে উল্টে পড়েছে। নবাব উঠেই সঙ্গে সঙ্গে তার গদান নামিয়ে দেওয়ার হুকুম দিতেই সৈন্যরা এসে ছেলেটির গদান নামিয়ে দিল। গুরুজনকে যদি খুব শ্রদ্ধা না কর তবে তুমি শেষ, এই হচ্ছে ধর্মের খুব সংক্ষিপ্ত পরিভাষা। ভীষ্ম বলছেন, যারা এই তিনজনকে সম্মান করে দিল জেনে নাও তারা এই তিনটে লোককে সম্মান দিয়ে দিল। এই তিনজনকে যে অনাদর ও অসম্মান করে দিল তার যত শুভকর্ম করা আছে সব নিষ্ফল হয়ে যেতে বাধ্য। সন্ন্যাসীও যদি মাকে অনাদর করে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসে সেই সন্ন্যাসীরও কিন্তু নানা ঝামেলার মধ্যে পড়তে হবে। শঙ্করাচার্যও তাই সন্ন্যাস নেওয়ার আগে মাকে বলেই দিয়েছিলেন তুমি অনুমতি না দিলে আমি কখনই সন্ন্যাস নেব না। ঠাকুরও সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, কিন্তু ভয়ে ভয়ে, বলছেন মা যেন না জানতে পারে। মা বাবাকে কখনই অনাদর করবে না। মা-বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য, ঝগড়া হতেই পারে কিন্তু অনাদর পুরো আলাদা ব্যাপার, ঝগড়া আর অনাদর এক নয়। ভীষ্ম নিজের ব্যাপারে বলছেন, হে যুধিষ্ঠির আমি যত শুভকর্ম করতাম তার ফল সব সময় আমি আমার মা বাবার নামে অর্পণ করে দিতাম। এই অর্পণ করে দেওয়ার ফলে আমার সব পুণ্য হাজার গুণ বেড়ে গেছে।

এইজন্যই ভীষ্ম এত মহৎ। ঠাকুর বলছেন – যুধিষ্ঠির ভীমকে এক সময় বলছিল সব কর্ম ভগবানকে অর্পণ করলে হাজার গুণ ফল পাবে, পাপ কর্মও যদি দিয়ে দাও তাহলে তার ফলও হাজার গুণ হবে। এটা অবশ্য মজা করে বলা, আসলে তা হয় না। যখন শুভ আর অশুভ কর্ম সবটাই ভগবানকে অর্পণ করে দেওয়া হয় তখন সেটা নিষ্কাম কর্ম হয়ে যায়।

ভীষ্ম বলছেন দশাচার্য্যানুপাধ্যায় উপাধ্যায়ান্ পিতা দশ। পিতৃন্ দশ তু মাতৈকা সর্বাং বা পৃথিবীমপি।। গুরুত্বেনাভিভবতি নাস্তি মাতৃসম গুরুঃ। গুরুর্গরীয়ান্ পিতৃতো মাতৃতশেচেতি মে মতিঃ।। ১৩/১০৫/১৭-১৮। দশ জন শ্রোত্রিয় থেকে একজন আচার্য শ্রেষ্ঠ। শ্রোত্রিয় মানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, যিনি বেদ জানেন। বিদ্যা গুরু দশজন আচার্যের সমান। বাবা দশ উপাধ্যায় মানে বিদ্যা গুরুর সমান। মা দশটি বাবার সমান। এখানে বলছেন যে পৃথিবী সব থেকে সম্মানের পাত্র, মা সম্মানে সেই পৃথিবীর থেকেও উঁচু। আমাদের পরম্পরতে বলা হয়ে আসছে নাস্তি মাতৃসম গুরুঃ, মায়ের মত আর গুরু হয় না। পরের শ্লোকেই ভীষ্ম বলছেন গুরুর্গরীয়ান্ পিতৃতু মাতৃত্বয়েষ্টি মে মতিঃ। উভৌ হি মাতাপিতরৌ জন্মন্যেবোপযুজ্যতঃ। শরীরমেব সৃজতঃ পিতা মাতা চ ভারত।। ১৩/১০৫/১৯। এর আগে পরম্পরার কথা বলে ভীষ্ম এবার নিজের মত বলছেন ‘তবে কি জান আমার মতে গুরুর স্থান মা-বাবার থেকে অনেক উপরে। কারণ মা-বাবা শুধু এই পার্থিব শরীরটা আমাকে দিয়েছেন কিন্তু গুরু দিব্য, অজর ও অমর শরীর দেন’। তার মানে গুরু যখন আমাকে আধ্যাত্মিক পথ দেখিয়ে দিলেন তখন আমার একটা নতুন শরীরের জন্ম হচ্ছে যে শরীরটা দিব্য, অজর ও অমর। তাই গুরুর স্থান সব সময়ই সবার থেকে উপরে। ভারতের মুসলমানরা বলে দিয়েছেন আমরা বন্দে মাতরম্ গান করব না। এর যুক্তি দেখাতে গিয়ে মুসলমানরা বলছেন আমরা মাকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু মাকে পূজা করিনা, আমরা পূজা একমাত্র আল্লাহকেই করি। এখানে ভীষ্মের মতের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়, মা-বাবা আমাকে পার্থিব শরীর দিয়েছেন এরজোনা তাঁদের পূজা করার কি আছে। যদিও মুসলমানদের মতের সঙ্গে অনেকেই এক মত নন। ভীষ্মের মতে ভগবানকে যেমন পূজা করা হচ্ছে তেমনি গুরুও একই পূজা পাওয়ার যোগ্য, কারণ তিনি আমাকে দিব্য, অজর ও অমর শরীর দিচ্ছেন। তাই গুরুর স্থান অনেক উঁচুতে।

মহাভারতের এই ধারণা গুলো অনেকবার ঘুরে ঘুরে আসবে। এই কারণেই মহাভারতের কথা খুব মন দিয়ে বারবার শুনতে বলা হয়। বাইবেল, কোরানের সব কথা হল ঋষির কথা, যদিও বলা হয় ভগবান বলেছেন, কিন্তু আমরা এগুলোকে ঋষি-বাক্য রূপেই দেখব। যখন কোন ধর্মগ্রন্থে একজন মাত্র ঋষির কথা চলতে থাকবে তখন সেটা একদেশী ও একঘেঁয়ে হয়ে যাবে, যখন দশ জন ঋষির কথা হবে তখন তার মধ্যে অনেক ধরনের চিন্তা ভাবনার সমাবেশ পাওয়া যাবে। ভীষ্ম এটাই বলছেন, পরম্পরতে বলা হয়ে আসছে মায়ের মত গুরু হয় না, মা-বাবার স্থান অনেক উঁচুতে। ঠিকই বলা হচ্ছে, এখানে কোন সন্দেহ নেই। বলেই আবার বলছেন মা-বাবার এই স্থান সাধারণ জীবনের জন্য ঠিকই বলা হচ্ছে কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে নয়। আধ্যাত্মিক জীবনে যিনি গুরু তিনিই শ্রেষ্ঠ। গুরুর কথা বলার পর বলছেন, যখন গুরুকে পূজা, শ্রদ্ধা, সম্মান করে প্রসন্ন করা হয় তখন দেবতা ঋষি এরা সবাই খুশী হন। এই হল সংক্ষেপে ধর্ম পালনের মূল কথা। তবে জেনে রেখো মা-বাবা যে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, সেই সন্তান বড় হয়ে যদি বৃদ্ধ মা-বাবার দেখাশোনা না করে তাহলে এর মত পাপাত্মা আর কেউ হতে পারেনা।

### চার ধরনের পাপ কর্মের প্রায়শ্চিত্ত হয় না

ভীষ্ম বলছেন মিত্রদ্রোহঃ কৃতঘ্নস্য স্ত্রীঘ্নস্য গুরুঘাতিনঃ। চতুর্গাং বয়মেতেষাং নিষ্কৃতিং নানুশ্রাম।। ১৩/১০৫/৩২। সব রকমের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কিন্তু চার রকম পাপ কর্মের কোন প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে বলে আমরা কখন শুনিনি। তার মানে এই চার ধরনের পাপ করলে তার ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে। যদিও পরের দিকে বলা হবে একটা পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত নেই। ১) প্রথমেই বলছেন মিত্রদ্রোহী, বন্ধুকে যারা অন্তর্ধাত করে। এই পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। ২) কৃতঘ্ন, যারা অকৃতজ্ঞ, এক সময় আপনি আমার অনেক উপকার করেছিলেন কিন্তু আপনার সেই কাজকে আমি মনে রাখিনি। আজকে আপনার হয়ত কোন বিপদ এসেছে কিন্তু এখন আমি আপনার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছি না, এটাকে বলা হচ্ছে কৃতঘ্ন। এখানে মনে না রাখার কথাই বলা হচ্ছে, কিন্তু উপকার করার বদলে তার কোন ক্ষতি করছে কিনা সেটার কোন উল্লেখ নেই। ৩) স্ত্রীঘ্ন, যে স্ত্রীর হত্যা করে। হিন্দুরা সেইজন্য যুদ্ধের সময় কখন নারী হত্যা করত না। ৪) গুরুঘাতী, যে গুরুর বধ করে। গুরুকে কটুকথা বলা গুরুকে অপমান করা এগুলোও গুরুঘাতীর মধ্যেই পড়ে। এই চারটে পাপ কর্মের কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই।

### সত্য ও অসত্যের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক নীতি

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করছেন, যারা ধর্মের আচরণ করছেন এই জগতে তাদের পক্ষে চলা খুব কঠিন। কারণ এই জগৎ সত্য ও অসত্যে মিশিয়ে। কোন মানুষ যখন ধর্মের আচরণ করতে যায় তখন শুধু ধর্মে অবস্থিত থাকার জন্য তারা ঠিক করতে পারে না কোন দিকে যাবে, সত্যের দিকে যাবে না অসত্যের দিকে যাবে। তার তখন কি করা উচিত? আর সত্য কি, অসত্য কি এই ব্যাপারটা আপনি আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিন। ভীষ্ম তখন বলছেন *সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্বিধ্যতে পরম্। যত্ন লোকেষু দুর্জ্ঞানং তৎ প্রবক্ষ্যামি ভারত।। ১৩/১০৬/৪।* ‘সত্য কথা বলার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু হয় না আর সত্য থেকে বড় ধর্ম আর কিছু হয় না। কিন্তু এই জগতের অনেক কিছু বোঝা যায় না, কিছু ক্ষেত্রে অনেক সংশয়ও উপস্থিত হয়। এগুলো খুবই সাধারণ সংজ্ঞা। যেগুলো খুব কঠিন সেগুলো আমি তোমাকে বোঝাচ্ছি। এটাই ব্যবহারিক নীতি’। ভীষ্ম এখন যে কথাগুলো বলছেন এগুলোই আমাদের ব্যবহারিক নীতি। জগতের সমস্ত ধর্মগ্রন্থে মূল্যবোধকে সব সময় পরিষ্কার ভাবে সাদা আর কালো রূপে নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে। সত্য কথা বলবে, মিথ্যা কথা বলবে না, সত্যমেব জয়তে এইভাবে পরিষ্কার করে বলে দেবে। বাস্তব জীবন কিন্তু এইভাবে চলতে পারেনা। ব্যবহারিক জীবনে সাদা আর কালো এই দুটোকে পরিষ্কার ভাবে আলাদা করা যায় না। এই জন্য ধর্ম পথে চলতে গিয়ে অনেক রকম সমস্যা ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। উচ্চতম আধ্যাত্মিক জীবন যে গ্রন্থ দ্বারা চালিত হয় সেই গ্রন্থ দিয়ে কখনই এই ব্যবহারিক জীবন চলতে পারেনা, ব্যবহারিক জীবনে এসে এর অনেক কিছুই পাল্টে যায়। এর সহজ উদাহরণ হল – যারা বাইবেলকে বিশ্বাস করতেন, এ্যারিস্টটলকে যারা মানতেন, যখন বিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার হতে শুরু করল এরা সেগুলিকে কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছেও এটা এক বিরাট সমস্যা। মহম্মদ চৌদ্দশ পনের বছর আগে যা বলে গেছেন সমাজ এখন সেখান থেকে অনেক পাল্টে গেছে। নতুন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে সমাজ নতুন ভাবে রূপ নিচ্ছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে যে নতুন নতুন আচার ব্যবহার আসছে সেগুলোকে এরা মানতে চায় না। অথচ তিনি এক সময় জগতকে এত মান সম্মান দিয়েছিলেন তাতে বিজ্ঞান এক সময় খুব উন্নতি করেছিল, এখন এরাই বিজ্ঞান বিরোধী হয়ে গেছে। ব্যবহারিক নীতি আর আধ্যাত্মিক নীতি দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। খ্রীস্টান আর মুসলমানরা দুটোকে এক করে ফেলছে বলে এই সমস্যা। ভীষ্ম এইটাই যুধিষ্ঠিরকে বলছেন আমি তোমাকে ব্যবহারিক নীতির কথাই বলছি, যেটা তোমাকে সহজে কেউ বলতে চাইবে না।

*ভবেৎ সত্যম ন বক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।। তাদৃশো বধ্যতে বালো যত্র সত্যমনিষ্ঠিতম্।। ১৩/১০৬/৫।* এই শ্লোকটিও খুব জটিল। কখন সখন দেখা যায় মিথ্যে কথাই সত্য কথার কাজ করে আবার কখন কখন সত্য কথা মিথ্যের ফল দেয়। এমন অবস্থায় সত্য কথা বলাটা কখনই ঠিক নয়। নিজের বা কারুর যখন প্রাণ খুব সঙ্কটে পড়ে গেছে তখন মিথ্যে কথা বলে যদি সেই প্রাণ রক্ষা হয়ে যায় তখন মিথ্যে কথাটাই সত্যের কাজ করবে আর যদি সত্য কথা বলে তার প্রাণ হরণ হয়ে যায় তখন সেই সত্য কথাই মিথ্যে কথার ফল দেয়। আসলে হিন্দুধর্মে জীবনকে খুব মূল্য দেওয়া হয়। পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা অনেক সময়ই ভুল করে হিন্দুধর্মকে নেতিমূলক দর্শন মনে করেন, আসলে তা কখনই নয় হিন্দুধর্ম প্রচণ্ড ইতিবাচক দর্শন। এখানেই তার দৃষ্টান্ত, হিন্দুধর্ম জীবনকে অত্যন্ত মূল্য দেয়, শুধু নিজের জীবনকেই নয়, অপরের জীবনকেও। তার জন্যই বলা হচ্ছে নিজের জীবন যদি সঙ্কটে পড়ে তাহলে দরকার হলে মিথ্যে কথা বলবে, পরের জীবন যদি সঙ্কটে পড়ে তখন তাকে বাঁচানোর জন্য দরকার পড়লে মিথ্যে কথা বলতে হবে। হিংসা যেন কোন মতেই না হয়। মহাভারতে বারবার অহিংসা পরমো ধর্মের কথা বলা হয়েছে। এই পরমো ধর্মকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি মিথ্যে কথা বলতে হয় তখন তোমাকে মিথ্যে কথাই বলতে হবে। এখানে অহিংসাকে সত্য থেকে নীচে রাখা হয়েছে। সত্য কথা বললে এক রকমের পূণ্য হবে, অহিংসা পালন করলে আরেক রকমের পূণ্য হয়। কিন্তু সত্যের জন্য যদি হিংসা হয়ে যায় তখন হিংসার পাপটুকুও নিতে হবে। আবার মিথ্যা কথা বলার জন্য যদি হিংসা সংঘটিত হওয়া থেকে বেঁচে যায়, তখন মিথ্যের পাপটুকু লাগবে আবার অহিংসা হওয়ার জন্য তার পূণ্যটা লাগবে। এখানে ভীষ্মের মত জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। ভীষ্ম বলছেন ‘আমাকে যদি জিজ্ঞেস কর আমার কাছে অহিংসাই পরমো ধর্ম। তবে কি জান, যাদের সত্যে মন স্থির নয়, এরা মুর্থ আর এরা মরার মত। অসত্যের নির্ণয় করে সব সময় সত্যেই প্রতিষ্ঠিত থাকতে হয়’।

### ধর্মের পূর্ণাঙ্গ রূপ

ধর্ম কি বলতে গিয়ে ভীষ্ম বলছেন *প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্। যঃ স্যাৎ প্রভবসংযুক্তং সধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।। ১৩/১০৬/১০।* প্রভবার্থায়, প্রভবের অর্থ বিভিন্ন ভাবে করা যায়। গীতা প্রেসের মহাভারতে অনুবাদ করা

হয়েছে অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স। যেটা দিয়ে অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স সাধিত হয় সেটাই ধর্ম। যদিও এখানে অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স শব্দটা নেই কিন্তু আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতার ভাষ্যে প্রভবোর ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন বলে অনুবাদক এখানে অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স শব্দ দুটো ব্যবহার করেছেন। এখানে প্রভবকে আধ্যাত্মিক উত্থানের অর্থে নেওয়া হয়েছে আর অর্থ মানে জাগতিক কল্যাণ। অভ্যুদয় মানে জাগতিক কল্যাণ ও মঙ্গল আর নিঃশ্রেয়স মানে আধ্যাত্মিক উত্থান। তাহলে ধর্মের কি সংজ্ঞা দিচ্ছেন? যার দ্বারা জাগতিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক উত্থান এই দুটোই সাধিত হয় সেটাই ধর্ম। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটে পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষ হল নিঃশ্রেয়স আর ধর্ম, অর্থ ও কাম অভ্যুদয়ের মধ্যে পড়ছে। যে কোন ধর্ম এই দুটোকে এক সঙ্গে যদি না শিক্ষা দেয় তাহলে সেই ধর্ম কখনই পূর্ণাঙ্গ ধর্ম হবে না। বৌদ্ধ ধর্ম যখন জাপানে প্রথম গিয়েছিল তখন জাপানের রাজা জিঙ্গেস করেছিল এই বৌদ্ধ ধর্ম পালন করে আমার কি লাভ হবে? তখন রাজাকে বলা হল সব কিছুই হবে। রাজা বললেন ঠিক আছে আগে আমার মন্ত্রী এই ধর্ম পালন করতে থাকুক, ছয় মাসের মধ্যে যদি দেখি মন্ত্রীর জাগতিক উত্থান হয়েছে তখন আমরা সবাই এই ধর্মকে মেনে নেব। বৌদ্ধ ভিক্ষু যিনি বৌদ্ধ ধর্মকে জাপানে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি মন্ত্রীকে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। ছয় মাস পরে দেখা গেল সত্যিই তার অর্থ সম্পদ সব কিছুই উত্থান হতে শুরু করেছে। সেই থেকে জাপান পুরোপুরি বৌদ্ধ হয়ে গেল, তিব্বতেও ঠিক তাই হয়েছিল। সাধারণ মানুষ দেখবে আমার জাগতিক উত্থান কিভাবে হবে, আমার মুক্তির দরকার নেই, আমি ভোগ চাইছি। আপনার ধর্ম কি আমাকে দেখিয়ে দেবে আমি আমার ভোগ্য উপকরণ কি করে পাব? এদের কি তাহলে বলে দিতে হবে যে তোমার জন্য ধর্ম নেই? যে ধর্ম যদি তাই বলে দেয় তাহলে কিন্তু সেই ধর্ম অসম্পূর্ণ। যে ধর্ম জগতের অভ্যুদয়ের শিক্ষার সাথে সাথে নিঃশ্রেয়সের পথও দেখায় তখনই সেই ধর্ম পূর্ণাঙ্গ হবে। বেদ ঠিক এই শিক্ষাটাই আমাদের দিচ্ছে। তুমি ধন-সম্পদ চাইছ? আচ্ছা ঠিক আছে পেয়ে যাবে, তুমি এই যজ্ঞ কর, তোমার ধন-সম্পদ হয়ে যাবে। তুমি সন্তান চাইছ? এই যজ্ঞ কর। শত্রুকে বিনাশ করতে চাইছ? এই যজ্ঞ কর। বেদের এই যজ্ঞ গুলো এখন বন্ধ হয়ে গেছে, বেদের এই কাজগুলো এখন তান্ত্রিকরা করছে। মানুষ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স দুটোই চায়, অভ্যুদয়ে যখন প্রাণ ভরে যায় তখন সে নিঃশ্রেয়সের দিকে যায়। কথামতে ঠাকুরের কথাগুলো কয়েকজন মুষ্টিমেয় ত্যাগী যুবকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। কিন্তু সেই কথাগুলো এখন জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে, মানুষ এখন তাই মুখে ত্যাগের কথা বলছে কিন্তু ভেতরে ভোগের আকাঙ্ক্ষা গিজগিজ করছে। উপনিষদ কখনই ভোগের কথা বলবে না, এই দৃষ্টিকোণ থেকে উপনিষদকে তাই পূর্ণাঙ্গ ধর্ম বলা যায় না। কথামতেও উপনিষদের মত। গৃহস্থদের জন্য কয়েকটি বিশেষ কথা বলছেন ঠিকই। তবে ঠাকুরের অনেক উপদেশ আছে যেগুলো যদি ঠিক ঠিক সাধনা করা যায় তাতে যদি কেউ চায় তার অভ্যুদয়ও হবে। স্বামীজী আরেক ধাপ এগিয়ে বলছেন, বেদান্তকে যে অনুশীলন করবে তার অভ্যুদয়ও হবে। যদি একজন মুচি জেনে যায় আমি সেই শুদ্ধাত্মা, শুদ্ধাত্মা মানে সে ঈশ্বরের সঙ্গে এক, তখন তার সমস্ত রকমের শোক মোহ জনিত চিন্তা ভাবনা গুলো চলে যাবে সাথে সাথে সে আরও ভালো একজন মুচি হবে। যখন মানুষ বুঝে যায় আমি সব কিছু থেকে আলাদা, আমি সেই শুদ্ধাত্মা, আমার পাওয়া বা হারাবার কিছু নেই, তাও যখন সে লোকের প্রতি করুণা করে তখন তার শক্তি সাংঘাতিক ভাবে বেড়ে যায়। স্বামীজী এটাকেই ব্যবহারিক বেদান্তে প্রয়োগ করলেন। এর আগে যে বলা হল উপনিষদ পুরোপুরি নিঃশ্রেয়সের কথাই বলছে, তা নয়, এখানে স্বামীজী এইভাবে উপনিষদের একটা নতুন ব্যাখ্যা দিলেন। উপনিষদ যে আত্মার কথা, ব্রহ্মের কথা বলছে সেই আত্মা বা ব্রহ্মের সাথে নিজে একাত্ম করার পর তার মধ্যে যে শক্তির জাগরণ হবে, সেই শক্তি দিয়ে তিনি তখন ইচ্ছে করলে লোককল্যাণের জন্য জাগতিক লোকদের থেকে অনেক ভালো ভালো কাজ করতে পারবেন।

ধর্মের সংজ্ঞা দিয়ে ভীষ্ম বলছেন *ধারণাদ্বর্মমিত্যাহ্বর্ধ্মেণ বিধ্বতাঃ প্রজাঃ। যঃ স্যাদ্ধারণসংযুক্তঃ সধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।।১৩/১০৬/১৪।* যা ধারণ করে রাখে তাকেই ধর্ম বলা হয়। যে জিনিষটা একটা জিনিষকে ধারণ করে রাখে তাকেই ধর্ম বলছেন। এই বোতলের জলটা জল কেন? জলটা কেন এই উত্তর যখন দেওয়া হয় তখন জলের ধর্মকেই বলা হয়। জলের যেটা ধর্ম সেটাই জলের আত্মা। যেটাই কোন কিছুর ধর্ম সেটাই আবার তার আত্মাও হয়। জলের ধর্ম শীতলতা, কোন কিছুকে শীতল করে। ঠিক তেমনি অগ্নির ধর্ম দাহিকা বা তাপ। সংস্কৃতে যত শব্দ আছে, সব শব্দই একটা জিনিষের যে ধর্ম আর সেই ধর্মকে আধার করে তার নামকরণ হয়। যেমন গরু, গরু শব্দটা আসছে গো ধাতু থেকে, গো মানে গমনে। গরু চলাফেরা করে বলে সেখান থেকে তার নামকরণ করা হল গরু। সংসার শব্দ এসেছে স্প ধাতু থেকে। স্প মানে সর্পের মত সরে সরে যাওয়া। সর্প যে ধাতু থেকে তৈরী সংসারও একই ধাতু থেকে তৈরী। সংসারের ধর্মই হল সংসারে কিছু স্থির থাকে না, সব সময় সরে সরে যাচ্ছে। সেইজন্য এর নাম সংসার। এটাই সংসারের ধর্ম। সংসারে সব কিছু যদি স্থিতিশীল হয়ে যায় তখন সংসার তার ধর্ম থেকে চ্যুত হয়ে যাবে। ধর্মের একটা ব্যাখ্যা পাই বাল্মীকি রামায়ণে

আর আরেকটা পাই মহাভারতে। এই দুটো গ্রন্থ ছাড়া আর কোথাও এত সুন্দর ধর্মের সংজ্ঞা কেউ নিরূপণ করেনি। অন্যান্য রামায়ণে দেখানো হয়েছে শ্রীরামচন্দ্র যখন লঙ্কায় যাবেন তখন সমুদ্র তাকে পথ দিচ্ছেনা দেখে তিনি তীর ধনুক বার করেছেন সমুদ্রকে শুকিয়ে দেবেন বলে। সমুদ্র তখন শ্রীরামচন্দ্রকে পথ দিয়ে দিলেন। বাল্মীকি রামায়ণ কিন্তু তা বলছে না। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র তীর সন্ধান করতেই সমুদ্র সোজা এসে শ্রীরামচন্দ্রকে বলল – ‘আমার ধর্মই হল আমাকে কেউ লঙ্ঘন করতে পারবে না। আমিও তাই আপনাকে পথ দিতে পারব না। আর লোভে পড়ে, ভয়ের কারণে কোনটাতেই আমি এই কাজ করতে পারিনা। আপনার ক্ষমতা আছে, আপনি যা খুশী করতে পারেন। তবে আপনাকে উপায় বলে দিতে পারি, আপনি আমার উপর দিয়ে একটু সেতু বানিয়ে নিতে পারেন। আপনি আমাকে শুকিয়ে দিয়ে পথ করতে পারেন না’। কিন্তু পরের দিকে অন্যান্য রামায়ণে কবির শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান বানিয়ে দিয়েছেন। শ্রীরাম ভগবান, ভগবানের কথাকে কেউ উল্লেখ করতে পারেনা। সেইজন্য সেখানে অন্য রকম কাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু অন্য কাহিনী নিয়ে আসার সময় এই জিনিষটাকে মাথায় ধরে রাখতে পারলেন না যে আপনি একটা পদার্থের মৌলিক ধর্মকে সরিয়ে দিচ্ছেন। সমুদ্রের ধর্ম এটাই, সমুদ্রের মর্যাদাকে কেউ উল্লেখ করতে পারেনা। অবতারের জন্য যদি সমুদ্র পথ দিয়ে দেয় তাহলে তো তার ধর্মচ্যুতি হয়ে গেল। এখন যদি কবিকে দেখাতে হয় তাহলে বলতে হবে শ্রীরাম অবতার, অবতারের জন্য কোন নিয়ম খাটবে না। এই ভাবে কখন ধর্ম চলতে পারে না। যে কোন দ্বৈতবাদী ধর্মের কাছে এটা এক বিরাট বড় সমস্যা। ভগবান এখন এই ধর্মকে মানবেন কি মানবেন না? ঠাকুরের জীবনে কোথাও দেখতে পাইনা ঠাকুর কারুর মর্যাদাকে উল্লেখ করেছেন। যীশুর জীবনেও কোথাও দেখা যাবে না তিনি মর্যাদাকে উল্লেখ করেছেন। বাইবেলে যিশু বলছেন লবণের যদি লবণত্ব চলে তাহলে আর তাকে কে লবণ বলবে, তখন সেটা একটা পাথর হয়ে যাবে।

ধর্মই সব কিছুর অধোগতিক আটকে দেয়, জীবনের রক্ষা করে আর ধর্মই সমস্ত প্রাণিকে ধারণ করে রেখেছে। ধারণ পোষণ যেখান থেকে হয় সেটাই ধর্ম। মানুষ স্বভাবেই দিব্য, তার ধর্মই হল আত্মজ্ঞান। সেখান থেকেই সে সব শক্তি পায়। যার মধ্যে দিব্যত্বের বেশী প্রকাশ সে ততো উচ্চস্তরের। অন্য দিকে আমরা নিজেদের বলছি আমরা মানুষ, মানুষ শব্দ এসেছে মানব থেকে, মানব হল মনু সন্তান। আমি যদি নিজেকে মনুর সন্তান বলে মনে করি তখন আমি জন্ম-মৃত্যু রূপী জীব হয়ে গেলাম, জন্ম-মৃত্যুর চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকব। এখানে যে ধর্মের কথা বলা হচ্ছে এটা হিন্দু, মুসলমান যে ধর্ম বলা হয় সেই ধর্ম নয়। এই ধর্ম হল একটা জিনিষের সারটুকু, যে জিনিষটা ঠিক ঠিক আমাকে ধরে আছে। ধর্মের ব্যাপারে বলার পরে যে শ্লোকটা বলছেন এটিও খুব উল্লেখনীয় *অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্। যঃ স্যাদহিংসাসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।। ১৩/১০৬/১৫*। ধর্মের উদ্দেশ্যই হল কোন প্রাণির যাতে কোন রকম হিংসা না করা হয়। মহাভারতের সার অহিংসা পরমো ধর্ম। অথচ যখন আমরা বলি বাড়িতে মহাভারত লেগে আছে, তখন মহাভারত মানে বোঝাচ্ছে বাড়িতে বিরাট লড়াই-ঝগড়া লেগে আছে। এটাই অবাক হওয়ার জিনিষ। প্রকৃতি মানুষকে নিয়ে এমন ঠাট্টা করে যে, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সব থেকে বড় উদাহরণ হল ইসলাম। ইসলামের অর্থ হয় শান্তির ধর্ম। অথচ এরাই বেশী সন্ত্রাসবাদীদের জন্ম দিয়েছে। ইসলামে আরও মজার জিনিষ, প্রকৃতি যে কতটা ক্রুর আমরা বুঝতে পারিনা। ইসলাম সঙ্গীতকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ ভারতের যত প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ বেশীর ভাগই মুসলমান। এটাই প্রকৃতির নির্মম পরিহাস।

ভীষ্ম বলছেন যতগুলো ধর্ম আছে কিসের জন্য আছে? প্রাণির রক্ষার জন্য আছে, নিজেরও প্রাণ রক্ষার জন্য অপরের প্রাণ রক্ষার জন্যও। মহাভারত বলছে বলে মহাভারতে যত ধর্মের কথা বলা হয়েছে শুধু এই কটি ধর্মই প্রাণিদের রক্ষার জন্য নেই, বিশ্বে যত ধর্ম আছে, ইসলাম, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু যাবতীয় ধর্মের একমাত্র কাজ প্রাণিদের হিংসা থেকে রক্ষা করা। অনেকে প্রশ্ন করবেন পয়গম্বর মহম্মদ তাহলে এত মারামারি কাটাকাটি কেন করলেন? এই ব্যাপারে মহম্মদের যুক্তি পরিষ্কার ছিল, এই পাঁচজন দুষ্ট লোককে না মারলে পাঁচশ লোককে বাঁচান যাবে না, ঐ পাঁচটাকে মেরে দাও। মহম্মদের এটাই ছিল উদ্দেশ্য হিংসা করাটা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। হিংসা কখনই কার্য নয়, হিংসা সব সময় মনের একটা অবস্থা বা বৃত্তি। আমাদের মত সাধারণ লোক যারা কোথাও হিংসা হলে আমরা ভয়ে আঁতকে উঠি। কিন্তু সব হিংসাই যে হিংসা বৃত্তি নিয়ে করা হচ্ছে তা নয়। একজন লোক খুব হিংস্র হয়ে উঠেছে, তার এই হিংস্র মনোভাবে যদি একশটা লোক মারা যেতে পারে তখন ঐ একটা লোককে মেরে উড়িয়ে দিতে হবে। এই লোকটাকে মারার পেছনে কোন হিংসার ভাব নেই। যেমন আমি একটা নৌকা করে নদী পারা হচ্ছি, সেই নৌকাতে একটা পাগল বসে বসে নৌকাটাকে ফুটো করতে শুরু করেছে। আমি পাগলটাকে বেঁধে রেখে দিলেও সে ছাঁদা করতেই থাকবে। নৌকার একশ জন যাত্রীর প্রাণ রক্ষার জন্য

আমাকে তখন কি করতে হবে? ঐ পাগলটাকেই তুলে নদীর জলে ফেলে দিতে হবে, এতে আমার রাগ দ্বৈধ কিছুই নেই এবং আমি তাকে ফেলতেও চাইছি না। কিন্তু পাগলটাকে না ফেললে বাকি একশ জন মারা যাবে। সেখানে তখন আর হিংসা থাকে না। যাঁরা বড় বড় মহাত্মা বা রাজা ছিলেন তারা হিংসার জন্য হিংসা করতেন না। শ্রীকৃষ্ণকে মানবজাতির বৃহত্তর স্বার্থে কয়েকজনকে বধ করে দিতে হয়েছিল। মহম্মদও তাই করেছিলেন। এইসব ক্ষেত্রে তখন কোন হিংসা থাকে না। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় ধর্ম মানেই হিংসার অভাব। আর উচ্চাবস্থায় মনে কোন হিংসা বৃত্তি থাকবে না। মা যখন সন্তানকে চড় মারে তখন কি তার মনে হিংসা ভাব থাকে? অন্য দিকে আমি মাছ খাচ্ছি, মাংস খাচ্ছি সেখানে হিংসা করতে হচ্ছে, চাল, ডাল এগুলোর মধ্যেও প্রাণ আছে। কিন্তু এই হিংসা না করলে তো আমার শরীরই থাকবে না, সেইজন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞ করতে বলা হয়। পঞ্চ মহাযজ্ঞ করলে হিংসা করে যে পাপ হচ্ছে সেই পাপটা শিথিল হয়ে যায়। ধর্মের স্থিতি অহিংসাতে আর ধর্মের শেষ কথা অহিংসা। সমগ্র প্রাণি জগতের প্রতি যে প্রেম করুণা এটাই ধর্মের শেষ কথা।

এরপর সত্য নিয়ে বলছেন। কেউ অন্যায় ভাবে কারুর সম্পদ অপহরণ করতে আমার কাছে তার খবর নিতে চাইছে কক্ষণ তাকে সত্যি কথা বলবে না। *শপথাদাপি*, দিব্যি খেয়েও যদি পাপী বদমাইস লোকের হাত থেকে ছাড়া পাও তখন মিথ্যে কথা বলেই ছাড়া পেতে হবে। তোমার সত্যি কথা বলার জন্য তুমি মারা যেতে পার, অন্য কেউ মারা যেতে পারে, এই সত্যি কথা বলার জন্য কখনই ধর্ম অনুমতি দেয় না। এটাই মহাভারতের মত। যদিও এর মধ্যে অনেক মূল্যবোধের তর্ক বিতর্ক চলে, অনেকে বলবেন আমি মরে যাই বা দশ জন মরে যাক আমি সত্য থেকে বিচ্যুত হব না। তাহলে সে তাতেই দৃঢ় থাকুক কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু মহাভারত এই অবস্থানকে মানবে না। মহাভারত সব সময় বলবে তুমি যাই কর না কেন কোন কিছুতেই তোমার যেন কোন স্বার্থ না থাকে। তোষামুদি, তেল দেওয়া এই যে শব্দগুলো আছে এর সব কিছুর মধ্যে স্বার্থ জড়িয়ে থাকে। এখানে আরেকটা মজার কথা বলছেন *ন চ তেভ্যো ধনং দদ্যচ্ছক্যে সতি কথঞ্চন। পাপেভ্যো হি ধনং দত্তং দাতারমপি পীড়য়েৎ।।১৩/১০৬/২০।* পাপীদের হাতে কখনই টাকা-পয়সা যেতে দেবে না। ঐ টাকা-পয়সার সাহায্য নিয়ে যদি পাপীরা কোন পাপ করে তখন সে পাপটা তোমার উপরও আসবে। এটাকেই ঠাকুর একটা গল্পের মাধ্যমে বলছেন। একজনের বাড়িতে শ্রাদ্ধ হচ্ছিল। সেই সময় এক কসাই একটা গরুকে কাটবে বলে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। কসাই খুব পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। শ্রাদ্ধবাড়িতে ঢুকে খুব করে খাওয়া-দাওয়া করে শরীরে বল এসেছে। এবার সে গরুকে নিয়ে গিয়ে কেটে দিল। এখন এই গোহত্যার যে পাপ সেই পাপ শ্রাদ্ধবাড়ির কর্তার উপরেও এসে চেপে গেছে। আরেকটি খুব দামী কথা ভীষ্ম বলছেন *স্বকর্মণা হতং হন্তি হত এব স অন্যতে। তেষু যঃ সময়ং কশ্চিৎ কুবীরীত হতবুদ্ধিষু।।১৩/১০৬/৩১।* যে পাপী পাপ করে সেতো নিজের কর্মের পাপে মরে গেছে, এরপর তুমি যদি তাকে মার তাহলে মরাকেই তুমি মারলে, সেইজন্য পাপীকে মারার কোন পাপ লাগে না। যে মরেই গেছে তাকে মেরে আর কি পাপ লাগবে। সেইজন্য কোন মানুষ যদি দিব্যি খেয়ে বলে আমি পাপীগুলোকে বধ করব তাতে তার কোন পাপ লাগে না। আবার অন্য দিক দিয়েও বলা যায়, পাপীরা যদি মরে গিয়েই থাকে তাহলে তাকে আর মারার কি দরকার পড়ছে। মহাভারত হাজার রকমের বিষয় আমাদের কাছে উত্থাপন করে দেবে, তার আবার হাজার রকমের সমাধানের রাস্তা দিয়ে দেবে। এরপর আমার যেটা ভালো লাগে সেটাকে অনুসরণ করে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ধর্মের গতিশীলতাকে কখনই অনুসরণ করতে বলা হচ্ছে না, আজকে এক রকম ধর্মকে অনুসরণ করছি কালকে গিয়ে অন্য রকম ধর্মের আচরণ করছি, এই জিনিষ কখনই করতে যাবে না। যে ধর্মটাকে তুমি ঠিক করে নিয়ে বলছ আমি এইভাবেই চলব, তখন তোমাকে বরাবর সেই ভাবেই চলতে হবে। একটা ধর্মকে ধরে নিয়ে যখন সেই ধর্মে এক বছর, দু বছর চলতে থাকবে তখন দেখবে এক সময় তোমার মধ্যে শক্তি আসতে শুরু করে দিয়েছে।

### দুঃখ, সঙ্কট, ঝামেলা, মহাবিপদাদি থেকে মুক্তির উপায়

এরপর বলছেন দুঃখ যখন হয় তখন সেই দুঃখ থেকে মানুষ কিভাবে মুক্তি পেতে পারে। ভীষ্ম বলছেন *আশ্রমেযু যথোক্তেষু যথোক্তং যে দ্বিজাতয়ঃ। বর্তন্তে সংযতাত্মানো দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে।।১৩/১০৭/২।* যে মানুষ নিজের মনকে সংযমে রেখে চারটে আশ্রমকে ঠিক ঠিক পালন করে যায় তার কখন দুঃখ, সঙ্কট, ঝামেলা হয় না। আসলে এই মতটা অনেকেই পোষণ করেন, যদি বর্ণাশ্রম ধর্মকে ঠিক ঠিক কেউ পালন করে তখন তার কোন দুঃখ আসে না। যদি দেখা যায় কারুর মন সব সময় অবসাদগ্রস্ত, ভেতরে আত্মহত্যার প্রবণতা আছে, তখন বুঝতে হবে সে কোথাও না কোথাও বর্ণাশ্রম ধর্মকে অবহেলা করেছে বা পালন করেনি। দুর্গম সঙ্কট, যার মহাবিপদ, সেখান থেকে বেরনোর কি পথ? ভীষ্ম বলছেন *প্রত্যাহ্নোচ্যমানা যে ন হিংসন্তি চ হিংসিতাঃ। প্রযচ্ছন্তি ন যাচন্তে দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে।।১৩/১০৭/৪।*

অপরের কটু কথা শুনে, নিন্দা শুনেও প্রত্যুত্তর দেয় না, হিংসা করলে প্রতিহিংসা করে না, দান করে যাঞ্চা করেনা তারাই দুঃসহ অবস্থা অতিক্রম করে পারে। এখানে সাধারণ অবস্থার লোকদের জন্য বলা হচ্ছে না, যে কষ্টে আছে, বিপদে পড়ে আছে তাকে যদি কেউ কটু কথা বলে নিন্দা করে তখন সে যদি কোন প্রত্যুত্তর না দেয় তাহলে সে আস্তে আস্তে সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। একবার যখন আমি বুঝে গেলাম আমি ঝামেলার মধ্যে পড়ে আছি তখন যদি আমাকে কেউ কটু মন্তব্য করে তখন আমার উচিত হবে সেই কথার কোন উত্তর না দেওয়া। মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হবে। যদি মুখ বুঝে সহ্য করে যেতে পারি তাহলে আমি নিশ্চিত যে আজ হোক কাল হোক এই ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। এমনকি যদি মারও খেতে হয় তাহলে কিন্তু পাল্টা মার দিতে নেই। এখানে আরেকটি কথা বলছেন *ন যাচস্তে*, যতটা পারবে অপরকে দিয়ে যাবে, যাচনা কখনই করবে না। এই ধরণের লোকেরা যত ধরণের দুঃখ কষ্ট আছে সব দুঃখ-কষ্ট থেকে বেরিয়ে আসে।

আরেকটি খুব মূল্যবান কথা বলছেন *যে বা পাপং ন কুর্বন্তি কর্মণা মনসা গিরা। নিষ্কিণ্ডদণ্ডা ভূতেষু দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে।* ১৩/১০৭/৭। মন, বচন আর কর্ম এই তিনটে দিয়ে যে কোন পাপ করে না, আর নিষ্কিণ্ডদণ্ডা, নিষ্কিণ্ড দণ্ডা মানে কোন প্রাণিকে অকারণে কষ্ট দেয় না, সে সব সঙ্কট ও ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসে। আমাদের জীবনে ঝাঞ্ঝাট ঝামেলা আসবেই, এমন কোন মানুষ নেই যার জীবনে কোন ঝামেলা বা সঙ্কট আসেনি। তবে মাঝে মাঝে এমন কিছু মারাত্মক ঝামেলা আসে মনে হয় জীবনটা শেষ হয়ে গেল, এই ঝামেলা থেকে আর বেরোতে পারব না। কিন্তু সে যদি মন, বচন আর কায় দিয়ে কোন পাপ না করে আর কাউকে যদি অযথা মানসিক বা শারীরিক কষ্ট না দেয়, তারও ঝামেলা বিপদ আসবে কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। যারা তমো ও রজোগুণ থেকে বেরিয়ে সত্ত্বগুণে অবস্থিত হয়ে গেছে, তারা কিন্তু দুর্লভ কষ্ট থেকেও বেরিয়ে আসে। যেমন যুধিষ্ঠিরের হয়েছিল, কি দুর্লভ বিপদ তাঁদের এসেছিল, কিন্তু সত্ত্বগুণে অবস্থিত থাকার জন্য ঐ কষ্ট থেকেও তিনি বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। আরও কারা কারা মহাবিপদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে? এরমধ্যে আছে যে নিজেও কাউকে ভয় পায়না অপর কেউ তার থেকে ভয় পায় না, সারা জগতকে নিজের মত দেখে, অপরের সম্পত্তি বৃদ্ধিতে হিংসা করে না, আর নিজেও গ্রাম্য বিষয়ক ভোগ থেকে বেরিয়ে এসেছে। এরাও সব ধরণের কষ্ট থেকে বেরিয়ে আসে। আর বলছেন *সর্বান দেবান্ নমস্যাতি সর্বধর্মাংশ্চ শৃণতে। যে শ্রদ্ধাধনাঃ শাস্তাশ্চ দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে।* ১৩/১০৭/১৮। সমস্ত দেবতাদের শ্রদ্ধাপূর্বক প্রণাম করে আর *সর্বানধর্মাংশ্চ শৃণতে*, সব ধর্মকে শ্রবণ করে, আর শ্রদ্ধা ও শান্তির ভাব নিয়ে থাকে, এরা সব ধরণের কষ্ট থেকে বেরিয়ে আসে। সব ধর্মকে শোনা বলতে হিন্দু, মুসলমান ধর্মের কথা বলা হচ্ছে না, তখন হিন্দু বা মুসলমান বলে আলাদা কোন ধর্ম ছিল না। এখানে ধর্ম বলতে বোঝাচ্ছে যারা যে কর্ম করে, যেমন ব্রাহ্মণ সে তার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কর্ম করে যাচ্ছে কিন্তু যে মুচির কাজ করছে তাকে শ্রদ্ধা করবে তার প্রতি কোন হয় ভাব থাকবে না। যারা এই রকম মনোভাব নিয়ে চলে তারা সব কিছু বিপদ থেকে বেরিয়ে যায়। বর্তমান যুগের ভাষায় এটাই হবে যারা অন্যান্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করে। আবার বলছেন, *যে ছোটবেলা থেকেই মধু, মাংস ও মদিরা ত্যাগ করে দিয়েছে তারা জীবনে শান্তিতে থাকে।* এইভাবে ঝামেলা থেকে বেরোবার অনেক উপায় বলে যাচ্ছেন। এরমধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে *যাত্রার্থং ভোজনং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনম্। বাক্ সত্যবচনার্থায় দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে।* ১৩/১০৭/২৩। প্রথম হল জীবন ধারণের জন্য যারা খাওয়া-দাওয়া করে, খাওয়া-দাওয়া কেন? জীবন ধারণের জন্য। ছেলে বলল আমি বিরিয়ানি খাবো, অমনি বাবা ছুটে বিরিয়ানি আনতে গেলে, বাচ্চা ছেলে তার একদিন শখ হল তাকে না হয় কিনেও দিলেন, কিন্তু তোমার নিজের এসবের প্রতি কোন লোভ থাকবে না। খাওয়া-দাওয়া করাটা লোভকে চরিতার্থ করার জন্য নয়, তোমার জীবন যাত্রা নির্বাহ করার জন্যই খাওয়া-দাওয়া। দ্বিতীয় *সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনম্*। পুরুষ-নারীর সম্পর্ক একমাত্র সন্তান উৎপত্তির জন্যই হবে। তৃতীয়, বাণী সত্য কথা বলার জন্যই। মিথ্যে কথা ও অপপ্রয়োজনীয় কথা বলতে যাবে না। এই তিনটে যারা ঠিক ঠিক পালন করে তারা সব রকমের কষ্ট, ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসে। এই শ্লোকটি খুব মজার শ্লোক, এই শ্লোকের প্রথম অংশটাতে কাঞ্চন থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলা হচ্ছে, দ্বিতীয়টাতে কামিনী থেকে তৃতীয়টা নাম-যশ থেকে। বেশীর ভাগ সময় মানুষ কখন মিথ্যে কথা বলে? যখন অপরের কাছে নামী-দামী হতে চায়। যতটুকু কথা বলা দরকার সত্য কথাই বলবে, তার বাইরে আর কিছু বলতে যাবে না। এই শ্লোকে খুব সাধারণ কথাই বলছেন, খাওয়া-দাওয়া কেন করবে? জীবনযাত্রার জন্য। পুরুষ-নারীর সম্পর্ক কেন হবে? সন্তানের উৎপত্তির জন্য। কথা কি বলবে? সত্য কথা ছাড়া কিছু বলবে না। এইটুকুই তো জীবনের সাধনা। পিতামহ ভীষ্ম খুব সহজ ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে বলে দিলেন। কষ্ট থেকে বেরোবার আরও অনেক পথের কথা বলছেন। যেমন যে ভগবানে ভক্তি রাখে সে কষ্ট থেকে সহজেই বেরিয়ে যায়। এখানে ইন্দ্রাদি দেবতাদের প্রতি ভক্তি রাখার কথা বলা হচ্ছে না। কোন

ভগবানকে ভক্তি করতে হবে বলতে গিয়ে ভগবান সম্বন্ধে বলছেন, যাঁর থেকে সমস্ত প্রাণি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়। যেমন নারায়ণ, আমাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান, তাঁতে যে ভক্তি রাখে, সে সব কষ্ট থেকে বেরিয়ে আসে।

### শেয়াল ও বাঘের কাহিনীর মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্মের নীতিশাস্ত্রের শিক্ষা

যুধিষ্ঠির অনেক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন আর ভীষ্মও সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। যুধিষ্ঠিরের একটা প্রশ্ন ‘হে পিতামহ! অনেক লোক স্বভাব থেকে খুব কঠোর কিন্তু বাইরে থেকে খুব নরম ও শান্ত দেখায়। আবার অনেক বাইরে কঠোর কিন্তু ভেতরে নরম। এদের কি করে আমি ঠিক ঠিক চিনতে পারব?’ ভীষ্ম তখন বলছেন ‘হে ভরতশ্রেষ্ঠ! শোন এই ব্যাপারে তোমাকে আমি একটা পুরনো কাহিনী বলছি। অনেক কাল আগে এক রাজা ছিল, সেই রাজা শুধুই হিংসা কাজ করত। অপরকে কষ্ট দিয়েই সে আনন্দ পেত আর এটাই তার শখ ছিল। একদিকে সে মৃগয়া করে পশুদের কষ্ট দিত আবার অন্য দিকে প্রজাদেরও খুব কষ্ট দিত। প্রাণিদের সেই রাজা এত কষ্ট দিয়েছে যে মৃত্যুর পর সে শেয়াল হয়ে জন্মেছে’। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে মহাভারতে এই বিষয়টা বারবার ঘুরে আসবে, খারাপ কাজ করলে নিম্নায়োনিতে জন্ম নেবে, ভালো কাজ করলে ভালো যোনিতে জন্ম নেবে। ভীষ্ম বলছেন ‘রাজা শেয়াল হয়ে জন্মালেও আমি যে আগে রাজা ছিলাম, এই স্মৃতি তার নষ্ট হয়নি। সেই কারণে তার খুব অনুতাপ হত। ছিঃ! ছিঃ! এ আমি কোথায় এসে শেয়াল হয়ে জন্মিলাম। একদিন সে বাকি শেয়ালদের বলছে ‘আমাদের শেয়ালদের আচরণ অতি বাজে তাই আমাদের কেউ বিশ্বাস করে না। তাই আমি ঠিক করেছি আমি আমার স্বভাবকে পাল্টাব, আমি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবে এতে আমাদের বংশের মর্যাদা বাড়বে। তোমাদের জীবনটা অসন্তোষে পূর্ণ, তাই তোমাদের জীবনে শান্তি নেই। সব রকম নিন্দনীয় কাজ কর বল তোমাদের ধর্ম হানিই হয়ে চলেছে’। শেয়ালটি এই সব কথা বলার পর মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, চুরি করে না, চালাকি করে না, মিথ্যে কথা বলে না। আস্তে আস্তে এর কথা চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। এক বাঘের কাছেও শেয়ালের খবর পৌঁছে গেছে। বাঘ শেয়ালকে দেখতে এসে বলছে ‘ভাই আমি হল্যাম এখানকার পশুকুলের রাজা, চারিদিকে তোমার এত সম্মান আর সুনাম, তুমি আমার মন্ত্রী হয়ে থাকবে চল’। বাঘের কথা শুনে শেয়াল বলছে ‘আমি এই সব মন্ত্রীফক্টরী কাজে নেই। সন্তুষ্টি ছাড়া আমি সুখ ঐশ্বর্য কিছুই চাইনা আর আপনার পুরনো যারা সেবক আছে এরা সবাই দুষ্ট লোক, এরা আমাকে সহ্য করার বদলে অনিষ্ট করতে চাইবে। আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে মন্ত্রী করে নিয়ে যাবেন না। যারাই রাজার আশ্রয়ে থাকে রাজার যা কিছু নিন্দনীয় গুণ আছে সবই তার মধ্যে চলে আসে। আমি এই জঙ্গলে ব্রত তপস্যা নিয়ে পড়ে আছি ঐ ঝামেলার মধ্যে আমি পড়তে চাইনা’। বাঘ কিন্তু শেয়ালকে কিছুতেই ছাড়ছে না ‘তোমাকে যেতেই হবে, আমি তোমাকে ছাড়ছি না’। শেয়াল শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে বলছে ‘আমি যেতে রাজী আছি কিন্তু আমার যত জ্ঞাতি ভাই আছে এদের সবাইকে আপনার সম্মান করতে হবে, আমি যে কথা বলব সব কথা আপনাকে মানতে হবে, আমার জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে’ ইত্যাদি অনেক রকম শর্ত করিয়ে বাঘের সাথে চলে গেল। শেয়াল এবার হয়ে গেল মন্ত্রী। শেয়াল খুব ভালো ভালো কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। চারিদিকে সবার উন্নতি হতে শুরু হয়েছে। এদিকে আশেপাশে বাঘের অনুচর ও তোষামদীরা শেয়ালের এই উন্নতি দেখে চেষ্টা করতে লাগল এই শেয়ালকে কি করে হাতে করা যায়, ঘুষটুশ দিয়ে যেভাবেই হোক। ঘুষের সমস্যা ভারতে প্রথম থেকেই ছিল। ঘুষ দিতে গিয়ে শেয়াল ঘুষ নিতে রাজী না হওয়াতে তখন এরা শেয়ালকে অন্য ভাবে ফাঁসাবার জন্য ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে দিল। একদিন রাজার জন্য খুব করে মাংস রান্না করে শেয়ালের ঘরে লুকিয়ে রেখেছে। শেয়াল বুঝতে পেরেছে কিন্তু কিছু বলেনি। এরপর রাজা খেতে গিয়ে দেখেছে মাংস নেই। সবাই চারিদিকে মাংস খুঁজতে নেমে পড়ল। এদেরই একজন বলল শেয়ালের ঘরে খুঁজে দেখলে হয় না? বলতেই সবাই গিয়ে দেখে শেয়ালের ঘরেই মাংস রাখা আছে। শেয়াল তো অনেক আগেই মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, কোন মাংসই খায় না। কিন্তু শেয়ালের ঘরেই যখন মাংস পাওয়া গেল তখন তাকে রাজার কাছে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে, সবাই বলতে লাগল এই শেয়ালকে প্রাণদণ্ড দিয়ে দাও। রাজাও শেয়ালের প্রাণদণ্ড দিতে রাজী হয়ে গেলেন। শেয়ালের এবার প্রাণদণ্ড হতে যাচ্ছে, শেয়াল কিন্তু একটা কথাও বলল না। প্রাণদণ্ড যখন দিয়ে দেবে সেই সময় বাঘের মা এসে বাঘকে বুঝিয়ে বলছে ‘বাবা! তুমি যে ওকে প্রাণদণ্ড দিচ্ছ তার আগে তুমি একটা ব্যাপার জেনে রেখ, কাজকর্মে যেখানেই পাঁচজন লোক জড়ো হয়ে মেলামেশা হয় সেখানে কয়েকজন শত্রু তৈরী হবেই’। এখানে খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন ‘একজন মানুষ যতই শুদ্ধ, পবিত্র হোক, যতই কর্মনিষ্ঠ হোক লোকে তার ওপর দোষারোপ করবেই। সংসারে সবার কলঙ্ক লাগবেই। যারা বনবাসী মুনি, জঙ্গলে গিয়ে বাস করেন তাদেরও শত্রু, মিত্র, উদাসী এই ধরণের লোক জুটে যায়। এই শেয়াল তো রাজদরবারে কাজ করছে এরতো শত্রু হবেই। যারা লোভী তারা নির্লোভীদের হিংসা করে, কাপুরুষ শক্তিমানকে, মুর্থ বিদ্বানকে, দরিদ্র ধনবানকে, পাপাচারী ধর্মান্নাকে হিংসা করবেই। যারা অবিবেকী, লোভী, কপটী এরা বৃহস্পতির মত



দেবগুরুর মধ্যেও দোষ বার করবে। এবার তুমি দেখ তোমার ঘরে যখন চুরি হয়েছিল কেউ তা দেখেনি। অন্য দিকে শেয়াল আগেও মাংস খেত না, এখনও মাংস খায় না, তবে তুমি এটা কি করে ধরে নিলে শেয়াল মাংস চুরি করেছে। একদিকে ভালো লোককে লাঞ্ছনা দেওয়া হচ্ছে অন্য দিকে যে মাংস খায় না তার উপরেই তুমি মাংস চুরির অপবাদ দিচ্ছ। চুরি যখন হয়েছে তখন কেউ সেখানে ছিল না। এই যে আকাশ দেখছ একে দেখে মনে হচ্ছে উল্টো কড়াই কিন্তু এই আকাশটা উল্টো কড়াই নয় আর জোনাকি পোকাকে দেখে মনে হয় ওর মধ্যে আগুন আছে কিন্তু আদপেই তার মধ্যে কোন আগুন নেই। ঠিক তেমনি যে জিনিষকে প্রত্যক্ষ চোখের সামনে দেখছ সেটা প্রত্যক্ষ দেখছ বলেই যে সঠিক হবে তার কোন ঠিক নেই। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখ’।

‘মায়ের কথা শোনার পর বাঘ খোঁজ করে যখন দেখছে শেয়াল তো সত্যিই চুরি করেনি, এটা একটা ষড়যন্ত্র করা হয়েছে শেয়ালকে ফাঁসাবার জন্য। বাঘ গিয়ে তখন শেয়ালের কাছে খুব করে ক্ষমাটমা চেয়েছে। শেয়াল কিন্তু তখন বলছে ‘আমি আপনার কাছে থাকার আর যোগ্য নই। যদি কোন লোকের মধ্যে এই ধরনের কয়েকটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে আর সেই লোক যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে বুঝবেন আপনার শত্রুর বৃদ্ধি হবে’। কি ধরনের সেই সেই পরিস্থিতি? যাকে তার নিজের মর্যাদা থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যেমন আপনি রাজা, আপনি আপনার মন্ত্রীকে এখন নীচে নামিয়ে দিয়েছেন, এর পরেও যদি তাকে কাছে রাখেন তাহলে জেনে যান আপনার শত্রুপক্ষ শক্তিশালী হয়ে গেছে। তার মনে অপমানজনিত একটা কষ্ট থেকেই যাবে। কেউ যদি কোন পুরস্কার পেয়ে থাকে কিন্তু অপর তাকে কোন লাঞ্ছনা করেছে, যেটা রাজা মেনে নিয়েছে এবং ক্ষীণ, লোভী, ক্রোধী, ভীতু, প্রতারিত হয়েছে, সব কিছু যার হারিয়ে গেছে এই ধরনের লোক যদি রাজার কাছে থাকে তাহলে বুঝে নিন রাজা বিপদে পড়বে’। অর্থাৎ শেয়াল বলতে চাইছে আমি তো আপনার কাছে লাঞ্ছিত হয়েছি, অপমানিত হয়েছি, এই ধরনের লোককে কাছে রাখতে নেই। এতে রাজার শত্রু বলবান হয়ে যাবে। শেয়াল বলছে ‘আমি আপনার কাছে পদচ্যুত হয়ে গেছি, অপমানিত হয়ে গেছি, আপনি এখন আমাকে আর কি করে বিশ্বাস করবেন। নীতিশাস্ত্র এর অনুমতি দেয় না, সেইজন্য আপনি আমাকে বিদায় দিন। আর আমি যখন যে কাজই করব সব কাজেই আপনি আমাকে সন্দেহ করবেন, আমিও সব সময় আপনাকে ভয় পাব। যারা অপরের দোষ খুঁজে বেড়ায় এই ধরনের লোকেরা সব সময় আমার আপনার মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে দিতে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। *দুঃখেন শ্লিষ্যতে ভিন্নং শিষ্টং দুঃখেন ভিদ্ধ্যতে। ভিন্না শ্লিষ্টা তু যা প্রীতির্ন সা স্নেহেন বর্ততে।* ১৩/১০৮/৮৬। ভালোবাসার দড়ি সহজে ছিন্ন হয় না, যদিও ছিন্ন হয় খুব কষ্টেই ছিন্ন হয়। কিন্তু একবার যদি ভালোবাসার দড়ি ছিঁড়ে যায় সেটা আর কিন্তু জোড়া লাগে না। আর যে ভালোবাসা একবার জুড়ছে আর ভাঙছে বুঝে নিন ওখানে ভালোবাসার কোন ভালোও নেই বাসাও নেই। তাই রাজা, আমার আপনার মধ্যে যে ভালোবাসা ছিল সেটা ছিঁড়ে গেছে, এই ভালোবাসা আর জোড়া লাগবে না। *অকস্মাৎ প্রক্রিয়া নৃণামকস্মাচ্চাপকর্ষণম্। শুভাশুভে মহত্ত্বঞ্চ প্রকর্ত্তং বুদ্ধিলাঘবম্।* ১৩/১০৮/৮৯। কারুর জীবনে উৎকর্ষতা বা অপকর্ষ এই দুটো হঠাৎই হয়ে যায়। কিন্তু কাউকে উপরে তুলে পরে নীচে ফেলে দেওয়াটা কখনই ভালো কাজ নয়। এই কাজ অত্যন্ত হীন বুদ্ধির পরিচায়ক আর সর্বদা নিন্দনীয়’। এই কথা বলে শেয়াল সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। এখানে ভালো যারা তাদের মন কি রকম হয় আর যাদের মন বাজে তারা কি রকম হয়, ঘুরিয়ে বলা হল।

### মুর্খদের তপস্যার পরিণতি ও উটের কাহিনী

হিন্দুদের কাছে জাগতিক বলে কিছু নেই সবটাই আধ্যাত্মিক। কিন্তু সেমেটিক ধর্মে গিয়ে দুটো আলাদা হয়ে যায়। ইংরাজীতে দুটো কথা আছে Spiritual and Secular। Spiritual মানে আধ্যাত্মিক আর Secular মানে জাগতিক। সেমেটিক ধর্ম বলতে ইসলাম, খ্রীস্টান, জুহুদি ধর্ম ইত্যাদি। এই ধরনের যত সেমেটিক ধর্ম আছে এরা ঈশ্বরের সৃষ্টিটাকে এক রকম দেখে আর পার্থিব সৃষ্টি আরেক রকম দেখে। অর্থাৎ জড়কে (matter) এক রকম দেখে চৈতন্যকে (spirit) আরেক রকম দেখে। উর্দুতে দুটো শব্দই আছে হালাল আর হারাম, ভালো খারাপ। ভালো খারাপ কিভাবে নির্ধারিত হচ্ছে? মানে জাগতিক যা কিছু সব হারাম। এই হারামকেই অর্থাৎ যে কোন পার্থিব জিনিষকে খ্রীস্টান ধর্মে বলা হয় Secular। যেমন ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এগুলোকে বলা হয় secular knowledge। আর যে বিদ্যা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শিক্ষা দেয় তাকে বলে spiritual knowledge। আমাদের এখানে বলা হয় পরা বিদ্যা আর অপরা বিদ্যা। আমাদের কাছে জাগতিক বিদ্যা কিছু নেই। স্বামীজীও বলছেন ভারতে সেকুলার বলে কিছু হয় না, যা কিছু আছে সবটাই স্পিরিচুয়াল। এই আধ্যাত্মিকতাই সাধারণ মানুষের কাছে নিম্ন আধারের আবার কিছু লোকের মধ্যে উচ্চ আধারের আবার আরও বেশী উচ্চ আধারের হয়। মহাভারতও একই কথা বলছে, এখানে জাগতিক বলে কিছু নেই, সব কিছুই এখানে আধ্যাত্মিক। একটা

জিনিষকে তুমি কিভাবে দেখছ, কিভাবে চিন্তা ভাবনা করছ সেটাই বলে দেবে তুমি নিম্ন আধারে আছ না উচ্চ আধারে আছ। কিন্তু ভগবান ছাড়া কিছু নেই। পরের দিকে আমাদের দেশে পঞ্চতন্ত্রের মত যে সব কথা কাহিনী রচিত হয়েছে বা বিদেশে আরব্য রজনীর মত যত কাহিনী আছে, এগুলো সবই জাগতিক কাহিনী, মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যই রচিত হয়েছে। কিন্তু মহাভারতে ঐ ধরণের কাহিনীগুলোকেই উপস্থাপনা করেছে মানুষে আধ্যাত্মিক উত্থানের জন্য।

যেমন এই শান্তিপর্বেরই এখন একটা কাহিনী আসবে যাতে বলছেন একজন মানুষ তপস্যা করতে পারে কিন্তু ভুলভাল তপস্যা করে কি বিপদে পড়তে পারে, সেটাকেই একটা কাহিনীর মাধ্যমে বলছেন। যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করে যাচ্ছেন আর ভীষ্ম সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। উত্তর দিতে গিয়ে আগে আগে অমুক ঋষি বা রাজা এই ব্যাপারে কি বলেছিলেন বা করেছিলেন সেই সব প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি তাঁর উত্তরটা সাজিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে পরিবেশন করছে। সেইজন্য মহাভারতের শান্তিপর্ব এক বিশাল পর্ব। এখনও যদি এর মধ্যে পাঁচশ পাতা জুড়ে দেওয়া যায় কারুর ধরার উপায় নেই যে এই অংশটা ব্যাসদেব লিখেছিলেন নাকি পরে কেউ লিখেছেন, এমন ভাবেই এখানে বিভিন্ন কথা ও কাহিনীকে সাজান হয়েছে। ভীষ্ম এই কাহিনীর মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন ঠিক ঠিক সুখী হওয়ার জন্য একজন রাজার কি করা উচিত। একটা উট ছিল। উট খুব তপস্যা করেছিল। আমাদের ভারতের পরম্পরাতে যে কেউ তপস্যা করতে পারে, একটা গাছও তপস্যা করতে পারে। উটও খুব জোর তপস্যা করেছে। তখন ব্রহ্মা খুব খুশী হয়ে বললেন ‘বল, তোমার কি বর চাই’। উট কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে বলল আমার ঘাড়টাকে এমন লম্বা করে দিন যাতে ঘাস খাওয়ার জন্য বেশী দূর না যেতে হয়। উট এমনই কুড়ে ছিল যে নড়াচড়া না করে একটা জায়গায় বসেই সে যাতে তার খাবার দাবার খেতে পারে তাই বলল আমার ঘাড়টাকে একশ যোজন লম্বা করে দিন। একশ যোজন মানে পাঁচশ মাইল অর্থাৎ কলকাতা থেকে প্রায় বেনারস। ব্রহ্মা বললেন তাই হোক। উট তপস্যা করেছে, তপস্যার ফলটা যাবে কোথায়। উটের গলাও পাঁচশ যোজন লম্বা হয়ে গেছে। এখন উট নড়াচড়া ছেড়ে দিয়ে এক জায়গাতে বসে থাকত, আর মাঝে মাঝে একবার ঘাড়টাকে নাড়িয়ে কিছু খেয়ে নেয়, এইভাবে সে শান্তিতে পড়ে আছে। এরপর একবার খুব বন্যা হয়েছে। চারিদিকে জল। একটা শেয়াল কোথাও আশ্রয় না পেয়ে ঐ গুহায় ঢুকেছে যেখানে এই উটটি ছিল। উটকে দেখে শেয়াল প্রথমে খুব ভয় পেয়েছে। তারপর শেয়ালের এত খিদে পেয়েছে যে উটের ঘাড় থেকে মাংস খেতে শুরু করেছে। উট এতই কুড়ে যে সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই শেয়ালের পেট ভরে গেছে। শেয়াল দেখছে এতো মহা কুড়ে, সে তখন তাড়াতাড়ি করে নিজের বউ বাচ্চাকেও ডেকে নিয়ে এসেছে। এবার সবাই মিলে উটের ঘাড়টাকে খেতে শুরু করেছে। তারপর যতক্ষণে উটটা ভাবল এবার একটু ঘাড়টাকে নাড়াবে ততক্ষণে তার ঘাড়টা আলাদা হয়ে গেছে। যে এত তপস্যা করেছিল, সেই তপস্যার চোটে তার প্রাণটাই চলে গেল। তাই বলছেন, মানুষ যদি মুর্থ হয় আর সে যদি তপস্যা করে আর তপস্যা করে যদি বর চাইতে হয়, তখন সে কি বর চাইবে? আলস্য চাইবে। সেখান থেকে তার বিনাশ। কুন্তকর্ণেরও ঠিক তাই হয়েছিল। সে বর চেয়েছিল আমি একদিন খাব আর ছয় মাস ঘুমোব। বেশীর ভাগ লোক মনে করে সাধু, সন্ন্যাসী আর বাবাজীরা মুর্থ হয়। কিন্তু তারা জানে না যে, যদি প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না থাকে সে কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে পারেনা। আধ্যাত্মিক জীবনে তারাই উন্নতি করতে পারে যাদের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। কুশাগ্র বুদ্ধি যদি না হয় তার জন্য আধ্যাত্মিক জীবন হতে পারেনা। মুর্থরা যদি আধ্যাত্মিক জীবনে নেমে পড়ে সবার ঐ উটের মতই পরিণতি হবে। মর্কট বৈরাগ্যতেও অনেকে সন্ন্যাস জীবনে নেমে পড়ে, খাওয়া-পড়া নেই, বাড়িতে অশান্তি চলছে, সব ছেড়েছুড়ে চললাম আমি কাশী। আবার সব ভালো হয়ে গেলে তখন নিকুচি করেছে সন্ন্যাসে। এদের কি করে আর বুদ্ধি হবে! এখানে যে কাহিনী গুলো বলা হয়েছে, এগুলো কোন গল্প বলার জন্যই বলা হয়নি, এর মধ্যে গভীর তাৎপর্য রয়েছে। আগেকার দিনে সন্ন্যাসীদের বলা হত উপনিষদের গভীর তত্ত্বগুলিকে সর্বদা চিন্তন করে যেতে। সন্ন্যাসীরা উচ্চ তত্ত্বগুলোকে চিন্তা করে, ধারণা করে উপলব্ধি করে নিতেন। আর আমাদের যা বুদ্ধি উপনিষদ পড়ে বুঝতেই পারিনা, ধারণা করা দূরে থাকুক। একজন মানুষকে আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে হলে কতটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দরকার এই গল্পের মাধ্যমে বোঝান হল। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন *এবমেব যদা বিদ্বান্মন্যতেহতিবলং রিপুম্। সংশ্রয়েদৈতসীং বৃত্তিমতেৎ প্রজ্ঞানলক্ষণম্।।* ১৩/১১০/১৪। ‘তোমার শত্রু যদি খুব শক্তিশালী হয়, তার কাছে বেত যেমন বেঁকে যায় সে রকম বেঁকে যাবে’। মানে কৃত্রিম ব্যাঁকা, বেতকে যত ব্যাঁকাবে তত বেঁকে যাবে, যেই ছেড়ে দেবে আবার সোজা হয়ে যাবে, এটাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

### বিশ্বামিত্র ও চণ্ডালের কাহিনীতে আপৎধর্মের বিশ্লেষণ

ভীষ্ম একটা পর একটা প্রসঙ্গ নিয়ে বলে যাচ্ছেন। অনেক প্রসঙ্গ চলতে চলতে আপৎধর্মের প্রসঙ্গ আসছে। এতক্ষণ রাজধর্ম অনুশাসন আলোচনা করছিলেন। সেখান থেকে সরে এসে আপৎধর্মের আলোচনা করছেন। আপৎধর্ম হিন্দুধর্মের

একটা অনুপম ধারণা। আপৎধর্ম হল, যখন আমরা কোন আপদ বিপদে পড়ে গেলাম, এই বিপদে আমাদের কারুর প্রাণ চলে যেতে পারে, আমাদের সর্বস্ব চলে যেতে পারে তখন সেই বিপদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যে ধর্ম পালন করা হয় সেটাকে বলা হয় আপৎধর্ম। আপৎকালীন অবস্থায় যে আপৎধর্ম পালন করা হয় অন্য সময় স্বাভাবিক অবস্থায় সেই ধর্ম পালন করা চলে না। যাঁরা জ্ঞানীশুণী হন সেইজন্য তাঁরা আপৎধর্মটাকে খুব ভালো করে জেনে রাখেন। এই যেমন কিছুক্ষণ আগে ভীষ্ম বললেন তোমার শত্রু যদি খুব বলবান হয় তখন তুমি বেতের মত বেঁকে যাবে। সব সময় যে তোমাকে বেঁকে থাকতে হবে তা নয়, এটা আপৎধর্ম, সব সময় শত্রুর সামনে বেঁকে থাকলে তো তোমার বিপদ হয়ে যাবে। এই আপৎধর্ম যে শুধু রাজাদের জন্যই আছে তা নয়, সবারই আপৎধর্ম আছে।

প্রেমচাঁদের একটা খুব সুন্দর গল্প আছে। একজন ভদ্রলোকের ছেলে বিয়ে করতে যাবে। উত্তরপ্রদেশের যে জায়গার কাহিনী বলা হচ্ছে সেখানে নিয়ম হচ্ছে বরকে নিজের বাসস্থান থেকে ঘোড়ার পিঠে চেপে বেরোতে হবে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেশনে যাবে সেখান থেকে ট্রেন ধরবে কিন্তু বাড়ি থেকে বরকে ঘোড়ায় চেপে বেরোতে হবে। এটাই ঐ অঞ্চলের খানদানি নিয়ম। এখন ঐদিন অনেক বিয়ে থাকতে ঘোড়ার খুব চাহিদা হয়ে গেছে। কোথাও ভদ্রলোক ঘোড়া যোগাড় করতে পারছে না। শেষে ভদ্রলোক তার একজন বন্ধুর কাছে গেছে, যার কাছে একটা ঘোড়া আছে। বন্ধু বলছে, তুমি আমার ঘোড়া নিয়ে যেতে পার কিন্তু এই ঘোড়ার একটা সমস্যা আছে। মিলিটারির ঘোড়া তাই রোববার দিন কাজ করতে চায় না। আজকে আবার রোববার। ভদ্রলোক বললেন আমি এমন ডাঙা লাগাব ঘোড়া সোজা হয়ে যাবে, আপনি একবার দিয়ে দিন না। ঘোড়াকে নিয়ে আসা হয়েছে। ঘোড়ার পিঠে বরকে বসান হয়েছে। ঘোড়া যেই দেখল আমার পিঠে কেউ বসেছে সে ঘোড়া আর নড়বে না। ঘোড়াকে নড়াবার জন্য যত কিছু করার দরকার সব করেছে, ডাঙা লাগান থেকে শুরু করে সব করেছে কিন্তু ঘোড়া আর চলল না। একজন এসে ঘোড়ার লেজের পেছনে একটা পটকা ফাটিয়েছে, ঘোড়া ভয়ে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে কয়েক পা গিয়েই আবার থেমে গেল। তারপর একজনের মাথায় বুদ্ধি এল, গ্রাম দেশে গোবর ফেলার যে ট্রলি হয়, সেই ট্রলিতে ঘোড়ার সামনে দুটো পা রেখে দাও। সবাই মিলে জোড় করে ঘোড়ার সামনের দুটো পা ট্রলির উপর রেখে দিয়েছে। এবার কয়েকজন মিলে ট্রলিটাকে টানতে শুরু করেছে। ট্রলিটা টানতেই ঘোড়ার পেছনের পাও স্বাভাবিক ভাবে চলতে শুরু করেছে। সবাই আনন্দে হৈচৈ করে উঠেছে ঘোড়া চলেছে ঘোড়া চলেছে বলে চৈচাতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে অনেক লোকজনও জড়ো হতে শুরু করেছে। ট্রলি আর কত দূর টেনে নিয়ে যাবে। যারা টানছে তারাও তো পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে। যেমনি একটু থেমেছে ঘোড়া আর নড়বে না। ততক্ষণে যাই হোক এরা নিজেদের পাড়া থেকে বেরিয়ে এসেছে। তখন বাপ ছেলেকে বলছে ‘খোকা, এবার আমাদের ট্রেন মিস হয়ে যাবে। এই ঘোড়াকে এইখানেই ছেড়ে দাও। চল হেঁটেই স্টেশনে চলে যাই। আর তোমার যে বরের সাজ এটাকে আপাততঃ খুলে লুকিয়ে রেখে দাও। যদি কেউ দেখে বর হেঁটে যাচ্ছে এর থেকে বেশী কলঙ্ক আর হবে না। আর ঘোড়াটাকে বলছে আমার ঘোড়া যদি হতে আজকেই তোকে গুলি করে উড়িয়ে দিতাম। এই যে এখন বাপ ছেলেকে বলছে চল এবার আমরা হেঁটে যাই, এটাই হচ্ছে আপৎধর্ম।

আমাদের পরম্পরাতে আপৎধর্মের উপর অনেক কাহিনী আছে। একবার দেশে দুর্ভিক্ষের জন্য খুব আকাল পড়েছিল। তখন এক ঋষি এই আকালে কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। ঋষি খবর পেলেন সেই দেশের এক রাজা একটা বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছেন যাতে সাধারণ মানুষ কিছু দান সামগ্রী ও খাওয়া-দাওয়া পেয়ে যায়। সেই ঋষি এখন অনাক্রিষ্ট শীর্ণ কলেবরে চলেছেন সেই যজ্ঞে। খুবই ক্ষুধার্ত। কোথাও কিছু খাবার-দাবার নেই। যেতে যেতে দেখেন একজন মাহুত গাছের ছায়ায় বসে ছোলা ভেজান খাচ্ছে। ঋষি গিয়ে সেই মাহুতের কাছে বলছেন ‘আমাকে তোমার থেকে একটু ছোলা খেতে দাও’। মাহুত বলছে এটা আমার উচ্ছিষ্ট ‘আমার মুখের জিনিস একজন ঋষিকে আমি কি করে দিতে পারি’। ঋষি বলছেন ‘আমাকে এখন প্রাণ বাঁচাতে হবে’। মাহুত ঋষিকে তার মুখের উচ্ছিষ্ট ছোলা খেতে দিয়েছে। তারপর মাহুত যে ঘটি থেকে জল পান করছিল সেই জলও ঋষিকে পান করতে দিয়েছে। ঋষি তখন বলছে ‘আমি তো তোমার মুখের ঐঠো জল খেতে পারিনা’। মাহুত বলছে ‘এইতো আপনি আমার ঐঠো ছোলা খেলেন’। ঋষি তখন বলছেন ‘সেতো আমি প্রাণ রক্ষার জন্য খেয়েছি, জলতো সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে, তাই ঐঠো জল কেন খেতে যাব’। এইটাই আপৎধর্ম। মহাভারতের এটাই বিশেষত্ব, ধর্মকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছে। যেমন বেদ, বেদ নিজেই ধর্মের ব্যাপারে একটাতেই দৃঢ় থাকে না। শাস্ত্রেই বলছে সত্যযুগে ধর্মের চারটি পা, ত্রেতা যুগে ধর্মের তিনটে, দ্বাপর যুগে দুটো আর কলিযুগে ধর্মের একটা পা। আবার বলছেন মহাপুরুষদের অনুসরণ করতে, কিন্তু মহাপুরুষরা একেক জন একেক রকম কথা বলে গেছেন। আবার দুর্জনদের দেখা যায় তারাও ভালো কাজ করে। সেইজন্য ধর্মের ব্যাপার কিছু বোঝা যায় না। ধর্ম ঠিক

ঠিক শেষ বোঝা যায় নিজের মন থেকে। নিজের মনই বলে দেবে এটা অধর্ম এটা ধর্ম। শেষ কালে নিজের মন ছাড়া আর কিছুই কাজে আসে না। এখানেই বলা হচ্ছে সাধারণ অবস্থায় যে ধর্ম চলে বিপদের সময় সেই ধর্ম চলে না, আবার আপৎ অবস্থায় যে ধর্ম চলে সাধারণ অবস্থায় সেই ধর্ম চলে না। ভারত আজ দুশ তিনশ বছর ধরে আপৎধর্মের মাঝখান দিয়ে চলেছে। জনসংখ্যা বেড়ে গেছে, খাওয়া নেই, বাসস্থান নেই। চুরি চামারি, জোচ্চুরি সব এই আপৎধর্মের মধ্যে পড়ছে। ইংরেজরা দুশ বছর ধরে ভারতকে লুট করে নিজের সম্পত্তি বাড়িয়েছে। সুইজারল্যান্ডে দুশো বছর আগে খাওয়া-পড়ার জিনিষ ছিল না। তখন ভারতকে বলা হত ‘গোল্ডেন সিল্ক’। ‘গোল্ডেন সিল্ক’ মানে, সারা বিশ্বে যেখানেই সোনা উৎপাদন হোক, দশ বছর পর বা পঞ্চাশ বছর পর খুব জোর একশ বছর পরে ঘুরে ঘুরে সেই সোনা ভারতে চলে আসত। ভারত থেকে সোনা আর বাইরে যেত না। তার কারণ হল, ভারতে সেই সময় কত রকমের মশলা হত, কাপড়ের সূক্ষ্ম কাজ হত, অন্যান্য জিনিষও এত প্রচুর হত যে, সারা বিশ্বে ভারতের উৎপন্ন পণ্যের বাজার ছিল। ভারতকে বাইরে থেকে কোন কিছুই আমদানি করতে হত না কারণ এদের প্রয়োজনই হত না। ভারতের এই মালগুলো কি দিয়ে কিনত? সোনা দিয়ে কেনা হত। যে যেখানে সোনা তৈরী করছে সব সোনা ভারতে এসে জমা হত। মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ দিকে যখন বিদেশীরা ভারতে এল, তারা ভারতের ঐশ্বর্য দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। মোঘল রাজারা বিদেশীদের তাদের রাজমহলে ঢুকতেই দিত না। জাহাঙ্গীর তো দেখাই করেনি।

এখানে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করছেন ‘হে পিতামহ ভীষ্ম! যদি কোন বিপদ এসে যায় তখন কোন ব্রাহ্মণ বা কোন লোক যদি তার পরিবার ও সন্তানাদি না ত্যাগ করতে চায়, তখন সে কিভাবে জীবিকা চালাবে’। সমস্যা ভারতে প্রথম থেকেই ছিল। ভারতের জীবন পুরোটাই দাঁড়িয়ে আছে মৌসুমী আবহাওয়ার উপর। বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইল ডুরাণ্ড, যিনি ইউরোপের উপর নটি বিশাল খণ্ডে ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল ভারতের উপর একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখবেন, কিন্তু সেটা আর না হয়ে উঠলেও ছোট্ট একটা খণ্ড লিখেছেন। সেখানে তিনি প্রথমেই লিখছেন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ যখন ভারতকে দক্ষ করে তখন India dreams of monsoon and monsoon falls India dreams of Nirvan ভারতের গরম এমন গরম যে বাইরের কেউ এসে এখানে টিকে থাকতে পারেনা। সারা ভারতবাসী কবে বৃষ্টি আসবে এই আশায় তাকিয়ে থাকে। বৃষ্টির উপরই ভারতের জীবন দাঁড়িয়ে আছে। দু-বছর যদি ভারতে বৃষ্টি না হয় মানুষ তখন মশা-মাছির মত মরে। এখন তাও প্রচুর জলাধার, খাল ইত্যাদি তৈরী হয়ে গেছে, রাষ্ট্রাঘাট অনেক উন্নত হওয়াতে খাদ্য সরবরাহটা ঠিক সময়ে হয়ে যাচ্ছে, জলও পৌঁছে দিচ্ছে। কিন্তু একশ বছর আগে ভারতে দু-বছর বৃষ্টি না হলেই পোকের মত মানুষ মরে সাফ হয়ে যেত। তাই বলা হয় ভারতের জীবন দাঁড়িয়ে আছে শুধু বৃষ্টির উপর। বৃষ্টি বেশী হলেও লোক মরবে বৃষ্টি কম হলেও মরবে। ভীষ্মকে যুধিষ্ঠির এই প্রশ্নই করছেন, এই রকম অবস্থা যদি হয়ে যায়, তখন ব্রাহ্মণ তার পরিবারের লোকদের খাওয়াতে পারছে না তখন সে কি করবে?

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে একটা কাহিনী নিয়ে আসছেন। *ত্রৈতাং দ্বাপরয়োঃ সঙ্কৌ তদা দৈববিধিক্রমাৎ। অনাবৃষ্টিভূদঘোরা লোকে দ্বাদশবার্ষিকী।।১৩/১৩৭/১৩।* ত্রৈতা ও দ্বাপরের সন্ধিক্ষণে একবার বারো বছর ধরে অনাবৃষ্টি চলেছিল। যদিও এটা পুরানের কাহিনী কিন্তু এখানে বারো বছর বৃষ্টি না হওয়াটা বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না। ঔরঙ্গজেবের সময় একবার তিন থেকে চার বছর বৃষ্টি হয়নি। বৃষ্টি নেই মানে, এত অল্প বৃষ্টি পড়ছে যে মাটি শুষে নিচ্ছে। জলটাকে ধারণ করে রাখতে পারছে না। এখানে নক্ষত্রের অবস্থার বর্ণনা করা হচ্ছে। ইন্দ্র বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছে আর বৃহস্পতি প্রতিলোম হয়ে গেছে। প্রতিলোম হয়ে গেছে মানে, বৃহস্পতির তার যে পথে চলার কথা সেই পথে না চলে অন্য পথে চলছে, অনুলোম না হয়ে প্রতিলোম হয়ে গেছে। চন্দ্রমা বিকৃত হয়ে দক্ষিণমার্গে চলে গেছে। *গতদৈবতসংস্থানা বৃদ্ধবালবিনাকৃতা। গোহজাবিমহিষীহীনা পরস্পরপরাহতা।।১৩/১৩৭/২২।* এমন দুর্ভিক্ষ হয়েছে যার প্রকোপে যত দেবালয়, মন্দির ছিল সব বন্ধ হয়ে গেছে। মন্দিরাদি সব স্পনশরশিপের উপর চলে কিনা। মানুষ নিজেই খেতে পাচ্ছে না, অপরকে কি দেবে। যত ছোট ছোট বাচ্চা আর যারা বৃদ্ধ সব মারা গেছে। মানুষ এত ক্ষুধার্ত হয়ে গেছে যে যেখানেই একটু খাবার পাচ্ছে সেটাকে পাওয়ার জন্য এক অপরকে আক্রমণ করতে শুরু করেছে।

বিশ্বামিত্রের মত অত বড় ঋষি, তিনিও ক্ষুধার্ত হয়ে চারিদিকে খাদ্যের অন্বেষণে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছেন, কোথাও যদি একটু খাবার মত কিছু পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্র সেই সময় নিজের স্ত্রী আর সন্তানকে কোথাও একটা ব্যবস্থা করে ছেড়ে দিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষার্থে বেরিয়ে এসেছেন। বিশ্বামিত্র এখন ক্ষুধার্ত, পথ চলতে চলতে শরীর অবসন্ন, পা আর চলছে না।

ঐ অবস্থায় তিনি একটা চণ্ডালদের গ্রামে পৌঁছে গেছেন। চণ্ডালরা সাধারণতঃ গ্রামের বাইরে থাকত। চণ্ডালরা ছিল শূদ্রের ঠিক নীচে। অস্পৃশ্য জাত বলতে এই চণ্ডালদেরকেই বলা হত। চণ্ডালদের কাজ ছিল মরা পোড়ানো, গ্রামের গৃহপালিত মরা পশুগুলোকে গ্রামের বাইরে ফেলে দিয়ে আসা ইত্যাদি। পরের দিকে অনেকে চণ্ডাল আর শূদ্রদের এক করে দেখা হত, কিন্তু শূদ্ররা কখনই অস্পৃশ্য ছিল না। অস্পৃশ্য শুধু চণ্ডালরাই ছিল। তখনকার দিনে একটা নিয়ম ছিল কোন ব্রাহ্মণ মেয়ে যদি কোন শূদ্র ছেলেকে বিয়ে করে তখন তাদের যে পুত্র হত তাকে চণ্ডাল করে গ্রামের বাইরে বার করে দিত।

বিশ্বামিত্র এই রকম এক চণ্ডালের গ্রামে পৌঁছে গেছেন। চারিদিকে তিনি দেখছেন ভাঙা মাটির ভাড়া আর কুকুর ও শূয়োরের শরীরকে ছেঁদা করতে পারে সেই রকম সব অস্ত্র। শূয়োরের চামড়া খুব মোটা হয় সহজে ছেঁদা করা যায় না, তাই বিশেষ অস্ত্র সব ছড়িয়ে পড়ে আছে আর গাধা শূয়োরের হাড়গোর পড়ে আছে। মরার উপর যে চাদর দেওয়া হয়, সেই চাদর গুলো চারিদিকে রাখা আছে। সাপের খোলসগুলোকে ঝুলিয়ে রাখা আছে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও চণ্ডাল পাড়ার এই রকম চিত্রই পাওয়া যেত, গান্ধীজীর সৌজন্যে এগুলো অনেকটা কেটেছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বিশ্বামিত্র একটা চণ্ডালের ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখছেন সেখানে একটা মরা কুকুরের পেছনের ঠ্যাং পড়ে আছে। মাংসটাও প্রায় পচে গেছে। বিশ্বামিত্র ঠিক করলেন এই মরা কুকুরের ঠ্যাংটাকেই চুরি করে আমাকে এখন খেতে হবে, কারণ তাঁকে প্রাণ বাঁচতে হবে। বিশ্বামিত্র বলছেন, যদি বিপদকালীন অবস্থা হয় তখন একজন ব্রাহ্মণও একজন নিম্নজাতির বাড়ি থেকে চুরি করে নিতে পারে। এই চুরি না করলে সে মরে যাবে, বিশ্বামিত্র এটাকে আপত্ধর্ম বলছেন। যখন বিপদ এসে যায় তখন সমাজের হীনতমো লোকের বাড়ি থেকেও চুরি করে নেওয়া উচিত। সেখানেও যদি চুরি করতে না পারে তাহলে তার সমান অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি থেকে চুরি করা উচিত। সেখানেও যদি চুরি করে কিছু না পায় তাহলে ধর্মাত্মা যিনি তাঁর বাড়ি থেকে চুরি করা উচিত। কম্যুনিষ্টরা বলে বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস, অপহরণ যদি করতে হয় বড়লোকের কাছ থেকে করবে। এখানে কিন্তু ঠিক উল্টো দিক থেকে যাচ্ছে। আর তাও ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বলা হচ্ছে, সামাজিক বা আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বলা হচ্ছে না। আমাদের সংস্কৃতিতে বলবে আমি যদি আমার থেকে যিনি বড়, আমি যাকে গুরু বলে শ্রদ্ধা করছি, তার বাড়ি থেকে যদি কিছু চুরি করি সেটা মহৎ পাপ। তাই বলছেন প্রথমে কার থেকে চুরি করবে? ধর্ম ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে তোমার থেকে হীনজাতি বলে তুমি যাকে মনে করছ, তার বাড়ি থেকে আগে চুরি করবে। তাতে তোমার পাপটা কম লাগবে। হীনজাতি যদি না পাওয়া তাহলে তোমার সমানে সমানে যাকে মনে হচ্ছে তার থেকে নেবে। সেটাও যদি না হয় তখন অগত্যা তোমার থেকে যে শ্রেষ্ঠ তার বাড়িতে গিয়ে চুরি করবে।

এই ভেবে বিশ্বামিত্র চুপি চুপি কুঁড়ে ঘরের ভেতরে ঢুকতে যাবেন তখন দেখছেন ঘরের বারান্দায় চণ্ডাল শুয়ে আছে। তার চোখে পিচুটি, সেও ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে আছে, তারও তো খাওয়ার-দাওয়ার কিছু নেই। শুয়ে আছে কিন্তু ঘুমোয়নি। শুয়ে শুয়ে চণ্ডাল দেখতে পাচ্ছে তার ঘরে একজন চুরি করতে ঢুকছে। চণ্ডাল তখন খুব জ্বর ভাষায় বলছে ‘এ্যাঁই তুই কে রে? এই চণ্ডালের বাড়িতে চুরি করতে এসেছিস, আবার আমার কুকুরের ঠ্যাংটাকে চুরি করছিস। আমি জেগে আছি, ঘুমোচ্ছি না, তুই এবার মরলি’। চণ্ডালের কথা শুনে বিশ্বামিত্র তো ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছেন। তিনি একেই একজন উচ্চ ঋষি, চণ্ডালের বাড়িতে মরা কুকুরের মাংস চুরি করতে ঢুকেছেন, তাও রান্না করা মাংস নয়, কাঁচা। বিশ্বামিত্র তখন চণ্ডালকে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। ‘আমি বিশ্বামিত্র, আমি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত, দেখো বাপু তুমি যদি ঠিক মনে কর তাহলে আমার বধ কর না’। অনেক সময় বলা হয় রাজার ব্যাটা মরে গেলেও রাষ্ট্রায় পড়া রুটি তুলবে না, এটাও যেমন আছে আবার এখানে বিশ্বামিত্র যিনি প্রথম দিকে ছিলেন রাজা পরে হয়েছেন ঋষি, সেই বিশ্বামিত্র আপত্ধর্মে পড়ে চণ্ডালের বাড়িতে ঢুকে মরা কুকুরের মাংস চুরি করছেন। বিশ্বামিত্রের নামতো তখনকার দিনে সবাই শুনেছে। চণ্ডাল বিশ্বামিত্র নাম শুনেই আঁতকে উঠেছে, হাতজোড় করে বলছে ‘দোহাই আপনার! আপনি আমার বাড়িতে এসে মরা কুকুরের মাংস চুরি করে আমাকে নরকে পাঠাবেন না’। চণ্ডাল বিশ্বামিত্রের নাম জানে দেখে বিশ্বামিত্রের মনে একটু জোর এসেছে। বিশ্বামিত্র চণ্ডালকে বলছেন ‘দেখো! আমি ক্ষুধার্ত, কিছু না খেলে আমার প্রাণটুকু বেরিয়ে যাবে, আমি মরা কুকুরের এই ঠ্যাংটা নিয়ে যাচ্ছি। ক্ষুধিতঃ কলুষং যাতো নাস্তি হীরশনার্থিনঃ। ক্ষুচ্ছ মাং দুষ্যত্যত্র হরিষ্যামি শৃঙ্গাঘনীম্। ১৩/১৩৭/৫১। খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে আমি এই পাপকর্মে লিপ্ত হয়েছি। ক্ষুধার্ত মানুষ কোন কিছু করতে লজ্জা বোধ করেনা। সুতরাং আমি এই কুকুরের জঙ্ঘার মাংস হরণ করব’।

সংস্কৃতে দশকুমার চরিতে খুব নামকরা একটা গল্প আছে। দশজন কুমারের একজনকে কেউ বলেছে এই শহরের বাইরে একজন খুব বড় ঋষি আছেন, তাঁর নাম মরীচি মুনি, তিনি সব কিছু বলে দিতে পারেন। মরীচি মুনির নাম শুনে

সেই কুমার শহরের বাইরে খুঁজতে খুঁজতে এসে বুড়ো বাবার কাছে এসে জিজ্ঞেস করছে ‘আচ্ছা, মরীচি মুনি কোথায় আছেন? আমি তাঁর কাছে কিছু জানতে চাই’। বুড়ো বাবা বললেন ‘আগে একজন মরীচি মুনি এখানে থাকতেন এখন আর উনি আর ঋষি টিশি কিছু নন, তিনি শেষ হয়ে গেছেন’। রাজকুমার অবাক হয়ে গেছে ‘কি বলতে চাইছেন? শেষ হয়ে গেছে মানে?’ গল্প টল্ল বলার পর বোঝা গেল উনিই মরীচি মুনি। উনি নিজেই বলছেন ‘মরীচি মুনি আগে তপস্যা করতেন, খুব ভালো লোক ছিলেন, পাকা দাড়ি ছিল। হঠাৎ একদিন এক নর্তকী তাঁর আশ্রমে হাজির হয়েছে। নর্তকী দেখতেও খুব সুন্দরী। মেয়েটে এসে বলছে আমি আপনার সেবা করব। মরীচি মুনি রাজী নন। তারপর সে গায়ের জোরেই তাঁর সেবা করতে শুরু করল। সেবা করতে করতে মাঝে মাঝে কয়েকটা প্রশ্ন করে। প্রশ্ন করতে করতে নর্তকী একদিন জিজ্ঞেস করছে চারটে যে পুরুষার্থের কথা বলা হয় তার কাম জিনিষটা আমাকে বুঝিয়ে দিন। মরীচি মুনি বলছে ‘আমি তো সেই ছোটবেলা থেকে সন্ন্যাসী আমি কি করে জানব কাম কি’। মরীচি মুনিকে নর্তকী বলছে তাহলে তো আপনার সাধনা পূর্ণ হল না। মরীচি মুনি বললেন ‘তুমি তো এইসব ব্যাপার জানো তুমিই না হয় আমাকে শিখিয়ে দাও’। নর্তকী বলছে আপনাকে আমি কি করে শেখাব। বিয়ে যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ আমি শেখাতে পারিনা। মরীচি মুনি বলে দিলেন ‘আমি তাহলে তোমাকে বিয়ে করব’। এতদিনের সাধনা সব ছেড়ে দিয়ে এখন বলছেন মেয়েটাকে নিয়ে বিয়ে করে থাকবেন। নর্তকী বলছে আপনাকে বিশ্বাস নেই, আপনি ঋষি মানুষ, আপনার কথার কোন ঠিক নেই। আপনি রাজার কাছে চলুন, রাজার কাছে গিয়ে বলতে হবে আপনি আমাকে বিয়ে করতে চাইছেন। এই হল সেই কথা, ক্ষুধার্ত মানুষের কোন কিছুতে লজ্জা থাকে না। বুড়ো ঋষি এখন রাজার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। সভা ডাকা হল। সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নর্তকী বলছে বলুন আপনি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন, তিন বার বলুন। ঋষিও তিন বার করে বলেছে হ্যাঁ, আমি বিয়ে করতে রাজী। ঋষির ঐ কথা শুনে সভার সব লোকেরা মাথা নত করে বসে আছে। নর্তকী এবার বলছে আমার ঐ বান্ধবীকে ডেকে পাঠান। বান্ধবীকে কেন আবার ডাকা হবে? না, ওর সাথে আমার বাজী হয়েছিল। আমার বান্ধবী আমাকে বলেছিল, তুমি এমন অহঙ্কারী হয়েছে যেন মনে হচ্ছে তুমি মরীচি ঋষিকে বিয়ে করে নেবে। তখন আমার বান্ধবীকে বলেছিলাম, আমি যদি নারী হই, আর আমার যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে আমি মরীচি ঋষিকেও নামিয়ে রেখে দেব। আমাদের মধ্যে তখন বাজী হয়েছিল যে জিতবে তার দাসী হয়ে থাকতে হবে। বান্ধবীকেও ডেকে আনা হল, সব শুনে স্বীকার করে নিয়েছে ঠিক আছে আমি তোমার দাসী হব। মরীচি ঋষি জিজ্ঞেস করছেন ‘আমাদের বিয়ে তাহলে কবে হবে?’ নর্তকী বলছে ‘বিয়ে! দূর হ বুড়ো, তোকে কি বিয়ে করবে। আমার এই বাজী জিততে হবে তাই এই নাটক করেছে। বুড়ো হয়ে আবার বিয়ে করতে এসেছে’! এখন মরীচি মুনি চারিদিকে অপমানিত হয়ে, কলঙ্কিত হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। দশকুমার চরিত খুব বিখ্যাত বই, এই ধরনের নানা রকমের কাহিনী আছে। মরীচি মুনির ক্ষুধাকে জাগিয়ে নর্তকী তাকে নাচিয়ে দিয়ে সরে গেল। যে ক্ষুধার্ত হয়ে যায় চক্ষুলাজ্জা তার একেবারেই চলে যায়। ক্ষুধার্ত যে কোন ব্যাপারে হতে পারে। এই কথাই চণ্ডালকে বিশ্বামিত্র বলছেন। তুমি ওরকম কিছু ভেবো না আমার চোখের লজ্জা চলে গেছে। আমাকে এখন প্রাণ বাঁচাতে হবে তাই আমি কে চণ্ডাল আর কিসের মাংস ওসব কিছু দেখছি না। খিদের জ্বালায় আমার চেতনা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মরীচি ঋষিরও চেতনা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তার মাথায় ঐ নর্তকী ঘুরছে, তার চোখে ঐ নর্তকীর রূপ তাকে ক্ষুধার্ত করে দিয়েছে। বিশ্বামিত্রের মাথায় এখন শুধু খাওয়া ঘুরছে।

বিশ্বামিত্র বলছেন ‘আমি জানি আমি অধর্ম করছি, কিন্তু অগ্নি যেমন সর্বভুক হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি আমি ব্রাহ্মণ হয়েও সর্বভক্ষি হব। তোমার কোন চিন্তা নেই তুমি আমাকে ঐ কুকুরের ঠ্যাংটাই দাও’। আগেকার দিনে অগ্নি শুধু যজ্ঞের আহুতির ঘি খেতেন, পরে এক অভিশাপের ফলে তিনি সব খেতে শুরু করেন। চণ্ডাল তখন বিশ্বামিত্রকে বলছে ‘ছিঃ! ছিঃ! আপনি এমন উচ্চকুলের ব্রাহ্মণ হয়ে এরকম দুষ্কর্ম করবেন না। আপনি একজন তপস্বী, এইভাবে তপস্যাচ্যুত হবেন না। এত বড় ঋষি হয়ে আপনি মরা কুকুরের মাংস খাবেন! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!’ আসলে চণ্ডালও হয়তো জানতো, যদি কোন যোগী যোগভ্রষ্ট হয়, তখন যার জন্য যোগভ্রষ্ট হয় তারও পাপ লাগে। যোগীর তো পতন হয়ে গেলই, চণ্ডাল এই মরা কুকুরের মাংস তাকে খাওয়াচ্ছে তাই তারও পাপ লাগবে। চণ্ডালও এটা জানত তাই বলছে আপনার এত দিনের তপস্যাকে এইভাবে নাশ হয়ে যেতে দেবেন না। চণ্ডালের কথা শুনে বিশ্বামিত্র বলছেন ‘আমি খাওয়া-দাওয়া পাচ্ছি না বলে চারিদিকে দৌড়াচ্ছি, আমাকে এখন প্রাণ রক্ষা করতে হবে। চণ্ডাল! তুমি জেনে রাখ আমার যে শক্তি সেটা হল বেদরূপী অগ্নি। আমার জঠরে যে অগ্নি জ্বলছে তার শক্তির জন্য আমি যে কোন জিনিষ করব’। এরপর বিশ্বামিত্র যে কথা বলছেন এটাই আপৎধর্মের মূল কথা, আর এই ভাবটা মহাভারতে ঘুরে ঘুরে আসবে। বিশ্বামিত্র বলছেন *জীবন্ ধর্মং চরিত্যামি প্রণোৎসাম্যশুভানি তু। তপোভির্বিদ্যা চৈব জ্যোতীংখীব মহত্তমঃ।।১৩/১৩৭/৬৬।* ‘যত অন্ধকারই থাকুক, সূর্যোদয় যখন হয় তখন সব

অন্ধকারের নাশ হয়ে যায়, ঠিক তেমনি আমি আমার তপস্যা আর বিদ্যা (এখানে বিদ্যা মানে ধ্যান) দ্বারা আমার যত অশুভ কর্ম হয়েছে, সব নাশ করে দেব’। আপত্ধর্ম কখন পালন করতে পারবে? যখন কারুর প্রাণ সঙ্কট হবে। প্রাণ সঙ্কটের বাইরে আপত্ধর্ম পালন করা যায় না। প্রাণ সঙ্কটে যদি কেউ পড়ে যায় তখন যে কোন পাপকর্মের দ্বারা নিজের জীবনকে রক্ষা করা যেতে পারে। আপত্ধর্ম পালনের দ্বারা নিজকে বাঁচিয়ে নেওয়া হল। এবার তাকে কি করতে হবে? জোর তপস্যা শুরু করে দিতে হবে। তপস্যার জোরে ঐ যে পাপটা লেগেছিল, সেই পাপটাকে কাটিয়ে দিতে হবে। ঐ পাপটা কিন্তু কোন দিন যাবে না। বিশ্বামিত্র যে চণ্ডালের বাড়িতে কুকুরের মাংস চুরি করতে গিয়েছিল এই কাহিনী চিরদিন থাকবে কিন্তু পরে তাঁর তপস্যার এত জোর হবে যে ঐ পাপটাকে ঢেকে দেবে। সেইজন্য স্বামীজী ঠাকুরের ভজনায় বলছেন কৃত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারী। শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সেই ভগবান, যে পাপকর্ম করা হয়েছে, যাঁর কৃপাতে সেই পাপকর্মটাও কৃত্য হয়ে যায়। চাঁদের যে কলঙ্ক, সেই কলঙ্ক চাঁদের সৌন্দর্যকে আরও মহিমাম্বিত করে দিয়েছে। ঈশ্বরের যখন কৃপা হয় তখন ঐ পাপকর্মই তার সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে দেয়। যেমন যার মুখের রঙ কালো তার দিকে কেউ তাকায় না, আবার ফর্সা মুখে যদি একটা কালো তিল থাকে তখন ঐটাই তার সৌন্দর্যকে আরও শ্রী করে দেয়। ঠাকুরের যদি কৃপা হয় তাহলে পাপকর্মটাও কৃত্য হয়ে যায়। তাই বলে ঠাকুর কি পাগল? সবাই পাপ কাজ করে ঠাকুরকে গিয়ে বলবে ঠাকুর এই পাপ করেছে তুমি আমার পাপটাকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দাও। আর ঠাকুর কি সঙ্গে সঙ্গে তার পাপটাকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেবেন? কখনই দেবেন না। ঠাকুর কখন কৃপা করবেন? যদি তোমার তপস্যা থাকে, তোমার যদি শুভ কর্ম থাকে তবেই তিনি কৃপা করবেন। তবে কি, পাপকর্ম করে শুভ কর্ম করলেই যে তাঁর কৃপা হয়ে সব ঠিক হয়ে যাবে এই কথা কখনই জোর দিয়ে বলা যায় না। কত লোক কত শুভ কর্মই তো করে যাচ্ছে কিন্তু জীবনের পদে পদের তাদের কত রকমের ঝামেলা, কত রকমের বিপদ লেগেই থাকে। ঠাকুরও তাই বলছেন তাঁর মায়ার রাজ্যে কিসে থেকে কি হয় কখনই বলা যায় না। এখানে কিন্তু বিশ্বামিত্র বলছেন না যে, আমার ভালো মন্দ কিছু হয়ে যাবে। বলছেন, চণ্ডালের বাড়ি থেকে মরা কুকুরের কাঁচা মাংস চুরি করে খাওয়ার এই যে আমার কলঙ্ক হবে, আমার তপস্যার জোরে সব কলঙ্ক ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। বিশ্বামিত্রের চরিত্র সেইজন্য খুব মজার চরিত্র। তাঁর জীবনে অনেক রকম গোলমালের কাহিনী আছে। কখন বশিষ্ঠ মুনির উপর অস্ত্র চালিয়ে দিচ্ছেন, কখন মেনকার সাথে জড়িয়ে যাচ্ছেন কখন আবার চণ্ডালের বাড়ি থেকে মরা কুকুরের কাঁচা মাংস চুরি করতে যাচ্ছেন, কিন্তু বিশ্বামিত্র হচ্ছে বিশ্বামিত্র। তপস্বীদের রাজা। এইটাই বিশ্বামিত্রের বিশেষত্ব। হিন্দুধর্মে পতন জিনিষটাকে কেউ মানে না। পতন বলে এখানে কিছু নেই। এই পতনটাই পাল্টে যাবে একটা সৌন্দর্যে। মহাভারতের এইটাই বৈশিষ্ট্য, পতনকে কেউ মানে না। পর্বতের শৃঙ্গ অভিযানে এটা তোমার আধ্যাত্মিক অভিযান। চড়াই উৎরাই পেরিয়ে তুমি এগিয়ে চল। কখন তোমাকে নীচে নামতে হচ্ছে কখন আবার তুমি উপরের দিকেই উঠতে থাকবে। যখন তোমাকে উৎরাইয়ের পথে নীচের দিকে নামছ তাই বলে তোমার অভিযান থেমে থাকছে না, এই পতনটাই তোমাকে কিন্তু চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বামিত্রের কথা শোনার পর চণ্ডাল এখানে ‘আমি এতদিন যা শুনে এসেছি ব্রাহ্মণদের এই এই করতে নেই’ এই বলে একটা বিরাট লিস্ট দিয়ে বলে যাচ্ছে ব্রাহ্মণদের কি কি করতে নেই। এর মধ্যে একটা মজার কথা বলছে চণ্ডাল ‘একেই আমি জাতিতে চণ্ডাল, মানে মনুষ্য জাতির মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্ট এবং অস্পৃশ্য, সমস্ত অস্পৃশ্যদের মধ্যে কুকুর হল সবার অস্পৃশ্য, সেই কুকুরের আবার পশ্চাদ ভাগ আবার পুরোপুরি অস্পৃশ্য, আর সেই পশ্চাদ ভাগের মাংস আপনার মত একজন ব্রাহ্মণ খেতে চাইছে’! বিশ্বামিত্র আবার বলছেন ‘এটা করা যেতে পারে, শ্রেষ্ঠ পুরুষরা এর আগে আগে ঝামেলার মধ্যে পড়ে যা যা করেছিলেন সেই অনুসারে এই কাজ করাতে কোন আপত্তি হতে পারেনা’। চণ্ডাল কিছুতেই বিশ্বামিত্রকে মাংস খেতে দেবে না, বলছে ‘যারা ঠিক ঠিক উচ্চ বংশজাত, তারা নিজেদের প্রাণ ছেড়ে দিতে রাজী হবে কিন্তু ভক্ষ্য ও অভক্ষ্যের ব্যাপারকে কখনই ছেড়ে দেবে না’। ভক্ষ্য ও অভক্ষ্যের বিচার বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কঠোর ভাবে মানা হয়, যেমন মুসলমান মরে যাবে কিন্তু কখন শূয়োরের মাংস খাবে না। এই কয়েক দিন আগেও হিন্দুরা মরে যাবে কিন্তু গোমাংস খাওয়া দূরে থাক স্পর্শই করবে না। এখন অবশ্য দিনকাল পাল্টে যাচ্ছে। চণ্ডাল বলছে ‘এই ভক্ষ্য ও অভক্ষ্যের বিচার (উপবাস) দ্বারা সব স্বর্গলোকের পূর্তি হয়’। চণ্ডাল বলতে চাইছে, সাধুপুরুষরা যখন ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য বিচার রাখেন, আমার এটা খেতে নেই বা আমি এটা খেতে পারি, শাস্ত্রে যখন বলে দেওয়া হয়েছে তুমি এটা খাবে না, সে যদি মহা সঙ্কটেও পড়ে যায় তখনও সেটা খায় না। আর উপবাস, বিশেষ বিশেষ দিনে যেটা ভক্ষ্য সেটাও সে সেদিন খাবে না, বাতাস খেয়ে থাকবে।

অভক্ষ্য কি? যে কোন খাদ্য। এই খাওয়ার উপরই কেউ যদি একাগ্র হয়ে সাধনা করে, এই খাদ্যযোগের দ্বারাই তার এত শক্তি এসে যাবে যে, তার মনে যা ইচ্ছে হবে সেটাই সে পেয়ে যাবে। জৈনরা এই খাওয়া-দাওয়ার উপর খুব জোর দেয়। নিরমিষ ছাড়া কোন কিছুই খাবে না, সন্ধ্যের পর কিছু খাবে না, জৈন মুনরা তো মুখে কাপড় বেঁধে রাখে। বলা হয় এতেই তারা যত রকমের সিদ্ধি পেয়ে যায়। কি করে পেয়ে যায়? শুধু এই খাওয়ার উপর সংযম করে। কোথা থেকে সংযম করার প্রেরণা পাচ্ছে? শাস্ত্র থেকে পাচ্ছে। তাহলে গরু খাওয়ার অনুমোদন হয় কিনা? শূয়ার খাওয়ার অনুমোদন হয় কিনা? নির্ভর করছে আমি কোনটাকে কোন সময়ে গ্রহণ করে রেখেছিলাম। হিন্দী বেলেট বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে একটা প্রথা আছে। হয়তো কেউ এসে বলছে আমি ঠাকুরকে কলা চড়িয়ে এলাম। আমরা শুনে ভাবব যে হয়ত সে ঠাকুরকে দুটো কলা নিবেদন করে এসেছে। আসলে তা নয়, কলা এর খুব প্রিয়, এখন ঠাকুরকে কলা চড়িয়ে এলাম মানে আমি কলা আর কোন দিন খাব না। যারা ঠিক ঠিক ভক্ত তারা তাদের যে ফলটা প্রিয় সেটা ঠাকুরকে নিবেদন করে ঠিক করে নেয় আমি আর সেই ফল খাবো না। যারা ঠিক ঠিক ভক্ত নয় তাদের যদি বিশেষ কোন ফল থেকে শারীরিক কোন সমস্যা হয়, সে ঐ ফলটাই ঠাকুরকে চড়িয়ে দিয়ে বলে আমি আর এই ফল ছোঁব না। উত্তরপ্রদেশে এটা খুব প্রচলিত প্রথা। একজন মা হয়তো তার সন্তানের মঙ্গল চাইছে, মা তখন ঠাকুরকে গিয়ে বলবে ‘ঠাকুর আম আমার খুব প্রিয় তাই আমার সন্তানের মঙ্গলের জন্য এই আম তোমাকে অর্পণ করে দিলাম’। এরপর থেকে সেই মা আর আম খাবে না। এই যে তপস্যা, আমার মরসুমে আমার ছড়াছড়ি, এত আম দেখছে কিন্তু আম অত প্রিয় কিন্তু সে খাচ্ছে না, এতেই সে সব সিদ্ধি পেয়ে যায়। এই যে সঙ্কল্প করে নিচ্ছে, ত্যাগ বা গ্রহণ, গ্রহণ মানে আমি সকালে গঙ্গাজল আর তুলসী পাতা মুখে না দিয়ে কিছু খাবো না। এরপর আমি বাইরে কোথাও গেছি সেখানে গঙ্গাজল আর তুলসী পাতা পেলাম না, আমি সেদিন কিছুই খেলাম না, বলছে এতেই শক্তি এসে যাবে। আমরা অনেক সময় এই ধরনের উপাচার নিয়ে হাসাহাসি করি, কিন্তু এগুলো আদর্শেই হাসাহাসির ব্যাপার নয়। আজকেই যদি আমি মনে মনে সঙ্কল্প করে নিই আজ থেকে আমি এই জিনিষটা করব না, কাল থেকেই দেখব যোগবিদ্য রূপে সেটাই করার জন্য কত রকমের প্রলোভন এসে যাবে। সব প্রলোভনকে উপেক্ষা করেও যদি সঙ্কল্পে অটুট থেকে যাই, সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে যোগশক্তি চলে আসবে। চণ্ডাল বিশ্বামিত্রকে এটাই বলছেন যে, গুরুজনরা বলে গেছেন ভিক্ষা ও অভিক্ষা বিচার করেই উচ্চ ব্রাহ্মণদের সর্ব সঙ্কল্প সিদ্ধি হয়ে যায়।

বিশ্বামিত্র এখানে খুব সুন্দর একটা শ্লোকে বলছেন *স্থানে ভবেৎ সংশয় প্রেত্যভাবে নিঃসংশয়ঃ কর্মণাং বৈ বিনাশঃ। অহং পুনর্জতনিত্যঃ শমাত্মা মূলং রক্ষাং ভক্ষয়িষ্যাম্যভক্ষণম্। ১৩/১৩৭/৭৮*। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য এত বিশাল যে সব কিছুকে সামনে নিয়ে আসা হয় না। সব কিছু সবার সামনে নিয়ে আসা যায় না, তারও একটা প্রস্তুতির দরকার। এমন অনেক কিছু মহাভারতে আছে যা আমাদের অনেক পুরনো প্রচলিত ধ্যানধারণার উপর এতই আঘাত স্বরূপ যে সেই আঘাতকে সহ্য করার মানসিকতাই আমাদের এখনও তৈরী হয়নি। বিশ্বামিত্র এখানে বলছেন ‘হে চণ্ডাল! অভুক্ত থেকে যদি আমি প্রাণত্যাগ করে দিই তাতে আমার লাভটা কি হবে। মৃত্যুর পর আমি স্বর্গলাভ করব এটাতো সংশয় যুক্ত’। মহাভারত বিশ্বামিত্রের নামে বলছে মৃত্যুর পর আমি আমার পুণ্যের ফল পাব কি পাব না সংশয় যুক্ত। তার মানে, মৃত্যুর পর কিছু আছে কিনা সেটাও সংশয় যুক্ত হয়ে গেল। তাই কুকুরের মাংস না খেলে আমার পুণ্য হবে এটাই সংশয় যুক্ত। এখানে মূল কথা হল, যতক্ষণ শাস্ত্রের কথা সাক্ষাৎ উপলব্ধি না হয় ততক্ষণ শাস্ত্রের কথা মুখের কথাই থেকে যায়, ঐ কথার কোন দাম নেই। মানুষ যেটা নিজে প্রত্যক্ষ করছে তারই দাম থাকে। এই শরীর আমার প্রত্যক্ষ, এই জগৎকে আমি প্রত্যক্ষ করছি, এই শরীর ও জগতই আমার কাছে একমাত্র সত্য, এই দুটোর বাইরে বাকি সব কিছুই সংশয় যুক্ত। বিশ্বামিত্রের মুখে ব্যাসদেব এই কথা বলাচ্ছেন – মরার পরে আমার কি হচ্ছে সেটা কে জানছে, তাই কুকুরের মাংস না খেলে মরার পরে আমার যে বিরাট পুণ্য হবে এটাই তো বিরাট সংশয়, কিন্তু আমি যদি কুকুরের মাংস এখন না খাই আমার মৃত্যুটা নিশ্চিত। আমি যদি মরেই যাই তাহলে তো আমার পুণ্য কর্মের নাশ হয়ে গেল। কেন? কারণ এই দেহ দিয়েই তো সব ধর্ম আচরণ হয়, দেহটাই যদি আমার নাশ হয়ে যায় তাহলে আমি ধর্মাচরণ করব কিভাবে। বিশ্বামিত্রের এই কথায় কি বলা হচ্ছে? আমাদের এই দেহটাকে কেন রক্ষা করতে হবে? ধর্মাচরণের জন্য। আমরা কেন বেঁচে আছি? ধর্মাচরণের জন্য। বিশ্বামিত্র তাই বলছেন ‘দেখো, আমি যদি কুকুরের মাংস খেয়ে আমার এই দেহটাকে যদি কোন ভাবে রক্ষা করে নিতে পারি তাহলে নিয়মিত জপ-ধ্যান ও তপস্যা করে আমি আমার এই পাপটাকে কাটিয়ে দিতে পারব।

চণ্ডাল আবার বিশ্বামিত্রকে উপদেশ দিতেই বিশ্বামিত্র বলছেন *পিবন্ত্যেবোদকং গাবো মণ্ডুকেষু রুবৎসপি। ন তেহধিকারো ধর্মেহন্তি মা ভূরাভ্রপ্রশংসকঃ। ১৩/১৩৭/৮১*। গরু জলাশয়ে যখন জল খেতে যায় তখন জলের ভেতর



থেকে ব্যাঙগুলো খুব ডাক ছাড়ে, তাই বলে কি গরু জল খাওয়া ছেড়ে দেয়? তুমি যতই ব্যাঙের মত ডাক ছাড় আমি এই মাংস খাওয়া ছাড়ছি না। বিশ্বামিত্র তাঁর বক্তব্যের উপসংহারে বলছেন ‘আপদ বিপদের থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য যদি সামান্য পাপ করা হয় সেই পাপের জন্য সারা জীবনের সঞ্চিত পুণ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারেনা’। আমাদের সতিই খুব দুর্ভাগ্য যে ব্রাহ্মণরা যারা শিক্ষার প্রসারকে ধরে রেখেছিল তারা জেনে বুঝেই সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার প্রচার হতে দেননি। তার ফলে সাধারণ লোক জানত পারল না আমাদের ধর্মগ্রন্থে কি আছে। এখানে আমাদের অন্যতম প্রধান শাস্ত্র মহাভারত কি বলছে? আপদের সময় একটা সামান্য পাপ করলে জীবনের সব সঞ্চিত পুণ্য নষ্ট হয়ে যায় না। হিন্দুদের উপর মুসলমানদের যখন আক্রমণ হল, যখন সমাজচ্যুত হিন্দুরা বাধ্য হয়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছিল তখন মহাভারতের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশটাকে প্রয়োগ করা হলে ধর্মান্তরিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। মুসলমানরা ভারতে আসার পর ভারতীয়দের উপর অনেক রকম অত্যাচার করতে শুরু করল। অনেক সময় এরা মজা করে কোন ব্রাহ্মণদের যদি টিকি কেটে দিত আর মুখে গরুর মাংস ছুঁয়ে দিত, আর তাতেই সব হিন্দুরা তাকে সমাজচ্যুত করে দিত। এখন এদের তো আর কোথাও যাবার নেই। মুসলমানদের মধ্যে ছিল দ্রাতৃত্ব ভাব, তারা এই সব সমাজচ্যুত লোকগুলোকে লোভ দেখিয়ে কায়দা করে মুসলমান করে তাদের কাছে টেনে নিত। যারা এখন মুসলমান হয়ে গেল এরা তখন রাগের চোটে হিন্দুদের উপর যারা তাকে সমাজচ্যুত করে দিয়েছিল তাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করতে শুরু করে দিল। কিন্তু এদের কখনই সমাজচ্যুত করাটা ঠিক হয়নি, কারণ এখানেই বলছেন আপদের সময় একটা সামান্য পাপের জন্য সারা জীবনের সঞ্চিত পুণ্য কখনই নষ্ট হতে পারেনা। ভারতের বাইরে এই সব মানে না, কিন্তু আমাদের সবাই এই ক্ষেত্রে ভুল করি, একটা লোককে গলা কাটতে এসে তার মুখে গরুর মাংস গুজে দিল কি দিল না তাতেই তাকে পাপী পাপী বলে ধর্ম থেকে, সমাজ থেকে বার করে দিল, এই জিনিষ কখনই হতে পারে না। খ্রীস্টানরা যদিও এইসব ব্যাপারে খুব খোলামেলা কিন্তু হিন্দু মুসলমানরা নিজেদের ব্যাপারে খুব কড়া, মুসলমান যদি একটু সামান্য কিছু ভুল করে তাহলে তার গর্দান চলে যাবে আর হিন্দুরা তাকে ধর্মচ্যুত করে দেবে। এটা আমাদের এক বিরাট সমস্যা।

এরপর চণ্ডাল আর কিছুতেই বিশ্বামিত্রকে আটকাতে পারল না। চণ্ডাল বিশ্বামিত্রকে মাংসটা দিয়ে দিলেন। বিশ্বামিত্রও খুব খুশী হয়ে মাংসটাকে নিলেন, আগুন জ্বালিয়ে জলের মধ্যে মাংসটাকে সেদ্ধ করলেন। বিশ্বামিত্র উচ্চ ব্রাহ্মণ, দেবতাদের নিবেদন না করে তিনি কিছু গ্রহণ করবেন না। কুকুরের মাংসটাকে কোন রকমে রান্না করে ইন্দ্রাদি দেবতাদের নামে যজ্ঞ করে নিবেদন করতে শুরু করলেন। বিশ্বামিত্র যেমনি দেবযজ্ঞ আর পিতৃযজ্ঞ করতে শুরু করেছেন তক্ষুণি ইন্দ্র স্বর্গ থেকে ঝাঁপ মেরে নেমে এসে বিশ্বামিত্রকে বলছেন আপনি এই পাপকর্ম করবেন না, আমাদের কুকুরের মাংস খেতে দেবেন না, বন্ধ করুন এই যজ্ঞ। ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ থেকে বৃষ্টি নামিয়ে দিয়েছেন। বিশ্বামিত্র ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী ব্রাহ্মণ, আমি কুকুরের মাংস খাব আর তোমাকেও খাওয়াব। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ) চেন্নাই মঠ প্রতিষ্ঠার পর সেখানকার দায়িত্বে আছেন। মঠের আর্থিক অবস্থা তখন খুবই খারাপ। রামকৃষ্ণ মঠের তখনও বিশেষ কোন প্রসার হয়নি। শশী মহারাজ একদিন দেখছেন ঘরে কোন কিছুই নেই। ঠাকুরকে ভোগে কিছুই দেওয়ার নেই। তিনি তখন বালি নিয়ে ঠাকুরকে বলছেন, আজকে ঘরে কিছুই যখন নেই তখন তোমাকেও এই বালিই খাওয়াব আর আমিও এই বালিই খাব। শশী মহারাজ যখন বালি থালাতে বাড়ছেন তখন হঠাৎ কোথা থেকে একজন শেঠজী নানা রকমের প্রচুর রান্না করা খাবার নিয়ে এসে হাজির হয়ে মহারাজকে বলছেন ‘আমার স্ত্রী বলে দিয়েছে যতক্ষণ না কোন সাধুকে এই খাবার না খাওয়ান হচ্ছে ততক্ষণ সে কিছুই খাবে না’। তখন মহারাজ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ভগবানের উপরও মাঝে মাঝে জুলুম করতে হয়। আমিও বালি খাব তোমাকেও বালি খেতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে ভালো ভালো খাবার দাবার চলে এল। এতক্ষণ চণ্ডালের সঙ্গে এত তর্ক হচ্ছিল বিশ্বামিত্রের তখন কিছু হল না, আর যেমনি বিশ্বামিত্র ইন্দ্রদেবকে বললেন তুমিও খাও, সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র বৃষ্টি নামিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যেহেতু চণ্ডালের বাড়ি থেকে মাংস নিয়েছে তাতে তো কিছু পাপ হয়েছে, তারপর তিনি অনেক দিন তপস্যা করে ঐ পাপটুকু থেকে মুক্ত হলেন।

ভীষ্ম এই কাহিনী বলে যুধিষ্ঠিরকে শেষ কথা বলছেন এবং বিদ্বানদীনাত্মা ব্যসনস্তু জিজীবিষুঃ। সর্বোপায়ৈরুপায়জ্ঞো দীনমাত্মানমুদ্ধরেৎ।। এতৎ বুদ্ধিং সমাশ্রায় জীবতব্যাং সদা ভবেৎ। জীবন্ পুণ্যমবাপ্নোতি পুরুষো ভদ্রমশ্রুতে।। ১৩/১৩৭/৯৯-১০০। নিজের বুদ্ধি দিয়ে একটা উপায় বার কর, ঐ উপায় বার করে তুমি ঐ বিপদ থেকে নিজেকে উদ্ধার কর। তার মানে, আপৎধর্মে নিজের বুদ্ধি লাগাতে হবে, ওখানে শাস্ত্র কাজ করবে না। আমরা অতি সাধারণ লোক, আমরা তো আর বিশ্বামিত্র বা বশিষ্ঠের মত পুরুষ নই। আমাদের সব সময় আপৎধর্ম লেগে

থাকে। আপৎধর্মে আমরা অনেক চিন্তা ভাবনা করি, কি হল, কি হবে, কি করব। কিছুই চিন্তা করতে হবে না, আগে তুমি ওখান থেকে নিজেকে কোন রকমে যে করেই হোক বার করে নিয়ে আস, তারপর তোমার কর্ম কেউ জেনে থাকুক আর না জেনেই থাক তপস্যা করে ঐ পাপটাকে মিটিয়ে দাও। এইটাই আপৎধর্মের মূল কথা।

### অতিথি সেবার আদর্শ এবং ব্যাধ ও পায়রার কাহিনী

ভীষ্ম এরপর এই আপৎধর্মের উপর আরও কয়েকটি কথা বলছেন, রাজার জন্যই বেশী বলা হচ্ছে, যেমন ব্রাহ্মণকে দান করবে ইত্যাদি। এখানেই আবার ভীষ্ম খুব নামকরা ব্যাধ ও পায়রার কাহিনী, যেখানে অতিথি সেবার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে, সেই কাহিনী বলছেন। স্বামীজীও এই কাহিনী বলেছেন। এক ব্যাধ বৃষ্টিতে ভিজে এক গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছে। সেই গাছে পায়রার একটা পরিবার বাস করত। পুরুষ পায়রাটা দেখছে আমাদের এখানে একজন অতিথি এসেছেন, তিনি বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছেন। পায়রাটা তখন মুখে করে কিছু খড়কুটো নিয়ে এসে আগুনের ব্যবস্থা করে খড়কুটোগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে যাতে অতিথি গরমে আরাম বোধ করে। এরপর রাত হচ্ছে, পায়রাটা দেখছে অতিথি খিদেয় কষ্ট পাচ্ছে, চিন্তা করছে কি খাওয়ান যায়। তখন পুরুষ পায়রাটা বলল ‘আমি নিজেকে ঐ আগুনে আহুতি দিয়ে দিচ্ছি আমার মাংস খেয়েই অতিথি তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করুক’। এরপর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেছে, এ বলছে আমি আহুতি দেব, স্ত্রী পায়রা বলছে, না আমিই আগুনে ঝাঁপ দেব, তাদের ছেলে বলছে না আমিই আহুতি দেব। শেষ পর্যন্ত পুরুষ পায়রাটাই আহুতি দিল। আহুতি দিতেই স্ত্রী পায়রা বলছে, আমার স্বামীই যখন আর নেই, তাই আমি বেঁচে থেকে কি করব। এই বলে সেও নিজেকে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে দিল। বাবা-মাকে আহুতি দিতে দেখে বাচ্চারাও নিজেদের আহুতি দিয়ে দিল। ঐ দেখে সেই ব্যাধ আর কিছুই খেতে পারল না। তারপর দেবতারা এসে ঐ চারটি জীবের জীবাত্মাকে স্বর্গে নিয়ে চলে গেল। অতিথি সংকারে নিজেকেও আহুতি দিয়ে দিচ্ছে। এই গল্পগুলোর মাধ্যমে ঠাকুম্মারা ছোটবেলাতেই বাচ্চাদের মধ্যে আমাদের সনাতন পরম্পরার মূল্যবোধগুলো জাগিয়ে দিতেন।

### ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে তপস্যার গুরুত্ব

হিন্দুধর্মে সব কিছুতেই তপস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়, বলাই হয় সব কিছুর মূলে তপস্যা, যেখানে তপস্যা আছে সিদ্ধিও সেখানে থাকবে। হিন্দুধর্মে তপস্যা ব্যাতিরেকে কিছুই হয় না, ব্রহ্মাও যখন সৃষ্টি করলেন সব কিছু তিনি তপস্যা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ঋষি বলছেন *স তপোতপ্যত স তপোজ্জ্ঞা*। উপনিষদে কোন ঋষির কাছে যখন কেউ কোন প্রশ্ন নিয়ে হাজির হত, তখন ঋষি বলতেন খুব ভালো কথা, আগে এখানে এক বছর থেকে তপস্যা কর তারপর তোমার প্রশ্ন শুনবো, প্রশ্নের উত্তর যদি আমার জানা থাকে তাহলে উত্তর পেয়ে যাবে। তপস্যা হল আত্ম কল্যাণার্থের কোন একটা ভাবকে অবলম্বন করে ঐ ভাবানুযায়ী জীবন-যাপন করা। এই যে আমরা এই গরমের মধ্যে দুপুরবেলায় কত দূর দূরান্ত থেকে শাস্ত্র আলোচনা করতে আসছি, এটাই তপস্যা। যে কোন জাগতিক সমৃদ্ধি তপস্যার দ্বারাই হয়। ভালো সন্তান যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে ঐ সন্তানের মা প্রচুর তপস্যা করেছে। সন্তান পাওয়ার জন্য যে মা তপস্যা করেছে আর সন্তান হওয়ার পরও মা যদি তপস্যা করে যায় সেই সন্তান ভালো হবেই হবে। যতই ডানদিক বাঁদিক করুক ঐ সন্তান কিন্তু কখনই বিপথে চলে যাবে না, মায়ের তপস্যা তাকে বেঁধে নেয়। সন্তান যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়, গোল্লায় যায়, দেখা যায় মায়ের কোন তপস্যা নেই নয়তো তপস্যায় কোন গোলমাল আছে। এই ধারণাটা আমাদের পরম্পরাতে খুব প্রাচীন, আর এর বাইরে কোন ব্যতিক্রম হতেও দেখা যায় না। প্রথম কথা হল সন্তান পাওয়ার জন্য মাকে তপস্যা করতে হবে আর দ্বিতীয় সন্তান হয়ে যাওয়ার পর তপস্যা বা সাধনা মাকে করে যেতে হবে। সন্তানের দুই-তিন বয়স পর্যন্ত মার বিরাট বড় সাধনা। মাকে কত রকমের ঝামেলা সহ্য করতে হয়, মাঝ রাত্রে বাচ্চার খিদে পেয়ে যাচ্ছে, ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, কখন বিছানা নোংরা করে দিচ্ছে। যখন মায়ের জাগার সময় তখন বাচ্চা ঘুমোবে আর মায়ের যখন ঘুমোবার সময় তখন বাচ্চা জেগে খেলবে নয়তো চোঁচাতে থাকবে। তিন চার বছরের বাচ্চাতো একটা রীতিমত স্বৈরাচারী, সবাইকে নাচিয়ে বেড়াবে, সাথে সাথে বেয়াদপি বাড়তে থাকবে, উদ্ভট সব আদার করতে শুরু করবে। এত কিছুকে সহ্য করা আর সহ্য করার পর যে মা মনকে নিয়ন্ত্রণে রেখে শান্ত ভাবে সব কিছুকে সামাল দিয়ে যাচ্ছে এটাই মায়ের বিশাল তপস্যা হয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টি করার আগে ব্রহ্মা প্রথমে তপস্যা করলেন, বলা হয় ব্রহ্মার তপস্যাতেই এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। ঋষিরাও তপস্যার দ্বারা সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। তপস্যা বলতে বোঝায় একটা ভাব ও চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে সমগ্র জীবনটাকে ঐ একটা ভাবের দিকে চালিত করা, ঐ ভাবের বাইরে আর কোন চিন্তা ভাবনা তার থাকবে না। বিভিন্ন শাস্ত্রে তপস্যার অনেক রকম সংজ্ঞা দেওয়া আছে, কিন্তু সব কটি সংজ্ঞার ভাব একই। একটা চিন্তনকে নিয়ে তৈলাধারাবৎ চিন্তা

করে যাওয়া যেখানে মনের কোন ধরণের চাঞ্চল্য আসবে না, সেটাই তপস্যা। সর্বমেতত্ত্বপোমূলং কবয়ঃ পরিচক্ষতে। নহ্যতপ্ততপা মূঢ়ঃ ক্রিয়াফলমবাপুতে। ১৩/১৫৬/১। হে যুধিষ্ঠির! পণ্ডিতরা বলেন সমস্ত ফলের মূলে হল তপস্যা। মুখরা কখনই তপস্যা করে না, তাই সে ক্রিয়ার ফলও পায় না। তপস্যা না করলে শুভ কর্মের ফল পায়না। আমরা সবাই মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে কতই না প্রার্থনা করি, ঠাকুর তুমি আমার এই করে দাও, সেই করে দাও। ঠাকুর কি সব প্রার্থনা পূরণ করে দেন? জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষায় কত হাজার হাজার ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে, সবাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন জয়েন্ট এন্ট্রাসে সুযোগ পাচ্ছে। যদি প্রার্থনা করে নাই কিছু পাওয়া যায়, তবে লোকেরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে কেন?

এর কারণ, আমাদের মধ্যে যত সঞ্চিৎ কৰ্ম আছে তার মধ্যে শুভ কর্মের ফলও আছে আবার অশুভ কর্মের ফলও আছে। এর আগেও আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, দুই ভাই একই দিনে একই মডেলের দুটো গাড়ি কিনেছে। কিছু দিন পর দেখা যাবে গাড়ির যত মাইলেজ দেওয়ার কথা দুই ভাইয়ের ক্ষেত্রে দু রকমের মাইলেজ হয়ে গেছে। একজনের আঠারো মাইলের জায়গায় উনিশ দিচ্ছে আরেক ভাইয়ের হয়ত সতেরো দিচ্ছে। কারণ একই মাইলেজ কিছুতেই হবে না। এই একটু কম-বেশীর হওয়ার পেছনে নানা রকমের কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে একটা কারণ আমার আগের আগের যে কর্ম জমে আছে তার শুভ-অশুভের প্রভাব। আমাদের জানা সম্ভব নয় কার কত শুভ কর্ম আর অশুভ কর্ম জমে আছে। আমার হয়তো অনেক শুভ কর্ম জমে আছে কিন্তু ঝামেলা আমার পেছন ছাড়ছে না। তখন বলা হয় একটা জিনিষ বাকি থেকে যাচ্ছে, সেটা হল দৈব কৃপা। দৈব কৃপা বলতে বোঝায়, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যখন তপস্যা করা হয় তখন শুভ কর্মের বাঁধনগুলো, যার জন্য শুভকর্ম গুলো বেরিয়ে আসতে পারছিল না, সেই বাঁধন আলগা হয়ে যায়। তপস্যাই শুভকর্মের বাধার অপসারক। আবার যখন আমি অন্যায় কাজ করতে শুরু করব, অধর্ম ও অশাস্ত্র বিহিত কর্ম করতে থাকব ততই আমার ভেতরের অশুভ কর্মগুলো বেরিয়ে আসবে। আমরা প্রায়ই কিছু না কিছু অশুভ কাজ করি। অশুভ কাজ করার সময় মনে মনে চিন্তাও আসে এই কাজের জন্য যেন আমার দুর্নাম না হয়ে যায়, যেন আমার বাজে কোন ফল না হয়। সেইজন্য আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার ফলে অশুভ কর্ম যেগুলো ভেতরে জমে আছে সেখানে একটা বাধা দাঁড়িয়ে যায়। এই বাধা তৈরী হওয়ার জন্য যতটুকু বাজে কর্ম করলাম সেটুকুর ফলটাই হয়তো পেলাম কিন্তু পেছনে যেটা জমে আছে সেটা দুম্ করে বেরিয়ে আসতে পারেনা। শুভকর্মেও ঠিক তাই হয়, বাঁধনটা সরে যাওয়াতে পেছনের শুভকর্ম গুলো এসে আমাদের উপরে তুলে দিল। সাধক যখন ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যায়, আর যখন জ্ঞান হয়ে যায় তখন তাঁর যত শুভ ও অশুভ কর্ম জমে আছে সবটাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমাদের হিন্দুধর্মের উদ্দেশ্যই হল শুভ ও অশুভ কর্মের পারে চলে যাওয়া। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মে বলবে তুমি শুভ কাজ করে যাও, অশুভ কাজ করবে না। হিন্দুধর্মে কখনই বলবে না শুভ কাজ করে যাও, এখানে বলবে শুভ অশুভের পারে চলে যাও। কারণ সম্পূর্ণ শুভ বলতে কিছু হয় না, শুভর সঙ্গে অশুভও জড়িয়ে থাকবে, শুভ কর্মের যখন ফল দেবে তখন ঐ অশুভটার ফলও দেবে।

ভীষ্ম এখানে তাই বলছেন *প্রজাপতিরিদং সর্বং তপসৈবাসৃজৎ প্রভুঃ। তথৈব বেদানুষয়ন্তপসা প্রতিপেদিরে।* ১৩/১৫৬/২। ‘প্রজাপতি তপস্যার দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন আর ঋষিরা তপস্যার দ্বারা বেদের জ্ঞান প্রাপ্ত করেছেন। তপস্যা না করলে বেদের জ্ঞান হয় না’। মুসলমানরা যারা কোরান পড়েন আর খ্রীষ্টানদের যারা বাইবেল পড়েন, এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যতক্ষণ না তারা তপস্যা করছেন ততক্ষণ তাদের কোরান বা বাইবেলের জ্ঞান কিছুতেই হবে না। কোরান, বাইবেল আর বেদের মধ্যে তফাৎ তো কিছু নেই, আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলোই বলা হয়েছে। ঐ আধ্যাত্মিক সত্যের জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য তপস্যার দরকার। আর তুমি যে বেদ সৃষ্টি করবে, ধ্যানের গভীরে গিয়ে একটা মন্ত্রকে যে তুমি আবিষ্কার করবে, কঠোর তপস্যা না থাকলে কখনই হবে না। ভীষ্ম বলছেন ‘সংসারে যা কিছু দুর্লভ পদার্থ আছে, মানুষ তপস্যার দ্বারা সেই দুর্লভ বস্তু তপস্যার দ্বারা সহজেই পেয়ে যায়’। যে ছাত্র পরীক্ষায় ভালো ফল চাইছে তাকে ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে, এই পড়াশোনা করাটাই ছাত্রের তপঃ। ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ, ছাত্র যে পড়াশোনা করছে এটাই তপস্যা। ছাত্রকে কখনই বলা হয় না যে, তুমি পড়াশোনা না করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে যাও, এটা তাদের তপস্যা নয়। অধ্যয়ণ করাই ছাত্রের তপস্যা। বলছেন ঋষিরা যে নানা রকমের সিদ্ধি পান, অগ্নিমা, লঘিমা, এগুলো তপস্যার দ্বারাই লাভ করেন। যারা পাপকর্ম করে থাকে, যেমন সুরাপানাদি করে, দুরাচার, চুরিচামারি করে, এই ধরণের পাপীরাও যদি তপস্যা করে তাহলে সে সেই পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। আগেকার দিনে উচ্চবংশের লোকেরা সুরা পান করত না, বিশেষ করে যারা ব্রাহ্মণ তারা একেবারেই সুরা পান করতেন না। ক্ষত্রিয়রা তাও মদ খেত কিন্তু বৈশ্যরা আবার একেবারেই

খেত না। শূদ্রদের আবার সব কিছু করার ব্যাপারে বাধা দেওয়া হত না। সারা ভারতে আগে ব্রাহ্মণের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র তিন থেকে চার শতাংশ। এখন যারা শূদ্রের মানসিকতার তারা হয়ে গেছে দেশের রাজা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এগুলো কোন বর্ণ নয় এগুলো মানুষের মানসিকতা। পরের দিকে এটাকেই বর্ণ করে দিয়ে জন্মগত করে দেওয়া হয়েছে। শূদ্র মানসিকতা মানে, আমি মদ, মাংস খেতে চাই, আমার কাছে দুরাচার সদাচার বলে কিছু নেই। তোমার মানসিকতা যদি এই হয় তাহলে তুমিও ধর্মের, তুমিও হিন্দু কিন্তু তুমি এই এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, তোমার যজ্ঞ কোন অধিকার থাকবে না, তোমার হল শূদ্র ধর্ম। হিন্দুদের জাতিপ্রথা এটাই, তোমার মানসিকতা কি রকম, তুমি কি করতে চাও। তুমি তপস্যা করতে চাইছ, টাকা-পয়সা সঞ্চয় না করে, খাওয়া-দাওয়া না করে তুমি নিজেও মরবে নিজের সন্তানদেরও না খাইয়ে মারবে আর বিদ্যাচর্চা নিয়ে থাকতে চাইছ? হ্যাঁ, আমি তাই চাই। তবে তাই করে যাও, তোমাকে দেখে সবাই সম্মান করবে। সাত থেকে আট হাজার বছর ধরে সমাজ ব্রাহ্মণকে এইভাবে রেখেছে? তুমি অপরের জন্য, দেশবাসীদের জন্য যে কোন মুহুর্তে প্রাণ বিসর্জন দিতে রাজী আছ? হ্যাঁ আমি রাজী আছি। ঠিক আছে তুমি ক্ষত্রিয়, তোমাকে প্রভুত্ব করার অধিকার দেওয়া হল। তুমি কি টাকা-পয়সা রাখতে চাইছ কিন্তু তার ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে নিজে ভোগ করতে চাইবে না, সমাজের অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে রাজী আছ? হ্যাঁ আমি রাজী আছি। তুমি তাহলে বৈশ্যের কাজ দেখাশোনা কর। আর তুমি ভাই কি করতে চাইছ? আমি এত কিছু করতে পারব না, আমি ভোগ করতে চাইছি। তবে তুমি তাই কর। তুমি শূদ্র হয়ে সব কিছু ভোগ করতে থাক। এইভাবে মানসিকতার ভিত্তিতে দেশের জাতিপ্রথা দাঁড়িয়েছিল। তুমি বলছ আমি ব্রাহ্মণের সুযোগ সুবিধা চাই আবার সব কিছু ভোগ করতেও চাই, কিন্তু সেটা বললে তো চলবে না।

ভীষ্ম বলছেন তপস্যার অনেক রূপ হয়। তবে যারা নিবৃত্তমাগী, সন্ন্যাসের পথে যে এগোচ্ছে তার জন্য উপবাসের থেকে বড় তপস্যা আর কিছু হয় না। উপবাসের ঠিক ঠিক অর্থ হচ্ছে ভিক্ষা ও অভিক্ষ্যের বিচার, কিছু না খেয়ে থাকা আর ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে কোন ভোগের দিকে না যেতে দেওয়া। এরপর সব থেকে বড় তপস্যা ১) অহিংসা, ২) সত্য বচন, ৩) দান ও ৪) ইন্দ্রিয় সংযম। এইগুলোই ঠিক ঠিক তপস্যা। অনেকের একটা ভুল ধারণা যে উপোস করলে শরীরের শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়, আসলে তা নয়। এর উল্টোটাই হয়, উপোস করলে মানুষের জীবনী শক্তি অনেক বেড়ে যায়। খাওয়া-দাওয়াতে মানুষের একদিকে শরীরে যেমন পুষ্টি হয় অন্য দিকে তার আয়ুটা ক্ষীণ হয়, এটা অনেকেই জানেনা। মানুষ না খেয়ে মরে না খেয়েই মরে। আজ পর্যন্ত কারুর না খেয়ে পেট খারাপ হয়নি যত পেট খারাপ খাওয়া থেকেই হয়। আমি যদি একবেলা উপোস থাকি আর আগামী বেলায় যখন খেয়ে নেব তখন ঐ ঘাটতিটা সে পূরণ করে নেয়, কিন্তু একটু বেশী খেয়ে নিলে তিন দিন শরীর খারাপ করে শুয়ে থাকতে হয়। রক্তদান করলে দু-তিন দিনের মাথায় ঐ রক্তটা আবার শরীরে তৈরী হয়ে রক্তের পরিমাণ স্বাভাবিক হয়ে যায়, যদি এমনিতে ঐ পরিমাণ রক্ত আমার শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে আমরা চিন্তাই করতে পারব না। প্রকৃতিই আগে থেকে আমাদের সব কিছুতেই ত্যাগের প্রস্তুতি করিয়ে দিচ্ছে। উপোস করলে শরীরে অনেক সমস্যা হয় এগুলো সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যে চারটে তপস্যার কথা বলা হয়েছে এই চারটির থেকে উপোস সবচেয়ে বড় তপস্যা। মুসলমানরা যে একমাস রোজা রাখে, এতেই তাদের তেজ এসে যাচ্ছে। একমাস দিনের বেলায় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত না খেয়ে থাকছে, থুতু পর্যন্ত গলা দিয়ে নামবে না, এটা কি কম তপস্যা! পেটের যে জ্বালা, ইচ্ছে করছে খাই খাই কিন্তু খেলাম না, এতেই শক্তি এসে যায়।

মহাভারতের এই শ্লোকটি খুব মজার শ্লোক ন দুষ্করতরং দানান্নাতিমাতরমাশ্রমঃ। দ্রৈবিদ্যোভ্যঃ পরং নাস্তি সন্ন্যাসঃ পরমং তপঃ।।১৩/১৫৬/৯। দান থেকে বড় দুষ্কর ধর্ম নেই, মানুষ দান করতে চায় না, খুব কষ্টার্জিত অর্থ কিনা, ছাড়তে চায় না। সেইজন্য বলছেন দানের চেয়ে বড় কঠিন ধর্ম হয় না। মায়ের সেবা থেকে বড় আশ্রয় কিছু নেই। তিন বেদের বিদ্বান থেকে বড় বিদ্বান নেই। মানে, তিনটে বেদকে যিনি জানেন ও বোঝেন তার থেকে বড় পণ্ডিত আর কেউ হতে পারেনা। শেষে বলছেন নাস্তি সন্ন্যাসঃ পরমং তপঃ, সন্ন্যাস থেকে বড় তপস্যা হয় না।

### সত্যই পরম গতি

যুধিষ্ঠির আবার প্রশ্ন করছেন সত্য কি, সত্যের এত প্রশংসা করা হয় তাই সত্যের ব্যাপারে কয়েকটি কথা বলুন। ভীষ্ম বলছেন সত্যং সৎসু সদা ধর্মঃ সত্যং ধর্মঃ সনাতনঃ। সত্যমেব নমস্যেত সত্যং হি পরমা গতিঃ।। ১৩/১৫৭/৪। এগুলোই হল ঠিক ঠিক মহাভারতের শ্লোক, এটাই হল মহাভারতের শৈলী। সৎ পুরুষ যাঁরা তাঁদের ধর্মটা সত্য, মানে সত্যরূপী ধর্ম তাঁর মধ্যে সর্বদা বিদ্যমান, সত্যই সনাতন ধর্ম, সত্যের সম্মুখে সব সময় মাথা নত করতে হয়।

কারণ সত্যই জীবের পরম গতি। ভগবান সত্যস্বরূপ তাই তাঁর আরেকটি নাম সত্য। সেইজন্য স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন ‘Truth does not pay homage to society, society has to pay homage to truth or else it has to die’। সত্যের কাছে সমাজ যদি মাথা নত না করে ঐ সমাজ কিন্তু মুছে যাবে। *সত্যং ধর্মস্তপো যোগঃ সত্যং ব্রহ্ম সনাতনম্। সত্যং যজ্ঞঃ পরঃ প্রোক্তঃ সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্।* ১৩/১৫৭/৫। এই শ্লোকগুলো আগেও অনেক জায়গায় এসেছে। সত্যই ধর্মের সব তপস্যা, যোগ, সত্যই সনাতন ব্রহ্ম, সত্যই পরম যজ্ঞ আর সব কিছু সত্যের উপর আশ্রিত। ঠাকুর যখন মার কাছে সব কিছু অর্পণ করে দিচ্ছেলেন, মা এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার ধর্ম এই নাও তোমার অধর্ম, ইত্যাদি বলে বলে শেষে কিন্তু বলতে পারলেন না মা এই নাও তোমার সত্য এই নাও তোমার অসত্য। কারণ সত্য যদি চলে যায় তাহলে যা কিছু দিয়ে সব বোধ হচ্ছে সেটাও মিথ্যা হয়ে যায়। সত্য থেকে কখন চেতনাকে বিচ্যুত করা যাবে না। তিনটে জিনিষ কখনই নড়বে না, সত্য, চিৎ মানে চৈতন্য আর আনন্দ। ঠাকুর যেমন মাকে সব কিছু দেওয়ার পর সত্যকে দিতে পারলেন না ঠিক তেমন ঠাকুর কোথাও বলছেন না যে মা এই নাও তোমার চিতি আর এই নাও তোমার অচিতি। ঠিক তেমন এই নাও তোমার আনন্দ আর এই নাও তোমার নিরানন্দ, ঠাকুর কখনই এই কথা বলবেন না। সাধক গানে বলছে ‘মাগো আনন্দময়ী নিরানন্দ কর না’। এই সৎ, চিৎ আর আনন্দ এই তিনটে ভগবানের থেকে কখন হারিয়ে যাবে না, এটা কিন্তু তাঁর গুণ নয়, এটাই তাঁর স্বভাব। যে কোন ধর্মে মানুষ যখন কিছু পাওয়ার জন্য তপস্যা করছে, মানুষ যখন কোন কিছু পাওয়ার জন্য ত্যাগ করতে শুরু করে তখন এই সচ্চিদানন্দকে পাওয়ার জন্যই করে। সেই সচ্চিদানন্দ আল্লা রূপেই হন, জিহবা রূপ বলুন, ফাদার ইন হেভেনের কথাই বলুক, যাঁরই কথা বলুক, তিনিই আছেন, তিনি চৈতন্যস্বরূপ, তিনি আনন্দস্বরূপ। এই তিনটেকে কখন পার করেন না। ভীষ্ম এই কথাই এখানে বলছেন তিনি সত্যস্বরূপ।

ভীষ্ম বলছেন সত্যের তেরোটি রূপ *সত্যঞ্চ সমতা চৈব দমশ্চৈব ন সংশয়ঃ। অমাৎসর্য্যং ক্ষমা চৈব হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়তা। ত্যাগো ধ্যানমথার্য্যাতুং ধৃতিশ্চ সততং দয়া। অহিংসা চৈব রাজেন্দ্র সত্যাকারান্ত্রয়োদশ।।* ১৩/১৫৭/৮-৯। ১) সত্য কথা। এর আগে বলেছিলেন সত্যই ধর্ম, সত্যই তপঃ, সত্যই যোগ এগুলো সত্য কথা হিসাবে বলছেন না, সত্য কথা আর সত্য দুটো আলাদা। এখানে সত্যের রূপের কথা বলা হচ্ছে, সত্যের একটা রূপ সত্য বচন। সত্য কথা বলাটাও সেই সত্যেরই একটি রূপ। ২) সমতা – সবার প্রতি সমান ভাব রাখা। ৩) দম – ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। ওখানে ভালো গান হচ্ছে, নাচ হচ্ছে, দৌড়ে সেখানে ছুটে যাচ্ছে। বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য ছুটেছে। এই দৌড়ানটাকে আটকান হল দম। ৪) মাৎসর্যের অভাব – অপরের ভালো কিছুতে ঈর্ষা না হওয়া। ৫) ক্ষমা। ৬) হ্রী – চক্ষুলাজ্ঞা। ৭) তিতিক্ষা – সহনশীলতা। ৮) অনসূয়া – অপরের কোন ছিদ্র নিয়ে আলোচনা না করা, মানে পরনিন্দা পরচর্চা না করা। ৯) ত্যাগ। ১০) ধ্যানপরায়ণ – পরমাত্মার ধ্যান করা। ১১) আর্যত্ব – ভদ্র আচরণ করা। এখানে আর্যত্বের খুব সুন্দর সংজ্ঞা দিচ্ছেন, নিজেকে প্রকাশ্যে না এনে অপরের ভালো করা। ১২) ধৃতি – একটা জিনিষের প্রতি লেগে থাকা। ধৃতি না থাকলে আধ্যাত্মিক জীবনে কখনই এগোন যায় না। ১৩) অহিংসা – মনের মধ্যে কারুর প্রতি হিংসা ভাব না রাখা। সত্যের ব্যাপারে আরও অনেক একই ধরনের কথা বলার পর ভীষ্ম বলছেন ‘এই যে সত্য ধর্মের কথা তোমাকে বলা হল এর থেকে বড় ধর্ম আর কিছু নেই। আর মিথ্যে কথা থেকে বড় পাপ আর কিছু নেই। সত্যই ধর্মের আধারশীলা। দাঁড়িপাল্লার একদিকে যদি হাজারটা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল রাখা হয় আরেক দিকে যদি সত্যের ফল রাখা হয়, সত্যের পাল্লাটাই ভারী থাকবে’।

### কাম, ক্রোধ ও লোভের উৎস ও এগুলোর প্রতিক্রিয়া

যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে একটা প্রশ্ন করেছেন ‘হে পিতামহ! লোকে বলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এগুলো খুবই খারাপ বৃত্তি, কিন্তু এগুলো উৎপত্তি কোথা থেকে হয়? এর উৎপত্তি স্থানটাকে না জানলে এই খারাপ বৃত্তি গুলিকে কি করে জয় করা যাবে’। আমরা প্রায়ই মনে করি আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করার সময় ইতিবাচক গুণগুলি যাতে বৃদ্ধি পায় সেদিকে ভালো করে নজর রাখতে হবে। কিন্তু আমরা ভুলে যাই ইতিবাচক গুণগুলি বৃদ্ধির সাথে সাথে তার নেতিবাচক গুণগুলোও এক সঙ্গেই বাড়তে থাকে। যারাই খুব নিষ্ঠার সঙ্গে জপ-ধ্যান করতে শুরু করে, প্রথম দিকে তার ভেতরে যত আবর্জনা জমে আছে সব একসঙ্গে বেরোতে শুরু করে। জমিতে বীজ দেওয়া হয়ে গেছে, সার আর জলও দেওয়া হল। এবার বীজ থেকে চারা বেরোতে শুরু করবে এটা জানা কথা কিন্তু তার সাথে সাথে যত আগাছা গুলোও বেরোতে আরম্ভ করে দেবে। ঠিক তেমনি জপ-ধ্যান করে যখন আধ্যাত্মিক পথে এগোতে চাইছি তখন কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ এগুলো বাড়তে থাকে। দুর্বাসা মুনির ক্রোধ নামকরা। কারণ তিনি প্রথম থেকে সাবধান হননি। বিশ্বামিত্র যত তপস্যা করছেন ততই তিনি কত

রকমের গোলমালে জড়িয়ে পড়েছেন, কখন বশিষ্ঠ মুনিকে বদলা নিতে অস্ত্র নিক্ষেপ করছেন, কখন আবার অঙ্গরাকে দেখে প্রলুদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাথমিক গুরুত্ব হচ্ছে এই নেতিবাচক গুণ গুলোকে দমন করা। যখনই টের পাওয়া গেল আমার মধ্যে এই দুর্গুণটা আছে, তখনই খুব সচেতন হয়ে যেতে হয় আর ঐ দুর্গুণটাকে তুলে ফেলে দিতে হয় যাতে আর মাথা চাড়া দিয়ে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করতে পারে। যদি সজাগ না হই তাহলে এই দুর্গুণই এমন কাণ্ড করে বসবে যে আমার পুরো সাধনাটা পণ্ড হয়ে যাবে। সাধনাকে যে নষ্ট করেই দেবে তা নয়, তুলে কোথায় ফেলে দেবে টেরও পাওয়া যাবে না। সুগুণ আর দুর্গুণ এক সঙ্গেই বাড়তে থাকে। সেইজন্য প্রথম থেকেই আমার ভেতরের গোলমাল ও দোষগুলোকে আবিষ্কার করে চিহ্নিত করে সজাগ হয়ে যেতে হবে।

ভীষ্ম বলছেন ‘যুধিষ্ঠির! তোমাকে আগে আমি ক্রোধের উৎপত্তি বলছি। *লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি পরদৌষৈরুদীর্য্যতে। ক্ষময়া তিষ্ঠতে রাজন্ ক্ষময়া বিনিবর্ততে।* ১৩/১৫৮/৭। লোভ থেকেই ক্রোধ জন্ম নেয়’। গীতাতে এই একই বিষয় নিয়ে মাত্র দুটি শ্লোকে খুব স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে। তবে কি, এগুলো শাস্ত্রীয় কথা, তাই বারবার শুনতে হয়, বারবার আলোচনা না করলে মাথায় স্থায়ী ভাবে বসবে না। ভীষ্ম বলছেন ক্রোধের জন্ম লোভ থেকে। এই ক্রোধ বৃদ্ধি কখন হয়? বলছেন, অপরের দোষ দেখলে ক্রোধ বৃদ্ধি পায়। ক্ষমার দ্বারা ক্রোধের অগ্নি প্রশমিত হয়, আর ক্ষমার দ্বারাই ক্রোধ নিবৃত্ত হয়। আমার মধ্যে যদি ক্রোধ আসে, প্রথমে ক্ষমা করলে ক্রোধটা থেমে যায়। এরপর যদি ক্ষমাই করতে থাকি তাহলে ক্রোধ নাশ হয়ে যায়। যার ভেতরে ক্ষমার ভাব বিন্দু মাত্র নেই, যদি তার কখন ক্রোধ হয় তাহলে আর ঐ ক্রোধকে কোন ভাবেই প্রতিহত করা যাবে না। আমাদের মনে হবে ক্রোধ যেন অপরকে নাশ করে দিচ্ছে। কিন্তু ক্রোধ বাইরের কাউকেই নাশ করে না, নাশ করে নিজেকেই। দেশলাই কাঠি যখন জ্বলে ওঠে তখন কোথাও লাগিয়ে দিলে সেখানে আগুন লাগছে ঠিকই কিন্তু যে আগুনের জন্ম দিয়েছে সেই আবার কাঠিকেও পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। অপরের দোষ দেখলে ক্রোধ আরও বেড়ে ওঠে। আমার হয়ত কোন একটা কিছু পাওয়ার লোভ হয়েছে, সেই জিনিষটা আমি পেলাম না, তখন আমার ক্রোধ হবে। এবার সেই জিনিষটাই আমার পাশের লোকটা পেয়ে গেল। এখন ঐ লোকটার যখন দোষ দেখতে শুরু করব তখন আমার ক্রোধটা বেড়ে যাবে। আমি পেলাম না সে পেয়ে গেল! এই বৃত্তিটা তখন ভেতরে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। মানুষের একটা বিচিত্র স্বভাব, যদি পাড়ায় কারুর নামে কিছু গোলমাল শুনে থাকি, অমুক লোকটা ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়েছে বা অমুক মেয়ের গোলমাল ধরা পড়েছে, তখন রাষ্ট্রায় এদের কাউকে দেখলে মুখ তুলে তাকে বেশ কিছুক্ষণ দেখতে থাকব। আর যদি পাড়ার লোক কোন প্রশংসা পেয়ে থাকে তখন বলবে, আরে জানো ঐ লোকটা চুরি করে বেড়ায়। কারুর ছেলে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে, বলবে জানা আছে কিভাবে ফার্স্ট হয়েছে! আমি যখন বুঝে যাব আমার মধ্যে ক্রোধ আছে তখন ক্ষমা করতে শিখতে হয়। নিজে এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে হয়, তার ভাল-মন্দ খোঁজ খবর করতে হয়, তা নাহলে এই ক্রোধ আমাকে নাশ করে দেবে।

এরপর কামের ব্যাপারে বলছেন। *সঙ্কল্পোজ্জায়তে কামঃ সেব্যমানো বিবর্দ্ধতে। যদা প্রাজ্ঞো বিরমতে তদা সদ্যঃ প্রণশ্যতি।* ১৩/১৫৮/৮। কাম সঙ্কল্প থেকে জন্ম নেয়, কামের সেবা করলে কামের বৃদ্ধি হয়, কামে বিরক্ত হলেই কাম তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। গীতায় বলছে *ধ্যায়তো বিষয়ানপুংস*, একটা বিষয়ের যখন চিন্তা করা হয় তখন কামের জন্ম হয়। আমার প্রতিবেশী একটা গাড়ি কিনেছে। গাড়িটা আমি রোজ দেখে যাচ্ছি। হঠাৎ একদিন মনে হল, আহা আমারও যদি ঠিক এই রকম একটা গাড়ি থাকত। আমার ভেতরে সঙ্কল্প এসে গেল। সেখান থেকে এসে গেল আমার একটা গাড়ি চাই। এবার এটা আস্তে আস্তে দানা বাঁধতে শুরু করেছে, সেখান থেকে এটাই কামনাতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কামের পরেই লোভ এসে যাবে। কাম আর লোভের পার্থক্য হল, একটা জিনিষকে যখন পাওয়ার ইচ্ছা হয় তখন সেটা হয়ে গেল কাম, আর লোভ হল অপরের আছে আমার নেই, আমাকেও ঐ জিনিষটা পেতে হবে। এবার কাম কি ভাবে বৃদ্ধি হয়? যদি ভোগ করা হয় তখন কাম বাড়তে থাকে। ভোগে যখন বিরক্তি এসে যায় তখন কামের নিবৃত্তি হয়। গীতায় এই জিনিষটাকেই ভগবান বলছেন সব কিছুতে দোষদৃষ্টি নিয়ে আসতে – *জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাদি দুঃখদোষানুদর্শনম্*। কোন জিনিষের প্রতি যদি একবার আকর্ষণ এসে যায় তখন তাকে একেবারে কোথায় ছিটকে ফেলে দেবে বুঝতেই দেবে না। যারা সংসারে থেকে সামাজিক জীবন-যাপন করছে তারা এই জিনিষগুলিকে ধরতে পারবে না। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে যারা চলেছেন তাঁরা একদিকে যেমন নিজের মনের গতিবিধিকে ভালো পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, অন্য দিকে যারা নতুন আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করে লড়াই করতে শুরু করেছে তাদের মনের গতিবিধিও বুঝতে পারেন আর যারা

সামাজিক জীবনে রয়েছে তাদের আরও ভালো বুঝতে পারেন। ঠাকুর বলছেন – যারা দাবা খেলছে তারা দাবার চাল তত বুঝতে পারে না, কিন্তু ওপর ওপর যারা দেখছে তারা ভাল দাবার চাল বুঝতে পারে।

এখানে ভীষ্মের এই কথাগুলো যে কত কঠিন বাস্তব, কাম, ক্রোধ, লোভের মধ্যে যারা দিনরাত পড়ে থাকে তারা বুঝতেই পারে না। মাথায় একটা ইচ্ছা জাগল, কোথা থেকে যে ইচ্ছাগুলো এসে নাচিয়ে দেবে ধরতেই পারা যায় না। যেমনি এরপর ভোগে নেমে পড়বে তখন আর ওখান থেকে বেরোনের কোন উপায় থাকে না। এই যে এখানে বলছেন বিরমতে, ভোগের থেকে বিরাম পাওয়া, এত কঠিন ব্যাপার ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। কিন্তু আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা যদি মাথায় একবার পরিষ্কার বসে যায় তাহলে কিন্তু এই ইচ্ছাগুলো খুব বেশী নাচাতে পারবে না। ইচ্ছা যে জাগবে না তা নয়, জাগবে কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্যের দিকে তাকালে সেই ইচ্ছাটাই আস্তে করে নিজে থেকেই সরে যাবে। যার কাছে জীবনের উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট হয়ে গেছে কয়েক দিনের মধ্যেই সে মহাপুরুষ হয়ে যাবে। আমরা কি একবারও ভাবি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কি? ভেবে থাকলেও উদ্দেশ্যটাকে সব সময় ধরে রাখতে পারিনা। সামান্য বাজারে আনাজ কিনতে গিয়েও স্থির থাকে না আমি কি কিনতে এসেছি, সেখানে জীবনের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে কি স্থির করে ধরে রাখবে! এখন যদি কেউ লটারিতে এক লাখ টাকা পেয়ে যায় তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি এই এক লাখ টাকা পেয়ে খুশী হয়েছ? হ্যাঁ খুশী হয়েছি। টাকা পেলে সবাই খুশী হবে। এবার যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এই এক লাখ টাকা দিয়ে তুমি কি করবে? আমি এই এই জিনিষ কিনব। এরপর যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি এই জিনিষ গুলো কেন চাইছ? এইভাবে যদি প্রশ্ন করেই যাওয়া হয় শেষে এই কাম আর ক্রোধে গিয়ে দাঁড়াবে। কেন ঐ জিনিষটা সে চাইছে? না, আমার পাশের বাড়িতে আছে তাই এই জিনিষটাই আমার চাই। এটাই ঈর্ষা। কিন্তু একবার যদি আমার জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার হয়ে যায় তখন আর এই ঈর্ষা, দ্বेष, লোভ, ক্রোধ এগুলো মাথা চাড়া দিলেও কিছু করতে পারবে না। আমি এখান থেকে ট্রেনে করে দিল্লী যাচ্ছি। আমার কাছে পরিষ্কার আমি দিল্লী যাচ্ছি। মাঝের কোন স্টেশনে চা খেতে যদি নেমে পড়ি তখনও আমি পরিষ্কার যে আমাকে দিল্লী যেতে হবে, চা খেয়ে আমাকে এই ট্রেনেই উঠতে হবে। কেউ যদি পরিষ্কার থাকে আমি জীবনে এটাই চাই তখন প্রকৃতি বা মায়ার কোন ক্ষমতা হবে না যে তার সাফল্যকে রোধ করে দেবে। আসলে তখন তার ভেতরে চৈতন্য সত্তা কাজ করতে শুরু করে দেয়। চৈতন্য সত্তা কাজ করতে শুরু করে দিলে তাকে আটকে দেওয়া প্রকৃতির ক্ষমতার বাইরে। সমস্যা হল আমরা জানিনা আমরা কি চাইছি। পাঁচ মিনিট শান্ত মনে যদি ভাবি আমি কি চাই, তখন দেখব কামিনী-কাঞ্চন আর নাম-যশ ছাড়া কিছুই চাইছি না। এ ছাড়া আমাদের আর কিছু চাওয়ার নেই। মুখে আমরা যতই শাস্ত্র কথা বলি না কেন, ভেতরে এই চাওয়াটাই আছে। নিজের যদি না হয় তখন নিজের সন্তানের মাধ্যমে চাহিদা মেটাবার জন্য উঠে পড়ে লাগবে। মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন, আমাদের কাছে এগুলো টিয়া পাখির বুলি। আমাদের ভালো কাজ করবার সাহস নেই আবার খারাপ কাজ করতেও দম নেই। এর আগে আমরা দশকুমার চরিতে যে মরীচি মুনির কথা বলেছিলাম, মরীচি সাধনা করে যাচ্ছে কিন্তু পরিষ্কার নয় যে ঐ নর্তকীকে সে চায় কি চায়না। পরিষ্কার ছিল না বলে সে ফেঁসে গেল। কিন্তু সে যদি পাক্ষা ওস্তাদ হত তাহলে বলত – হ্যাঁ, তোমাকে দেখে আমার মনটা একটু দুর্বল হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমি দশ দিন তোমার সঙ্গে কাটা'ব তারপর আমি যে ট্রেনে যাচ্ছিলাম সেই ট্রেনে আবার উঠে যাব। তখন মরীচির আর কোন ঝামেলা হত না, তাকে দেখে মায়া রূপী নর্তকী পালিয়ে যাবে।

এখানে বলছেন কাম সঙ্কল্প থেকে জন্ম নেয়ে, ভোগে বুদ্ধি পায় আর বিরক্ত হয়ে গেলে কাম থেকে বেরিয়ে আসবে। বিরক্ত এখানে বাংলা বিরক্ত নয়, বিরক্ত মানে বৈরাগ্য। যদি ভোগ করে বিরক্তি এসে যেত তাহলে ভারতে একশ কুড়ি কোটি আর সারা বিশ্বে ছশ কোটি মানুষ মুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু মুক্ত হচ্ছে না কেন? কারণ মা নতুন নতুন খেলনা নিয়ে হাজির হচ্ছেন। বিরক্তি কখন আসে? যদি আমার জীবনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার থাকে। আমাদের পুরানোই সমুদ্র মন্তনের গল্প আছে। সমুদ্র মন্তনে প্রথম বেরিয়ে এল হলাহল। এই হলাহল এখন কে গ্রহণ করবেন? কারণ এই হলাহল এত তীব্র যে সৃষ্টিকেই দক্ষ করে দেবে। তখন শিবকে বলা হল। শিব জগতের কল্যাণের জন্য গ্রহণ করে খেয়ে নিলেন, খেয়েই গলাটা টিপে ধরলেন যাতে হলাহল নীচে না নামতে পারে। ঐ বিষ পান করে শিব বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলেন। ইতিমধ্যে আরও অনেক কিছুই সমুদ্র মন্তন থেকে বেরিয়ে এল, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, লক্ষ্মী বেরোলেন, শেষে অমৃত বেরিয়ে এসেছে। অমৃত বেরিয়ে আসতেই অসুর আর দেবতাদের মধ্যে বিবাদ লেগে গেছে। তখন ভগবান বিষ্ণু মোহিনী রূপ ধারণ করে সব অমৃত দেবতাদের পান করিয়ে দিলেন। অনেক দিন পর শিবের হুঁশ এসেছে। তিনি খবর পেলেন ভগবান বিষ্ণু নাকি মোহিনী রূপ ধারণ করে এক নারী হয়েছিলেন। বিষ্ণুর সেই মোহিনী রূপ দেখে সব অসুরগুলো মোহিত হয়ে গিয়েছিল। এদিকে শিব পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান বিষ্ণুর কাছে বৈকুণ্ঠে পৌঁছে গেছেন। শিব বলছেন আপনার ঐ মোহিনী রূপটা একবার

আমাকে দেখান। বিষ্ণু তখন বলছেন, ‘ধুস! আপনাকে কি আমি মোহিনী রূপ দেখাব। আপনি হলেন স্বয়ং কামেশ্বর, আপনি কামদেবকে ভঙ্গ্য করে দিয়েছিলেন, মোহিনী রূপে কি আপনাকে মোহিত করা যাবে কখন!’ শিব ছাড়বেন না ‘না না, আপনি দেখান। শুনেছি আপনার ঐ মোহিনী রূপ দেখে সম্পূর্ণ জগৎ নাকি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, আমি একটু দেখতে চাই কি এমন মোহিনী রূপ যাতে বিশ্ব চরাচর সব মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল’। বিষ্ণু তাও বলে যাচ্ছেন ‘আপনি হলেন কামজয়ী, এই কামিনী রূপ আপনাকে কি মোহিত করবে!’ পুরো সভা বসে আছে, এই ভাবে কথা চলতে চলতে হঠাৎ শিব দেখছেন সেখানে একটা সুন্দর বাগান হয়ে গেল, মিষ্টি মিষ্টি বাতাস বইছে, সেই বাগানে একটা সুন্দরী মেয়ে একটা বল নিয়ে খেলা করছে, খেলা করতে করতে তার কাপড় সরে যাচ্ছে। ঐ মেয়েটিকে দেখে পার্বতীর সামনেই শিবের মাথা গেছে একেবারে ঘুরে। শিব এবার আস্তে আস্তে মেয়েটির পেছনে পেছনে ঘুরতে শুরু করেছেন। মেয়েটি কোন কথা বলছে না, আর অঙ্গভঙ্গি করে বল নিয়ে খেলা করে যাচ্ছে আর শিবও তার পেছন পেছন চলেছেন। কখন যে শিবের জটা খুলে গেল টেরই পেলেন না, কখন যে তাঁর ব্যস্ত চর্ম খুলে গেছে কোন হুঁশই নেই। শুধু মেয়েটিকে এক দৃষ্টে দেখে যাচ্ছেন আর তার পেছনে পেছনে ছুটে চলেছেন। মেয়েটি শুধু কায়দা করে এই আড়ালে চলে যাচ্ছে এই সামনে এসে পড়ছে কিন্তু শিব তাকে ধরতেই পারছেন না। এই করতে করতে শিবের হঠাৎ চেতনা ফিরে এল, যেমনি হুঁশ এসে গেল দৃশ্যটাও উধাও হয়ে গেল। শিব দেখছেন সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু তাঁর সব জামা কাপড় খুলে পড়ে গেছে, জটা ভুলুগুটিত। পাশেই পার্বতী দাঁড়িয়ে। লজ্জার চোটে শিবের চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে। নিজের স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে তিনি অন্য মেয়ের পেছনে দৌড়াচ্ছেন, এই দৃশ্যটা তো সবাই দেখতে পেলেন। বিষ্ণু তখন বলছেন ‘আপনি সাক্ষাৎ শিব, তাই বেরিয়ে আসতে পারলেন, তা নাহলে মেয়েটির হাত থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা কারুর হবে না’। মজার ব্যাপার হল শিব যে এই কাহিনীর মধ্যে দুর্বল হয়ে পড়েছেন এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল শিব ঐ মোহজাল থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। কেন গুরুত্বপূর্ণ? তোমার সঙ্কল্প হতেই পারে, এটাকে কেউ কিছু খারাপ বলবে না। জগৎ সংসারকে ভালো করে দেখার আগেই সব কিছু ছেড়ে যে সন্ন্যাসের পথে চলে এসেছে, একটা বয়সের পর তার সামনে যখন এই জগতটা প্রলোভন দেখাতে থাকবে, হয়তো তখন দুর্বলতা বশতঃ তাতে সে প্রলুপ্ত হয়ে যেতে পারে অথবা ঝাঁপিয়ে পড়তেও পারে। এতে কিছু দোষের হবে না, কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে কিনা এটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এটাই মহাভারত বলছে, বিরক্ত হয়ে যদি ওখান থেকে বেরিয়ে না আস তা নাহলে তুমি গোত্তা খেতেই থাকবে। মহামায়ার কাছে আছে নানান রকমের খেলনা, কখন কোন খেলনা দিয়ে যে তোমাকে নাচাতে থাকবে তুমি টেরও পাবে না। তাই যেটাতেই তুমি সঙ্কল্প করে ফেলেছ সেটাতে বিরক্ত হয়ে মানে বৈরাগ্য নিয়ে বেরিয়ে এস। কিন্তু এটাই দুর্ভাগ্যের যে, ভোগটা একটু মিটিয়ে দিয়ে যে বেরিয়ে আসবে তাও হয় না। যখন বয়স হয়ে যায় তখন ইন্দ্রিয়গুলো শিথিল হয়ে পড়ে, ভোগ করার ক্ষমতাও থাকে না, কিন্তু ভোগের বীজগুলো ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম স্তরে জমে থাকে। ওখান থেকে না বেরিয়ে আসলে কিছুই হবে না। আমরা মনে করি আমাদের সব কিছুর থেকে ভোগের নিবৃত্ত হয়ে গেছে, কিন্তু আসলে কিছুই হয়নি। একদিকে সমাজের ভয়ে আর অন্য দিকে ইন্দ্রিয়ের শৈথিল্যতার জন্য আমাদের ভোগটা অতৃপ্তই থেকে যায়।

এরপর ভীষ্ম বলছেন পরাসূয়া ক্রোধলোভাবস্তুরা প্রতিমুচ্যতে। দয়য়া সর্বভূতানাং নির্বেদাধিনিবর্ততে।। ১৩/১৫৮/৯। ক্রোধ আর লোভ যদি খুব বেশী বেড়ে যায় তাহলে সেখান থেকে বৃদ্ধি পাবে পরাসূয়া। পরাসূয়ার অর্থ হল অপরকে মেরে দেওয়ার ইচ্ছে। এই জিনিষটা যে শুধু বয়স্কদের মধ্যে হবে তা নয়, এমনকি ক্লাশ নাইন টেনের অল্প বয়সী ফাস্ট সেকেন্ড হওয়া ছাত্রদের মধ্যেও কাউকে দেখা যায় মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী যেন মরে যায়। তার মধ্যে ক্রোধ আর লোভের প্রকোপটা প্রচণ্ড ভাবে বেড়ে গেছে। একটা মেয়ে বিয়ের পর প্রথম বাপের বাড়ি এসেছে। সেই রাতেই একটি ছেলে মেয়েটির ঘরের জানলা দিয়ে গুলি চালিয়ে মেয়েটিকে মেরে ফেলেছিল। ছেলেটি নাকি মেয়েটিকে ভালোবাসত, মেয়েটি জানতই না যে ছেলেটি তাকে ভালোবাসে। বাপের বাড়ি এসেছে শোনার পর ছেলেটি রাত্রিবেলা জানলা দিয়ে বলছে আমি তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যেতে এসেছি, বলেই গুলি চালিয়ে দিয়েছে। একদিকে মেয়েটিকে পাওয়ার লোভ, ভেতরে ক্রোধও আছে, লোভের পূর্তি হচ্ছে না, ক্রোধ এসে লোভটাকে গ্রাস করে নিয়েছে, শেষে গুলি মেরে মেয়েটিকে উড়িয়ে দিল। সেইজন্য এগুলোকে সংযম না করলে সাধারণ জীবন চালান খুব দুর্বিষহ হয়ে যায়। এই পরাসূয়াকে কিভাবে আটকান যাবে? সবারই প্রতি দয়ার ভাব নিয়ে আসতে হবে। সবারই প্রতি দয়ার ভাব না আনলে পরাসূয়া ভাব কিছুতেই যাবে না। পরাসূয়ার জন্ম হয় পরদোষদর্শনে, অপরের দোষ দেখতে থাকলে আর পরনিন্দা পরচর্চা করলে পরাসূয়ার জন্ম হয়। সবারই প্রতি দয়ার ভাব এলে পরাসূয়া দমে যায়। আর একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানেই পরাসূয়ার সম্পূর্ণ নাশ হয়। ধর্মবিরোধী পুস্তকাদি পাঠ করলে মানুষের মনে অনুচিত কর্ম করার ইচ্ছা জাগে। নাটক, উপন্যাস পড়লে বা সিনেমা, টিভি সিরিয়াল দেখলে এইসব কাহিনীর চরিত্রের প্রভাব আমাদের মধ্যে পড়তে বাধ্য। আধ্যাত্মিক জীবনে যারা



আছেন তাঁদের কাছে এগুলো একেবারে বিষতুল্য। ধর্মবিরোধী যে কোন লেখা আর যত বড় সাহিত্যিকই লিখে থাকুন না কেন, যে কোন সিনেমা সিরিয়াল আধ্যাত্মিক সাধকের কাছে বিষ। সেইজন্য আমাদের পরম্পরাতে সাধককে নাটক, উপন্যাস পড়তে নিষেধ করা হয়, কারণ এগুলো ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কোনটাই আলোচনা করে না। উপন্যাস গুলোতে সাধারণতঃ কি থাকে? একজন গৃহিণী ছিল, তার স্বভাবটা খুব ভালো ছিল। কিন্তু একজন পুরুষকে দেখে তার ভালো লেগে গেল, সেখান থেকে সেই পুরুষের সাথে একটা অবৈধ সম্পর্ক তৈরী হয়ে গেল। বেশীর ভাগ কাহিনী এইখান থেকেই শুরু হয়। এগুলোই ধর্মবিরোধী কথা হয়ে গেল। তখন আবার সুন্দরী মেয়েগুলো ভাবতে শুরু করবে আমারও যদি একজন উপপতি থাকত। একটা একটা করে ভেতরে ছাপ পড়তে শুরু হয়ে যায়। এই ছাপ যদি একবার পড়ে যায় একে নির্মূল করা খুব কঠিন হয়ে যায়। এই ছাপটা একমাত্র দূর করা যাবে উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞানে, তত্ত্ব জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত এই ছাপ কিছুতেই যাবে না।

এরপর শোক সম্বন্ধে বলছেন। যে জিনিষটাকে আমি ভালোবাসি, সেই জিনিষটা চলে গেলে মনে দুঃখ হয়, এইটাই শোক। কিন্তু যদি একবার বিচার করে দেখে নেওয়া যায় শোক করে কোন লাভ হয় না, তখন শোকটা চলে যায়। মাৎসর্য মানে ঈর্ষা, মাৎসর্য একটা মারাত্মক ব্যাধি আর এর প্রকৃতি খুব ত্রুণ। কি করলে মাৎসর্য হয়? *সত্যত্যাগাত্ম মাৎসর্যমহিতানাঞ্চ সেবয়া। এতত্ত্ব ক্ষীয়তে তাত সাধুনামুপসেবনাৎ। ১৩/১৫৮/১৪।* সত্যকে ত্যাগ আর দুষ্ট সঙ্গ করলে মাৎসর্যের জন্ম হয়। পাড়ায় একজন একটা ভালো বাড়ি বানিয়েছে। আমি বলছি চুরি না করলে ঐ রকম বাড়ি করা যায় না। আমার ভেতরে যে ঈর্ষা বৃষ্টি রয়েছে সেই ঈর্ষা ভাব থেকেই আমার মুখ দিয়ে এই ধরনের কথা বেরিয়ে আসছে। কারণ আমি তো সত্যিই জানিনা সে কিভাবে এই টাকা পেয়েছে। এখানে আমার সত্য ত্যাগ করা হল। বলছেন সাধুপুরুষের সঙ্গ করলে মাৎসর্য চলে যায়। শান্তিপর্বের এই জিনিষগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ভীষ্ম বলছেন সর্বদা কৃপণ লোকের সঙ্গ করলে নিজের ভেতরে দৈন্য ভাব জন্ম নেয়। ঠাকুর কৃপণের জিনিষ নিতে পারতেন না। দীন ভাব আধ্যাত্মিক জীবনে কত ক্ষতিকারক আমরা ধারণাই করতে পারিনা। আধ্যাত্মিক জীবন হল নিজেকে বিস্তার করা আর দীন ভাব ঠিক এর উল্টো, মানুষকে সঙ্কুচিত করে দেয়। আধ্যাত্মিক জীবন মানুষকে যে প্রসারিত করে তার প্রমাণ আমরা পওহারি বাবার জীবনেই দেখতে পাই। চোর পওহারি বাবার ঘুরে চুরি করতে ঢুকেছে। সব জিনিষ চুরি করে জড়ো করে এইবার সে বেরোবে, ঠিক সেই সময় পওহারি বাবার ঘুমটা ভেঙে গেছে। তখন চোরটা ঐ জিনিষগুলো ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে। পওহারি বাবাও সেই মাল নিয়ে চোরের পেছনে ছুটছেন আর চিৎকার করে বলছেন ‘প্রভু আপনার জিনিষগুলো নিয়ে যান’। এটা হল উদার হৃদয়। কুকুর রুটি নিয়ে পালিয়েছে, পওহারি বাবা ঘিয়ের বাটি নিয়ে কুকুরের পেছনে ছুটছেন আর বলছেন ‘প্রভু রুটিতে ঘি লাগান হয়নি, ঘিটা লাগিয়ে নিতে দাও’। পওহারি বাবার মত এতটা আমরা হয়ত করতে পারব না, আর করা যায়ও না, কিন্তু তাঁর যে এই উদার ভাব এটাই আমাদের শিক্ষণীয়। ঠাকুর বলছেন সত্ত্বগুণী বাড়িতে চোর ধরা পড়লে বলবে ‘আহা! আহা! ওকে ছেড়ে দাও’। রজোগুণী বলবে মালগুলো কেড়ে নিয়ে বলবে ‘যাঃ! এখান থেকে বেরো’। তমোগুণী প্রথমে মালগুলো কেড়ে নেবে, তারপর তাকে খুব মারবে, তারপর তাকে পুলিশে দেবে, পুলিশে দিয়ে বলবে ‘এত দুঃসাহস! আমার বাড়িতে চুরি করতে আসা! জানিস না আমি কে’! এই কৃপণ ভাব আধ্যাত্মিক জীবনের বিরাট বড় শত্রু। কাম-ক্রোধ বা মেয়েদের প্রতি যে দুর্বলতা তার থেকে কৃপণতা বেশী বিপজ্জনক। মেয়েদের প্রতি দুর্বলতা থাকলে লোকে দেখে ফেলবে, চক্ষুলজ্জায় আর অপমানিত হয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে আসা যাবে কিন্তু দীন ভাব যদি ভেতরে থাকে তাহলে সেখান থেকে কোন দিন বেরোতে পারা যাবে না। এই কথাটাকেই পরিষ্কার করে বলছেন ‘ধর্মনিষ্ঠ পুরুষের উদার ভাব জানলে মনের কৃপণতার ভাব চলে যায়’। ধর্মনিষ্ঠ পুরুষ ছাড়া উদার ভাব হয় না। কারুর মধ্যে যদি উদার ভাব দেখা যায়, বুঝতে হবে তিনি ধর্মপ্রাণ পুরুষ। যেখানেই ধর্মের অনুশীলনের কথা বলা হয় তার মধ্যে দানের কথা থাকবেই। মুসলমানদের মধ্যে পাঁচটি আবশ্যিক পালনীয় কর্তব্য বেঁধে দেওয়া আছে, তার মধ্যে নিয়মিত দান অবশ্যই করতে হবে। হিন্দুদের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে বিবাহে, শ্রাদ্ধাদিতে দান বাধ্যতামূলক। আমরা মনে করি ব্রাহ্মণরা টাকা রোজগার করার জন্য নিজেরাই এই ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে। একেবারই ভুল ধারণা। মানুষের ভেতরে উদার ভাবকে জাগ্রত করার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বলছেন *অজ্ঞানপ্রভবো লোভো ভূতানাং দৃশ্যতে সদা। অস্থিরত্বঞ্চ ভোগানাং দৃষ্টা জ্ঞাত্বা নিবর্ততে।। ১৩/১৫৮/২০।* ভোগের প্রতি মানুষের যে লোভ দেখা যায় এটা অজ্ঞান থেকে হয়। অনেকে বলে কাম ভোগের পূর্তি না

হলে যোগ হয় না। এগুলো পুরো ধর্মবিরোধী কথা। এর আগেই আমরা দেখলাম ভীষ্ম বলছেন যে ধর্মবিরোধী কথা বলে তার মধ্যে অনুচিত কর্ম করার প্রবৃত্তি উদয় হয়। যে ভোগে নেমে পড়বে সেই গোপ্লায় যাবে। কিন্তু যদি মনে একটু কোন কাম-বাসনার ইচ্ছা জাগে, তখন নিজের মূল শেকড়টাকে এক হাতে ধরে রেখে ঐ ভোগের মধ্যে একটা পাক মেরে ফেরত চলে আসতে হয়। হনুমান যেমন সুরসার মুখে ঢুকেই বেরিয়ে এসেছিলেন। ঠাকুরও বলছেন, আমার মনে বাসনা হয়েছিল গড়গড়িতে তামাক খাব, শাল গায় দেব। ঠাকুরের রসদার মথুরাবাবু সব কিছু ব্যবস্থা করে দিলেন। ঠাকুর ঐ ভোগটাকে নিয়ে বললেন মন এরই নাম গড়গড়িতে তামাক খাওয়া, মন এরই নাম শাল। বলে একটু ছুঁয়ে থু থু করে ফেলে বেরিয়ে এলেন। ঠাকুরের কাছে তো তাঁর রাষ্ট্রাটা পরিষ্কার, তিনি জানেন তাঁকে কি করতে হবে। কিন্তু যে বলছে আগে আমি ভোগ করে নিই তারপর ত্যাগ করব, বলেই ভোগের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, এর দ্বারা কোন দিন ত্যাগ হবে না। ভোগ করে যে ভোগের পথে কেউ আসছে না তা নয়, আসে। কিন্তু একজন যে বেরিয়ে আসতে পারছে সেটাকেই সবাই দেখছে কিন্তু হাজার জন ডুবছে সেটাকে কেউ আর দেখে না। লোকে বলে গিরিশ ঘোষ আগে কত মদ খেতেন, আরও কত কিছু করতেন। কিন্তু এরা রাষ্ট্রায় নেমে দেখুক, কত লোক মদ খাচ্ছে কিন্তু কজন গিরিশ ঘোষ হচ্ছেন। ভোগ করলে কখন ভোগের নিবৃত্তি হবে না। কিসে নিবৃত্তি হবে? ভোগের অস্থায়ীত্বকে যখন ভালো করে দেখে নেবে, পরিষ্কার বুঝে যাবে তখন ভোগের নিবৃত্তি হয়ে যাবে। শাস্ত্র কোথাও বলবে না যে তুমি ভোগ কর। ভোগ থেকে বেরিয়ে আসার অনেকগুলো পথ বলে দিচ্ছে। তার মধ্যে একটা পথ ভোগের ক্ষণভঙ্গুরত্ব, ভোগের স্বরূপই হল এর অস্থিরতা, ভোগ কখনই চিরস্থায়ী নয়। গীতার এই শ্লোকটাকে বারবার চিন্তা করতে হয় – জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাদি দুঃখদোষানুদর্শনম্। যাকেই আমি ভালোবাসতে যাচ্ছি তখন একবার চিন্তা করতে হয়, আমি কাকে ভালোবাসতে যাচ্ছি? এর জন্ম আছে, এর ব্যাদি আছে, এর জরা হবে এর মৃত্যু হবে, এগুলো দুঃখই দেবে। এই ভেবে মনটাকে গুটিয়ে নিতে হয়। তাই বলে কি কাউকে ভালোবাসব না? ভালো না বাসলে আমরা তো পশু হয়ে যাব। ভালোবাসব ঠিকই কিন্তু মনটা আমার তাতে নেই, মনটা আছে আমার সেই লক্ষ্যে।

### ধর্ম, অর্থ ও কামের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের বিচার

যুধিষ্ঠির আবার প্রশ্ন করছেন ‘দেখা যায় ধর্ম, অর্থ আর কামের প্রতিই মানুষের মনটা বেশী থাকে। এই তিনটির মধ্যে কোনটি ভাল’? যুধিষ্ঠির যেদিন ভীষ্মকে এই প্রশ্ন করছেন সেদিন আবার অন্যান্য ভাইয়েরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেইজন্য সবাই মিলে ধর্ম, অর্থ আর কাম নিয়ে আলোচনা করছে, আর সবাই যে যার মত বলে যাচ্ছেন। বিদুর প্রথমে বলছেন ধর্মৈর্গৈর্বষয়স্তীর্ণা ধর্মো লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। ধর্মেণ দেবা বৃধুর্ধর্মে চার্খঃ সমাহিতাঃ।। ধর্মো রাজন্ গুণশ্রেষ্ঠো মধ্যমো হ্যর্থ উচ্যতে। কামো যবীয়ানিতি চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।। ১৩/১৬২/৭-৮। ‘ঋষিরা এই ধর্ম দিয়েই সংসার সমুদ্রকে পার করেছিলেন আর এই ধর্মকে আধার করেই সম্পূর্ণ লোক টিকে আছে। ধর্ম দিয়েই দেবতাদের উৎপত্তি আর ধর্মতেই অর্থ স্থিত আছে। সেইজন্য ধর্ম শ্রেষ্ঠ, অর্থ মধ্যম আর কাম নিম্ন’। অর্জুন তখন বলছেন ‘না না, আপনি একি বলছেন তাতে! অর্থ না থাকলে মানুষ কিছুই করতে পারবে না। মানুষ যে ধর্ম সিদ্ধি করে সেটাও অর্থ দিয়েই করে। আর কাম সিদ্ধি যেটা করে সেটাও অর্থ দিয়েই করতে হয়, তাই অর্থই শ্রেষ্ঠ’। অর্জুন তখন খুব সুন্দর কথা বলছেন ‘যারা স্বর্গপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন আর কুল পরম্পরা বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করেন, তাদেরও দেখা যায় অর্থপ্রাপ্তির দিকে তাদের মন রয়েছে। আর কাষায়বসনাশ্চন্যে শশ্রুশ্চা হ্রীনিষেবিণঃ। বিদ্বাংসশ্চৈব শান্তাশ্চ মুক্তা সর্বপরিগ্রহৈঃ।। ১৩/১৬২/১৭। যারা সব কিছু থেকে সঙ্কল্পরহিত হয়ে আছে, কোন কিছু নিজের জন্য রাখে না, সঙ্কোচশীল মানে যেখানে সেখানে মুখ খোলে না, শাস্ত প্রকৃতির, গেরুয়া পরিধান করে আছে, বড় বড় দাড়ি চুল রেখেছে, দেখা যায় টাকা-পয়সাতে এদেরও মন থাকে’। অর্জুনের কথাতে বোঝা যাচ্ছে, মহাভারতের সময় সাধু সন্ন্যাসীদেরও টাকা-পয়সার দিকে আকর্ষণ ছিল। যারা উচ্চকুলের ব্রাহ্মণ, মানে যাদের মন যজ্ঞ-যাগের দিকেই থাকে তাদেরও মন টাকা-পয়সার দিকে থাকে, সেইজন্য অর্থই প্রধান। নকুল-সহদেব মিলে তখন বলছেন ‘আমাদের কিন্তু তা মনে হয় না, তবে আগে ধর্ম আচরণ করুক, ধর্ম আচরণ করে তারপর টাকা-পয়সা আয় করুক, টাকা-পয়সা আয় করলে কাম নিজে থেকেই সিদ্ধি পেয়ে যায়’। ভীম কিন্তু মানতে পারছে না, বলছেন ‘মানুষ যখন কোন তপস্যা করে তখন তাতেও কোন না কোন কাম জড়িয়ে থাকে। আর যেসব ঋষিরা ফল-পাতা খেয়ে থাকে, বায়ু সেবন করে থাকে তাদেরও মনে কিছু না কিছু কামনা থাকে, কামনা থাকে বলে তারা এই ধরণের তপস্যা করে। আবার যারা বেদ উপনিষদ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ণ করে, উপবাসাদি করে তখনও তার মধ্যে কিছু না কিছু কামনা-বাসনা থাকে। তাই কামই শ্রেষ্ঠ, কাম না হলে কোন কিছু করার প্রেরণাই আসবে না। যেমন দইয়ের সার মাখন ঠিক তেমনি ধর্ম আর অর্থের সার কাম। সরষে থেকে তেল বেরোলে খোল পড়ে থাকে, তাই খোলের থেকে

তেল বেশী শ্রেষ্ঠ, ঘোল থেকে ঘৃত শ্রেষ্ঠ আর কাঠ থেকে শ্রেষ্ঠ তার ফুল, ঠিক তেমনি ধর্ম আর অর্থ থেকে বেশী শ্রেষ্ঠ কাম এতে কোন সন্দেহই নেই’। এই হল মহাভারতের বিশেষত্ব, সব দিক দিয়ে বিচার করে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করা হচ্ছে।

### মুক্তির ইচ্ছা কার হয়

সব শোনার পর যুধিষ্ঠির বলছেন ‘দেখো ভাই, আমরা নানা রকমের মত দিচ্ছি। তুতানি জাতিস্মরণাত্মকানি জরাবিকারৈশ্চ সমন্বিতানি। ভূয়শ্চ তৈস্তৈঃ প্রতিবোধিতানি মোক্ষং প্রশংসন্তি ন তঞ্চ বিদ্যাঃ।।১৩/১৬২/৪৫। যারা পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা জানে, যারা বৃদ্ধাবস্থার বিকারপ্রাপ্ত হয়েছে, যারা আবার সংসারের নানান জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছে, তারা কিন্তু বারবার মুক্তিরই প্রশংসা করে, তারাই মোক্ষের কথা বলে’। যুধিষ্ঠির এখানে একটি খুব মূল্যবান কথা বলছেন, যেটা আমাদের খুব ভালো করে বোঝা দরকার। যুধিষ্ঠির বলছেন যাঁরা জাতিস্মরণ তাঁরাই মুক্তির প্রয়াসে সচেষ্ট হয়ে পড়েন।

বিশ্বে ধর্মের দুটো ধারা, একদিকে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ এরা সবাই প্রাচ্য বা ভারতীয় ধারা, এদের মধ্যে যদিও শিখ ধর্মকে যুক্ত করা হয়, কিন্তু শিখ ধর্ম খুবই শিশু বলে অতটা ব্যাপক ভাবে এই ধারার মধ্যে গণ্য করা হয় না। আর ইসলাম, খ্রীস্টান ও জহুদি এই তিনটে পাশ্চাত্য ধারা বা সেমেটিক ধর্ম। সেমাইট ইজরায়েলের দিকের একটা জায়গার নাম। সেখান থেকে এই সেমেটিক ধর্মের জন্ম নিয়েছে। ইগ্টিক মানে ভারতীয়। এদের মধ্যে পার্সি ধর্ম আবার খুব বিচিত্র। এদের কিছু কিছু জিনিষ হিন্দুদের সাথে মিলবে আবার কিছু জিনিষ জহুদিদের সাথে মেলে। এই দুটো ধর্মের মধ্যে সব থেকে বড় পার্থক্য হল পুনর্জন্মবাদকে নিয়ে। চাইনিজ যে ধর্মের ধারা সেটাকে আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কারণ আধ্যাত্মিক পুরুষ বলতে যাঁদের ঠিক ঠিক বোঝায়, এই আধ্যাত্মিক পুরুষ এই সাতটি ধর্মের মধ্যেই আবির্ভাব হয়েছেন, এর বাইরে আর কোন ধর্মেই এই রকম আধ্যাত্মিক পুরুষের আবির্ভাব হয়নি। শিখ ধর্মে যদিও গুরুনানক ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন সন্ত, হিন্দুধর্মের এই ধরনের অনেক সন্তই এসেছিলেন। পার্সিদের মধ্যে প্রথম দিকে একজন দুজন যিনি ছিলেন তিনিই শেষ। পরম্পরাকে পুরো শক্তিতে ধরে আছে এই ছটি ধর্ম। এই ছটি ধর্মকেই দুটো ভাগ করে ইগ্টিক আর সেমেটিক করে দেওয়া হয়েছে। ইগ্টিক মানে ভারতীয় আর সেমেটিক সেমাইটা নামের একটা জায়গা থেকে এই ধর্মগুলির জন্ম হয়েছিল বলে এই তিনটেকে সেমেটিক ধর্ম বলা হয়। এই দুটো ধারার মধ্যে মূল পার্থক্য হল পুনর্জন্মকে নিয়ে। সবারই আলাদা আলাদা শাস্ত্র আছে, আর সবারই শাস্ত্রের মধ্যে অনেক কিছু মিলবে না, কিন্তু দর্শনের দিক দিয়ে প্রধান পার্থক্য হল এই পুনর্জন্মবাদের ব্যাপারে। প্রাচ্যের ধর্মগুলো পুনর্জন্মকে মানছেন কিন্তু সেমেটিক ধর্ম পুনর্জন্মকে মানবে না। এই নিয়ে দু-পক্ষের মধ্যেই অনেক তর্ক-বিতর্ক চলে আসছে। মুসলমানরা বলবে কোরানে এটাকে নিন্দা করা হয়েছে, খ্রীস্টান ধর্ম বলেই দিচ্ছে আমরা এটাকে মানিনা। হিন্দুরা আবার পুনর্জন্মবাদের ব্যাপারে একেবারে স্পষ্ট। শঙ্করাচার্য বলছেন, পুনর্জন্মবাদকে তর্ক দিয়ে, যুক্তি দিয়ে কোন দিন জানা যাবে না, শাস্ত্রে বলে দিয়েছে তাই এটাকে মেনে নাও। কিন্তু পুনর্জন্মবাদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা এই শ্লোকটি, জাতিস্মরণাত্মকানি, জাতিস্মরণ মানে যারা পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা মনে রাখতে পারেন। একজন যদি এই রকম কোন জাতিস্মরণকে পেয়ে যায় তাহলেই তো প্রমাণ হয়ে গেলে পুনর্জন্ম আছে। যেমনি পুনর্জন্ম আছে যে জেনে যাচ্ছে সে তখন মুক্তির চেষ্টা করতে শুরু করে দেব, আমাকে যেন আর জন্মাতে না হয়। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের এক কর্মচারীর ছয়-সাত বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে প্রায়ই বলত আমাকে এখানে রেখেছ কেন, আমি তো অমুক বাড়ির বউমা। আমাকে আমার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে চল। কোথায় তোর শ্বশুর বাড়ি? মেয়েটিও রোজ বলত বর্ধমানে অমুক গ্রামে আমার বাড়ি, আমি ওখানকার বউমা। ঐ বাড়িতে আমার এই জিনিষ সেই জিনিষ আছে। বাড়ি লোকরা ভাবল একবার খোঁজ নিয়ে দেখলে হয়। এরা গিয়ে খোঁজ নিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেলে মেয়েটি ঠিকই বলছে। যাই হোক মহারাজদের নির্দেশে এই জিনিষগুলোকে বেশী প্রচার হতে দেওয়া হয়নি। তারপর আরও মজার, মেয়েটি যখন আট দশ বছর হয়েছে তখন তার আর কিছুই মনে পড়ছে না। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলে বলত, তাই নাকি আমি এইসব বলতাম। কোন কোন সময় পূর্বজন্মের স্মৃতিটা প্রথম অবস্থায় চলে আসে, পরে আবার সেটা হারিয়ে যায়। যারা যোগপথে সাধনা করছে একটা সময় তার মধ্যে পূর্ব পূর্ব জন্মের পুরো স্মৃতিটা জেগে ওঠে। এই যে আগে বলা হচ্ছিল আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি সেটাই আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। আমরা না বুঝেই বলে দিই মুক্তিই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু তার আগে আমরা কি জানি যে আমি বন্ধনে পড়ে আছি? আমি যে বন্ধনে পড়ে আছি সেটাই যদি উপলব্ধি না হয় তাহলে আমি মুক্তি চাইব কিভাবে! বন্ধনটা কি তাই জানিনা মুক্তির ব্যাপারে জানব কি করে! মুক্তি কিসের থেকে চাইছে? এই জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তি। কিন্তু আমি কি একটাও জন্ম আমার দেখেছি? আমি কি নিশ্চিত যে আমার আবার জন্ম হবে? আমি কি আমার আগের একটা জন্মকে মনে রেখেছি? যে তার আগের একটা জন্মকেও দেখতে পাইনি তার

মুক্তির প্রশ্ন কোথা থেকে আসবে! আমি কি ঈশ্বরকে কোথাও দেখেছি? আমি কি এমন কাউকে দেখেছি যে সে ঈশ্বরকে দেখেছে? তাহলে কি করে ঈশ্বর দর্শন আমার জীবনের উদ্দেশ্য হবে! সেইজন্য আমাদের কাছে মুক্তির কথা বলা শুধু মুখের কথা মাত্র। মুক্তির ইচ্ছা কখন মানুষের মধ্যে জাগবে? যখন ধ্যানের গভীরে পরিষ্কার সে দেখতে পায় আরে আরে ছিঃ আমি আগের জন্মে এই রকম ছিলাম! আমি এই এই জন্মে কুকুর ছিলাম! শূয়ের ছিলাম! তখন সে বলে আর না। এই বোধ না হওয়া পর্যন্ত মুক্তির ইচ্ছা আসবেই না। যতক্ষণ জাতিস্মার না হয় ততক্ষণ মুক্তির ইচ্ছা জাগতেই পারে না। এগুলো অত্যন্ত কড়া কথা। এত কড়া কথা বলে দিলে লোকে ঘাবড়ে যাবে বলে সবাইকে বলা হয় না। সেইজন্য বলে দেওয়া হয় তোমাকে গুরু বলে দিয়েছে, তুমি নিষ্ঠা নিয়ে জপ-ধ্যান করে যাও। আমিও শুনে নিলাম। গুরুবাক্যকে শিরোধার্য করে মন প্রাণ দিয়ে পালন করতে শুরু করে দিলাম। এর পর কি হবে আমার জানা নেই। গুরু বলে দিয়েছে গুরুবাক্যে বিশ্বাস রেখে তাই করে যাচ্ছি। এটাই হল সততা। কিন্তু যখনই বলে দিচ্ছি আমার উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন, আমার উদ্দেশ্য মুক্তি, তখনই এগুলো মুখের কথাই হয়ে থাকবে। যতক্ষণ সাক্ষাৎ কিছু উপলব্ধি না হয় ততক্ষণ আমার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হবে না। স্বামীজী বলছেন ‘ঈশ্বর দর্শন করতে এসেছিস, কিছু না হলেও আগে অন্তত একটা ভূত দেখ, তাহলে বিশ্বাস হবে এই জগতের বাইরেও কিছু একটা আছে’। আমরা একটা ভূত দেখিনি, একটা সূক্ষ্ম শরীর দেখিনি আর আমরা বলছি মুক্তির ইচ্ছা জেগেছে।

স্বপ্নেও যদি ঠাকুরের দর্শন হয় তাতেও মুক্তির ইচ্ছা হবে না। কারণ এখানে প্রশ্ন হবে স্বপ্নে যে দর্শন হচ্ছে তার প্রভাব কি আমার ব্যক্তিত্বের উপর পড়ছে? আমার জীবনের কি এতে কোন আমূল পরিবর্তন হচ্ছে? কিছুই হচ্ছে না। তাই এই স্বপ্ন দর্শনে মনের ক্ষণিক আত্মতৃপ্তি ছাড়া কোন লাভ নেই। যতক্ষণ একটা জিনিষকে না জানা হয় ততক্ষণ সেটাকে পাবার ইচ্ছা আসবে না। আমাকে যদি বলা হয় পাশের ঘরে প্রচুর ইউরেনিয়াম রাখা আছে। আমি ইউরেনিয়ামের কোন দিন নামই শুনিনি, বা নাম হয়তো শুনেছি কিন্তু আমি জানিই না ইউরেনিয়াম দিয়ে কি হয়, এর মূল্য কতখানি। কিন্তু যে ইউরেনিয়ামের সব খবর জানে সে কি আর নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবে! এক রাজকুমার আর ভিখারির ছেলে নিজেদের মধ্যে একবার জায়গা বদল করে ভিখারির ছেলে রাজকুমার হয়ে গেছে আর রাজকুমার ভিখারি হয়ে গেছে। পরে যখন রাজকুমার তার পদ ফেরত চাইছে তখন ভিখারির ছেলে আর রাজী হচ্ছে না। বুড়ো মন্ত্রী বুঝতে পেরে ভেতরে গিয়ে রাজদণ্ডটা বার করে আসল রাজকুমারকে জিজ্ঞেস করেছে ‘এটা কি’। রাজকুমার বলে দিয়েছে এটা রাজদণ্ড। যে নকল রাজকুমার তাকেও জিজ্ঞেস করেছে ‘এটা কি’। গরীব ভিখারির ছেলে বলছে ‘এটা দিয়ে আখরোট ভাঙা হয়’। সে জানেই না যে এটা রাজদণ্ড, রাজদণ্ড দিয়ে কি হয় তাও জানে না। অথচ আসল রাজকুমার ছোটবেলা থেকেই জানে এটা রাজদণ্ড। তখন সবাই বুঝে গেলে কে আসল রাজকুমার। আমার সামনে যদি স্বয়ং ভগবানও এসে সাক্ষাৎ দেখা দেন আমাদের অবস্থা ঐ গরীব ভিখারির ছেলের মতই হবে। রাজকুমারকে ছোটবেলাই রাজদণ্ড দেখিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে ‘দেখো এটা হল রাজদণ্ড, তুমি যখন বড় হবে এই রাজদণ্ডকে হাতে নিয় সবার মঙ্গলের জন্য লেগে থাকবে’। রাজকুমার তখন থেকে স্বপ্নটা তৈরী হতে থাকল। গুরু যখন এইভাবে আমাদের দেখিয়ে দেবেন ‘এই দ্যাখ! এই হল ঈশ্বরের স্বরূপ, এই হল জগতের স্বরূপ, এটাকে ধারণা করে এবার তুমি লেগে পর’। ঠাকুরও নরেন্দ্রনাথ দত্তকে তাই করলেন, তিনি একটু স্পর্শ করে দেখিয়ে দিয়ে বললেন ‘এই দ্যাখ! এই হল নির্বিকল্প সমাধি। এবার তোকে এটা পেতে হবে’। স্বামীজী তখন পাওয়ার জন্য নেমে পড়লেন। যতক্ষণ না আমি জাতিস্মার না হয়ে থাকি, ততক্ষণ আমি মুক্তির দিকে এগোবই না। গুরু কৃপায় যতক্ষণ ঈশ্বরের কিছু ধারণা বা জ্ঞান না হয়ে থাকে, ঈশ্বরের পথে এগোবার কোন ইচ্ছাই হবে না। আমরা ঈশ্বর, মুক্তি যা কিছুই বলি সবই না বুঝেই বলি। যার বন্ধনের জ্ঞান নেই সে মুক্তির কথা বলবে কি করে! যে একটিও পুনর্জন্ম দেখেনি সে কি করে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করবে! ফলে আমাদের জীবনের কোন পরিবর্তনই হয় না, যেমন চালাক ছিলাম সেই রকম চালাকই থেকে যাই। আমরা বলি ঠাকুর সর্বব্যাপী, তিনি সব কিছু দেখছেন, সব কিছু জানেন, তাও আমরা মিথ্যা কথা বলি, হিংসা করি, লোভ করি, অপরের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছি। খ্রীষ্টানিটিতে খুব সুন্দর একটা কথা আছে ‘A man is afraid of dog but he is not afraid of God’, একটা চোর পর্যন্ত কুকুরের ভয়ে ঘরে ঢুকতে পারছে না, কিন্তু ভগবান যিনি সব কিছু দেখছেন, তাঁকে ভয় পাচ্ছেনা। মানুষ পুলিশকে ভয় পায় কিন্তু ভগবানকে ভয় পায় না। আমরা আবার ঠাকুরকে আমাদের চাকর বানিয়ে রেখেছি, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হবে, আমার ছেলের চাকরি ঠাকুর করে দেবেন, আমার অসুখ ঠাকুর সারিয়ে দেবেন, আমার অমুক করে দেবেন। যখন বুঝবো এই গাছের পাতা যে নড়ছে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই নড়ছে, তখনই ঠাকুরের ইচ্ছাকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারব। আমার হাত থেকে কলমটাকে ছেড়ে দিলে মাটিতে পড়ে যাবে। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এটা কিসের জন্য মাটিতে পড়ে গেল, আমি বলব মাধ্যাকর্ষণের জন্য পড়ছে। তখন বুঝতে হবে আমার জন্য স্বাধীন ইচ্ছাটাই চলছে। যদি ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি বলবেন তাঁর ইচ্ছাতেই পড়ছে। এটা যখন তাঁর ইচ্ছাতেই

পড়ছে বুঝবো তখন সব কিছুই তার ইচ্ছাতেই হচ্ছে। আর তখন আমি যা সঙ্কল্প করব সেটাই পূর্ণ হয়ে যাবে, যদি নাও হয় তাতেও আমার কিছু এসে যাবে না। সবটাই যদি তাঁর ইচ্ছাতে হচ্ছে মনে করি তাহলে কোন কিছুতেই মন বিচলিতও হবে না আবার উদ্বেলিতও হবে না। বাড়িতে আগুন লেগেছে সেখানেও তাঁর ইচ্ছা দেখে মন বিচলিত হবে না, আবার বিরাট সম্পত্তির মালিক যদি হয়ে যায় তাতেও মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে না। তখন বোঝা যাবে যে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে এই ধারণাটা পাকা হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি জাতিস্মার না হয়ে কেউ যদি তার আগেই বলে আমি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পেতে চাই, তখন এটা একটা কথার কথা হয়ে থাকবে। ঈশ্বরের কোন জ্ঞান যদি না হয়ে থাকে তাও যদি বলে আমার ঈশ্বর দর্শনই উদ্দেশ্য, তখনও এই কথার কোন দাম থাকে না। যাদের ঈশ্বরের জ্ঞান হয়ে গেছে তারাই বলে আমার মুক্তি চাই। এইটাই যুধিষ্ঠির এখানে বলতে চাইছেন।

যুধিষ্ঠির ব্রহ্মার কথা উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন স্নেহেন যুক্তস্য ন চান্তি মুক্তিরিতি স্বয়ম্ভূর্ভগবানুবাচ। বুধাশ্চ নির্বাণপরা ভবন্তি তস্মান্ কুর্য্যাৎ প্রিয়মপ্রিয়ঞ্চ। ১৩/১৬২/৪৬। ‘যার মনে এতটুকু আসক্তি আছে তার কখন মুক্তি হয় না। শুধু মাত্র আসক্তি শূন্য মানুষই মুক্তি কামনা করে এবং তারা মুক্তিও পায়। সুতরাং রাগদ্বৈষ বশতঃ কারুর প্রিয় বা অপ্রিয় করতে নেই’। ঠাকুরকে একজন বলছে ‘আমি পুনর্জন্মকে ভয় পাইনা, আমার আবার জন্ম হলে কোন অসুবিধা নেই’। ঠাকুর বলছেন ‘তুমি বল না, আমার এখনও ভোগ করার ইচ্ছে আছে’। আমাকে যদি বলা হয় তোমাকে আবার জন্ম নিতে হবে। তখন আমার মনে একটা বিরক্তির ভাব আসবে, সেই আবার জন্ম নিয়ে এত ঝামেলা সামলাতে হবে। কিন্তু এখানে বিরক্তির কথা বলা হচ্ছে না, আবার জন্ম নেওয়ার নামে আতঙ্ক হচ্ছে কি? কিন্তু আবার নাতির মুখটা দেখলে মনটা আবার অন্য রকম হয়ে যায়। কিন্তু এখানে তা বলছে না, এখানে বলছেন সবটাই আতঙ্ক মনে হবে – মাগো আবার একজনকে ভালোবাসতে হবে! আসলে আমরা সবাই সবার থেকে জর্জরিত, স্বামীরা স্ত্রীদের থেকে জর্জরিত, স্ত্রীরা স্বামীদের থেকে জর্জরিত, ছেলেরা মায়ের থেকে জর্জরিত, মায়েরা ছেলের থেকে জর্জরিত। কিন্তু তাই বলে এদেরকে নিয়ে যে কামনা-বাসনাগুলো জড়িয়ে আছে সেগুলো তরতাজা আছে। কালকেই স্ত্রী যদি স্বামীকে তোয়াজ করে আর স্বামী যদি স্ত্রীকে তোয়াজ করে সব কিছু পাল্টে যাবে। মারীচি, যাঁর কাহিনী এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম, সেই মারীচি সংসার জগৎ থেকে জর্জরিত হয়ে শহরের বাইরে চলে গিয়েছিল তপস্যা করতে। যখন এক সুন্দরী নারী সেবা করার জন্য মারীচির দিকে এগিয়ে এল, আস্তে আস্তে মারীচির মনটা নরম হয়ে গেল। কিন্তু যিনি ত্যাগে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, যেমন ঠাকুরকে মথুরাবাবু নিয়ে গিলেন ঐ নর্তকীদের কাছেই। ঠাকুর বাচ্চা ছেলেদের মত মথুরের সঙ্গে আনন্দ করতে করতে গেছেন। সেখানে গিয়ে নর্তকীদের বড় বড় চোখ দেখে তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। পূর্ণত্যাগী আসক্তি শূন্য হয়ে যায়, তাকে জগতের কোন কিছু দিয়ে আর কাবু করা যাবে না। যুধিষ্ঠির শেষে বলছেন ‘মোক্ষ পথের যারা পথিক, তারা আগে জেনে যায় কর্ম দিয়ে কোন দিন কিছু পাওয়া যায় না, যা হওয়ার সেটা নিজে থেকেই হয়। তখন তারা মোক্ষ পথে এগিয়ে যায়’। মহাভারতের এই বাক্যগুলো অত্যন্ত গূঢ় কথা আর খুব উচ্চ অবস্থাতেই এই ভাবটা আসে। সাধারণ লোক যারা তারা অত কথা বোঝে না, বুঝতেও চায় না। মহাভারতের এই কথাগুলো পড়ে নিয়ে ভেবে নিচ্ছে যেটা হবার সেটা এমনিতেই হবে, তাই খাটাখাটনির করার কি দরকার। এখানে এই কথাগুলো সংসারীদের জন্য নয়, যারা মোক্ষ পথের মানে সন্ন্যাসীদের জন্য বলা হচ্ছে। এটা কোন মতেই গৃহস্থধর্ম নয়। সংসারীদের আগে রীতিমত খাটতে হবে, সংসারীকে কিছু পেতে হলে পরিশ্রম করতে হবে। যেটা হবার সেটা নিজে থেকেই এসে যাবে, এই কথা কে বলছে? সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী শুধু ঈশ্বরের চিন্তন, ধ্যান করে যাবে, যখন কথা বলবেন তখন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গই করে যাবেন, সন্ন্যাসী বলে দিচ্ছে আমি আর নতুন করে কাজে জড়াব না, আমাকে যে কাজটা করতেই হবে সেই কাজে আমার কোন ফলের ইচ্ছা থাকবে না। এই ভাবটা হল যারা মোক্ষ পথগামী তাদের।

মিশনের স্কুল হস্টেলে ছেলেদের মধ্যে কত রকমের অভিযোগ, কত দুঃখ, কত জ্বালা জমে থাকে। কিন্তু যেদিন তারা বাড়ি যাবে তার আগের রাতে তাদের ঘুম পাড়ানো যাবে না। তখন যদি কোন ছাত্রকে ধরে দুটো চড় মেরে দেয় তাতে কিছুই মনে করবে না সে। সে জানে আর মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। আর যারা বারো ক্লাশের পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে যাচ্ছে, শেষ রাতে তাদের সামলান অসম্ভব ব্যাপার। রাতে চার পাঁচজন মহারাজকে ওদের পাহারা দেওয়ার জন্য জেগে থাকতে হয়। মহারাজ যখন ঘুমে একটু ঢুলছে ছাত্ররা তখন সব চাঙ্গা হয়ে আছে। একটু যদি ফাঁক পায় তিড়িং করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। তখন তাদের মহারাজরা যাই করে দিক কোনটাতেই তাদের কিছু মনে হবে না। যাঁরা মুমুক্শু হন তাঁদের ঠিক এই অবস্থাটাই হয়। সক্রোটসকে যখন বিষ পান করান হল, তখন তিনি জেনে গেছেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে

তিনি মৃত্যুর কোলে চিরনিদ্রায় চলে যাবেন। তখন তিনি সবার সাথে হাত মেলালেন, উপদেশ দিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল অমুক লোকের কাছ থেকে একটা মুরগী নিয়েছিলাম, একজনকে বলে দিলেন তাকে মুরগীর দামটা মিটিয়ে দিতে। সফ্রেটিসের স্ত্রী এসে কান্নাকাটি করছেন, তিনি তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন। আমরা যদি ভেবে নিই আর কয়েক ঘণ্টা পরেই আমার মৃত্যু, আমাদের বাকি জীবনের ধারাটাই পাল্টে যাবে। কিন্তু আমরা কখনই বিশ্বাস করতে পারিনা যে আমি একদিন মারা যাব। যুধিষ্ঠিরকে যক্ষ প্রশ্ন করছেন আশ্চর্য কি। তার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলছেন এত লোক মরছে দেখেও তার বিশ্বাস হয় না যে সেও একদিন মরবে। আমাকে যদি বলে দেওয়া হয়, তোমার ক্যান্সার হয়েছে তিন দিনের বেশী বাঁচবে না, তাও আমি বিশ্বাস করতে পারব না। যখন আমি জেনে যাব আমার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু, তখন আমি কারুর সাথে ঝগড়া করতে যাব না, সবাইকে বিদায় জানাব আর যে কাজগুলো গুছিয়ে নেওয়া দরকার সেগুলো চটপট গুছিয়ে নেব। ফ্রাণ্সের একজন নামকরা গণিতজ্ঞ ছিলেন, খুবই অল্প বয়সী। তাকে একজন ডুয়েলের জন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। ডুয়েল মানে গুলি চালানোর খেলা। ও জানে যে আমি মরে যাব, আমার বাঁচার কোন পথই নেই, সকালবেলা আমার মৃত্যু অবধারিত। তিনি সারা রাত ধরে গণিতের থিয়োরি গুলো লিখে গেলেন। মাত্র কুড়ি একুশ বছর বয়সে তিনি মারা গেলেন।

মৃত্যুর সাথে মুক্তির কোন সম্পর্ক নেই, জন্ম-মৃত্যুর যে চক্র মৃত্যু তার একটা অঙ্গ। মুক্তি এগুলোর থেকে পুরো আলাদা। এখানে বোঝান হচ্ছে, যদি আমাকে বলে দেওয়া হয় ওহে ভাই তুমি আর তিন ঘণ্টা বেঁচে থাকবে, তখন আমি কি রকম ব্যবহার করব? আমার ব্যবহারে অনেক কিছু পাল্টে যাবে। ঠিক তেমনি যিনি সন্ন্যাসী, যিনি মোক্ষমार्গের পথিক তার আচরণটা অনেকটা ঐ রকম হয়। কারুর প্রতি তাঁর বিশেষ রাগ-দ্বেষ থাকে না, কারুর প্রতি বিশেষ ভালোবাসা থাকে না। যুধিষ্ঠির এই সব বলে বলছেন ‘আমরা হলাম সাধারণ লোক, আমরা কখনই এগুলো বুঝতে পারব না’। যুধিষ্ঠিরের কথা শোনার পর বাকি ভাইরা বললেন ‘ধর্ম, অর্থ আর কামের আসলে কোন দাম নেই, মুক্তির পথটাই ঠিক ঠিক পথ’। এর সমর্থনে তাঁরা কি প্রমাণ দিচ্ছেন? যাঁরা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, যাঁদের আর কিছু করার ক্ষমতা নেই আর যাঁদের পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ আছে, অর্থাৎ যাঁরা জাতিস্মার তাঁরা এই কথা বলে গেছেন।

### কৃত্যে বিনাশ ও বন্ধুত্বে ঈশ্বরলাভ

শান্তিপর্বে এই ধরনের অনেক আলোচনার সাথে সাথে আবার কিছু কিছু কাহিনীর মাধ্যমে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার কয়েকটি গুঢ় তত্ত্বকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। এখানে রাজধর্মা নামে একটি বক আর গৌতমো নামে এক ব্রাহ্মণকে নিয়ে একটা সুন্দর কাহিনী বলা হচ্ছে। এই কাহিনীতে দেখান হচ্ছে একজন আধ্যাত্মিক ও ধার্মিক ভাবসম্পন্ন ব্যক্তি কিভাবে ক্ষমা করে। গৌতমো আর রাজধর্মা দুজন বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গৌতমো লোভে পরে এই রাজধর্মাকে বধ করে দিয়েছে। পরে দেখানো হচ্ছে দেবতারার এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করে রাজধর্মাকে জীবিত করে আর রাজধর্মারই আনুকূল্যে গৌতমের কিভাবে প্রাণ রক্ষা হল। কাহিনীটা বলার পর ভীষ্ম বলছেন কৃতঃ কৃতঘ্নস্য যশঃ কৃতঃ স্থানং কৃতঃ সুখম্। অশ্রদ্ধেয়ঃ কৃতঘ্নো হি কৃতঘ্নে নাস্তি নিকৃতিঃ। ১৩/১৬৭/১৯। যে কৃতঘ্ন সে কখন যশ পায়না। কৃতঘ্ন শব্দকে অনেক সময় অকৃতজ্ঞও বলা হয়। কৃতঘ্ন কখন জীবনে স্থিতি পায়না আর সুখও পায়না। কৃতঘ্নের উদ্ধারের কোন পথ নেই। আসলে কৃতঘ্ন সেই হয় যার মন খুব সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। মন যার সঙ্কুচিত হয়ে যায় ধরেই নিতে হবে তার জীবন শেষ। শেষ কথা বলছেন কৃতঘ্নে নাস্তি নিকৃতিঃ। যত রকম পাপের কথা বলা হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্তের বিধানও বলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে কৃতঘ্ন অর্থাৎ বিশেষ করে যে মিত্রদ্রোহ, যে বন্ধুকে ধোকা দিয়েছে তার প্রায়শ্চিত্তের কোন বিধান দেওয়া নেই। সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কিন্তু বন্ধুকে যে ধোকা দিয়েছে তার কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। মিত্রাদ্রোহাংস্ত ভুঞ্জীথ মিত্রেণাপংসু মুচ্যতে। সৎকারৈরুত্তমৈর্মিত্রং পূজয়েত বিচক্ষণঃ। ১৩/১৬৭/২২। মিত্রের সাহায্যে মানুষ ভোগ করে, বন্ধুর সাহায্যেই মানুষ আপদ-বিপদ থেকে বেরিয়ে আসে। যারা উত্তম জীবন-যাপন করতে চাইছে তাদের প্রথমে অবশ্যই বন্ধুদের সম্মান দিতে হবে আর পূজন করবে। এখানে শব্দটা হচ্ছে পূজ্যে, পূজ্যের দুটো অর্থ হতে পারে, এক সম্মান করা আবার আরেকটি অর্থ রীতিমত পূজা করা। স্বামীজী বলছে Through a true friendship even a man can realize God ঠিক ঠিক বন্ধু যদি থাকে তাহলে সেই বন্ধুর সাহায্যে মানুষ ঈশ্বর দর্শন পর্যন্ত করে নিতে পারে। সত্যিকারের বন্ধুত্বের সাহায্যে মানুষ তিনটে জিনিষ করে নিতে পারে ১) ভোগ করতে সাহায্য করে, ২) আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে ও ৩) ঈশ্বর দর্শন পর্যন্ত করে নিতে পারে। অর্থাৎ এখানে বলতে চাইছেন বন্ধুত্বকে যদি কেউ সাধনা হিসাবে নেয় সেই সাধনায় সে ঈশ্বর দর্শনও করতে পারে। ভীষ্ম বলছেন যারা ধর্মপথের পথিকরূপে যারা উত্তম জীবন-যাপন করতে চাইছে তাদের কয়েক ধরনের লোকের সঙ্গে পরিত্যাগের কথা বলা হয়। কিসের থেকে দূরে থাকতে হবে? প্রথম তাকে পাপীদের থেকে দূরে

থাকতে হবে, দ্বিতীয় কৃত্য থেকে, তৃতীয় নির্লজ্জদের থেকে, চতুর্থ মিত্রদ্রোহীদের থেকে, মিত্রদ্রোহী কৃত্যের ছোটভাইয়ের মত, পঞ্চম যারা কুলাঙ্গার, কুলাঙ্গার মানে যারা নিজের কুলকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে আর ষষ্ঠ যারা পাপাচারী, পাপী পাপাচারীর থেকে একটু বড়। পাপীর পুরো ভেতরটাই পচে গেছে, আর পাপাচারী মানে পাপ কর্ম করছে কিন্তু ভেতরটা এখন পুরো পচে যায়নি। যারা উত্তম জীবন যাপন করতে চায় তাদের এই ধরণের লোকদের ত্যাগ করতে হবে।

### ত্যাগের মহিমা (মক্ষিগীতা)

এরপর ত্যাগের মহিমার কথা বলা হচ্ছে। আধ্যাত্মিক জীবন মানেই ত্যাগের জীবন। এরমধ্যেই পাওয়া যাবে মক্ষি গীতা। যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে প্রশ্ন করেছেন মানুষ কিসের থেকে সুখ পায়। ভীষ্ম তার উত্তরে যা বলছেন এগুলো সাধারণ মানুষ, যাদের জীবনের অনেক কিছু পাওয়ার বাসনা আছে তাদের জন্য বলছেন না, যারা আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করতে চাইছেন তাদের জন্যই এগুলো বলা হচ্ছে *সর্বসামান্যমনায়াসং সত্যবাক্যঞ্চ ভারত। নির্বেদশ্চাবিধিৎসা চ যস্য স্যাৎস সুখী নরঃ। ১৩/১৭১/২। ১) সমতা, সবার মধ্যে সমান ভাব দেখা। ২) অনায়াস (বৃথা পরিশ্রমের অভাব), যেটা স্বাভাবিক ভাবে হয়ে যাবে সেটাই করা, যেটা করতে গেলে প্রচুর খাটাখাটনি করতে হবে সেটাকে পাওয়ার চেষ্টা করতে নেই। ৩) সত্য বচন। ৪) বৈরাগ্য, এখানে সংসারের প্রতি বৈরাগ্যের কথাই বলছেন। শেষে ৫) কর্মসক্তির অভাব (কর্মে আসক্তির অভাব), কর্মসক্তির অভাব শব্দের এখানে মূল অর্থ হচ্ছে নির্বেদঃ, বেদের যে যজ্ঞ-যাগ আছে সেগুলো থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। যজ্ঞ-যাগ থেকে বেরিয়ে আসার অর্থ হল, মানুষ যে কারণে যজ্ঞ-যাগ করে আমার টাকা চাই, আমার সন্তান চাই, আমাকে স্বর্গপ্রাপ্তি করতে হবে এই জিনিষগুলো থেকে বেরিয়ে আসা। কর্মসক্তির অভাব আবার সাধারণ অর্থেও হতে পারে, আমরা বেশীর ভাগ সময় অনেক আজেবাজে কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ি, আমি ফাঁকা বসে থাকতে পারিনা তাই কি করব বসে বসে এই কাজ সেই কাজ করে যাচ্ছি।*

মক্ষি নামে একটা লোক শহরে থাকত। তার খুব ইচ্ছে ছিল তার কিছু টাকা হোক। টাকা হওয়ার জন্য যত রকমের চেষ্টা আছে সব চেষ্টাই সে করে গেছে, আর যেটাই সে চেষ্টা করে সেটাই তার বৃথা হয়ে যায়। কিছুতেই তার আর টাকা হচ্ছে না। দেখল কিছুতেই সে টাকা করতে পারছে না, তখন তার যা কিছু ছিল সব বিক্রী করে দুটো বাছুর কিনল। ঠিক করল এই বাছুর দুটো বলদ করে চাষবাশের কাছে লাগাবে। এখন তার আর কিছু নেই এই বাছুর দুটোই সম্বল। এবার বাছুর দুটোকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে লাঙল কিভাবে টানতে হয়। বাছুর বলে প্রথমে একটা হাঙ্কা ডাঙা দুটো কাঁধে সমান ভাবে বেঁধে দেওয়া হল, এবার দুটোকে এক সঙ্গে চালাবে। আস্তে আস্তে হাঙ্কা ডাঙার জায়গায় আরেকটু ভারি ডাঙা দেওয়া হল, এইভাবে ভারি করতে করতে বলদ দুটো আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যায়। দুটোকে এক সাথে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল যাতে চাষের কাজে যখন দুটোকেই লাগান হবে তখন এরা যেন ভালো লাঙল দিতে পারে। এরপর যদি কোন কারণে জুড়ি পাল্টে যায় তাতেও সে টানে কিন্তু ঐ রকম ভালো লাঙল দিতে পারেনা। এখন মক্ষি বাছুর বলে প্রথমে হাঙ্কা ডাঙা দিয়ে ট্রেনিং দিতে নিয়ে গেছে। গ্রামের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখছে রাস্তায় একটা উট বসে আছে। উটটাকে মাঝখানে রেখে দুটো বাছুর কাঁধে ডাঙা নিয়ে দৌড় লাগিয়েছে। হঠাৎ বাছুর দুটো উটের কাছে আসতেই উট ঘাবড়ে গেছে। ঘাবড়ে গিয়ে উট উঠে দাঁড়িয়ে পড়তেই উটের ঘাড়ের এসে ঐ ডাঙাটা গেছে আটকে। বাছুর দুটো উটের কাঁধে আটকে গেছে, বলদ দুটো এখন আকাশে ঝুলছে। উটটা কিছু বুঝতে পারছে না, দুটো বাছুর উটের ঘাড়ের দুই পাশে ঝুলছে। উট এখন ভয় পেয়ে খুব জোরে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়েছে। মক্ষিও উটের পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে। কিন্তু উটের পেছনে দৌড়ে মক্ষি তো তাকে ধরতে পারবে না। লম্বা লম্বা পা ফেলে উর্দ্ধ্বাঙ্গে উট পালাচ্ছে। বাছুরগুলোও কিছু বুঝতে পারছে না, আকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় সেগুলো হাঙ্গা হাঙ্গা করে চেষ্টাতে শুরু করেছে। মক্ষি শেষ পর্যন্ত উটের নাগালই পেল না, কোথায় পালিয়ে গেলে বুঝতেই পারল না। তখন মক্ষি কাঁদছে আর বলছে ‘মানুষ যতই চতুর হোক আর যতই কায়দা করুক, তার ভাগ্যে যদি না থাকে টাকা-পয়সা সে কোন দিনই পাবে না। এই যে আমি সর্বস্ব বিক্রী করে দুটো বাছুর কিনলাম, একবারে কাকতালীয় ব্যাপার হয়ে গেল, একটা উট বসে ছিলে তাকে মাঝখান দিয়ে বাছুর দুটো দৌড়ে এল, উট সেই সময়ই উঠে পড়ল আর বাছুর দুটো উটের কাঁধের দুদিকে সমান ভাবে আটকে গেল, ঘাড় নাড়লেও আর পড়বে না। তারপর সেউ উটটা আবার পালিয়ে গেল। উটের সঙ্গে এখন দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরা কিছুতেই সম্ভব হবে না’।

মক্ষি বলছে ‘অনেক ভেবে দেখলাম, যদি কোন পুরুষার্থ সফল হয় তাতেও দেখা যায় দৈবই কাজ করে’। এটা অবশ্য মক্ষির মত। আসলে মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে যখন প্রচুর মার খেতে থাকে, জীবনে যখন অনেক বিপর্যয় আসতে

থাকে তখন তার মনে অনেক কিছুই চিন্তা ভাবনা আসতে শুরু করে। সেইজন্য ভীষ্ম বলছেন যে খুব সুখ চায় তার সবার আগে চাই বৈরাগ্য। যতক্ষণ বৈরাগ্য না হয় ততক্ষণ মানুষ সুখ পায়না। যেদিন কারুর জগতের সুখের প্রতি বৈরাগ্য এসে যায়, সেদিন পরিস্কার বুঝতে পারবে যে তার মধ্যে সত্যিকারের বৈরাগ্য এসে গেছে। বৈরাগ্য এলে তার মুখের হাসিটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। পরমহংস উপনিষদে বলছে যৎ আয়াতু তৎ আয়াতু, যৎ প্রয়াতু প্রয়াতু তৎ, যা আসছে তা আসুক, যা চলে যাচ্ছে তা চলে যাক। এই ধরনের ভাব ঠিক ঠিক যার মধ্যে এসে যায়, মুখের কথা নয়, ভেতর থেকে যদি এসে যায় ওর মুখের হাসিটাই পাল্টে যায়। বৈরাগ্য ছাড়া সুখ হয় না, এই কথা আমরা অনেকবার শুনেছি কিন্তু ধারণা হয় না। কিন্তু যেদিন ভেতরে আমাদের এই বোধটা জাগবে তখনই এর অর্থ মর্মে মর্মে বুঝতে পারব। মক্ষি বলছে যদি টাকা পয়সা ও অন্যান্য জিনিষের প্রতি কারুর তৃষ্ণা থাকে কোন দিন তার শান্তি হবে না। শরীর, জীবন এগুলোর প্রতিও তৃষ্ণাকে যখন মানুষ তাগ করে দেয় তখনই মানুষ প্রকৃত শান্তির দিকে যায়। আসলে দেখা যায় জগতের সব কিছুকে ছেড়ে দিলেও নিজের শরীরের প্রতি আসক্তিটা যেতে চায় না, এই আসক্তিটা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থেকে যায়। একটা অজ্ঞাত ভয় মৃত্যুর পেছনে লুকিয়ে থাকে। অথচ আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি যে মৃত্যুর সময় আমার কোন কষ্ট হয়েছে। কিন্তু আমরা একটা ভয় পাই, কারণ তৃষ্ণা। সন্ন্যাস এমন একটা জিনিষ যে, প্রত্যেক মানুষকে সন্ন্যাস নিতে হবে, এখানে কোন ব্যতিক্রম নেই। জীবিত থাকা কালীন অবস্থায় সন্ন্যাস যদি না নেয় মৃত্যুর সময় প্রকৃতিই সব জোর করে কেড়ে নিয়ে ওখান থেকে বার করে নিয়ে আসবে। শেষ সন্ন্যাস হয় শরীরের প্রতি আসক্তি ত্যাগের দ্বারা। সবাইকে এই পথ দিয়েই যেতে হবে, যে যেতে চাইছে না তাকেও টেনে নিয়ে চলে যাবে। মক্ষি নিজের মনকে বোঝাচ্ছে, মন তুমি তো কতবারই প্রচেষ্টা করেছ আর প্রত্যেকবারেই ব্যর্থ হয়েছে, এইবার তুমি নিজেকে শান্ত কর, টাকার পেছনে দৌড়ানটা এবার বন্ধ কর। আমার কামনা-বাসনার জন্য আমি তোমার হাতের খেলনা হয়ে আছি। সেইজন্যই বলছেন যারা বুদ্ধিমান পুরুষ তারা কখন কারুর দাসত্ব যেন গ্রহণ না করে। মক্ষি বলছে হে কাম আমি তোমাকে ভালো করে চিনেছি, তোমার যা কিছু প্রিয় আমি এতদিন তাই করে এসেছি, এত কিছু করেও তো মনে কোন দিন সুখ পেলাম না। আমার যত কিছুর প্রতি তৃষ্ণা, তৃষ্ণার জন্য যত পরিশ্রম, শোক এই সব কিছুর মা তুমি। তুমিই আমাকে প্রেরণা দিয়ে দিয়ে আমাকে চারিদিকে ছুটিয়ে মেরেছ। আমি তোমাকে বুঝে ফেলেছি, আর নয়। মানুষের সাতটি শত্রু – কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্যর্য আর সপ্তম হল মমতা, মমতা মানে আমার ভাব, আমার যা কিছু আছে, বাড়ি, গাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, স্ত্রী, পুত্রাদির প্রতি বিরাট আকর্ষণ। মক্ষি বলছে এই সাতটা শত্রুকে আর তার সাথে কামনা যার মা অজ্ঞান ও অবিদ্যা, এই সব কটিকে আমি মেরে শেষ করে দেব। মক্ষির কাহিনী বলে ভীষ্ম বলছেন *দম্যনাশকৃতে মক্ষিরমৃতত্বং কিলাগমৎ।। অচ্ছিনৎ কামমূলং স তেন প্রাপ মহৎ সুখম্।। ১৩/১৭১/৫৪।* ঐ বাছুর দুটো যে তার নাশ হয়ে গেল সেটাকে নিমিত্ত করে মক্ষি কামের যে মহান রূপ সেটাকেই সে নাশ করে দিল। নিমিত্ত কি করল? বাছুর দুটোর নাশ করল। সেখান থেকে তার অমৃতত্ব লাভ হল। এটাকেই বলে বিষাদযোগ। গীতাতে এই বিষাদযোগের কথাই নিয়ে আসা হয়েছে অর্জুনবিষাদযোগে। যত দিন জীবনের প্রতি বিষাদ না আসে তত দিন কখনই কেউ আধ্যাত্মিক হতে পারবে না। স্বামীজী বলছেন Religion begins with tremendous dissatisfaction with present state of affairs আমার যদি মনে হয় আমার যা কিছু চলছে এতে আমি দিবি ভালোই আছি তাহলে আমার দ্বারা কিন্তু ধর্ম হবে না। যখন বুঝব জীবনটা অশান্তিতে চলছে, কোন কিছুই মনের মত হচ্ছে না, তখনই ধর্ম শুরু হবে, এর আগে ধর্ম কখনই শুরু হবে না। বাড়িতে একজনকে আমি খুব ভালোবাসি, হঠাৎ সে মারা গেল, কেউ একজন মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এই ভাবে জগৎ থেকে কোন একটা ঝটকা না খেলে বিষাদ আসে না। যাঁরা সাধু সন্ন্যাসী হয়েছেন, তাঁরা জন্মজন্মান্তর ধরে কোন না কোন ভাবে একটা বিষাদ পেয়ে এসেছেন বলেই তিনি সন্ন্যাসের পথে এসেছেন। ভগবান বুদ্ধও প্রথম জীবনে মানুষের তিনটি অবশ্যম্ভাবি পরিণতি দেখে তাঁর মন বিষাদে ভরে গিয়েছিল। অনেক সময় বড় বড় মহাপুরুষদের অনেকে বলতে চান না তিনি কি বিষাদ পেয়েছিলেন। যদিও গীতাতে ভগবান বলছেন চার রকমের লোক ভগবানকে জানতে চায়, তার মধ্যে জিজ্ঞাসুর কথাও বলা হয়েছে। মনে একটা জিজ্ঞাসা এসেছে সেটাকে জানতে চাইছে, যেমন ঠাকুর জিজ্ঞাসু থেকে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় বিষাদ থেকেই ধর্মের পথে আসে, কোথাও না কোথাও জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা আসবে। জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা না এলে আধ্যাত্মিক অগ্রগতি হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কারুর কারুর প্রথম থেকেই জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা। বাইরে থেকে এদের বোঝা যায় না। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন লাউ কুমড়োর ফল আগে ফুল পরে। এরা অন্য ধরনের। এই হল মক্ষীগীতা।



### রাজা জনক ও নহ্ষ সংবাদ (বোধ্যগীতা)

এরপর আসছে বোধ্যগীতা, রাজা জনক আর নহ্ষ সংবাদের উপর বোধ্যগীতা। এখনও ভীষ্ম আগের বিষয়বস্তু নিয়েই বলে যাচ্ছেন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন *অনন্তমিব মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন। মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন।* ১৩/১৭২/২। মহাভারতের এই শ্লোকটিও একটি খুব মূল্যবান শ্লোক। এর শেষ লাইনটা আমাদের সবার মুখস্ত করে রাখা উচিত, *মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন*, পুরো মিথিলা যদি পুড়ে দন্ধ হয়ে যায় তাতেও আমার কিছু যায় আসে না। এই নিয়ে নানা রকমের কাহিনী আছে। একটা কাহিনীতে বলছে, রাজা জনক আর শুকদেব বসে ব্রহ্ম বিষয়ক তত্ত্বের আলোচনা করছেন। শুকদেব মনে মনে ভাবছেন রাজা জনক একজন ব্রহ্মজ্ঞানী অথচ তিনি রাজমহলে রাজ ঐশ্বর্যের উপর বসে আছেন। তার আগের শ্লোকে বলছে *অনন্তমিব মে বিত্তং*, আর সম্পদ অনন্ত, *যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন*, এগুলোতে আমার কোন মমত্ব নেই। মিথিলার যিনি রাজা হতেন তাঁকে জনক বলেই সম্বোধন করা হত। আর মিথিলার রাজার উপর একটা আশীর্বাদ ছিল, মিথিলার রাজা সব সময় ব্রহ্মজ্ঞানী হতেন। এই জনক যে সীতার বাবা ছিলেন তা নয়। শুকদেব ভাবছেন জনক রাজা বেশ আছেন, একদিকে ব্রহ্মজ্ঞানী আবার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। নরেনও ঠাকুরকে দেখে বলছিলেন ‘এঁকে আবার লোকেরা পরমহংস বলে আবার মোটা গদিতে শোয়’। ঠাকুর বুঝতে পেরে বলছেন তুইও আমার মত কর, জগৎ তোকে এর থেকে চার আঙুল মোটা গদিতে শোওয়াবে। পরে সত্যিই দেখা গেল বেলুড় মঠে স্বামীজী যে গদিতে শুতেন সেটা চার আঙুল বেশী মোটা ছিল। এই গদি স্বামীজীকে তাঁর এক আমেরিকান শিষ্যা দিয়েছিলেন। পরমহংসের এগুলোতে কিছুই যায় আসে না। রাজা জনক দেখছেন এই ব্যাপারটা শুকদেবের মাথায় কিছুতেই ঢোকান যাচ্ছে না। শেষে রাজা জনক রাজমহলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। চারিদিকে রব উঠেছে রাজমহলে আগুন লেগেছে। শুনেই শুকদেব ছুটে গেছেন। শুকদেব একটা কৌপিন পড়ে আছেন আরেকটা কৌপিন রাজমহলের কোথাও শুকোতে দিয়েছেন। কৌপিনটা পুড়ে যাবে তাই সেটাকে দৌড়ে আনতে গেছেন। রাজা জনক তখন হেসে এই শ্লোকটা বলছেন *মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন।* ‘হে শুকদেব! তুমি নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞানী মনে করছ আর তোমার একটা কৌপিন পুড়ে যাবে তাকে রক্ষা করার জন্য ছুটে যাচ্ছ কিন্তু রাজমহলের কথা বাদ দাও আমার পুরো মিথিলা যদি পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাতে আমার কিছু এসে যাবে না। রাজা জনকই ভারতের জীবনের ঠিক ঠিক আদর্শ। একদিকে রাজা অন্য দিকে ব্রহ্মজ্ঞানী আবার আরেক দিকে তিনি পূর্ণ ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত।

বোধ্য বলে একজন ঋষি ছিলেন। রাজা যযাতি একবার বোধ্য ঋষির সমীপে গিয়ে বলছেন আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দিন যাতে আমার মনটা শান্তি ও সমৃদ্ধি পায়। বোধ্য ঋষি তখন বলছেন ‘দেখো বাপু, আমি তো উপদেশ দিই না, আমি উপদেশ গ্রহণ করি। তবে কি জান আমি অনেকের কাছেই অনেক উপদেশ পেয়েছি কিন্তু সেগুলো সবই সঙ্কেত মাত্র। আমি কিভাবে কিভাবে উপদেশ পেয়েছি সেই কাহিনীগুলোই আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি, সেখান থেকে তুমি নিজে বিচার করে উপদেশ হিসাবে গ্রহণ করে নাও’। ভাগবতে অবধূতের কাহিনীতে এই কাহিনীই সামান্য একটু অন্য ভাবে আছে। এখানে কয়েকজনের কথা বলা হচ্ছে যাদের মাধ্যমে বোধ্য ঋষি উপদেশ পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে পিঙ্গলা নামে একজন বেশ্যানারী, একটি কুড়ুর পাখি, একটা সর্প, এক ব্যাধ, একজন যে বাণ তৈরী করে আর একজন কুমারী কন্যা। এই ছয় জনের কাছে বোধ্য ঋষি বিভিন্ন জিনিষের শিক্ষা পেয়েছিলেন। এই কাহিনীগুলোকে অনেক ভাবে পরিবেশন করা হয়।

পিঙ্গলা একদিন খন্দেরের আশায় দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন তার কাছে কেউ এলো না, তখন তার সব আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। সেই মুহূর্তে তার মধ্যে একটা চেতনা এল, এই আশায় থেকে থেকে মিছিমিছি আমার জীবন নষ্ট করছি। তখন সে ঘরে গিয়ে শান্তিতে নিদ্রা গেল। আশা যখনই ত্যাগ হয়ে যায় তখনই প্রকৃত শান্তি। চিলের মুখে একটা মাছ ছিল। কাকগুলো কা কা করে চিলের পেছনে উড়ে চলেছে। চিলটা কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিল না। মুখ থেকে যখন মাছটা পড়ে গেলে তখন কাকগুলো চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে চলে গেল। ভোগ্যবস্তু থেকে যখন মানুষ সরে আসে তখনই শান্তি। সাপ কখন নিজে আস্তানা তৈরী করে না, অপরের আস্তানায় গিয়ে থাকে। ইঁদুর গর্ত বানায় আর সাপ গিয়ে গর্ত খুঁজে নিয়ে ইঁদুরকে খেয়ে ইঁদুরের গর্তেই থাকে। বিষয় আশয় করা মানেই ইঁদুরের মত ঝামেলা আসবে। টপোলজি বলে গণিতজ্ঞদের একটা শাখা আছে, পৃথিবীর মধ্যে এই শাখার যিনি সব থেকে বড় গণিতজ্ঞ তাঁর নিজের বাড়ি বলে কিছুই ছিল না। নিজের দুটো বড় স্যুটকেশেই তাঁর সব জিনিষ থাকত। হঠাৎ কোন বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে যেতেন, সেখানে দু-তিন মাস থেকে তাঁর কাজকর্ম চালাতেন। যখন মনে করতেন এই বাড়িতে অনেক দিন থাকা হয়ে গেছে, তখন ঐ দুটো স্যুটকেশে নিজের সব কিছু ভরে নিয়ে সন্ন্যাসীর মত বেরিয়ে চলে যাবেন। বাড়ি বানালে তার হাজারটা ঝামেলা এসে যায়। একজন সন্ন্যাসী,

তাঁর অনেক গুণ আছে, এখন সে যদি দুটি ঘর নিয়ে একটা ছোট্ট আশ্রম বানায়, এখন তাকে জলের ব্যবস্থা করতে হবে, জলের জন্য তাঁকে ট্যাক্স দিতে হবে, তারপর ইলেক্ট্রিক্যাল লাইনের ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর মিউনিসিপ্যালিটি ট্যাক্স দিতে হবে, বাড়ি রঙ করাতে হবে, বাড়ি মেরামত করতে হবে। কত রকমের ঝামেলা এসে যাচ্ছে। এই ঝামেলাকে মাথায় বয়ে নিয়ে কি আর উচ্চ চিন্তন করবে! এই কারণে যার উচ্চ চিন্তন করে তাদের পক্ষে এই সব ঝামেলা সামলান সম্ভব নয়। যাঁরা উচ্চ চিন্তন নিয়ে থাকেন তাঁদের জীবন চালানোর জন্য যেটুকু দরকার তার দায়িত্ব যে সমাজ গ্রহণ করে না সেই সমাজের কখনই অভ্যুদয় হবে না। সেইজন্য আগেকার দিনে সমাজ ব্রাহ্মণদের বলে দিল তোমরা জাগতিক কিছু প্রত্যাশা করো না, যেটুকু না হলে চলবে না সেইটুকু তুমি রাজার কাছে পেয়ে যাবে, তোমার কাজ উচ্চ চিন্তন করে যাওয়া। রাজারা ব্রাহ্মণদের কিছু জমি জায়গা দানপত্র করে দিতেন তাই তাঁদের কোন ট্যাক্স দিতে হত না। সমাজের উচ্চবিত্তরাও জানতেন নানা রকমের ঝামেলার মধ্যে উচ্চ চিন্তন করা সম্ভবই না। তাই ব্রাহ্মণদের বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে নানা ভাবে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করত।

নদীয়াতে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর নাম ছিল রামনাথ। গ্রামের বাইরে তিনি একটা কুঁড়ে ঘরে থাকতেন। গ্রাম থেকে কিছু চাল জোগাড় করে ভাত রাঁধতেন আর তেঁতুল পাতার ঝোল করে নিজেও খেতেন আর স্ত্রীকেও তাই খাওয়াতেন, আর যত ছাত্ররা তার কাছে অধ্যয়ন করত তাদেরও খাওয়াতেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে যায় বুনো রামনাথ। কোন কিছুতেই তাঁর কোন ভ্রক্ষেপ ছিল না, কিন্তু নদীয়ার সবাই বুনো রামনাথকে একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে সম্মান করত। স্ত্রী সব সময় তাল্পি দেওয়া শাড়ি পড়তেন আর হাতে একটা লাল সুতো বাঁধতেন, মানে শাঁখা বা চুরি কেনারও পয়সা ছিল না। গঙ্গায় ব্রাহ্মণের স্ত্রী একদিন স্নান করছেন। নদীয়ার রাজা যিনি ছিলেন তাঁর রানীও তখন পাশেই স্নান করছিল। জলে ছপাৎ ছপাৎ করে নামতে গিয়ে রানীর গায়ে জলের ছিটে গেছে। রানী তখন বলছে ‘হাতে লালসুতো তাতে আবার এত অহঙ্কার!’ মানে তোমার চুরি কেনারও পয়সা নেই তাতেই এত অহঙ্কার। ব্রাহ্মণী তখন বলছেন ‘আমার হাতে লালসুতো আছে বলে নদীয়ায় আমার সম্মান আছে’। রানী ঐ কথা শুনে খুব অপমানিত বোধ করে রাজাকে গিয়ে নালিশ করেছে। রাজা শুনে খোঁজ নিয়ে জানলেন এ হল বুনো রামনাথের স্ত্রী। রাজা ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণের কাছে গেছেন। রাজা গিয়ে আলাপ করে বুঝতে পারল ব্রাহ্মণ সত্যিই একজন বড় পণ্ডিত। আরও সব খোঁজ নেওয়ার পর রাজা যেভাবেই হোক ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্যে আর এই সহজ সরল জীবনধারায় খুব প্রভাবিত হয়ে পণ্ডিতকে বলছেন ‘আপনার যদি কোন কিছুর প্রয়োজন থাকে আমাকে বলতে পারেন’। ব্রাহ্মণ বলছেন ‘না না, আমার কিছু লাগবে না। গ্রাম থেকে আমার স্ত্রী চাল-টাল যা পায় নিয়ে আসে আর এই তেঁতুল গাছ যত দিন আছে আমার কোন চিন্তা নেই। তেঁতুল পাতার ঝোল হয়ে যায় আর ভাতও হয়ে যায়, ব্যস্ এতেই আমার সব কিছু মিটে যায়’। রাজা শুনে হতবম্ব হয়ে গেছেন ‘কিছু একটা আপনি নিন’। পণ্ডিত এখনও জানে না যে তিনি নদীয়ার রাজার সাথে কথা বলছেন। তখন পণ্ডিত অনেক ভেবে চিন্তে বলছেন ‘আমি যা চাইব আপনি দিতে পারবেন?’ রাজা সঙ্গে সঙ্গে বলছেন ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি একবার বলে দেখুন না, আমি দিতে পারি কিনা’। তখন পণ্ডিত বলছেন ‘ব্যাকারণে একটা শব্দ আছে যার অর্থ আমি কিছুতেই উদ্ধার করতে পারছি না। আপনি এই শব্দটার অর্থ উদ্ধার করার ব্যবস্থা করিয়ে দেবেন?’ রাজা পণ্ডিতের কথা শুনে মাথা নত করে তাঁকে প্রণাম করে বলছেন ‘এই ব্রাহ্মণের স্ত্রীর হাতে লালসুতো বাঁধা আছে তাই নদীয়ায় তাঁর এত সম্মান’। অভাবগ্রস্ত পণ্ডিত, সেইজন্যই সম্মান। ভারতের যা কিছু সম্মান এই অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণদের জন্যই হয়েছিল। এই যে পাণ্ডিত্য, শুধু পাণ্ডিত্যই নয় কারণ পাণ্ডিত্য তো যে কোন লোকই অর্জন করে নিতে পারে, কিন্তু এই পাণ্ডিত্যের সাথে যে এই ত্যাগ, এই কৃচ্ছ সাধন আর কোথাও পাওয়া যাবে না, যেটা ভারতের ব্রাহ্মণদের মধ্যে ছিল।

আলেকজাণ্ডার যখন বিশ্ব জয়ে বেরিয়েছেন তখন তার সাথে কয়েক জন সৌফিস্ট পণ্ডিতের পরিচয় হয়েছিল। এর মধ্যে একজন সৌফিস্ট সব সময় খালি গায়ে পড়ে থাকত। শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি কোন কিছুতেই তার কিছুই হত না। বিরূপ দার্শনিক পণ্ডিত কিন্তু ঐভাবে রাস্তার ধারে পড়ে থাকতেন। আলেকজাণ্ডার তাঁর নামে অনেক কথা শুনেছেন। তিনি একবার তাঁর সাথে দেখা করতে যাবেন বলে ঠিক করলেন। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গীরা নিষেধ করছে আপনি ওর কাছে যাবেন না, জামা-কাপড় পড়ে না, পাগলের মত পড়ে থাকে। তাও আলেকজাণ্ডার তাঁর কাছে গিয়েছেন। শীতকাল। লোকটি শুয়ে আছে। আলেকজাণ্ডার দাঁড়িয়ে আছেন। আলেকজাণ্ডারের ছায়া লোকটির গায়ে পড়েছে। আলেকজাণ্ডার লোকটিকে কিছু প্রশ্ন করেছেন। ঐ সময় শুধু আলেকজাণ্ডার ছিলেন আর ঐ দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, পাশে আর কেউ ছিল না। দুজনে কি কথা হয়েছে সেটাও লিপিবদ্ধ হয়নি। আলেকজাণ্ডারের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। উত্তর শুনে আলেকজাণ্ডার খুব খুশী হয়েছেন। তখন দার্শনিক পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করছেন ‘আমি কি আপনার জন্য কিছু করতে পারি?’ বারবার আলেকজাণ্ডার বলছেন

আপনার জন্য আমি যদি কিছু করতে পারি। পণ্ডিত তখন বলছেন ‘আমি যা বলব তুমি আমার জন্য তাই করতে পারবে’? ‘হ্যাঁ আমি তাই করব’। দুবার তিনবার এক কথা বলার পর পণ্ডিত বলছেন ‘তুমি আমার রোদটাকে আটকে দিচ্ছ, তুমি যদি একটু সরে দাঁড়াও তাহলে আমি একটু রোদ পেতে পারি’। আলেকজান্ডার অভিভূত হয়ে গেলেন। সেই উলঙ্গ, পাগল বলে সবাই যাকে জানে তাঁর কাছে বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডার মাথা নত করে দিলেন। এই স্তরে যতক্ষণ জ্ঞানী, পণ্ডিতরা না যেতে পারছে, কাঙালী, পাগল, ভিখারীর মত যতক্ষণ না থাকবে ততক্ষণ সমাজ কখনই এগোতে পারবে না। শিক্ষক সমাজ যখন ঝাণ্ডা হাতে আমাদের দাবী মানতে হবে বলে রাষ্ট্রায় নেমে গেছে তখন বোঝাই যাচ্ছে এই সমাজের আর কিছুই হবে না। আমেরিকাতে যখন প্রিংস্টন ইউনিভার্সিটি করা হল তখন তারা বুঝে গিয়েছিল যে, এই আধপাগলা যত বিজ্ঞানী আছে এদের ইউনিভার্সিটির দায়িত্ব সামলানোর ফুসরৎ থাকবে না, আপনি পড়াতে হলে পড়ান, গবেষণা নিয়ে থাকুন আপনারা এই কাজেই পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া হল। আইনস্টাইনের মত বিশ্বের বড় বড় বিজ্ঞানীরা ঐখানে গিয়ে জড়ো হয়ে গেলেন। সব থেকে বেশী মাইনে, ভালো বাংলো, আর সব কিছু ফ্রী, কোন দায়িত্ব নেই নিজের আনন্দে আপনি কাজ করে যান। আইনস্টাইনকে নিয়ে একটা কৌতুক ঘটনাই আছে। একদিন আইনস্টাইন প্রিংস্টন ইউনিভার্সিটিতে ফোন করছেন ‘দয়া করে আপনি আমাকে আইনস্টাইনের ফোন নাম্বারটা দেবেন’? অন্য প্রান্ত থেকে আইনস্টাইনকে বলা হল মিস্টার আইনস্টাইনের ফোন নাম্বার দেওয়া নিষেধ আছে। আইনস্টাইন তখন ফিসফিস করে বলছেন ‘কিছু মনে করবেন না, আমি আইনস্টাইন বলছি। আমার ফোন নাম্বারটা মনে নেই আর আমার বাড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না তাই আমি ফোন করে জিজ্ঞেস করতাম আমার বাড়িটা কোথায়’। এই ছিলেন আইনস্টাইন, কোথায় আছেন ভুলে গেছেন। ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে হাঁটতে গিয়ে রাষ্ট্র হারিয়ে ফেলেছেন। নিজের জগতে তিনি হারিয়ে গেছেন। এই ধরনের আধ পাগলা না হলে মহৎ হওয়া যায় না।

বোধ্য ঋষি এইটাই বলছেন, নিজের বাড়ি বানালে মাথায় কত রকমের ঝামেলা এসে যাবে। সাপ থেকে আমি এই শিক্ষা পেয়েছি। আমরা যদি কিছু শিখতে চাই প্রকৃতির চারিপাশে ভালো করে নজর দিলেই শেখার অনেক কিছুই পেয়ে যাব। সাপ কখন নিজে বাড়ি বানায় না, যেখানে গর্ত পাবে সেখানেই মস্ত হয়ে থেকে যাবে। তারপরে একটা পাখির কথা বলছেন যে কারুর সাথে শত্রুতা করে না, যেখানে যা পাবে তাতেই তার সব কিছু মিটে গিয়ে সমুষ্টি পেয়ে যায়, এর কাছ থেকে আমি অদ্রোহ শিখেছি। এরপর একজন লোকের কথা বলছেন, যেটা আমরা কথামূতেও পাই। একজন বাণ তৈরী করছিল, বাণ তৈরীতে এমন নিমগ্ন হয়ে গেছে যে রাজার বরকন্দাজরা যাচ্ছে সেদিকেও তার কোন হুঁশ নেই। শেষে একজন কুমারি মেয়ের কথা বলছেন। মেয়েটির বিয়ের ব্যাপারে কথা বলার জন্য ছেলের বাড়ির লোকেরা এসেছে। মেয়েটি তখন ধান ভাঙছিল। ধান ভাঙার সময় তার চুরিতে বনবান আওয়াজ হচ্ছিল। চুরির আওয়াজ শুনে অতিথিরা মনে করতে পারে যে অতিথি আসার পর ধান ভাঙা হচ্ছে তার মানে বাড়িতে কিছু নেই। মেয়েটিও চাইছে না যে এটা কেউ জেনে যাক। সে তখন হাতের চুড়িগুলোকে একটা একটা করে ভাঙতে শুরু করেছে। যখন দুটো চুড়িতে এসে ঠেকেছে তখনও আওয়াজ হচ্ছে দেখে দ্বিতীয় চুড়িটাও ভেঙে দিয়েছে। যখন একটি চুড়ি থেকে গেল তখন সব আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। সেখান থেকে বোধ্য ঋষি শিখলেন দুজন পর্যন্তও যদি এক সঙ্গে থাকে তাহলে কিন্তু অশান্তি লাগবেই। তাই মনে মনে একা হয়ে যাও। বোধ্য ঋষি রাজা যযাতিকে বলছেন আমি এইভাবে প্রকৃতি থেকে শিক্ষা পেয়েছি।

### জগতে সুখে কিভাবে বিচরণ করা যায় – ব্রাহ্মণ ও প্রহ্লাদ সংলাপ

যুধিষ্ঠিষ্ঠ প্রশ্ন করছেন ‘হে পিতামহ! মানুষ কিরূপ চরিত্র আশ্রয় করলে শোকশূন্য হয়ে এই জগতে বিচরণ করতে পারে আর কি কাজ করলে উৎকৃষ্ট গতিপ্রাপ্ত হয়’? তখন প্রহ্লাদের একটা কাহিনী নিয়ে ভীষ্ম বলছেন। প্রহ্লাদ একদিন দেখছেন চরন্তং ব্রাহ্মণং কশ্চিৎ কল্যাচিভমনাময়ম্। পপ্রচ্ছ রাজা প্রহ্লাদো বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিসম্মতম্। ১৩/১৭৩/৩। এক ব্রাহ্মণ যাচ্ছেন যাঁর চিত্ত একেবারে সুদৃঢ় তাঁর শোক দুঃখ বলে কিছু নেই। একা রয়েছেন। প্রহ্লাদ তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন ‘হে ব্রাহ্মণ! যত মানুষ আছে সবাই কাম ক্রোধের প্রবাহে হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে যাচ্ছে কিন্তু সেখানে আপনি পুরো উদাসীন, এটা কি করে সম্ভব হচ্ছে? আপনার মধ্যে কি বুদ্ধি, কোন্ শাস্ত্র, কোন্ বৃত্তি এমন আছে যার জন্য আপনার এই রকম ক্ষমতা হয়ে গেছে। কাম ক্রোধের বন্যাতে সবাই ভেসে যাচ্ছে কিন্তু আপনি এই রকম উদাসীন কি ভাবে রয়েছেন’? ব্রাহ্মণ খুব মেধাবী ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বলছেন পশ্য প্রহ্লাদ ভূতানামুৎপত্তিমনিমিত্তাঃ। হ্রাসং বুদ্ধিং বিনাশঞ্চ ন প্রহৃষ্যে নচ ব্যথো। ১৩/১৭৩/১০। ‘হে দানবরাজ প্রহ্লাদ! এই জগতে যত প্রাণী আছে আর তাদের যে উৎপত্তি, বুদ্ধি, হ্রাস ও বিনাশ, এই চারটে পরমাত্মা থেকেই হয়, এটা আমি বুঝে গেছি’। ষড়বিকারকে এখানে চারটে বিকারে নিয়ে আসা হয়েছে উৎপত্তি, বুদ্ধি, হ্রাস ও বিনাশ। উৎপত্তি মানে মানুষ জন্ম নিল, বুদ্ধি – সে বড় হতে থাকল,

হ্রাস – বৃদ্ধ হচ্ছে আর বিনাশ – মারা গেল। এই চারটে পরমাত্মা থেকেই হচ্ছে এইটা বুঝে নেওয়ার ফলে কারুর জন্ম হল তাতে আমার আনন্দ হয় না, কারুর মৃত্যু হলেও আমার কোন দুঃখ হয় না। এটা হল প্রথম। এরপর হল, এর আগে আগে মানুষ যা কিছু করেছে, তার উপর নির্ভর করে আজকে তার এই স্বভাব তৈরী হয়েছে। যেমনটি স্বভাব হয়েছে সে সেই রকমই কাজ করেছে, তাই তাকে দোষ দিয়ে কি লাভ। এই ভাবটাকে অবলম্বন করে সাধনা করা খুব কঠিন। মানুষ কত রকম আজবাজে কাজ করে, নোংরা কথা বলে। এখানে কিছু করার নেই। গত গত জন্মের অনেক সংস্কার সে ভেতরে জমিয়ে রেখেছে, যেমন যেমন সংস্কার সে জমিয়েছে তার স্বভাবটাও সেই রকমই হবে। পাঁচ-ছয় মাসের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে খেলা করাতে গিয়ে যদি বাচ্চা পেছাপ করে দেয় তখন কি আমি রেগে গিয়ে বাচ্চাকে মারতে শুরু করব! এটা তো বাচ্চা তার স্বভাবে করছে, এই নিয়ে তো কেউ রাগ করে না, বাচ্চাকে মারতেও যায় না। জগতকে যখন একটা শিশু মনে করবে, যেটাই করছে সে তার স্বভাবে করছে, তখন সে নির্বিকার হয়ে যাবে। সেটা দেখে আর আনন্দও হবে না বা দুঃখও হবে না। সারা জগতের প্রতি যখন এই দৃষ্টিভঙ্গী এসে যাবে যে এইটাই তার ধর্ম, এইটাই তার স্বভাব, তখন আর কিছুই তার মনে হবে না। ব্রাহ্মণ বলছেন *পশ্য প্রহ্লাদ সংযোগান্ বিপ্রয়োগপরায়ণাম্। সঞ্চয়াংশ্চ বিনাশান্তান্ কচিদ্ভিদধে মনঃ।।১৩/১৭৩/১২।* ‘হে প্রহ্লাদ! আমি জানি এই জগতে যত রকমের সংযোগ হয়, সব সংযোগের পরিণতি বিয়োগ। এই বিয়োগটাই জগতের শাস্ত্র নিয়ম। আর যত ধরণের সঞ্চয় হয় এর বিনাশ হল সমাপ্তিতে’। যা কিছুই আমরা সঞ্চয় করি না কেন, বাড়ি বানাই বা টাকা-পয়সাই জমাই এর একদিন সমাপ্তি হবেই। ব্রাহ্মণ তাই বলছেন সমস্ত কিছুই এই পরিণতি যখন আমি জেনে গেছি তখন আমি কোন কিছুতে মন লাগাই না। কারুর সাথে সংযোগও করিনা বা কোন কিছু সঞ্চয়ও করিনা, আমি জানি এগুলো আজ আছে কাল থাকবে না। মহাভারতে এই কথাগুলো যত সহজে বলে দেওয়া হয়েছে, ব্যাপারটা অত সহজে হয় না। আমি একটা জিনিষ থেকে দূরে থাকতে পারি কিন্তু তাই বলে সেই জিনিষের রস আমার ভেতর থেকে চলে যাবে তা হয় না। গীতাতেই ভগবান বলছেন *বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ততে।।(২/৪৯)।* বিষয় থেকে আমরা সরে যেতে পারি কিন্তু বিষয়ের রস আমাদের ভেতর থাকবে আর সুযোগ পেলে সেই রস থেকে তৃষ্ণা আমাদের চাড়া মারবেই। আমরা যদি এই ভেবে নিই যে সব সংযোগেরই পরিণতি বিয়োগে, সব সঞ্চয়ই শেষ হয়ে যায় তাই আমি আর কোন কিছুর জন্য চেষ্টা করব না। কিন্তু আমরা পারব না, কারণ আমার প্রকৃতিই সেই দিকে নিয়ে গিয়ে আমাকে নাচিয়ে ছাড়বে। আধ্যাত্মিকতার একটা স্তরে না পৌঁছালে এই ভাবটা দৃঢ় হয় না।

প্রহ্লাদ জিজ্ঞেস করছেন আপনি অজগর বৃত্তি কেন অবলম্বন করে থাকেন? ব্রাহ্মণ বলছেন, যখন ভালো খাওয়া-দাওয়া এসে যায় তখন একটু বেশী করে খেয়ে নিই। আবার যখন কোন খাওয়া-দাওয়া পাইনা তখন অল্প একটুতেই পরিতৃপ্ত হয়ে যাই। এটাই অজগর বৃত্তি। ব্রাহ্মণ বলছেন ‘হে দানবরাজ! আমার বুদ্ধি অবিচল, মন আমার কোন কিছু থেকেই বিচ্যুত হওয়ার অবকাশ পায় না। কারণ আমার মন সব সময় পরমাত্মার চিন্তনে নিযুক্ত। আমি আমার ধর্ম থেকে কখন চ্যুত হইনা। তদুপরি আমার সাংসারিক ব্যবহার এখন খুব পরিমিত হয়ে গেছে। আমার গাঙীটা খুব ছোট হয়ে গেছে, বেশী লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিনা। ভালোমন্দের জ্ঞান আমার হয়ে গেছে, আমার মন থেকে সব ধরণের কুবৃত্তি চলে গেছে। সেইজন্য আমি এই রকম আনন্দে আছি’।

### **জন্ম, কর্মফল ও পুণ্যফলাদি নির্ধারণে মহাভারতের নিজস্ব মত এবং সত্য ও মডেলের পার্থক্য**

মহাভারতের আলোচনার শুরুতে আমরা একটা কথা বলেছিলাম যে কর্মবাদের কথা প্রথম উপনিষদেই এসে গিয়েছিল। আসলে বেদ ও উপনিষদে যে ভাবগুলো এসে গিয়েছিল পরের দিকে বিভিন্ন শাস্ত্র ঐ ভাবগুলোকে ধীরে ধীরে বিস্তার করে এগিয়ে গেছে। পরের দিকে যে সব ঋষিরা বা চিন্তাবিদরা এসেছেন তাঁরা বেদ উপনিষদের একেকটি ভাব ধরে নিয়েই আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছেন। কর্মবাদ বেদে ঠিক পরিষ্কার ভাবে পাওয়া যায় না, যদিও উপনিষদে কর্মবাদের একটু ছোঁয়া হাল্কা ভাবে এসেছে। কঠোপনিষদেই যেমন আমরা একটা জায়গাতে পাচ্ছি যেখানে যমরাজ মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায় বলতে গিয়ে বলছেন, মানুষ যেমন জ্ঞান লাভ ও যেমন কর্ম করেছে, এই দুটোকে মিলিয়ে মৃত্যুর পর সেই রকম শরীর ধারণ করে – *যথা কর্ম যথা শ্রুতম্।* আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে বর্তমান হিন্দুধর্ম পুরোপুরি মহাভারতের ধর্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে। মহাভারত যা কিছু দিয়ে গেছে সেটাই হিন্দুধর্মে থেকে গেছে আর মহাভারত যেগুলোকে ফেলে দিয়েছে সেগুলো হিন্দুধর্মে জায়গা পায়নি। মহাভারত এক বিশাল কীর্তি, বিরাট শাস্ত্র। মহাভারতেরই অনেক কিছুকে পরের দিকে শাস্ত্রগুলি নিজেদের মত করে codified করেছে। যেমন এই শাস্তিপর্বেরই যোগসাধনা নিয়ে একটা অধ্যায় আছে। মহাভারতে যোগসাধনার ব্যাপারে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, পতঞ্জলী যোগসূত্রে

আবার সেগুলোকে পাওয়া যাবে না বা গীতাতেও পাওয়া যায় না। পতঞ্জলী বা গীতাতে যোগসাধনার ব্যাপারটাকে আরও সুসংবদ্ধ ভাবে সুন্দর করে সাজান অবস্থাতে পাওয়া যাচ্ছে। মহাভারতে যোগসাধনার দর্শনকে খুব হাল্কা ভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। মনে হবে যোগসাধনার ব্যাপারে এনাদের মাথায় যেন একটা চিন্তা ভাবনা এসেছে, সেটাকে অনেকের সাথে আলোচনা না করেই যেমনটি ভাবনাতে এসেছে ঠিক তেমনটি বলে গেছেন। পরের দিকে যাঁরা যোগসাধনার ব্যাপারে অনেক চিন্তা ভাবনা করে এগিয়ে গেছেন তাঁরা এটাকেই আরও পরিষ্কার করে বেঁধে দিলেন।

আমরা এখন মহাভারতের শান্তিপর্বে আছি। ভীষ্ম এখনও শরশয্যায় শায়িত। যুধিষ্ঠির নিয়মিত পিতামহের কাছে যাচ্ছেন আর অনেক ধরনের প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় যুধিষ্ঠির কি আদৌ ভীষ্মকে প্রশ্ন করেছিলেন, না কি পরের দিকের মণীষিদের মনে অনেক প্রশ্ন এসেছিল যেগুলোকে নিজেদের মত চিন্তা ভাবনা করে মহাভারতের মধ্যে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। একবার যদি বলে দেওয়া হয় পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে আছেন আর যুধিষ্ঠির প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছেন আর যত খুশী অধ্যায় তৈরী করা হোক না কেন তাতে কাহিনীতে কোন পরিবর্তন হবে না। যুধিষ্ঠিরের বেশীর ভাগ প্রশ্ন আমাদের সবারই মনের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাবে জাগতে পারে, সেই প্রশ্নগুলোকেই মহাভারতে সাজিয়ে গুছিয়ে যুধিষ্ঠিরের মাধ্যমে পরিবেশিত করা হচ্ছে। ভীষ্মের উত্তরে যে মতগুলো বেরিয়ে আসছে তার সব মতকেই যে আমাদের মনে নিতে হবে এমন নয়। কারণ ধর্ম সব সময় গতিশীল, আমার ধর্ম আপনার ধর্ম কোন দিন এক হবে না। হিন্দু ধর্ম খুবই খোলামেলা ধর্ম, সেইজন্য হিন্দুধর্মকে কখনই একটি কথাতে ব্যাখ্যা করা যায় না। খ্রীস্টান, ইসলামকে বলে দেওয়া যেতে পারে এইটাই ইসলাম বা খ্রীস্টান ধর্ম কিন্তু এইটাই হিন্দুধর্ম এইভাবে হিন্দুধর্মকে বলে দেওয়া যাবে না। হিন্দুধর্ম খুব খোলামেলা। ইসলামেও যেখানে তারা খুব কটর সেখানেও অনেক ঢিলেঢালা, যার জন্য ইসলামেও হাজার হাজার শাখা আছে। কেন হচ্ছে? কোথাও তারা পুরো থিয়োলজিকে মেনে নিচ্ছে না, কোথাও তাদের একটু ফাঁক রয়েছে বলে অন্য রকম ভাবনা চিন্তা এসে পড়ছে। আসলে নিজের মনই শেষ গুরু। মানুষ ঐটাই করে যেটা তার মন বলে। মহাভারতের বিশেষত্ব এইটাই, যত রকমের মন হতে পারে, যত রকমের চিন্তন হতে পারে সব মহাভারতে বলে দেওয়া হয়েছে। এই জগতে যে কোন দুজনের মন কখনই এক রকম হতে পারেনা। একমাত্র মন এক হয় মিলিটারিতে আর পার্টি ক্যাডারদের, ওপর থেকে যেটা বলে দেওয়া হবে সেটাই তাদের মনে নিতে হবে, এরা নিজেদের মনটাকে মেরে রেখেছে। এরাও যখন সেই মন থেকে বেরিয়ে আসবে তখন এদের যদি একটা কবিতা দিয়ে বলা হয় কবিতাটা আপনার কেমন লাগছে, তখন পাঁচজন পাঁচ রকম মন্তব্য করবে। কখনই দুজনের মন এক হতে পারেনা, যদি দুজনের মন এক হয়ে যায় তাহলে বুঝে নিতে হবে একজন মরে গেছে। এখন যদি আমাদের দুজনের মন সমান না হয় তাহলে আমাদের একজনের মন কম শুদ্ধ হবে। এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার, এতে বুদ্ধি লাগাবারও প্রয়োজন হয় না। যার মন কম শুদ্ধ, সঙ্কটের সময় সে ঐ অশুদ্ধ মন নিয়েই সেই সঙ্কটের মোকাবিলা করবে। এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচানর জন্যই বলা হয়, তুমি তো নিজেই জাননা তোমার মন কতটা শুদ্ধ আর কতটা অশুদ্ধ, সেইজন্য যতক্ষণ না তুমি বুঝতে পারছ তোমার মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণ তুমি বড়দের কথা মেনে চল, তস্যাচ্ছাত্রং প্রমাণং তে। শাস্ত্র যেটা যেভাবে করতে বলেছে ঠিক সেই রকমটি করে যাও। যদি তা না কর তাহলে তোমাকে সমস্যায় ফেলে দেবে। সাপের লেজ একদিন মুণ্ডুকে বলছে ‘আমাকে কেন সব সময় তোমার পেছনে পেছনে চলতে হবে? আমি এগিয়ে এগিয়ে চলব আর তুমি আমাকে অনুসরণ করবে’। মুণ্ডু বলল ‘ঠিক আছে বাবা, তুমি তাই কর’। এখন সাপের লেজ চলল আগে আর মুণ্ডু চলল তার পেছনে পেছনে। লেজ তো আর কিছু দেখতে পায় না। চলতে চলতে গিয়ে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে। লেজ তখন বলছে এখন কি হবে আমার। মুণ্ডু বলছে ঠিক আছে আমি তোমাকে বার করে নিয়ে চলতে শুরু করছি। তারপর মুণ্ডু তাকে গর্ত থেকে বার করে নিয়ে এল। এইভাবে চলছে। আবার লেজ বলছে আমিই এগিয়ে এগিয়ে যাব আর তুমি আমার পেছনে পেছনে আসবে। এবারে একটা কাঁটার ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। কাঁটাতে শরীর রক্তারক্তি হয়ে গেছে। মুণ্ডু আবার তাকে বার করে নিয়ে এসেছে। আবার লেজ এগিয়ে এগিয়ে চলেছে। তৃতীয়বার গিয়ে সাপ আগুনের মধ্যে পড়েছে। সাপের আর বাঁচার কোন উপায় ছিল না। এইটাই হয়। অশুদ্ধ মনের অধিকারী আর অযোগ্য লোকের হাতে যদি ক্ষমতা চলে আসে তার দুর্প্রয়োগ হতে বেশীক্ষণ সময় লাগে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এগুলোই অশুদ্ধ মনের ধর্ম। মানুষ কতটা শুদ্ধ মনের অধিকারী হয়েছে তার উপর নির্ভর করে তার নিজেকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা। নিজেকে নেতৃত্ব দেওয়া ক্ষমতা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ শাস্ত্র যা বলছে তোমার সেটাই করা সব থেকে জরুরি। এখন আমি কোন্ শাস্ত্রকে অনুসরণ করব? সেটা আমার ব্যাপার। কোন শাস্ত্রই বলে না যে তুমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহে ঝাঁপিয়ে পড়। জেন্দাবেস্তা, বাইবেল, কোরান, ত্রিপিটক ইত্যাদি যত শাস্ত্র আছে কোন শাস্ত্রই বলবে না যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহে ঝাঁপিয়ে পড়। শাস্ত্র বলে দেবে আল্লা আলাদা, ফাদার ইন হেভেন, বিষ্ণুর কথা বলবে কিন্তু এটা বলবে না যে তুমি খুব করে ভোগ করে নাও আর যেখানে যা কিছু আছে

সব লুটেপুটে নাও। সেইজন্য বলা হয় তস্মাচ্ছাত্রং প্রমাণং তো। কিন্তু এটা কাদের জন্য? অশুদ্ধ মন যাদের তাদের জন্য। আমাদের সবারই মন অশুদ্ধ। কিন্তু একবার যদি বুঝে নিই আমার মনের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য আছে, এগুলোর একটাও যদি সুপ্ত অবস্থাতেও থাকে তাহলে বুঝতে হবে আমার মন এখনও শুদ্ধ হয়নি। এখন আমাকে একটা শাস্ত্রকে ধরে নিতে হবে। তা আমি কথামৃতকে ধরব, না কোরানকে ধরব তার কোন গুরুত্ব নেই, একটা শাস্ত্রকে ধরতে হবে। যে শাস্ত্রকে ধরব সেই শাস্ত্র যে রকমটি বলেছে আমাকে সেই রকমটি করতে হবে। ঐ শাস্ত্রের কথাকে পালন করতে করতে আমার মনটা আস্তে আস্তে শুদ্ধ হতে থাকবে। এখানে যে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করা হয়েছে, আমাদের অশুদ্ধ মনে নানান রকমের প্রশ্ন ওঠে। আর আমরা সবাই নিজেকে বড় ওস্তাদ মনে করি। সফ্রেটিস সব সময় জ্ঞান লাভের পেছনে লেগে থাকত। একবার সফ্রেটিস ডায়নার মন্দিরে গেছেন, মন্দিরে সফ্রেটিস জিজ্ঞেস করছে আমার শহর এথেন্সে সব থেকে বুদ্ধিমান কে? দেবীর দৈববাণীতে উত্তর এল সফ্রেটিস। দৈববাণী শুনে সফ্রেটিস খুব হতাশ হয়ে গেছে, আমাকে কি করে সব থেকে বুদ্ধিমান বলছে! পাহাড় থেকে ফিরে আসার সময় নামতে নামতে সফ্রেটিস ভাবছে দেবী কেন আমাকে বলল আমি সব থেকে বুদ্ধিমান! ভাবতে ভাবতে তখন তাঁর মন বুঝতে পারল, ও এই ব্যাপার। বাকীরা সবাই মনে করে আমি জ্ঞানী আর আমি নিজেকে মনে করি আমি অজ্ঞানী, সেইজন্যই আমাকে বুদ্ধিমান বলা হচ্ছে। কেনোপনিষদে অনেক আগেই এই মন্ত্র এসে গিয়েছে – যো নস্তদবেদ তদ্বদ বেদেতি চ। যে মনে করে বুঝে গেছে সে বোঝেনি, যে মনে করে বোঝেনি সেই বুঝেছে। এখানে বলা হচ্ছে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ব্যাপারে। যে মনে করে ব্রহ্ম কি, আত্মা কি, ঈশ্বর কি বুঝে গেছি আসলে সে কিছুই বোঝেনি। কিন্তু যে বলছে ব্রহ্ম কি বোঝা যাচ্ছে না, আমাকে বুঝিয়ে দাও, সেই বুঝেছে। এখানে এই প্রশ্নগুলো আমার আপনার সবার অশুদ্ধ মনের জন্য। আমরা সবাই নিজেকে মনে করি আমার মত কেউ নেই। কিন্তু এই ভাবটা বাইরে কেউ প্রকাশ করে না, ভেতরে রাখে। আমরা নিজের যতই ওস্তাদ মনে করি এই প্রশ্নগুলো আমাদের মনের মধ্যে ওঠে। সেই প্রশ্নগুলোকে নিয়ে বিভিন্ন রকমের আলোচনা করা হয়েছে। তবে মহাভারত এই প্রশ্নগুলোকে কিভাবে দেখছে, তখনকার দিনের মহাপুরুষরা বা মুনি ঋষিরা কিভাবে দেখতেন সেটাকে নিয়ে আলোচনা করছেন।

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে প্রশ্ন করছেন ‘হে পিতামহ! শাস্ত্রে শুনে এসেছি দান, যজ্ঞ, তপ আর গুরুর সেবা এগুলোই পূণ্যকর্ম। এই পূণ্যকর্মের কি কোন ফল পাওয়া যায়?’ ভীষ্ম উত্তর দিচ্ছেন *আত্মনানর্থযুক্তেন পাপে নিবিশিতে মনঃ। স্বকর্মকলুষং কৃত্বা কৃচ্ছ্রে লোকে বিধীয়তে।।১৩/১৭৫/২।* ‘যুধিষ্ঠির! মানুষ যখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদিতে লিপ্ত থাকে এরা সবাই কৃচ্ছ্রলোকে গিয়ে পড়ে, মানে নীচ লোকে গিয়ে পড়ে’। কঠোপনিষদে নচিকেতাকে যমরাজ বলছেন *যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থানুমন্যেহনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাপ্রণতমঃ।।(২/২/৭)।* মানুষের মৃত্যুর পর যখন তার নতুন জন্ম নেওয়ার সময় আসে তখন তারা বিভিন্ন যোনিতে যায়। যদি খুব খারাপ কর্ম থাকে তখন তারা স্থানু হয়েও জন্মায় অর্থাৎ গাছপালা হয়ে জন্মায়। কিভাবে এগুলো নির্ধারিত হয়? যেমনটি তোমার কর্ম ছিল আর যেমনটি তোমার জ্ঞান ছিল সেই অনুসারেই নির্ধারিত হয় তুমি কোন যোনিতে যাবে। শুধু জ্ঞান হলেই হবে না কর্মটিও ঠিক হওয়া চাই। ভীষ্ম বলছেন ‘তুমি যে প্রশ্ন করছ এই কর্মগুলিতে কোন পূণ্য হয় কিনা, অবশ্যই পূণ্য হয়। যাদের জীবনে কোন উচ্চ আদর্শ নেই, ধর্ম যাদের উদ্দেশ্য নয় এরা মানুষের মধ্যে কি রকম জান? যেমন ধান গাছের মধ্যে ফাঁপা ধান গাছ, দেখতে ধান গাছের মতই হবে, একই আকৃতি কিন্তু সেই গাছে কোন ফসল হয় না, যদিও বা শীষ বেরোয় কিন্তু তার মধ্যে কোন দানা থাকে না। মানুষের মধ্যে এরা এই চিটে ধান, যাদের কোন উচ্চ আদর্শ নেই। ডানায়ুক্ত প্রাণির মধ্যে এরা মশা। মশারও ডানা থাকে তাই বলে মশাকে পাখি বলা যায় না। ধর্মবিহীন লোককেও মনুষ্য পদবাচ্য করা হয় না’। মহাভারত এইসব ব্যাপারে খুব কড়া ভাষা ব্যবহার করতে কোন রকম দ্বিধা করেনি। এগুলো সবই মহাভারতের মত আর ধর্মের ব্যাপারে এগুলো একেকটি মডেল। সত্য আর মডেলের মধ্যে অনেক তফাৎ। যেমন গাছ থেকে আম নীচে পড়ে এটা হল একটা সত্য আর মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম হল একটা মডেল। নিয়ম যখন হয় তখন সেই নিয়মটা হল সত্য, সত্য যেটা সেটা সর্বকালে সর্বস্থানে প্রযোজ্য হবে। যেমন বিনাশ, এটা হল সত্য। জগতের যা কিছু আছে সব কিছুর বিনাশ হবেই এইটাই চিরন্তন শাস্ত্র নিয়ম, এইটাই ঠিক ঠিক নিয়ম। কিন্তু আমরা উপর থেকে নীচে কেন পড়ছে সেটাকে বোঝাতে গিয়ে অনেক রকম ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসতে পারে, এগুলোই মডেল। নিউটন একটা মডেল দিয়েছেন, আইনস্টাইন আরেকটা মডেল দিয়েছেন এইভাবে গ্রীক বিজ্ঞানীরা, কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মডেল দিয়েছেন। মডেলটা ঠিক না ভুল বলা আমাদের বুদ্ধির বাইরে। কারণ আগামীকাল আরেকজন বড় বিজ্ঞানী এসে বলে দেবে আজ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে এগুলো সব ফালতু, এই থিয়োরিটাই সব থেকে ঠিক ঠিক। কিন্তু এটাও একটা মডেল। আমরা এখানে যে জিনিষগুলো আলোচনা করছি এগুলো সবই মডেল। মডেলকে সব সময় একেবারে ঠিক বলে ধরে নেওয়া যায় না। হিন্দুদের সমস্যা হল তারা মডেলগুলোকে খুব

আক্ষরিক ভাবে মেনে নিয়েছে। তাহলে ধর্মের সত্যটা কি? আধ্যাত্মিক জীবনে ধর্মের একটাই সত্য তা হল – ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, সর্বৎ খন্ডিত ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। এইটাই একমাত্র সত্য। বাকি সব কিছু শুধুমাত্র মডেল। এই মডেলকে নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামাতে নেই। সব ধর্মই একেকটি মডেল আর এই মডেলকে নিয়েই পরস্পর মারামারি করতে থাকে। কিন্তু সব ধর্ম এই সত্যকেই বলছে, মুসলমানরা বলছে আল্লাই আছেন, খ্রীস্টানরা বলছে মাই ফাদার ইন হেভেন, হিন্দুরা বলছে সচ্চিদানন্দই বস্তু।

জীবনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজীর সমস্ত বক্তব্য গুলোকে যদি সমন্বিত করে বলা হয় তখন সব মিলিয়ে মাত্র তিনটে মত আসে। প্রথম মত হল যেটা যুক্তিবাদীরা বলেন, বিজ্ঞানীরাও যেখানে দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন। বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে সমস্যা হল এনারা সব সময় কার্য ও কারণের সম্পর্ককে বার করতে থাকবেন, আর যখন প্রথম কারণের কথা বলবে তখন বলবে এটা চাপ। বিজ্ঞান সব কিছুতেই বলছে এটা থেকে এটা হয় ওটা থেকে এটা হয়, কেমিস্ট্রি থেকে শুরু করে যা কিছু আছে সব কিছুতে বলে দেবে এটা থেকে ওটা হয়, মানে সব কিছুর পেছনে কার্য কারণকে নিয়ে আসবে কিন্তু যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোথা থেকে এল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও তো একটা কার্য, এই কার্যের কারণটা কি? তখন বিজ্ঞান বলে এর উত্তরতো আমার দেওয়ার কথা নয়। তাহলে তুমি কিসের বিজ্ঞানী! মূল কথা হল যুক্তিবাদীরা বলে এবং বিজ্ঞানীরাও বলে সৃষ্টিটা কেন হল তাদের জানা নেই, এটা একটা চাপ। ক্লাশ এইট পাশের বিদ্যা নিয়ে একটি ছেলে যোগী হয়ে আজ এগারশ কোটি টাকার মালিক। এখন যদি এই ব্যাপারে যুক্তিবাদীদের জিজ্ঞাসা করা হয় তারা বলবে সে খেটেছে, একটা বিদ্যা তার ছিল আর বাকিটা চাপ। যার ঈশ্বরে একনিষ্ঠ ভক্তি আছে সে বলবে এটা তাঁর ইচ্ছা। প্রথমটি নাস্তিকবাদীদের মত, দ্বিতীয় মত আস্তিকবাদীদের মত, ঈশ্বরের ইচ্ছা। তৃতীয় মতটা একমাত্র হিন্দুদেরই। পরে এই মতটাই প্রাচ্যের অন্য যত ধর্ম আছে শিখ, জৈন ও বৌদ্ধদের এদের সবারই মত হয়ে গেছে। সেটা হল যা কিছু আমার সঙ্গে ঘটছে এর জন্য আমি নিজেই দায়ী। সমস্যাটা হিন্দুদেরই বেশী হয়, কোন সময় বলছে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে অন্য দিকে বলে সবই আমার কর্মের জন্য হচ্ছে। এই দুটোকে হিন্দুরা মেলাতে পারেনা বলে এদের সমস্যাটা বেশী হয়। এই যে প্রচণ্ড গরমে আমরা হাঁকপাঁক করছি, যুক্তিবাদীরা বলবে এটা আবহাওয়া যে রকম হওয়ার ছিল সেই রকম হয়েছে বলে গরম হচ্ছে, বৃষ্টি হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। আস্তিকরা বলবে ঠাকুরের ইচ্ছাতেই এই গরম হচ্ছে। আর যারা কটর বেদান্তী তারা বলবে আমার কর্মে এমন কিছু ছিল যে আজকে আমাকে এই গরম ভোগ করতে হচ্ছে। আমাদের মত সাধারণ মানুষ যারা, যাদের কোন আদর্শ নেই তারা কখন বলবে ঠাকুরের ইচ্ছায় হচ্ছে আবার কখন বলবে আমার কপাল। কিন্তু স্বামীজী বলছেন হিন্দুদের বেদান্তের সিদ্ধান্ত প্রেরণাদায়িনী ও প্রচণ্ড শক্তিদায়িনী। চাপ মানে সমুদ্রে ঢেউ উঠছে কখন ঢেউ আমাকে উপরে নিয়ে যাবে কখন নীচে নিয়ে আসবে তার কোন ঠিক নেই। নাস্তিক মতে অনন্ত শক্তির সামনে নিজেকে অসহায় হয়ে যেতে হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর যদি চলে যায় তখন আমি এতই দুর্বল যে যা কিছু হচ্ছে সেটা অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছি। বেদান্ত বলবে, তা নয়, আমি এর আগে আগে ভালো কাজ করেছি তার ফল আজকে পাচ্ছি, খারাপ কর্ম করেছি তার ফল আজকে পাচ্ছি। আজকে যদি ভালো কাজ করতে থাকি পরে আমার সবই ভালো হবে। তাই আমাকে এখন ভালো হতে হবে, এটাকে ভগবানের উপর ছাড়া যাবে না। আমাকেই আমার যা কিছু করে নিতে হবে। স্বামীজী তাই বেদান্তের উপর বারবার জোর দিয়ে গেছেন। স্বামীজী তাই বলে গেলেন বেদান্তই ভবিষ্যতের ধর্ম। এখন আর লোককে এই বলে বোকা বানান যাবে না, ভগবান আকাশে একটা সিংহাসনে বসে সুপার কম্পিউটার চালাচ্ছেন আর একে বলছেন তোমার ঘাড়টা নাড়, সেও অমনি ঘাড় নাড়ল। এসব কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার দিন চলে গেছে। এখন সব আমার উপর নির্ভর করছে। আমার ফ্ল্যাটে যদি জল না আসে তাহলে আমি কি করব? খেটেখুটে কিছু বেশী টাকা রোজগার করে আরেকটা ফ্ল্যাট কিনব যেখানে চব্বিশ ঘন্টা জল পাওয়া যাবে, ভগবানের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। যখন আমি নিজের উপর সব কিছুকে টেনে নিলাম তখন এই মতটাকে বলা হয় কর্মবাদ। মহাভারত কর্মবাদের উপর সব থেকে বেশী জোর দিয়েছে।

*সুশীঘ্রমপি ধাবন্তং বিধানমনুধাবতি। শেতে সহ শয়ানেন যেন যেন যথা কৃতম্।।১৩/১৭৫/৮।* কি সুন্দর শ্লোকের ভাবটি! আপনি যেমনটি কর্ম করেছেন, শুধু এই জন্মে নয় এর আগের আগের জন্মেও যত কর্ম করা আছে, কোন কর্মই আপনাকে ছাড়বে না। *সুশীঘ্রমপি ধাবন্তং*, ধাবন্তম্ মানে তাড়া করা, পালান বা দৌড়ান, শুধু দৌড়ানই নয়, শীঘ্রম্, মানে খুব জোরে দৌড়াচ্ছে, আবার শীঘ্রমই নয়, বলছেন সুশীঘ্রম্। যদি আমি খুব জোড়ে পালাতে থাকি, কিভাবে পালাচ্ছি? যদি ট্রেনে করেই পালায় বা প্লেনে করেই পালাই কর্ম কিন্তু কিছুতেই তাকে ছাড়বে না। কর্ম ঠিক তার পেছনে পেছনে যাবে। লোকে যখন ঘুমিয়ে থাকে তার কর্মও তার পাশে শুয়ে থাকে।

একটা গল্প আছে। কোন এক শহরে একজন শেঠ ছিল। হঠাৎ তার এক বিশ্বস্ত চাকর এসে বলছে ‘হুজুর আপনার ঐ ঘোড়াটা আমাকে এফুণি দিন’। ঘোড়াটা বিশেষ ঘোড়া, কারণ খুব জোরে দৌড়াতে পারে। শেঠ জানতে চাইছে ঘোড়া নিয়ে তুমি কি করবে। চাকর বলছে ‘আপনি জানেন না, মৃত্যু আমার পেছনে লেগে আছে, আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে তাই আমি এফুণি এখান থেকে পালিয়ে বর্ধমান চলে যেতে চাই। তাহলে মৃত্যু আমাকে আর ধরতে পারবে না’। শেঠজী বলে দিলেন ‘ঠিক আছে ঘোড়াটা নিয়ে চলে যাও’। শেঠজী বাগানে পায়চারী করছিল তখন তার মৃত্যুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। মৃত্যুকে শেঠজী বলছে ‘এই তুমি আমার লোককে ভয় দেখাচ্ছ কেন’? মৃত্যু বলল ‘না, আমি তো তাকে ভয় দেখাইনি’। ‘ভয় দেখাওনি মানে, তোমার ভয়ে সে বর্ধমান পালিয়ে গেছে’। ‘ও! তাই বলুন, ওর জন্য আজ এই সময়ে আমার বর্ধমানে অপেক্ষা করার কথা। আমি তাই ভাবছিলাম লোকটা এখানে আছে কেন’। ভয় দেখিয়ে ওকে বর্ধমানে পাঠান হয়েছে কারণ ওর মৃত্যু লেখা আছে বর্ধমানে। বর্ধমানে ওর মৃত্যু অপেক্ষা করছে, ওখানে পৌঁছাবে আর মারা যাবে। এটা একটা গল্প, এগুলোকে আক্ষরিক অর্থে নিতে নেই। কিন্তু এই ভাব সব ধর্মে আছে, মৃত্যু তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। কোথায় অপেক্ষা করছে? বর্ধমানে। কিন্তু তুমি থাক কলকাতায়। তোমার মৃত্যুর আর বেশী সময় নেই। তোমাকে এখন এমন কিছু একটা করে দেবে, এখানে যেমন ভয় দেখিয়ে দিল, তাকে দৌড় করিয়ে বর্ধমানে নিয়ে গেল। সেইজন্য বলছেন *সুশীলমপিধাবন্তম্* যতই পালাও মৃত্যু তোমার সাথে লেগে আছে। বাংলায় বলে যাব কোথায়? নেপাল! সঙ্গে যাবে কপাল। তোমার কর্ম তোমাকে কিছুতেই ছাড়বে না। ঠাকুরও বলতেন – কে জানো বাপু, আগের জন্মে দানটান করা থাকলে এই জন্মে একটু সমৃদ্ধি হয়’।

বলছেন, যখন সে ঘুমোয় সেও তার সঙ্গেই ঘুমোয়। আমি যেখানেই ঘুমোই না কেন, কখনই মনে করতে পারব না যে আমি একা ঘুমিয়ে আছি। আমি ছাদে ঘুমোই আর জঙ্গলে একা ঘুমোই আমার কর্মফলও আমার সাথে গুণে আছে। তাই বলছেন যখন সে দাঁড়ায় সেও দাঁড়ায়, যখন বসে সেও বসে আর যখন চলতে থাকে ছায়ার মত তার সঙ্গে চলতে থাকে। পূর্ব পূর্ব জন্মে যা কিছু করেছ সব তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলছে। *স্বকর্মফলনিষ্কপং বিধানপরিরক্ষিতম্। ভূতগ্রামমিমং কালঃ সমন্তাৎ পরিকর্যতি।* ১৩/১৭৫/১১। এখানে বিশেষ শব্দটি হল বিধান, সংস্কৃতে এই ধরণের শব্দকে অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বিধানের অর্থ হয় যে নিয়মটা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, বিধাতা যা করে দিয়েছেন তাকে বলা হয় বিধান। বিধানকে অনেক সময় বলা হয় অদৃষ্ট, লোকে যেমন বলে আমার অদৃষ্টে ছিল বা কপালে ছিল। অদৃষ্টের কাছে সব কিছু গচ্ছিত রাখা থাকে, সেগুলোকে সে সব সময় সামলে রাখে। আপনি আমাকে একটা জিনিষ দিয়ে বললেন ভাই আমার এই জিনিষটাকে সামলে রেখো। আমিও সামলে রাখলাম। কিছু দিন পরে আপনি ফেরত চাইলে আমি ফেরত দিয়ে দিলাম। আমরা যা কিছু কর্ম করছি তার সব ফল বিধাতা, যাঁর নিয়মাদি আছে, তাঁর কাছে সুরক্ষিত থাকে। কোনটাই বৃথা যাবে না। এই কর্মফলটা যখন পাওয়ার সময় হবে তখন তিনি আমাকে দিয়ে দেবেন, এই নাও তোমার জিনিষ তোমাকেই দিলাম। পাওয়ার সময়টা কখন আসবে আজ পর্যন্ত কেউ পরিষ্কার করে বলতে পারেনি। সেইজন্য এটা হয়ে যায় মডেল। যদি বলে দিত এই ধরণের কর্ম এই সময়ে বেরিয়ে আসে তাহলে কিন্তু এটা আর মডেল হবে না, এটাই হয়ে যাবে নিয়ম। আমরা বলি বটে Law of Karma আসলে তা হয় না, এটা Theory of Karma। Theory of Karma এই জন্য বলা হয় কারণ তার একটা অঙ্গকে জানা যায় না। বাকি সব কিছু ঠিক আছে শুধু একটা অঙ্গ নিরুত্তর থেকে যায়। তবে সাধারণতঃ দেখা যায় যখন বাজে কর্ম চলতে থাকে তখন সবটাই তার বাজে চলতে থাকবে। যখন ভালো চলে তখন সবটাই ভালো চলতে থাকে। মানুষের যেমন কর্মফল থাকে তেমনি দেশ, সমাজ, রাজনৈতিক দল সবারই কর্মফল থাকে। হিন্দু সমাজেরও একটা কর্মফল আছে মুসলমান সমাজেরও কর্মফল আছে। যে যে রকম কাজ করেছে সেই রকম তার ফলটাও জমতে থাকে। কখন সেই ফলটা বেরিয়ে আসবে কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু একটা বাজে কর্ম করার পর তার ফলটা যদি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে তার কপাল খুব ভালো। যারা অত্যন্ত নিম্ন প্রকৃতির লোক তারা অনেক রকম বদমাইশি করে যাচ্ছে কিন্তু ধরা পড়বে না। পাখি যেমন ডিমে তা দেয়, ওর কর্মফল গুলিকে এখন তা দেওয়া হতে থাকবে। যখন বেরোবে তখন ফেটে জলের তোড়ের মত বেরোতে থাকবে। আমি কোন ভুল কাজ করতে যাচ্ছি তখনই যদি কেউ আমাকে আটকে দেয়, আপনি এটা করবেন না। বুঝতে হবে আমার কপাল খুব ভালো। কিন্তু বাকিরা যদি বলে, কি আছে আপনি করুন না, কেউ বারণ করবে না, সবাই করছে আপনিও করুন, তখন বুঝতে হবে আমার কপালটা খুব মন্দ। আবার আমি খারাপ কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু ধরা পড়ছি না, তাহলে বুঝতে হবে আমার কপাল মন্দ। আরও করে যাচ্ছি কিছু দিন ধরে আর আমি ধরাও পড়ছি না, বন্ধু বান্ধব কেউ টের পাচ্ছে না। তারপর একদিন আমার শুভকর্মের



কোটাটা শেষ হয়ে যাবে। যখনই শেষ হয়ে যাবে তখন বাকি যা কিছু অশুভ কর্মের ফল জমা আছে সব এবার তেড়েফুড়ে বেরোবে। এটাই কর্মবাদের নিয়ম।

যদি কেউ বেদান্তকে অনুসরণ করে লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চায় তাহলে কর্মবাদ তাকে মানতেই হবে। কেউ যদি বলে আমি বেদান্ত মানি কিন্তু কর্মবাদ মানি না, তা বললে চলবে না। বেদান্ত মানেই কর্মবাদ, কর্মবাদ ছাড়া বেদান্ত চলতে পারবে না। কর্মবাদ মানা হল বিধাতার কাছে সব ফল সুরক্ষিত থাকে। অদৃষ্ট যখন কিছু পাঠাতে শুরু করে তখন সেটাকেই বলে ঠাকুরের ইচ্ছা। ভগবান নিজে থেকে কিছুই করেন না, তিনি একেবারে নিরপেক্ষ। সুইচ্ছা অন করলে পাখা ঘুরবে আর সুইচ্ছা অফ করে দিলে পাখা আর চলবে না। বিদ্যুৎ এখানে কারুর প্রতি পক্ষপাত করছে না, যেমনটি আমি কর্ম করেছি সেই রকমই আমার কাছে চলে আসবে। কর্মবাদের এটাই মৌলিক নিয়ম। যেমন ফুল ফল এগুলোকে বেরিয়ে আসার জন্য কোন প্রেরণা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। সময় হলে ঠিক বেরিয়ে আসবে। ঠিক তেমনি কর্মকে কখনই প্রেরণা দিতে হয় না, ঠিক সময় হলেই ফলবে। কিন্তু আমি যদি একটু সার জল দিয়ে দিই তাহলে গাছে ফুল ফলটাও তাড়াতাড়ি আসতে থাকে। ঠিক তেমনি যদি ঠাকুরের নাম-জপ-ধ্যান করা হয় তখন ভালো কর্মগুলো একটু আগে বেরিয়ে আসে, এছাড়া আর কিছু হয় না। আমি যদি মনে করে থাকি ঠাকুরের নাম নিতে শুরু করলাম আর আমার কাঁড়িকাঁড়ি টাকা এসে যাবে, বাড়িতে বসেই সব সুযোগ এস যাবে। তা কিন্তু হব না। আমার ঠিক ততটুকুই হবে যেটা আমার কর্মে আছে, একটু আগে না হয় একটু পরে। সেইজন্য বলা হয় ঠাকুরের কাছে কিছু চাইতে নেই। কারণ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতেই আমার ভালো যা কিছু ছিল সব বেরিয়ে আসতে শুরু করে দিল, আমি ভাবলাম ঠাকুরের নাম করে আমার বেশ ভালোই হচ্ছে। কিন্তু মন্দ গুলো কোথায় যাবে? ভালো যা কিছু ছিল সব বেরিয়ে মন্দগুলোই থেকে গেল। এরপর মন্দ যা কিছু আছে সব যখন তোড়ে বেরোতে শুরু করবে তখন মাথা ঘুরে যাবে। ঐ মন্দগুলোকে সহ্য করার ক্ষমতা থাকা চাই। সেইজন্য বলা হয় ঠাকুরের কাছে জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য ছাড়া আর কিছু চাইতে নেই। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলেই ফল দেবে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে যে ফল দেবে না তা নয়, তিনি ঐটাই দেবেন যেটা আমার জমা আছে। কারণ ভগবানেরই একটি রূপ বিধাতা। এর আগে আমরা শ্রীকৃষ্ণের চারটি রূপ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ এক রূপে বদ্রিকাশ্রমে নারায়ণ ঋষি হয় মানব কল্যাণের জন্য তপস্যা করছেন, দ্বিতীয় রূপ কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের রথের সারথি হয় অর্জুনকে নির্দেশ দিচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয় রূপ তিনি ক্ষীরসাগরে অনন্তশায়রে ভগবান নারায়ণ রূপে যোগে আছেন। যখন দেবতারা, মুনি ঋষিরা প্রার্থনা করেন তখন তিনি শরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হয়ে ভক্তদের ইচ্ছা পূরণ করেন। আর চতুর্থ রূপে তিনি বিধাতা। বিয়ে বাড়িতে একজন কর্তা থাকেন, তিনি কিছুই করেন না কিন্তু তিনি সুপারভাইজার আছেন বলে সবাই কাজ করে যাচ্ছে। বিধাতা কারুর উপর কোন পক্ষপাতিত্ব করেন না। ভক্তিশাস্ত্র আর বেদান্তের সঙ্গে এইখানে এসে অনেক ঝামেলা সৃষ্টি হয়। ভক্তিশাস্ত্র ভগবানকে কখনই সীমিত করবে না, যে ভগবানের ক্ষমতা নেই সেই ভগবান কিসের ভগবান। কিন্তু বেদান্তের ভগবান সীমিত ভগবান নন, বেদান্তের ভগবান নিরপেক্ষ। ফুটবল খেলার রেফারির মত, তুমি ফাউল করেছ তোমার বিরুদ্ধে ফ্রীকিক নেওয়া হবে। তিনি আছেন বলেই ঐ ফ্রীকিকটা হবেই হবে, এটাকে কেউ আটকাতে পারবে না। আমরা মনে করছি রেফারি ফ্রীকিক দিয়েছে, রেফারি কেন দেব, তুমি দোষ করেছ তোমার বিরুদ্ধে ফ্রী কিক নেওয়া হবে, তুমি গোল করেছ তোমার সুনাম হবে, তুমি গোল করলে রেফারির সম্মান হবে না। বিধাতা ঠিক এই রকম নিরপেক্ষ, এটি ভগবানেরই একটা রূপ। এখন প্রার্থনা করলে বিধাতা আমার ভালোটাকে একটু আগে ঠেলে দেবেন। কিন্তু মন্দটা যাবে কোথায়? ওটাতো জমা আছে, ওর তো নাশ হবে না। বাড়িতে যখন কোন শুভ কাজ হয় তখন প্রার্থনা করা হয় ‘হে ঠাকুর! এই কদিন যেন কারুর শরীর খারাপ না হয়, কোন ঝামেলা যেন না হয়’। তারপর দেখা যাবে কাজটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। যেদিন শেষ হয়ে গেল তারপরের দিনই দেখা যাবে কেউ না কেউ প্রচণ্ড শরীর খারাপ হয়ে বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে গেছে। শুভকর্ম ছিল বলে প্রার্থনা করার জন্য শরীর খারাপ হওয়াটাকে আটকে ছিল। কিন্তু খারাপ হওয়াটা কোথায় যাবে? শুভ কাজটা নির্বিঘ্নে শেষ হতেই শরীর খারাপ যেটা হওয়ার কথা ছিল সেটা তেড়েফুড়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু আবার মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে এটাও একটি মডেল। সব সময়ই একই রকম নাও হতে পারে, তবে এগুলোর ব্যাখ্যা কেউ কখন দিতে পারবে না। কিন্তু এই মডেল জগৎকে খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে।

ভীষ্ম বলছেন সমান্শচাবমানশ্চ লাভালাভৌ ক্ষয়োদয়ো। প্রবৃত্তানি নিবর্তন্তে বিধানান্তে পুনঃ পুনঃ।। ১৩/১৭৫/১৩। মান-অপমান, লাভ-ক্ষতি, উন্নতি-অবনতি এগুলো সবই পূর্ব পূর্ব কর্মানুসারে মানুষের কাছে আসে, কিছু দিন থাকে, প্রারব্ধ ভোগে ক্ষয় হয় তারপর এরা নিজের মত বেরিয়ে চলে যায়। এর আগের আগের জন্মে আমি ভালো-মন্দ যাই করে থাকি না কেন তার ফলটা এখন মান-অপমান, লাভ-ক্ষতি, উন্নতি-অবনতি রূপে ভোগ হবে। আজকে যেটা করছি তার

ফল আগামীকাল পাব। উপনিষদ গীতা থেকে শুরু করে সমস্ত শাস্ত্র বারবার বলছে তুমি খেটে যাও, চুপচাপ বসে থাকবে না, কাজ করে যাও। তুমি যদি জগৎ থেকে কিছু পেতে চাও, মানে অর্থ ও কাম পেতে চাও তাহলেও তোমাকে খাটতে হবে, যদি ধর্ম লাভ করতে চাও তাও তুমি খেটে যায়, মোক্ষের জন্য যদি প্রযত্নশীল হতে চাও তাতেও তোমাকে খেটে যেতে হবে। কিন্তু দুটো জিনিষ কক্ষণ করবে না, একটা হল কখনই পাপকর্ম করবে না, নিষিদ্ধ কর্ম মানে যেটা শাস্ত্র নিষেধ করছে সেটা কখনই করবে না। কারণ পাপকর্ম যদি কর তাহলে আজ হোক কিংবা কাল হোক তোমাকে উল্টে ফেলে দেবে। আর দ্বিতীয় আলস্য কখন করবে না। গীতায় যে বলছে *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন*, এইটাই মূল কথা। এখন যে ফলটা পাচ্ছ সেটা আগের আগের কর্মের ফল পাচ্ছ, সেইজন্য এখন তুমি যে কর্ম করছ সেই ফলের কামনা তুমি কর না। *মা তে সঙ্গোহকর্মণি*, অকর্মে কখন যেন তোমার মন না যায়, আলস্যে কখন যেন তোমার মন না যায়। এই দুটো জিনিষ কখন করতে নেই একটা পাপকর্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম আর আলস্য।

আমরা যদিও বলি আমি পাপ-পুণ্য সব ত্যাগ করছি কিন্তু পাপ-পুণ্য সব ত্যাগ হবে না। পাপ-পুণ্য ত্যাগ করলেও কর্মের ফলটা আসবেই, ওটাকে আটকান যাবে না, সেইজন্য মনটাকে এই দুটো ব্যাপারেই উদাসীন করে দিতে বলা হয়। যখন অশুভ কিছু হচ্ছে তখন তা নিয়ে মন খারাপ করব না, ভালো কিছু যখন হচ্ছে তখন তার জন্য উৎফুল্ল হওয়ার কিছু নেই। তার কারণ, আমি যদি ভালো কিছু হওয়াতে উৎফুল্ল হই তার মানে ঐ জিনিষের প্রতি আমার আকর্ষণ আছে। যদি আকর্ষণ থাকে তার মানে, যেমনি আমার সুযোগ আসবে তখনই আমি ঐ ধরনের কাজ করতে শুরু করব এবং তারও ফল আসতে থাকবে। কিন্তু জগতে এমন কিছু কর্ম নেই যে শুধু ভাল ফলই দেয়। যে কর্ম ভালো ফল দেবে সেই কর্ম খারাপ ফলও দেবেই দেবে। যে কর্ম খারাপ ফল দেবে সেই কর্মও কিছু ভাল ফল দেবে। একমাত্র নিষিদ্ধ কর্মই শুধু বাজে ফল দেয়। ঠিক তেমনি যখন অশুভ কিছু ফল দিতে শুরু করল তখন আমি সেই অশুভ কর্ম থেকে পালাতে চাইব, পালাতে গিয়ে আবার অন্য ধরনের কর্ম তৈরী হবে। সেইজন্য বলা হয় অশুভ ফল যখন দেয় তখন তুমি সেখান থেকে পালাতে যেও না, আর শুভ ফল দেখে তাকে আঁকড়ে ধরতে যেও না। তবেই তুমি লক্ষ্যের দিকে এগোতে পারবে। এই কথাগুলো আমাদের শুনতে যেতে হয়, ভেতরে চৈতন্য জাগ্রত না হলে এগুলো ধারণা করা বা বোঝা যায় না। শুনে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। ঠাকুর বলছেন – সময় না হলে কিছু হয় না, তবে শুনে রাখা ভাল। আরেকটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শেষ কালে আমার মনই আমার সব থেকে শ্রেষ্ঠ গুরু। শাস্ত্র দিয়ে কিছু হবে না। শাস্ত্র শুধু আমার অশুদ্ধ মনটাকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে। পাপ-পুণ্য নেব কি নেব না, এটা শেষমেষ ঠিক করে দেবে আমার শুদ্ধ মনই, শাস্ত্র সেখানে কিছু করতে পারবে না। আমার মন যেটা বলছে সেটা শাস্ত্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, এর বেশী কিছু শাস্ত্র করবে না। শাস্ত্র কখনই বলবে না যে তুমি বল আমি এই ফল চাই না। কারণ তুমি যদি বল আমি এই ফল চাই না, তাও ঐ ফলটা আসবে। আমাকে শুধু বলতে হবে, শুভ অশুভ যা ফলই আসুক আমি উদাসীন। কাজ যখন করব তখন বলব আমার এটা কর্তব্য তাই আমি করছি। এখন আমি জানি এর কিছু ভালো ফলও আসবে আবার খারাপ কিছু ফলও আসবে। ধর্ম কাজ যখন করব, ধর্ম কাজ মানে অনুমোদিত কর্ম, যেমন ধর্মে বলছে আমি গৃহী, আমাকে একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা মানে আমাকে একটা বাড়ি বানাতে হবে। এখন আমি ধর্ম মতে পরিশ্রম অর্থ উপার্জন করলাম। সেই টাকা দিয়ে আমি একটা বাড়ি বানালাম, বাড়িতে নিত্য পূজো করছি। তারপর একদিন ঝড়ে বা ভূমিকম্পে বাড়িটা নষ্ট হয়ে গেল। এখানে আমার কিছুই করার নেই, এগুলো আমার হাতের বাইরে। তখন শাস্ত্র বলছে ঐ জায়গাটায় তুমি মন খারাপ কর না। এটা কখনই বলবে না যে, তোমার মন খারাপ হবে না, জানে যে তোমার মন খারাপ হবে। দু মিনিট পাঁচ মিনিট মন খারাপ হওয়ার যদি থাকে তবে তাই হোক। কিন্তু এরপর যদি আমি সারাটা জীবন কপাল চাপড়াতে থাকি আর বলি আমার কপাল কি মন্দ, আমি কি অভাগা, আমার সব গেল। শাস্ত্র এই সারা জীবন কপাল চাপড়াতে নিষেধ করছে, দু মিনিট পাঁচ মিনিট মন যা খারাপ হওয়ার হল, এরপর তুমি এগিয়ে চল। যে মানুষের জীবন দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ সেতো বলবেই এই দু পয়সার যেটা ভালো হবে যার জন্য এত কষ্ট তাই পাপ-পুণ্য দুটোই ত্যাগ করে দিলাম। এতে তার দুঃখ যাবে না, এর আগের আগের জন্মে কত পাপ করেছে তার দুঃখটা যাবে কোথায়! তবে দান-ধ্যান করলে পরের জন্মে টাকা-পয়সা হয় কিনা আমাদের জানা নেই, তবে যেটা হয় নিজের মনটা এই শোক-দুঃখের উপরে চলে যায়। দুঃখ কষ্ট তখনও আসতে থাকবে কিন্তু ঐদিকে মন আর যায় না। বাড়িতে দুই বছরের বাচ্চাকে আমি কোলে নিয়েছি সে আমার কান ধরে টানতে শুরু করেছে, এখন কি আমি ঐ বাচ্চার উপর রাগ করব! আবার আমি চুয়ান্ন নম্বর বাসে করে যাচ্ছি সেখানে একটা লোক যদি আমার নাকটা আচ্ছা করে নেড়ে দেয় তখন কি আমি তাকে ছেড়ে দেব! জগৎকে আমি কিভাবে দেখছি সেটাকে আগে বুঝতে হবে। জগতটাকে যদি চুয়ান্ন নম্বর বাসের মত দেখি তখন নাক আর কান কেউ টানলে কষ্ট পাব আবার জগতকে যদি একটা তিন বছরের শিশুর মত দেখি তখন সে কান টানলেও আমার কোন কষ্ট হবে না, এরা তো

শিশু। জগৎ যে রকম চলার সেই রকমই চলতে থাকবে শুধু আমার দৃষ্টিভঙ্গীটা পাল্টাতে হবে। এখানে আমাদের কি বলা হচ্ছে? এখন যে তোমার বাজে যে জিনিষগুলো হচ্ছে এগুলো সবই তোমার নিজের কর্মফল। সেইজন্য তোমার মনটাকে পরিবর্তন কর। আমাদের ঋষিরা এই যে কর্মফলের সিদ্ধান্তটা বার করেছেন, এগুলোকে যদি আমরা না মানি আমরা পাগল হয়ে যাব। কর্মফল, কর্মবাদের এই মডেলকে মেনে নিলে আমাদের জীবন শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আবার যদি মনে করি এটা তাঁর ইচ্ছা, ঠাকুরের এই রকম ইচ্ছাই ছিল তাই আমার এই রকম হয়েছে, এতেও মন শান্ত হয়ে যায়। যারা ভক্ত তারা সব সময় বলবে তাঁর ইচ্ছায় সব কিছু হয়, এতে যখন দুঃখ-কষ্ট হল তখন সেটা আরেকজনের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু যারা যোগী বা জ্ঞানমার্গের সাধক তারা বলবে এটা আমার জন্যই হয়েছে। এই মূল কথাটাই এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে।

ভীষ্ম বলছেন, বাছুর যেমন হাজারটা গরুর মাঝখানেও ঠিক তার মার কাছে পৌঁছে যায়, ঠিক তেমনি মানুষের কর্ম যত ভীড়ই থাকুক খুঁজে তার কাছেই পৌঁছে যায়। কর্ম থেকে বাঁচার কোন পথ নেই। আমি এখন মনে করছি আমি এত শাস্ত্র কথা শুনছি, সাধুসঙ্গ করছি আমাকে পাপকর্ম কিছু করতে পারবে না, কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়বে না ওর মধ্যেই সুযোগ বুঝে আমার কাছে পৌঁছে যাবে। এর আগেও আমরা এই উপমাটা নিয়েছিলাম এ/২/৩৭। করমণ্ডল এক্সপ্রেসে আমি চেন্নাই যাব। আমাকে একটা ছোট্ট চিরকুট দিয়ে বলে দিয়েছে এসি টু টিয়ারে বার্থ নম্বর ৩৭এ তোমার সিট রাখা আছে। হাওড়া স্টেশনে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়, শত শত ট্রেন চারিদিকে যাচ্ছে আসছে। আমি দেখছি করমণ্ডল এক্সপ্রেস অমুক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে, সেই ট্রেনের একটা কামরাতে লেখা আছে এ/২। ঐ ভীড়ে, ঐ হৈচৈএর মাঝখানে ঐ ট্রেনে ঐ কামরায় আমার বার্থ রাখা আছে, ওখানে আমি ছাড়া আর কেউ বসবে না। কর্মও ঠিক এই রকম, আমি যেখানেই থাকি না কেন আমার কর্ম ঠিক আমাকেই খুঁজে নিয়ে পৌঁছে যাবে। আগেকার দিন বলে বাছুর গরুর উপমা দিয়েছেন, এখন শহরের লোকেরা গরুও দেখতে পায়না বাছুরও দেখতে পায়না, তাই এই এ/২/৩৭ এর উপমা দেওয়া হল।

যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম বলছেন *অলমনৈরুপালন্তেঃ কীর্তিতৈশ্চ ব্যতিক্রমৈঃ। পেশলধগনুরুপধঃ কর্তব্যং হিতমাত্মনঃ।* ১১৩/১৭৫/২০। উপালম্ব, মানে অপরকে যে আমরা দোষ দিই, এটা তুমি কখনই কর না। আর অন্যের অপরাধ, খারাপ কাজ নিয়ে চর্চা করতে নেই। যে কাজ সুন্দর, সুষ্ঠু, অনুকূল মানে নিজের এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করেছে, যে কাজ নিজের জন্য হিতকর মনে হয়, শুধু সেই কাজই করবে, এর বাইরে আর কোন কাজ করতে যেও না। জীবনে বাজে কিছু হলেই আমরা ঠাকুরের কাছে কপাল ঠুকতে থাকি, হে ঠাকুর তুমি একি করলে! আমরা এখানে ঠাকুরকে দোষ দিচ্ছি কিন্তু অপরকে উপদেশ দেওয়ার বেলায় বলি তোমার কপালে ছিল তাই এই রকম হয়েছে। তোমার এই গোলমালটা কেন হয়েছে? তোমারই দোষে হয়েছে। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই কথাই বলছেন, অপরকে উপালম্ব দেবে না। ঠাকুর কিছু করেননি, তিনি বিধাতা, তিনি নিরপেক্ষ।

শান্তিপর্বে এই ধরণের অনেক আলোচনা আছে, আমরা এখানে কর্মবাদের আলোচনা করলাম। শান্তিপর্বে বর্ণাশ্রম ধর্মের অনেক আলোচনা করা হয়েছে। জীবনকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে স্বর্গে প্রচুর সুখ, নরকে প্রচুর দুঃখ আর মর্ত্যলোকে সুখ আর দুঃখ মিশিয়ে থাকে। একমাত্র ব্রহ্মপদই সুখ-দুঃখের পার। আত্মজ্ঞানে যে সুখ নেই তা বলা হচ্ছে না, আত্মজ্ঞানে শুধুমাত্র নির্মল শুদ্ধ আনন্দ, একে সুখ বলা হয় না। আনন্দ আর সুখ এই দুটোতে তফাৎ আছে। আমি একটা মিষ্টি খেলাম বা গরমের সময় ঠাণ্ডা শরবৎ খেলাম, এতে একটা ইন্দ্রিয় সুখ হল। আবার আমি একটা খুব সুন্দর কবিতা পড়লাম বা খুব সুন্দর একটা নৈসর্গিক দৃশ্য দেখলাম তখন ভেতর থেকে একটা আনন্দ হয়। এই দুটোতে তফাৎ আছে, আনন্দ সব সময় ভেতর থেকে আসে, সুখ সব সময় বাইরে থেকে আসে। স্বর্গে যেটা হয় সেটাকে সুখ বলা হচ্ছে আর ব্রহ্মজ্ঞানে বা ঈশ্বর দর্শনে যে আনন্দটা হয় সেটা ভেতর থেকে আসে। এছাড়া শান্তিপর্বে মানুষের শিষ্টাচার কেমন হবে সেই সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। মনুস্মৃতিতে এই জিনিষটাকে আরও বিস্তৃত এবং অনেক গুছিয়ে বলা হয়েছে।

### দৈনন্দীন জীবনে আচার

এখানে বলছেন *আচারস্য বিধি*, আচারটা কি রকম হবে। আচারের বিরাট লম্বা এক তালিকা দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি হল, যেমন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শৌচাদি নিয়মিত ঠিক ভাবে করবে, দাঁত মাজা, মুখ ধোওয়া, স্নান করা, কাপড় কাচা। আমাদের দেশে আগেকার দিনের সবাই যে পোষাক আজকে পড়ছেন সেটা আগামীকাল না কেচে

পড়তেন না। শরীরের সংস্পর্শে যে পোষাক এসছে দ্বিতীয় দিন না ধুয়ে সেই পোষাক কখনই পড়তে নেই। যার জন্য বিদেশীরা যখন ভারতে প্রথম এসেছিল তাদের ভারতীয়রা খুব ঘৃণার চোখে দেখত। বিদেশীরা শীতের দেশের লোক বলে তারা উলের জিনিস বেশী পড়ে, উলের জিনিস রোজ কি করে ধোবে! ব্রাহ্মণরা ধুতি পড়ত সেটাকে কেচে দিয়ে আরেকটা ধুতি পড়ে নিতেন। আমাদের শাস্ত্রেই বলা আছে যে উলের পোষাক আর তুলোর জিনিস কখন অপবিত্র হয় না, মানে রোজ কাচতে হবে না। কিন্তু সুতির কাপড় গুলো অপবিত্র হয়। স্নান করার পর একেবারে শুদ্ধ বস্ত্র পড়ে বেরোতে হয়। আমার ভেতরে যে ধর্মভাবটা বৃদ্ধি পাবে সেটা অনেকটাই এই শৌচের উপর নির্ভর করে, ধর্মের উন্নতিতে শৌচ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। হিন্দুধর্মে শৌচকে খুব গুরুত্ব দেয়, ইসলাম ধর্মেও শৌচ আছে, যখন মুসলমানরা নমাজ পড়তে যাবে তখন হাত, পা, মুখ খুব ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নেবে। গুরুদ্বারে প্রবেশ করার সময় পা সব সময় জলে ডুবিয়ে ভেতরে যেতে হয়। খ্রীস্টান ধর্মে শৌচের ব্যাপারটা একেবারেই নেই। জুতো পরেই চার্চে যাবে, সেই জুতো পরেই প্রার্থনাও সঙ্গীত করবে। সেইজন্য হিন্দুরা এগুলোকে একেবারেই সহ্য করতে পারত না। এরপর বলছেন নিত্য স্নান করবে। আধ্যাত্মিক জীবনে যাঁরা যান তাঁদের নিত্য স্নান অবশ্যই করতে হবে। এরপর বলছেন নিজের যে অধিকার তার উপর উপাসনা করবেই করবে। এখানে অধিকার মানে, গুরু আমাকে যে রকমটি নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন। যে যেমন দেবতাদের পছন্দ করে সে সেই সেই দেবতাদের অবশ্যই পূজা করবে। এই কটি আচরণকে ভীষ্ম বলছেন এগুলো হল মানব মাত্রেরই ধর্ম। সবাইকে এগুলো করতে হয় – শৌচ, তর্পণ আর উপাসনা। তর্পণ বলতে এখানে দেবতাদের পূজা করা আর উপাসনা জপ-ধ্যান করা। ভীষ্ম বলছেন, সূর্যোদয় হয়ে যাওয়ার পর আর কোন মতেই শুয়ে থাকা চলবে না আর দুই বেলাই সন্ধ্যা উপাসনা আর গায়ত্রী জপ করবে। এগুলো যাঁরা করেন তাঁর নিষ্ঠার সঙ্গেই করেন, যেমন মুসলমানরা দিনে পাঁচবার নমাজ পড়বেই পড়বে। এখানে আমি পাঁচবার নমাজ পড়ছি কি দুবার গায়ত্রী জপ করছি সেটা কোন গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল মনকে শুদ্ধ করা। মন চাইছে বিশ্রাম করতে, আলস্যে মন এলিয়ে দিতে চায়, পাপ কাজের দিকে মন যেতে চায়, তখন মনকে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। তোমার এই সময় পূজা করার কথা তুমি পূজাই করবে।

এই রকম আচারের অনেক কিছু বলা হচ্ছে, এর মধ্যে একটা হল খাবারের আগে শরীরের পাঁচটা অঙ্গকে ধৌত করবে। দুটো হাত, দুটো পা আর মুখ খুব ভালো করে ধোবে। আগেকার দিনে সবাই খালি পায় চলাফেরা করত বলে পায়ে প্রচুর ধুলো কাদা লেগে থাকত আর আসনে বসে খাওয়া হত বলে পা খুব ভালো করে ধোওয়াটা বাধ্যতামূলক ছিল। গ্রামে গঞ্জে এখনও খাবার আগে পা ধোবেই। খাওয়ার সময় পূর্বদিকে মুখ করে বসবে। খাওয়ার সময় মৌন থাকবে। ব্রাহ্মণরা এই নিয়মটা খুব কঠোর ভাবে পালন করতেন। তোমাকে যে কিছু খাদ্য সামগ্রী পরিবেশন করা হয়েছে সেগুলোর কখন নিন্দা করবে না। তৈত্তিরীয় উপনিষদেই মন্ত্র আছে অন্নং ন নিন্দ্যাৎ তদ্ব্রতম্। খাবার পর খুব ভালো করে হাত মুখ জল দিয়ে ধৌত করবে। আজকাল যেখানে বুফে সিস্টেমে খাওয়া দাওয়া হয় সেখানে পেপার ন্যাপকিন দিয়ে দেওয়া হয় তাই দিয়ে হাত মুখ মুছে সবাই চলে আসে। শাস্ত্র এটা করতে নিষেধ করছে। বলছেন, রাত্রে যখন বিছানায় ঘুমোতে যাবে তখন ভেজা পা নিয়ে কখন বিছানায় যাবে না। স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে এই কথা বলা হচ্ছে, পায়ে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে আর বিছানাটাও ভিজ়ে যাবে। আবার অন্য দিকে বলছেন পা না ধুয়ে কখনই ঘুমোবে না। একদিকে বলছেন পা না ধুয়ে ঘুমোতে যাবে না আবার অন্য দিকে বলছেন পা যেন ভেজা না থাকে। পাটা ধুয়ে মুছে নেবে। অতিথিকে কখন না খাইয়ে ছাড়বে না। সূর্যোদয়ের সূর্যের দিকে তাকাবে না। এর মধ্যে কিছু কিছু স্বাস্থ্য বিষয়ক, কিছু আছে শরীর মনের শুদ্ধতার বিষয়ে আর কিছু আছে নৈতিক ব্যাপারে।

### শরীরের উপর পাপকর্মের প্রতিক্রিয়া

এখানে একটি খুব বিতর্কিত শ্লোক আছে অনেকে বলে এই শ্লোকটির জন্য আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। হৃদয়ং পাপবৃত্তানাং পাপমাখ্যাতি বৈকৃতম্। জ্ঞানপূর্বং বিনশ্যন্তি গৃহমানা মহাজনে। ১৩/১৮৬/২৬। পাপী যে পাপ কাজ করছে আর তাতে তার হৃদয়ে, তার চোখে মুখে যে বিকৃতি হয়, সেই বিকৃতিই বলে দেয় সে কি ধরণের পাপ করেছে। আবুল ফজল যিনি একজন খুব নামকরা লেখক ছিলেন, আকবরের সময়ে তিনি তিনটে মোটা মোটা বই লিখেছেন যার নাম ‘আকবরনামা’। সেখানে তিনি শাহেনশা আকবরের ব্যাপারে যেমন লিখেছেন তেমনি হিন্দুদের আচার প্রথা নিয়েও অনেক কথা লিখেছেন। আবুল ফজল একটা বিরাট তালিকা দিয়ে দেখাচ্ছেন যে হিন্দুরা যেকোন রোগের ব্যাপারে কিভাবে বলে দেয় যে আগে এই এই পাপ করেছিল বলে এই এই রোগ হয়েছে। পাতার পর পাতা এই নিয়ে লিখেই গেছেন। তুমি যদি এই পাপ করে থাক তাহলে সামনের জন্মে তোমার এই রোগ হবে, বা যদি দেখে কোন রোগ

হয়েছে তখন বলবে গত জন্মে তুমি এই পাপ করেছ বলে এই রোগ হয়েছে। এই পাপের ফলে এই রোগ থেকে বাঁচতে হলে তোমাকে এই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কুষ্ঠ রোগ পাপের মধ্যেই পড়ত। এখানে এইটাই বলছেন, শরীরের কোন অঙ্গ যদি বিকৃত থাকে, ট্যারা, বোবা, কানা, খোঁড়া যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে তোমার কোন পাপকর্ম আছে। যারা জেনেশুনে মহাপুরুষদের কাছে নিজের পাপটাকে লুকিয়ে রাখে তাদের আরও পতন হয়। এইজন্য খ্রীশ্চানদের মধ্যে এই স্বীকারোক্তির প্রথা আছে, খ্রীশ্চানরা যদি কোন দোষ করে তখন তাদের চার্চে ফাদারের কাছে গিয়ে বলতে হয় আমি এই দোষ করেছি। যারা মুর্থ তারাই পাপটাকে লুকিয়ে বেড়ায়, তারা জানে না যিনি বিধাতা তিনি সব কিছু জানতে পারেন।

### পাপ লুকালে পাপ বাড়ে, লুকিয়ে ধর্ম করলে ধর্ম লাভ ত্বরান্বিত হয়

এর পরের শ্লোকটিও খুব মূল্যবান শ্লোক। *পাপেনাপিহিতং পাপং পাপমেবানুবর্ততে। ধর্মেণাপিহিতো ধর্মো ধর্মমেবানুবর্ততে।* ধার্মিকের কৃতো ধর্মো ধর্মমেবানুবর্ততে। ১৩/১৮৬/২৮। পাপী যখন তার পাপকে লুকোয় তখন তার পাপ বাড়তে থাকে, কারণ এই পাপ তাকে আরও পাপের দিকে নিয়ে যায়। অন্য দিকে ধর্ম যখন লোকচক্ষুর আড়ালে করা হয় সেটাই তখন আরও ধর্মের দিকে নিয়ে যায়। যে জিনিষটাই আমরা লুকিয়ে করি সেই জিনিষটাই বাড়তে থাকে, সেইজন্য বলা হয় জপ-ধ্যান সব সময় লুকিয়ে করতে হয়, কাউকে জানতে দিতে নেই। তখন জপ-ধ্যানটাও বেশী হতে থাকবে। পাপের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, পাপ যখন লুকিয়ে করতে থাকে তখন পাপটা বাড়তে থাকে। যে কোন জিনিষই, সাহিত্য রচনা, সঙ্গীত সাধনা, পেইন্টিং যদি লুকিয়ে করা হয়, কাউকে জানতে না দেওয়া হয়, ঐ বিষয়ে তার শক্তিটা বেড়ে যায়। যদি লুকিয়ে দান করা হয় দান করার শক্তিটাও বেড়ে যাবে। সেইজন্য বলা হয় শুভকর্ম সব সময় লোকচক্ষুর আড়ালে করতে হয় আর অশুভ কর্মে প্রকাশ্যে করতে হয়। অশুভ কর্ম প্রকাশ্যে করতে হলে ঐ কর্মের দিকে তখন প্রবৃত্তিটা যাবে না। এবার শেষ কথা বলতে গিয়ে ভীষ্ম বলছেন মণীষিরা বলেন সমস্ত প্রাণির প্রতি মন থেকে তুমি যেটা করছ সেটাই তোমার আসল ধর্ম। সেইজন্য যুধিষ্ঠির মনের ব্যাপারে তুমি খুব সাবধান থাকবে। ঠাকুর বলছেন – গৃহস্থরা মনে ত্যাগ করবে কিন্তু সন্ন্যাসী মনেও ত্যাগ করবে বাইরেও ত্যাগ করবে। কিন্তু আসল জিনিষটা হল মন। মনটা কোন দিকে আছে দেখতে হবে। মনটা অশুভ কর্মের দিকে না শুভ কর্মের দিকে। ঠাকুর তাই গৃহস্থের জন্য বলে দিলেন মনে ত্যাগ করতে। যখন বাজে কাজের দিকে যেতে হচ্ছে তখন ঠাকুরকে বলতে হয় ‘হে ঠাকুর আমাকে কি পরিস্থিতিতে ফেলে দিলে আমাকে কেন এই কাজ করতে হচ্ছে?’ ঠাকুরই তখন তাকে আস্তে আস্তে সেই পরিস্থিতি থেকে সরিয়ে নেবেন। মনই হল শেষ কথা। বাইরে আমরা কি করছি, ধর্ম, কর্ম, শুভ অশুভ যাই করি না কেন কোন দাম নেই, মুখে কি বলছি কোন দাম নেই, আমার মন আসলে কি চাইছে দেখতে হবে। মনটাকে তাই সব সময় শুদ্ধ রাখতে হয়। যদি কোন পরিস্থিতির চাপে বা শারীরিক কোন দুর্বলতার জন্য কোন বাজে নিকৃষ্ট কাজে যুক্ত হয়ে পড়ি, কিন্তু মন যদি পরিষ্কার থাকে, তাহলে প্রকৃতিই আস্তে আস্তে তাকে ওখান থেকে টেনে সরিয়ে দেবে। আবার এটাও আছে, যে শাস্ত্র কথা শুনছে, শুনতে ভালোও লাগছে কিন্তু বুঝতে পারছে যে সে দেহ দিয়েও পাপ করে আর মনটাও পাপের দিকে চলে যাচ্ছে। সে হয়তো অফিসে কাজ করতে গিয়ে ঘুষ নেয় আবার মনেও তার লোভ আছে যে কিছু টাকা হলে ভাল হত কিন্তু শাস্ত্রের কথা শুনে সে বুঝতে পারছে ঘুষ নিতে নেই। তখন তাকে ঠাকুরের কাছে মাথা ঠুকে ঠুকে বলতে হয় হে ঠাকুর আমার মন থেকে এই লোভটা দূর করে দাও। তখন ধীরে ধীরে তার লোভের বৃত্তিটা কমতে কমতে এক সময় একেবারেই শেষ হয়ে যায়। লোভের বৃত্তিটা যখন শেষ হয়ে গেলে তখন দেহ দিয়ে বাইরে যে খারাপ কাজটা করছিল সেটাও বন্ধ হয়ে যায়।

### অধ্যাত্ম ও ধর্মের প্রভেদ

যুধিষ্ঠির আবার প্রশ্ন করছেন ‘শাস্ত্রে আমরা এত অধ্যাত্মের কথা শুনছি, এই অধ্যাত্ম জিনিষটা কি?’ এখানে দুটো পরিভাষা নিয়ে আসা হয়েছে, একটা হল ধর্ম আরেকটি অধ্যাত্ম। খুব সহজ ভাষায় ধর্ম হল আমি যখন ভগবানকে ধরার চেষ্টা করছি আর অধ্যাত্ম হল ভগবান যখন আমাকে ধরে নেন। ধর্মের ব্যাপারে ভগবানকে যে ভাবেই ধরা হোক না কেন এটাকে বলা হয় বৈধী ভক্তি। বিধি থেকে বৈধী এসেছে, যেখানে বিধি নিষেধকে মেনে কিছু জিনিষ পালন করা হচ্ছে, যেমন আমরা রোজ মন্দিরে যাচ্ছি, সকাল বিকেল জপ করছি, গঙ্গাজল পান করছি, তুলসীপাতা খাচ্ছি আর মুসলমানরা বলে দিনে পাঁচবার নমাজ পড়বে, দান করবে। খ্রীশ্চানরা বলে রোববার রোববার চার্চে যাবে। তারপর মালা জপা, যেটা সব ধর্মেই আছে, এগুলো সব ধর্ম। অধ্যাত্মে সব সময় রাগাত্মিকা ভক্তি থাকে। রাগাত্মিকার অর্থ হল ভালোবাসা। বৈধী ভক্তি করে করে একদিন হঠাৎ দেখতে পায় ঈশ্বরের প্রতি তার একটা প্রগাঢ় ভালোবাসা জন্মে গেছে। ঈশ্বরের প্রতি এই রাগাত্মিকা ভক্তি এসে গেলে তার আর কোন কিছু করতে ভালো লাগেনা তখন বৈধী ভক্তি উড়ে যায়। ইচ্ছে করলে তারাও বৈধী ভক্তি

পালন করতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসার এমন ঝড় আসে সেই ঝড়ে সব কিছুই খড়কুটোর মত উড়ে যায়। তখন আধ্যাত্মিক সত্তা তাঁকে ঈশ্বরই বলা হোক বা যে কোন ইষ্ট দেবতাই হোক, তিনি যেন তাকে ধরে নেন, এইটাই অধ্যাত্ম। অধ্যাত্ম আর ধর্মের এইটাই মূল পার্থক্য। যখন বাহ্যিক আচরণ করা হয় তখন তাকে বলা হয় ধর্ম আর মানুষ যখন ঐ ধর্মের পেছনে যে তত্ত্ব আছে সেটাকে জানার প্রচেষ্টা করে তখন সেটাই অধ্যাত্ম হয়ে যায়। আমি যখন মন্দিরে যাচ্ছি, চরণামৃত পান করছি তখন আমি তত্ত্বকে জানার চেষ্টা করছি না। টিয়া পাখির মত করে যাচ্ছি। কিন্তু যখন তত্ত্বকে জানার চেষ্টা করছে তখন ঐটা অধ্যাত্ম হয়ে যায়। এই জগৎ কোথা থেকে সৃষ্টি হয়েছে আর কোথায় এই জগৎ যায়, এই জগতে আমি কেন এলাম, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব এই প্রশ্নগুলো যখন ভেতরে নাড়া দিতে থাকে তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ভাব জাগ্রত হচ্ছে।

### সৃষ্টির ব্যাপারে মহাভারতের চিন্তাধারা ও সত্ত্ব, রজো ও তমো গুণানুসারে জীবের স্বভাব

আমাদের শাস্ত্রে যত রকমের সৃষ্টির কথা আছে মহাভারতে সব রকম সৃষ্টির বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। এই কারণে মহাভারতে সৃষ্টির ব্যাপারে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে গিয়ে অনেক সংশয় হয়ে যায়। সৃষ্টির ব্যাপারে হিন্দুদের যেটা সব থেকে গ্রহণযোগ্য ধারণা তার মধ্যে পাঁচটি তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে – ভূমি, অপঃ, অগ্নি, বায়ু আর আকাশ। ভগবান যখন সৃষ্টি করেন তখন তিনি প্রথমে এই পাঁচটি তত্ত্বকে জন্ম দেন। এই পাঁচটি তত্ত্ব একে অপরের সাথে মিশতে মিশতে পুরো সৃষ্টিটা বেরিয়ে আসে। এখানে যে আকাশের কথা বলা হচ্ছে আমরা যে আকাশ দেখছি সেই আকাশের কথা বলা হচ্ছে না, এই আকাশ হল একটা সূক্ষ্ম বস্তু কণিকা। ঠিক তেমনি ভূমি বলতে আমরা যে ভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছি সেই ভূমি নয়, এগুলো এক একটি নাম। এগুলোর কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকে এবং এক অপরের সাথে সংমিশ্রিত হতে থাকে। মেশার পর যেটা জন্ম নিচ্ছে তারও নাম একই ভূমি, অপঃ, অগ্নি, বায়ু আর আকাশ। এই কারণে সৃষ্টি তত্ত্ব বুঝতে গিয়ে প্রথমে খুব সংশয় হয়। দ্বিতীয় স্তরে গিয়ে যে পাঁচটি স্থূল জিনিষের জন্ম নিচ্ছে তাতে সবটাই মিলে মিশে থাকে। এর পর থেকে একটার পর একটা বস্তুর আকার নিতে শুরু হয়। হাইড্রোজেনের অ্যাটম, অক্সিজেনের অ্যাটম এখান থেকেই বেরোচ্ছে। এই যে পৃথিবী যেটা আমরা দেখছি এর যা কিছু উপাদান যেটা আমরা ফিজিক্স কেমেস্ট্রির মাধ্যমে জানতে পারছি এগুলো ঐ পাঁচটি তত্ত্ব আর পাঁচটি স্থূল ভূতের অনেক নীচে। ঋষিরা যেটা আলোচনা করে গেছেন সেটা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্বের অনেক উপরে কথা, আরও সূক্ষ্মতরের কথা ঋষিরা বলে গেছেন।

সমুদ্রে যেমন সমুদ্র থেকে ঢেউ উঠে আবার সমুদ্রেই লয় হয়ে যায়, ঠিক তেমনি পরমাত্মা থেকে এই পাঁচটি তত্ত্ব ওঠে আবার পরমাত্মাতেই লয় হয়ে যায়। এই পাঁচটি তত্ত্ব থেকেই তাঁরই খেলা হল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আমরা যদি বিজ্ঞানের দিক দিয়ে যাই তখন এরা বলবে একশ দশটি বা একশ বারোটি যে মৌলিক উপাদান আছে তারই খেলা হল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তারও পেছন যদি চলে যাই তখন বলবে পিওর এণার্জিই আছে। বিজ্ঞান বলছে পিওর এণার্জি থেকে কোয়ার্ক হয়, কোয়ার্ক থেকে ইলেক্ট্রন প্রোটন হচ্ছে, সেই ইলেক্ট্রন প্রোটন থেকে একশ বারোটি উপাদান বেরিয়ে আসছে, তাই দিয়েই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচিত হয়েছে। ঋষিরাও তাই বলে গেছেন, এনারা বলবেন এই পিওর এণার্জি প্রথমে পাঁচটা সূক্ষ্ম তত্ত্বকে জন্ম দেয়, সেই সূক্ষ্ম তত্ত্ব থেকে আবার পাঁচটা স্থূল পদার্থ বেরোয়। এই পাঁচটা স্থূল পদার্থ থেকেই সৃষ্টি বেরোতে শুরু করে। সেই পাঁচটা তত্ত্ব কোথা থেকে জন্ম নিচ্ছে? তখন বলছে যতঃ সৃষ্টানি তত্রৈব তানি যান্তি পুনঃ পুনঃ। মহাভূতানি ভূতেভ্যঃ সাগরস্যোর্ময়ো যথা।। প্রসার্য্য চ যথাস্থানি কূর্মঃ সংহরতে পুনঃ। তদ্বদভূতানি ভূতাত্মা সৃষ্টানি হরতে পুনঃ।। ১৩/১৮৭/৬-৭। এই পাঁচটা তত্ত্ব পরমাত্মার ঢেউয়ের মত। কচ্ছপ যেমন নিজের অঙ্গকে বার করে আবার ভেতরে গুটিয়ে নেয়, ঠিক তেমনি পরমাত্মা থেকেই এই পাঁচটা তত্ত্ব বেরিয়ে আসে আবার পরমাত্মাতেই গুটিয়ে যায়। যখন ছাড়ছে তখন সেটাই হয়ে যায় সৃষ্টি আবার যখন গুটিয়ে নিচ্ছে সেটাই তখন হয়ে যাচ্ছে লয়। এনাদের আরেকটা বিখ্যাত উপমা হল মাকড়সা, মাকড়সা যেমন নিজের ভেতর থেকে জালটাকে ছেড়ে দিচ্ছে আবার সেই জালটাকেই গিলে ফেলে। এই সৃষ্টিও ভগবান থেকেই বেরিয়ে আসছে আবার ভগবানেতেই লয় হয়ে যায়। ভগবান থেকে সৃষ্টি কি পদ্ধতিতে হচ্ছে আর কি পদ্ধতিতে ভগবানের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে সেটা আবার বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন উর্দ্ধং পাদতলাভ্যাং যদবীক্ চোদ্র্দ্ধং পশ্যতি। এতেন সর্বমেবেদং বিদ্য্যভিব্যাগুন্তরম্।। ১৩/১৮৭/১৪। ‘হে যুধিষ্ঠির! তুমি এটা ভালো করে বুঝে নাও, তোমার দুটো পা থেকে মাথা পর্যন্ত আর যেখান থেকে সব কিছু দেখছে, সেই একই জিনিষ বাইরে আর ভেতরে সর্বত্র সমান ভাবে ব্যপ্ত হয়ে রয়েছে’। ভীষ্ম যেটা বললেন এইটাই বেদান্তের নিজস্ব তত্ত্ব। আমার মধ্যে যখন আমি বোধ আসছে তখন আমি বুঝতে পারছি আমার মধ্যে চেতনা আছে। তাহলে

আমার চেতনা কোথায় আছে? মাথা থেকে দুটো পা পর্যন্তই চেতনা আছে। তখন এটাও বুঝতে পারছি এই মাইক্রোফোনটা আমার বাইরে আছে। আর আমার চেতনা বাইরে গিয়ে এই মাইক্রোফোনটাকে ধরতে পারছে। তখন ভীষ্ম বলছেন তুমি যেটা মনে করছ তোমার চেতনা শুধু তোমার ভেতরেই আছে তা নয়, সেই চেতনা কিন্তু বাইরেও পুরোটা ব্যপ্ত হয়ে আছে। বাইরে আর ভেতরে সর্বত্র সেই একই চেতনা ব্যপ্ত হয়ে আছে। কেন বলছেন? কারণ এইটাই, সচ্চিদানন্দই বস্তু আর বাকি সব অবস্তু। সেই বিশুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া, সেই সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কিছু নেই। সেই সচ্চিদানন্দই ভেতরে চৈতন্য হয়ে ভেতরে অবস্থান করছেন বলেই মনে হচ্ছে আমার শরীর চলছে, আমার মন ভালো নেই, আমার খিদে পেয়েছে। সেই চৈতন্য বাইরেও সর্বত্র ব্যপ্ত। এই বিশুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নেই। যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্মেষ হবে তখন দেখবে সর্বত্র সেই চৈতন্যই পরিব্যপ্ত হয়ে আছেন। যে বিদ্যা আমাকে এই জ্ঞান প্রাপ্ত করার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, কি জ্ঞান? চৈতন্যই ভেতরে বাইরে সর্বত্র ব্যপ্ত, সেইটাই হল অধ্যাত্ম। সচ্চিদানন্দই বস্তু বাকি সব অবস্তু; ঈশ্বরই আছেন, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই এইটাই আধ্যাত্মিক জ্ঞান। সামনে যে জগতকে দেখছি এটিও তাঁরই অঙ্গ থেকে বেরিয়েছে, আবার তাঁরই মধ্যে ঢুকে যাবে। সেইজন্য এই জগৎ ঈশ্বর ছাড়া নয়। বেদান্তের এই তত্ত্ব যে কোন দ্বৈতবাদী ধর্মকে বিরাট বড় সমস্যার মধ্যে ফেলে দেবে।

ফ্রান্সের খুব নামকরা একজন দার্শনিক ছিলেন, ওনার নাম ছিল ডেকার্ড। তিনি আবিষ্কার করলেন কার্টেশিয়ান সিস্টেম। এই কার্টেশিয়ান সিস্টেম থেকে পরে গ্রাফ বেরিয়েছে। এখন যে ম্যাপের প্রচলন আমরা পাই তাকে বলা হয় কার্টোগ্রাফি, ডেকার্ডের থেকেই এই কার্টোগ্রাফি এসেছে। ডেকার্ড গাণিতিক জগতে নতুন একটা শাখার প্রচলন করলেন, পরে যে কোর্ডিনেট জিওগ্রাফি শুরু হয়েছে সেটা এখন থেকেই মানে ডেকার্ডের থেকেই শুরু হয়েছিল। তিনি এসে সব কিছুকে এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিস করে দুটো ডিভিশন করে দিলেন, মানে এটা হল জগৎ আর এটা হল ভগবান, এটা হল মন আর এটা হল জড়। এটাকেই বলা হয় কার্টেশিয়ান ডিভাইড। এই কার্টেশিয়ান ডিভাইড সারা জগতে এক মহা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ডেকার্ড এই কার্টেশিয়ান ডিভাইড এনে সব কিছুকে ভেঙে দিলেন। যেটার সঙ্গে কোন মিল নেই সেটাকেই তিনি এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিসে দিয়ে দিলেন। মন যাকে এরা চেতনা বলছে সেটাকে দিয়ে দিলেন ওয়াই এক্সিস। আর পদার্থকে দিয়ে দিলেন এক্স এক্সিসে। এর ফলে আমাদের মনটা পুরো সংশয়ের মধ্যে ডুবে গেছে। এখন আমরা সব কিছুকে দেখছি এই কার্টেশিয়ান ডিভাইড দিয়ে। যার জন্য আমরা একটাকে বলছি আধ্যাত্মিক আরেকটাকে বলছি জাগতিক। বেদান্ত মতে কিন্তু তা হয় না, বেদান্ত মতে সবটাই আধ্যাত্মিক, বেদান্ত মতে সবটাই ঈশ্বর, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। কার্টেশিয়ান ডিভাইড দ্বৈতবাদীদের কাছে এক বিরাট সমস্যা। দ্বৈতবাদীদের কি সমস্যা? দ্বৈতবাদীদের মতে ঈশ্বর একজন আছে আর তিনি সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বর আর তাঁর সৃষ্টি এই দুটো পুরো আলাদা। যখনই ঈশ্বর আর তাঁর সৃষ্টি আলাদা হয়ে গেল তখন এসে যাবে কার্টেশিয়ান ডিভাইড, যেটা বেদান্ত মতে কখনই দাঁড়াতে পারবে না। আমরা মাকড়সা আর মাকড়সার জাল, এই দুটোকে কি আমি আলাদা দেখছি, না এক দেখছি? যদি বলি মাকড়সা আর মাকড়সার জাল দুটো আলাদা জিনিষ, তখন দুটো আলাদা জিনিষ। কিন্তু যারা জানে তারা ভালো করেই জানেন যে দুটো আলাদা জিনিষ নয়। উপনিষদেই বলছে *যথার্থানাভি সৃজতে গুরুতে চ*, মাকড়সার মুখ থেকে জালটা বেরায় আবার সেই মুখ দিয়ে ভেতরে চলে যায়। মাকড়সা আর তার জাল যেমন এক, ঠিক তেমনি ঈশ্বর আর তাঁর সৃষ্টি এক। কিন্তু দ্বৈতবাদী যত ধর্ম আছে, ইসলাম, খ্রিস্টানিটি আমাদের বৈষ্ণব ধর্ম এরা এই দুটোকে সব সময় আলাদা দেখবে। বৈষ্ণবরা শ্রীকৃষ্ণ আর তাঁর সৃষ্টি এই দুটোকে কখন এক দেখবে না। মাধ্বাচার্য, যিনি ঘোর দ্বৈতবাদী, তিনি আবার গীতা উপনিষদের যেসব শ্লোক বা মন্ত্রে বলা হচ্ছে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, সেই শ্লোক বা মন্ত্রকে নিজের মত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বেদান্ত আবার মাধ্বাচার্যের মতকে মানবে না। ভীষ্ম এখানে বেদান্তের কথাই বলছেন তোমার ভেতরে যে চেতনা আছে, যার প্রভাবে তুমি নিজেকে চৈতন্য মনে করছ সেই চেতনা বাইরেও ব্যপ্ত আর বাইরে ভেতরে সেই একই চেতনা।

ভগবান থেকে প্রথমে সত্ত্বঃ, রজঃ আর তমঃ এই তিন গুণের সৃষ্টি হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সবই এই সত্ত্বঃ, রজঃ আর তমের খেলা। সত্ত্বকে সব সময় সাদা রঙে চিহ্নিত করা হয়, রজোকে লাল আর তমোকে কালো রঙে চিহ্নিত করা হয়। এই তিনটে গুণ এক অপরের বিরোধী। আবার এই তিনটে গুণ সব সময় এক সঙ্গে থাকে। থাকবে এক সঙ্গে আর সর্বদা এক অপরকে দাবানর চেষ্টা করে যাবে। গুণের নিরিখে তমের বৈশিষ্ট্য সব সময় ঘোর আলস্য আর নিদ্রাতে অভিভূত হয়ে থাকবে, রজোগুণে সব সময় সক্রিয় আর সত্ত্ব এই দুটোরই উল্টো, শান্ত ভাব। তার মানে রজোগুণের সক্রিয়তা তার মধ্যে থাকবে না আর তমের আলস্য ভাবও থাকবে না, সব সময় একটা সাম্য ও শান্ত ভাব। গীতাতে চতুর্দশ অধ্যায়ে এই তিনটে গুণের বৈশিষ্ট্য আর বিশেষত্বকে নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের স্বভাব এই তিনটে গুণ দিয়েই তৈরী। আবার এই তিনটে গুণই আলাদা আলাদা অবস্থায় চলে যায়। যেমন জিরে লঙ্কা দিয়ে মাছের ঝোল করা

হয় ঐটাই হয়ে যাবে সাত্ত্বিক খাবার। খুব তেল মশলা দিয়ে যখন রান্না করা হবে তখন সেই মাছের ঝোলই হয়ে যাবে রাজসিক খাবার। আবার ঐ মাছকে যখন পচিয়ে শুটকি করে খাওয়া হবে তখন ঐটাই হয়ে যাবে তামসিক খাদ্য। একই মাছ তিন রকম হয়ে গেল। এইভাবে সব জিনিসকে তিনটে ভাগে দেখা যায়। আমাদের মধ্যে সাধারণ ভাবে দেখা যায় সকালের দিকে আমাদের সাত্ত্বিক ভাব থাকে। সাত্ত্বিক ভাব যখন থাকে তখন জপ, ধ্যান, পূজো এগুলো করতে হয়। দিনের বেলায় আমাদের মধ্যে রাজসিক ভাবের প্রাধান্য থাকে, তখন খুব সক্রিয় হয়ে যায়। রাত্রে গিয়ে ঐটাই তামসিক ভাবে চলে যায়। একই লোকের মধ্যে তিনটে সময়ে তিন রকমের ভাব থাকে। পুরোটাই তামসিক বলে কিছু হয় না ঠিক তেমনি পুরোটাই সাত্ত্বিক বলে কিছু হয় না। কারণ এই তিনটে গুণ সব সময় এক সঙ্গেই থাকে। সত্ত্ব থাকলে তমোও থাকবে, কম থাকবে কিন্তু থাকবে। তেমনি রজো থাকলে সত্ত্বও থাকবে আবার তমোও থাকবে। শতকরা হিসাবে একটু কম বেশী হবে, যেমন শুদ্ধ সত্ত্ব বললে সেখানে হয়তো ৯৯.৯% সত্ত্বগুণ আছে বাকি .০৫% হয়তো রজো আর .০৫% তমো থাকবে। শুদ্ধ সত্ত্বের মধ্যে তমোগুণ থাকতেই হবে। কিন্তু এখানে কি হবে, ঐ যে .০৫% তমোগুণ আছে এটাই যে কখন সত্ত্বগুণকে পাল্টে দিয়ে তমোগুণে ধরে নেবে বুঝতেই পারা যাবে না। একজন বিরাট মহাত্মা, এনার মত মহাত্মা দেখা যায় না, বিরাট সত্ত্বগুণী। হঠাৎ একদিন শুনলাম সেই মহাত্মার পতন হয়ে গেছে। ঐ যে .০৫% তমোগুণ বা রজোগুণ রয়েছে সেটা কোন দিন যে পাল্টে গিয়ে রজোগুণে বা তমোগুণে চলে যাবে বোঝাই যাবে না। সেইজন্য যত বড়ই যোগী হন না কেন, পতনের ব্যাপারে কোন গ্যারান্টি থাকে না। কখন পাল্টে যাবে না? যখন সে ত্রিগুণাতীত হয়ে যায়, যখন এই তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজো আর তমোকে পার করে যায়। আধ্যাত্মিক পুরুষ হওয়া মানে সত্ত্ব, রজো ও তমোকে পার করে যাওয়া। ধার্মিক মানে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ধর্মের উদ্দেশ্য হল মানুষকে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত করা। আধ্যাত্মিকতার উদ্দেশ্য ত্রিগুণাতীত হয়ে যাওয়া। কিন্তু মজার ব্যাপার হল যতক্ষণ আমি সাত্ত্বিক না হচ্ছি ততক্ষণ কখনই ত্রিগুণাতীত হতে পারব না। সেইজন্য প্রথমে সাত্ত্বিক হতে হবে। বৈধী ভক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ আস্তে আস্তে সাত্ত্বিক হওয়ার দিকে এগোতে থাকে। এবার যখন সে সত্ত্বগুণে চলে গেল। কতটা চলে গেল? ৯৯.৯% তে চলে গেল হয়ত ৯০% তেই চলে গেছে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এবার সে বলছে আমি এই তিনটে গুণের এলাকা ছাড়িয়ে চলে যেতে চাই। যেমন এই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আছে, আমি এই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে ছাড়িয়ে যেতে চাই। কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে ছাড়িয়ে চলে যাওয়া যাবে না। আমি পাথর ছুড়ি, বুলেট ছুড়ি সেটা আবার নীচে নেমে আসবে, কালীপূজায় হাওয়াই বাজী ছাড়ছে অনেকটা উঁচুতে উঠে আবার ভুস করে নীচে নেমে আসবে। উড়োজাহাজও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না, এর জন্য আলাদা গতি দরকার। মহাকাশে যে রকেট পাঠান হয় সেটা ঐ গতিতে ছাড়া হচ্ছে যে গতিতে সে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। ঠিক তেমনি যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ হন তিনি এই তিনটে গুণের পারে চলে যান। কিন্তু যখন আবার মনটাকে জগতে নামিয়ে আনতে চান তখন এই তিনটে গুণকে আশ্রয় করে থাকেন, তখন এই গুণের বন্ধনে থাকেন না। কলিমুনি যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি যেদিকে যেতেন সেদিকে পুলিশ যেত। এখন তিনি জেলে পুলিশ এখন যেদিকে যাবে কলিমুনিকে সেদিকে যেতে হবে। তিনটে গুণের অধীনে যখন আমরা থাকি তখন গুণ আমাদের যেদিকে নিয়ে যেতে চাইবে সেদিকেই আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু ত্রিগুণাতীত যখন হয়ে গেল তখন আর তিনি তিনটে গুণের অধীনে নেই, তিনটে গুণ আর তাঁকে বাঁধতে পারবে না।

ভীষ্ম বলছেন যদি মানুষ ত্রিগুণাতীত না হতে পারে, কিন্তু খুব সাত্ত্বিক হয়ে গেল, কিন্তু গুণকে পার করতে পারল না তখন মৃত্যুর পর তার কি হবে? তখন সে দেবতাদের মধ্যে গিয়ে জন্ম নেবে। অন্য দিকে যদি সে ঘোর তামসিক হয়ে থাকে, তখন মৃত্যুর পর সে নীচের দিকে যাবে। সেইজন্য মানুষকে এগুলো বলে বলে সচেতন করে দিতে হয়, তুমি যদি তামসিক হও তাহলে তুমি নিম্নযোনিতে গিয়ে জন্ম নেবে, রাজসিক যদি হও তাহলে মানুষ যোনিতে জন্ম নেবে, সাত্ত্বিক যদি হয়ে থাক তুমি দেবলোকে জন্ম নেবে। কিন্তু তোমাকে ঘুরপাক খেতেই হবে, এটাকে বুঝে নিয়ে তোমাকে এই তিনটে গুণকে কেটে বেরিয়ে আসতে হবে। এগুলোই সব সময় বিচার করতে হয়, আমি যতই ভালো হয়ে থাকি না কেন, খুব জোর দেবতালোকেই না হয় জন্মাব কিন্তু আবার ওখান থেকে নীচে নেমে আসতে হবে। আবার আমাকে সংগ্রাম করে যেতে হবে। সেইজন্য এইখান থেকে আমাকে বেরোবার জন্য আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তিনটে গুণের পারে আমাকে যেতে হবে, এই জিনিসটাকে মাথার মধ্যে বারবার নিয়ে আসতে হবে। এই প্রচেষ্টাই আমাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে নিয়ে যাবে।

তারপর বলছেন, মানুষের যখন সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হয় তখন সত্ত্বগুণ তাকে সুখের দিকে টেনে নিয়ে যায়। গীতাতে এই জিনিসটাকেই খুব সংক্ষেপে বলছে সুখসঙ্গেন বলাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘা। সত্ত্বগুণের আধিক্য হলে জ্ঞানের স্পৃহাটা বেড়ে



যায়, শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে, উচ্চ চিন্তন করতে, সৃষ্টিমূলক কাজ করতে ভালো লাগবে। ছোটবেলায় আমার হিন্দীগান শুনতে ভালো লাগত, কিন্তু একটা বয়সের পর থেকে আমার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ হতে শুরু করল, তার মানে আমার মন এখন সাত্ত্বিক ভাবের দিকে এগোচ্ছে। কারণ সঙ্গীত জ্ঞান না থাকলে, উচ্চ চিন্তন না থাকলে ক্লাসিক্যাল কখন ভালো লাগবে না। জ্ঞানের সঙ্গে সরাসরি যোগ রয়েছে সত্ত্বগুণের। এই যে এত গরমের মধ্যে দুপুরবেলা আমরা এখানে কত কষ্ট করে কত দূর দূর থেকে এসে জড়ো হয়েছি, কেন এসেছি? দুটো ভালো কথা শুনতে ইচ্ছে করছে। এই ইচ্ছাটা সত্ত্বগুণ ছাড়া হতে পারেনা। সত্ত্বগুণে সব সময় একটা সুখ অনুভব হয়, মনের ভেতরে একটা ভালো লাগার আমেজ, একটা আনন্দের ভাব ছড়িয়ে থাকে। সত্ত্বগুণের লক্ষণই হল সুখ আর জ্ঞান। রজোগুণের আধিক্যে সব কিছুর প্রতি আকর্ষণ হতে শুরু হয় আর মনে মধ্যে তৃষ্ণা জাগে। আর তমোগুণে মনটা সব সময় জড়ের মত পড়ে থাকবে, সব কিছুতেই একটা অনীহা মানে নেতিবাচক মনোভাব। এই হচ্ছে তিনটে গুণের মোটামুটি একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এরপর ভীষ্ম বলছেন তত্র যৎপ্রীতিসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ। বর্ততে সাত্ত্বিকো ভাব ইত্যচক্ষীত তত্তথা।/১৩/১৭৬/৩১। যখন শরীর বা মনে কোন ধরনের আনন্দ জন্মায়, তত্র যৎপ্রীতিসংযুক্তম্, কোন কারণ নেই মনটা অকারণেই ভালো লাগছে। তখন বুঝতে হবে সাত্ত্বিক ভাব উদয় হয়েছে। যাদের ভেতরে সাত্ত্বিক ভাব থাকে তাদের চেহারাটা সব সময় আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে। যখন মন্দিরে যাওয়া হয়, ঠাকুরকে প্রণাম করে যখন বেরিয়ে আসে তখন চোখমুখের ভাবটাই অন্য রকম হয়ে যায়। কারণ ভেতরে একটা আনন্দের অনুভূতি হয়েছে। এই আনন্দটা আসে সত্ত্বগুণের জন্য। ঠিক তেমনি যখন অপ্রসন্নতার ভাব আসে, দুঃখের ভাব আসে তখন বুঝতে হবে রজোগুণের আধিক্য হয়েছে। কারণ রজোগুণের সাথে তৃষ্ণার সম্পর্ক আছে। তৃষ্ণার যখন পূর্তি হয় না তখন মানুষ দুঃখে ম্লিয়মাণ হয়ে যায়। যখন কোন কিছুকে স্পষ্ট করে জানতে পারছে না, মনটা কোন কিছুর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এটা হল তমোগুণের লক্ষণ। আমাদের আগ্রহ হল সত্ত্বগুণকে নিয়ে। যখন দেখবে নিজে থেকেই আনন্দে ভাসছে, এখন যে দশ লাখ টাকার লটারি পেয়ে গেছে তার তো আনন্দ হবেই, সেই আনন্দের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। এখানে বলা হচ্ছে নিজে থেকেই আনন্দ এসে যাচ্ছে। এই আনন্দের কোন হেতু নেই। ঠিক তেমনি মনের মধ্যে যখন প্রীতির ভাব জন্মায়, জগতের সবার প্রতি, মানুষ মাঝেই ভালোবাসা, সমস্ত প্রাণির প্রতি ভালোবাসার উদয় হয় এগুলো সব সত্ত্বগুণ থেকে জন্মায়। এখানে ছেলে মেয়ের ভালোবাসার কথা বলা হচ্ছে না, এই ভালোবাসা রজোগুণ থেকে, না হলে তমোগুণ থেকে হয়। যখন ভেতরে একটা শান্তির ভাব অনুভব হয় সেটাও সত্ত্বগুণের লক্ষণ। শান্তি আর আলস্য দুটো আলাদা। যখন দেখা যাবে অকারণে, কোন কিছুই হয়নি কিন্তু মনের মধ্যে অসন্তোষ জমে আছে, আমরা যেমন প্রায়ই বলি ‘দূর কিছু ভালো লাগছে না’, তারপর শোক, কোন কারণ নেই অকারণে মনটা অবসাদে ভরে যাচ্ছে, আর সন্তাপ, কোন কারণ নেই পুরনো কথা ভেবে ভেবে মনে কষ্ট পাচ্ছে, এই রকম লোভ, প্রয়োজন নেই কিন্তু তবু কোন জিনিষের প্রতি লোভ হচ্ছে, সব থেকে বড় হল অক্ষমা, অর্থাৎ ভেতরে সহনশীলতার অভাব, এগুলো যখন কারুর মধ্যে বেশী হতে থাকবে তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে রজোগুণ বেড়ে গেছে, এগুলোই রজোগুণের চিহ্ন। আর যখন দেখব ঘুম বেশী হচ্ছে, প্রচুর স্বপ্ন দেখছে, কাজ করতে ইচ্ছে করছে না, আলস্য বেড়ে গেছে, শাস্ত্রের কথা শুনলে বা অধ্যয়ণ করে স্পষ্ট করে বুঝতে পারছে না, একটা সূক্ষ্ম কথা বলা হলে ধরতে পারেনা, বুঝতে হবে তাকে তমোগুণ গ্রাস করে নিয়েছে। তমোগুণকে সব সময় রজোগুণ দিয়ে কাটাতে হয় আর রজোগুণকে সব সময় সত্ত্বগুণ দিয়ে কাটাতে হয়।

ফলের ভেতরে পোকা থাকে। ফলটা কাটতে গেলেই পোকাটা বেরিয়ে আসে। ফল আর পোকা এক, কারণ ফলের ভেতরেই পোকাটা থাকে। যখন ফল কিনছি তখন পোকা শুদ্ধই ওজন করা হয়েছে তাই ফল আর পোকা এক। কিন্তু ফল আর পোকা আবার আলাদা। ঠিক তেমনি বুদ্ধি আর আত্মা এক সঙ্গে আমাদের শরীরে থাকে কিন্তু এই দুটো আলাদা। আত্মাটা ফলের মত আর বুদ্ধিটা ফলের পোকার মত। বুদ্ধি আর আত্মা যে আলাদা এটা একদিনে বোঝা যাবে না। আমাদের এখন এগুলো শুধু শুনে যেতে হবে। আমরা যত কাজ করছি মনে করছি সব কাজ বুদ্ধি দিয়ে করছি, কিন্তু এখানে বুদ্ধির কোন ভূমিকা নেই। সব কিছুই আত্মার জন্যই হচ্ছে অথচ আমরা মনে করি বুদ্ধির জন্য হচ্ছে। যেমন জল আর মাছ দুটো এক সঙ্গেই থাকে, কিন্তু দুটো আলাদা জিনিষ। ঠিক তেমন বুদ্ধি আর আত্মা এক সঙ্গেই থাকে কিন্তু দুটো জল আর মাছের মত আলাদা। মজার ব্যাপার হল এই সত্ত্বগুণ, রজোগুণ আর তমোগুণকে আত্মা সব সময় জানতে পারে কিন্তু এই তিনটে গুণ কোন দিন আত্মাকে জানতে পারবে না। আমি যদি তমোগুণের আশ্রয় নিই আত্মাকে জানতে পারব না, যদি রজোগুণের আশ্রয় নিই আত্মাকে জানতে পারব না, যদি সত্ত্বগুণের আশ্রয় নিই তাও আত্মাকে জানতে পারব না। কারণ এই

তিনটে গুণ বুদ্ধির এলাকার। কিন্তু আত্মা বুদ্ধির বাইরে এবং এদের তুলনার আত্মা আরও অনেক বেশী বৃহৎ। সেইজন্য আত্মাকে বলা হয় বুদ্ধি আর এই তিনটে গুণের সাক্ষী। আত্মা এদের সব খেলা দেখতে পায়। মা যেমন তার তিনটে বাচ্চার সব কিছু দেখতে পায়, কিছু বলে না হয়তো। মা আর বাচ্চার এক কিন্তু আলাদা। ঠিক তেমনি আত্মা মায়ের মত আর তিনটে বাচ্চা এই তিনটে গুণের মত। বাচ্চা তিনটে নানা রকমের উপদ্রব করে চলেছে। এই তিনটে গুণের খেলা চলছে কারণ আত্মা আছেন বলে। মা না থাকলে তিনটে বাচ্চা হত না। কিন্তু তিনটে বাচ্চা থেকে মা সম্পূর্ণ আলাদা। গাছ আর তার ফল, ফল যদি নাও থাকে গাছটা থাকবে কিন্তু গাছ না থাকলে ফল হবে না। আত্মাও ঠিক সেই রকম। আত্মার ফল এই তিনটে গুণ। আমাদের সমস্যা হল আমরা সত্ত্ব, রজো আর তমের বন্ধনে বাঁধা পড়ে যাই। বেঁধে গিয়ে আমরা আর এদের থেকে বেরোতে পারিনা। যাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হতে চাইছেন, তাঁদের জন্য আবশ্যিক হল এই সত্ত্ব, রজো আর তমের লীলাখেলাটা বোঝা আর এই তিনটে গুণের পারে যাওয়ার চেষ্টা করা।

ভীষ্ম একটা খুব নামকরা প্রচলিত কথা বলছেন যেটা আমরা সবাই শুনে থাকব। *মহানদ্যা হি পারজন্তপ্যতে ন তদন্যথা। ন তু তপ্যতি তত্ত্বজ্ঞঃ ফলে জ্ঞাতে তরত্যত। এবং যে বিধুরধ্যাত্মং কৈবল্যং জ্ঞানমুত্তমম্।।* ১৩/১৭৬/৫৪। যে একটা মহানদীকে পার করতে চায়, জেনে গেল এখানে গঙ্গানদী আছে, সে কি পেরোতে পারবে? যদি জানে নৌকা করে পার হওয়া যায়, তাও নদী পার করতে পারবে না। নৌকার ব্যাপারে সে সব কিছু জানে, নৌকা কাঠ দিয়ে তৈরী হয়, মাঝি চালায় এত কিছু জেনে নিলেও নদীকে পার করতে পারবে না। কিভাবে ওপারে যেতে হবে? আমাকে নৌকোতে গিয়ে বসতে হবে, নৌকো করেই নদী পার হওয়া যাবে। এই ক্ষেত্রে সেইজন্য সব ধরনের তাত্ত্বিক জ্ঞান পুরোপুরি তাৎপর্যহীন। আমি নদীর ব্যাপারে সব কিছুই জানতে পারি, গঙ্গার উৎস কোথায় আর কোথায় গিয়ে সে মিশছে, কত রকমের নৌকা হতে পারে, নৌকা তৈরীর ইতিহাস সবই আমার জানা আছে। কিন্তু গঙ্গাকে পার করার ব্যাপারে এগুলো কোন কাজেই লাগবে না। হ্যাঁ, আমি যখন গঙ্গাকে অতিক্রম করে গেলাম তখন এই জ্ঞানটাই আমার একটা বাড়তি গুণ হয়ে থাকল। মূল বক্তব্য হল আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যুক্তিগত জ্ঞান আর তথ্য সমৃদ্ধ জ্ঞান কোন কাজেই আসে না।

ভীষ্ম বলছেন, মানুষ যখন সমস্ত জীবের এই আবাগমন, জন্ম-মৃত্যুর চক্রে এই যে আসা যাওয়া চলছে, এটাকে যদি খুব ভালো করে চিন্তা ভাবনা করে নিজের মনের মধ্যে সুদৃঢ় ভাবে বসিয়ে নেয়, আর যখন বুঝে নেয় আমাকেও এই দূরবস্তুর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে যদি না আমি এই তিনটে গুণের পারে চলে যাই। এই জ্ঞানটাকে সুদৃঢ় করে নিতে পারলে তখন সে পারে চলে যায়। সেইজন্য এই জগতে যা কিছু আছে সব কিছুকে বিচার করে করে নিজেকে কোন ভাবে এখান থেকে বার করে নিতে হবে। আমি যখন কারুর মৃত্যু দেখছি তখন আমাকেও ভাবতে হবে আমারও একদিন এইভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। তখন বিচার আনতে হবে এই মৃত্যুকে কিভাবে জয় করা যায়। আমার মনে যখন দুঃখ ভাব আসে তখন বিচার করতে হবে, এই যে মনে দুঃখ আসছে এর উল্টোটা কি? সুখ। কিন্তু যার আছে সুখ তারই আছে দুঃখ, যার আছে দুঃখ তারই আসবে সুখ। এই সুখ-দুঃখ সত্ত্ব, রজো আর তমের খেলা। আমাকে এই সত্ত্ব, রজো ও তমের পারে যেতে হবে। যারই জন্ম আছে তারই মৃত্যু হবে, আর মৃত্যু হলেই জন্ম হয়। এটা শাস্ত্র থেকে আমরা জানছি। জন্ম হলেই মৃত্যু হয় এটা আমরা লৌকিক দৃষ্টিতে জানি। আমাদের কি কর্তব্য? এই জন্ম-মৃত্যুকে কিভাবে অতিক্রম করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। যারই টাকা আছে সেই নির্ধন হয়, যে নির্ধন হয় সেই টাকা আয় করার চেষ্টা করে। এটাকে দেখে নেওয়ার পর চেষ্টা করতে হবে কিভাবে অভাব আর স্বচ্ছন্দের পারে যাওয়া যায়। তখন আমার কখন মনে হবে না যে আমার প্রচুর টাকা আছে আর কখন অভাব বোধ এটাও হবে না। জগতের দাম এইটুকুই, এর বেশী জগতের দাম আমাদের কাছে নেই। যখনই কোন কিছুর দিকে আকৃষ্ট হয়ে মন দিলাম তখন সেই জিনিষটা পেলে আনন্দ হল, না পেলে মন খারাপ হবে, তখনই বুঝতে হবে পাওয়া আর হারানো, হারানো আর পাওয়া এটাই জীবন, এই জীবনের পারে কিভাবে যাওয়া যায়। বলছেন যখনই এই ভাবটা এসে যায় তখনই মানুষ ঠিক ঠিক শান্তি পায়।

### তত্ত্বদর্শি কে?

এখানে একটি অত্যন্ত মূল্যবান শ্লোকে ভীষ্ম বলছেন *ত্রিবর্গো यस্য বিদিতঃ প্রেক্ষ্য যশ্চ বিমুঞ্চতি। অস্বিষ্য মনসা যুক্তস্তত্ত্বদর্শী নিরুৎসুকঃ।।* ১৩/১৭৬/৫৬। যাঁরা ধর্ম, অর্থ ও কামের ঠিক ঠিক স্বরূপকে বুঝে নিয়েছেন, বুঝে তিনটেকেই পরিত্যাগ করে দিয়েছেন, পরিত্যাগ করে আত্মানুসন্ধানের দিকে এগিয়ে গেছেন, তাঁরাই তত্ত্বদর্শি হন। এটা আমাদের খুবই দুর্ভাগ্য যে অনেক বড় বড় লেখকরা, পণ্ডিতরা এমনকি অনেক সন্ন্যাসীরাও প্রবন্ধাদিতে লিখছেন আমাদের

সব কিছুকে ধর্মের উপর আধারিত করতে হবে, অর্থ, কাম এগুলোকে ধর্মের উপরে আধারিত করে অর্জন করতে হবে, মোক্ষও ধর্মের উপর আধারিত হবে। আদপেই শাস্ত্রের এটা অর্থ নয়। অর্থ হল যখন আমি ন্যায়সঙ্গত ভাবে অর্জন করছি, কাম হল যখন আমি ন্যায় সম্মত ভাবে ভোগ করছি। ধর্ম হল শাস্ত্র মতে যখন আমি পূণ্যকর্ম করছি, যে পূণ্য আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। অর্থ আর কাম এই জগতের ভোগ এবং ধর্ম পরকালের ভোগ। এই দুটোকে যখন খুব ভালো করে চিন্তা করে নেওয়া হয়, চিন্তা করার পর ইহামুদ্রফলবিরাগ, অর্থাৎ এই জগতের যা কিছু সুখ তাকে ত্যাগ করব আর পরের যে জগৎ সেটাকেও ত্যাগ করব, ইহজগৎ আর পরজগৎকে ত্যাগ করার পরে যখন সে মোক্ষের চেষ্টা করে তখনই সে তত্ত্বদর্শি হওয়ার দিকে এগোয়। এই রকম যাদের হয় তাদের কি হয়? অজ্ঞানীদের কাছে এই সংসার মহাভয়ের জায়গা, কিন্তু জ্ঞানী এই মহাভয় রূপ সংসারের পারে চলে গিয়ে নির্ভয় হয়ে যান। জ্ঞানীর আর কিছু পাওয়ারও থাকে না হারাবারও কিছু থাকে না। বলছেন যখন নিষ্কাম ভাবে কর্ম করা হয় তখন সে এর আগের আগের যে কর্মসংস্কার সঞ্চিত করেছে সেটাকে আস্তে আস্তে নাশ করতে থাকে। আবার অন্য জায়গাতে আছে কর্মফলে কাটাকাটি হয় না। এগুলো এক একটি মডেল। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যখন নিষ্কাম ভাবে কর্ম করা হয় তখন পূর্ব পূর্ব কর্মসংস্কারকে নাশ করে দেয়। এই পূর্ব পূর্ব সংস্কারকে যখন নাশ করে দিয়ে যায় তখন আর শুভ আর অশুভ কোন কর্মেরই ফল দেয় না। যদিও এই মতটা খুব একটা গ্রহণযোগ্য নয় তবুও মহাভারতে এখানে বলা হয়েছে। এগুলো সবই এক একটি মডেল। কিন্তু যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হল, নিষ্কাম কর্ম করতে করতে মন বাসনাশূন্য হয়ে যায়, বাসনাশূন্য হয়ে গেলে তখন ভালো-মন্দ থেকে তার মনটা সরে আসে। আর যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়ে গেল, আমি কে এইটা যখন জেনে গেল তখন তার যাবতীয় যত কর্ম সঞ্চিত হয়ে আছে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এইটাই হল মূল কথা। অন্যান্য শাস্ত্রে একটা বিশেষ ভাবে নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু মহাভারতে সমস্ত রকমের ভাব ও ধারণাকে আলোচনা করা হয়েছে।

### জ্ঞান ও ভক্তির লক্ষ্য ও পরিণাম এক

আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা চরম লক্ষ্যে গিয়ে সাধক যা দর্শন করেন বা জানতে পারেন অর্থাৎ যে তত্ত্বের সাথে তিনি এক হয়ে যান, তা যে পথেই তিনি সাধনা করে থাকুন না কেন, সেখানে তাঁর দুটি জিনিষেরই উপলব্ধি হয়। হয় তিনি দেখেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু, এখানে আমি বলে কিছু থাকে না, তিনিই থাকেন। আর তা নাহলে দেখেন আত্মাই সব কিছু হয়েছেন অহং ব্রহ্মস্মি। মজার ব্যাপার হল সব ধর্মেই, খ্রীষ্টান, ইসলাম, শিখ যে ধর্মই হোক না কেন যাঁরা সাধনা করছেন তাঁদের সবার ক্ষেত্রে এই একই জিনিষ হচ্ছে। সাধনা যখন করেন তখন হয় দেখবেন ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান আর তিনিই সব হয়েছেন। সাধনা যখন অন্য রকম হয় তখন দেখেন তিনি নিজেই সব কিছু হয়েছেন। তিনি নিজে যে নাম রূপে আছেন সেই ভাবে দেখেন না, বিশুদ্ধ চৈতন্যের সাথে নিজেকে একাত্ম রূপে দেখেন। সুফীদের মধ্যেও এই ধরনের সাধক আছেন, যাঁরা নিজেকে সব কিছুর সঙ্গে একাত্ম বোধ করছেন, আমিই সেই। আবার অন্য পথের যাঁরা তাঁরা দেখেন কৃষ্ণই সব হয়েছেন বা দেখেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন বা দেখেন আল্লাই সব কিছু হয়েছেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রাথমিক অবস্থায় জ্ঞান আর ভক্তির একটা বিভাজন থাকে। যাঁরা জ্ঞান পথে এগিয়ে যান তাঁরা দেখেন আত্মাই সব কিছু হয়েছেন। যাঁরা ভক্তিভাব নিয়ে এগিয়ে যান তাঁরা দেখেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। এটা হল শেষ কথা, কিন্তু শেষে গিয়ে জ্ঞান আর ভক্তিতে কোন বিভাজন থাকে না। জানা আর ভালোবাসা দুটো একই জিনিষ। যে জিনিষকে যত বেশী জানতে থাকব সেই জিনিষের প্রতি ততই ভালোবাসা জন্মাতে থাকব। আবার যত জিনিষটাকে ভালোবাসা হয় তত জিনিষটাকে জানা হয়। তাই জ্ঞান আর ভক্তি কখনই আলাদা হয় না। যারা মন্দ বুদ্ধি সম্পন্ন, নিম্ন স্তরের তারা এই দুটোকে আলাদা দেখে।

আধ্যাত্মিক সত্য তো একটিই। কিন্তু জ্ঞান আর ভক্তি আলাদা বলছি। যিনি জ্ঞানী তিনি দেখছেন আত্মাই সব কিছু হয়েছেন, যিনি ভক্ত তিনি দেখছেন ঈশ্বরই সব হয়েছেন। আপাত দৃষ্টিতে দুটোকে আলাদা দেখলেও কোথাও এই দুটো একই কথা বলছে। তাহলে এই দুটো এক হচ্ছে কোথায় গিয়ে? নিজের যে অহং বোধটা যেখানে গিয়ে নাশ হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরই সব হয়েছেন আর আত্মাই সব হয়েছেন এই দুটোর মধ্যে একটা সাধারণ জিনিষ আছে, সেটা হল আমিভূত্বের নাশ, জগতের নাশ হয়ে যাচ্ছে। জগৎ বলে জগৎ তখন থাকছে না, আমি বলে কিছু থাকছে না। আধ্যাত্মিকতায় একটা সাধারণ জিনিষ হল আমিটা নাশ হয়ে যাওয়া। সাধনার উদ্দেশ্য কি? ঈশ্বর লাভ যদিও বলা হয়, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হল এই আমার নাশ। আমিটা নাশ হয়ে গেলে কি থাকে সেটা আর মুখে বলা যায় না, যা থাকে সেটাই থাকে। যারা ঈশ্বর ভক্ত তারা বলবে ঈশ্বরই সব। আবার যারা ঘোর বেদান্তী তারা বলবে আত্মাই সব। তাহলে ভক্ত আর বেদান্তী কি আলাদা হয়ে যাবে? না, কখনই আলাদা হবে না, দুটো ক্ষেত্রে সাধারণ একটা আছে, দুটো ক্ষেত্রেই আমিটা নাশ হয়ে যাচ্ছে। ভক্তের

ক্ষেত্রে আমি ভক্ত এটাও নাশ হয়ে যাচ্ছে আর বেদান্তীর ক্ষেত্রে আমি জ্ঞানী এই বোধটাও নাশ হয়ে যাচ্ছে। এই সাধারণে পৌঁছানর জন্য অনেকগুলো পথ থাকে। তার মধ্যে একটা পথকে বলা হয় জ্ঞানযোগ। জ্ঞান আর জ্ঞানযোগে তফাৎ কোথায়? আচার্য শঙ্কর কখনই বলতে রাজী হবেন না যে কর্ম আর জ্ঞান এক। অথচ স্বামীজী বলছেন কর্মযোগও যা জ্ঞানযোগও তাই, দুটোই এক জায়গাতে নিয়ে যায়। জ্ঞানযোগ একটা পথ। জ্ঞান আর জ্ঞানযোগ পুরো আলাদা। স্বামীজী বলছেন কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি একই জায়গায় নিয়ে যায়, এগুলো হল রাস্তা। এই রাস্তাকে অবলম্বন করে যেখানে গিয়ে পৌঁছায় সেটাকেই বলা হয় জ্ঞান বা ভক্তি। জ্ঞান বা ভক্তি হল লক্ষ্য। এই জ্ঞানকে বলা হয় তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বা শুধু জ্ঞান। ভক্তি যখন বলা হয় তখন একেই বলা হয় ঈশ্বর জ্ঞান বা পরম ভক্তি। পরম জ্ঞান আর পরম ভক্তিতে কোন তফাৎ হয় না। এই পরম জ্ঞান বা পরম ভক্তিতে পৌঁছাবে কিভাবে? এখানে পৌঁছানর যে কত পথ আছে তার কোন ঠিকানা নেই। স্বামীজী বেলুড় মঠের নিয়মাবলীর মধ্যে লিখে গেছেন রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সন্ন্যাসী যদি নতুন পথ আবিষ্কার করে তাকেও ঠাকুরের মত বলেই মেনে নিতে হবে। তার মানে এখনও পথের সংখ্যা শেষ হয়নি, ভবিষ্যতে আরও পথ বেরোবে। গীতাতে তো আঠারোটা পথের বর্ণনা আছে। গীতার প্রত্যেকটি অধ্যায় একটা করে যোগ। অর্জুনবিষাদযোগ, মানে বিষাদ করেও সেখানে কেউ পৌঁছে যেতে পারে। কিসের বিষাদ? পুরো জগতের প্রতি বিষাদ। কিন্তু মানুষের যখন বিষাদ হয় তখন জগতের প্রতি বিষাদ হয় না, নিজেরটা ঠিক থাকে। তত্ত্বজ্ঞানে বা ঈশ্বরজ্ঞানে পৌঁছানর যে কত পথ আছে তার কোন শেষ নেই। কিন্তু সব পথকে যদি সংগঠিত করে বাছাই করা হয় তখন মোটামুটি সব কটা পথকে চারটে পথে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। সব কটা পথকেই কোন না কোন ভাবে এই চারটির মধ্যে ফেলে দেওয়া যায়। যেটা স্বামীজী বলছেন কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি আর যোগ। এই চারটে যোগের কথা স্বামীজী বলছেন। আর গীতা বলছে আঠারোটি যোগের কথা। কিন্তু ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গীতার ঐ আঠারোটা যোগকে, কিছুটা এর তার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে এই চারটির মধ্যে ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু এই দুটো জ্ঞানযোগের জ্ঞান আর ভক্তিযোগের ভক্তির মধ্যে তফাৎ আছে। শঙ্করাচার্য বারবার বলছেন কর্ম দিয়ে কখনই জ্ঞান হতে পারেনা। ব্রহ্মজ্ঞান যেটা হয় সেটা হয় নিজের স্বরূপকে জানলে। এগুলো শুধু পথ। মহাভারত এই পথগুলো থেকে কয়েকটি পথের আলোচনা করছে। মহাভারত মাঝে মাঝে ভক্তির কথা যেমন বলবে তেমনি মাঝে মাঝে জ্ঞানের কথা আবার মাঝে মাঝে যোগের কথাও বলবে। আগেকার দিনে কর্মযোগ বলতে বোঝাত আমি সংসারে যে কাজকর্ম করছি এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম যদি পালন করি, সেটা যদি নিষ্কাম ভাবে করা হয় তাতেই আমার জ্ঞান হয়ে যাবে। স্বামীজী এসে বলছেন এখন দিনকাল পালে গেছে বর্ণাশ্রম ভুলে যাও, যে কোন কাজই যদি তুমি নিষ্কাম ভাবে অনাসক্ত হয়ে কর তাহলে সেটাই তোমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। জ্ঞানযোগে সব সময় বিচার করা হয়। কি বিচার করা হয়? ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। সর্ব স্তরে সর্ব অবস্থায় এই বিচার করে করে এগিয়ে যেতে হবে, এটা আত্মার সঙ্গে কোন ব্যাপার নেই একে ফেলে দাও। যোগের ক্ষেত্রে একটা জিনিষের প্রতি একাগ্র করে বাকি সব কিছুকে ফেলে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। উদ্দেশ্য সবার কিন্তু একটাই, জ্ঞান বা ভক্তি।

### মহাভারতের মতানুসারে জপ-ধ্যান প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ

এখানে কয়েকটি পথের আলোচনা করা হচ্ছে, কিন্তু মহাভারতে এত বিস্তারিত ভাবে করা হয়েছে যে আমাদের পক্ষে সব কিছু আলোচনা করা সম্ভব নয়। প্রথমে ধ্যানমার্গ নিয়ে বলছেন। ধ্যান মানে টানা এক আসনে দু ঘন্টা বসে আছে আর জপও বন্ধ হয়ে গেছে। জপ আর ধ্যান কিন্তু আলাদা। মানে জপ তখন আঙুলে বা মালায় করা বন্ধ হয়ে যায়। জপ তখন যেটা হয় তখন মনে মনে হতে থাকে। আর কেন্দ্র থাকে গুরু যেমন যাকে ইস্ট বলে দিয়েছেন, সেই ইস্টতে। এই ধ্যান করার আগে বলা হয় সাংসারিক যত কাজ, বর্ণাশ্রমের যত কাজ সেগুলো করে আগে মনটাকে শুদ্ধ করতে হয়। যারা কাজে ফাঁকি মেরেছে, ঘুষ নিয়েছে, চুরি করেছে এদের দ্বারা কোন দিন জপ-ধ্যান হয় না। মানুষ যখন প্রচুর কাজ করবে, সেই কাজে কোন ফাঁকিবাজি নেই, কোন চুরিচামারি নেই, কোন পাটোয়ারি নেই, একেবারে নিষ্ঠার সঙ্গে এইভাবে প্রচুর কাজ করার পর মনের অঙ্কট-বঙ্কট গুলো পরিষ্কার হয়। এরপর তাকে বলা হয় তুমি এবার পূজো অর্চনা করতে থাক। মুসলমানদের বলা হয় দিনে পাঁচবার নমাজ পড় আর পারলে একবার হজ করে এস। এগুলো করার পরে মনটা আরেকটু পরিষ্কার হল। এরপর বলবে এবার তুমি জপ করতে থাক। কত জপ করবে? কত আর করবে, দিনে রোজ পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা জপ করতে থাক। দুই তিন বছর ছয় ঘন্টা ধরে রোজ জপ যদি করা হয়ে থাকে তারপর মনটা এবার ধ্যানের জন্য প্রস্তুত হল। বেশীর ভাগ ভক্তরা বয়সের ভাবে যখন নুয়ে পড়ে তখন আসে ধ্যান শিখতে। জপ-ধ্যান এগুলো কম বয়স থেকে, যখন শরীরে মনে তেজ ও শক্তি থাকে তখন শুরু করতে হয়। ধ্যান যখন শুরু করে তা সাকারের ধ্যানই করুক বা নিরাকারের ধ্যানই করুক, মনটাকে তাকে জগৎ থেকে সরিয়ে দিতে হয়। কিন্তু জপটা তখনও চলে। জপ তখন হাতেও চলে না, ঠোঁটেও চলে না, গলাতেও চলে না, জপটা তখন পুরো অন্তর্লীন হয়ে যায়। ধ্যানে জপের সময় কোথাও কিছু নড়বে

না। এমন সাধারণ সময়ে যদি রাম রাম জপ করি প্রথমে ঠোঁট নড়বে, ঠোঁট যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন জিভের সামনের ডগাটা নড়তে থাকবে। জিভের ডগাটা বন্ধ করে দিলে জিভের দুটো পাশ নড়বে, জিভের দুটো পাশের নড়াকে বন্ধ করলে কণ্ঠের মধ্যে একটা জায়গাতে নড়তে শুরু করেছে। এগুলো তো একদিনে বন্ধ হবে না। অনেক দিন করতে করতে একটা একটা করে বন্ধ হতে থাকবে। কণ্ঠের এই নড়াটা কিছুতেই বন্ধ করা যায় না। এই কণ্ঠটা যখন বন্ধ হয় তখন বুঝতে হবে এবার ধ্যানের প্রস্তুতিটা হচ্ছে। তার আগে ধ্যান হবে না।

কণ্ঠ নড়াটা যখন বন্ধ হয় তখন ধ্যানের প্রস্তুতি হয়। ধ্যানটা কি রকম যদি বোঝাতে হয় তাহলে এইভাবে বোঝান যেতে পারে। মনে করা যাক এই দেওয়ালে একটা বিন্দু দেওয়া আছে। এখন এই বিন্দুর উপরই যদি মনকে একাগ্র করা হয়, এই বিন্দু ছাড়া আর কিছু নেই। তাতেই কিন্তু মন একাগ্র হয়ে যাবে। এটার ওপরেও যদি ধ্যান করা হয়, কিছুক্ষণ বিন্দুর দিকে তাকিয়ে নিয়ে চোখটা বন্ধ করে দেওয়া হল। এরপর এই বিন্দুকেই চিন্তা করে যাচ্ছি, মাথায় আর কোন চিন্তা আসতে দেওয়া হচ্ছে না। এইটাই ধ্যান। যখন ঈশ্বর চিন্তন করা হয় তখন এই একই জিনিষ করা হয়। গুরু যেখানে ধ্যান করতে বলে দিয়েছেন, হৃদয়ে কিংবা কপালে যেখানেই হোক সেখানে ইষ্টকে বসিয়ে শুধু ইষ্টের চিন্তা করে যাচ্ছে। চিন্তা করতে গেলেই মনটা ঐ জায়গা থেকে সরে যায়। সরে যায় শুধু না, সরতে বাধ্য। কি রকম বাধ্য?

ভীষ্ম বলছেন ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব যদা পিণ্ডীকরত্যম্। এষ ধ্যানপথঃ পূর্বো ময়া সমনুবর্ণিতঃ।। তস্য তৎ পূর্বসংরক্ষমাভূনঃ ষষ্ঠমাস্তরম্। স্মুরিষ্যতি সমুদ্রভ্রাতা বিদ্যদম্বুরে যথা।। জলবিন্দুর্যথা লোলঃ পর্ণস্থঃ সর্বতশ্চলঃ। এবমেবাস্য চিত্তঞ্চ ভবতি ব্যানবর্ত্তনি।। ১৩/১৮৮/১০-১২। অনেক চেষ্টা করে যখন ইন্দ্রিয় সমেত মনকে ধ্যানে বসান হয়, এখানে আমি সাকারের ধ্যান করছি, কি নিরাকারের ধ্যান করছি তাতে কিছু আসে যায় না, বসালেই তখন মন বসবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই, কালো আকাশে যেমন বিদ্যুৎ চমকায় ঠিক তেমনি বিষয়গুলো চমকে ওঠে। আর মনটা দুম্ করে তার দিকে চলে যায়। বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর পাতার ডগায় যে বৃষ্টির জল জমে থাকে আর বাতাসে জলের ভারে পাতাটা দুলতে থাকে ঠিক তেমনি ধ্যানের সময় মনটা নড়তে থাকে। মন নড়বেই কিছু করার নেই, এইভাবেই ধ্যান শুরু হয়। তখন মনকে যদি জোর করে ইষ্টের উপর বসান হয় এবার মন পথে চলতে শুরু করে ঠিকই কিন্তু একটু পরেই পথ থেকে ছিটকে বাতাসের মত চঞ্চল হয়ে ওঠে। বলছেন, ধ্যান করার সময় নানান রকমের উপদ্রব আসতে শুরু হয়, কিন্তু এটাই স্বাভাবিক। তখন কি করতে হয়? বলছেন, যতই মন চঞ্চল হোক, যতই উপদ্রব আসুক, যতই কষ্ট হোক ধ্যান করা বন্ধ করতে নেই। যখন একবার বুঝে নিল, আরে আমার মন চঞ্চল হয়ে যাচ্ছে, তখন বুঝতে হবে মনের খুবই দুরবস্থা। তাও জোর করে বসতে হয়, কারণ আসন সিদ্ধিটা আগে দরকার। সাধারণ লোকেদের জন্য জপ। জপ যখন করতে বসে তখন প্রথমেই পা চুলকাতে শুরু করবে, তারপর দেখবে কানটা সুরসুর করছে, হয়ত পিঠটা চিড়বিড় করছে। এটাই স্বাভাবিক। এই যোগবিদ্যু গুলো আসবেই, জপ করতে বসলে ঘুম আসবে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ চুলকাতে বা জপ করার কয়েক দিন পর থেকে শরীর খারাপ হতে শুরু করবে। এই বিদ্যুগুলো কেটে যাওয়ার পর দেখা যাবে দুনিয়ার যত রকমের চিন্তা এসে জপকে বন্ধ করে দিচ্ছে। জপে বসলে কি কাজ করলে ভালো হতে, কোন কাজ করাটা ঠিক হয়নি সব ধরনের কাজের চিন্তা এসে যাবে। মহাভারতের সময় এনারা মানুষের মনকে কিভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

আমাদের মনের সব থেকে বড় সমস্যা স্নেহ। স্নেহ মানে, যেটা দিয়ে একটা জিনিষকে ভেজান হয়। তেল, ঘি এগুলোকে বলা হয় স্নেহ পদার্থ। একটা জিনিষে তেল লাগালে সেটা পিচ্ছিল হয়ে যায়, কথায় বলে তুই খুব তেল মারছিস। স্নেহ দিয়ে সম্পর্ককে সহজ করা হয়। কারকে ভালোবাসা মানে তার প্রতি স্নেহাসিক্ত। যার যেটার প্রতি স্নেহ থাকবে ধ্যানের সময় সেটাই মনের মধ্যে ঘুরতে থাকবে। আমি আমার নাতিকে খুব ভালোবাসি, তার মানে আমার মন স্নেহাসিক্ত। ধ্যানে বসলে ঘুরে ফিরে নাতির কথাই মনে আসবে। তখন নিজের প্রতি রোখ করতে হয়, এই আমি এক ঘন্টা আসনে বসলাম, বাড়িতে আগুন লাগুক, বোমা পড়ুক আমি নড়ছি না। তখন মন আবার অন্য খেলা করতে শুরু করবে। তখন মন বলবে, অনেক দিন পরে বসলে তা চল্লিশ মিনিট তো বসলে আর কতক্ষণ, এবার উঠে পড়লে হয়, কাল নাহয় এক ঘন্টা বসবে। এই কাল যখন এসে গেল তখন পুরো প্রচেষ্টাটাই নষ্ট হয়ে যাবে। বলছেন মনোনিগ্রহ পূর্বক ধ্যান করতে। এখানে যোগের কথা বলা হচ্ছে, যোগ মানে ধ্যান। মনোনিগ্রহ মানে মনটাকে পুরো নিয়ন্ত্রিত করে ধ্যান করতে হবে। নিয়ন্ত্রিত মানে জগতের প্রতি যে স্নেহ আছে, সেই স্নেহটাকে পুড়িয়ে দিতে হবে। জগৎ চলে তেলের উপর, তেল মানে স্নেহ, আর

আধ্যাত্মিক জীবনে এই তেলটাকে শুকিয়ে দিতে হয়। আমাদের শরীর থেকে ঘামের সাথে এক ধরনের তেল বেরোয়, সেই তেল লেগে জামা নোংরা হয়। ডেটারজেন্ট দিয়ে কাচা মানে জামার তেলটাকে ছাড়িয়ে দেওয়া। ধ্যান করা মানে জামা কাপড় কাচা, ধ্যান করা মানে মন থেকে তেলটাকে ছাড়িয়ে দেওয়া। মন থেকে যখন সব স্নেহ শুকিয়ে যাবে তখন কি হয়? বলছেন দিব্য সুখ অনুভব হতে শুরু করে। যোগীরা ধ্যানে যে সুখ পান এই সুখ জাগতিক কোন সুখের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

যুধিষ্ঠির সব শুনে বলছেন ‘আপনি তো ধ্যানের কথা বললেন, কিন্তু আমরা তো শুনেছি জপ করলেই হয়। এই জপ কি একটা স্বতন্ত্র পথ? না এটা যজ্ঞেরই একটা অঙ্গ? আর জপ করলে কি হয় আমাদের একটু বুঝিয়ে দিন’। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন শুনে পিতামহ ভীষ্ম বলছেন ‘প্রাথমিক অবস্থা জপ করতে হয়, ব্রহ্মচারী সাধক যারা তাদের জপ অবশ্যই করতে হয়। জপ করতে করতে কর্ম নিবৃত্তি এসে যায়’। এই যে কর্ম নিবৃত্তির কথা বলছেন, আসলে খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব যে বেশীর ভাগ সময়ই আমরা কাজকে নিজেদের মধ্যে জড়িয়ে নিই, কাজ আমাদের কাছে নিজে থেকে আসে না। গায়ের জোরে আমরা কাজকে ডেকে আনি। অনেক জপ যখন করা হয় তখন এই আলতু-ফালতু কাজগুলো খসে যায়। যতটুকু কাজ না করলেই নয় তার বাইরে আর কাজে জড়াতে মন চাইবে না। ভীষ্ম আরও বলছেন ‘জপ করতে করতে জপ থেকে একটা সিদ্ধাই আসে। ঐ শক্তিকে আশ্রয় করে সে পরে ধ্যানের দিকে সহজে এগোতে পারে’। আবার অনেকে আছেন যাঁরা জন্ম থেকেই ধ্যানসিদ্ধ, যেমন স্বামীজী ছিলেন। জপের প্রথা প্রত্যেক ধর্মেই আছে। খ্রীষ্টানরা রোজারীকে খুব গুরুত্ব দেয়, ইসলাম ধর্মের মৌলবীরাও জপের জন্য মালা ব্যবহার করে, তাতে নিরানব্বুইটা দানা থাকে, আল্লার নিরানব্বুইটা নাম তাতে জপ করে। আল্লার নিরানব্বুইটা নাম জপ করতে করতে মনটা স্থির হয়ে যায়। তাতে তার মধ্যে একটা শক্তি আসে, ঐ শক্তি যখন পায় তখন সে সহজে ধ্যানের দিকে এগোতে পারে। সেইজন্য যারা ধ্যান করতে পারেনা তাদের জন্য প্রথমে জপ করাটা অত্যন্ত আবশ্যিক বলা হয়।

এখানে একটা কথা বলছেন, যে ঠিক ভাবে জপ করে না সে মৃত্যুর পর নরকে যায়। এখানে আবার নরককে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, সে মুক্তি পায় না, মুক্তি না পাওয়ার জন্য তাকে পুনর্জন্ম নিতে হয়, পুনর্জন্ম মানেই নরক। আমাদের পরম্পরাতে যেমন বলা হয় জপ করার সময় আঙুলে ফাঁক রাখতে নেই। আঙুলে ফাঁক থাকলে নাকি জপের ফল সব ঐ ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়। ফল বেরিয়ে যাবারই কথা, কারণ হাতের আঙুল আলগা মানে আমার মনটাও আলগা হয়ে আছে। মন যার আলগা হয়ে আছে তার আর জপ কি করে হবে! সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য হল মনটাকে স্থির করা। নাচ করতে করতে কি জপ হয়? কিন্তু অনেক বাবাজীরা নাচ করতে করতে জপ করতে বলছেন। যখন কীর্তন করছে সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু জপের সময় পুরো শরীরটাকে স্থির করে বসাতে হবে আর শরীর মন পুরো সজাগ থাকবে। যদি অবমানে কুরুতে ন প্রীয়াতি ন হয্যাতি। ঈদৃশো জাপকো যাতি নিরয়ে নাত্র সংশয়ঃ। ১৩/১৯০/৪। মানে মন্ত্রের প্রতি যার ভালোবাসা নেই তখন সেই মন্ত্রের জপ করলে কোন ফল হয় না। অন্য দিকে জপ যারা খুব বেশী করে, কয়েক দিন পর তাদের খুব অহঙ্কার এসে যায়। আমি কত জপ করছি, এই অহঙ্কার আসবেই, আর অপরের প্রতি একটা তচ্ছিল্য ভাব আসতে বাধ্য। জাপকদের কাছে এটা এক বিরাট সমস্যা। যারা জপ করছে শুধু তাদেরই নয়, যারাই একটু ধার্মিক হয়ে গেছে তারা অপরকে মনে করে এরা কিছুই না। ভীষ্ম বলছেন এই ধরনের লোকেরা নরকে অবশ্যই যাবে।

অবিধ্যাপূর্বকং জপ্যং কুরুতে যশ্চ মোহিতঃ। যত্রাস্য রাগঃ পততি তত্র তত্রোপপদ্যতে। ১৩/১৯০/৬। মোহে পড়ে যে জপ-ধ্যান করছে, মোহ মানে মনের মধ্যে একটা কামনা বাসনা আছে, যেমন আমার ছেলের চাকরি হচ্ছে না। এবার আমি জপে বসে গিয়ে ভাবছি, চাকরি তো হবেই আমার জপের একটা ফল আছে না! এই মনোভাব নিয়ে যারা জপ করে তারাও নরকে গিয়ে পড়ে। জপের ফল স্বরূপ যারা ঐশ্বর্য কামনা করে তারাও নরকে গিয়ে পড়ে। এখানে আবার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন – যারা নিশ্চিত করে নেয় যে আমি এত সংখ্যা জপ করব, নিশ্চিত করে জপে বসে যখন দেখে মনটা স্থির হচ্ছে না, তখন পুরোটা না করে উঠে পড়ে, তারাও নরকে গিয়ে পড়ে। এই এতগুলো কথা এখানে কেন বলা হল? আমরা কিভাবে জপ করব সেটা আমাদের গুরুরা বলে দিয়েছেন, সেখানে আলোচনার কিছু নেই। কিন্তু জপের উদ্দেশ্য হল দুটো, একটা উদ্দেশ্য হল মনটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল অহং নাশ। এই যে এতগুলো কথা বলা হল, এটা করবে না, সেটা করবে না, এর একমাত্র কারণ হল আমাদের মনটাকে নিয়ন্ত্রিত করা। তারপর বলা হল তুমি ফলের দিকে নজর দেবে না, আর শেষে তোমার অহংটাকে নাশ কর। কর্মযোগ যেমন, জপটাও

একটা কর্ম, ধ্যানটাও কর্ম। মন দিয়ে যেটাই করা হয় সেটাকেই কর্ম বলা হয়। যখন ভগবানের ধ্যান করছি তখন মন দিয়েই করছি, সেইজন্য ধ্যানটাও কর্মের মধ্যেই পড়ে। কর্মযোগে বলা হয় যে কোন কর্মই যখন করা হবে তখন সেই কর্মটা পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে আর কোন ধরনের ফলের আকাঙ্ক্ষা করতে নেই। তখনই মানুষ সফল হয়। এরপর অনেক কাহিনী এনে দেখানো হচ্ছে কোন্ ব্রাহ্মণ কিভাবে জপ করে উর্দ্ধলোকে গেল। এগুলো আমাদের আলোচ্য নয়।

যুধিষ্ঠির এবার যোগের ব্যাপারে ভীষ্মকে কিছু বলতে বলছেন। যোগের কথা বলতে গিয়ে ভীষ্ম পুরনো একটা কাহিনী নিয়ে আসছেন, যেখানে এক গুরু আর শিষ্যের কিছু কথা হয়েছিল। গুরু শিষ্যের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, ঈশ্বরের যে মাহাত্ম্য বা লীলাকে যখন বর্ণনা করা হয় সেটাও তখন এক ধরনের যোগ। বলছেন *বাসুদেবঃ পরমিদং বিশ্বস্য ব্রহ্মণো মুখম্। সত্যং জ্ঞানমথো যজ্ঞস্তিতিক্ষা দম আর্জবম্।* ১৩/২০৭/৯। পুরো বেদের যে মুখ, মুখ মানে সার, যেমন দুধের সার মাখন, তেমনি সমগ্র বেদের যে সার সেটা হল প্রণব, প্রণব মানে ওঁ। এই প্রণবের সাথে যত রকমের যে শুভ সংস্কার, যেমন সত্য, জ্ঞান, যজ্ঞ, তিতিক্ষা, ইন্দ্রিয় সংযম, সরলতা ইত্যাদি এর সব কিছু হলেন শ্রীকৃষ্ণ। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে মহাভারতের ভগবান হলেন শ্রীকৃষ্ণ। এটাই যখন অন্য শাস্ত্রে যাবে তখন বলবে যা কিছু আছে সব শিব বা রাম বা আল্লা। তার মানে জগতে শুভ যা কিছু আছে সব ভগবান। আসলে শুভ যা কিছু আছে সব ভগবান আর অশুভ যা কিছু আছে সেটাও ভগবান। কিন্তু সেমেটিক ধর্মে এটাই পাল্টে যায়। খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মে অশুভ জিনিষগুলো শয়তান করছে। কিন্তু মহাভারতে যখন উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে যাবে তখন সবটাই ভগবানের বলে দেখা হয়। তবে ভগবানের যে শুভ রূপ সেটার দিকেই আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হয়। ভগবানের শুভ রূপ হল বেদ, সত্য, সরলতা। এগুলো তাঁর শুভ রূপ। সেইজন্য যখন ভগবানের নাম করা হয় বা তাঁর ধ্যান করা হয় তখন ভগবানের এই শুভ রূপ গুলো স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। ভগবানের কথা যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে জরুরি হল তাঁর থেকে যারা নীচে পড়ে আছে তাদেরকে ভগবানের এই শুভ রূপের কথা শোনাবেন। গীতাতেও এই একই কথা বলা হয়েছে। যখন ভাগবত কথা শোনান হয়, ভাগবত কথা মানে, যখন খ্রীস্টান ফাদার বাইবেল শোনাচ্ছেন, মৌলবীরা কোরানের কথা শোনাচ্ছেন, এইগুলোই ঈশ্বরীয় কথা, ঈশ্বরীয় কথা মানেই ভাগবত কথা, তখন এই ভাগবত কথা শোনানটাও একটা সাধনা, এই সাধনার দ্বারাও একজন উচ্চস্তরে চলে যেতে পারে। এখানে গুরু নিজের শিষ্যকে বলে যাচ্ছেন।

*যথাস্থকলীকায়ামন্তর্ভূতো মহাদ্রুমঃ। নিষ্পন্নো দৃশ্যতে ব্যক্তমব্যক্তাং সম্ভবন্তথা।* ১৩/২০৮/২। অস্থখ বা বটবৃক্ষের অত ছোট বীজ। কিন্তু যখন মাটিতে পড়ে জল, আলো, বাতাস পায় তখন সেই ছোট একটা বীজ থেকে অত বিরাট মহিরুহে দাঁড়িয়ে যায়। বোটানিক্যাল গার্ডেনের ঐ বিশাল বট গাছের কথা একবার ভাবুন, যার মূল শেকড়টাও হারিয়ে গেছে, ভাবা যায় একটা অত ছোট বীজ থেকে এই গাছটা বেরিয়ে এসে এই বিশাল বটবৃক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। যখন ঈশ্বর সৃষ্টি করেন তখন একটা বিন্দু থেকে সৃষ্টিটা করেন। ঐ বিন্দুটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিন্তু ঐ ছোট সূক্ষ্ম বিন্দু থেকে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বেরিয়ে আসে। যাঁরা এটা লিখছেন তাঁরা কি ঐ ছোট বীজ থেকে এই বিশাল বৃক্ষকে বেরিয়ে আসতে দেখেছেন? ঐ সূক্ষ্ম বিন্দু থেকে ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি হতে দেখেছেন? আমরা জানিনা। কারণ বেদেই বলছে সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে এটা কে বলবে? কারণ এই বিশ্বের সব থেকে প্রাচীন যাঁরা তাঁরা হলেন দেবতারা কিংবা ঋষিরা, এঁরাও তো সৃষ্টির পরেই হয়েছেন। তাঁরা জানবেন কিভাবে যে কি করে সৃষ্টি হল? জানার কোন পথই নেই। সেইজন্য বলা হয় এগুলো হল সব এক একটি মডেল। বাইবেলে বলছে ভগবান সৃষ্টি করলেন, প্রথম দিন তিনি অমুক সৃষ্টি করলেন, দ্বিতীয় দিন অমুক করলেন। যে বলছে সে কি তখন ওখানে ছিল এগুলো দেখার জন্য? না অন্য কেউ কি ছিল সেগুলো দেখার জন্য? তা এনারা বলবেন ভগবান বলেছেন। ঠিক আছে ভগবান তাঁকে বলেছেন আমি এইভাবে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু আজকের দিনে যদি বলে ভগবান বলেছেন আমি এইভাবে সৃষ্টি করেছি এই কথা কে বিশ্বাস করবে? আসলে ঋষিরা যখন ধ্যানের গভীরে যান তখন তাঁরা চিন্তা করে দেখেন এইভাবেই সৃষ্টি হতে হবে এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। শেষমেশ বলছেন অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদার্থ থেকে এই সৃষ্টিটা এসেছে। আমি বলতে পারি আমি এই কথা বিশ্বাস করিনা। বিশ্বাস না করলে কি আর করা যাবে, কিন্তু এগুলো এইভাবেই হয়। যারা বায়োলজি পড়েছেন তারা জানেন একটা মানুষ যখন মায়ের গর্ভে প্রথম আসে, অর্থাৎ যখন ডিম্বানুটা প্রথম ফার্টিলাইজ হয়েছে তখন কয়েকটি কার্বন মলিক্যুলস, কটি অক্সিজেন মলিক্যুলস, কটি হাইড্রোজেন মলিক্যুলস, যেটাকে ডিএনএ বলছে, যখনও সেল গুলোর বিভাজন শুরু হয়নি তার ঠিক আগে একেবারে প্রথম অবস্থায় তাতে এই কটি মলিক্যুলসই থাকে। এখন যদি কোন ষাট বছরের লোককে বলা হয় ষাট বছর আগে আপনি কয়েকটি মলিক্যুলস ছিলেন যার ওজন এক গ্রামও ছিল না, সে বিশ্বাসই করতে চাইবে না, অথচ এইটাই সত্য। এই ব্যাপারটাকেই যখন যুক্তিগত

ভাবে জগতের ক্ষেত্রে নিয়ে গেছেন তখন যেটা দেখেছেন সেটাই বলছেন। এই যে অব্যক্ত সেইখান থেকেই এই পুরো ব্যক্তিটা এসেছে।

চুম্বক পাথর যেমন লোহাকে নিজের দিকে টেনে নেয়, ঠিক তেমনি একজন মানুষ যখন জন্ম গ্রহণ করে, চুম্বকের মত যত সংস্কার জমে আছে সবটাকে সে নিজের ভেতরে টেনে নেয়। আমি, আপনি সবাই চুম্বক আর দেখা যাবে ঠিক ঐ সব জিনিষকেই টেনে আনবে যেসব জিনিষ আমাদের ভেতরে রয়েছে। যে মনে প্রাণে আচরণে কথায় বার্তায় সম্পূর্ণ ভাবে সৎ লোক তার সঙ্গে একটা দুর্নীতিগ্রস্ত লোকে কখনই বন্ধুত্ব হবে না বা মেলামেশা হবে না। দুজন দুজনের থেকে ছিটকে যাবে, সৎ লোকের ধারে কাছে কোন অসৎ লোক দাঁড়াতেই পারবে না। কিন্তু একজন সৎ লোক আরেকজন সৎ লোককে সব সময় চুম্বকের মত টেনে আনবে। ইংরাজীতে একটা প্রবাদই আছে Man is known by the company he keeps কেন? আমার যা সংস্কার তার মতই আমি লোকজনকে টানব। দ্রৌপদীকে যখন পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণের বেশে বরণ করে নিয়ে এলেন তখন রাজা দ্রুপদের মনে সংশয় এসেছিল ব্রাহ্মণের বেশে এরা কারা। তখন দ্রুপদ পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ করে ভেতরে নিয়ে একটা ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে। সেই ঘরে সব রকমের জিনিষ রাখা আছে, চাল-গম রাখা আছে, টাকা-পয়সা রাখা আছে, ভালো বই রাখা আছে আবার নানা রকমের অস্ত্রশস্ত্রও রাখা আছে। দ্রুপদ লুকিয়ে দেখছে এরা কোন জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। লুকিয়ে দেখছেন পাঁচ ভাই মিলে যেখানে অস্ত্রশস্ত্র রাখা আছে সেইখানেই ঘুরঘুর করতে করতে সব অস্ত্রগুলো দেখতে শুরু করেছে। ভীম গদা তুলে দেখছে, একজন তলোয়ার তুলে দেখছে। তখন দ্রুপদ বলছেন এরা নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় বলেই অস্ত্রশস্ত্র দেখছে, ক্ষত্রিয় না হলে এরা অন্য জিনিষ দেখত। অন্য কারকে দেখার দরকার নেই, শুধু দুটো দিন আমি যদি নিজেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করি, আমি কার কার সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসছি, কোন কোন জিনিষকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালো লাগে, অবসর সময়ে আমি কি করতে চাইছি, পরিস্কার বুঝে নিতে পারব আমার মনে কি আছে। আমাদের কোন জ্যোতিষের কাছে যাবার দরকার নেই, শুধু নিজেই এই ভাবে বিশ্লেষণ করলেই বুঝে নিতে পারব আমার মনে কি আছে, আমি কি ধরণের লোক, কোথায় আমার দুর্বলতা। ভীষ্ম এখানে বলছেন, চুম্বক যেমন লোহাকে টেনে নেয় ঠিক তেমনি মানুষ নিজের সংস্কারকে টেনে নেয়। সংস্কারগুলোকে টানার ফলে কি হচ্ছে? তার চারিপাশে ঐ জিনিষগুলোই হাজির হয়ে যায় যেটার জন্য সে প্রস্তুত।

সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে এখানে ভীষ্ম নাসদীয়সূক্ত থেকে বলছেন নর্ন ভূ খং দ্যৌর্ভূতানি নর্ষয়ো ন সুরাসুরাঃ। নান্যদাসীদৃতে জীবমাসেদুর্ন তু সংহিতম্।।১৩/২০৮/৫। প্রথমে চৈতন্য ছাড়া কিছুই ছিল না। তখন পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ, ভূত, ঋষি, অসুর অন্য কিছুই ছিল না। হিন্দুধর্মের এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। অন্য ধর্মেও তাই বলে ভগবান ছাড়া কিছুই ছিল না। প্রথমে কি কি ছিল না বলতে গিয়ে বলছেন, পৃথিবী ছিল না, আকাশ ছিল না, স্বর্গ ছিল না, ঋষিরা ছিলেন না, অসুররা ছিল না, চেতন ছাড়া কিছুই ছিল না। চেতন আর জড়ের সংযোগটাও ছিল না। তাহলে কি ছিল তখন? পূর্বং নিত্যং সর্বগতং মনোহেতুমলক্ষণম্।। অজ্ঞানকর্মনির্দিষ্টমেতৎ কারণলক্ষণম্।।১৩/২০৮/৬। আত্মা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যাঁরা ভক্তিমার্গের তাঁরা বলেন ঈশ্বরই ছিলেন, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু ছিল না। জ্ঞানমার্গের সাধক বলে আত্মাই ছিলেন, আত্মা ছাড়া আর কিছু ছিল না। নিত্যং সর্বগতং আত্মাই আছেন, আত্মা অনন্ত সর্বত্র তিনিই বিদ্যমান। মনের হেতু আত্মা, মন তারপরে জন্ম নেয়। লক্ষণম্ মানে গুণ, যেটা দিয়ে একটা জিনিষকে জানা যায়। যেমন আমি মানুষ, আমার লক্ষণ দিয়ে জানা যায় আমি মানুষ, আমার দুটি হাত, দুটি পা, আমার মন, এগুলো লক্ষণ। কিন্তু আত্মার কোন লক্ষণ হয় না, সেইজন্য আত্মাকে নিরাকার বলা হয়। সেই চৈতন্য থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়ে হয়ে যখন আমাদের অবস্থায় আসে, তেলিরা যেমন বীজকে ঘানিতে দিয়ে পিষে পিষে তেল বার করে ঠিক সেই রকম আমাদের যত আসক্তি, ভোগ পিষে পিষে আমাদের ভেতর থেকে সব বার করতে থাকে। এই আসক্তি যদি কারুর না থাকে তাহলে এই জগৎ তাকে কিছু করতে পারবে না। জগৎ কাকে কষ্ট দেবে? যার মধ্যে আসক্তি আছে। এরপর আসক্তির কার্যকলাপের বর্ণনা করা হচ্ছে। কিভাবে মানুষ আসক্তিতে আবদ্ধ হয়ে আরও নীচের দিকে যেতে থাকে। এই আসক্তি থেকে বেরোতে হলে মানুষকে ব্রত কিভাবে করতে হয়, তপস্যা কিভাবে করতে হয়, ব্রহ্মচর্য কিভাবে পালন করতে হয় বলা হল শেষ করছেন।

### ইন্দ্র ও বলিরাজার সংবাদ

এরপর আসছে ইন্দ্র আর বলির সংবাদ। দেবতা আর দৈত্যরা আসলে ভাই ভাই, অদিতির সন্তানরা দেবতা হলেন আর দিতির সন্তানদের দৈত্য বলা হত। অদিতি আর দিতি ছিলেন আবার দুই বোন। দেবতাদের রাজা ছিলেন ইন্দ্র আর



দৈত্যদের রাজা হলেন বলি। বলি খুব ভালো লোক ছিলেন। তিনি প্রচুর দান-ধ্যান করতেন। বলি এত দান-ধ্যান করতেন যে তাতে ইন্দ্র খুব ভয় পেয়ে গেছে। এই সময় বিষ্ণু বামন অবতার হয়ে জন্ম নিলেন। বলি একটা যজ্ঞ করছিল, দেবতার কায়দা করে বলির কাছে বিষ্ণুকে পাঠিয়েছে। বিষ্ণু বামন অবতার রূপে বলির যজ্ঞে পৌঁছে গেছেন। যজ্ঞে বলি বলে দিয়েছিলেন আমার কাছে যে যা চাইবে আমি দান করে দেব। বামন অবতার ব্রাহ্মণ রূপে গিয়ে বলিকে বলেছেন আমাকে ভূমি দান করুন। বলিকে সবাই নিষেধ করছে আপনি এই ব্রাহ্মণকে কিছু দান করতে যাবেন না। বলি বলে দিয়েছে, আমাকে দিতেই হবে, যেহেতু আমি কথা দিয়েছি। ব্রাহ্মণকে বললেন আপনাকে তিন পাদ জমি দেব। ব্রাহ্মণ এখন দু পা দিয়ে পুরো ব্রহ্মাণ্ডকে মেপে নিয়েছেন। এবার তৃতীয় পা কোথায় রাখবেন। বলি সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাথাটা পেতে দিয়ে বললেন আপনার তৃতীয় পা এখানে রাখুন। বলির মাথাটাও এখন চলে গেল। দৈত্যরাজের এখন আর কোথাও থাকার জায়গা নেই। তখন তাকে পাতাল লোকে পাঠিয়ে দেওয়া হল, তুমি পাতাল লোকে চলে যাও। পাতাল লোকে পাঠিয়ে দিয়ে বিষ্ণু খুব খুশী হলেন। দৈত্যরাজ জানেন যে আমার বিনাশ হবে তাও তিনি তাঁর সত্যকে পালন করেছেন। দৈত্যরাজকে পাতাল লোকের রাজা করে দেওয়া হল। ইন্দ্র এখন একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে পুরো অহঙ্কারে মত্ত হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এখন পাতালে চলে গেছে। অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে ইন্দ্র ব্রহ্মার কাছে গিয়ে ঔদ্ধত্য নিয়ে বলছেন ‘পিতামহ! বলুন কোথায় সেই বলি, আমি গিয়ে ওকে শেষ করে দেব’। ব্রহ্মা তখন ইন্দ্রকে বলছেন ‘ইন্দ্র! আমি তোমাকে বলির খবর দেব ঠিকই কিন্তু তুমি কিন্তু ওকে বধ করবার ইচ্ছা করো না’। ইন্দ্র যখন কথা দিলেন বলিকে বধ করবেন না তখন ব্রহ্মা বলে দিলেন ‘তুমি পাতাল লোকে যাও, সেখানে যেখানে কোন একটা ঘরে যদি দেখ একটা ছাগল, ভেড়া, উট, গাধা এই ধরনের কোন প্রাণি একা একা আছে তখন বুঝবে ঐটাই বলিরাজ। ইন্দ্র এইবার পাতাল লোকে গিয়ে খুঁজতে শুরু করেছে। তারপর দেখে একটা ফাঁকা ঘরে একটা গাধা দাঁড়িয়ে আছে। ইন্দ্র বুঝে গেছেন এই হল বলি। এইবার ইন্দ্র পুরো নিজের স্বভাবে চলে গেছে, হাতে বজ্র নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর বলিকে এখন খেলাতে শুরু করেছে। এইটাই ইন্দ্র ও বলির সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

ইন্দ্র এবার বলিরাজকে নানা রকমের কুটুক্তি করতে শুরু করেছে। তোমার নাকি বিরাট ঐশ্বর্য ছিল, সেই ঐশ্বর্যের জোরে তুমি নাকি খুব দান করে বেড়াতে। কোথায় গেল তোমার সেই ঐশ্বর্য, আর দানই বা কি করছ এখন। বলি তখন বলছেন ‘ইন্দ্র তুমি যে এই মুখের মত কথা বলছ এতে আমার খুব আশ্চর্যবোধ হচ্ছে, কারণ তুমি ভুলে যেও না তুমি দেবতাদের রাজা। অপরকে কষ্ট দেওয়ার মত, আঘাত দেওয়ার মত কথা তোমার মত দেবতার মুখে মোটেই শোভা পায় না। তুমি কিসের দেবতাদের রাজা! আমি এখন দূরবস্থায় পড়ে আছি, আর তাই তুমি আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এই ধরনের কথা বলছ। এই ধরনের আচরণ দেবতাদেরই শোভা পায় না, তুমি আবার দেবতাদের রাজা’। বলিরাজের কথা শুনে ইন্দ্র একটু চমকে গেলেন। ইন্দ্র তাও তার অহঙ্কারকে প্রশমিত করে কুটুক্তি করা থেকে বিরত হননি। বলিরাজ তখন বলছেন ‘তুমি জিজ্ঞেস করছ আমার ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার কোথায়? তাহলে শোন আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। আমার সব ঐশ্বর্য লুকিয়ে রাখা আছে। আমার সময় এখন ভালো নেই, যখন সময় ভালো আসবে তখন সব কিছুই আবার প্রকাশ করা হবে। আর দেখো আমি এখন মার খেয়ে পড়ে আছি আর তুমি এখন ক্ষমতার শীর্ষে উঠে আছ, এই সময় তুমি যদি আমাকে পীড়াদায়ক কথা বল, সেটা কিন্তু তোমার জন্য মঙ্গলজনক কিছু হবে না। যাদের শুদ্ধ বুদ্ধি আর যাদের মন জ্ঞানে পরিতৃপ্ত, তারা তাদের সমৃদ্ধি হলে অহঙ্কারে ফুলে ফেঁপে ওঠে না, আর শোকের কিছু হলে তারা মুষড়ে গিয়ে অবসাদে চলে যায় না’। যদি কাউকে দেখা যায় সমৃদ্ধি পেয়ে খুব উৎফুল্ল হয়ে লাফালাফি করছে কিংবা খারাপ সময় এলে একেবারে ভেঙে পড়ছে, তখন বুঝতে হবে হয় এর বুদ্ধি শুদ্ধ নয় আর তা নাহলে এর মধ্যে জ্ঞান গান্ধীর্ষ নেই। যাদের বুদ্ধি শুদ্ধ আর তার সঙ্গে ভেতরে জ্ঞান গান্ধীর্ষ আছে তারা কখনই এই রকম কাজ করবে না। বলিরাজ ইন্দ্রকে বলছেন ‘ইন্দ্র! তুমি অশুদ্ধ বুদ্ধির কারণে এই ধরনের কথা বলছ। তাই কাল যদি তোমার এই রকম দূরবস্থা হয়ে যায় যা এখন আমার হয়েছে, তখন আর এই রকমটি কথা তোমার মুখ থেকে বেরাবে না’। বুদ্ধি যখন অশুদ্ধ হয়ে যায় তখন মানুষ এই রকম কথাই বলে। যে আমার থেকে নীচে পড়ে আছে তাকে যখন আমি কটু কথা বলছি, তার মানে আমার বুদ্ধিটা অশুদ্ধ হয়ে গেছে। অশুদ্ধ বুদ্ধি মানে আজ হোক কিংবা কাল হোক আমাকে কিন্তু মাটিতে ফেলে দেবে। যখন ফেলবে তখন আমি আর দাঁড়াতেই পারব না। শুদ্ধ বুদ্ধির লোকরাও মার খায় কিন্তু ভেঙে মাটিতে পড়ে যায় না।

ইন্দ্র তখন বলছেন ‘তুমি তো এক সময় সব কিছু জয় করেছিলে, তোমার কি এই অবস্থায় পড়ে আগের কথা ভেবে মন খারাপ হয় না?’ বলিরাজ বলছেন ‘হে ইন্দ্র! কালচক্র হল স্বাভাবিক পরিবর্তনশীল। কালের চাকাটা যে কখন কোন দিকে ঘুরবে বলা যায় না। সেইজন্য আমি কখনই শোক করিনা, কারণ এই জগতে কোন কিছুই স্থির নয়’।

কালচক্রের এই স্বাভাবিক পরিবর্তনশীলতাকে বোঝা খুব মুশকিল। বিশেষ করে যারা খুব জপ-ধ্যানের দিকে মন দেন, মনটা যখন সূক্ষ্ম হতে থাকে তখন বাজে জিনিষগুলো বন্যার মত আসতে শুরু করবে। আবার যখন ভালো জিনিষ আসতে শুরু করবে সেটাকে আমরা আবার কল্পনার মধ্যেই আনতে পারব না। এই দুটো পরিস্থিতিতেই মনকে স্থির রাখাই আসল কাজ। আমরা বেশীর ভাগই কাঁচা মনের অধিকারী কিনা, তাই কোন ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের মনের আবেগকে ধরে রাখতে পারিনা। বলিরাজ বলছেন ‘আজকে আমি এই গাধার শরীর পেয়েছি, কিন্তু আমি জানি শরীর পাওয়া মাত্রই হল একটা অনিত্য ব্যাপার। এক সময় ভালো শরীর পেয়েছিলাম, আজকে গাধার শরীর পেয়েছি, আবার ভালো শরীর পাব, এতে মন খারাপ করার কি আছে’। গাধা হলেও বলিরাজের এই বোধটা আছে। ‘ইন্দ্র! যত বড়ই বিদ্বান হোক বা যত বড়ই মুর্থ হোক, যতই বলবান হোক বা দুর্বল হোক, যতই রূপবান হোক বা কুরূপ হোক কিন্তু কাল সবাইকে নিজের তেজে টেনে নেয়’। আলেকজান্ডার কত ক্ষমতাবান ছিল, সেই আলেকজান্ডার নিজের দেশেই ফিরে যেতে পারলেন না, ইংল্যান্ড যার সাম্রাজ্যে কোন দিন সূর্য অস্ত যেত না সে এখন একটা ছোট্ট দ্বীপে পর্যবসিত হয়েছে, রাশিয়া যে নিজেকে পৃথিবীর মালিক মনে করত তারও আজ টুকরো টুকরো হয়ে অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে গেছে। এখন আমেরিকা লাফাচ্ছে, কদিন পরে তাকেও আবার খুঁজে পাওয়া যাবে না। কালের গতি এমন যে কেউই এই দুনিয়ায় বেশী দিন টিকতে পারেনা। সেইজন্য যখন সমস্যা এসে যাবে তখন মুখ বুজে সহ্য করে যাও আর যখন ক্ষমতা এসে যাবে তখন বিনয়ের আশ্রয়ে চলে যাও। বলিরাজ বলছেন ‘কাল যখন কাউকে মেরে দেবে বলে ঠিক করে নেয় তাকে তার পেছন থেকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। কাল যখন কোন জিনিষকে নষ্ট করে দেবে বলে ঠিক করে নেয় তখনই কেউ তাকে নষ্ট করতে পারে, তার আগে তাকে কেউ কিছু করতে পারবে না’। শাস্ত্রে বলে, যদি সাধুসেবা করা হয়, সৎসঙ্গ করা হয়, ঈশ্বরের জপ-ধ্যান, ভজন-পূজন করা হয় তখন কাল কিন্তু তাকে নষ্ট করতে পারেনা। কর্মের বিপাকে ও প্রারন্ধে তার অনেক সমস্যা সৃষ্টি করবে কিন্তু নষ্ট করতে পারবে না। বলিরাজ বলছেন ‘সময়ই সব কিছু দেয় সময়ই সব কিছু কেড়ে নেয়, নিজের পুরুষার্থের উপর তুমি কি নির্ভর করবে’! পুরুষার্থ আমাদের করতেই হবে, পুরুষার্থ না করলে যেটা আসার সেটা আসবে না। কিন্তু যেটা আসবে আর যেটা চলে যাবে সেটা কালের হাতে। এই কালকেই কখন বলা হয় কপাল, এই কালকেই আবার ঈশ্বরের ইচ্ছা বলা হয়। কালের এই ধারণা আমাদের পরম্পরাতে অনেক প্রাচীন ধারণা।

বলিরাজ খুব সুন্দর বলছেন ‘হে ইন্দ্র! তোমার বুদ্ধি একেবারেই বালবুদ্ধি, বাচ্চা বয়সে তোমার যে বুদ্ধি ছিল আজও সেই বুদ্ধি নিয়েই তুমি চলছ। আমাদের উদ্দেশ্য বালবুদ্ধিটা পাকা বুদ্ধি করা। কিন্তু গতকাল তোমার যে বুদ্ধি ছিল আজও তোমার সেই একই বুদ্ধি। তুমি নৈষ্ঠিক বুদ্ধি পাওয়ার চেষ্টা কর’। নৈষ্ঠিক বুদ্ধি মানে যেখানে গিয়ে বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, যে বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হলে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলিকে ধারণা করা যায়। বলিরাজ বলছেন ‘আমি জানি আমরা সবাই ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র, তাই আমি এগুলোকে নিয়ে কখন শোক করিনা। আর ইন্দ্র! তুমি মনে রেখো, কাল যদি আমার অনুকূলে থাকত তাহলে তোমার হাতে বজ্র থাকলেও এক মুষ্টিঘাতে তোমাকে আমি শেষ করে দিতাম। কিন্তু আজ কাল তোমার অনুকূলে আছে বলেই তুমি এত লক্ষ্যবান্ধব করতে পারছ’।

ফরাসী লেখক বালজাকের একটা বই আছে ফরাসী ভাষায় লেখা পরে ইংরাজীতে অনুবাদ হয়েছে, বইটার নাম ‘The Donkey’ Skin গাধার চামড়া। সংক্ষেপে কাহিনীটা হল একটি যুবক আত্মহত্যা করতে গেছে তখন তাকে এক দোকানদার বাঁচিয়ে দিয়ে বলছে আমি ভারত থেকে একটা গাধার চামড়া নিয়ে এসেছি এটা তুমি নিয়ে যাও, একে তুমি যা বলবে সেই ইচ্ছাই এই চামড়া পূরণ করে দেবে। কিন্তু তার সাথে তোমার আয়ুটা কমে যাবে। এইটার উপর বালজাক একটু যুবকের জীবনের ছবিকে তুলে ধরছেন। ঐ যুবকটির মনে যে ইচ্ছাটাই হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সেটা এসে যাচ্ছে, আর যে গাধার চামড়াটা ছিল, সেই বিরাট বড় চামড়াটা দ্রুত গতিতে ছোট হয়ে আসছে। শেষে যখন চামড়া একেবারে ছোট হয়ে এসেছে তখন যুবকটি আতঙ্কিত হয়ে গেছে, আমার আয়ুও কত দ্রুত কমে আসছে। চামড়া পাওয়ার পর তখন ছ’মাসও হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যে সমস্ত রকমের ভোগ সামগ্রী এসে গেছে। এরই মধ্যে একজনের সাথে তার ঝগড়া হওয়াতে দুজনে পিস্তলবাজী করে এক অপরকে মারার জন্য লড়াই শুরু করেছে। তখন যুবকটি হাতজোড় করে বলছে ‘আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, কারণ আপনি আমাকে মারতে পারবেন না, আমি যদি ঠিক করে নিই আপনাকে আমি মারব তখন আমি যদি উল্টো দিক করেও গুলি চালাই তাও আপনি মরবেন। কিন্তু তাতে আমার আয়ুটা কমে যাবে। আর আমার আয়ু এখনও শেষ হয়নি কারণ চামড়াটা এখনও আছে। আপনি গুলি চালাবার আগেই ছিটকে যাবেন, আপনি এই কাজ করতে যাবেন না’। লোকটি কিছুতেই শুনল না। তখন যুবকটিকে তাই করতে হল, ঠিক আছে তাহলে এই লোকটাকে মেরে দিই। মনে ইচ্ছা আনলেই হল। ঠিক তাই হল লোকটা গুলি চালাতেই গুলিটা ছিটকে গেল আর যুবকটা গুলি চালাতেই লোকটার বুক

গিয়ে লেগে গেল। এটাই হল কাল। বলিরাজ তাই বলছেন কাল যদি আমার পক্ষে থাকত তোমার হাতে বজ্র থাকতেও আমি খালি হাতে মেরে দিতাম, তুমি কিছুই করতে পারতে না। বলিরাজ বলছেন ‘বুঝলে ইন্দ্র তুমিও কর্তা নও আমিও কর্তা নই, কর্তা অন্য কেউ, বেশী লাফালাফি করো না। তুমি যে মনে করছ তুমি নিজের পরাক্রমে নিজের শক্তিতে ইন্দ্রত্ব পদ পেয়েছ, তা নয়। তোমার মত হাজার হাজার ইন্দ্র এর আগে হয়ে গেছে, আর তারা সবাই কালের গতিতে চলে গেছে। সেইজন্য এই নিয়ে তুমি বেশী উৎফুল্ল হয়ে লাফালাফি করো না’। এটি একটি বিরাট অধ্যায়, ইন্দ্রকে অনেক কথা বলে শেষে কিভাবে ভালো জীবন-যাপন করবে সেই সম্বন্ধে বলছেন। এই সব কথাবার্তা চলছে, দুজনে মুখোমুখি হয়েছে। তখন দেখছে বলির শরীর থেকে লক্ষ্মী বেরিয়ে ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করে গেল। বোঝাল বলির সব ঐশ্বর্য শেষ হয়ে গেছে, এখন সব ঐশ্বর্য ইন্দ্রের কাছেই থাকবে।

**পুত্র শুকদেবকে ব্যাসদেবের উপদেশ** (বারো রকমের যোগ – উত্তম জ্ঞান কিসে হয় – শান্তি কিসে আসে – ধ্যানের মাধ্যমে পঞ্চ তত্ত্বকে জয়ে কি কি সিদ্ধাই – ব্যক্ত ও অব্যক্তের সংজ্ঞা – জগতে কত রকমের প্রাণি ও তার শ্রেণিবিণ্যাস)

যুধিষ্ঠির এখনও অনেক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, ভীষ্ম বেশীর ভাগ প্রশ্নেরই উত্তর দিতে গিয়ে এর আগের আগের কোন কাহিনী নিয়ে এসে বলছেন এই এই ঘটনায় অমুক ঋষি কি বলেছিলেন বা অমুক রাজা কি করেছিলেন এগুলো আমার জানা আছে। তখন ভীষ্ম ঐ কাহিনীটা যুধিষ্ঠিরকে বলে দিচ্ছেন। এই রকম একটি কাহিনীতে ব্যাস তাঁর পুত্র শুকদেবকে কি বলেছিলেন সেটা শুনিয়ে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ ধরে ব্যাসের কথা চলছে। এগুলো পড়ার পর মনে হয়ে মহাভারত লেখা হয়ে যাওয়ার পরে এই কাহিনীগুলিকে ঢোকান হয়েছে। ব্যাসদেব নিজের কথা এই ভাবে লিখবেন এটা ঠিক খাপ খায় না। আমাদের কাছে কাহিনী বা ঘটনা বড় ব্যাপার নয় আমাদের কাছে বড় হল জীবন দর্শনের সারটাকে বার করে আনা।

ব্যাসদেব বলছেন অথ চেন্দ্রোচয়েদেতদুহ্যেত স্রোতস্য যথা। উন্মজ্জংশ্চ নিমজ্জংশ্চ জ্ঞানবান্ প্লববান্ ভবেৎ।।১৩/২৩৩/১। মানুষ যখন নদীর স্রোতে ভেসে যেতে থাকে তখন সে যদি একটা নৌকা দেখতে পায় তখন তাড়াতাড়ি করে নৌকাতে উঠে যাবার চেষ্টা করবে। ঠিক তেমনি শোক, মোহাদি ঘূর্ণাবর্ত সমৃদ্ধ এই সংসার রূপ নদীতে মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন যদি জ্ঞানরূপী বা ভক্তিরূপী নৌকা পেয়ে যায়, সেই সময় তার প্রধান কর্তব্য হল যে করেই হোক সেই নৌকাকে আশ্রয় করে এই সংসার নদীকে যেন অতিক্রম করে যায়। সেই নৌকাতে কিভাবে আশ্রয় নেবে? ব্যাসদেব বলছেন ছিন্নদোষো মুনির্যোগান্নুক্তো যুঞ্জীত দ্বাদশ। দেশকর্মানুরাগার্থনুপায়ানিশ্চয়ঃ। চক্ষুরাহারসংহারৈর্মনসা দর্শনেন চ।।১৩/২৩৩/৩। ‘যোগ, অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হবার যে পথ, সেই যোগপথের ঠিক ঠিক আশ্রয় নেওয়ার জন্য তাকে প্রথমে হৃদয় থেকে যত রকমের কামনা-বাসনা আছে সব ত্যাগ করতে হয় আর বারো রকমের উপায়ের সাহায্য নিতে হয়’। এই বারো রকমের উপায়ের কথা আর কোন যোগশাস্ত্রে পাওয়া যাবে না। এই বারোটি হল – ১) দেশযোগ – একটা নির্দিষ্ট স্থানে আসন পেতে নিয়মিত ভাবে স্থির হয়ে বসা। ২) কর্মযোগ – এই কর্মযোগ আর গীতাতে যে কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে এক নয়। এই কর্মযোগের অর্থ হল, খাওয়া-দাওয়া, ঘুমনো, জাগা সব কাজকর্ম করা নির্দিষ্ট থাকে। আজ নিমন্ত্রণ বাড়িতে প্রচুর খাওয়া-দাওয়া করলাম, আজকে রাত দশটায় ঘুমোতে গেলাম, কোন দিন সকাল পাঁচটায় উঠছি আবার কোন দিন সাতটায় উঠছি, আর সপ্তাহে চারদিন চুটিয়ে কাজ করেই যাচ্ছি তারপর তিন দিন ধরে বিশ্রামই করে যাচ্ছি এই করলে যোগী হওয়া যায় না। যোগীদের এই জীবন ধারা চলে না। যোগীকে সাতদিনই কাজ করতে হবে, কাজের সময়টা পাল্টান যেতে পারে। যোগীর সব কিছুই নিয়মে ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলবে। ৩) অনুরাগযোগ – আমাকে পরমাত্মা বা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি রেখে এই জগৎ সংসার থেকে বেরোতে হবে, এইটাকে বলা হয় অনুরাগযোগ। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি আর জগতের প্রতি বৈরাগ্য বিচার করে করে জাগাতে হয়। ৪) অর্থযোগ – আমার জীবন চালাতে যতটুকু জিনিষের দরকার তার বাইরে কোন কিছু না রাখা। অনাবশ্যক জিনিষ থেকে মনকে সরিয়ে আনতে হবে। ৫) উপায়যোগ – যে আসনে বসলে ঠিক ঠিক ধ্যান হবে সেই আসনকে অবলম্বন করে স্থির হয়ে বসা। দেশযোগে বলা হয়েছিল একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বসতে হবে আর উপায়যোগে বলছেন একটা নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে আসন করে বসা। ধ্যানে বসার কতকগুলি নির্দিষ্ট আসন আছে, পদ্মাসন, অর্ধপদ্মাসন, সুখাসন ইত্যাদি। সব আসনে কিন্তু ধ্যান হবে না। ৬) অপায়যোগ – বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বামী, বাবা, মা সবার থেকে মনকে সরিয়ে নেওয়া। সংসারে, সমাজে থাকতে গেলে পাঁচজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়, কিন্তু কারুর সাথে মমত্ব থাকবে না। ঠাকুর এইটাকে বলছেন, ঈশ্বরের দিকে অনুরাগ ভক্তি হলে সংসারকে পাতুকুয়া বলে মনে হয় আর আত্মীয়দের কালসাপ দেখে। সংসারটা পাতুকুয়া আর বাড়ির লোক কালসাপ, ঐ কুয়ের মধ্যে পড়লে কি হবে বুঝে নিতে হবে। বাড়ির লোকেদের

কালসাপ বললে হয়ত খেতেই দেবে না। ঠাকুর যেটা বলছেন মহাভারত এখানে একই কথা বলছে। অপায়যোগে বাড়ির লোক, বন্ধুবান্ধবদের থেকে মন যদি না সরিয়ে আনা হয় তাহলে আর বাঁচার কোন পথ নেই। লোকেরা এসে বলে সংসারে থেকে কি ধর্ম হয় না? আসলে সত্যিই হয় না। শাস্ত্রই বলে দিচ্ছে, আর ঠাকুরও বলছেন। কিন্তু এই কথাতো সবাইকে বলা যায় না তাহলে নিরুৎসাহ হয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক পথে যারাই ঠিক ঠিক একটু এগিয়ে গেছেন তাদের কাছে সংসারকে ঠিক এই রকমই মনে হবে। ৭) নিশ্চয়যোগ – শাস্ত্রের কথার উপর পুরোপুরি বিশ্বাস। ঈশ্বরই বস্তু আর বাকি সব অবস্তু, এই কথাতে যখন বিশ্বাস এসে যাবে তখন এই ভাবটাকে চিন্তা করে করে দৃঢ় করতে হয়। ৮) চক্ষুযোগ – ধ্যানের সময় দৃষ্টিটাকে নাসিকাগ্রে স্থির করা। এগুলো একটা ধ্যানের বিধি। আবার চোখ বন্ধ করে হৃদয়ে যখন ইষ্টের ধ্যান করা হয় সেটাও একই ব্যাপার। এখানে চক্ষু মানে মনের দৃষ্টিটাকে আর কোন দিকে যাবে না শুধু একটা জায়গাতেই স্থির করতে হয়। ৯) আহারযোগ – শুদ্ধ সাত্ত্বিক খাওয়া-দাওয়া করা। সাত্ত্বিক খাবার না খেলে ধ্যান করতেই পারবে না। ১০) সংহারযোগ – ধ্যানের সময় মন বিভিন্ন দিকে যেতে থাকে। একমাত্র ধ্যায়বস্তু ছাড়া অন্য দিকে মনকে না যেতে দেওয়াটাই সংহারযোগ, মনের স্বাভাবিকত্ব হল মনের দৃষ্টি বিভিন্ন দিকে ছিটকে যাওয়া, মনের যেটা স্বাভাবিক স্বভাব সেটাকে সংহার করে দিতে হবে। ১১) মনযোগ – সংহার করে মনকে যখন একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে তখন তাকে বলা হয় মনযোগ। ১২) দর্শনযোগ – জগতে যা কিছু আছে তাতে দোষ দেখা, এটাকে দর্শনযোগ বলছেন। গীতাতে আছে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাদি দুঃখদোষানুদর্শনম্। বাড়িতে যখন একটা বাচ্চার জন্ম হয় তখন সবার কত আনন্দ, সবাই ঢাক-ঢোল পেটাতে থাকে, সবাইকে খবর দিচ্ছে, তারপর ধুমধাম করে অন্নপ্রাশন করছে। অন্য দিকে ভগবান বুদ্ধের পুত্র রাহুলের যখন জন্ম হল তখন তিনি বলছেন বন্ধন জন্ম নিল। জগতের যা কিছু আছে যতক্ষণ তাতে দোষ দর্শন না হয় ততক্ষণ কখনই আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে পারবে না। যারই জন্ম হচ্ছে তারই ব্যাদি হবে, জরা আসবে, মৃত্যু হবে। এই জিনিষগুলিকে বারবার মাথার মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে সংসারের প্রতি বিরক্তি এসে যায়। জ্ঞান বা ভক্তি যেটারই অনুশীলন করি না কেন, প্রথমেই সংসারের প্রতিটি জিনিষে দোষ দর্শন করে সংসারে অনাসক্তি আনতে হবে। আমার নাতির চাঁদমুখ না দেখলে খেতে পারিনা বলছি, আর তার সাথে আমি ধ্যান করতে চাইছি, এই দুটো কখনই একসাথে হতে পারে না। ঈশ্বরের চাঁদমুখ আর নাতির চাঁদমুখ একসঙ্গে দেখা যায় না। যারা নাতি, সন্তানের চাঁদমুখ দেখতে চাইছে তারা ধর্ম, অর্থ ও কামের ধর্মটা করতে পারবে, তাদের ধর্ম করতে সমস্যা হবে না কিন্তু মোক্ষ পথের পথিক কখনই হতে পারবে না। ঠাকুর যে বাক্য কথামতে অনেকবার বলে গেছেন, ঈশ্বর দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য, এটাই হল মোক্ষ পথ। কথামতে ঠাকুরের সব কথাই মোক্ষ পথের কথা। হিন্দুধর্মের শাস্ত্রে ধর্ম বলতে যেটা বোঝায়, ধর্ম মানে যেটা পালন করলে মৃত্যুর পর আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে আর এই জীবনে সুখ সমৃদ্ধি দেবে। কথামতে ধর্মের একটা কথাও ঠাকুর বলছেন না, সবই মোক্ষ পথের জন্য বলছেন। এই বারোটি যোগ না হলে ধ্যান হবে না। সুতোতে যদি একটু আঁশ থাকে সারাটা জীবন ধরে ছুঁচে সুতো ঢোকাতেই থাকব, ছুঁচে কোন দিন সুতো ঢোকান যাবে না। আধ্যাত্মিকতা বা মোক্ষ পথ হল ষোল আনার ব্যাপার। আমি যদি ঠাকুরকে গিয়ে বলি ঠাকুর আমি ৯৯.৯% করেছি ঐটুকুই ফল দাও, বাকিটা চাইনা, ওতে হয় না। ট্রেন আমি এক সেকেন্ডের জন্যই মিস করি আর এক ঘন্টার জন্যই মিস করি, ট্রেন মিস মানে মিসই। আমিতো বলতে পারি পুরোটাই আমি ঠিক সময়ে এসেছি কিন্তু এক সেকেন্ডে দেরী হয়ে গেছে ঠিক আছে আমাকে না হয় এক সেকেন্ডে দেরী করেই হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিও। রেলের ড্রাইভার কি ঐ কথা শুনবে? আধ্যাত্মিক পথে ঠিক এইটাই হয়। ঐ একটু যদি থেকে যায় তাহলেই আর হবে না, আমার সব ঠিক আছে কিন্তু ঠাকুর আমার বিরিয়ানি খেতে খুব ভালো লাগে শুধু বিরিয়ানিটাই ভালো করে খেতে দাও কিংবা আমার নাতির মুখটা না দেখে থাকতে পারিনা, ভগবান বলবেন তুমি ওখানেই থাক আর এগোতে হবে না। ঋষিরা প্রথম থেকেই জানতেন আধ্যাত্মিকতা আমাদের দ্বারা হবে না, সেইজন্য তাঁরা ঠিক করে দিলেন অর্থ আর কাম। আমাদের মন ভোগের দিকে পড়ে আছে, ওখান থেকে বেরোতেই পারছি না। তাই ঋষিরা অর্থ আর কামকে বলে দিলেন, তুমি যদি ঐটাই করতে চাও কর কিন্তু শাস্ত্র সম্মত ভাবে, ধর্মানুসারে কর আর আলস্য করবে না, চুরি করবে না। ব্রাহ্মণদের বলে দিলেন তোমার সব কিছু ত্যাগ কর তাহলে তোমরা শাস্ত্র অধ্যয়ণটা ভালো করে করতে পারবে। আধ্যাত্মিকতা মাত্র কয়েকজনের জন্য শুধু। এই যে বারোটি যোগের কথা বলা হয়েছে এর সব কটিই থাকতে হবে, শুধু থাকলেই হবে না, এর কোন একটি যদি সামান্য কম থাকে তাহলে তুমি আধ্যাত্মিক পথের জন্য বিবেচিত হবে না।

যদি তুমি উত্তম জ্ঞান পেতে চাও, শাস্ত্রে কি আছে যদি তোমার জানার আগ্রহ হয় তাহলে আগে বুদ্ধি দিয়ে তোমার মনকে জয় করতে হবে আর মন দিয়ে নিজের বাণীকে জয় করতে হবে। বুদ্ধি যখন পুরোপুরি মন আর বাণীকে নিজের অধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে তখনই শাস্ত্রের কথা ধারণা হবে। আর তুমি যদি শান্তি পেতে চাও তাহলে আরও এক ধাপ

এগিয়ে গিয়ে বুদ্ধিকে পরমাত্মাতে লয় করে দিতে হবে। এখানে দুটো জিনিষ আসছে, প্রথম হল উত্তম জ্ঞান মানে শাস্ত্র জ্ঞান, দ্বিতীয় শান্তি। শাস্ত্র জ্ঞান হবে যখন বুদ্ধি দিয়ে মন ও বাণীকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে আর এই বুদ্ধিকে যখন পরমাত্মাতে লয় করে দেওয়া হয়, কারণ তখন সে পরমাত্মা ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না, তখনই সে শান্তি পায়। প্রায়ই লোকেরা বলে আমার জীবনে শান্তি নেই, শান্তি নেই মানে তার বুদ্ধিটা পরমাত্মাতে লয় হয়নি। তার জন্য আগে দরকার শাস্ত্রজ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞানই যদি না থাকে বুদ্ধি আসল সময় কাজ করবে না। ঠাকুরকে একজন বলছেন, মশাই আপনি কি জানেন? আপনি তো পড়াশোনাই করেননি। ঠাকুর বলছেন ওগো আমি শুনছি কত। বেশীর ভাগ ভক্তরা মনে করে শাস্ত্র পড়ে কি হবে, ঠাকুরই তো বলেছেন পড়াশোনার কি দরকার। সাথে আবার লাটু মহারাজকেও নিয়ে এসে বলে পড়াশোনার কি দরকার। এই কথাটা এদের বোঝানই যায় না যে, মুর্থদের দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবন হয় না। এরা ধার্মিক জীবন চালাতে পারবে, গঙ্গা স্নান করবে, গরদের কাপড় পড়ে মন্দিরে পূজো করবে, সাংগাহিক ধর্ম কথা শুনতেও যাবে কিন্তু মোক্ষমার্গের পথিক তারা কখনই হতে পারবে না। তাই বলে শাস্ত্র মুখস্ত করলেও হবে না, সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা শাস্ত্রের মর্মটুকু বুঝে নিতে পারা চাই। ঠাকুরও অনেকবার এই কথা বলছেন – শাস্ত্রে চিন্তিতে বালিতে মেশানো আছে। সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে চিনিটুকু নিয়ে বালিটা ছেড়ে দিতে হয়। চিনিটুকু তো আমাকে নিতে হবে। পণ্ডিতরা চিনিটা ছেড়ে বালি নিয়ে পাণ্ডিত্য দেখায়। আর আমরা চিনি আর বালি দুটোই ফেলে দিই। শাস্ত্র যদি বুঝতে হয়, চিনিটুকু যদি নিতে হয় বুদ্ধি দিয়ে মন আর বাণীকে জয় করতে হবে। আর জীবনে যদি শান্তি পেতে চাই তাহলে বুদ্ধিকে পরমাত্মাতে লয় করে দিতে হবে।

ভল্টায়ারের একটা গল্প আছে। ফরাসী থেকে একজন ভারতে এসে এক ব্রাহ্মণের কাছে গেছে। ব্রাহ্মণের ঘর ভর্তি বই দেখে ফরাসী ভদ্রলোক বলছে ‘আপনি কত বড় পণ্ডিত! আপনার ঘর সব বইয়ে ঠাসা’। ব্রাহ্মণ বলছেন ‘হ্যাঁ ভাই! ঠিকই বলেছ কিন্তু মনের আমার শান্তি নেই’। একদিন দেখে এক বিধবা ব্রাহ্মণী এসে এই ব্রাহ্মণ দেবতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করেছে। সেই বিধবা বুড়িকে ফরাসী ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছে ‘মা! আপনার মনে শান্তি আছে?’ বিধবা মহিলা বলছেন ‘শান্তি! অশান্তি জিনিষটা কি বাবা?’ ‘আপনি কি ধর্ম করেন মা?’ মহিলা বলছেন ‘ধর্ম! আমি রোজ সকালে দুটো তুলসী পাতা খাই, একটু গঙ্গাজল পান করি আর ব্রাহ্মণ দেবতাকে প্রণাম করি, এইটাই আমার ধর্ম’। ফরাসী ভদ্রলোক তখন ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বলছে ‘আপনার কি একবার মনে হয় না এই বুড়ির জীবনে অনেক শান্তি?’ ব্রাহ্মণ বলছেন ‘তুমি ঠিক বলেছ বাবা। আমিও অনেকবার ভাবি আমি যদি এর মত হতে পারতাম। কিন্তু ভগবান আমাকে যাই দিয়ে দিন কোন দিন আমার স্থান তার সঙ্গে আমি পাল্টাপাল্টি করব না। ঐ রকম মুর্থ আমি কোন দিন হতে চাইব না, তাতে টাকা পাই না পাই, আর যাই পাই না কেন’। ফরাসী ভদ্রলোক চিন্তা করে দেখলেন আমি এই দিকটা তো ভেবে দেখিনি। এটা একটা কাহিনী। ফ্রান্সে গিয়ে সব কথা বন্ধুদের বলছে, বন্ধুরাও বলল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কিন্তু ঠিকই কথা বলেছেন। ভল্টায়ারের এটা তাঁর নিজস্ব দর্শন, আমার জীবনে টাকা আছে, সুখ আছে, শান্তি আছে কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, বিদ্যা যদি না থাকে সব বৃথা। আর মহাভারতের তত্ত্ব দিয়ে যদি বিচার করা হয় তাহলে এই যে পণ্ডিত, ঐর কি সমস্যা ছিল? পণ্ডিত প্রথমটা করে নিয়েছেন, বাণী নিয়ন্ত্রণ আর শাস্ত্রের জ্ঞান পেয়ে গেছেন কিন্তু বুদ্ধিকে পরমাত্মাতে সমাহিত করেননি সেইজন্য শান্তি নেই। তাহলে বুড়িটা কি? একটা পাথর। পাথরের মত শান্তি কি কারুর আছে? ভারতের সমস্যা এই জায়গাটাতাই। এর উপরেই স্বামীজী আঘাত হেনেছেন। প্রথমে আমাকে কর্ম ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, এরপর বুদ্ধি দিয়ে মন ও বাণীকে নিয়ন্ত্রণ করে শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন করতে হবে। তারপর সেই বুদ্ধিকে আবার পরমাত্মাতে দিতে হবে। ভল্টায়ারের এই কাহিনীর নাম ‘Learned Brahmin’। ভারতের বেশীর ভাগ লোকই হয় আলস্যে পড়ে আছে আর যার বুদ্ধি আছে, একটু বিদ্যা অর্জন করে ক্ষমতায় চলে এসেছে সে ঘুষ নিচ্ছে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে এখন আবার লোভের মাত্রাটা অনেক বেড়ে গেছে, সবাই এখন প্যাকেজটা কেমন হবে তাই নিয়ে পড়ে আছে। এই দিয়ে কোন দিন ধর্ম হয় না। যেদিন এই আলস্য আর লোভের পারে যাবে তখন মনটা শুদ্ধ হতে থাকবে। মন যখন শুদ্ধ হয় তখন মন আর বাণীকে বশে আনে, তারপর শাস্ত্রের মর্ম বোঝা যায়। শাস্ত্রকে বোঝার পর যখন বুদ্ধিকে পরমাত্মার দিকে লাগাবে তখন প্রকৃত জ্ঞান হয়। কি জ্ঞান হয়? এর আগে আমরা পাঁচটি তত্ত্বের কথা আলোচনা করেছিলাম, যেটা দিয়ে সৃষ্টি হয়, এই পাঁচটি তত্ত্বের জ্ঞান হয়ে যায়।

এখন ব্যাসদেব ধ্যানের প্রসঙ্গেই বলে যাচ্ছেন। *ক্রমশঃ পার্থিবং যচ্চ বায়ব্যং খং তথা পয়ঃ। জ্যোতিষো যত্তৈশ্চর্যমহঙ্কারস্য বুদ্ধিতঃ।।১৩/২৩৩/১৪।* বলছেন যখন ধ্যানে বসা শুরু হল, তখন প্রথম সে পৃথিবী তত্ত্ব কে জয় করে। এই সৃষ্টি ভগবান থেকে এসেছে, ভগবান সব সময়ই আছেন। ভগবান থেকে প্রথম প্রকৃতির সৃষ্টি হয়, প্রকৃতি থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল এবং জল থেকে পৃথিবী। এরপর এই পাঁচটা মিলে আমাদের

এই শরীর আর জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। এখন সে যখন ভগবানের কাছে ফেরত যাবে তখন তাকে এই পথ দিয়েই ফেরত যেতে হয়। কিভাবে ফেরত যাবে? ধ্যানে বসে প্রথমে জগৎ আর নিজেকে আলাদা করে। জগৎ থেকে নিজেকে আলাদা করার কথা এর আগে অপায়যোগে বলা হয়েছে। এর পরের ধাপ হল, আমি এই ভাবটাকে পাঁচটি তত্ত্ব দিয়ে আলাদা করা। আলাদা করা মানে জয় করা, সিঁড়ির ধাপে ধাপে ওঠার মত। প্রথমে পৃথিবী অর্থাৎ ভূমিতত্ত্বকে জয় করে, তারপর অপঃকে জয় করে, জল তত্ত্বকে জয় করে সে অগ্নি, বায়ু ও আকাশকে জয় করে। এই পাঁচটি তত্ত্বকে জয় করার পর প্রকৃতিকে জয় করে। প্রকৃতিকে জয় করার পর সে দেখে আমি আর ব্রহ্ম এক ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’।

আমাদের মন সব সময় স্থূল জগতে পড়ে আছে। *শৈশিরস্ত যথা ধূমঃ সূক্ষ্মঃ সংশ্রয়তে নভঃ। তথা দেহাদিমুক্তস্য পূর্বরূপং ভবত্যত।।১৩/২৩৩/১৭।* ধ্যানে চোখ বন্ধ করে জগতের স্থূল দেহ থেকে যখন মন বেরিয়ে আসে তখন সে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটা পাতলা কুয়াশার পর্দার মত দেখে। মনের গভীরে যখন যায় তখন এটি ধ্যানের প্রথম একটা ধারণা হয়। এই অবস্থা পার করে যাওয়ার পর ধ্যানের গভীরে সে দেখে চারিদিকে শুধু জল আর জল। সেইজন্য উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে বলা হয়ে সৃষ্টি জল থেকে হয়েছে। পুরানাদি শাস্ত্রে বলছে ভগবান বিষ্ণু ক্ষীরসাগরে শুয়ে আছেন। আমরা মনে করি ঋষিরা বসে বসে শুধু কাহিনী তৈরী করে গেছেন, কিন্তু তা নয়। *অথ ধূমস্য বিরমে দ্বিতীয়ং রূপদর্শনম্। জলরূপমিবাকাশে তথৈবাত্মনি পশ্যতি।।১৩/২৩৩/১৮।* সাধক যখন ধ্যানের গভীরে অপঃ তত্ত্বে পৌঁছালেন তখন তিনি জল ছাড়া কিছুই দেখছেন না। নিজেকেও দেখছে জল রূপে, যেন একটা মহান বিস্তারিত সমুদ্র। তখন সে অপতত্ত্বকে জয় করে নিয়েছে। এরপর সে অগ্নিতত্ত্বকে জয় করতে এগিয়ে যায়। তখন আবার চারিদিকে অগ্নি দেখে। সত্যি সত্যিই সে দেখে, এগুলো কোন আখ্যায়িকা নয়। তিনি সেই অবস্থায় আমাকে আপনাকেও অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত দেখবে। মুণ্ডকোপনিষদ শুরুই হয় এইটা দিয়ে। ঠাকুর গেছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বেদ থেকে কিছু বলতে বললেন, দেবেন্দ্রনাথ তখন বেদ থেকে একটা মন্ত্র পাঠ করলেন যাতে বলা হচ্ছে পুরো জগতটা যেন একটা ঝাড়লন্ঠন, সব জীব যেন ছোট ছোট দীপ। ঠাকুর শুনে বলছেন আমি তো ঠিক তাই দেখেছিলাম। পরে ঠাকুর অন্যদের বলছেন দেবেন ঠাকুর তো বিরাট বড় লোক। এটা বোঝা যাচ্ছে যে ঠাকুর এটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন আর দেবেন ঠাকুর সেটা বেদ থেকে বলছেন। দুটোতে তফাৎ আছে। মহাভারতের এখানেও বলছে পুরো জগতটা যেন অগ্নিময়। এই অগ্নি আমাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে না। এই অগ্নি যখন লয় হয়ে যায় তখন সবটাই বায়ুময় দেখে। যত বৃক্ষ, পাহাড়, যাবতীয় যা কিছু আছে সবটাই বায়ুতে লয় হয়ে গেছে। সেইজন্য একটা শব্দ আসে পিতৃশব্দ, মানে বায়ু সব কিছুকে পান করে নিচ্ছে। ধ্যানের গভীরে তখন কিছুই থাকে না, শুধু বায়ুতত্ত্বই থেকে যায়। তখন যোগী নিজেকে দেখে তুলোর মত বাতাসে ভাসছে। বাতাসের সঙ্গে সে যেন এক হয়ে গেছে। এই বায়ুতত্ত্বকে পেরিয়ে যোগী আকাশতত্ত্ব পৌঁছে যায়। সেই অবস্থাটা আরও সূক্ষ্ম, সেই সূক্ষ্মের সাথে যোগী নিজে এক হয়ে যায়। তখন তার স্থূল ভাব, তুলোর মত যে একটা টুকরো সেই ভাবটাও চলে যায়।

এই পাঁচটি তত্ত্বকে যিনি পার করে যাচ্ছেন তার পরীক্ষা হল তার মধ্যে কিছু সিদ্ধাই চলে আসে। যখন পৃথিবী তত্ত্বের সাথে এক হয়ে যায় তখন যোগী ব্রহ্মার শক্তি পেয়ে যায়। তখন যোগী ইচ্ছে করলে সত্যি সত্যিই যা কিছু সৃষ্টি করে দিতে পারে। যোগী যদি বলে এখানে একটা গ্লাশ হোক, সঙ্গে সঙ্গে গ্লাশ এসে যাবে। সৃষ্টিতে যা কিছু আছে সবটাই পৃথিবী তত্ত্ব দিয়ে তৈরী। এখন যোগী পৃথিবী তত্ত্বের মালিক হয়ে গেছে। বায়ুতত্ত্বে সিদ্ধ হয়ে গেলে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে এক হয়ে যায় বলে যোগী যদি চায় তাহলে পায়ের আংটা দিয়ে যদি এই বিল্ডিংটা ঠেলে দেয় তাতেই বিল্ডিংটা পড়ে যাবে। স্বামীজী যে বলছেন আমি পর্বতকে বিদীর্ণ করে দেব, এগুলো কোন মুখের কথা নয়। তিব্বতের বৌদ্ধ সাধুরা যখন নিজেদের ক্ষমতা দেখাবার জন্য গেলেন তখন একজন সাধু শুধু পাহাড়ের সামনে হাতটাকে একটু তুলেছেন তাতেই পাহাড় মাঝখান থেকে বিদীর্ণ হয়ে রাস্তা তৈরী করে দিয়েছে। এখনও সেই রাস্তা আছে। এগুলো কোন গালগল্প নয়, সত্যি সত্যিই এই ক্ষমতা যোগীর মধ্যে এসে যায়। সব শেষে যখন আকাশতত্ত্ব পৌঁছে যায় তখন যোগী সর্বব্যাপী হয়ে যায়, যোগী যখনই চাইবে তখনই অন্তর্ধান হয়ে যেতে পারবে। দেবতাদের তাই হয়। নারদ হঠাৎ হঠাৎ করে এসে হাজির হয়ে যাচ্ছেন, আবার হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাচ্ছেন। কারণ তিনি আকাশতত্ত্বের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন বলে এই সিদ্ধাইটা এসে গিয়েছিল। জলতত্ত্বের সঙ্গে যখন এক হয়ে যায় তখন যোগী ইচ্ছে করলে সমুদ্রকে পান করে নিতে পারবেন। অগস্ত্যমুনি ঠিক এই সিদ্ধাইটা দেখিয়েছিলেন যখন অসুররা সব সমুদ্রের ভেতরে লুকিয়ে থাকত তখন তিনি সমুদ্রকেই পান করে শুকিয়ে দিতে অসুরগুলোর আর লুকোবার জায়গা পেল না, তখন দেবতারা এসে সব অসুরদের মেরে দিল। অগ্নিতত্ত্বের সঙ্গে যখন এক

হয়ে যায় তখন যোগী চাইলে তার শরীরের এমন তেজ নিয়ে আসবেন যে, তার দিকে কেউ তাকাতে পারবে না। লীলাপ্রসঙ্গে খুব সুন্দর একটা বর্ণনা আছে। ঠাকুরের শরীর থেকে এক সময় এমন তেজ বেরোত যে শরীরটা সব সময় জ্বলজ্বল করত, গোটা একটা চাদর দিয়ে ঠাকুরকে ঢেকে রাখতে হত।

এই পাঁচটি তত্ত্বের পর আসে অহঙ্কার তত্ত্ব। অহঙ্কার তত্ত্বকে জয় করে নিলে এই পাঁচটা তত্ত্বই তাঁর অধীনে এসে যায়। অহঙ্কার তত্ত্বকে ছাড়িয়ে যখন মহৎ তত্ত্ব পৌঁছে যায় তখন তাঁর মধ্যে সমস্ত রকমের ঐশ্বর্য, যত ধরণের ঐশ্বর্য হতে পারে সব এসে যায়। তখন তিনি ভগবান থেকে একটু নীচে অবস্থান করেন। এই ঐশ্বর্যকেও যখন ত্যাগ করে পরমাত্মাতে মন দিয়ে দেন তখন তিনি ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যান। তাই পরমাত্মার সঙ্গে এক হতে গেলে আগে জগতের এই সব কিছু জয় করতে হবে, জয় করার পরে এগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে, তবেই সে এগোতে পারবে। আমার জপ-ধ্যান ঠিক মত হচ্ছে কিনা ধরা পড়ে যাবে আমার সিদ্ধাই হয়েছে কিনা, কিন্তু আমি এই সিদ্ধাই চাইনা, আমি চাইছি পরমাত্মার সঙ্গে এক হতে। তখন তাকে এইভাবে একটা একটা করে তত্ত্বকে জয় করে করে সিদ্ধাই অর্জন করার পর সেই ক্ষমতাকেও ত্যাগ করে এগিয়ে যেতে হবে।

এরপর শুকদেবের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাসদেব ব্যক্ত ও অব্যক্তের সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলছেন প্রোক্তং তদ্ব্যক্তমিত্যেব জায়তে বর্দ্ধতে চ যৎ। জীর্য়তে ম্রিয়তে চৈব চতুর্ভির্লক্ষণৈর্যুতম্। ১৩/২৩৩/৩০। যখনই কোন বস্তুতে চারটে ধর্ম এসে যায়, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি তখনই তাকে ব্যক্ত বলা হয়। বেদান্ত পরে ছয়টি ধর্মকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু মহাভারতে মোটামুটি চারটে ধর্মকে নিয়ে বলছে, প্রথম জন্ম, তারপর আসে বৃদ্ধি, বৃদ্ধির পর জরা, জরা মানে ক্ষয় হয়ে যাওয়া আর শেষে মৃত্যু, মানে শেষ হয়ে যাওয়া। এই চারটেকে বলা হয় ব্যক্ত, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যেটা প্রত্যক্ষ করা যায়। যে কোন জিনিষের, যেমন এই বাড়িটা, এর যখন ভিত্তি স্থাপন করা হল তখন এই বাড়িটার জন্ম হল। তারপর এর নির্মাণ কার্য চলতে থাকল, বাড়িটা আস্তে আস্তে বড় হতে শুরু করল। তারপর একটা সময় থেকে বাড়ির ক্ষয় হতে থাকবে, এরপর একদিন কালের নিয়মে বাড়িটা ধুলোয় পরিণত হয়ে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে। যে কোন জিনিষের যার এই চারটে লক্ষণ আছে তাকে বলা হয় ব্যক্ত। এর বিপরীত যা কিছু আছে তাকে বলা হয় অব্যক্ত, যার এই চারটে লক্ষণ নেই। তার জন্ম নেই, তার বৃদ্ধি নেই, তার জরা নেই, তার মৃত্যু নেই। অব্যক্ত বলতে দুটো জিনিষ বোঝায়। একটা হল ভগবান আর অনেক সময় তাঁর শক্তি, এই দুটোকেই অব্যক্ত বোঝায়।

এখন মজার ব্যাপার হল, ব্যক্ত আর অব্যক্ত দুটোই স্বভাবতঃ বিপরীত ধর্মি, কারুর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। ব্যক্ত হল যার মধ্যে জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যু এই চারটে লক্ষণ আছে আর আত্মার মধ্যে এই চারটের কোন লক্ষণই নেই। কিন্তু আত্মা কিভাবে এই ব্যক্তের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে, কেন জড়ায় কেউ বলতে পারবে না। এইটাই মায়া। জড়িয়ে গিয়ে এক অপরের ধর্মকে নিয়ে নেয়। যেমন তপ্ত লৌহদণ্ডকে জলের মধ্যে দিয়ে দিলে জলটা গরম হয়ে যায় লৌহদণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে যায়, দুজনে দুজনের ধর্ম পেয়ে যায়। বিয়ের পর ছেলে মেয়ের মত গুণ পেয়ে যায় আর মেয়ে ছেলের মত গুণ পেয়ে যায়। যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনি অশুদ্ধ প্রকৃতির সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে তখন এক অপরের গুণ নিয়ে নেয়। যেমন আত্মা যিনি ঠিক ঠিক চিন্তা করতে পারেন, প্রকৃতির সাথে এক হয়ে সে নিজেকে মনে করে মৃত্যুধর্ম। আমি মরে যাচ্ছি, আমার ব্যাধি হচ্ছে, আমার দুঃখ হচ্ছে, আমার আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু তোমার কি করে মৃত্যু হবে? তোমার তো জন্ম নেই মৃত্যু নেই আর তোমার বৃদ্ধিও নেই ক্ষয়ও নেই, কিন্তু আত্মা তাই নিজেকে সব সময় এই ভেবে ভেবে কখন কষ্ট পাচ্ছে কখন আনন্দ পাচ্ছে। অন্য দিকে ইন্দ্রিয়গুলি হল প্রকৃতির, কিন্তু সে মনে করছে আমি চিরদিন থাকব, আমার কখন দুঃখ হবে না, আমি ক্ষমতাবান, আমি বিরাট কিছু। কিন্তু সে বুঝতে পারে না যে এরা সবাই প্রকৃতির অঙ্গ, যার জন্ম আছে তার আবার বৃদ্ধি আছে, ক্ষয় আছে আবার মৃত্যুও হবে। আত্মা এই ইন্দ্রিয়াদি দেহের সাথে জড়িয়ে মনে করে আমার কি দুরবস্থা, আমার কি শোক, আর এই মনে করে এমন সে লেজেগোবরে হয়ে যায় যে এখান থেকে আর কিছুতেই বেরোতে পারেনা। এইটাই চিঞ্জড়গ্রস্থি। চিৎ মানে চৈতন্য বা আত্মা আর জড় মানে প্রকৃতি। চিৎ আর জড় মিলে এমন গাঁট বাঁধে যে চিৎ নিজেকে জড়ের মত মনে করে আর জড় চিৎএর মত আচরণ করে।

ব্যাসদেব ব্যক্ত আর অব্যক্তের ব্যাখ্যা করে বলছেন, মানুষ যখন কষ্ট পেয়ে পেয়ে আর কোন উপায় খুঁজে পায়না তখন সে শাস্ত্র পড়ে, গুরু বা আচার্যের কাছে উপদেশ পেয়ে যোগাভ্যাস ও ধ্যান করতে শুরু করে। যোগাভ্যাস করে করে

এই পাঁচটা তত্ত্বকে সে জয় করতে থাকে। তারপর যখন তার মধ্যে ঐশ্বর্য আর ঐ শক্তি আসতে শুরু করে তখন বুঝতে পারে হ্যাঁ, আমি এইবার এগোচ্ছি। এই শক্তি ও ঐশ্বর্যকেও ছেড়ে যখন সে এগিয়ে যায় তখন মোক্ষপদ পেয়ে যায়। ব্যাসদেব বলছেন, বুদ্ধিই সব কিছু। বুদ্ধিই বলে দেয় ছোট কি, বড় কি, শাস্ত্র কি, অশাস্ত্র কি, তুমি কোন দিকে যাবে, কোন দিকে যাবে না।

ব্যাসদেব বলছেন, বুদ্ধিই সব কিছুকে আলাদা করে দেখিয়ে দেয় এটা এই সেটা ঐ। *ভূতানাং জন্ম সর্বেষাং বিবিধানাঞ্চ তুর্বিধম্। জরায়ুজাস্ত্রজোড়িজ্জ স্বেদজঞ্চৈপলক্ষয়েৎ। ১১৩/২৩৪/১১।* সংসারে যত প্রাণি আছে তাদের চারটে শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। প্রথম জরায়ুজ, যারা গর্ভ থেকে জন্ম নিয়ে, যেমন মানুষ, গরু, ছাগল ইত্যাদি। দ্বিতীয় অণুজ বা ডিম্বজ, যারা ডিম থেকে জন্ম নেয়, যেমন পাখি। তৃতীয় স্বেদজ, স্বেদজ হল ঘাম থেকে যাদের জন্ম হচ্ছে, যেমন রোগের জীবানু বা ব্যাকটেরিয়া, এগুলো জলীয় তাপমানের উপর জন্ম নেয়। আবার স্বেদজ বলতে মাথার উকুন, গায়ের ঘাম থেকে চামড়ার মধ্যে যে পোকাগুলো জন্ম নেয় এগুলোকে স্বেদজ বলা হচ্ছে। কেন যে এদের স্বেদজ বলছে বোঝা যায় না, কারণ এগুলোও ডিম থেকেই জন্ম নেয়। কিন্তু ঠিক ঠিক স্বেদজ হল ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস। আর চতুর্থ হল উদ্ভিজ্জ, যত রকমের বৃক্ষ, লতা, গুল্ম আছে এদের উদ্ভিজ্জ বলা হয়। তারপর বলছেন যে কোন স্থাবর প্রাণি থেকে জন্ম প্রাণি শ্রেষ্ঠ। মানে গাছপালার তুলনায় যে প্রাণি চলতে ফিরতে পারে সেই প্রাণিরা শ্রেষ্ঠ। কারণ ওর মধ্যে চেষ্টা বেশী দেখা যায়। যেমন গাছ সূর্যের আলো, জল, বাতাস যেমন যেমন পাবে সেইভাবে সে বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু প্রাণি নিজেকে সতেজ রাখার জন্য চেষ্টাকে চালিয়ে যায়। জন্ম প্রাণিদের মধ্যে বহুপদ প্রাণি থেকে দ্বিপদ বিশিষ্ট প্রাণি শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্ব বুদ্ধির দিক থেকে বলা হচ্ছে। দ্বিপদ বিশিষ্ট প্রাণি আবার দুই ধরনের। একটাকে বলা হয় পার্থিব আরেকটি হল অপার্থিব, অর্থাৎ যারা পৃথিবীতে বাস করে আর যারা পৃথিবীতে বাস করে না। অপার্থিব প্রাণি হল পাখি, পাখিদের দুই পা কিন্তু পৃথিবীতে থাকে না, এদেরকে বলা হয় অপার্থিব। বলছেন, অপার্থিব থেকে পার্থিব প্রাণি শ্রেষ্ঠ। দ্বিপদ বিশিষ্ট প্রাণি মানুষের মধ্যে আবার দুই ধরনের মানুষ হয়, মধ্যম ও অধম। অধম মানুষ হল যারা জাতি ধর্ম মানে না। যারা জাতি ধর্ম মানে তাদেরকে বলা হয় মধ্যম। এই মধ্যমের আবার দুই রকম হয়, ধর্মজ্ঞ আর ধর্মে অনভিজ্ঞ, মানে যারা ধর্ম জানে আর যারা ধর্ম জানে না। এই দুই জনের মধ্যে ধর্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কারণ এদের মধ্যে কর্তব্য আর কর্তব্যের বিচারটা স্পষ্ট। ধর্মজ্ঞের মধ্যে আবার দুটো ভেদ দেখা যায়। এই দুটো ভেদ হল বেদজ্ঞ আর অবেদজ্ঞ। যেমন বৌদ্ধরা, এরা সবাই ধর্মজ্ঞ, এদের মধ্যে ধর্ম আছে কিন্তু অবেদজ্ঞ। বেদজ্ঞ আর অবেদজ্ঞের মধ্যে বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ বেদেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা বেদজ্ঞ হন তাঁদেরও আবার দুটো ভেদ আছে – প্রবক্তা ও অপ্ৰবক্তা। প্রবক্তা মানে, যাঁরা বেদের প্রবচন দেন মানে বেদ অধ্যয়ন করান। প্রবক্তারাই শ্রেষ্ঠ। কারণ এনারাই বেদের ধর্ম, কর্ম ও ফল এগুলোকে ঠিক ঠিক জানেন বলেই ব্যাখ্যা করছেন। প্রবক্তাদের মধ্যে আবার দুটো ভাগ আছে – আত্মজ্ঞ ও অনাত্মজ্ঞ। যিনি আত্মার ব্যাপারটা জানেন তিনি আত্মজ্ঞ আর যিনি জানেন না তিনি অনাত্মজ্ঞ। বলছেন, যিনি বেদের প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিমার্গ মানে গৃহস্থের পথ আর সন্ন্যাসের পথ এই পুরো ধর্মটাই জানেন, যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞ মানে যিনি ঈশ্বরতত্ত্ব জেনে গেছেন, যিনি সর্ববেত্তা, ত্যাগী, সত্য সঙ্কল্প, মানে যেটাই সঙ্কল্প করেন সেটাই পূরণ করেন, যিনি সত্যবাদী, পবিত্র এঁরাই হলেন ঠিক ঠিক সমর্থ। যাঁরা পরমব্রহ্মের তত্ত্বকে ঠিক ঠিক নিশ্চিত করে বসে গেছেন তাঁরাই হলেন ব্রাহ্মণ, এনাদের ব্যতিরেকে আর কেউই ব্রাহ্মণ নয়। এই ধরনের পুণ্য মানবের মধ্যেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত, কারণ তাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। ঠিক ঠিক দ্বিজ হলেন যাঁরা পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেছেন। মহাভারত আমাদের কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেল। সৃষ্টির জগতে একটা হল সজীব আরেকটি নিজীব। সজীবের মধ্যে যারা চলাফেরা করে তারা শ্রেষ্ঠ। চলাফেরা করা প্রাণির মধ্যে দ্বিপদ প্রাণি শ্রেষ্ঠ, দ্বিপদ প্রাণির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ, মানুষের মধ্যে যারা ধর্ম মানে তারা শ্রেষ্ঠ। ধর্মজ্ঞের মধ্যে যারা ঠিক ঠিক বেদ জানে তারা শ্রেষ্ঠ। তাদের মধ্যে প্রবক্তা শ্রেষ্ঠ, তার মানে তাঁরা বেদের কথা ব্যাখ্যা করছে। অন্তিমে গিয়ে আধ্যাত্মিকতাই শ্রেষ্ঠ। এই তত্ত্বকে যদি আমরা একেবারে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করি তাহলে ক্রমবিবর্তনের শেষ কথা হল যাঁরা আত্মতত্ত্বকে জেনে গেছেন। সে মুসলমান, না খ্রীশ্চান, না হিন্দু, না বৌদ্ধ তাতে কিছু যায় আসে না। যিনি আত্মতত্ত্বকে জেনে গেছেন, আমি কে এইটা জেনে গেছেন, তাঁরাই হলেন ক্রমবিবর্তনের শেষ কথা। আজ থেকে কত হাজার বছর আগে মহাভারত যুক্তি দিয়ে ক্রমবিবর্তনের এই তত্ত্বকে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে গিয়ে বুদ্ধির বিকাশে। বুদ্ধির বিকাশের দ্বারা আমি বাকি সব কিছুকে ধরে নিচ্ছি। আমি যদি বলি আমার কি তুখোড় বুদ্ধি, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রী নিয়ে কত টাকা বানাচ্ছি। তাতে আমার হলটা কি! আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে বনিয়া যারা ছিল তারাও টাকা বানাতে জানত, তাতে আমি নতুন আর কি করলাম! আর টাকারও যে গুরুত্ব আছে সেটাও সবাই জানে। কিন্তু যখন কেউ বলছেন, আমি আত্মজ্ঞ হয়ে গেছি। তখন



বলবে, এবার তুমি কিছু একটা করেছ। কারণ কোটি কোটি লোকের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন এই পথে আসে, আবার তাদের মধ্যেও দুই এক জন এই আত্মজ্ঞ হতে পারেন। তখন তুমি তাই শ্রেষ্ঠ হয়ে গেল। হিন্দুদের মতে ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ হল আত্মজ্ঞান। যিনি আত্মজ্ঞানী তিনি ভগবানের সঙ্গে এক।

শান্তিপর্বে যত রকমের ধর্ম হতে পারে তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। আমরা এর আগেও বলেছি যে হিন্দুদের কাছে এমন কোন জিনিষ হয় না যেটা ধর্মের অপেক্ষে হবে না। শুধু দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখার কথা বলা হচ্ছে না, সত্যিকারের তাঁরা ধর্মকে ঐভাবেই দেখেন। একজন স্ত্রীর স্বামীর প্রতি কি কর্তব্য, স্বামীর স্ত্রীর কি প্রতি কর্তব্য এটাও ধর্মের অঙ্গ। সন্তানের মা-বাবার প্রতি কি কর্তব্য এটাও ধর্মের অঙ্গ। রাজা কিভাবে থাকবে, সন্ন্যাসী কিভাবে থাকবে সবটাই ধর্মের অঙ্গ। এই ধর্মকে আচরণ করতে করতে তার বুদ্ধিটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে শুরু করে। বলা হয় দশহরার দিন গঙ্গায় অবগাহন করতে হয়। যদি স্নান করি তাতে কি হবে? আপাতদৃষ্টিতে কিছুই হবে না। দশহরাতে গঙ্গায় স্নান করলে কি তার ভগবান লাভ হবে? তার জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে? আদর্শেই এগুলোর কিছুই হবে না। কিছু যে হবে না এটা সবাই জানে, শাস্ত্রও জানে। কিন্তু কি হয় তাতে? মনের মধ্যে একটা সুশৃঙ্খল ভাব আসে। জীবনটাকে যদি শৃঙ্খলতায় না নিয়ে আসা হয় কোন দিন সে আধ্যাত্মিক হতে পারবে না। শুধু আধ্যাত্মিকত ক্ষেত্রেই নয়, যে কোন ক্ষেত্রে যদি আমি সাফল্য পেতে চাই, প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হতে চাই, প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে চাই, প্রচুর জ্ঞানলাভ করতে চাই, ভালো খেলোয়াড় হতে চাই, ধর্মের জ্ঞান পেতে চাই, সব ক্ষেত্রেই ডিসিপ্লিন ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। পড়াশোনা করার যেমন একটা ডিসিপ্লিন আছে, অর্থ রোজগার করার একটা যেমন একটা ডিসিপ্লিন আছে, ঠিক তেমনি সৎ জীবন যাপন করারও একটা ডিসিপ্লিন আছে, আর আধ্যাত্মিক জীবনে যে উন্নতি হয় এর জন্যও একটা ডিসিপ্লিন আছে। যদি কোন স্ত্রী বলে বিয়ে করেছি বলেই কি আমাকে স্বামীর সব সেবা করতে হবে নাকি বা যদি স্বামী বলে, কে বলেছে যে বিয়ে করেছি বলেই স্ত্রীর সব ভার আমাকে নিতে হবে! কেউ বলছে না তোমাকে সেবা করতে বা ভার নিতে, তুমি থাক তোমার মত। কিন্তু যদি বল জীবনে আমি শান্তি পেতে চাই, আমি মনের শক্তি বাড়াতে চাই তখন তোমাকে এই জিনিষগুলো করতে হবে। আর যদি তুমি দেখ তোমার আশেপাশের লোকগুলো অশান্তিতে রয়েছে, তাদের শক্তির হ্রাস হচ্ছে, কেউ তাদের মানে না, একটা সময় তাদের মনে একটা জিজ্ঞাসা উঠবে আমাদের কেন এমন হল। তখন বলে যে, কোথাও একটা জায়গায় তার ঘাটতি ছিল, যে কর্ম ও আচরণ দিয়ে মনের শক্তি বৃদ্ধি পায় সেগুলো করা হয়নি। বহির্জগতে যা কিছু সাফল্য বা অসাফল্য এবং আধ্যাত্মিক জীবনে যা কিছু সাফল্য সবই এই মন থেকেই হচ্ছে।

টেবিলে এই বোতলটা আছে, আলো এসে এই বোতলের উপর পড়ছে, বোতল থেকে আলোটা প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে আসছে, চোখে একটা অনুভূতি তৈরী হচ্ছে, এই অনুভূতিটা মস্তিষ্কের স্নায়ু কেন্দ্রে পড়ছে, মস্তিষ্কে সেখান থেকে একটা প্রতিক্রিয়া বাইরে ছুঁড়ে দিচ্ছে, এই প্রতিক্রিয়াটা একটা আকৃতি তৈরী করছে। এই ভাবে যা কিছু জ্ঞান হয় তা মস্তিষ্কের মাধ্যমে এই ভাবেই হয় আর মস্তিষ্কের ভেতরেই হয়। বোতলটা আমরা বাইরে দেখছি কিন্তু এর আকৃতিটা তৈরী হচ্ছে মস্তিষ্কের ভেতরে। বোতলের জ্ঞানটা ভেতরেই তৈরী হচ্ছে, অথচ মন এমন খেলা করে যেন বোতলটা বাইরে দেখছি। এইটাই মায়া। আমি যেভাবে বোতলটা দেখছি অন্যরা সেইভাবে দেখছে না। আমি যদি বোতলটাকে সবুজ রঙ দেখি আপনি হয়তো সবুজ নাও দেখতে পারেন। যে রঙকানা জিনিষটাকে সে যে রঙের দেখবে সেই রঙই বলে। সব কিছুই এই ভেতরে হচ্ছে অথচ আমরা দেখি বাইরে। এইটাই আশ্চর্য। সেইজন্য বহির্জগতে যা কিছু দেখা হয় সেটা দেখা হয় নিজের মনের যে রঙ, সেই রঙে। লাল রঙের চশমা পড়লে যেমন সব কিছু লাল দেখাবে, নীল রঙের চশমা লাগালে আবার সব নীল দেখাবে। আমাদের মনটা হল একটা রঙিন চশমা, যার যে রঙের চশমা সে জগতকে সেইভাবেই দেখবে। আর কোন দিন জানতে পারা যাবে না আমি জিনিষটাকে কেমন দেখছি আর আপনি জিনিষটাকে কেমন দেখছেন। আত্মাকে বা ভগবানকে যখন দেখছি তখন এই মনের রঙের মাধ্যমেই দেখি। যার মন যেমন রঙ থাকবে, যেমন নোংরা থাকবে সে জগতটাকে তেমনিই দেখবে। এটা কোন তত্ত্ব নয়, সত্যিকারের এই রকমই হয়। আর ভগবানও তখন সেইভাবেই আমাকে দেখবেন। সেইজন্য বহির্জগত আর অন্তর্জগতে যা কিছু ঘটছে মনই হল তার মালিক। এই মনই বহির্জগতকে এক রকম দেখাচ্ছে সেই মনই দেখাচ্ছে ঈশ্বরকে আরেক রকম। বহির্জগত, চিন্তার জগত আর অন্তর্জগত এই তিনটে জগতকে মনই দেখে। সেইজন্য জীবনের একটাই উদ্দেশ্য এই মনকে শক্তিমান করা। মন যত পরিষ্কার হবে আর যত একাগ্র হবে মানুষের মন তত শক্তিমান হবে জগতকে সে তত স্পষ্ট ভাবে দেখবে। ঈশ্বরকে যখন দেখতে যায়, যখন সাধন-ভজন করে তখন এই একই ব্যাপার, সেই মনকে নিয়েই খেলা চলে।

এই মনটাকে এখন কিভাবে পরিস্কার করতে হবে? এই যে মহাভারত বলছে, স্বামীর সেবা করতে হয়, স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে হয়, লোকের সেবা করতে হয়, দানাদি করতে হয়, গঙ্গাস্নান করতে হয় ইত্যাদি যা করতে বলা হচ্ছে, এগুলো সব হল মনকে পরিস্কার করার উপায়। শান্তিপর্বের যাবতীয় যা কিছু আলোচনা করা হচ্ছে, এর উদ্দেশ্যই হল মনটাকে কিভাবে পরিস্কার করতে হবে। মন যত পরিস্কার হবে ততই তার মনের একাগ্রতা বাড়তে থাকবে, আর এই পরিস্কার মন দিয়ে যদি সে আধ্যাত্মিক রাজ্যে এগোতে চায় তাতেও সফল হবে আবার যদি সে জাগতিক ক্ষেত্রে সাফল্য পেতে চায় তাতেও সে কৃতকৃত্য হয়ে যাবে। আমেরিকাতে স্বামীজীর একটা ঘটনা আছে, একবার একটা ব্রীজের উপর থেকে কয়েকটি বাচ্চা ছেলে এয়ারগান দিয়ে নীচে জলের উপর দিয়ে ডিমের উপর টিপ করে যাচ্ছে, ডিম গুলো কখন ভাসছে কখন ডুবে যাচ্ছে। একবারও গুলি লাগাতে পারছে না। স্বামীজী তখন এদের কাণ্ড দেখে হাসছেন। ছেলেগুলো বলছে ‘আপনি হাসছেন কেন, আপনি কি পারবেন লাগাতে। মার্কন দেখি’? স্বামীজী এয়ারগানটা হাতে নিয়ে একটা একটা করে সব কটা ডিমকে ভেঙে দিলেন। যে মন নিয়ে ভগবান লাভ হয় সেই মন নিয়েই বাকি সব কিছু করা হয়। মায়েরা যে মন নিয়ে বাড়িতে রান্না করেন সেই মন নিয়েই তাদের ভগবান লাভও হবে। বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ আর চিন্তার জগৎ একই জিনিষ কোন তফাৎ নেই। মনটা আমাদের টুকরো টুকরো হয়ে আছে তাই আকৃতিগুলিও টুকরো টুকরো আসে। সবার আগে মনকে নিয়ন্ত্রণে আনার কৌশলটা আমাদের ভালো করে জানা দরকার। আমরা যে মনে করি বাচ্চারা যারা খেলাধুলোতে মত্ত তাদের পড়াশোনা হয় না, কিন্তু তা নয়, যে ভালো খেলতে পারে সে লেখাপড়াতেও ভালো হয়। মুশকিল হল, এরা খেলাটাও ভালো পারেনা, লেখাপড়াতো করেই না। যাদের প্রাথমিক জীবনচর্চা অসংগঠিত তাদের দ্বারা কিছু হয় না। শান্তিপর্বে যত রকমের আলোচনা চলছে তার উদ্দেশ্য হল মনকে কিভাবে একাগ্র করতে হবে।

মহাভারত কখন বলছে না তুমি যদি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চাও তাহলে তোমাকে অমুক হতে হবে, তোমাকে সন্ন্যাসী হতে হবে, তোমাকে ঘর-বাড়ি ছাড়তে হবে বা তোমাকে বিয়ে করতে হবে, এই ধরনের কথা কখনই বলবে না। বলবে তুমি যেখানে আছ সেখান থেকেই তুমি মহৎ হয়ে যেতে পার। তুমি যদি ব্যাধ হয়ে পশুপাখির মাংস বিক্রী কর সেখান থেকেও তুমি মহৎ হয়ে যেতে পার।

### সন্ন্যাসীর আচরণ ও ধর্ম

ব্যাসদেব বলছেন, সন্ন্যাসীর আচরণ কি রকম হবে। একশ্রুতি য় নশ্যান্ন জহাতি ন হীয়তে। অনগ্নিরনিকেতশ্চ গ্রামমন্মথমাশ্রয়েৎ। ১৩/২৪২/৫। এখানে সন্ন্যাসের প্রশংসা করা হচ্ছে। সন্ন্যাস জীবন সবারই জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য, আর সন্ন্যাসেই সবার পরিণতি হয়। যারা আগে থেকেই জগতকে ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে তারা আগে থেকেই সব ধরে নেয় আর বাকীদের মৃত্যুর সময় প্রকৃতি সবাইকে সন্ন্যাস করিয়ে দেয়। মৃত্যুর সময় আমাদের ঠ্যাং দড়ি দিয়ে বেঁধে প্রকৃতি টেনে নিয়ে চলে যায়, আর আমাদের বাহ্যিক জগৎ, অন্তর্জগৎ সব এখানে পড়ে থাকবে। শেষে সন্ন্যাসের দিকে সবাইকেই যেতে হবে, সন্ন্যাস ছাড়া কারুর গতি নেই। সেইজন্য বলছেন, তুমি কেন ঐভাবে যাবে, কেন তোমার ঠ্যাংয়ে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে, তুমি রাজার মত যাবে। আমি আমার মত যাব, মৃত্যু! তুমি আমাকে কি নিয়ে যাবে! সেইজন্য হিন্দুধর্মের সব থেকে উচ্চভাব হল ইচ্ছামৃত্যু। আমি যখন চাইব তখন আমি এই দেহকে ছাড়ব, তুমি নিয়ে যাবার কে হে! সেই উচ্চভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে আমাকে মৃত্যুর মালিক হতে হবে। মৃত্যুর মালিক কিভাবে হবে? ঈশ্বরের সঙ্গে যদি এক হয়ে যাওয়া যায়। প্রাণি মাত্রেই সব থেকে ভয় মৃত্যুকে। সবাই মুখে বলে আমার মৃত্যুকে ভয় নেই। কিন্তু একটা গুণ্ডা এসে যদি বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে বলে এফুণি সব দিয়ে দাও তা নাহলে গুলি চালিয়ে দেব। তখন বোঝা যাবে মৃত্যুকে ভয় পাও কি পাওনা। মৃত্যুকে সবাই ভয় পায়। যোগশাস্ত্রে এটাকেই বলা হয় অভিনিবেশ। প্রাণি মাত্রেই এই অভিনিবেশ থাকবে, কেউই মরতে চায় না। এই অভিনিবেশকে কিভাবে জয় করবে? মৃত্যুর যিনি অভিমানি দেবতাকে আগে তাকে জয় করতে হবে। তাকে জয় করা মানে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া। মৃত্যু-ভয়টা বেশী বৃদ্ধাবস্থায় আসে। আঠারো কুড়ি বছর বয়সে মৃত্যুকে অত ভয় পায়না। বয়স যখন বাড়তে থাকে, দেহের অঙ্গগুলো যখন অর্থর্ব হতে থাকে, কানে শুনতে পায়না, চোখে দেখতে পায়না তখন কিন্তু সে মৃত্যুকে প্রচণ্ড ভয় পায়। কারণ দেহ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তত দিনে একটা ভালোবাসা জন্মে যায়। একটা বাড়িতে থাকতে থাকতে সেই বাড়ির প্রতি যেমন মমতা তৈরী হয়ে যায়, ঠিক তেমনি এই দেহে বাস করতে করতে এই দেহের প্রতি একটা মমত্ব জন্মে যায়। বৃদ্ধ বয়সে যখন দেহের প্রতি বিরক্তি ভাব আসার কথা সেখানে তার দেহের প্রতি মমত্ব এসে যায়। সেইজন্য যারা যুদ্ধ করতে যায় সব কম বয়সীরাই যায়। এই

মৃত্যু-ভয়কে জয় করার জন্য মানুষকে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসাটা জাগাতে হয়। আর যখন ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তখন শুধু ভয়ই চলে যায় না, তখন বলে আমি যখন ইচ্ছে হবে যাব, তুমি নিয়ে যাবার কে!

এখানে বলছেন যিনি সন্ন্যাসীর রাজা, যিনি দেখে নিয়েছেন। কি দেখে নিয়েছেন? যিনি আত্ম সাক্ষাৎকার করে নিয়েছেন। আত্মজ্ঞান যতক্ষণ না হয়ে যায়, আমি সেই বিশুদ্ধ আত্মা এই জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ততক্ষণ মৃত্যু ভয় থাকবেই। এই জ্ঞান যখন হয়ে যায় তখন দুই রকমের জ্ঞান হয়, একটা হল সাক্ষাৎ জ্ঞান, দেখছে আমি সেই আত্মা। আর দ্বিতীয় জ্ঞান হল, শাস্ত্র পড়ে পড়ে নিজের মনে ‘আমি সেই আত্মা’ এই ধারণাটা দৃঢ় করে নিয়েছে। ঠাকুর বলছেন, কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে আর কেউ দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানেও ঠিক তাই হয়। কেউ শুনেছে যে ঈশ্বর বলে কেউ আছেন। কিন্তু নিয়মিত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করেছেন, বোঝার চেষ্টা করেছেন এটা কি, তারপর ধীরে ধীরে নিজের মনকে তৈরী করা হয়েছে, তৈরী করার পর নিজের জীবনকে পুরোপুরি ওর মধ্যেই ঢেলে দিয়ে বলছেন এবার তাঁর মতই জীবন চলবে। একজন লোক, তার যে রকম বুদ্ধিই থাকুক, বলল ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব হয়। এরপর সে নিজেকে ঢালতে শুরু করল, ঈশ্বর আছেন আর তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়, তাঁর ইচ্ছাতেই গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে। এই পাখা কেন ঘুরছে? তাঁর ইচ্ছাতেই ঘুরছে। আমি বললাম, না, এটা ইলেক্ট্রিসিটিতে চলে। সে বলবে, হ্যাঁ, ইলেক্ট্রিসিটিও তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছে। সবই তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছে। এখন তাঁর সন্তান মারা গেল, তখন সে শোক করবে না, বলবে তাঁর ইচ্ছাতেই আমার সন্তান হয়ে জন্ম নিয়েছিল, তাঁর ইচ্ছাতেই সে চলে গেল। এরপর হঠাৎ তার লটারি লেগে গেল, তখন আবার সে আনন্দও করতে যাবে না। তাঁর ইচ্ছাটা সে ঠিক বলছে কিনা ধরা পড়ে শোক আর মোহতে। যদি শোক মোহ থাকে আর তারপরও বলছে ঠাকুরের ইচ্ছাতে হচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে সে ধাপ্পা দিচ্ছে। শোক আর মোহই হল শেষ পরীক্ষা, কোন কিছু চলে গেলে দেখতে হবে তার শোক হচ্ছে কিনা, আর কোন কিছু পাওয়ার জন্য তার মোহ আছে কিনা। যখন টাকা-পয়সা এসে গেল, ভালো কিছু হল তারপর খুব আনন্দ হচ্ছে তার মানে তার মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। আমি যদি বলি আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে, আমি আত্মজ্ঞানী, এখন কোন উপায় নেই ধরার আমি ঠিক বলছি না ধাপ্পা দিচ্ছি। কারণ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হল স্বসংবেদ্য। কেউ আত্মজ্ঞানী কিনা বোঝার কোন উপায় নেই, কিন্তু ধরা পড়ে এই একটা জায়গাতে। তার শোক আর মোহ আছে কিনা। যখন কোন বিপরীত পরিস্থিতি হয়ে যায় তখন তাতে তার মন খারাপ হচ্ছে কিনা। যখন পরিস্থিতি অনুকূল হয়, তার মনের মত সব হতে থাকে তখন তার আনন্দ হয় কিনা। যদি অনুকূল অবস্থায় তার আনন্দ হয় আর প্রতিকূল অবস্থায় মন খারাপ হয়, তাহলে বুঝতে হবে সে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী নয়। এই একটা জায়গাতেই এসে ধরা পড়ে যাবে। এখন এটাকে দেখার জন্য কি করতে হবে? ঠাকুর বলছেন সাধুকে দিনে দেখবি রাতে দেখবি। সাধুর সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরতে হবে বছরের পর বছর, তখন বোঝা যাবে সাধু ঠিক ঠিক জ্ঞানী কিনা। যিনি সন্ন্যাসী হয় তার সাক্ষাৎ আত্মদর্শন হয়েছে। সাক্ষাৎ যদি না হয়ে থাকে তাহলে চিন্তা করে করে আত্মার স্বরূপকে মনের মধ্যে পাকাপাকি ভাবে বসিয়ে নিয়েছে। সন্ন্যাসী যিনি তাঁর মধ্যে এই দুটোর মধ্যে একটা থাকবেই থাকবে। হয় তাঁর আত্মসাক্ষাৎকার হয়ে গেছে, নয়তো চিন্তা করে করে মনের মধ্যে ধারণাটা দৃঢ় করে গেঁথে নিয়েছেন যে আত্মা ছাড়া কিছুই নেই। এরপর কি করে? ন জহাতি ন হীয়তে, তখন সে নিজেকেও সর্বব্যাপী বলে জানে। সর্বব্যাপী জানার জন্য ন জহাতি, কাউকে ছেড়ে দেয় না এবং কেউ তাঁকে ছেড়ে দেয় না। তাঁর ব্যক্তিত্ব তখন এমন হয়ে যায় যে, যস্মান্মোদ্বিজতে লোক লোকান্মোদ্বিজতে, তিনি কাউকে দ্বेष করেন না তাঁকেও কেউ দ্বেষ করে না। যদি কেউ তাঁকে হেয় জ্ঞানও করে তাতেও তাঁর কিছু প্রতিক্রিয়া হবে না, কারণ সে জানে যে সে সর্বব্যাপী। যে তাঁকে হেয় করছে সেও সে নিজে, যে তাঁকে প্রশংসা সেও সে নিজে।

সন্ন্যাসী কখন অগ্নি স্থাপনা করে না। অগ্নিস্থাপনা দুটো অর্থে হয়, প্রধান যেটা সেটা হল যজ্ঞ-যাগ করা। আগেকার দিনে অগ্নিহোত্রাদির জন্য অগ্নিস্থাপনা করতে হত। কিন্তু সন্ন্যাসী অগ্নিস্থাপনা করেনা। পরের দিকে অগ্নিস্থাপনার অর্থ এসে গেল সন্ন্যাসী কখন রান্না-বাণী ইত্যাদি করে না। যা পেল তাই খেয়ে নিল, কোন ঝামেলাতে যাবে না। সন্ন্যাসী কোন বাড়ি বা মঠ তৈরী করে থাকবে না। সন্ন্যাসী গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করবে শুধু ভিক্ষা নেওয়ার সময়, এ ছাড়া সে কখনই গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করবে না। এর মানে, জাগতিক কোন সম্পর্ক যাতে কারুর সাথে না তৈরী হয় তাই কোন লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করবে না। সন্ন্যাসী ভিক্ষা নিতে যাবে, কেউ যদি ধর্মের ব্যাপারে কিছু জানতে ইচ্ছে করে তাকে দুটি কথা শুনিয়া চলে আসবে আর গাছের তলায় বা কোন মন্দিরে থাকবে। সন্ন্যাসী যদি দেখে কেউ কারুর নিন্দা করছে তার দিকে সন্ন্যাসী চোখ তুলেও তাকাবে না। কারুর নিন্দা করা মানে তাকে ছোট করা। জীবনের উদ্দেশ্য নিজেকে বড় করা। ব্রহ্ম শব্দই এসেছে ‘বৃ’ ধাতু থেকে, বৃ মানে বৃহৎ। যখনই কারুর নিন্দা করছি মানে তাকে আমরা ছোট করছি। সন্ন্যাসী নিজেও

ছোট ভাববে না অপরকেও ছোট করবে না, আর কেউ কাউকে ছোট করছে সেটা করতে দিতে নেই আটকে দিতে হয়। শুধু সন্ন্যাসীর জন্যই যে এটা জরুরী তা নয়, আধ্যাত্মিক পথের যারা পথিক তাদের সবার জন্য এটা জরুরী।

ব্যাসদেব বলছেন *যদ্বাক্ষণস্য কুশলং তদেব সততং বদেৎ। তৃষ্ণীমাসীত নিন্দায়াং কুব্ধনং ভৈষজ্যমাত্মনঃ।* ১৩/২৪২/১০। সন্ন্যাসী সেই ধরনের কথাই বলবে যে ধরনের কথা বললে অপরের মঙ্গল হয়। যখন তাঁর কেউ নিন্দা করে তখন মৌন থেকে সব শুনে যেতে হয়। আমার কেউ নিন্দা করছে আর আমি তখন মৌন হয়ে গেলাম, এটাকে এখানে বলছেন *ভৈষজ্যমাত্মনঃ*, এটাই ভবরোগ, এই সংসার থেকে মুক্তি পাওয়ার মহৌষধ। সংসারটা একটা ব্যাধি, এই ব্যাধির উপশমের জন্য ওষুধ হল মৌন অবলম্বন করা। কখন মৌন অবলম্বন করবে? কেউ তার নিন্দা করলে।

ব্রহ্মজ্ঞানীর অনেক গুলো লক্ষণের কথা বলছেন, তার মধ্যে তিনটি লক্ষণ খুব মজার। *অহেরিব গনাডীতঃ সৌহিত্যম্নরকাদিব। কুনপাদিব চ স্ত্রীভ্যস্তং দেবব্রাক্ষণং বিদুঃ।* ১৩/২৪২/১৩। প্রথম জনসমুদায়, এখানে সংস্কৃত শব্দটি হল গণাৎ, মানে জনগণকে। যেখানে দশজন লোক জড়ো হয়ে আছে সেই জনসমুদয়কে ব্রহ্মজ্ঞানী কালসর্পের মত দেখেন। স্বাদিষ্ট খাওয়া-দাওয়া করে নরকের মত দেখেন। সন্ন্যাসীদের খাওয়া-দাওয়া শরীরটাকে চালানোর জন্য, রসনার পরিতৃপ্তির জন্য খাওয়া-দাওয়া করে না। যাঁরাই কোন মহৎ কাজ করার জন্য নেমে পড়েন তাঁদের ভালো খাওয়া-পড়ার দিকে নজর দেওয়ার ফুসরৎই হয় না। যাদের ভালো ভালো খাওয়া ভালো লাগছে, আরামে থাকতে চাইছে তাদের দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না। সন্ন্যাসী ঝোল ভাত খেয়েই বছরের পর বছর কাটিয়ে দেবে, বিশেষ কোন আয়োজন করতে যায় না আর ইচ্ছেও হয় না। বিয়ে বাড়ি, অন্নপ্রাশন, পৈতে বাড়ির অনুষ্ঠানে আমরা কত বিশাল আয়োজন করি, আবার খাওয়ার লিস্ট দেওয়া হয় সবাইকে। সেইজন্য আমাদের দ্বারা কোন মহৎ কাজও হয় না। তৃতীয় লক্ষণ হল, নারীর শরীরকে মৃত শরীরের মত দেখেন। মৃত শরীরকে স্পর্শ করলেও যেমন অপবিদ্র হয়ে যায়, তেমনি নারীর শরীরকে স্পর্শ করাও পাপ। ঠিক তেমনি সন্ন্যাসীনিও আবার পুরুষ শরীরকে মৃত শরীর দেখবেন।

সন্ন্যাসী আর সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল *নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্। কালমেব প্রতীক্ষত নিদেশং ভূতকো যথা।* ১৩/২৪২/১৫। সন্ন্যাসী জীবনেরও অভিনন্দন করে না মৃত্যুরও অভিনন্দন করে না। সাধারণ মানুষ জীবনকে ভালোবাসে, মৃত্যুকে সে পেতে চায় না, সেইজন্য বাড়িতে যখন সন্তানের জন্ম হয় তখন মানুষ কত আনন্দ করে। যারা মানসিক অবসাদগ্রস্ত রোগী তারা মৃত্যুকে অভিনন্দন করে। মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না বলে সে মরে যেতে চাইছে, অর্থাৎ মৃত্যুকে অভিনন্দন করে। এই যে বলা হচ্ছে সন্ন্যাসী জীবনকে অভিনন্দনও করে না মৃত্যুকেও অভিনন্দন করে না, আসলে বলতে চাইছে সন্ন্যাসী জীবনকেও ভালোবাসে না জীবনকে ঘৃণাও করে না। যে মানসিক রোগী সে জীবনকে ঘেন্না করছে। সন্ন্যাসীর জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণও নেই বিকর্ষণও নেই, তাই বলে কি তাঁর মৃত্যুর প্রতি আকর্ষণ? কোনটাই না। তাঁর বেঁচে থাকারও ইচ্ছে নেই আবার মরে যেতেও ইচ্ছে নেই।

*যথা নাগপদেহন্যানি পদানি পদগামিনাম্। সর্বান্যেবাপিধীয়ন্তে পদজাতানি কৌঞ্জরে।। এবং সর্বমহিংসায়াং ধর্মধর্মপিধীয়তে। অমৃতঃ স নিত্যং বসতি যো হিংসাং ন প্রপদ্যতে।* ১৩/২৪২/১৮-১৯। কোন ধুলোময় পথ দিয়ে অনেক পশু চলে গিয়ে থাকে তারপর সেই পথ দিয়ে যদি হাতি চলে যায় তখন হাতির পায়ের ছাপ সব পায়ের ছাপকে চাপা দিয়ে দেয়। হাতির পা বড় কিনা। ঠিক তেমনি যত রকমের ধর্ম আছে সব ধর্ম চাপা পড়ে যায় একটি ধর্মে, সেটি হল অহিংসা ধর্ম। অহিংসা ধর্মের সামনে সব ধর্ম চাপা পড়ে যায়। তার মানে, একজন নারী রূপে তার স্বামীর সেবা করে যাচ্ছে, এটা একটা ধর্ম। একজন সন্ন্যাসী নানা রকমের নিয়ম পালন করে যাচ্ছে, এটাও একটা ধর্ম। যে যার ধর্ম করে যাচ্ছে, আর সব ধর্ম পালন করা খুবই ভাল, কিন্তু যখনই অহিংসা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন সব কটি ধর্মকে সে অতিক্রম করে যাবে। ইংরাজীতে বলা হয় *Violence is not an act, it's a state of mind*। হিংসা কোন কর্ম নয়, হিংসা মানুষের মনের একটা অবস্থা। যেমন আমি মাছ খাচ্ছি, মাংস খাচ্ছি, কিন্তু তাই বলে আমি হিংসা করছি, তা নয়। মা বাচ্চাকে একটা চড় মারতে পারে কিন্তু তাই বলে মা বাচ্চাকে হিংসা করছে না। এমনিতে কাউকে একটা চড় মারলে সেটা হিংসা হয়ে যাবে, কিন্তু মায়ের ক্ষেত্রে এটা হিংসা নয়। আবার আমি কাউকে কোন গালাগাল না দিয়ে, কোন চড় না মেরেও আমি প্রচণ্ড হিংসপ্রবণ লোক হতে পারি। বলাই হচ্ছে হিংসা একটা মনের বিশেষ অবস্থা। এখানে আমি বাইরে কি আচরণ করছি তা নিয়ে কোন কথাই বলা হচ্ছে না। আমার মাথায় কি আছে সেটাকেই বলা হচ্ছে। সেইজন্য

সাধু সন্ন্যাসীদের মাছ মাংস খাওয়াটাকে নিষেধ করা হয়। আর ভ্রূণ হত্যা ভারতে প্রচণ্ড পাপ বলে স্বীকার করা হয়। যাঁরা তন্ত্র অনুশীলন করতেন তাঁরা মাছ খেতেন মাংসও খেতেন কিন্তু ডিম কিছুতেই খেতেন না। হিন্দু ধর্ম অবশ্য হঠাৎ করে অনেক পাল্টে গেছে, এখন তো সবাই ডিম খাচ্ছে। হিন্দুরা আগে পেঁয়াজ, রসুন, ডিম এগুলো একেবারেই খেত না কিন্তু মাছ মাংস খেত। মাছ, মাংস খাওয়াটা তন্ত্র অনুমতি দেয়, কিন্তু ডিম খাওয়াটা ভ্রূণ হত্যা হয়ে যায় বলে ডিম খেতে নিষেধ করা হয়েছে। যে প্রাণি জীবনটাই দেখতে পেলো না তার আগেই তাকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। ডিম যখন সেদ্ধ করা হচ্ছে তখন তার মধ্যে যে প্রাণ রয়েছে তার পালিয়ে যাওয়ারও কোন পথ নেই, কিন্তু মাছ পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, একটা পাখি পালিয়ে যেতে পারে। অন্য দিকে গ্রামের মুরগী তারও পালিয়ে যাবার পথ নেই, সেতো আমাকে ভালোবাসছে। সেতো আমার বাড়িতে আছে কিন্তু আমি তাকে ধরে গলাটা কেটে দিচ্ছি। সেইজন্য গ্রামের মুরগী খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হত না। ওকে একটা বাঁচার সুযোগ তো দিতে হবে। বন্য পাখি মেরে খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, কারণ তাকে পালিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। মাছ জলের মধ্যে পালিয়ে যাচ্ছে, তারও একটা পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। পোষা প্রাণিকে মেরে তার মাংস খাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। তার মধ্যে ডিম, সেতো একটা জায়গাতে বদ্ধ হয়ে আছে, তার বাঁচারও কোন পথ নেই। এত কিছু ভেবে ডিম, পোষা প্রাণিকে মারা নিষেধ করা হয়েছিল। এখন এগুলো সব পাল্টে গেছে, নতুন ধর্ম আসছে, সেই নতুন ধর্ম এটাকে আবার অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করবে।

অহিংসার ব্যাপারে প্রথমে বলা হচ্ছে তোমার মানসিকতাতেও কোন হিংসার ভাব থাকবে না, দ্বিতীয় তোমার খাওয়া-দাওয়াটাও এমন ভাবে সাজাতে হবে যাতে সেখানেও কোন হিংসাকে যেন প্রশ্রয় না দেওয়া হয়। আবার ব্যাধগীতাতে এই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ব্যাধ ব্রাহ্মণকে অন্য ভাবে বলছেন ‘হে ব্রাহ্মণ! আমি মাংস বিক্রী করছি বলে তুমি আমার নিন্দা করছ। কিন্তু মাংস না খেয়ে যেটাই খাচ্ছ, ভাত রুটি যাই খাওনা কেন, চাল গমকে মাটিতে ফেলে দিয়ে দেখ সেখান থেকে আবার জীবন বেরিয়ে আসবে। তুমি কোথায় যাবে তাহলে। জীবনের দ্বারাই জীবন চলছে’। সেইজন্য বলা হয় আমাদের যে জীবন চলছে সেটা অপরের জীবনের উপর দিয়ে চলে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাই খুব সচেতন থাকতে হয় যাতে খাদ্যের কোন ধরনের অপচয় না হয়। অনুষ্ঠান বাড়িতে কত মাছ, মাংস, খাবার-দাবার অপচয় হয় এটা খুবই অন্যায্য। যারা অহিংসা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, এরা সব সময় অমৃত। এদের মৃত্যু ভয় থাকে না, মৃত্যুর বন্ধন থেকে এরা বেরিয়ে যায়।

যাদের জীবন ধর্মের উপরই চলছে আর ধর্মটা শ্রীহরির জন্য, যাঁর চিন্তা দিবারাত্র করছে এরাই ব্রহ্মজ্ঞ। ঠাকুরের ভাষায় এটাই গিয়ে দাঁড়ায় ঈশ্বর দর্শনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। প্রথমে জীবনের উদ্দেশ্য হবে ধর্ম, দ্বিতীয় ধর্মের উদ্দেশ্য হবে ঈশ্বর প্রাপ্তি। ঈশ্বর চিন্তনেই তার সারা দিন সারা রাত অতিবাহিত হবে। এঁরাই হলেন ব্রহ্মজ্ঞ। তার মানে, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ তাঁরা সব সময় ঈশ্বর চিন্তন নিয়ে থাকেন, ঈশ্বর চিন্তনের বাইরে আর কোন কিছু চিন্তা করবেন না। এগুলো সব সন্ন্যাসীদের ধর্ম বলা হচ্ছে। আবার বলছেন, *দানং হি ভূতাত্ত্বদক্ষিণায়াঃ সর্বাণি দান্যান্যধিতীর্থাহ। তীক্ষ্ণং তনুং যঃ প্রথমং জহাতি সোহনন্ত্যমাপ্নোত্যভয়ং প্রজাভ্যঃ।।১৩/২৪২/২৬।* এই জগতে যত রকমের দান হয়, অভয় দান সব থেকে বড়। সমস্ত প্রাণিকে যে অভয় দান করা হয়, এই দানের উপর আর কোন দান হয় না। হিংসা প্রবৃত্তি নিবন্ধন যে উগ্রবৃত্তি হয়, এই বৃত্তিকে ত্যাগ করে সমস্ত প্রাণিকে যিনি অভয় দান করেন তিনিই মুক্তি লাভ করেন।

এখানে একটা খুব সুন্দর শ্লোক বলছেন। *প্রাদেশমায়ে হৃদি নিঃসৃতং যত্তস্মিন প্রাণানাত্মায়াজি জুহোতি। তস্যাগ্নিহোত্রং হতমাত্মসংস্থং সর্বেষু লোকেষু সদেবকেষু।।১৩/২৪২/২৮।* এটি একটি খুব কঠিন শ্লোক। যোগ করে করে যাঁরা যোগী হন, এখানে যোগী বলতে সন্ন্যাসীকেও বোঝাচ্ছে, এঁরা নিজেদের হৃদয়ের ভেতরে চৈতন্যের জ্যোতি দর্শন করেন। আর দৈনন্দিন জীবনে তাঁর যা কিছু ঘটছে, সব কিছুকে তিনি এই জ্যোতিতে আহুতি দিয়ে দেন। যোগী সব সময় দেখতে পান যে তাঁর হৃদয়ে চৈতন্যের জ্যোতি আছে। চৈতন্য জ্যোতি বলতে কি বোঝায় আমি আপনি কেউ বুঝতে পারব না, যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই একমাত্র বুঝতে পারবেন। ঠাকুর বলছেন, দেখছি কোশাকুশি চিন্ময়, দরজার চৌকাঠও চিন্ময়, বেড়ালের মধ্যে সেই মাকে দেখছেন। এগুলো আমরা কখনই ধারণা করতে পারব না। সন্ন্যাসী সব সময় সেই চৈতন্যের আলোকে দেখতে পান, এটা শুধু মাত্র আলো নয়, আলোটা জীবন্ত সত্তা। আর তার মধ্যে তিনি সব কিছুকে আহুতি দিয়ে দেন। যখন খাচ্ছেন তখন ঐ জ্যোতিতেই খাওয়া-দাওয়াটা আহুতি দিচ্ছেন, যখন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন সেটাকেও ঐ জ্যোতিতে আহুতি দিয়ে দিচ্ছেন, কাজকর্ম যা করছেন ঐ জ্যোতিতেই আহুতি দিচ্ছেন। এই ব্যাপারটা সত্যিই এই রকমই

হয়, কোন কল্পনা করে করছেন তা নয়, সত্যি সত্যিই এইটাই হয়। আর দেখেন সমস্ত বেদ, ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় যা কিছু আছে সবই ঐ চৈতন্যের জ্যোতির মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। প্রথম বলছেন অভয়ঃ সর্ব ভূতেভ্যো, সমস্ত প্রাণিকে অভয় দান, দ্বিতীয় বলছেন মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্যন্তে, আমার থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে। এই যে নিজের হৃদয়ে চৈতন্যের জ্যোতি দর্শন করছেন, তিনি দেখেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাতেই প্রতিষ্ঠিত, যত বেদ, উপনিষদ তার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। তখন সে কাকে হিংস করবে, একটা মুরগীকে কাটতে গেলে দেখবে এই মুরগীটাও আমার থেকে বেরিয়েছে। তখন সে কারুকে হিংসা করতে পারেনা। পর বলে কিছুই দেখেন না, অন্য দিকে আরেকটা অনুভূতি হচ্ছে কারুর গলা কেটে দিলেও তার কিছু মনে হবে না, বা তাঁর গলাও যদি কেউ কেটে তখনও তাঁর কোন কিছুই হবে না।

শেষ কথা হল অগর্হণীয়ো ন চ গর্হতেহন্যান্ স বৈ বিপ্রঃ পরমাত্মানমীক্ষেৎ। বিনীতমোহো ব্যপনীতকল্যাণো ন চেহ নামুত্র চ সোহন্নমর্ছতি। ১৩/২৪২/৩৫। যিনি নিজেও নিন্দনীয় নন, অগর্হণীয়ঃ আর সে কক্ষণ কোন গর্হিত কর্ম করে না যে কর্মের জন্য লোকে তাকে ঘৃণা করবে, আর তার সাথে কারুরই কর্মকে সে গর্হিত কর্ম বলে দেখে না। কারণ তিনি সবটাই চৈতন্য দেখছেন। এই অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ পরমাত্মার দর্শন করেন। যতক্ষণ ভালো-মন্দের জ্ঞান আছে ততক্ষণ পরমাত্মার দর্শন হবে না। যখন দেখব সবটাই তাঁর, ভালোটাও তাঁর মন্দটাও তাঁর, এইটাকে চিন্তা করে করে যখন তত্ত্বের ধারণা হয়ে যাবে তখনই এই ভাবটাকে নিয়ে মগ্ন হয়ে যেতে পারব। বিনীতমোহো ব্যপনীতকল্যাণো। এই অবস্থায় তাঁর যত রকমের পাপ, মোহ, শোক সব চলে যায়। তাঁর ভেতরে আবর্জনা বলে কিছু থাকে না। তার ফলে ন চেহ নামুত্র, এই জগৎ আর মৃত্যুর পর স্বর্গ কোন কিছুর প্রতিই তাঁর আসক্তি থাকে না। মানুষ কখন কোন জিনিষকে পেতে চায়? যখন দেখে জিনিষটার প্রতি তার আসক্তি আছে কিন্তু তার কাছে নেই তখনই সেই জিনিষটাকে পেতে চাইবে। বাচ্চার স্কুল ব্যাগে অনেক খোপ আছে, আর সে জানে এই ব্যাগে যা কিছু আছে সবটাই আমার। সে কি বলবে যে এই খোপে না রাখলে এটা আমার হবে না, এই খোপে রাখলে আমার হবে? ব্যাগের যেখানেই থাকুক না কেন, ব্যাগের মধ্যে যেটাই আছে সেটাই তার। সে তখন বলে না যে এই ব্যাগের এই জিনিষটা আমার চাই, সবটাই তো তার। কিন্তু অপরের ব্যাগে যেটা আছে সেটা যদি তার ব্যাগে না থাকে তখন তার প্রতি লোভ হবে। বাড়ির মালিক জানে পুরো বাড়িটাই তার, ডাইনিং রুমটাও তার, বেডরুমটাও তার। সে কি কখন বলবে ফ্রীজটা ডাইনিং স্পেসে না রেখে আমার বেডরুমে রাখব তাহলে মনে করব ফ্রীজটা আমার। সবটাই তো তার ফ্রীজটা যেখানেই থাকুক না কেন ফ্রীজটা তারই। এবার যদি আরেকটু বিস্তার করে বলি এই বেলুড় শহরের সবটাই আমার। তখন কি আমি বলব এই দোকানের জিনিষটা আমার চাই, ঐ বাড়ির ফুলের টবটা আমার চাই? বেলুড় শহরের সব কিছুই তো আমার। কেন চাইতে যাব। আর যখন বলব পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার, তখন কি কোন কিছু আমি চাইব? যোগী দেখেন তাঁর হৃদয়ে যে চৈতন্যের জ্যোতি, জগতের সব কিছু সেখান থেকেই বেরিয়েছে, সব কিছুই ঐ জ্যোতির মধ্যেই সমাহিত। এখন কোন জিনিষটার প্রতি তিনি লোভ করবেন আর কোনটাকেই বা তিনি ত্যাগ করতে চাইবেন। এগুলো শুধু মাত্র তত্ত্ব কথা নয়, এই জিনিষ সত্যিই এই রকমই হয়। তখন তাঁর জীবনটা অন্য রকমের হয়ে যায়, তিনি তখন কারুর নিন্দা করেন না, কারুর প্রশংসাও করেন না।

ব্যাসদেব অনেক কিছুর আলোচনা করে যাচ্ছেন, জ্ঞানীর কথা, জ্ঞানীর সাধনার কথা এই নিয়েও অনেক কথা বলছেন। এখানে আরেকটি বিষয় নিয়ে বলছেন কারুর মন পুরো শান্ত হয়ে গেছে আর মনের মধ্যে একটা বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব হয়ে চলেছে, তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে সত্ত্বগুণ জেগেছে। মন অনেক কারণেই শান্ত হয়, প্রচণ্ড দুঃখ যখন আসে তখনও কিন্তু সে শান্ত হয়ে যায়। এখানে কিন্তু সেই শান্ত ভাবের কথা বলছেন না, শান্ত কিন্তু আনন্দের ভাব। তার মানে তার মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়েছে। যখন মনের মধ্যে সব সময় সন্তাপ সৃষ্টি হতে থাকে, একটা বিরক্তির ভাব সব সময় তার মধ্যে তাপের সৃষ্টি করছে তখন বুঝতে হবে তার রজোগুণের বৃদ্ধি হচ্ছে। যখন মোহযুক্ত ভাব আসে, যখন জিনিষগুলো পরিস্কার বোঝা যায় না, যেমন ঘুম ঘুম চোখে কি দেখছি বা পড়ছি সেটাকে ঠিক বোঝা যায় না, তখন বুঝতে হয় মনটা তমোসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। সব সময় মনকে সত্ত্বগুণের দিকে নিয়ে যেতে হয়। কারণ যারা আধ্যাত্মিক জগতে এগোতে থাকেন তারা সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করে যান, কিন্তু প্রথমে সত্ত্বগুণে যেতে হবে। যখন অতিশয় আনন্দ, ভালোবাসা, সবাইকে সমদৃষ্টিতে দেখা, স্বচ্ছ চিন্তা মানে মনে কোন ধরণের নোংরা চিন্তা আসছে না, এগুলো হলে, শুধু হলেই না, তার আগে আছে অতিশয় খুব বেশী মাত্রায় যখন এগুলো হয় তখন বুঝতে হয় মনের মধ্যে সত্ত্বগুণ জাগছে। এগুলোই সত্ত্বগুণের ভাব। যদি দেখা যায় মনের মধ্যে অহঙ্কার জাগছে, মিথ্যে কথা বলছে, লোভ, অসহনশীলতা মানে সহ্য করার শক্তির অভাব, এগুলো হলে বুঝতে হবে তার রজোগুণ বেড়ে গেছে। আর যখন ঘুম বেড়ে যায়, থেকে থেকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে,

প্রমাদগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে আর অজ্ঞান ঢেকে রেখেছে, এগুলো সবই তমোগুণের লক্ষণ। আমাদের ভেতরে এই তিনটে গুণ কাজ করে চলেছে, নিজের দিকে তাকালেই বোঝা যায় কোন গুণটা এখন আমার মধ্যে কাজ করছে।

### ধর্মের উৎপত্তি ও কি প্রাপ্তির জন্য ধর্ম পালন? এই প্রসঙ্গে জাজলি ও তুলাধরের সংলাপ

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করছেন ধর্ম কি আর কোথা থেকে এর উৎপত্তি। সাথে সাথে আবার জিজ্ঞেস করছেন এই জগতে সুখ পাওয়ার জন্য যেটা করা হয় সেটাই কি ধর্ম, না পরলোক প্রাপ্তির জন্য যেটা করছে সেটাকে ধর্ম বলা হয়? ভীষ্ম বলছেন – *অপি হ্যুক্তানি ধর্মাণি ব্যবস্যান্ত্যভিরাবরে। লোকযাত্রার্থমেবেহ ধর্মস্য নিয়মঃ কৃতঃ।।১৩/২৫৪/৪।* বেদ, স্মৃতি আর সদাচার এই তিনটে মানে শ্রুতি, স্মৃতি আর সদাচার ধর্মলক্ষণমকে পরিষ্কার করে। শ্রুতি হল বেদ, স্মৃতি হল এই মহাভারত, বাণীকি রামায়ণ ইত্যাদি আর সদাচার হল মনুস্মৃতি আদি। শাস্ত্রে যে কথাগুলিকে ধর্ম বলে বলা হয়েছে, সেটাকেই প্রধান ও অপ্রধান ভাবে নিশ্চিত রূপে ধর্ম বলে গ্রহণ করা হয়। *লোকযাত্রার্থমেবেহ ধর্মস্য নিয়মঃ কৃতঃ।* এই শ্লোকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, ধর্ম কি বলতে গিয়ে মহাভারত ভীষ্মের মুখ দিয়ে বলছে জীবনযাত্রার জন্যই ধর্মের নিয়ম সৃষ্টি করা হয়েছে। হিন্দুরা আগে মুরগী খেত না, ডিমও খেত না কিন্তু এখন সবই খাচ্ছে। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণদের গায়ে মুরগীর পালক লেগে গেলে স্নান করত। এই জিনিষটা একটা প্রজন্ম আগেও দেখা গেছে, কিন্তু আজকে তারা মুরগীর মাংস খাচ্ছে। তাহলে এত দিন ধরে যেটা চলে আসছিল সেটা কি কোন বুজরুকি ছিল, না এখন যেটা চলছে সেটা অনাচার? কিন্তু কোনটাই এখানে তা হচ্ছে না, এখানে বলছেন শাস্ত্রে যেসব ধর্মের কথা বলা হয়েছে সেইগুলোকেই প্রধান ও অপ্রধান ভাবে ধর্ম বলা হয়। আর জীবনযাত্রাকে সুস্থ ভাবে চালানার জন্য মহর্ষিরা এইটাকেই নিয়ম করে দিয়ে গেছেন। এই যুগে ঠাকুর, মা ও স্বামীজী অনেক কিছু শিখিল করে দিলেন। ঠাকুর যদিও মাংস খুব কম খেতেন কিন্তু মাছ ভালই খেতেন তাই মাছ খাওয়াতে সন্ন্যাসীরা মেনে নিয়েছেন। ঋষি যতক্ষণ না খায় ততক্ষণ কোন খাদ্যকেই মেনে নেবে না। আগে কেন নিষেধ ছিল? আগে ঋষিরা বারণ করেছিলেন। গুরুত্ব হল জীবনযাত্রা। আমি যদি মুরগী নাই খাই, পেঁয়াজ নাই খাই তাতে আমার ধর্ম লাভও হবে না আর ধর্মের হানিও হবে না। ঋষিরা জীবনটাকে সুস্থ ভাবে চালানার জন্য কিছু নিয়ম করে গেছেন, কিন্তু এই নিয়মগুলো পাল্টাতে থাকে। স্মৃতির বিধানগুলি নিরন্তর পাল্টাতে থাকে। কিন্তু বেদের সিদ্ধান্ত কখন পাল্টাবে না। আত্মা অনন্ত, আত্মা ছাড়া কিছু নেই, এই সিদ্ধান্ত কোন দিন পাল্টাবে না। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানর যে পথ, সেই পথ পাল্টাতে থাকবে। আমরা পেঁয়াজ খাবো কি খাবো না, মুরগী খাবো কি খাবো না এগুলো পাল্টাতে থাকবে। অদূর ভবিষ্যতে যদি ব্রাহ্মণরা গরু খেতে শুরু করে দেয় তাহলে কি হিন্দু ধর্ম নাশ হয়ে যাবে? কিছুই হবে না, একজন ঋষি যদি বিধান দিয়ে দিলে সবাই খেতে শুরু করে দেবে। এই নিয়ম গুলো করা হয়েছে জীবনযাত্রাকে সুস্থ ভাবে চালানার জন্য। এই কথা বলার পর ভীষ্ম বলছে, যারা ধর্ম পালন করে তারা এই লোকে ও পরলোকে সুখ পান, যারা ধর্ম পালন করে না তাদের পাপী বলা হয়। এখানে একটা ডিসিপ্লিনের ব্যাপার আছে, আমাদের ঋষি বলে দিয়েছেন তুমি এটা খাবে না, এই কাজ করবে না ব্যস্ এইটাই নিয়ম হয়ে গেল। আবার পরবর্তী কালে কোন ঋষি বলে দিলেন এগুলো খেতে পার তখন আর এটা নিয়মের মধ্যে থাকল না, তখন অন্য জিনিষ হয়ে গেল। মূল কথা হল মনকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসা।

এখানে ভীষ্ম খুব মূল্যবান একটি কথা বলছেন *অপাপবাদী ভবতি যথা ভবতি ধর্মবিৎ। ধর্মস্য নিষ্ঠা ত্বাচারস্তমোবাশ্রিত্য ভোৎস্যসে।।১৩/২৫৪/৬।* যখন বিপদ হয় তখন পাপীরা তাদের পাপকর্মকে ছাড়তে পারেনা। যেমন আমাদের শাস্ত্রে মদ পান করতে নিষেধ করছে। কিন্তু যারা পাপী, মদ খেয়ে যদি তাদের লিভারের কোন অসুখ হয়ে যায় তখন তাও কিন্তু মদ খাওয়া ছাড়তে পারেনা। যারা সদাচারী তারা যতই বিপদে পড়ে যাক ঐ পাপে কখনই লিপ্ত হবে না। এইটাই হল তফাৎ। ডাক্তার রোগীকে বলছে আপনাকে মদ খাওয়া ছাড়তে হবে, তা নাহলে আপনি সুস্থ হবেন না। সে এখন বিপদে পড়ে গেছে, সে কিন্তু মদ ছাড়তে পারেনা। একজন কুলিন ব্রাহ্মণকে ডাক্তার বলে দিল, আপনার শরীরের যা পরিস্থিতি এই অবস্থায় যদি একটু মদ খান তাহলে রোগ সেরে যাবে। ব্রাহ্মণ কিন্তু তাও খাবে না। বেলুড় মঠের এক মহারাজের শরীরের কিছু সমস্যা হওয়াতে ডাক্তার চিকেন স্যুপের পথ্য ঠিক করে দিলেন। মহারাজ পরিষ্কার বলে দিলেন, সারা জীবন খেলাম না, এই বয়সে আর খাওয়া যাবে না, তাতে আমার শরীর যদি চলে যায় তো চলে যাবে চিকেন স্যুপ আমি খেতে পারব না। শ্রীমার যখন খুব শরীর খারাপ হয়েছিল তখন তাঁকে পাউরুটি খেতে দেওয়া হয়েছিল। শ্রীমা তখন বলে দিলেন ‘এই শেষ বয়সে আমাকে আর মুসলমানি রুটি দিও না’। আমরা লেকচারে বলি শ্রীমা বলছেন আমজাদও আমার ছেলে শরৎও আমার ছেলে। কিন্তু এটা আমরা বলি না যে শ্রীমা বলছেন এই শেষ বয়সে আমাকে মুসলমানি রুটি খাইয়ো না। কারণ এইটাই যে ধর্মটা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমজাদ তাঁর সন্তান হতে পারে, আর শেষ বয়সে তিনি

বলছেন না যে আমজাদ আমার সন্তান নয়, কিন্তু বলছেন মুসলমানি রুটি খাইয়ো না। শ্রীমা আবার বলছেন ঘরের মধ্যে মেম সাহেবরা চটি পড়ে হাটবে এটা চলবে না। নার্সরা ঐ ভাবে হাটে বলে তিনি ঢুকতেই দেননি। এটাই ধর্ম। প্রাণ রক্ষার জন্যও এই ধর্মকে তিনি ছাড়বেন না। আমি এটা ঠিক করে নিয়েছি, এটাই আমার ধর্ম।

যুধিষ্ঠির বলছেন, দেখুন ধর্মের এটা কি আশ্চর্যের, যারা চোর, যারা খুনি তারাও কিন্তু সত্য কথার দিব্যি খেয়ে নিজেদের মধ্যে আচার করে। যারা বড় বড় ক্রিমিনাল গ্যাং চালায়, এরা তো আইন কানুন কিছু মানে না। কিন্তু এদের নিজেদের মধ্যে কেউ যখন কাউকে যে কথা দেয় তোমার এই কাজটা করে দেব তখন তার সেটা করবেই। নিজেদের মধ্যে যে কথা দিয়ে দেয় সেটা তার কাছে একেবারে শেষ ধর্ম কথা হয়ে যায়। সেইজন্য যখন একবার বুঝে নিলাম যারা চোর ডাকাত, তাদেরও মধ্যে নিজেদের কথার দাম থাকে, তাহলে কথার দাম রাখা এটা হল উচ্চ অবস্থা। যারা চোর ডাকাত তারাও কিন্তু নিজের সন্তান, নিজের স্ত্রীকে খুন করে না। তার মানে তারাও জানে যে খুনোখুনি জিনিষটা ভালো না। আমরা সমাজে যাদের চোর ডাকাত বলছি, তারাও কিন্তু নিজেদের মধ্যে এই সব জিনিষ করে না। তারা নিজেদের মধ্যে যে জিনিষটা করে না, তখন বুঝতে হবে এটা ধর্মের কথা। যেমন নিজেদের মধ্যে মিথ্যে কথা বলে না, নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে না, নিজেদের কাউকে চিটিং করে না। তার মানে এই জিনিষগুলো করা ঠিক নয়।

যুধিষ্ঠির ধর্ম নিয়ে আরও কিছু প্রশ্ন করছেন। বলছেন, ধর্মই প্রাণির সৃষ্টি করে, ধর্মই তার জীবন ধারণের কারণ আর ধর্মই তাকে উদ্ধার করে। কিন্তু ধর্মতো এক নয়, শুধু বেদেই যেটা বলেছে সেটাই তো ধর্ম নয়। যে মানুষ ভালো অবস্থায় আছে তার ধর্ম এক রকম হয়, যে অসুবিধাতে পড়ে গেছে তার ধর্ম অন্য রকম হয়, সেইজন্য শুধু বেদকে দিয়ে কি করে ধর্ম জানা যায়। এর আগে আমরা দেখেছি আপৎধর্মও আছে আবার যার টাকা-পয়সা আছে তারও অন্য রকম ধর্ম হয়, যারা সব কিছু ত্যাগ করে দিয়েছে তাদের ধর্ম আবার আলাদা। যুধিষ্ঠির এই প্রশ্ন খুব পুরনো প্রশ্ন। এটা ঠিক যে ধর্মকে বেদ থেকেই জানা যায়। যুধিষ্ঠির বলছেন, এটা কি করে সম্ভব যে বেদের ধর্মটাই ধর্ম, কারণ বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ধর্ম আছে। অনেক সময় দেখা যায় অনেকে নিজের স্বার্থের বশীভূত হয়ে ধর্ম করে, আবার অনেকে অন্যরা বলেছে বলে করে, আবার দেখা যায় অনেকে ধর্মের নামে মিথ্যাচার করে বেড়ায়। ধর্মের নামে মিথ্যাচার করাটা খুব প্রাচীন সমস্যা। যুধিষ্ঠির বলছেন এই সব দেখে কেমন একটা সন্দেহ যে ধর্ম ব্যাপারটা ঠিক ঠিক কি!

ভীষ্ম বিরাট লম্বা আলোচনা করে এর উত্তর দিচ্ছেন। জাজলি আর তুলাধরের মধ্যে একটা সংলাপ হয়েছিল সেটা আমি তোমাকে বলছি। জাজলি একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি একবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে বিরাট তপস্যা করেছিলেন। এমন তপস্যা করেছিলেন যে তাঁর শরীরটা যেন খুব হালকা হয়ে গেছে, সব জায়গায় অবলীলা ভাবে চলে যেতে পারছেন। মানে তার মধ্যে অনিমা, লঘিমাতির মত কিছু সিদ্ধাই এসে গেছে। জাজলির তখন মনে হল *ন ময়া সদ্‌শোহস্তীহ লোকে স্থাবরজোঙ্গমে। অপ্সু বৈহায়সং গচ্ছেন্যয়া যোহন্যঃ সহতি বৈ।* ১৩/২৫৫/২৬। অর্থাৎ, জাজলি ভাবছে আমার মত আর কেউ নেই, তপস্যা করে আমার মধ্যে যে যোগশক্তি এসেছে তাতে আমি আকাশমার্গ দিয়ে যেতে পারি, যেখান দিয়ে খুশী যেতে পারি, আমার মত কারুর এই রকম শক্তি নেই। সমুদ্রের ধারে এই সব কথা বলছেন, তখন কিছু অদৃশ্য বাণী জাজলিকে বলছে ‘এই রকম অহঙ্কার করতে নেই। কাশীতে তুলাধর নামে একজন বৈশ্য আছেন, তিনি খুব ধর্মপ্রাণ লোক। কিন্তু তিনি এই রকম অহঙ্কার করেন না যেভাবে আপনি করছেন’। এই দৈববাণী শোনার পর পুরো জিনিষটা জাজলির ঠিক ভালো লাগল না। তার ইচ্ছে হল যে একবার কাশীতে গিয়ে এই তুলাধরকে দেখলে হয়।

যুধিষ্ঠির তখন জিজ্ঞেস করছেন, জাজলির নাম তো এর আগে কখন শুনিনি। ভীষ্ম শুনে যুধিষ্ঠিরকে জাজলি কি রকম তপস্যা করেছিল বলছেন। কখন এক পায়ে দাঁড়িয়ে, কখন এই ভাবে, কখন ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে তপস্যা করেছিল। একবার জাজলি এক পায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করে যাচ্ছে, একটা পাখি মনে করল এটা বুঝি কোন শুকনো গাছ। ঐ ভেবে পাখিটা জাজলির মাথায় বাসা তৈরী করেছে। জাজলি যখন বুঝল তার মাথায় পাখি বাসা বেঁধেছে। ঐটা দেখেই সে আরও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করতে লাগল, নড়াচড়া করলে যাতে ওদের অসুবিধা না হয়। পাখিরা বাসা বানিয়ে তারপর তাতে ডিম পেড়েছে। ডিম পাড়ার পর জাজলি আরও সাবধান হয়ে গেছে। পরে ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়েছে। তখন দেখছে, এখন নড়াচড়া করলে বাচ্চাগুলোর কষ্ট হবে। জাজলি এই সব ভেবে দাঁড়িয়েই রইল। পাখির মা বাচ্চাগুলো খাইয়ে বড় করল। বড় হওয়ার পর বাচ্চাগুলো উড়ে চলে গেল, তারপর জাজলি নিজের আসনটাকে ভাঙলেন। এই রকম অনেক



তপস্বী এখনও আছেন। দেবরাহা বাবা বলে একজন এই রকম তপস্বী ছিলেন উনি সব সময় একটা গাছের উপরে থাকতেন। একটা অবস্থার পর তিনি সারা জীবন গাছে বসেই কাটিয়ে দিলেন, গাছে বসে পা ঝুলিয়ে রাখতেন। ইন্দ্রিরা গান্ধীও তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কেউ বলত তাঁর বয়স দেড়শ বছর, কেউ বলত চারশ বছর। কিছু দিন আগে তিনি দেহ রেখেছেন। এই ধরনের কিছু সাধক থাকেন, এরা একটা পণ করে নেন, আমি এইভাবেই তপস্যা করে যাব। এখন সেই ভাবে বছরের পর বছর তপস্যা করতে করতে এদের ভেতরে আস্তে করে শক্তি সঞ্চয় হয়ে যায়। এগুলোতে একটা যোগশক্তি আসে, এগুলো যে ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক কিছু তা নয়। জাজলিরও একটা যোগশক্তি আসাতে তার এখন যেখানে খুশী চলে যাবার শক্তি এসে গেছে।

পাখির বাচ্চাগুলো উড়ে যাবার পর জাজলির মনে খুব অহঙ্কার হয়েছে। নিজেকে একজন বড় সিদ্ধ বলে মনে করছে। নিজেই নিজের পিঠি চাপড়ে বলছে আমি ধর্ম পেয়ে গেছি। তখন সেই অদৃশ্য বাণী জাজলিকে বলছে ‘দেখো তুমি ধর্মের দিক দিয়ে তুলাধরের ধারে কাছে যেতে পারনি। তুলাধরও ধর্ম পেয়ে কখন বলে না যে আমি ধর্ম পেয়ে গেছি’। জাজলি শুনে একটু চমকে গেছে, কেননা আমি এত তপস্যা করলাম আর তুলাধর সে কোন তপস্যা করেনি একটা দোকান চালিয়েই সে কি করে ধর্ম পেয়ে যেতে পারে। জাজলি তখন ঠিক করল কাশীতে গিয়ে এই তুলাধরকে একবারে দেখতে হবে। এরা আগে ব্যাধগীতাতে ব্যাধ আর কৌশিক ব্রাহ্মণের যে কাহিনী এসেছিল এখানেও কতকটা ঐ রকমই হচ্ছে।

তুলাধরের কাছে জাজলি গিয়ে দেখছে সে একটা দোকান খুলে দাড়িপাল্লাতে ওজন করে যাচ্ছে, আর জিনিষপত্র বিক্রী করছে। জাজলিকে দেখেই তুলাধর উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে বলছে ‘আমি জানতাম আপনি আমার কাছেই আসছেন, আর আপনার এই বোধ হয়েছে যে আপনি একজন বিরাট ধর্মপ্রাণ পুরুষ’। এরপর তুলাধর আর জাজলির মধ্যে বিরাট লম্বা আলোচনা চলছে। দুজনেই আলাদা পথের পথিক। তুলাধর বলছে ‘আমি কখন নিজেকে কারুর কাছে জাহির করি না, কাউকে বলতে যাই না যে আপনারা আমাকে একবার পরীক্ষা করে দেখুন। আবার কারুর আমি বিরোধিতাও করি না, আর কারুর পক্ষও যাই না। কারুর প্রতি আমার কোন ঘৃণা নেই, আর কারুর কাছ থেকে আমার কোন প্রত্যাশাও নেই’। মানুষ কারুর সাথে কখন ভালো ব্যবহার করে? যখন কারুর কাছে থেকে কোন প্রত্যাশা থাকে বা যার থেকে কোন ভয়ের ব্যাপার থাকে তখনই মানুষ তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে যায়। প্রত্যাশা না থাকলে কেউ ভালো ব্যবহার করতে যায় না, যদি ভালো ব্যবহার করে তাহলে বুঝতে হবে সে সাধুপুরুষ। অফিসের কর্মচারি সাহেবের সাথে ভালো ব্যবহার করে, কারণ সাহেবের সাথে ভালো ব্যবহার করলে আমার চাকরির উন্নতি হবে, আবার অন্য দিকে ভয়ও আছে ভালো ব্যবহার না করলে আমার অন্য কোথাও বদলি হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করে, কারণ সে জানে যে আপদে বিপদে প্রতিবেশী পাশে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু যিনি সাধুপুরুষ তিনি সবাইকে সমান ভালোবাসেন, কারুর কাছে থেকে কোন কামনা বা প্রত্যাশা তাঁর নেই। তুলাধর বলছে ‘সবারই প্রতি আমার সম ভাব। এইটাই আমার ব্রত, এইটাই আমার নিয়ম। এই যে আমার দাড়িপাল্লা, এর উপরের কাঁটা আর নীচের কাটা যেমন সমান রেখে আমি সবাইকে মালপত্র বিক্রী করছি, আমার বুদ্ধিটাও ঠিক এই রকম সমান। কাউকে যে আমি বেশী ভালোবাসব, কাউকে যে আমি কম ভালোবাসব তা কখন আমার বুদ্ধিতে উদয় হয় না। সেইজন্য আমার নাম তুলাধর’।

তুলাধর বলছে ‘আমি এই আকাশের মত, আকাশ যেমন অসঙ্গ কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না, আমিও কারুর সাথে কোন ভাবে লিপ্ত হয় না। আকাশে কত কি হচ্ছে কিন্তু আকাশ নির্লিপ্ত। ঠিক তেমনি জগতের সবারই কাজকর্ম সাক্ষীর মত আমি দেখে যাচ্ছি কিন্তু কারুরই আমি নিন্দা করিনা কারুরই আমি প্রশংসা করি না’। সারা জগতের প্রতি যখন আমাদের মনে এই সম ভাব এসে যায় তখনই আমাদের মন শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। ‘হে জাজলি! যদা চায়ং ন বিভেতি যদা চাস্মান্ন বিভ্যতি। যদা নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা। ১৩/২৫৬/১৫। তুমি যখন এই জগতে কাউকে ভয় পাবে না, তোমাকেও যখন কেউ ভয় পাবে না তখন তুমি বুঝতে পারবে যে তুমি সম ভাব পেয়ে গেছ, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে’। ভয় কখন হয়? যখন দুই বোধ থাকে তখনই ভয় আসে, আমি আর তুমি আলাদা এই বোধ থেকেই ভয় তৈরী হয়। উপনিষদে বলা হচ্ছে যখন প্রজাপতির সৃষ্টি হল তখন প্রজাপতি ভয় পেয়ে গেলেন। ভয় পেয়ে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় তাঁর মনে জিজ্ঞাসা এল আমি কেন কাঁদছি। আমি ভয় পেয়ে গেছি। ভয় কেন পেয়ে গেছি? আমি একা আছি বলে। কিন্তু ভয়তো সব সময় অপর থেকে হয়, এখন তো আমি একা আছি, পর কেউ নেই তাহলে আমার ভয়ের কি আছে। ভয় যদি না থাকে তাহলে আমি মিছিমিছি কাঁদব কেন। আমি যদি একা এই ঘরে থাকি

তাহলে কোন ভয়ের কিছু নেই। চোর ডাকাতের ভয়েই মানুষ দরজা, জানলা বন্ধ করে ঘুমোয়। বাচ্চাদের যদি একা ঘরে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন তারা ভয় পায়। কেন ভয় পায়? ভূতের ভয়, তখনও সে দুই দেখছে। যেখানে দ্বিতীয় বলে কোন বোধ নেই তখন কাকে আমি ভয় করব! আমাকেও কেউ ভয় পাবে না, আমিও কাউকে ভয় পাবনা। তুলাধর বলছে ‘জগতের সমস্ত প্রাণির প্রতি দৃষ্টি পড়লেও আমার কোন ধরনের পাপদৃষ্টি আসে না’। এখানে বলছেন পাপকম, মিথ্যা আচরণ, কারুর ক্ষতি করার ইচ্ছা, কারুর প্রতি হিংসা এই ধরনের কোন পাপদৃষ্টি হয় না।

তুলাধরকে জাজলি জিজ্ঞেস করছে তুমি এগুলো কিভাবে শিক্ষা পেয়েছ? তুলাধর খুব সুন্দর বলছে *যথাবদ্বর্তমানানাং বৃদ্ধানাং পুত্রপৌত্রিণাম্। অনুবর্তমহে বৃত্তমহিংস্রাণাং মহাত্মনাম্। ১৩/২৫৬/১৯*। যারা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, যাদের পুত্র পৌত্রাদি আছে আর শাস্ত্র মতে আচরণ করে জীবন যাপন করছেন, কারুর প্রতি এবং কোন জীবের প্রতি হিংসা করেনা, তাঁরা যে আচরণ ও ব্যবহার করেন আমিও সেই আচরণ ও ব্যবহারকে অনুসরণ করি’। শাস্ত্রে অনেক রকম কথা আছে, আর শাস্ত্রের কথার শেষ নেই। শাস্ত্রের এই কথাগুলোকে যখন বৃদ্ধজনরা নিজের জীবনে আচরণ করেন, যেটা শাস্ত্র সম্মত, ঐটাই আমার আপনার জন্য অনুকরণীয়। যেমন গান্ধীজী, তিনি অনেক কিছুই করতেন। তাঁর পুত্র পৌত্র সবই ছিল, সচ্ছল পরিবার। তাঁর মনে কোন ধরনের হতাশার ভাব থাকার কথা নয়। তবুও তিনি বলে দিলেন আমি সত্য আর অহিংসা পালন করব। এই দুটো করতে গিয়ে এর পাশাপাশি আরও অনেক কিছু করতে শুরু করলেন। সত্য অহিংসা করতে গিয়ে এটা কখনই পড়বে না যে আমাকে লবণ খাওয়া চলবে না, মশলা খাওয়া যাবে না, ভালো সজী খাওয়া যাবে না। গান্ধীজী সত্য আর অহিংসাকে ব্রত করে নিলেন, আমি সত্যকে ছাড়ব না, আর কোন ধরনের হিংসা, আমাকে যদি কেউ মারতেও আসে আমি তাও আমি হাত উঠাব না। এরপর তিনি ঠিক করে নিলেন আমি তেল মশলা ছাড়া সাদা খাওয়াই খাব। তিনি তাই খাওয়া শুরু করে দিলেন। তখনকার দিনে সবাই এই খাওয়াই খেতে শুরু করে দিল। গান্ধীজী বৃদ্ধজন, এইভাবেই ধর্ম সৃষ্টি হয়। সিনিয়র সিটিজেনরা যখন শাস্ত্রমতে জীবন-যাপন করতে শুরু করেন, তাঁরা যা যা করেন সেটাই তখনকার ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। গান্ধীজী পর পর অনেক কিছুই করতে শুরু করলেন। একবার ঠিক করে নিলেন আমি খার্ড ক্লাশ ছাড়া যাব না। যার ফলে স্বাধীনতার অনেক দিন পরেও রেল শীততাপনিয়ন্ত্রিত কোচ চালুই হল না। এখন অবশ্য গান্ধীজীর থেকে দেশ অনেক সরে এসেছে। এইটাই এখানে তুলাধর বলছেন। শাস্ত্র আমরা বেশীর ভাগ লোক পড়িই না, তাহলে কাকে আচরণ করব? আচরণ করব যাদের বয়স হয়ে গেছে তারা শাস্ত্র সম্মত যে আচরণ গুলো করছেন, সেগুলোকে অনুসরণ করতে হবে। শুধু বৃদ্ধই নয়, যাদের পুত্র পৌত্র আছে। কারণ পরিবার না হলে আমরা বুঝব কি করে তার আচরণটা কোথায় কেমন হচ্ছে। সন্ন্যাসীর আচরণকে এখানে অনুসরণ করলে আমরা সংসারে চলতে পারব না। ভারতের অতি দুর্ভাগ্য যে সন্ন্যাসীর ধর্মকে গৃহস্থরা নিয়ে নিয়েছে। সন্ন্যাসীদের প্রতি দেশের মানুষের এত সম্মান যে সারা দেশ সন্ন্যাসীকেই অনুসরণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে সন্ন্যাসীদের আদর্শটা চলে গেল গৃহস্থদের মধ্যে। সন্ন্যাস একটা আলাদা জিনিষ, সে জাগতিক সব কিছু ত্যাগ করে একমাত্র মোক্ষকে অবলম্বন করে এগিয়ে যাচ্ছে। গৃহস্থকে জগতের সব কিছুর মধ্যেই থাকতে হবে, তাই যারা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, যাদের পুত্র পৌত্র আছে, তারা যে শাস্ত্র সম্মত আচরণ করে যা যা করছেন সেটাই গৃহস্থদের অনুকরণ করতে হবে।

তুলাধর বলছে *নদ্যাধে যথা কাষ্ঠমুহ্যমানাং যদৃচ্ছয়া। যদৃচ্ছয়েব কাষ্ঠেন সন্ধিং গচ্ছেত কেনচিৎ।। ১৩/২৫৬/২২*। ‘নদী বয়ে চলেছে, নদীর জলে অনেক কাঠের টুকরো ভেসে যাচ্ছে, নদীর গতিতে কাঠগুলো কখন এক অপরের সাথে মেশে আবার নদীর গতি প্রবাহে এক অপরের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই না, কাঠগুলো যখন ভেসে যায় তখন তার সাথে আরও অনেক কিছু এসে জড়ো হয়ে যায়। এই যত রকমের সংযোগ হচ্ছে এগুলো সবই অকস্মাৎ। নিজের মত এসে মিশে যাচ্ছে আবার নিজের মত আলাদা হয়ে যায়’। তুলাধরের এই শ্লোকটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটছে, এগুলো তিন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। একটা মত হল, ভগবানের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। দ্বিতীয় মত হল আমার পূর্ব পূর্ব কর্মফলের জন্যই হচ্ছে। তৃতীয় মত বাই চান্স, দৈবাৎ, অকস্মাৎ। তুলাধর এখানে তৃতীয় মতটাকে এনেছে। তাহলে সত্য কোনটা? কোনটাই সত্য নয়, আমি যে মতটাকে নিয়ে এগিয়ে যাব সেটাকেই যদি ধরে রাখতে পারি তখন ঐটাই আমাকে সিদ্ধির পথে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমরা ধরে রাখতে পারিনা। মুখে সবাই এই চান্স থিয়োরির কথা বলে কিন্তু বিশ্বাস কেউ করে না। যদি চান্স থিয়োরিকে বিশ্বাস করে এগিয়ে যাই তাতেও সব কিছু হয়ে যাবে। আমি এই জগতে কেন এসেছি, দৈবাৎ এসে গেছি, এর আর কোন কারণ নেই। এখন এই চান্স থিয়োরিকে যদি বিশ্বাস করে এগোতে হয় তখন নিজের ছেলের যদি কিছু গোলমাল হয়ে যায় তখনও বলতে হবে, এ কিছুই না এটা চান্স,

দৈবাৎ হয়ে গেছে। ছেলের ডিভোর্স হয়ে গেছে, মাথা খারাপ করার কিছু নেই, এটা একটা চাম্পের ব্যাপার। যদি চাম্পেই বিশ্বাস কর তাহলে তোমার চেষ্টা করার কি প্রয়োজন। বাই চাম্প ওটা আসার হলে আসবে, বাই চাম্প ওটা আসার না হলে আসবে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই যদি সব হয় তাহলে তো আরও কিছু করার দরকার নেই। কিন্তু একমাত্র যারা কর্মফলের থিয়োরিকে বিশ্বাস করে তাদেরই চেষ্টা করার কথা আসে। এর আগে আগে আমি যা কর্ম করেছি এখন তার ফল পাচ্ছি, এখন যা কর্ম করছি তার ফল পরে পাব। কর্মবাদে যারা বিশ্বাস করে একমাত্র তাদের জন্যই চেষ্টার ব্যাপারটা আসবে। তিনটে থিয়োরির উদ্দেশ্যই হল আমাদের মাথাটা যেন খারাপ না হয়, ভালোতেও যেন খারাপ না হয় আর মন্দতেও যেন খারাপ না হয়। কিন্তু যে কোন একটা মতকে বিশ্বাস করে তাকেই ধরে রাখা খুব কঠিন। কিন্তু যে কোন একটা মতকে সর্বতো ভাবে অবলম্বন করে নিয়ে জীবনে যদি চলতে পারি তাতেই আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি এসে যাবে। আমাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হল, আমরা তিন চারটে নৌকাকে একসঙ্গে নিয়ে চলি, কোন নৌকাতে একটা পা, কোনটাতে একটা হাত কোন নৌকাতে মাথাটা দিয়ে চলি। ফলে যখনই নৌকা চলতে শুরু করে আমরা ঝপাং করে জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খেতে থাকি। এই তিনটির মধ্যে যে কোন একটাকে নিয়ে যদি তিন মাসও চলতে পারি তাহলেই আমাদের জীবন আমূল ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

তুলাধর বলছ *যস্মাদুদ্বিজতে বিদ্বন্ সর্বলোকো ব্রুকাদিব। ক্রোশতস্তীরমাসাদ্য যথা সর্বে জলেচরাঃ।।* ১৩/২৫৬/২৫। দেখো যখন মানুষরা এসে নদীর ধারে হৈচৈ করতে থাকে তখন তাদের ভয়ে জলের সব প্রাণিরা ভয়ে লুকিয়ে যায়। ঠিক তেমনি কোন বাঘ যদি জঙ্গলে হুঙ্কার দেয় তখন মানুষরা লুকিয়ে যায়। যার থেকে জগৎ ভয় পায়, সেই কিন্তু এই জগৎ থেকে ভয় পায়। আমাকে দেখে যদি জগৎ ভয় পায় তাহলে বুঝতে হবে আমিও এই জগৎ থেকে ভয় পাব। যদি আমার মধ্যে কোন ভয়ের কিছু থাকে তাহলে এটাও নিশ্চিত যে আমিও কাউকে ভয় দেখাচ্ছি। মূল কথা হল কাউকে ভয় দেখাতে নেই। সেইজন্য কারুর প্রতি হিংসা ভাব রাখবে না। বৈশ্যদের মধ্যে অহিংসার ভাবটা খুব বেশী দেখা যেত। বলছেন যে মানুষকে দেখে বাড়ির ভেতরে বাড়ির বাইরে সবাই ভয় পায়, তাহলে বুঝে নাও সেই মানুষ যতই ধর্ম করুক কোন দিন ধর্মের ফল পাবে না।

তুলাধর আবার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছে *কারণাদ্বিধর্মম্বিচ্ছেন্ন লোকচরিতধ্বংসেৎ। যো হন্যাদ্ যশ্চ মাংস্তৌতি তত্রাপি শৃণু জাজলে।।* ১৩/২৫৬/৫৩। জাজলি! এই ধর্ম করে আমার কি লাভ হবে, এইটাকে বিচার করেই তোমাকে যে কোন ধর্ম করা উচিত। কেউ কিছু একটা করছে সেইটাকেই অন্ধের মত অনুকরণ করতে নেই। তাই বলা হয় যে কোন ধর্মকে পালন করতে গেলে বিচার করে দেখতে হয় এই ধর্মটা কেন আমি পালন করতে যাচ্ছি, পালন করে আমার কি লাভ হবে। খুব বাস্তব একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, কোন বাঙালী সাধু ঠিক করলেন আমি ধর্ম করব। কি রকম ধর্ম করবেন? জৈন মুনিরা যেমন নিরামিষ খেয়ে থাকেন আমিও নিরামিষ খাব। সে মাছ খাওয়া ছেড়ে দিল। কিছু দিন পর দেখা গেল তার শরীর খারাপ হয়ে গেল। শ্রীমা বলছেন বাবা মাছ খেতে হয়, মাছ খেলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। এখানকার আবহাওয়া এমন আর বাঙালীর শরীর এমন যে এখানে মাছ খেলে মাথাটা ঠাণ্ডা থাকে। এখন জৈনরা মাছ খায় না বলে শুধু এই কারণে আমিও ছেড়ে দিলাম মাছ খাওয়া, এই ধরনের কাজ করতে নেই। একটা ধর্মকে যখন পালন করতে যাব তখন দেখতে হবে এই ধর্ম পালন করে আমার লাভটা কি হবে। আমার পাড়ার একজন রোজ গঙ্গায় স্নান করতে যায়, তার দেখাদেখিতে আমিও রোজ গঙ্গা স্নান করতে শুরু করলাম। এইভাবে ধর্ম হয় না। যখন বিচার করা হয় এই ধর্মটা পালন করলে আমার কি লাভ, এই বিচার করার পর ধর্ম পালন করলে তখন ধর্মের ফল পাওয়া যায়। সেইজন্য সবাই দীক্ষা নিচ্ছে বলে আমিও দীক্ষা নেব, এতে কখন ফল হয় না। সাংসারিক ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। এই কলেজে আমার বন্ধুরা ভর্তি হচ্ছে আমিও ভর্তি হব। এতে তার ভবিষ্যত কখন উজ্জ্বল হবে না। আমার এই সাবজেক্ট ভালো লাগে, যে কলেজেই এই সাবজেক্টে অনার্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাব সেই কলেজেই ভর্তি হব। বিয়ের সময় আরও মজা হয়। কোন ছেলেকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় বিয়ে কেন করলে। বলবে বাবা-মা বলল তাই বিয়ে করলাম। জীবনে এই একবারই বাবা-মায়ের আজ্ঞাকারী সন্তান হয়, বিয়ের সময়। সারাটা জীবন বাপ-মায়ের কথা শোনেনি শুধু বিয়ের সময় বাবা-মায়ের কথা শুনে বিয়ে করেছে। বিয়ে আমি কেন করব এটা তারা একবারও ভাবে না। জাগতিক সমস্ত ক্ষেত্রে যেটাই আমরা করতে যাব সেখানেও এই বিচারটা আনতে হবে। কাজটা আমি কেন করব এই চিন্তাটা আনতে হবে। আমি এই জিনিষটা চাই তাই আমি এই কাজটা করব। যে কোন কাজ করার আগে এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে করতে গেলে দেখা যাবে আমাদের বেশীর ভাগ কাজই খসে যাবে। অন্ধ অনুকরণ, অন্যরা করছে বলে আমি এটা করব, এইভাবে ধর্মের ফল পাওয়া যায় না।

আমাদের পূর্ব পুরুষরা মুরগীর মাংস, ডিম খেতেন না। এখন পরিস্থিতি এমন হয়ে গেছে, আমাদের শরীরে যে পরিমাণ প্রোটিন দরকার তাতে ডিম খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহলে ডিম খাও। ডিম খেলে ধর্মের হানি হবে কোথাও বলছে না, ধর্মের হানি হবার তো কথা নয়। এইটাই এখানে বলছেন, তুমি সব সময় বিচার করে দেখ। খাদ্য পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বিচার করে দেখতে হবে কোনটা খেলে আমার শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হবে। শুধু আমাদের পূর্ব পুরুষরা খেতেন না বলেই এটা না খাওয়াটা ধর্ম তা নয়। তুমি নিজে চিন্তা ভাবনা করবে, চিন্তা ভাবনা করে বিচার করবে তারপর যেটা ভালো বুঝবে সেটাই করবে। এই কথা তুলার বলছে জাজলি মুনিকে। এইভাবে একটার পর একটা বিষয়কে নিয়ে তুলার আলোচনা করে যাচ্ছেন, মাঝে মাঝে এই কাহিনী সেই কাহিনী নিয়ে আসা হচ্ছে। যুধিষ্ঠিরের মূল প্রশ্ন ছিল ধর্মের প্রামাণিকতার উপর সন্দেহকে নিয়ে। ভীষ্ম তখন এই জাজলি আর তুলারের সংলাপ শোনানোর পর বলছেন যাঁরা মুনি তাঁরাও এই ধর্মের আচরণ করেছেন, আর সাধারণ দৈনন্দিন জীবনেও এই ধর্মকে পালন করা যায়, ধর্ম পালনের দ্বারা ই মানুষ সুখি হয়।

### ধর্ম, অর্থ ও কামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি? এই প্রশ্নে নির্ধন ব্রাহ্মণ ও কুণ্ডধারের কাহিনী

এরপর যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করছেন, ‘পিতামহ! বেদে ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটিরই প্রশংসা করা হয়েছে। এই তিনটির মধ্যে কোনটা ভালো আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন’। ভীষ্ম তার উত্তরে বলছেন। এক সময় এক নির্ধন ব্রাহ্মণ ছিল, এই নির্ধন ব্রাহ্মণ একবার সকাম ভাবে সাধনা করতে শুরু করেছে। সকাম ভাবে সেই নির্ধন ব্রাহ্মণ এমন তপস্যা করেছে যে সেই তপস্যার শক্তিতে তার অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু তার কপাল এমনই মন্দ ছিল যে তাতেও সেই ব্রাহ্মণ কোন টাকা পয়সা অর্জন করতে পারল না। তখন সে ভাবতে শুরু করল, এমন কোন দেবতা আছেন কি যিনি আমার উপর খুব প্রসন্ন হবেন, যাকে মানুষ জড় বানিয়ে দেয়নি। মানে এত বেশী মানুষ ঐ দেবতার পেছনে দৌড়াচ্ছে যে সেই দেবতা জড় হয়ে গেছে। ব্যাপারটা হল, কোন এক বড়লোক যদি কোন আশ্রমে মোটা কিছু ডোনেশান দিয়ে দেয় আর সেই খবর যদি অন্যান্য আশ্রমে জানানাজানি হয়ে যায় তখন সব আশ্রমের অধ্যক্ষরা তার কাছে পৌঁছে যাবে। আমরা এই প্রজেক্ট নিয়েছি, আমরা অমুক করতে যাচ্ছি, এমন হয়ে যায় যে ঐ বড়লোকটি শেষে বিরক্ত হয়ে সব আপীলগুলোকে ফেলে দেয়। একবার যদি কোন দেবতার নাম হয়ে গেল, সন্ধ্যাই তখন সেই দেবতার সামনে লাইন দিয়ে দেয়। এই ব্রাহ্মণও অনেক তপস্যা করেও কিছু হল না দেখে বলছে এমন কোন দেবতা আছে যার তপস্যা করলে ফল পাওয়া যাবে। তার কপাল এমনই যে সেই সময় দেবতার একজন অনুচর, আসলে সে ছিল একটা মেঘ, জলধর মেঘ তার নাম কুণ্ডধার, সে সব শুনছিল। এই জলধর দেবতাও না, দেবতাদের থেকে অনেক নীচে। ব্রাহ্মণ বুঝতে পেরেছে এই অনুচর দেবতাদের খুব কাছের লোক, আর মেঘ হওয়াতে ইন্দ্রের খুব ঘনিষ্ঠ। আমার এমন একজন চাই যে আমার কথা শুনবে। তখন ব্রাহ্মণ এরই খুব করে পূজো অর্চনা করেছে। মেঘের পূজো কেউ করে না, আবার দেবতাদের থেকে অনেক নীচে, তাকেই এই ব্রাহ্মণ খুব পূজো করেছে। কুণ্ডধার মেঘ তাতেই খুব সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। সন্তুষ্ট হয়ে সে ব্রাহ্মণকে কয়েকটা ধর্মের কথা বলছেন। কৃতঘ্ন যে তার জন্য কোন প্রায়শ্চিত্তের বিধান নেই। মানে বলতে চাইছে, তুমি আমার পূজো করছ তাই তোমার জন্য কিছু একটা আমাকে করতে হবে। বলছে আশার সন্তান হল অধর্ম। যার মনে প্রচুর আশা জমে আছে তার মানে আজ হোক কাল হোক সে অধর্মের দিকে পা বাড়াবে। অনেক উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্রাহ্মণ এইবার রাতে ঘুমিয়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেই ব্রাহ্মণ স্বপ্নে সমস্ত প্রাণিকে দেখতে পাচ্ছে। স্বপ্নের মধ্যে দেখছি দেবতারা সবাইকে সব কিছু দিচ্ছেন। যেমনি কেউ শুভ কাজ করছে তখন অনেক কিছু দিচ্ছেন, কিন্তু যখনই আবার অশুভ কর্ম করছে সেগুলো সব আবার কেড়ে নিচ্ছেন। ভগবানই যাকে যা দেবার সব কিছু দেন। ঐ স্বপ্নের মধ্যেই ব্রাহ্মণ দেখছে কুণ্ডধার দেবতাদের সামনে মাথা নত করে দিয়েছেন। তখন কুণ্ডধার আবার কয়েকজন দেবতাকে গিয়ে ধরেছে কিভাবে এই ব্রাহ্মণের জন্য কিছু করা যেতে পারে। সেই দেবতারা তখন তাকে বললেন, ‘দেখো, একে এখন কিছু দিও না, তার চাইতে বরং এর তপস্যার জোরটা বাড়িয়ে দাও। কারণ সুখটা ক্ষণিক’।

মণিভদ্র নামে একজন দেবতা কুণ্ডধারকে বলছে, ‘এই ব্রাহ্মণ এত তপস্যা করেছে যে তুমিও তার জন্য কিছু করার জন্য আমাদের বলছ, আমরা এর তপস্যাতে খুব খুশিই হয়েছে, আর এই ব্রাহ্মণের বুদ্ধি সব সময় ধর্মেতেই লেগে থাকবে আর খুব বড় ধর্মাত্মা হবে’। ব্রাহ্মণ দেখছে সবাই এত কিছু দেবতাদের কাছ থেকে পেল কিন্তু তার পাশে দেখছে শুধু একটা গেরুয়া কাপড় আর জঙ্গলে যে কাপড় পড়ে থাকা হয় সেই ধরণের কাপড় গুলো রাখা আছে। ব্রাহ্মণ তখন দেখলে যে আমার ভাগ্যে যখন কিছুই জুটল না, ঠিক আছে আমি ধর্ম জীবনই যাপন করব। ওগুলো নিয়ে ব্রাহ্মণ বেরিয়ে

গেল তপস্যা করতে। তপস্যা করতে করতে ব্রাহ্মণের ভেতরের অন্তর্জগৎ স্পষ্ট হতে শুরু হয়েছে আর দিব্যদৃষ্টি পেতে শুরু করেছে। দিব্যদৃষ্টি যখন পেতে শুরু করেছে তখন হঠাৎ তার চেতনা হল যে আমি এখন যাকে বলে দেব তার প্রচুর টাকা-পয়সা হয়ে যাক সে তাই পেয়ে যাবে। ব্রাহ্মণের নিজের কিছু ছিল না, কিন্তু অন্যের জন্য যাকে বলে দেবে তার প্রচুর ধন-সম্পদ এসে যাবে। এই ধরণের শক্তি তপস্যাতে সিদ্ধাই রূপে এসে যায়। ব্রাহ্মণ দেখছে আমার মধ্যে এই ক্ষমতা এসে গেছে! যাকে বলব তার টাকা হয়ে যাক তারই টাকা হয়ে যাবে! তখন ব্রাহ্মণের মধ্যে আরও উৎসাহ জেগে গেছে। মণিভদ্র আসলে ব্রাহ্মণকে আশীর্বাদ করেছিল যাতে তার মন সব সময় ধর্মে লেগে থাকে। ব্রাহ্মণ কিন্তু এখানেই থেমে গেল না, এখান থেকে আবার আরও জোর তপস্যা শুরু করল। তারপর দেখছে মনে যে সঙ্কল্পটা উঠছে সেটাই পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ যদি কাউকে আমি বলে দিই তুমি একটা সাম্রাজ্য পেয়ে যাবে সে সাম্রাজ্য পেয়ে যাবে। এই ভাবে একটা একটা করে যত ক্ষমতা আসছে সে আরও দ্বিগুণ উৎসাহে তপস্যাতেই লেগে থাকল। এরপর সেই মেঘ কুণ্ডার এসে ব্রাহ্মণকে বলছে ‘দেখো, তুমি আমার কাছে সেদিন টাকা-পয়সা চেয়েছিলে, আমি যদি ইচ্ছে করতাম তোমাকে দিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আজ হোক কিংবা কাল হোক সেই টাকা-পয়সা তোমার কাছে থেকে চলে যেত। কিন্তু আমি তোমাকে এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছি যার ফলে কোন দিন তোমার আর কোন ক্ষতি হবে না। সব পথ তোমার জন্য খুলে গেল’। ভীষ্ম বলছেন ‘সেই ব্রাহ্মণের তখন দৃষ্টি খুলে গেল। *ততোহপশ্যৎ স কামধঃ ক্রোধং লোভং মদম্। নিদ্রাং তন্দ্রী তথালস্যমাবৃত্য পুরুষান্ হিতান্।।১৩/২৬৫/৪৭।* যারা ভোগী পুরুষ, যারা সকাম ভাবে নানান রকমের কর্ম করেছে, তাদেরকে কিভাবে পরের দিকে নানান রকমের শত্রু – কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, মত্ততা, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য এই শত্রুরা ঘিরে ফেলে।

ব্রাহ্মণের মন তখন জগৎ থেকে আরও সরে গেছে, এমনকি স্বর্গ থেকেও তার মন সরে এসেছে। সে আরও জোর তপস্যাতে লেগে রয়েছে। তাতে তার আরও নানান ধরণের সিদ্ধি আসতে থাকছে। এক সময় তার অনুভূতি হল, এই জগতে দেবতা হোক, ব্রাহ্মণ হোক যেই হোক সবাই তাঁরই পূজা করে যিনি ধর্মান্বিত। যার কুবেরের মত প্রচুর টাকা-পয়সা আছে তার পূজা হয় না। এই কাহিনী বলে ভীষ্ম বলছেন *সুপ্রসন্না হি তে দেবা যন্তে ধর্মে রতা মতিঃ। ধনে সুখকলা কাচিৎ ধর্মে তু পরমং সুখম্।।১৩/২৫৬/৫৬।* ‘হে যুধিষ্ঠির! তোমারও সম্মান এই জন্য যে তোমার মন সতত ধর্মে লেগে আছে। দেবতারা অবশ্যই তোমার উপর অতিশয় সুপ্রসন্ন আছেন। ধনে মতি থাকলে কখন সখন একটু সামান্য সুখ হয় কিন্তু ধর্মে মতি থাকলেই পরম সুখ হয়’। এখানে ভীষ্ম কি বলতে চাইছেন এটা আমাদের খুব ভালো করে বোঝা দরকার। এক ব্রাহ্মণের খুবই সাধারণ একটা গল্প কিন্তু ভেতরে একটা তাৎপর্য রয়েছে। ঠাকুর বলছেন গ্রাম দেশে যখন কোন ঝগড়া-বিবাদ হয় তখন তার মিমাংসা করবার জন্য গ্রামে বড় বড় পালোয়ান থাকতেও বিশ ক্রোশ দূর থেকে পাক্কী করে একটা রোগা প্যাটকা ব্রাহ্মণকে নিয়ে আসা হয়। কারণ সে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। সম্মান বলতে যেটা বোঝায়, ধর্মপ্রাণ যারা তাদের ছাড়া কেউ সম্মান পায়না, আগেও পেত না এখনও পায়না। ব্রাহ্মণের গল্প দিয়ে এটাই বোঝান হচ্ছে। ব্রাহ্মণকে বোঝান হচ্ছে, দেখো তুমি যদি তপস্যা করে টাকা-পয়সা পেয়ে যাও, সিদ্ধাই যদি পেয়ে যাও তুমি সেই সম্মানটা পাবে না যে সম্মানটা তুমি ধর্মপ্রাণ হয়ে পাবে। ধর্মে যদি প্রতিষ্ঠিত হও তুমি চিরদিন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে আর দ্বিতীয় ঠিক ঠিক সম্মান পাবে। কিছু দিন আগে মাকবুল ফিদা হোসেন মারা গেলেন। এই মানুষটিকে সবাই কত সম্মান করেন। যদিও তিনি কিছু উল্টোপাল্টা কাজ করেছেন, কিন্তু পুরোপুরি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। খালি পায়ে হাটাচলা করতেন, সাদাসিধে পোষাক আর পুরো জীবনটা সৃজনশীল কাজের মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন। যে সমাজে এখনও যাকে দেখে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত তাকেই বেশী সম্মান করা হয়। টাকা-পয়সাওয়ালাদের দিকে লোক লোভের বশে যায়, যাদের ক্ষমতা আছে তাদের ভয় পায় কিন্তু সম্মান করে যে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত তাকে।

বেলুড় মঠের মহারাজদের অনেক জায়গা থেকে ডাকা হয় দুটো ধর্মের কথা শোনার জন্য। একবার এক মহারাজকে কোন এক গ্রামে ধর্মের কথা শোনার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঐ গ্রামের লোকেরা এর আগে সন্ন্যাসী কোন দেখেইনি। আশেপাশের তিন চারটে গ্রাম থেকে লোক জড়ো হয়েছে মহারাজ কি বলেন শুনতে। মহারাজ যাওয়ার পর গ্রামের সবাই যেমন করে থাকে, সবাই মিলে পা ধুয়ে দিচ্ছে, প্রণাম করছে, অর্ঘ্য দিচ্ছে। মহারাজ একজনকে জিজ্ঞেস করলেন কি নিয়ে আলোচনা করব, তাতে তিনি বললেন, মহারাজ বর্তমান যুগে ধর্মের খুব হ্রাস হয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে বাংলার মাটিতে, এইটার উপর কিছু বলুন কিভাবে ধর্মকে বাড়ান যেতে পারে। মহারাজ এটা দিয়েই শুরু করলেন—এখানে আপনাদের একজন বললেন ধর্ম কি করে বৃদ্ধি করা যায় বলতে। কিন্তু এখানে এসে বুঝতে পারছি না কোথায় ধর্মের হানি হয়েছে? বুদ্ধদেববাবু বা মমতা ব্যাণার্জি যদি এখানে আসতেন তাঁদের দেখার জন্য পঞ্চাশটা গ্রাম থেকে লোক আসত কোন

সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের পা ধুয়ে সবাই প্রণাম করতেন না। আর আমি একজন অজানা অচেনা সন্ন্যাসী, আমার নামও কেই কোন দিন শোনেনি অথচ দেখুন সবাই আমাকে নিয়ে কি করছেন। ধর্মের কোথায় হাস হয়েছে? ধর্মের যদি হাস হত তাহলে গ্রামের লোক সবাই মিলে সন্ন্যাসীকে এই সম্মান দেখাতেন? শুধু এইখানেই নয় পৃথিবীর সর্বত্র ধর্মপ্রাণ মানুষ সব সময় সম্মান পায়। আমাদের টাকা-পয়সা সব কিছুই আমাদের ছেড়ে দেবে, আমি যাকে ভালোবাসি সে ছেড়ে চলে যেতে পারে, মরে যেতে পারে কিন্তু ধর্ম আমাদের কখন ছাড়বে না, যতক্ষণ আমরা না ছাড়ছি। এইটাই এইখানে বলতে চাইছেন। হঠাৎ করে আমাদের সামনে সমাজের সব কিছু আলগা হয়ে গেছে। আমাদের এখন হাতে অটেল টাকা-পয়সা আর ভোগের প্রচুর উপকরণ এসে গেছে বলে চোখে ছানি পড়ে গেছে তাই আমাদের ধর্মের এই জিনিষগুলো নজরে পড়ছে না। কিন্তু ধর্মের এই সম্মান আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে একটুও কোন পরিবর্তন হয়নি। এখনও যারা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, তাগে প্রতিষ্ঠিত তাদের প্রচুর সম্মান আর ধর্মও তাদের ছেড়ে চলে যায় না।

### শান্তিপূর্বের মূল বক্তব্য

শান্তিপূর্বে যত কিছুর আলোচনা চলছে তার মূল ব্যাপারটা হল আমার মন যেমন সজ্জ করবে সেই রকম প্রভাব আমার মনের মধ্যে পড়বে। এই প্রভাব থেকে আমাদের বাঁচতে হয়। আরেকটি ব্যাপার হল পুনর্জন্মকে নিয়ে, স্বর্গ নরক এগুলো সত্যিই আছে কি নেই আমরা জানিনা। কিন্তু যিশু, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ এনারা ধ্যানের গভীরে যে সত্তাকে দর্শন করেছেন সেই সত্তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। যে মন দিয়ে আমরা এই জগতকে দেখছি, যে মন দিয়ে সব কিছু বিচার করছি, যে মন দিয়ে আমরা ভোগ করছি সেই মন দিয়েই তাঁরা ঈশ্বর দর্শন করেছেন। তাহলে এনারা যে মন দিয়ে যে সত্তাকে দেখছেন সেটা যদি ভুল হতে পারে তাহলে সেই মন দিয়েই যখন জগৎ দেখছি সেটাও কেন ভুল হতে পারবে না। যে মন দিয়ে এনারা অন্তর্জগৎ দেখছেন সেই মন দিয়েই আমরা বহির্জগৎ দেখছি, যদি অন্তর্জগৎ দেখা ভুল হয় তাহলে বহির্জগৎটাও ভুল হতে পারে। যদি বলি অন্তর্জগৎও নেই বহির্জগৎও নেই তাহলে একটু যুক্তিযুক্ত হয়। আমি এই মন নিয়ে যা কিছু দেখি সবটাই ভুল, আমি তোমাকে দেখছি এটাও ভুল, আমি যে খাচ্ছি এটাও ভুল। যদি এই অবস্থায় কেউ চলে যায় তখন বলা যাবে আপনি একটু যুক্তিতে এসেছেন। কিন্তু বহির্জগৎটা ঠিক বলছি আর অন্তর্জগৎটা ভুল এটা তো যুক্তিগত ভাবে মানা যাবে না। এরা আগে আমরা বলেছিলাম, এই বোতলটা আমরা চোখ দিয়ে দেখছি, কিন্তু এর আকৃতিটা তৈরী হচ্ছে মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে। আসল দেখাটা মস্তিষ্কে হচ্ছে অথচ বোতলটা দেখছি বাইরে। বিজ্ঞানও বলছে বোতলের একটা ইমেজ চোখে গিয়ে পড়ছে, চোখের নার্ভগুলো এই ইমেজকে মস্তিষ্কে নিয়ে যাচ্ছে, ইমেজটা তৈরী হচ্ছে মস্তিষ্কে। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে মস্তিষ্কের ভেতরে অথচ দেখছি বাইরে। এইটাই আমাদের মনের স্বভাব। এই মনকে আমি সন্দেহ করছি না কিন্তু ঐ মন যখন ঈশ্বর দর্শন করছে তখন সন্দেহ করছি। এইটাই আশ্চর্যের। আমরা যদি ঠিক ঠিক যুক্তিবাদী হই তাহলে বিজ্ঞানীর কথাও নিতে হবে অন্য দিকে ঋষিদের কথাও নিতে হবে। ঋষিরা এই কথাটাই বলছেন, তুমি যে মন দিয়ে বহির্জগৎ দেখছ সেই মন দিয়েই অন্তর্জগৎও দেখা হচ্ছে। অন্তর্জগতের মূল সত্তাকে যখন দেখে নিচ্ছে তখন দেখছেন ঈশ্বরই সত্য বাকি সব অনিত্য, ঈশ্বর ছাড়া নিত্য বলে কিছু নেই। আর এই জগতের যা কিছু হয়েছে সেটা হয় বলবেন তাঁর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে আর তা নাহলে বলবেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। ঈশ্বর আর তাঁর সৃষ্টি কখন আলাদা হতে পারেনা, এটা খুবই সহজ যুক্তি। ঈশ্বরই যদি সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে ঈশ্বর কি দিয়ে সৃষ্টি করবেন? ধরলাম মাটি দিয়েই তিনি সৃষ্টি করছেন। তাহলে মাটিটা কি ঈশ্বরের বাইরে? মাটি যদি ঈশ্বরের বাইরে হয় তাহলে ঈশ্বরের সীমানা সীমিত হয়ে গেল। ঈশ্বর সৃষ্টির উপকরণকে যদি তাঁর বাইরে থেকে নিয়ে আসেন তাহলে ঈশ্বরের বাইরেও কিছু আছে। ঈশ্বরের বাইরে যদি কিছু থাকে তাহলে তিনি তো আর অনন্ত হলেন না। ঈশ্বর যদি সীমিত হয়ে যান তাহলে তিনি কিসের ঈশ্বর? ঈশ্বর যদি অনন্ত হন তাহলে সৃষ্টি মানে ভগবানই হয়েছেন। এই কথাই বেদান্ত প্রথম থেকে বলে যাচ্ছে। তুমি যে বলছ ভগবান আর তাঁর সৃষ্টি আলাদা এটা তো তোমারই যুক্তিতে দাঁড়াবে না। বেদান্তকে এখন যে সবাই মানতে শুরু করেছে এই জন্যই, বেদান্তের কথা খুব যুক্তি সম্মত।

আগেকার দিনে বেদান্তের কথা সবাইকে জানতে দিত না। কিন্তু ইদানিং কালে সবাই বেদান্তী হয়ে যাচ্ছেন। মদনমোহন মালব্য একদিকে ব্রাহ্মণ আবার অন্য দিকে প্রচণ্ড গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। ভারত তখনও পরাধীন, সেই সময় বৃটেনের হোম সেক্রেটারী এসেছেন, তিনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন। হোম সেক্রেটারী মদনমোহন মালব্যকে খুব মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করলেন ‘আমি যদি চাই হিন্দু হতে পারি’? মদনমোহন মালব্য খুব ঘেন্নার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলছেন ‘এই জন্মেতো কোন মতেই হওয়া যাবে না, কিন্তু যদি হিন্দু হওয়ার খুব ইচ্ছে থাকে তাহলে আগামী জন্মে চণ্ডাল হয়ে ভারতে জন্মতে হবে। আর কয়েক জন্ম চেষ্টা করে শূদ্র হয়ে তারপর সেখান থেকে আস্তে আস্তে হিন্দুধর্মের মূল স্রোতে আসতে পারবেন’।

মদনমোহন মালব্য এটা কাকে বলছেন? ব্রুটেনের হোম সেক্রেটারীকে, যার অধীনে ভারতের শাসন চলছে, মানে নিজের রাজাকে বলছেন। হিন্দুধর্মের আবার সবাইকে বেদান্তের কথা বলা হত না। এই কারণে বেদান্তের এত যুক্তি সম্মত দর্শন ভারতে লোকচক্ষুর অন্তরালেই পড়ে ছিল। শাহেনশা আকবরের একবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল বেদান্তের কথা শুনবেন। এক পণ্ডিতকে ঠিক করা হল। সেই পণ্ডিত সোজা বলে দিল ‘আপনি মুসলমান, আপনার কাছে আমি যেতে পারব না’। বাদশা বললেন ‘ঠিক আছে, আমিই আপনার কাছে আসব’। পণ্ডিত দশ হাত ছিটকে বলছে ‘আপনাকে তো আমি ঢুকতেই দেব না’। তাহলে বাদশা কিভাবে বেদান্ত শুনবেন? আকবরের রাজমহলের পাশে এক কপিকল বসান হল। কপিকলের মধ্যে একটা খাটিয়া লাগিয়ে তাতে পণ্ডিত মশাইকে বসান হল। সেই কপিকল দিয়ে পণ্ডিতকে রাজমহলের ছাদের উপর তোলা হল। আকবর বাদশা বসলেন ছাদে আর পণ্ডিত মশাই বসে রইলেন কপিকলের খাটিয়াতে। শূন্যে ঝুলছেন। তাও আবার দিনের বেলাতে পণ্ডিত আসবেন না, দিনের বেলায় মুসলমানের মুখ দেখে ফেলতে হবে। ব্রাহ্মণ মশাই এখন আকাশে ঝুলছেন, ওখান থেকে রাতে তিন থেকে চার ঘণ্টা ধরে শাহেনশা আকবরকে বেদান্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিন চার ঘণ্টা বলা হয়ে যাওয়ার পর ব্রাহ্মণ মশাইকে কপিকল থেকে নামিয়ে দেওয়া হত। উইলিয়ম জোন্সেরও খুব ইচ্ছে হয়েছিল সংস্কৃত শেখার। পরে উইলিয়ম জোন্সই সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান রচনা করলেন। বাংলার যত ব্রাহ্মণ ছিল কেউ রাজী হচ্ছিল না তাঁকে সংস্কৃত শেখাতে। আপনি শ্লেচ্ছ, আপনাকে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। অনেক কষ্টে এক ব্রাহ্মণকে রাজী করান গেল। আমি তোমাকে সংস্কৃত পড়াব কিন্তু আমার এই ঘর, ঘরের বাইরে এই উঠোন, উঠোনের এতটুকু গোবর লেপা থাকবে, তার বাইরে তোমাকে বসতে হবে। আমি নিজের মনের মত বলে যাব আর তুমি শুনে যাবে। আর রোজ তোমাকে গঙ্গা স্নান করে আসতে হবে। উইলিয়ম জোন্স রোজ গঙ্গা স্নান করে উঠোনের একটা ধারে কোন রকমে বসে থাকতেন, সেখানে বসে বসে সব লিখে যেতেন। এইভাবে বছরের পর বছর লেগে থেকে তিনি সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করলেন। আজ এখন ওনার ডিকশনারি ব্যবহার করে চলেছেন। এই ব্রাহ্মণরাই এখন তাঁর অভিধান পড়ে। ব্রাহ্মণরা ছিলেন এই রকম, বেদান্ত কাউকে জানতেই দিত না। কিন্তু এখন বেদান্ত যখন জানাজানি হয়ে গেল তখন সবাই দেখছে এর মত সহজ যুক্তি আর কোন ধর্ম শাস্ত্রেই নেই। স্বামীজী বারবার বলছেন বনের বেদান্তকে জনসমাজের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু ব্রাহ্মণরা এই বিদ্যা কিছুতেই অপরকে দিতে চাইত না, অন্য দিকে বলত আমি তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ। কেন শ্রেষ্ঠ? আমার কাছে এই বিদ্যা আছে। আমাদের ঋষিরা এই কথাই বলে গেছেন আমি যে মন দিয়ে বহির্জগত দেখছি সেই মন দিয়েই আমার অন্তর্জগতকেও দেখছি। আমার অন্তর্জগতকে যদি তুমি ভুল বল তাহলে তোমাকে তোমার বহির্জগতটাকেও ভুল বলতে হবে।

মহাভারতই হল ঠিক ঠিক হিন্দুধর্ম। উপনিষদ, গীতা হিন্দুদের দর্শনটাকে বলে দিচ্ছে কিন্তু আসল ধর্ম মহাভারতই বলে দিচ্ছে। আমাদের সবার জীবন-যাপন কি ভাবে করতে হবে, কখন কোন ধর্মকে তুমি গ্রহণ করবে, তোমার জীবনের বাস্তব দিকটাকে তুমি কিভাবে গ্রহণ করবে, এইগুলো মহাভারত বিস্তারিত ভাবে বিশেষ ভাবে শান্তিপূর্বে বলে দিচ্ছে, যেগুলো আমরা এর আগে অনেক আলোচনা করে এসেছি। এর মধ্যে যেটা মূল কথা হল আমাদের মনে অনেক আবর্জনা জমে আছে। এই আবর্জনা গুলো আমাদের বারবার ভালো থেকে খারাপের দিকে নিয়ে যাবে। যদি আমরা খারাপের দিকে যাই তাহলে আমাদের আরও নীচে থেকে গভীর নীচে নিয়ে যাবে। সেইজন্য ওনারা দেখলেন এমন অনেক কিছু আবর্জনা আছে যেটা এক জন্মে পরিষ্কার হয় না। তখন তাঁরা এই পুনর্জন্মের ধারণাটাকে নিয়ে এলেন। এখন পুনর্জন্ম হয় কি হয় না আমরা কিছুই জানিনা। ঠাকুরও বলছেন – অনেকে বলে গেছেন তাই মানতে হয়। কিন্তু পরিষ্কার করে কেউ কোথাও কিছু বলছেন না যে জিনিষটা এই এই। খ্রীস্টান বা মুসলমানরা বলে মৃত্যুর পরে সব শেষ, মৃত্যুর পর আর কিছু নেই। যাঁরা খুব উচ্চমার্গের বেদান্তী তাঁরাও বলেন মুক্তি হয়ে গেলে আর জন্ম-মৃত্যু কিছু থাকবে না। এও বলেন যে, মুক্তি হয়ে গেলে দেখেন জন্ম-মৃত্যু বলে কিছুই নেই, আরও বলেন জন্ম-মৃত্যু বলে কিছু ছিলই না। কিন্তু সাধারণ মানুষকে যদি জন্ম-মৃত্যু বলে কিছু নেই বলে দেওয়া হয় তাহলে অনাচার খুব বেড়ে যাবে। সেইজন্য আমাদের ঋষিরা এমন একটা ধারণা আমাদের দিয়ে দিলেন যেটাকে প্রমাণিতও করা যাবে না আবার অপ্রমাণিতও করা যাবে না। কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক জীবন-যাপন করার পন্থা রূপে এই ধারণাটা অতি মহৎ। পুনর্জন্মের ধারণাতে আমাদের জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। তা নাহলে মানুষ যদি ভাবে এই জন্ম পেয়েছি আমাকে মরে যেতে হবে তাই যত পার ভোগ করে নাও, সে চুরি করেই হোক, লুটেপুটেই হোক আর কারুর গলা কেটেই হোক। কিন্তু ঋষিরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে যখন দেখছেন সত্তাটা ঠিক এই রকম তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন, এই সত্তাকে জেনে নিলে সমস্ত রকমের শোক মোহ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তখনই বোঝা যায় জন্ম-মৃত্যু বলে কিছু নেই।

### পরশর গীতা

এরপর আসছে পরশর গীতার কথা। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বলছেন, আমাকে এমন কিছু বলুন যাতে আমার ইহকাল আর পরকাল দুটোই ভালো হয়। তখন ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন ‘এই ব্যাপারে আমি আর তোমাকে কি বলব, তুমি তো সবই জান। তবে তোমাকে আমি একটা পুরনো কথা বলছি। রাজা জনক আর পরশর মুনির মধ্যে একটা সংলাপ হয়েছিল’। পরশর মুনি ব্যাসদেবের পিতা। অথবা এটাও হতে পারে পরশর মুনি বলে অন্য কেউ আরেকজন ছিলেন। এখানে একই নামে অনেক ঋষি মুনিকে পাওয়া যায়। আর মিথিলারা রাজার উপর একটা বর ছিল। যিনিই মিথিলার রাজা হবেন তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ হতেন। সেইজন্য এটা পরিক্ষার নয় যে, জনক একজন ছিলেন না অনেকজন ছিলেন। আমাদের কাছে যে কাহিনীগুলো আছে তাতে বোঝাই যায় যে, জনক অনেকজন ছিলেন। মিথিলার রাজার এইটাই বিশেষত্ব যে একদিকে তিনি রাজা অন্য দিকে তিনি আবার ব্রহ্মজ্ঞ।

একবার পরশর মুনি রাজা জনকের কাছে গেছেন কিছু আলোচনা করতে। পরশর মুনি রাজা জনককে বলছেন **ধর্ম এব কৃতঃ শ্রেয়ানিহলোকে পরত্র চ। তস্মাদ্ধি পরমং নাস্তি যথা প্রাহ্মর্গীষিণঃ।।১৩/২৮৩/৬।** মণীষিরা বলেন এই লোকে ধর্ম কার্যই শ্রেয়ঃ। ধর্ম কার্যে ইহকাল আর পরকাল দুটোই ভালো হয়। তামা বা পেতলের উপর যদি সোনার জলের প্রলেপ দেওয়া হয় তখন এগুলোকে সোনার মতই মনে হয়। ঠিক তেমনি প্রাণিদের উপর পূর্বকৃত কর্ম যা করা হয়েছে তার প্রলেপ লাগান থাকে। আমরা আগে আগে যত কর্ম করেছি সেই কর্ম আমাদের ঢেকে রাখে। জমি, সার যতই থাকুক ওর মধ্যে বীজ না থাকলে অঙ্কুরোদগম হবে না। ঠিক তেমনি যতক্ষণ কেউ পূণ্যকর্ম না করে ততক্ষণ সে কখন সুখী বা সমৃদ্ধশালী হতে পারেনা। সেইজন্য মানুষ মৃত্যুর পর শরীর ধারণ করার পর আগের আগের জন্মে যে কর্ম করেছে তারই ফল পায়। আমরা এখন যে ফল পাচ্ছি, ভালো মন্দ যা কিছু, এটা কিন্তু এই জন্মের ফল নয়। এই জন্মে যে কর্মটা করা হচ্ছে, এই কর্মটা শুধু আগের আগের কর্মের যে ফলটা চাপা আছে তার মুখটা খুলে দেয়। ভালো কর্মেরও মুখ খুলে দেয়, মন্দ কর্মেরও মুখ খুলে দেয়, আর যা কিছু ভেতরে আছে সেগুলো হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসে। এই ভালো মন্দ ফলের প্রতি আমার যেমন যেমন প্রতিক্রিয়া হবে, সেইভাবে তার ফল আবার আগামী জন্মের জন্য তৈরী হয়ে যাচ্ছে। যেমন আমি একটা বীজ রোপণ করলাম, তার থেকে একটা গাছ হল। ঐ গাছের ফলে যে বীজ হবে সেই বীজটা পরে কাজে লাগবে। গাছ থেকে বীজ পড়লে সঙ্গে সঙ্গেই গাছ হবে না, বীজকে তৈরী হতে একটা সময় দিতে হবে। ঠিক তেমনি আমরা যে কর্ম এখন করছি সেই কর্মের বীজ তৈরী হতে একটা সময় লাগবে। এইভাবেই আগের আগের কর্ম যা করা আছে তার ফল এখন বেরোচ্ছে। ঋষিদের কাছে এই কর্মবাদটা একটা আলাদা শাস্ত্র। তবে এনারা বলেন অত্যন্ত গর্হিত কর্ম যদি হয় তার ফল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেবে। যতই পূণ্যকর্ম থাকুক ওর ফল চাপা থাকবে না। অত্যন্ত গর্হিত কর্মের একটা উদাহরণ হল কাউকে খুন করলে এই জন্মেই তাকে জেলে যেতে হবে। কেউ যদি পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়ে নেয় সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। এগুলো অত্যন্ত গর্হিত কর্ম। আমরা যে সাধারণ কর্ম করছি এগুলো তৈরী হতে সময় লাগবে, কিন্তু কিছু কিছু কর্ম খুব জোরালো, ওই কর্ম করলে সঙ্গে সঙ্গে ফল দিয়ে দেবে। সেইজন্য দেখা যায় যখন মানুষ কোন দেবতাদের পূজা করে তখন বলে দেওয়া এই দেবতার পূজা করলে সঙ্গে সঙ্গে ফল দিয়ে দেবে। এগুলো বলা শুধু মানুষকে টেনে নিয়ে আসার জন্য। একটা মানুষের প্রচুর কষ্ট থাকে, এখন তাকে যদি বলা হয় ভাই তুমি আগের আগের জন্মে অনেক পাপ করেছ তাই এই কষ্ট পাচ্ছ, এখন ভালো ভালো কাজ কর ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। এতে মানুষ সন্তুষ্ট পায় না। তাই তাকে বলা হয় তুমি যদি অমুক পূজা কর তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ফল পেয়ে যাবে আর তোমার ভালো হতে থাকবে। আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে এগুলো সবই একটা জিনিষকে ব্যাখ্যা করার জন এক একটি মডেল।

যারা নাস্তিক বা যুক্তিবাদী তারা বলে প্রারন্ধকে তো প্রত্যক্ষ দেখা যায় না আর প্রারন্ধের অস্তিত্ব সূচক কোন অনুমান প্রমাণও নেই সেইজন্য আমি এই প্রারন্ধকে মানি না। দেবতা, গন্ধর্ব, দানব এই যোনিগুলো স্বাভাবিক। মানে কেউ বড়লোকের বাড়িতে জন্ম নিচ্ছে, কেউ গরীবের বাড়িতে জন্মাল, কেউ হিন্দু হয়ে জন্ম নিচ্ছে কেউ মুসলমান হয়ে জন্মাচ্ছে এগুলো সব স্বাভাবিক, ঘটনাচক্রে গিয়ে জন্ম নিচ্ছে তাই নিয়ে এত মাতামাতি করার কিছু নেই। মহাভারত কত প্রাচীন গ্রন্থ কিন্তু তখনই মহাভারতে এই ধরনের মত নিয়ে আসা হয়েছে যে এই যে তোমরা প্রারন্ধ প্রারন্ধ করছ এর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, অনুমান দিয়ে যুক্তি দিয়েও দাঁড়ায় না। বর্তমান যুগে যুক্তিবাদীরা যেটা বলছে সেটা নতুন কিছু বলছে না, মহাভারতেই অনেক আগে দেখিয়ে দিচ্ছে যুক্তিবাদীরা তখনও ছিল।



পরশর মুনি তখন নাস্তিক বা যুক্তিবাদীদের এই যুক্তির বিরুদ্ধে উত্তর দিচ্ছেন। প্রেত্য যান্ত্রিক কৃতং কর্ম ন সমরন্তি সদা জনাঃ। তে বৈ তস্য ফলপ্রাপ্তৌ কর্ম চাপ চতুর্বিধম্। ১৩/২৮৩/১৩। মানুষের যখন মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পর যখন আবার জন্ম হয় তখন তার কখনই মনে থাকে না এর আগের আগের জন্মে সে কি কর্ম করেছিল। কিন্তু দুম্ করে হঠাৎ খারাপ যদি কিছু হয় তখন প্রথমেই তার মাথায় আসে আমি মন, বাণী, নেত্র ও ক্রিয়া এই চারটে দিয়ে আমি কিছু খারাপ কাজ করেছিলাম সেইজন্য আমার এই দুরবস্থা হয়েছে। একটা জিনিষকে যখন জানা হয় তখন তাকে ষট্ প্রমাণাদির দ্বারাই জানা হয়, অর্থাৎ একটা জিনিষ সত্য কিনা ছয় ভাবে জানা যায়। একটা যেমন প্রত্যক্ষ, এখন আমাদের গরম লাগছে এটা না বোঝার কিছু নেই। এখানে যে যতই যুক্তি দিয়ে বোঝাক যে গরম হওয়ার কথা নয়, কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমার গরম লাগছে। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যা প্রত্যক্ষ ভাবে বোঝা যায় সেটাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। দ্বিতীয় অনুমান প্রমাণ, যেটা যুক্তি দিয়ে বোঝা হয়। আমি দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম, ঘুম থেকে উঠে দেখছি সামনের রাস্তাটা ভেজা, আমি বুঝে নিলাম যে দুপুরে বৃষ্টি হয়েছিল। আমি বৃষ্টি দেখিনি কিন্তু অনুমানে বুঝে গেলাম বৃষ্টি হয়েছিল। এই রকম আরেকটি প্রমাণ হল ঐতিহ্য, ঐতিহ্য প্রমাণ হল পরম্পরা ভাবে যেটা চলে আসছে, এর কোন ইতিহাস নেই। পরম্পরাত্রে একটা জ্ঞানের কথা চলে আসছে সেটাকেও একটা প্রমাণ হিসাবে মানতে হয়। ঠাকুরও বলছেন, ঋষিরা যখন মেনেছেন তখন ঐটা মানতে হয়। ঐতিহ্য প্রমাণকে সবাই আবার মানে না। এখানে মহাভারত কিন্তু ঐতিহ্য প্রমাণকে প্রমান রূপে মানছে। এনারা একটা উদাহরণ দেন, গ্রামের ধারে একটা পুরনো পিপ্পল গাছে আছে, গ্রামের লোকেরা বলে ঐ গাছে একটা প্রেতনী থাকে। এখন যারাই ওই গাছের তলা দিয়ে যাবে তারাই মেনে নেবে। এরপর কেউ এসে দেখিয়ে বলে দেবে এখানে প্রেতনী বলে কিছু নেই। তখন এইটাই ঐতিহ্য হয়ে যাবে, আগে ছিল এখন আর নেই। ঠিক সেই রকম যখন কেউ প্রমাণ করে দেবে যে পুনর্জন্ম বলে কিছু নেই তখন ঐটাকেই মেনে নেবে যে পুনর্জন্ম বলে কিছু নেই। কিন্তু পুনর্জন্ম নেই এটাকে কেউ প্রমাণ করে দিতে পারছে না। যখন এটারও প্রমাণ নেই ওটারও প্রমাণ নেই তখন কি নিয়ে চলতে হয়? ঐতিহ্যকে নিয়েই চলতে হয়। আবার একজন বলতে পারে আমি ঐতিহ্যকে মানি না। তা মানবে না যখন মানবে না, কেউ তোমাকে মানতেও বলছে না। এনারা এইটাই বলবেন আমাদের এর প্রমাণ হল ঐতিহ্য প্রমাণ। শঙ্করাচার্য গীতাতে এই কথাই বলছেন, ঋষিরা বলে গেছেন তাই সেটাকেই প্রমাণ বলে মেনে নিতে হবে। তাহলে স্বর্গ-নরক, পুনর্জন্মাদির কি প্রমাণ? হয় শব্দ প্রমাণ, শব্দ প্রমাণ মানে যেটা শাস্ত্রে বলা আছে। এই জিনিষটা সত্য কেন? বাইবেলে বলা আছে বা কোরানে বলা আছে। আমি কোরান মানি না। তাহলে তোমার জন্য এটা সত্য নয়। স্বামীজী খুব সুন্দর একটা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন একজন উঠে বলল আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত নই। স্বামীজী তাকে বলছেন, তাহলে এই কথাটা তোমার জন্য নয়। ঋষিরা কোন মতকে স্থাপনা করেন না, তাঁরা মতের ব্যাখ্যা করেন। কেউ যদি ঋষিকে গিয়ে বলে আপনার সাথে আমি বিচার করতে চাই। তখন ঋষি বলবেন আমি ভাই বিচার করতে পারব না, তুমি যদি বুঝতে চাও আমি বুঝিয়ে দিতে পারব। ধর্মের খুব সূক্ষ্ম জিনিষ নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করছি। এই চারটে ছাড়া আরেকটা প্রমাণ হয় উপমান প্রমাণ, উপমান প্রমাণে তুলনামূলক ভাবে প্রমাণ করা। আমি কোন দিন নীল গাই দেখিনি, কিন্তু বর্ণনাতে শুনেছি গরুর মত দেখতে একটা প্রাণি, তার গায়ের রঙ কতকটা নীল রঙের মত, আর সে হরিণের মত দৌড়ায়। এখন আমি কোথাও দেখলাম তিনটে গরু দৌড়ে গেল, দেখেই আমি বলে দিলাম এগুলো নীল গাই। আমি নীল রঙ জানি, গরু কি রকম দেখতে জানি, হরিণ কিভাবে দৌড়ায় সেটাও জানা আছে। সব কটি মিলিয়ে যখন চোখের সামনে এসে গেল তখন বুঝে গেলাম ঐটাই নীল গাই। আর ষষ্ঠ প্রমাণ হল অভাব প্রমাণ। একটা জিনিষের অভাব, যেমন এই টেবিলে গ্লাস আছে, বোতল আছে কিন্তু ঘটি নেই। আমাকে যদি বলা হয় এখানে ঘটি নেই, তখন একটা অভাব বোধ আসবে। মজার ব্যাপার হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ, উপমান প্রমাণ আর অভাব প্রমাণ এই তিনটে যেন খুব কাছাকাছি। অন্য দিকে অনুমান প্রমাণ, শব্দ প্রমাণ আর ঐতিহ্য প্রমাণ এই তিনটেকে আবার এক রকম মনে হবে। সেইজন্য অনেকে প্রত্যক্ষ আর অনুমান প্রমাণ ছাড়া আর কোন প্রমাণ মানতে চান না। অভাব প্রমাণকে তাঁরা প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যেই রেখে দেন। কিন্তু শুধু অভাব প্রমাণকে মানা না মানার উপর পুরো দর্শন পাল্টে যায়। যদি কেউ ঐতিহ্য প্রমাণ না মানে তাহলে তিনি পুনর্জন্মকেও মানতে পারবেন না। পুনর্জন্ম যদি না মানা হয় তাহলে পুরো ধর্মটাই তাঁর পাল্টে যাবে। যেমন খ্রীস্টান ধর্মে আগে পুনর্জন্ম মানা হত। পরে খ্রীস্টান ধর্মের বড় বড় নেতারা একত্রিত হয়ে একটা মিটিং করেছিল আমরা পুনর্জন্ম মানব কি মানব না। অনেক আলোচনার পর ভোট নেওয়া হল, তখন পুনর্জন্মকে যারা মানতে চাইলেন না তারা এক ভোটে জিতে গেল। সেই থেকে খ্রীস্টানরা ঠিক করে নিল আমরা পুনর্জন্ম মানব না। ইসলাম ধর্মে আরও মজার ব্যাপার, তারা ভূত মানবে, জিন মানবে কিন্তু পুনর্জন্ম মানবে না। এটাকে ইসলাম অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করে কিন্তু পুনর্জন্ম মানবে না।

স্বামীজী যখন বিদেশ থেকে ফিরে কাশ্মীরে ঘুরতে গেছেন তখন সেখানে এক মৌলবী স্বামীজীর উপর খুব রেগে গিয়েছিলেন, কারণ তার এক শিষ্য স্বামীজীর কাছে খুব আনাগোনা করতে শুরু করেছিল। মৌলবী এক অভিশাপ দিয়ে স্বামীজীর উপর এমন এক বাণ মারল যে স্বামীজীকে তিন দিনের মধ্যে রক্ত বমি করে করে এখান থেকে পালাতে হবে। ঠিক তাই হল, স্বামীজীকে কাশ্মীর থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। পরে শ্রীমাকে হেসে হেসে স্বামীজী বলছেন ‘এই তো তোমার ঠাকুর! আমাকে রক্ষা করতে পারলেন না’। শ্রীমাও হেসে বলছেন ‘শক্তি মানতে’। স্বামীজীও বলছেন ‘তা তুমি যাই বল ঠাকুরতো রক্ষা করতে পারলেন না’। শ্রীমা বলছেন ‘বাবা! ঠাকুরতো গড়তে এসেছেন ভাঙতে আসেননি’। মৌলবী যে বাণটা মারছে এখন সে বাণ যদি কাজ না করে তখন ঐ শক্তির প্রতি তার আস্থাটাই চলে যাবে। মন্ত্রশক্তি, অভিশাপ শক্তিতে যে কাজ হয় এই নিয়মটাই তাহলে উঠে যাবে। সেইজন্য ভগবান এই নিয়মটাকে মাথা পেতে মেনে নিচ্ছেন আর নিজের শিষ্যকেও মেনে নিতে বলছেন। কারণ তা নাহলে পুরো জিনিষটা থেকে শ্রদ্ধাটাই উঠে যাবে।

পরশর মুনী নাস্তিকরা যে যুক্তিগুলো ব্যবহার করেন সেই নিয়ে বলছেন। নাস্তিকরা প্রথম বলে লোকযাত্রা প্রবাহের জন্য, মনের শান্তির জন্য বেদকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ নাস্তিকরা বলতে চাইছে বেদে যে কর্মাদি করতে বলা হয়েছে, ধর্মের কথা যা বলা হয়েছে এগুলোকে প্রমাণ কেন বলা হয়েছে? জীবনটা যাতে সুখে চলে যায়, মনকে শান্তি দেওয়া হয়, এর বাইরে আর কিছু নেই। মহাভারতের সময় থেকেই এই যুক্তি গুলো চলছে। এখনকার দিনের যুক্তিবাদীরা যে নতুন নতুন কথা বলছে এগুলো কিছুই নতুন নয়, অনেক আগেই সেই মহাভারতের সময় থেকেই চলে আসছে। সেইজন্য গীতা উপনিষদ পড়ে সেই সময়কার মানুষের বিভিন্ন চিন্তাধারা ও তারা কি ধরণের যুক্তি ব্যবহার করত তার সঙ্গে পরিচয় হওয়া যায় না। আর বলছেন পূর্বজন্মের যে কথাগুলো বলা হয় এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল মানুষকে ধৈর্য অবলম্বন করা। তুমি দুঃখ-কষ্টে কেন আছ? তুমি পূর্বজন্মে কিছু খারাপ কাজ করেছিলে। কিন্তু এ রকমটি নয়। বৃদ্ধ অনুশাসনম্, এইটাই ঐতিহ্য প্রমাণ, যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, তিনি বলেছেন, তাঁর কথা মেনে নিতে হয়। ঠাকুর বলছেন – মা ছেলেকে বলছে অমুক তোর দাদা হয়, ছেলের পাক্কা ষোল আনা বিশ্বাস যে সে তার দাদা হয়। মা বলে দিয়েছে ঐ ঘরে জুজু আছে, ছেলে মেনে নেয় ঐ ঘরে জুজুই আছে। কারণ বাচ্চা ছেলে মাকে বিশ্বাস করে। যাঁরা জ্ঞানবৃদ্ধ তাঁদের কথাকে সব সময় মেনে চলতে হয়। যেমন আমরা শুনে আসছি ভূত বলে কিছু আছে। কিন্তু আমিও কোন দিন ভূত দেখিনি আপনিও কোন দিন ভূত দেখেননি। কিন্তু ঠাকুর বলছেন – রাখালের সাথে এক জায়গায় গিয়েছিলাম। সেখানে কয়েকটি ভূত এসে আমাকে বলছে ‘তুমি এখান থেকে চলে যাও, তোমার গায়ের গন্ধ আমরা সহ্য করতে পারছি না’। ঠাকুর হলেন জ্ঞানবৃদ্ধ। স্বামীজী তখন হিমালয়ে ঘুরছেন। একদিন দেখেন সামনের একটা বাড়িতে আগুন লেগে গেছে। সেই বাড়ি থেকে একটা মেয়ের চিৎকার ভেসে আসছে, আমাকে বাঁচাও বাঁচাও। ঐ অন্ধকার রাতে স্বামীজী কি করে যাবেন বুঝতে পারছেন না। সেদিন রাতে স্বামীজীর আর ঘুম হল না। সকালে হতেই তাঁর আশেপাশের লোকদের বলছেন ‘আরে কাল দেখলাম ঐ বাড়িতে আগুন লেগে গেছে’। তখন তারা স্বামীজীকে বলছে ‘না স্বামীজী, ওখানে আগে একটা বাড়ি ছিল, ঐ বাড়িতে আগুন লেগে একবার সত্যিই একটা মেয়ে পুড়ে মারা গিয়েছিল’। আপনি ওর ভূতটাকে নিশ্চয়ই দেখেছেন। স্বামীজী ঐ দৃশ্যটা দেখেছিলেন। তারপর জিম করবেটর জীবনেও অনেক ঘটনা আছে। জিম করবেট একজন খ্রীস্টান, তার উপর আবার একজন শিকারী, সারা রাত জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বাঘ মারত। তিনি তাঁর জীবনীতে বর্ণনা করছেন, একবার একটা নরখাদক বাঘকে মারতে গেছেন। সেই গ্রামে কোন লোক নেই, বাঘের উৎপাতে সব পালিয়ে গেছে। তিনি একটা জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে ওত পেতে আছেন বাঘ মারবেন বলে। সেই রাতে হঠাৎ তার পাশের ঘরেই একটা লোকের চিৎকার শুনতে পেলেন, লোকটা চিৎকার করে বলছে আমাকে বাঘে ধরেছে। আর সত্যিই তিনি শুনতে পাচ্ছেন বাঘ যখন শিকার করে তখন সে যেমন মুখে আওয়াজ করে, সেই আওয়াজ হচ্ছে। তারপর বুঝতে পারলেন যে লোকটা এবার মরে গেল। জিম করবেট খুব আতঙ্কিত হয়ে গেছেন, তার মানে তার পাশের ঘরেই বাঘটা আছে। সকালে আলো হতেই দেখেন কোথাও কোন বাঘের বা মানুষের কোন চিহ্নই নেই। তিনি ফেরত এসে লোকদের ঘটনাটা বললেন। তখন লোকেরা বলছে, আপনি যেখানে ছিলেন তার পাশের ঘরেই বাঘ ঐ লোকটিকে মেরেছিল, ঐটাই বাঘের শেষ শিকার ছিল। আর ঐ সময় ঐ লোকটি এই রকম আওয়াজ করেছিল। জিম করবেটের জীবনে এই ধরণের কয়েকটি ঘটনার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এটাকে আমরা কি বলব? ভূত না অন্য কিছু, না এমনও হতে পারে একেকটা ঘটনা যেন ছাপ পড়ে গেছে সেটাই আবার যেন আমি নতুন করে দেখছি। যেমন ভিডিওগ্রাফি করার পর আমি আবার ঐ ভিডিওটা দেখছি। আমরা জানি না সত্যিই এগুলো কি। সেইজন্য এনারা বলেন আগে তুমি ধর্মকে ধর। ধর্মকে কেন ধরবে? ধর্ম হল শব্দ প্রমাণ, বেদে আছে বলে এটাকে মানবে। দ্বিতীয় জ্ঞানবৃদ্ধরা যেটা বলে গেছেন, আমাদের ঐতিহ্যে যেটা চলে আসছে সেটাকে মেনে নিতে হয়, যদি না মান তাহলে বিপদে পড়বে। আমরা বলতে পারি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া কিছু মানব না। কেউ বলছে না তোমাকে মানতে। আর প্রত্যক্ষ প্রমাণে তো

দুটো জিনিষই দেখ, একটা দেখ জীবন আরেকটা দেখ মৃত্যু। এই দুটো ছাড়া তো প্রত্যক্ষ কিছু দেখিনা, তাই কাল যখন মৃত্যু তোমাকে ঘিরে ধরবে তখন আর কান্নাকাটি করবে না।

পরশর এরপর যেটা বলছেন এটা মহাভারতের খুব প্রচলিত মত। ততো দুঃখক্ষয়ং কৃত্বা সুকৃতং কর্ম সেবতে। সুকৃতক্ষয়াদুক্ষৃতঞ্চ তদ্বিক্রি মনুজাধিপ। ১৩/২৮৩/১৮। যখন পুণ্যফলের উদয় হয় তখন পাপগুলো চাপা পড়ে যায়। পুণ্যের ফল যখন শেষ হয়ে যায় তখন চাপা পড়ে থাকা পাপের ফলগুলো বেরোতে থাকে। শ্রীমা এর উপমা দিচ্ছেন ঘুড়ির লাটাইয়ের সুতোর সাথে। লাটাইয়ের যখন সুতো ছাড়া হয় তখন যে রঙের সুতো যেমন যেমন গোটান ছিল সেই সুতোই বেরোতে থাকে। এক সময় লাল রঙের সুতোই বেরোতে থাকে, আবার যখন সাদা রঙের সুতো বেরোতে থাকে তখন শুধু সাদা সুতোই বেরোতে থাকবে। মোটামুটি এটাই সবার জীবনে দেখা যায়। যখন ভালো চলে তখন ভালোই চলতে থাকে। যখন খারাপ চলে তখন খারাপই চলতে থাকে। সেইজন্য ভালো সময় অহঙ্কার করতে নেই, মাথা নত করতে হয়। আর খারাপ যখন আসে তখন শুধু ঠাকুরের নাম করে যেতে হয় আর কারুর প্রতি দোষারোপ না করে চূপচাপ মুখ বুঝে সহ্য করে ঠাকুরের শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে হয়। ঐ খারাপ সময়ে ঠাকুরের নাম করছি বলে কিছু পুণ্য অর্জন হয়ে গেল। পরশর মুনি বলছেন – যারা বিদ্বান পুরুষ তারা যে করেই হোক কখন পাপের দিকে মন দেবে না। সব সময় ঈশ্বরের দিকে মন কিভাবে থাকতে পারে এর জন্য চেষ্টা করে যেতে হয়। তাহলে দুঃখ-কষ্টের তোড়টা কম আসে।

এই জগতে ঠিক ঠিক নিন্দনীয় বা পাপী কারা? ভীক্স রাজন্যো ব্রাহ্মণঃ সর্বভক্ষ্যো বৈশ্যোহনীহাবান্ হীনবর্ণোহলসন্স। বিদ্বাংশাশীলো বৃত্তিহীনঃ কুলীনঃ সত্যাদ্বিভ্রষ্টো ব্রাহ্মণঃ স্ত্রী চ দুষ্টা।। রাগী যুক্তঃ পচমানোত্নহেতোর্মুখো বক্তা নৃপহীনঞ্চ রাষ্ট্রম্। এতে সর্বে শোচ্যতাং যান্তি রাজন্ যশ্চাযুক্তঃ স্নেহহীনঃ প্রজাসু। ১৩/২৮৩/২৪-২৫। যদি ক্ষত্রিয় ভীতু হয় তখন সে নিন্দার পাত্র। ব্রাহ্মণ যদি সর্বভক্ষি হয় তাহলে সেই ব্রাহ্মণ নিন্দনীয়। অনীহাবান বৈশ্য, মানে অর্থের জন্য চেষ্টা না করাটা বৈশ্যের পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয়। আর আলস্যপরায়াণ শূদ্র নিন্দার পাত্র, মানে যারা সেবাকার্যে আছে তারা যদি কুঁড়ে হয়ে বসে থাকে তখন সেই শূদ্র নিন্দনীয় হয়। অশীল বিদ্বান, বিদ্বান কিন্তু শীল নেই, অর্থাৎ সদাচার নেই সেই বিদ্বান নিন্দার পাত্র। কলেজের প্রফেসর কিন্তু টিউশানি করে বেড়ায়, অর্থাৎ তার শীলের অভাব। অসদাচারী কুলিন নিন্দনীয়। ভালো বংশে জন্ম কিন্তু সদাচার করে না। সত্যত্রষ্ট ধার্মিক নিন্দনীয়। ধার্মিক যদি হয় তাকে সত্যশীল হতে হবে, সত্যশীল না হওয়াটাই অধার্মিক। আমি মন্দিরে যাচ্ছি, চরণামৃত খাচ্ছি, রোজ নিয়মিত গঙ্গা স্নান করছি, মানে আমি ধর্ম করছি কিন্তু অন্য দিকে মিথ্যা কথাই সব সময় বলি, বাইরে ধর্মাচরণ আর মুখে মিথ্যা কথা বলা এটা খুবই মারাত্মক নিন্দনীয়। এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম সত্যের কত দাম, সদাচারের কত মূল্য। সেখানে বলা হয়েছিল যারা চোর, গুপ্তা, বদমাইস তারাও কিন্তু নিজেদের মধ্যে সত্যটাকে ধরে রাখে, তারাও নিজেদের মধ্যে হিংসা বৃত্তি করে না। তার মানে এই মূল্যবোধগুলো হল শাস্ত্র, চিরন্তন। এই মূল্যবোধের সঙ্গে কখনই পাটোয়ারি করতে নেই। আর কে নিন্দনীয়? দুরাচারিণী স্ত্রী। দুরাচারিণী মানে দুই আচারিণী, নিজের স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করছে, এরা নিন্দার পাত্র। তারপর বলছেন রাগীযুক্ত, অর্থাৎ বিষয়াসক্ত যোগী। যোগী কিন্তু তার মন সব সময় বিষয়ে পড়ে আছে। যে রান্না করে নিজেই খায় সে পাপী। নিজে খায় মানে, অতিথিদের সেবা করে না, পশুপাখিদের খাওয়ায় না। আর মুর্থ বক্তা হল নিন্দনীয় পাত্র। ভক্তদের সামনে ভাষণ দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মুর্থ, এর থেকে নিন্দার কিছু হতে পারেনা। নৃপহীন রাজ্য নিন্দনীয়, রাজ্যে যদি ঠিক ঠিক রাজা না থাকে তাহলে সেই রাজ্যের খুব নিন্দা হয়। রাজা যদি শিষ্টের রক্ষণ আর দুষ্টির দমন না করতে পারে তাহলে সে কিসের রাজা!

এই যত কজনের নাম করা হল এরা হল শোক করার যোগ্য, এদের নাম করে চোখের জল ফেলতে হয়। এর ঠিক উল্টো গুলো হল তাদের আত্মা। একজন যোগী, যদি তার বিষয় ত্যাগ না থাকে তাহলে তার আত্মাই নাশ হয়ে গেছে। পরশর মুনি বলছেন পুণ্য কর্ম থেকেই মানুষ উচ্চবর্ণে জন্ম নেয়। এই যে মহাভারত এখানে একটা ধারণা দিল, ভালো কর্ম করলে পুনর্জন্মে সে ভালো জায়গায় যায়, যদি আমরা ডারউইনের ক্রমবিবর্তন থিয়োরিকে মানি আর দ্বিতীয় যদি পুনর্জন্মকে মানি তাহলে এই ধারণাটাকে আমাদের মানতেই হবে, অন্য কোন পথই নেই। কারণ যদি আমি পুনর্জন্মকে মানি তাহলে একজন লোক যদি ভালো কাজ করে তারপর সে মৃত্যুর পর সে কোন দিকে যাবে উপরের দিকে না নীচের দিকে? অবশ্যই উপরের দিকে যাবে। কর্মবাদকে যদি আমরা ঠিক ঠিক পুরোপুরি বিশ্বাস করি তাহলে মহাভারতের এই ধারণাটা, পুণ্য কর্ম থেকেই মানুষ উচ্চবর্ণে জন্ম নেয়, এটাকেও বিশ্বাস করতে বাধ্য হব। সমস্যাটা কোথায়? সারা দেশ এখন জাতিপ্রথাকে

নিন্দা করছে। জাতিপ্রথাকে যদি নিন্দা করতে হয় তাহলে কর্মবাদকেও নিন্দা করতে হয়। কিন্তু আমরা কর্মবাদকে অস্বীকার করতে পারছি না অন্য দিকে জাতিপ্রথাকে মানতে পারছি না। কিন্তু কর্মবাদকে মানলে, পুনর্জন্ম মানলে জাতিপ্রথাকেও মানতে বাধ্য থাকব। কর্মবাদ আর পুনর্জন্মের যুক্তি সম্মত পরিণাম হল এই জাতিপ্রথা। স্বামীজী কিন্তু এই জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেননি, বিদেশী বড় বড় পণ্ডিত, যাঁরা খুব গভীর চিন্তনশীল ব্যক্তি তাঁরাও বলছে ভারতে জাতিপ্রথা কোন সমস্যা নয়। ভারতের সমস্যা হল ব্রাহ্মণবাদকে নিয়ে। ব্রাহ্মণরা সমাজের সব কিছু সুযোগ সুবিধাকে নিজেদের কাছে কুক্ষিগত করে রেখেছে, এটাই হল কাল। ব্রাহ্মণরা বলছে আমি সবার থেকে শ্রেষ্ঠ, তোমার জন্য আমিই সব করে দেব, এইটাই আমাদের সর্বনাশ করে দিয়েছে। জাতিপ্রথার নামে উচ্চবর্ণের লোকেরা যে সুযোগ নিচ্ছে এইটাকেই স্বামীজী বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আমাদের দেশের মন্ত্রীরা শহরের মধ্যে যাতায়াতের জন্য লালবাতির গাড়ি ব্যবহার করেন, লালবাতি গাড়িটা ব্যবহার করছেন এই কারণে যে মন্ত্রীদের সময়ের দাম আছে তাই কোন ট্রাফিকে আটকে গিয়ে সময়ের যাতে অপচয় না হয় সেইজন্য লালবাতির গাড়ি ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে। লালবাতি গাড়ি দেখলে ট্রাফিক সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র করে দিচ্ছে। এখন ছোট বড় যত আমলারা আছে তারাও কি সরকারি কাজে, কি নিজের ব্যক্তিগত কাজে লালবাতির গাড়ি ব্যবহার করে চলেছেন। এইটাই সুযোগের অপব্যবহার। আমরা নিজেদের সুবিধাটুকু পেতে চাইছি, এই ব্রাহ্মণরাও এক সময় ত্যাগে ও পাণ্ডিত্যে সবার শ্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু এখন এদের না আছে পাণ্ডিত্য না আছে ত্যাগ কিন্তু সুযোগ সুবিধাটা আদায় করতে ছাড়ছে না। আগে ব্রাহ্মণদের এত সম্মান করা হত তিনটে জিনিষের জন্য, যোগশক্তি, পাণ্ডিত্য আর ত্যাগ। এখন এই তিনটির কোনটাই ব্রাহ্মণদের নেই কিন্তু সুযোগ সুবিধা সবটুকু চাই। স্বামীজী এই সামাজিক সুবিধাগুলো পাইয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধেই বলছেন। শুধু ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেই নয়, এই সুযোগ-সুবিধার অগ্রাধিকার পাওয়ার ইচ্ছা আমাদের স্বভাবের মধ্যেই নিবদ্ধ রয়েছে। জাতিপ্রথাতে কোন দোষ নেই, কারণ কর্মবাদের মধ্যেই জাতিপ্রথার তত্ত্ব নিহিত হয়ে আছে। কর্মবাদের মধ্যেই আসে পুনর্জন্ম, এই পুনর্জন্ম থেকে বেরোতে হলে তোমাকে স্বধর্মের অনুষ্ঠান আগে করতে হবে, স্বধর্ম সাধিত করতে হলে জাতিপ্রথাকে অবশ্যই মানতে হবে। এখন বিদেশেও কর্মবাদকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়ে গেছে। এরাও এখন কর্মবাদকে মানতে শুরু করে দিয়েছে। একদিকে পুনর্জন্ম মানবে না অন্য দিকে এরা বলতে শুরু করেছে it was my Karma, কর্মবাদ এমন একটি বাদ, যে জিনিষটা কোন কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু কর্মবাদকে দিয়ে অতি সহজেই সব কিছুর ব্যাখ্যা করে দেওয়া যাবে। কর্মবাদকে যখনই আমরা মেনে নেব, তখন কর্মবাদের সাথে সাথে কিছু কিছু মারাত্মক জটিল পরিণামও এসে যায়। তার মধ্যে একটা পরিণাম হল জাতিপ্রথা। জাতিপ্রথাতে উচ্চবর্ণে কেন একজনের জন্ম হচ্ছে? পূণ্য কর্মের দ্বারা। দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন ভালো কাজ করেছে আরেক ভাই খারাপ কাজ করেছে। এবার কর্মবাদ অনুসারে মৃত্যুর পর এই দুই ভাই নিশ্চয়ই এক জায়গাতে যাবে না, যে ভালো কাজ করেছে সে ভালো বংশে জন্ম নেবে, যে খারাপ কাজ করেছে সে নীচের দিকে যাবে। এইটাই কর্মবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

পরশর মুনি বলছেন, পাপ সম্পর্কিত যত কর্ম আছে, সেই কর্মের দ্বারা লৌকিক যা কিছুই ভালো হোক না কেন, বিদ্বান পুরুষরা কখনই ওই পাপকর্মে লিপ্ত হবেন না। যেমন কেউ যখন মোটা টাকা ঘুষ নিচ্ছে তখন তার অনেক টাকা হয়ে যাচ্ছে ঠিকই, আর সেই টাকাতে অনেক লৌকিক সুখ আসবে, কিন্তু ঘুষ নেওয়া একটা পাপকর্ম। এখানে এটাই বলা হচ্ছে তুমি যতই লৌকিক সুখ পাও, পাপকর্ম যেখানে আছে সেদিকে যেও না। কারণ পাপকর্ম তুমি যতই লুকিয়ে কর আর প্রকাশ্যেই কর ফল তুমি পাবেই পাবে। অতি গর্হিত হলে সঙ্গে সঙ্গে ফল দিয়ে দেবে, অতি গর্হিত না হলে কয়েক দিন পর দেবেই দেবে। মুনি ঋষিরা যে কর্ম গুলি করে গেছেন সেই কর্মগুলিকে অনুসরণ করতে হয়, তার বাইরে অন্য কোন কিছুর অনুকরণ করতে নেই।

### হংসগীতা

পরশর গীতার মতই আরেকটি গীতা আছে যার নাম হংসগীতা। ব্রহ্মা একবার হংস রূপ ধারণ করে ঋষিদের কাছে যাচ্ছেন, ঋষিরা আবার প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেখে অনেক প্রশ্নাদি করছেন, সেই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা যা বলছেন সেটাকে নিয়েই এই হংসগীতা। এই রকম এক জায়গায় হংস রূপী ব্রহ্মা বলছেন – *বাক্সায়কা বদনান্নিস্পতন্তি যৈরাহতঃ শোচতি রাত্র্যহানি। পরস্য নামর্মাসু তে পতন্তি তান্ পণ্ডিতো নাবসৃজেৎ পরেষু।।১৩/২৯২/৯।* সায়ক হল এক ধরণের তীক্ষ্ণ অস্ত্র, বল্লম, বর্শার মত তীক্ষ্ণ অস্ত্র। কটু কথা দিয়ে, বাক্যবাণ দিয়ে যে মানুষকে বিদ্ধ করা হয়, বাক এই সায়ক অস্ত্রের মতই তীক্ষ্ণ। ব্রহ্মা বলছেন কটু কথা মানুষের মর্মের ভেতরে গিয়ে বিদ্ধ হয়। সেই মানুষ সারা জীবন ঐ কটু কথা ভুলবে না। যত দিন তার মর্মের অন্তঃস্থলে ব্যথা থাকবে ততদিন কিন্তু আমাকেও পুড়তে হবে। সেইজন্য যাঁরা বিদ্বান

পুরুষ, মহাভারতে বিদ্বান পুরুষ সব সময়ই আধ্যাত্মিক পুরুষকে বলা হয়, আধ্যাত্মিক পুরুষরা কখনই বাক্যবাণ ব্যবহার করবেন না। শ্রীমা খুব সুন্দর বলছেন, খোঁড়া লোককে খোঁড়া বললে কষ্ট পায়, তাই তাকে যদি জিজ্ঞেস করতে হয় বলতে হয় তোমার পাটি অমন মোড়া হল কি করে। শ্রীমা আসলে বলতে চাইছেন যখনই কারুর কোন দুর্বলতা বা কষ্টের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে হয় তখন এই ভাবে মিষ্টি করে অন্য ভাবে বলতে হয়। অনেকে মনে করবেন এটা এক ধরনের চাতুরি করা হচ্ছে, যেটা সত্যি সেটাই বলে দিতে হয়। কিন্তু শাস্ত্র কখনই এভাবে সরাসরি কিছু বলতে অনুমতি দেয় না। এগুলো চাতুরি নয়, এটাই ভদ্রতা ও শোভনীয়। মনসুতিতেও বলছে অপ্রিয় সত্য কথা কক্ষণ বলবে না, যত সত্যই হোক। কিছু লোক আছে গর্ব করে বলে আমি সত্য কথা বলতে ভয় পাইনা, আমি সত্য কথা ছাড়া বলিনা। শাস্ত্রে এই ধরনের অপ্রিয় সত্য কথা বলার কোন মতেই অনুমতি দেয় না। বাক্যবাণ দিয়ে মানুষ এমন এমন কথা বলে যে সামনের মানুষটার ভেতরটা পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

প্রজাপতি ব্রহ্মা ঋষিদের বলছেন – যদি তোমাকেও কেউ কটু কথা বলে দেয় তখনও তুমি শান্তই থাকবে। এখানে ব্রহ্মা একটা খুব মজার কথা বলছেন – তোমাকে যখন কেউ আক্রোশবশতঃ কটু কথা বলছে সেই সময় তুমি যদি শান্ত মনে সব শুনে চুপ করে থাক, তাতে ঐ লোকটার যত পুণ্য কর্ম জমা আছে সব তোমার কাছে চলে আসবে। এইভাবে পুণ্যগুলো চলে আসে কি আসে না, কিংবা কাউকে কটু কথা না বলতে উৎসাহিত করার জন্য বলা হচ্ছে আমাদের জানা নেই। তবে দেখা যায় কাউকে যদি কটু কথা বলা হয়, সে যদি কটু কথা শোনার পরও শান্ত ভাবটাকে ধরে রাখতে পারে, এই ধরনের মানুষদের জীবন অন্য ধরনের হয়। এর আগে যেমন বলছিল, তাকে বাড়িতে সবাই সাপের মত ভয় করে, এই লোকটি মৃত্যুর পর নরকে যাবেই যাবে। ঠিক তেমনি আপনাকে কেউ একটা কটু কথা বলল আর আপনি সহ্য করে নিলেন তখন আপনি একজন সত্যিই মহাপুরুষ। এখানে ব্রহ্মা প্রথমে বললেন, তুমি কাউকে কটু কথা বলবে না। আর দ্বিতীয় বললেন, তোমাকেও যদি কেউ কটু কথা বলে তখন তার পাল্টা জবাব না দিয়ে সহ্য করে নেবে।

যখন ভারতে স্বাধীনতার সংগ্রামের তীব্রতা ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছিল, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, নেহেরুর উপর সেই সময় ইংরেজ সরকার কত অত্যাচার করেছিল। স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর নেহেরু ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ব্রুটেনে গেছেন, সেখানে চার্চিলকে একেবারে বন্ধুর মত হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নেহেরুর মনে কোথাও কোন রকম ক্ষোভ ছিল না। চার্চিল খুব দুঃখ করেই বলেছিলেন Your father is a great man. I put him jail so many times, নেহেরু ইংরাজ সরকারের হাতে যে ভাবে নিগ্রহ হয়েছিলেন, তারপরেও তিনি যে ব্রিটিশদের সাথে সম্পর্ক রেখেছিলেন এটাই তাঁর মহত্বের পরিচয়। যারা আমাদের কষ্ট দিয়েছে তাদের আমরা কিছুতেই ক্ষমা করে দিতে পারিনা, কিন্তু যাঁরা পারেন তাঁরাই মহৎ। শুধু কটু কথাতেই না, যে আমার প্রতি আক্রোশ দেখাচ্ছে, যে আমাকে পীড়ন করছে, যদি আমি নিজেকে সংযত করে নিতে পারি তাহলে আমি জেনে যাব সামনের লোকটির যত পুণ্য আছে সবটাই আমি টেনে নেব। এটা সত্যি কি মিথ্যে আমরা জানিনা। একটা ঘটনা আমরা জানি, গান্ধীজী যাঁকে এত লাঠি মারা হল, এত কিছু করা হল কিন্তু তাও তিনি সব সহ্য করে গেলেন। কিন্তু এটাই আশ্চর্যের, কিছু দিন পরেই ব্রুটেন নামতে শুরু করল আর ভারতের উত্থান শুরু হয়ে গেল। একা একটি লোক ব্রুটেনের সব শক্তিকে টেনে নিলেন। এটা শুধু ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রেই নয়, বৃহত্তর ক্ষেত্রে যে সমাজ যত কম আক্রমাণাত্মক হয় সেই সমাজের তত অভ্যুদয় হয় আর সেই সমাজে একটা শান্তির বাতাবরণ তৈরী হয়, এটা বিশ্ব ইতিহাসেই দেখা যায়। যে কোন ধর্ম, সমাজ ও ব্যক্তি আক্রমাণাত্মক হতে যাবে তারাই মৃত্যুকে বরণ করে নেবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। যে শান্ত হয়ে সহ্য করে নেয় সেই টিকে থাকে। শ্রীমাও বলছেন যে সয় সে রয়।

এরপর ঠিক ঠিক মুনি কে বলতে গিয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা মুনির বৈশিষ্ট্য বলছেন। এমনিতে মুনি শব্দের অর্থ মননশীল, আর মুনি শব্দ বলতে এটাও বোঝায় যিনি নিজের অনেক কিছুকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। ব্রহ্মা বলছেন, মুনি কয়েকটি বেগকে প্রশমিত করে দেন – বাণী বেগ, আমাকে কেউ কটু কথা বলেছে, আমাকে অপমানিত করছে তখন আমারও তাকে কটু কথা শুনিয়ে দেওয়ার জন্য মনটা ছটফট করতে থাকে, এইটাকে আটকে দেওয়া হল, তার মানে সে বাণী বেগ করছে। মনের বেগ – কোন একটা আবেগ, শোক, দুঃখ, আনন্দের যখন মনে জন্ম হয়, তখন সেটা মনকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলে দেয়, এই ইমোশান গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হল, এটাই মনের বেগ। ক্রোধের বেগ - যদিও ক্রোধটা মনের মধ্যেই পড়ে, মনের বেগ বলতে বোঝায় মনের মধ্যে কোন একটা আবেগ বা বৃত্তি তৈরী হল আর সেটাকে আমি প্রকাশ করতে চাইছি। ক্রোধকে এখানে নির্দিষ্ট করে বলা হচ্ছে আর মনের ক্ষেত্রে সব কিছুকেই সাধারণ অর্থে নিয়ে আসা

হয়েছে। তৃষ্ণার বেগ, যেমন আমার সোনার হরিণ চাই, অমুক লোকের একটা গাড়ি আছে ঠিক ঐ রকম আমারও একটা গাড়ি চাই। তৃষ্ণার বেগ যদি একবার এসে যায় তাহলে তাকে শেষ করে দেবে। তারপর বলছেন উদর বেগ, যখন তখন খাওয়ার ইচ্ছে। পেটে খিদে হওয়াতে আমি এখন বিরিয়ানি খেতে চাইছি, বিরিয়ানিই চাই আমার। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণদের এই উদর বেগকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এই যে একাদশী করা, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বা অন্য অন্য দিনে যে উপোস করা হয় তারপর মুসলমানরা যে এক মাস রোজা রাখে, এগুলো সবই উদর বেগকে নিয়ন্ত্রণ করা। আমার খিদে পাচ্ছে কিন্তু খাচ্ছি না, এটাই উদর বেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হচ্ছে। এই কয়েকটি বেগের কথা বলে বলছেন, মুনিরা এই কটি বেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন, এতে তাঁদের শক্তি বাড়ে। সব শেষে বলছেন কাম বেগ – পুরুষের নারীর প্রতি আর নারীর পুরুষের প্রতি আকর্ষণ। এই বেগগুলোকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন তাঁদেরকেই বলা হয় মুনি। এগুলো গৃহস্থদের জন্য বলা হচ্ছে না, গৃহস্থ প্রয়োজন বুঝে এগুলো করতে শাস্ত্র নিষেধ করছে না কিন্তু মুনি এগুলো অবশ্যই পালন করবে।

প্রজাপতি ব্রহ্মা বলছেন *যদি সন্তং সেবতি যদ্যসন্তং তপস্বিনং যদি বা স্তেনমেব। বাসো যথা রঙ্গবশং প্র্যাতি তথা স তেষাং বশমভ্যুপৈতি।* ১৩/২৯২/৩৩। কাপড়কে যে রঙে ছোপাবে কাপড় সেই রঙের হবে। তুমিও ঠিক সেই স্বভাবের হবে যে রকমটি তুমি সঙ্গ করবে। তপস্বীর সঙ্গ যদি কর তাহলে তুমি তপস্বী হয়ে যাবে। আর যদি চোরের সঙ্গ কর তাহলে তুমিও চোর হয়ে যাবে। সেই কারণে সঙ্গী নির্বাচনে, আমি কার সঙ্গে মেলামেশা করব সেই ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হয়। ঠাকুরও বলছেন যখন যে যার দাসত্ব করে, মানে যার চাকরি করছে তার সত্তা পেয়ে যায়। বাণীর ব্যাপারে বলতে গিয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা বাণীর চারটি বৈশিষ্ট্য বলছেন। *অব্যাহতং ব্যাহতাহ্লেয় আহুঃ সত্যং বদেদ্যাহতং তদ্বিতীয়হম্। ধর্মং বদেদ্যাহতং ততৃতীয়ং প্রিয়ং বদেদ্যাহতং তচ্চতুর্থম্।* ১৩/২৯২/৩৮। ১) বক্ করার থেকে চুপ করে থাকা অনেক ভালো। ২) সত্য কথা বলা। ৩) প্রিয় কথা বলা। ৪) ধর্ম সম্মত, মানে ধর্মের কথাই সব সময় বলতে হয়। আমি সত্য কথাই বলছি আর কথাগুলো প্রিয় কিন্তু ধর্ম সম্মত নয় তখন এটা আর বাণীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য করা হবে না। বাণীর এই চারটি বৈশিষ্ট্যকেই যিনি অনুশীলন করেন তাহলে বুঝতে হবে তিনি বাণীকে জয় করে নিয়েছেন। বাণীকে জয় করে নিলে কি হবে? তাঁর মুখ থেকে যেটাই বেরিয়ে আসবে সেটাই সত্য হয়ে যাবে, এটাই বাকসিদ্ধি। যোগীদের এই বাকসিদ্ধি হয়।

### সাংখ্য ও যোগ দর্শনের আলোচনা এবং যোগীদের যোগ সাধনা

গীতাতে সাংখ্য আর যোগে এই দুটো দর্শন অনেকবার আলোচিত হয়েছে, বিশেষ করে পঞ্চম অধ্যায়ে বলছেন *সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালা প্রবদ্যস্তি ন পণ্ডিতঃ।* কথামূতেও এই দুটো আলাদা দর্শনের উল্লেখ পায়, একটা জ্ঞানমার্গ আর দ্বিতীয়টি ভক্তিমার্গ। ঠাকুর বারবার বলছেন জ্ঞান আর ভক্তি এক। আবার বলছেন ভক্তি অন্দরমহল পর্যন্ত নিয়ে যায়। ভারতে গত হাজার বছরের ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ইতিহাসে যেটা বেশী দেখতে পাই তা হল, জ্ঞান আর ভক্তির বিরোধ। মহাভারতের সময়ে, যেখানে গীতা রচিত হয়েছে, সেখানে প্রধান বিতর্ক ছিল সাংখ্য আর যোগ এই দুটোর মধ্যে। তখনকার সময় যোগ ছিল প্রচলিত পথ। এই যোগকেই পরবর্তি কালে এসে পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে সুন্দর করে সাজিয়ে একটা আলাদা দর্শন রূপে দাঁড় করিয়ে দিলেন। কিন্তু মহাভারতের সময় এটাই ছিল প্রচলিত সাধনা, যেমন আসনে কিভাবে বসবে, প্রাণায়াম করবে, উপোস করবে, ধ্যান করবে এ সবই যোগ। সাংখ্যযোগের প্রবক্তা হলেন কপিল মুনি। কপিল মুনিকে স্বামীজী বলছেন Father of Indian philosophy। দর্শন বলতে যেটা বোঝায় সেটা প্রথম এনেছিলেন কপিল মুনি, যোগকে দর্শন রূপে নিয়ে এসেছিলেন পতঞ্জলি কিন্তু মহাভারতের সময় যোগ ছিল শুধু সাধনার একটা পথ মাত্র। সাধনার পথ আর তার দর্শন দুটো আলাদা।

যোগের উদ্দেশ্য ছিল পরিস্কার। আমাকে ওখানে পৌঁছাতে হবে। ওখানে পৌঁছাতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? যোগ তখন বলে দিচ্ছে ওখানে পৌঁছাতে গেলে তোমার শরীরের প্রতি যে আকর্ষণগুলো রয়েছে সেটাকে নাশ করে দিতে হবে, খাবার প্রতি, ইন্দ্রিয়ের ভোগের প্রতি আকর্ষণ গুলোকে শুকিয়ে দিয়ে তোমাকে যোগ পথে এগিয়ে যেতে হবে। আর সেই সময়ই কপিল মুনি সাংখ্য দর্শনকে নিয়ে এলেন। সাংখ্য যেহেতু চব্বিশটি তত্ত্বকে নিয়ে আসে তাই অনেকেই ভুল করে সাংখ্যকে সংখ্যার সঙ্গে এক করে ব্যাখ্যা করেন, মানে যারা সংখ্যা নিয়ে বর্ণনা করেন তারাই সাংখ্য দর্শনের মতাবলম্বী। কিন্তু সাংখ্য শব্দের মূল অর্থ হল সম্যক জ্ঞান। যে দর্শন সম্যক জ্ঞান দেয় তাকেই সাংখ্য দর্শন বলা হয়। পরবর্তি কালে সাংখ্য দর্শনের সাথে যোগদর্শন এমন ভাবে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিল যে দুটো দর্শনকে যমজ দর্শন বলা হতে লাগল।

এখন তো সাংখ্য আর যোগ দুটো এক সঙ্গেই চলে। অথচ প্রথম দিকে এই দুটো দর্শনের অনুগামীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ ছিল। এইটাই প্রকৃতির উপহাস। ঠিক তেমনি ন্যায় আর বৈশাখিক এবং কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড মানে পূর্বমীমাংসা আর উত্তরমীমাংসা যমজ দর্শন। ষড়দর্শনের এই তিনটে আলাদা আলাদা গ্রুপ।

সাংখ্য দর্শন দুটো জিনিষকে নিয়েই চলে পুরুষ আর প্রকৃতি। পুরুষ হল চৈতন্য আর প্রকৃতি মানে জড়। সাংখ্য দর্শনের মতে পুরুষ আর প্রকৃতি যেন দুটো নদী আলাদা আলাদা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে এই দুটো নদী পরস্পরের কাছে এসে মিলে যায়। যেখানে এসে মিলে যায় সেটাই হল সৃষ্টির বিন্দু অর্থাৎ ঐ বিন্দু থেকেই সৃষ্টি শুরু হয়। যখন দুটো আবার আলাদা হয়ে যায় তখন কি হয় মুখে বলা যাবে না। এখানে পুরুষ আর প্রকৃতি মানে নারী আর ব্যাটাছেলে নয়, সেখানে নারী আর ব্যাটাছেলে দুজনেই প্রকৃতির অন্তর্গত। কপিলের বৈশিষ্ট্য হল, বেদ উপনিষদের পরম্পরা ধারা থেকে সরে এসে তিনি সম্পূর্ণ এক নতুন ধারাকে সামনে নিয়ে এলেন। যার জন্য কপিলের এই চব্বিশ তত্ত্ব, পুরুষ প্রকৃতি থেকে মহৎ তত্ত্বাদি এই বর্ণনাগুলো উপনিষদ বা বেদে কোথাও পাওয়া যাবে না। পরের দিকের পণ্ডিতরা সাংখ্যের এই চব্বিশ তত্ত্বগুলিকে বেদান্তের অনেক কিছুর সাথে মিলিয়ে দিলেন। আচার্য শঙ্করও সাংখ্যের অনেক কিছুই বেদান্তে টেনে নিয়েছেন। টেনে নিয়ে তিনি মাঝে মাঝেই বলতেন সাংখ্যদের অনেক গুণ আছে বিশেষ করে যখন সংখ্যা নিরূপণাদি করেন তখন খুবই ভালো করেন, তবে তত্ত্ব কথা বলার সময় এদের একটু গোলমাল হয়ে যায়। তত্ত্ব কথা বলতে একটা জায়গাতেই বেদান্তের সাথে সাংখ্যের বিরোধ, আবার সেটাও কিছুটা যুক্তি আর উপনিষদকে আধার করে। যুক্তির দিক থেকে দেখা হলে দুজনেরই কিছু কিছু অকাট্য যুক্তি আছে। কিন্তু পরের দিকে ঠাকুর, স্বামীজী এনাদের দিব্য দৃষ্টিতে যে অনুভূতি হয়েছে সেটা আবার বেদান্তের পক্ষে যায়। সেইজন্য আস্তে আস্তে সাংখ্যরা ভারতে কমে গেল। ভারতের দর্শনের যে মূল ভিত্তিটা কপিল দিয়ে গেছেন সেটাকে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করছেন। যখনই আমরা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ বলি তখন এগুলো সবই কপিল মুনির কথা। ভূমি, অপঃ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এগুলো সবই কপিলের আবিষ্কার।

এখানে সাংখ্যের ব্যাপারটা উঠছে যুধিষ্ঠিরের একটি প্রশ্নে। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে প্রশ্ন করছেন সাংখ্য আর যোগে অনেক মিল আছে, যেমন দুজনেই বলে ব্রত উপোস করতে হয়, পবিত্রতা রাখতে হয়, দয়া রাখতে হয় তাহলে তফাৎটা কোথায়? তখন ভীষ্ম বিরাট লম্বা একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ভীষ্ম বলছেন *রাগং মোহং তথা স্নেহং কামং ক্রোধঞ্চ কেবলম্। যোগাচ্ছিত্ত্বা ততো দোষান্ পশ্বেতান্ প্রাপুবন্তি তৎ। ১৩/২৯৩/১১।* যাঁরা যোগী হন তাঁরা যখন পাঁচটা দোষের মূলকে উচ্ছেদ করে দেন তখন তাঁরা পরমপদ পেয়ে যান। যোগীরা এই পাঁচটি দোষকে নিজের চিন্তা ভাবনা দিয়ে উচ্ছেদ করেন না, নিজের যোগবল দিয়ে উচ্ছেদ করে দেন। এই পাঁচটি হল ১) রাগ, ২) মোহ, ৩) স্নেহ, ৪) কাম ও ৫) ক্রোধ। এটা মহাভারত বলছে, কিন্তু পতঞ্জলী যোগসূত্রে যদিও পাঁচটা দোষের কথা বলা হয় কিন্তু সেখানে এই পাঁচটা থেকে একটু আলাদা। পতঞ্জলি বলছেন অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটা দোষকে যোগীকে পার করতে হয়। রাগ আর দ্বেষ দুটোতেই এক। অভিনিবেশ হল জীবনের প্রতি আসক্তি। অস্মিতা হল স্নেহ, যখন কোন জিনিষের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নেয়, স্নেহ মহাভারতেও বলছে। কিন্তু অবিদ্যাটা মহাভারতে নেই। মহাভারতের সময় যোগদর্শন তখনও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তখন যোগ একটা পথ হিসাবে চলছিল। যখন পথ রূপে কোন কিছু চলে তখন সেটা দর্শনে প্রতিষ্ঠিত হতে একটু সময় লাগে। ভীষ্ম বলছেন বড় বড় মাছ যেমন জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে চলে আসে ঠিক তেমনি যোগী এই দোষগুলোকে নাশ করে পরমপদ পেয়ে যান। এখানে ভীষ্ম পরমপদ শব্দ ব্যবহার করছেন, পরমপদ মানে সব থেকে উচ্চ অবস্থায় চলে যায়। কিন্তু পতঞ্জলি এই ব্যাপারে আরও খোলামেলা ও স্পষ্ট, যার জন্য তাঁর ভাবটা আরও বেশী জোড়াল হয়ে যায়। উনি বলবেন *তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্*, এই পাঁচটাকে যখন যোগী পার করে যান তখন দ্রষ্টা মানে যিনি যোগী তিনি নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন। এখন আমার কি স্বরূপ সেটা আমাকে ভাবতে হবে। যে বলছে আমার স্বরূপ ব্রহ্মের তখন তার ব্রহ্মের জ্ঞান হবে। যে বলছে আমার স্বরূপ জীব, তাহলে জীব জ্ঞান হবে। যদি মনে করে আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক তাহলে তার সেইটাই হবে। এই কারণে যোগপথ যোগদর্শনের থেকে খুব জনপ্রিয় পথ হয়ে গেল, তাই যোগপথের দিকেই বেশী মানুষ আকৃষ্ট হয়েছে।

ভীষ্ম যোগপথের কথাই বলছেন, যেমন আগুনের উপর ইট চাপা দিলে আগুন নিভে যায়, ঠিক তেমনি যারা দুর্বল, যোগবলহীন, তারা যদি যোগ অনুশীলন করতে যায় তাদের অবস্থা ঐ ইট চাপা আগুনের মত যোগের চাপেই তার যোগ করার ইচ্ছেটা নিভে যায়। আমরা যারা মনে করছি বেলুড় মঠ থেকে যখন দীক্ষা পেয়েছি তখন ঠাকুর অস্তিমকালে আমাকে

ঠিকই তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন, কিন্তু যোগীরা এই ধরনের চিন্তাভাবনাকে একেবারেই গুরুত্ব দেননা। তুমি আছ আর তোমার মন আছে, তোমার মন এখন কি অবস্থায় আছে দেখে নাও। এরপর তুমি যেদিন যোগের পথে নামলে তখন মনের ঠিক ঠিক শক্তি যদি না বাড়াতে থাক তখন ঐ যোগই তোমাকে চাপা দিয়ে দেবে, তার মানে তুমি যেমন ছিলে তেমনই থাকবে। তুমি যদি মনে করে থাক যোগের পথে যখন নেমেছি ভগবান বিষু এসে আমাকে ঠিকই নিয়ে যাবেন, দীক্ষা যখন নিয়েছি ঠাকুর ঠিকই কিছু করবেন। কিন্তু যোগ কোন ভগবানকেই মানে না। সাংখ্য ভগবানকে মানবেই না। পরে যোগ দেখল ঈশ্বরকে না মানলে ঠিক জমছে না, তাই যোগ ঈশ্বরকে নিয়ে নিল। কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে যেভাবে দেখি যোগ কিন্তু সেইভাবে মানে না। গুরু যখন আছে তখন গুরুরও গুরু আছেন। ঈশ্বর হলেন প্রথম গুরু। শুধু তাই নয়, পূর্বমীমাংসাও ভগবানকে মানে না। যোগ অনেক লোক অনুশীলন করছিল, লোকের মনে কষ্ট হতে পারে অনেক ভেবে চিন্তে একজন ঈশ্বরকে নিয়ে এসেছে, কিন্তু পরম গুরু রূপে। সচ্চিদানন্দই গুরু, এই কথা যোগ থেকে এসেছে। ঈশ্বর গুরু রূপেই আছেন, এর বাইরে ঈশ্বরের আর কোন ভূমিকা নেই। তোমাকে ঈশ্বর করুণা করবেন, তোমার দুঃখ যন্ত্রণা ঈশ্বর দূর করে দেবেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা, এই জিনিষগুলোকে যোগ এখনও কোন মতেই মানে না। আমাদের ভারতের পুরনো তিনটে দর্শন, পূর্বমীমাংসা, সাংখ্যদর্শন আর যোগদর্শন ঈশ্বরকেই মানে না। হিন্দুদের মধ্যে একটা ছোট্ট অংশ, দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টদ্বৈতবাদীরা ঈশ্বরকে মানে। শুধু এই দুটোকে দিয়ে তো হিন্দুধর্মের সামগ্রিক বিচার করা যাবে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল যখন মুসলমানরা ভারতে এসে হিন্দুদের গলা কাটতে শুরু করল এই একটা কারণে, হিন্দুরা পৌত্তলিক। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রধান দর্শনগুলোই ভগবানকে মানে না, যারা ভগবানকেই মানে না তারা কি করে পৌত্তলিক হবে। এটাই প্রকৃতির উপহাস। বেদে ঈশ্বর বলে কিছু নেই, উপনিষদে ঈশ্বরের কোন নাম নেই, সাংখ্যে নেই, যোগে নেই, বৈশাখিকে নেই, পূর্বমীমাংসাতেও নেই অথচ আমরা হয়ে গেলাম ঘোর ঈশ্বরবাদী।

কিন্তু যখন যোগী যোগের অনুশীলন করতে শুরু করে তখন তার ভেতরে আস্তে আস্তে ঐ ছোট্ট আগুনটা বড় হতে আরম্ভ করে। তারপর যখন দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু হয় তখন যোগী যত রকমের দোষ আছে সব পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। ছোট আগুন আর বড় আগুন, আমরা হলাম সবাই ছোট আগুন, আমাদের সবারইর ভেতর যোগশক্তি সুপ্ত হয়ে আছে। যখন তপস্যা করে করে, যোগের অনুশীলন করে করে ঐ সুপ্ত আগুনকে বড় করা হচ্ছে তখন সেই আগুন অন্য কিছুই করছে না, আমাদের ভেতরে যে দোষগুলো আছে, কামক্রোধাদি রিপুগুলিকে পুড়িয়ে দেয়। পুড়িয়ে দিলে কি হবে? আমরা কি ভগবানকে পেয়ে যাব? না, তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্। আমি আমার স্বরূপে অবস্থান করে যাব। যখন স্বরূপে অবস্থান হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে আমার স্বরূপ কি। এর আগে যোগ বলে দেবে না আমার স্বরূপটা কি। শুধু এইটুকু বলবে, তুমি ঠিক ঠিক যা, তুমি তাই দেখবে। আমি যদি বলি আমি এখন আমাকে যে ভাবে দেখছি সেটা কি আমি নই? তখন তাঁরা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন, তুমি তোমাকে এই মন দিয়ে দেখছ আর তোমার মনের অবস্থাতাতো সব সময় পাণ্টে পাণ্টে যাচ্ছে। সেইজন্য যোগদর্শনকে পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত দর্শন বলা হয়, শুধু মনকে নিয়ে কথা বলে।

যোগের উদ্দেশ্য হল মনের যত রকম কলুষঃ, মানে যত পাপ আছে, তার নাশ করা। ভীষ্ম এখানে একটা তালিকা দিয়ে বলছেন যোগীরা কিভাবে যোগশক্তিকে বাড়ায়। যে যোগী শুধু ধানের খুদ আর তিলের খোল খেয়ে থাকে, ঘি আর তেলটা ছেড়ে দেয়, এই যোগীরা যোগবল লাভ করে। যে যোগী শুধু যবের ডালিয়া খেয়ে থাকে তার যোগশক্তি বৃদ্ধি পায়। যে যোগী প্রথমে দিকে দিনে একবার জলে দুধ মিশিয়ে পান করে, এইভাবে কমাতে কমাতে পনের দিন অন্তর একবার পান করে, এরপর মাসে একবার পান করে, তারপর বছরে একবার এইভাবে গ্রহণ করে তবে সে ঠিক ঠিক যোগশক্তি পায়। যোগীরা সত্যিই এইভাবেই তপস্যা করেন।

রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন তাঁর একটা লেখাতে একজন স্বামী বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বামী দাদা বলে সম্বোধন করতেন। সেই স্বামী হৃষিকেশ গঙ্গার ওপারে তপস্যা করতেন। তাঁকে মাঝে মাঝে ভিক্ষা করতে আসতে হত। কিন্তু তাতে তাঁর ধ্যান করার সময় নষ্ট হত বলে ভিক্ষা করা বন্ধ করে দিলেন। ওখানে গ্রাম থেকে যারা ছাগল চড়াতে আসত, ওরা নিজেদের জন্য যে রুটি বানাত সেখান থেকে একটা দুটো মোটা মোটা রুটি আর ছাগল বা গরুর দুধ ওনাকে দিত। উনি ওখান থেকে অল্প অল্প করে খেতেন। তারপর তিনি খাওয়া আস্তে আস্তে আরও কমাতে শুরু করলেন। এরপর গ্রামের লোকরাও গরু ছাগল চড়াতে আসা বন্ধ করে দিল। এরপর উনি সব খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। কালে ভদ্রে কখন সখন গ্রামে ভিক্ষা করতে যেতেন। এইভাবে চলতে চলতে তাঁর শরীর খুব শীর্ণকায় হয়ে গেছে আর তিনি নিজেও খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এত দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে কোথাও আর যেতে পারেন না। একদিন তিনি কুঠিয়ার ভেতরে বসে ধ্যান করছেন



সেই সময় তাঁর ঠিক মাথার উপর কুঠিয়ার চালে দুটো সাপ মারামারি করতে করতে তাঁর মাথার উপর পড়েছে। মাথার উপর পড়তেই তিনি চমকে উঠেছেন, শরীর একেই দুর্বল হয়ে গিয়েছে, আর ঐ সাপ দেখেই তিনি বেহুঁশ হয়ে গেছেন। ঐ ভাবে কত দিন পড়েছিলেন কে জানে। গ্রামের লোকের ভাবছে উনি অনেক দিন ভিক্ষা করতে আসছেন না। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে তিনি নিজের কুঠিয়াতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। সেখান থেকে তারা ধরাধরি করে দেবাদুনে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছে। মরেই যেত কিন্তু কোন রকমের চিকিৎসার ফলে সেই যাত্রা বেঁচে গেলেন। ভগবান বুদ্ধের জীবনেও দেখা যায় না খেয়ে তপস্যা করতে গিয়ে তাঁর শরীরটা একটা কঙ্কালে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তবে বছরে একদিন দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে খাওয়া এগুলো একটু বাড়াবাড়ি।

ভীষ্ম বলছেন যে যোগী সারা জীবন মাংস না খায়, আর নানা রকম ভালো ব্রতাদি করে নিজের ভেতরটা শুদ্ধি করে নেয় তাহলে তার যোগবল বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে অনেক রকম তপস্যার কথা বলে শেষে বলছেন *সুহ্রেয়ং ক্ষুরদারাসু নিশিতাসু মহীপতে। ধারণাসু তু যোগস্য দুঃশ্রেয়মকৃতাত্ত্বিঃ।।১৩/২৯৩/৫৪।* তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ধারের উপর দাঁড়ানোর মত যে শুদ্ধ নয় সে কখন যোগের ধারালতে দাঁড়াতে পারবে না। একদিকে মন অশুদ্ধ অন্য দিকে যোগ অনুশীলন করে, এটা অসম্ভব। কঠোপনিষদেও আত্মজ্ঞান লাভের পথকে ক্ষুরস্যাধারার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

এরপর সাংখ্য দর্শনের কথা বলছেন। এই সাংখ্যই পরে জ্ঞানযোগে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কিন্তু তখনকার দিনে যে সাংখ্য দর্শন ছিল, এখন যে জ্ঞানযোগ এসেছে সেখানে এসে সাংখ্যের অনেক কিছু পাল্টে গেছে। স্বামীজী জ্ঞানযোগকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এটি আবার পুরোপুরি একটা নতুন দিক। স্বামীজী যদিও পুরনো ধারণার উপর আধার করে বলেছেন কিন্তু স্বামীজীর জ্ঞানযোগ পুরোপুরি একটা নতুন সৃষ্টি। ভীষ্ম তখনকার পরম্পরাতে সাংখ্যদর্শন যেভাবে চলছিল সেটাকেই বলছেন। সাংখ্যে প্রকৃতির তিনটে গুণ – সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই তিনটে গুণের মিশ্রণ আর তার থেকে যে বিবর্তন হয় সেই থেকে সৃষ্টি হচ্ছে এই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। মন এই তিনটে গুণ দিয়েই তৈরী, বাইরে যত পদার্থ তৈরী হচ্ছে এই তিনটে গুণ থেকেই হচ্ছে। স্বর্গ, মর্ত্য ও নরক এই তিনটে লোক তিনটে গুণ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। যত ভূত, প্রেত, রাক্ষস, দেবতা সবই এই তিনটে গুণ থেকে তৈরী। সব কিছুকে মিলিয়ে এনারা তিনটে শ্রেণীতে বিভক্ত করে দিয়েছেন – তিনটে গুণ আর তিন রকমের যোনি – উত্তম, মধ্যম ও অধম। জগতের যা কিছু আছে সবটাকে এই তিনটেতে ফেলে দেওয়া যায়। এখানে আমার উদ্দেশ্য কি হবে? আমি উত্তম, মধ্যম ও অধম কোন যোনিতেই জন্ম নিতে চাইনা। মানে আমি দেবতা হয়েও জন্ম নিতে চাইনা, অসুর হয়েও জন্ম নিতে চাইনা, পশু হয়েও জন্ম নিতে চাইনা। যার যেমন ভোগের ইচ্ছা থাকে মৃত্যুর পর সে সেই রকম যোনি পাবে। যার খুব মাংস খাওয়ার ইচ্ছে সে পরের জন্মে বাঘ হয়ে জন্ম নিয়ে শুধু মাংস খেতেই থাকবে। এখানে কি বলা হচ্ছে? যত রকমের যোনি আছে তার কোনটাই আমার পেতে ইচ্ছে করবে না। তাহলে আমি যে মাছ খাচ্ছি! আমার পেট ভরাতে হবে, শরীরটাকে সুস্থ রেখে সাধনা করে এগিয়ে যেতে হবে তাই খাচ্ছি। মাংস কেন খাচ্ছেন? আজ এইটাই রান্না হয়েছে তাই খাচ্ছি, আমার নিজের কোন ইচ্ছে নেই। যদি খাওয়ার ইচ্ছে থাকে তাহলে ঐদিকে টেনে নিয়ে যাবে, তারপর একটা অবস্থার পর দেখব আমি আর ওখান থেকে বেরোতে পারছি না। আমার যদি কাম বাসনা খুব থাকে, ঠাকুর বলছেন তুমি তাহলে চড়ুই পাখি হয়ে জন্মাবে দিনে দশবার করে মৈথুন করবে। তাতেও যদি না মেটে তখন কেঁচো হয়ে জন্মাবে, একই শরীরে পুরুষ-নারী দুটোই পেয়ে যাবে। যেটাই ইচ্ছে করবে আমাকে সেই যোনিতে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে। ঠাকুর বর্ণনা দিচ্ছেন, এক সতী নারী মরার সময় গঙ্গায় গেল, গঙ্গার ঢেউ গুলো তার গায়ে লাগছে বলে খুব ভালো লাগছে, পরের জন্মে সে বেশ্যা হয়ে জন্মাল। সাংখ্যে তাই কোন ধরনের ইচ্ছাকে মাথা তুলতে দেবে না, যে ইচ্ছা আসবে সেই অনুসারে তোমাকে যোনিতে ঠেলে ফেলে দেব, নাও খুব করে ভোগ কর। যে যোনিতেই তুমি থাকো না কেন, প্রথমে তোমাকে সেই যোনির সব দোষগুলোকে দেখতে হবে। যোনির দোষ দেখে সেই যোনি থেকে কিভাবে বেরোন যায় বুঝে নিয়ে এবার নিজের ইচ্ছাগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সব কিছুই হল এই তিনটে গুণের খেলা, ইন্দ্রিয়গুলো যেখানে প্রাণশক্তিতে খেলা করে এগুলো সবই তিনটে গুণের খেলা – তিন গুণের এই খেলাটাকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে।

সাংখ্য যোগে মোক্ষ বলতে বোঝায় পুরুষের যে ঠিক ঠিক অবস্থা, সেই অবস্থায় অবস্থান করা। যোগ বলছে, তুমি কেন এই আপদে বিপদে পড়ে গেছ? তুমি সেই পুরুষ কিন্তু প্রকৃতির খপ্পড়ে পড়ে গেছ। প্রকৃতি তোমাকে নাচ দেখিয়ে যাচ্ছে আর তাতে তুমি মুগ্ধ হয়ে নিজের স্বরূপকে ভুলে গেছ। কি নাচ দেখাচ্ছে? প্রকৃতি তোমাকে এখন মনুষ্যলোক

দেখাচ্ছে, পরে দেবলোক দেখাবে, অসুরলোক দেখাবে, কখন তোমাকে সুখ দিয়ে, ভালো দিয়ে বেঁধে রাখবে, কখন তোমাকে ভয় দেখিয়ে ফাঁদে ফেলবে, কখন দুঃখ দিয়ে তোমাকে কাঁদিয়ে মারবে। প্রকৃতি এই মায়া মানে চোখের জল, সুখ, আনন্দ, বেদনা এই সব দিয়ে বেঁধে নেয়। ঠাকুর বলছেন তুমি যতই সেয়ানা হও কাজলের ঘরে ঢুকলে কালি লাগবেই। পুরুষ চৈতন্য কিন্তু প্রকৃতির খপ্পড়ে একটু পড়লেই প্রকৃতি তাকে ফাঁসিয়ে দেবেই দেবে। কিন্তু প্রকৃতির ঝুলিতে কায়দা করার নাচ খুব সীমিত, পুরুষ আবার একই নাচ দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে যায়। পুরুষ দেখে এই নাচ তো আমি আগেও দেখেছি, এই নাচ আর আমি দেখব না। যখন পুরুষ বিরক্ত হয় যায়, প্রকৃতির ঝুলিতে আর কিছু দেখানর যখন থাকে না, ঐ একই নাচ দেখতে গিয়ে পুরুষ বলে ওঠে তোমার আবার সেই পুরনো নাটক শুরু করেছ, ওসব আমার সব দেখা আছে। প্রকৃতি তখন সেই পুরুষকে ছেড়ে দেয়। একই সিনেমা মানুষ কতবার দেখবে! সাংখ্যের পুরো দর্শন এই পুরুষ আর প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে। গীতার চতুর্দশ অধ্যায় আর সপ্তদশ অধ্যায়ে ঠিক এই জিনিষটাকেই বর্ণনা করা হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়েও সাংখ্যযোগের বর্ণনা পাওয়া যায়। আমাদের ভারতীয় দর্শনে সাংখ্যযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দর্শন আর এটা পুরো একটা আলাদা পথ।

এখানে বলছেন, সাংখ্যযোগীরা বলে বেদের যা নানান রকমের মনোমুগ্ধকারী কথা আছে তুমি সেই দিকেও দৃষ্টি দেবে না। কারণ বেদের এই কথাগুলো তোমাকে স্বর্গে নিয়ে বেঁধে রাখবে। গীতাতেও ভগবান বলছেন *দ্রৈশ্ণুণ্যবিষয়াবেদা নিদ্রৈশ্ণুণ্যোভবার্জুন*। বেদের কথাগুলো দ্রৈশ্ণুণ্য, তিনটে গুণের মধ্যে অর্থাৎ প্রকৃতির এলাকার মধ্যে। বেদের কোন কথাগুলো প্রকৃতির এলাকায়? যে কথাগুলো স্বর্গের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে বেদান্তকে অন্তর্গত করা হচ্ছে না। ঋতুর যে পরিবর্তন হয়, দিন, মাস, পক্ষ, সম্বৎসর এই যা কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে সবই প্রকৃতির এলাকায়। চন্দ্রমায় যা কিছু হচ্ছে, সমুদ্র ও নদীতে জোয়ার-ভাটা, ধনবানের ধন নাশ আর পুনঃ ধনপ্রাপ্তি এই যাবতীয় যা কিছু দেখছ সবই প্রকৃতির এলাকায়। এইটাকে বুঝে নিয়ে তুমি কোনটাতেই মুগ্ধ হবে না, চাঁদ উদয় হয়েছে দেখে উৎফুল্ল হবে না, চাঁদ অস্ত গেছে দেখে কাতর হয়ে যাবে না। কোন দিকেই তুমি মন দেবে না, সবটাই প্রকৃতির এলাকা। সব কিছুকে প্রকৃতির এলাকা দেখার পর নিজের শরীরের দিকে তাকাবে, তখন দেখবে এই শরীরটাই শুধু দাঁড়িয়ে আছে। তখন নিজের শরীরের ভেতরে যত রকমের দোষ আছে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করবে। তোমার শরীর থেকে যে সব সময় দুর্গন্ধ উঠছে ঐ দিকে ধ্যান দেবে। এইভাবে দৃষ্টি দিতে দিতে তোমার নিজের শরীরের প্রতিও ঘেন্না এসে যাবে। সাংখ্যের এই ভাবটা যোগশাস্ত্রও গ্রহণ করেছে, পতঞ্জলি বলছেন *শৌচাৎ স্বাস্থ্যজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ*। শৌচে মানুষ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন নিজের শরীরের প্রতি ঘেন্না চলে আসে সাথে সাথে অপরের শরীরকেও কাছে আসতে দিতে ইচ্ছে করবে না। তার মানে যোগী এখন বিরাট একটা ধাপ এগিয়ে গেল। যারা শৌচে প্রতিষ্ঠিত নয়, শৌচ ক্রিয়াদি যারা নিয়মমত করে না তাদের দ্বারা যোগী হওয়া যায় না। যোগী শৌচে এমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান যে লোকেরা বাইরে থেকে দেখে মনে করবে যে এর ছুঁচিবাঈ আছে। কিন্তু যোগশাস্ত্রে বলবে এই শুচিতাই যোগের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যিক। শুচিতার বোধ যদি ভেতরে না থাকে তাহলে বুঝতে হবে ভেতরে কিছু গোলমাল আছে। শৌচে প্রতিষ্ঠিত নয় মানে আজকে আমার নিজের শরীরের সব কিছু ভালোই লাগছে, আগামীকাল কিন্তু অপরের শরীরের প্রতি আকর্ষণ হতে শুরু করবে। যখনই অপরের শরীরের প্রতি আকর্ষণ এসে গেল তখন পাকের মধ্যে পড়তে আর কতক্ষণ লাগবে! সেইজন্য সাংখ্য বলছে প্রথমে বাইরের জগতটাকে ছাড়তে হবে, যাদের প্রতি আকর্ষণ আছে তাদেরকে ছাড়তে হবে আর সব শেষে নিজের শরীরের প্রতি আকর্ষণটাকেও ছাড়তে হবে।

এরমধ্যে শুকদেবের একটা বিরাট লম্বা কাহিনী আছে। শুকদেব নারদের কাছে বৈরাগ্যের শিক্ষা পেয়েছিলেন। বৈরাগ্যের শিক্ষা পাওয়ার পর শুকদেবের কাছে ঘরবাড়িতে থাকাটাও খুব পীড়াদায়ক লাগছিল। এত তীব্র বৈরাগ্য এসে গেছে তিনি এখন সব কিছু ছেড়ে প্রাণপনে ছুটে পালাচ্ছেন। সেখান থেকে তিনি পালিয়ে হিমালয়, সেখান থেকে বদ্রিকাশ্রম তারপর তিনি নিখোঁজই হয়ে গেলেন। শুকদেব প্রথম থেকেই জ্ঞানী তারপর নারদের কাছে বৈরাগ্যের জ্ঞান শোনার পর সব কিছুই উড়ে গেল। শুকদেবের এই পালিয়ে যাওয়ার খুব সুন্দর একটা বর্ণনা আছে, যেটা ঠাকুরও বর্ণনা করেছেন। শুকদেব যেন সংসারের ভয়ে প্রাণপনে পালাচ্ছেন। একটা জলাশয়ের পাশ দিয়ে তিনি ছুটে যাচ্ছেন, সেই সময় জলাশয়ে মেয়ের কাপড় ছেড়ে স্নান করছিল। মেয়েরা দেখছে শুকদেব উলঙ্গ হয়ে ছুটে যাচ্ছেন, মেয়েদের মধ্যে কোন বিকারই হচ্ছে না, যেন কোন ব্যাপারই নয়। এর কিছু পরেই ব্যাসদেব পুত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য পুত্রা পুত্রা করে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে চলেছেন। মেয়েরা ব্যাসদেবকে দেখতে পেয়েই তড়িঘড়ি করে জামা কাপড়গুলো গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। ব্যাসদেব তখন অবাক হয়ে মেয়েদের জিজ্ঞেস করছেন। এইমাত্র যুবক শুকদেব উলঙ্গ অবস্থায় তোমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল তখন

তোমাদের লজ্জাবোধ হল না আর আমি বৃদ্ধ আমাকে দেখে তোমাদের লজ্জার ভাব কি ভাবে এল! তখন মেয়েরা বলছে ওনার মধ্যে নারী-পুরুষের ভেদ জ্ঞান নেই কিন্তু আপনার মধ্যে এই বোধটা আছে।

এখানে মহাভারতে খুব সুন্দর বর্ণনা করছে। ব্যাসদেব হিমালয়ে চলে গেছেন। সেখানে গিয়ে ব্যাসদেব খুব করুণ ভাবে ভো ভো বলে ডাকছেন, ভো ভো মানে তুমি কোথায়, তুমি কোথায়। শুকদেবের মত এত উচ্চ আধ্যাত্মিক পুরুষকে পেয়ে হিমালয়ের পুরো সংসার এতো আনন্দে বিভোর হয়ে গেছে তারাও ভো ভো করে সারা দিয়ে চলেছে। সেই থেকে পাহাড়ের নির্জন ফাঁকা জায়গায়, গুহার কাছে ভো ভো করলে তারাও সারা দিতে থাকে। আসলে এখানে প্রতিধ্বনির কথাই বলতে চাইছে। প্রতিধ্বনি কিভাবে সৃষ্টি হল? ব্যাসদেব তাঁর ছেলে শুকদেবকে ডাকছিলেন ভো ভো, তুমি কোথায়, তুমি কোথায় বলে তখন সমস্ত প্রকৃতিও তাঁর ডাকে সারা দিয়ে যেন শুকদেবকে ডাকছে তুমি কোথায়, তুমি কোথায়। এই ভাবেই পৌরানিক কাহিনীর জন্ম হয়।

এইভাবে যুধিষ্ঠির নানান ধরনের প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, ভীষ্মও প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন, কোন কোন প্রশ্নের উত্তরকে নানা রকমের পৌরানিক কাহিনী বলে উত্তরটাকে সাজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। শান্তিপর্ব বিশাল এক অধ্যায়। সব কিছু আলোচনা করা সম্ভব নয়, কয়েকটি মূল প্রশ্নকে নিয়ে আলোচনা করা হল।

## অনুশাসনপর্ব

এখনও ভীষ্ম আর যুধিষ্ঠিরের মধ্যে কথাবার্তা চলছে। কিন্তু একটা জায়গা থেকে শান্তিপর্বকে থামিয়ে দিয়ে আলাদা একটা পর্বে আলোচনাটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই পর্বের নাম অনুশাসনপর্ব। অনুশাসনপর্বও খুব মহাভারতের নামকরা একটি পর্ব। শান্তিপর্ব আর অনুশাসনপর্বের মোটামুটি একই ধরনের আলোচনা চলছে, খুব একটা তফাৎ নেই। মহাভারত যদি শুধু পাতার পর পাতা পাঠ করে যাওয়া হয় তাও আমাদের মোটামুটি তিন বছর লেগে যাবে। আর ব্যাখ্যা যদি করা হয় তাহলে এই জীবনটাই হয়তো লেগে যাবে মহাভারত শেষ করতে। তাই আমরা কয়েকটি বিশেষ শ্লোককে বেছে নিয়ে আলোচনা করছি। যেমন যুধিষ্ঠির এখানে ভীষ্মকে জিজ্ঞেস করছেন কোন ধরনের পুরুষ আর নারীতে লক্ষ্মী বাস করেন। লক্ষ্মীকে সবাই চাই, সবাই আশা করে লক্ষ্মী আমার কাছে চিরকাল বাস করুক। সবাই টাকার পেছনে ছুটছে, যাঁরা সাধু মহাত্মা তাঁদেরও দুটো টাকা-পয়সা না থাকলে চলে না। লক্ষ্মীর আরেকটি নাম শ্রী, কারুর চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায় এর মধ্যে শ্রীর বাস আছে কিনা। ঘরবাড়ি দেখলে দু মিনিটেই বোঝা যায় এই বাড়িতে শ্রী আছে কিনা। ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঝুল, সন্ধ্যা বেলা ধূপ দীপ না দেওয়া হয় এগুলো হল অলক্ষ্মীর চিহ্ন। লক্ষ্মীর চিহ্ন এর বিপরীত।

### **লক্ষ্মী কোথায় থাকেন আর কোথায় থাকেন না**

রুক্মিণী একবার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করছেন। দুজনের মাঝখানে কিভাবে কিভাবে লক্ষ্মী এসে হাজির হয়েছেন। লক্ষ্মী হলেন স্বর্গের দেবী। শ্রীকৃষ্ণ যখন বিষ্ণু রূপে থাকেন তখন লক্ষ্মী তাঁর পাশে থাকেন। রুক্মিণী জিজ্ঞেস করছেন ‘মা! এই জগতের প্রাণির উপর তুমি কিভাবে কৃপা কর, আর কোথায় কোথায় তুমি বাস কর’। সবাই জানার খুব ইচ্ছা টাকা-পয়সা কিভাবে আসে, কিভাবে টাকা-পয়সাকে ধরে রাখা যায়। তখন লক্ষ্মী বলছেন ‘টাকা-পয়সা থাকলেই যে শ্রী থাকবে তা নয়, শ্রীতে একটা আলাদা সৌন্দর্য থাকে। এই সৌন্দর্য দিয়েই বোঝা যায় যে এর ধন-সম্পদ আছে’। লক্ষ্মী এরপর কতকগুলো শর্ত বলছেন, কার কার কাছে আমি থাকি। *বসামি নিত্যং সুভগে প্রগল্ভে দক্ষ নরে কর্মণি বর্তমানে। অক্রোধনে দেবপরে কৃতজ্ঞে জিতেন্দ্রিয়ে নিত্যমুদীর্ঘসত্ব।* ১৪/১০/৬। যারা নির্ভিক তাদের কাছে আমি থাকি। ভীতু লোকদের কাছে টাকা-পয়সা থাকে না। তবে একটা মজার ব্যাপার হলে জহুদিরা সারা বিশ্বে অর্থ উপার্জনে খুব নামকরা জাত, কিন্তু অন্য দিকে এরা আবার খুব ভীতু। সেইজন্য গত দু হাজার বছর ধরে মুসলমানরা, খ্রীষ্টানরা জহুদিদের উপর অত্যাচার করেই যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত যখন দেখল আমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই তখন এরা ইজরাইলে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছে। ইজরাইলে এসে জহুদিরা এবার মুসলমানদের মারতে শুরু করেছে, আর এখন জহুদিরাও বাড়তে শুরু করেছে। তবে এটাই নিয়ম যারা ভীতু ও কাপুরুষ তাদের কাছে অর্থ থাকে না। যারা দক্ষ তাদের কাছে লক্ষ্মী সব সময় থাকে। কিন্তু যারা অদক্ষ, কাজকর্ম করতে গিয়ে ল্যাঞ্জেগোবরে হয়ে যায় তাদের কাছে কখন টাকা-পয়সা যাবে না। যারা কর্মপরায়ণ, সব কাজে কর্মে লেগে থাকে তাদের কাছেই টাকা-পয়সা আসে। কোন কাজকর্মের চেষ্টা না করে

বাড়িতে বসে বসে যদি ভাবে কপালে টাকা-পয়সা থাকলে ঠিকই এসে যাবে, এদের কাছে লক্ষ্মী কোন দিন আসে না। ক্রোধরহিত পুরুষের কাছেই লক্ষ্মী আসেন। যারা ক্রোধী পুরুষ তাদের কাছে লক্ষ্মী কোন দিন আসে না। তারপর বলছেন ঈশ্বর ভক্ত যারা তাদের কাছে লক্ষ্মী বাস করেন। এখানে কি বলতে চাইছেন? যারা ভক্ত তাদের কি সত্যিই টাকা-পয়সা আসে? এখানে যদি দুটো চরিত্র নেওয়া হয়, দুজনের কাছেই অর্থ আছে, একজন ঈশ্বর ভক্ত আরেকজন ঈশ্বর ভক্ত নয়। দেখা যাবে, যে ঈশ্বর ভক্ত নয় তার অর্থ আস্তে আস্তে চলে যাবে। যারা ঈশ্বর ভক্ত নয় তাদের যে টাকা-পয়সা হবে না তা নয়, আবার যারা ঈশ্বর ভক্ত তাদের যে টাকা-পয়সা হবে তারও কোন গ্যারান্টি নেই। কিন্তু যদি টাকা-পয়সা থাকে আর সে যদি ঈশ্বর ভক্ত হয় তাহলে তার অর্থটা থাকবে, অভক্ত হলে টাকা-পয়সা উড়ে যাবে। ঈশ্বর ভক্ত সব সময় বিনয়ী হয়, বিনয় আছে আর ক্ষমতাও আছে তখন তার কাছে টাকা-পয়সা জমতে থাকে। এরপর কৃতজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে। এর আগে কয়েকটি যে বলা হল, কার্যকুশল, ক্রোধরহিত, এগুলোর সাথে কৃতজ্ঞের একটা সম্পর্ক আছে। দোকানদারদের মধ্যে যারা বিনয়ী, খুব ভদ্র ব্যবহার করে, খদ্দেরকে ঠকায় না তাদের দোকানের বিক্রী সব সময় বেশী হয়। যে দোকানদার বাইরে দিয়ে খুব ভদ্র ব্যবহার করেছে কিন্তু ভেতরে ভেতরে চুরি করে, প্রথমে দিকে তার দোকানে খদ্দের যাবে আর তার বিক্রীও ভালো হবে। কিন্তু মানুষ একদিন ঠিকই ধরে ফেলে এই দোকানদার চুরি করে, তখন তার ব্যবসা আস্তে আস্তে খারাপের দিকে চলে যাবে। আসলে যে চারিত্রিক গুণগুলো মানুষকে মহৎ ও প্রশংসিত করে, লক্ষ্মীর নিবাসের জন্য সেই গুণগুলো থাকা দরকার। তফাৎ হল, যারা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি লাভের দিকে পুরোপুরি মন দিয়ে রেখেছে তারা লক্ষ্মীর দিকে নজর দেয় না। এরা টাকা-পয়সার জন্য চেষ্টা করতে যায় না বলে এদেরও সেই রকম টাকা-পয়সা খুব বেশী হয় না। এদের বাইরে যে কোন পথেই মানুষ যাক না, অর্থপ্রাপ্তি, ধর্মপ্রাপ্তি, নামযশ প্রাপ্তি, যেটাই হোক না কেন এই মানবিক চারিত্রিক গুণগুলো সবারই থাকতে হবে, তা নাহলে এর কোনটাই হবে না। আমরা প্রায়ই মনে করি চালবাজি করে, চিটিং করে ব্যবসাতে অনেক টাকা করে নেওয়া যায়, কিন্তু একটা সময়ে গিয়ে এরা মুখ খুবড়ে পড়বেই। পাড়ার ছোট দোকানদার সেও কদিন পরে ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। স্বাভাবিক অবস্থাতেও ব্যবসা খারাপ হতে পারে। ভালো লোক যদি হয়, তখন লোকেরাই সাহায্য করে দাঁড় করিয়ে দেয়। তারপর সেখান থেকে চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে আবার সে দাঁড়িয়ে যাবে। শেষে বলছেন *নিত্যমুদীর্ঘসত্ত্বৈ, সত্ত্বগুণের আধিক্য, যে ব্যবসায়ীর মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য তার কাছে টাকা-পয়সা বেশী থাকবে।*

এরপর বলছেন কাদের কাছে লক্ষ্মী থাকেন না। *নাকর্মশীলে পুরুষে বসামি ন নাস্তিকে সাক্ষরিকে কৃতঘ্নে। ন ভিন্নব্রতে ন নশংসবর্ণে ন চাপি চৌরে ন গুরুস্বয়ৈ।* ১১৪/১০/৭। যারা অকর্মা, কাজকর্ম করে না, যারা নাস্তিক মানে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, যারা বর্ণসঙ্কর মানে বাবা মা ঠিক নেই। কৃতঘ্ন, দুরাচারী, ক্রুর, চোর, গুরুজনের মধ্যে দোষ দেখে এই ধরনের লোকদের মধ্যে আমি কখনই বাস করি না। মানবিক মূল্যবোধ আর ব্যবসার শিষ্টাচার এই দুটো একই। যারা টাকা-পয়সা উপার্জন করতে চাইছে তাদের সেই গুণগুলোই লাগে যেটাকে আমরা উচ্চতর মানবিক মূল্যবোধ বলছি। যাদের মধ্যে তেজ, শক্তি, সত্য, মান আর গৌরবের মাত্রাটা খুব কম, যারা কথায় কথায় ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়, যাদের ভেতরে ছলচাতুরি কিন্তু বাইরে অন্য রকম দেখায় এই ধরনের কপট লোকদের মধ্যে আমি বাস করি না। সচরাচর সবারই একটা ধারণা যে ব্যবসা করতে গেলে একটু চালাকি করতে হয়, একটু এদিক সেদিক করতে হয়। এটা ঠিকই চালাকি আর কপটতার দ্বারা কদিনের জন্য প্রচুর অর্থ আসবে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তারা সেই অর্থকে ধরে রাখতে পারেনা। সে আমি যেভাবেই টাকা আয় করি না কেন, ব্যবসা করেই হোক, কাজকর্ম করেই হোক এই গুণ গুলো না থাকলে কিছু দিন পরেই সে শ্রীহীন হয়ে যায়। আমি যদি জানি আপনার কাছে প্রচুর টাকা-পয়সা আছে, এবার আমাকে দেখতে হবে আপনার মধ্যে এই গুণগুলো আছে কিনা। যদি এই গুণগুলো আপনার মধ্যে থাকে তাহলে জেনে নিন আপনার মৃত্যু পর্যন্ত আপনার টাকা কোথাও যাবে না। যদি একটা গুণও আপনার মধ্যে কম থাকে, আপনি জেনে নিন মৃত্যুর অনেক আগেই আপনার সব টাকা-পয়সা হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। লক্ষ্মীকে যে খুব চঞ্চলা বলা হয়, এই কারণেই বলা হয়। বিদ্যার ক্ষেত্রে, আগেকার দিনে যাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন, বেদ উপনিষদ অধ্যয়ন করাতেন, বাচ্চা বয়স থেকে এঁদের মধ্যে এই গুণগুলোকে চরিত্রের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হত। যার জন্য আগেকার দিনের ব্রাহ্মণদের মধ্যে, যাঁরা ঠিক ঠিক পণ্ডিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে এই ধরনের কোন দোষ পাওয়া যেত না। সেইজন্য বিদ্যাটা তাঁদের কাছে সব সময় থাকত। যদি এই গুণগুলো থাকে তার মধ্যে যেমন বিদ্যা থাকে ঠিক তেমনি ধন-সম্পদও থাকে। যদি না থাকে, তাহলে কোন একটা কারণে আপনার কাছে ধন-সম্পদ এসে গেছে, কিন্তু এটা আপনার কাছে বেশী দিন টিকবে না। আমরা প্রায়ই দেখি বাবা জীবনে একজন খুব সফল ব্যক্তি কিন্তু তার ছেলে একেবারে অপদার্থ হয়ে গেছে। ভারত স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ করে অনেক সুযোগ সুবিধা বেড়ে গেছে, তাই একটুতেই অনেকে সাফল্য পেয়ে গেছে, কিন্তু এদের মধ্যে এই গুণগুলো না থাকতে পরের প্রজন্ম এই সাফল্যকে

ধরে রাখতে পারছে না। আগেকার দিনে এই সমস্যা ছিল না, কারণ যার যে কাজের জন্য যে মানবিক মূল্যবোধের দরকার সেগুলো বাচ্চা বয়সেই পরিবার থেকে তৈরী করে দেওয়া হত।

এতক্ষণ পুরুষদের ব্যাপারে লক্ষ্মী বলে গেলেন, এখন মেয়েদের ব্যাপারে বলছেন। কান্টা মানে যাদের একটা বিশেষ সৌন্দর্য আছে যার মধ্যে একটা কমণীয় ও সৌম্য ভাব থাকে, লক্ষ্মী তাদের মধ্যে বাস করেন। যেসব মেয়েদের মধ্যে ঔদ্ধত ভাব থাকে, আজকাল নতুন প্রজন্মের মেয়েদের দেখলেই বোঝা যায় সবাই কেমন ঔদ্ধত হয়ে আছে। এদের মধ্যে লক্ষ্মী বাস করেন না। যারা ঈশ্বর পরায়ণ আর ব্রাহ্মণ পরায়ণ, ব্রাহ্মণ পরায়ণ বলতে বোঝাচ্ছে যারা গুণীজনদের সম্মান করে, যারা ঘর আর ভাণ্ডার সব সময় ঝকঝকে তকতকে করে পরিষ্কার রাখে, এদের কাছে লক্ষ্মী সব সময় বাস করেন। অনেক আগে একবার স্কুলের ছেলেদের একটা ক্যাম্প হয়েছিল। সেখানে এক সাহেবকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়েছিল ভাষণ দেওয়ার জন্য। সাহেব আসার পর তাঁকে সব কিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান হচ্ছে। সাহেব প্রথমে বলছেন ‘আমাকে আপনাদের রান্নাঘরটা দেখানতো’। রান্নাঘরে এসে দেখেন ঘরটা একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার। সাহেব বলছেন যে কোন প্রতিষ্ঠান বা গৃহস্থের রান্নাঘরটা দেখেই বোঝা যাবে বাড়ির মালিক কি রকম লোক। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের যে কোন আশ্রমের রান্নাঘর, গোশালা সব সময় ঝকঝকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাবে। মেয়েদের যত খাটুনিই হোক, রাত্রে শোবার আগে ঘর আর রান্নাঘর পরিষ্কার তকতক না করে শুতে যাবে না। আধুনিক কালের মেয়েরা সব রান্নাবান্না করে বেসিনের উপর সব টাল করে রাখবে, সকালে কাজের মেয়ে আসবে সে যে রকম পারবে করবে। বুঝে নিন এদের শ্রী আর বেশী দিন নেই। সকালে সূর্য দেবতা উঠেছেন, তিনি আমার বাড়িতে প্রবেশ করছেন, প্রবেশ করে কি দেখছেন? চারিদিকে এঁঠো বাসন। অন্যান্য কর্মের জোরে কিছু দিন চলবে, সেগুলো শেষ হয়ে গেলে অলক্ষ্মী এসে ঘরে বাসা বাঁধবে।

গরু আর ধানের ক্ষেত্রে মেয়েরা বিশেষ রূপে যত্ন নেন। আগেকার দিনে জমি ও গরু ছিল সম্পদ, বলাই হত গোধান। এখন আর কারুর গরু নেই, কিন্তু জীবন চালাবার জন্য যা কিছু সম্পদ আছে, সব কিছুকে টিপটপ করে রাখতে হবে। আমাদের মনে হতে পারে আমরা এগুলো কেন আলোচনা করছি। যাদের এই গুণগুলো নেই তারা কোন দিন ঈশ্বরের পথেও এগোতে পারবে না, কোন দিন আধ্যাত্মিক মনস্কতায় যেতে পারবে না। এগুলো হল প্রাথমিক পদক্ষেপ, আগে এগুলো করে নিজেকে পরিশুদ্ধ কর তারপর তুমি ধর্মের পথে যেতে পারবে। বাড়িতে যত রকমের বাসনপত্র আছে সব পরিষ্কার এবং গোছান। আর যে কাজটাই করবে সেটা ভেবে চিন্তে করবে। এরা স্বামীর বিরুদ্ধে কখন কথা বলে না। দুজনের এক রকম মন যদি না হয় তাহলে অশান্তি লাগবেই। লজ্জাকে যারা ত্যাগ করে দিয়েছে লক্ষ্মী তাদের ছেড়ে চলে যান। লক্ষ্মী আর কাদের থেকে দূরে থাকেন? নারী যদি নির্দয় হয়, পাপাচারে যদি লিপ্ত হয়, যারা অপবিত্র, খুব অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন থাকে, খাওয়া-দাওয়ার প্রতি যাদের কোন সংযম নেই, যারা অধৈর্য, যারা খুব কলহপ্রিয়, কথায় কথায় ঝগড়া করে, প্রচণ্ড ঘুম কাতুরে, ঘুমের জন্য বিছানাই ছাড়তে চায় না। এদের থেকে আমি সব সময় দূরে থাকি।

লক্ষ্মী যেমন পুরুষ আর স্ত্রীদের নিয়ে বললেন, ঠিক তেমনি নদীর কথাও বলছেন, কোন ধরণের নদীতে লক্ষ্মী বাস করেন। এগুলো হল একটা জিনিষের শ্রী কেমন হবে, কোন জায়গায় বেড়াতে গেলে একটা পুকুর বা জলাশয় দেখলেই চোখটা জুড়িয়ে যায়, কোথাও কোথাও আবার সেই রকম ভালো লাগবে না। যে জলাশয়ে হাঁস থাকে, বিভিন্ন রকমের পাখির কলতানে মুখরিত, নদী বা জলাশয়ের তীর প্রচুর তরুরাজি দ্বারা আচ্ছাদিত, যার তীরে প্রচুর ব্রাহ্মণদের বাস, যে জলাশয় জলে সব সময় পরিপূর্ণ আর হাতি, সিংহ, হরিণ এরা এসে যে জলাশয়ের জলপান করে, এই ধরণের নদী বা বড় দীঘিতে আমি ঠিক ঠিক বাস করি। এই ধরণের নদী বা জলাশয়ের উপর সব সময় একটা পরিপূর্ণতার ভাব বজায় থাকে। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে, যারাই আধ্যাত্মিক জীবনে আসে তাদের জীবন পরিপূর্ণ থাকতে হবে। নদীর যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, ঠিক সেই রকম জীবন যদি পরিপূর্ণ না থাকে আধ্যাত্মিক পথে কখনই এগোতে পারবে না। লক্ষ্মী বলছেন, মস্ত হাতি অর্থাৎ যে হাতি পুরো সাবলীল, সাপ, সিংহাসন, সৎ পুরুষের আমার নিত্য নিবাস। কেউ যখন রাজনীতিতে আসে তখন সে চায় আমি যেন প্রধানমন্ত্রী হতে পারি, মানে রাজা হতে পারি, প্রধানমন্ত্রী না হলেও অন্তত যেন একটা মন্ত্রী হতে পারি। কারণ যেখানেই সিংহাসন সেখানেই লক্ষ্মীর বাস। কিন্তু তার সাথে সৎ পুরুষের কথা বলছেন। আমি যদি একবার বুঝে নিতে পারি আমি রাজা হতে পারব না, তাহলে কি লক্ষ্মী কি আমার মধ্যে বাস করবেন না? না, তখন আমাকে সৎ পুরুষ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। রাজার সঙ্গে লক্ষ্মী সব সময়ই থাকবেন এটা জানা কথা, কিন্তু সবাই তো আর রাজা হতে পারবে না, কিন্তু সৎ পুরুষের সঙ্গে লক্ষ্মী সব সময় বাস করেন।

লক্ষ্মী রুক্মীনিকে বলছেন, আমি শরীর রূপে নারায়ণের সঙ্গে বাস করি। কিন্তু শরীর রূপে সব জায়গাতে না থাকলেও ভাবনা রূপে আমি বিভিন্ন জায়গায় বাস করি। ভাবনা রূপে যেখানে যেখানে আমি বাস করি সেখানে সেখানে ধর্ম, অর্থ, কাম আর যশ এই চারটির সমৃদ্ধি হয়। লক্ষ্মী যদি থাকেন তখন যে শুধু অর্থ বৃদ্ধিই হবে তা নয়, কামও বৃদ্ধি হয়, ধর্মও বৃদ্ধি আর তার সঙ্গে যশ হয়। যারই দেখা যাবে কাজ কর্ম করে নাম যশ হচ্ছে তখন বুঝতে হবে লক্ষ্মী তার মধ্যে খুবই ভালো ভাবে বাস করছেন।

মহাভারতের একটা খুব প্রচলিত মত যে কৃত্যদের কখনই কোন গতি হয় না। কৃত্য মানে, যে উপকারির উপকারকে মনে রাখে না, উল্টে তার ক্ষতি করার চেষ্টা করে, এরা জীবনে নাশ হয়ে যায়। এখানে একটা খুব মজার কাহিনী আছে। এক রাজা কিভাবে কিভাবে অভিশাপ পেয়ে নারী হয়ে গেছে। রাজা যখন পুরুষ ছিল তখন তার কয়েকটি সন্তান ছিল। পরে নারী হয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে তার আবার কয়েকটি সন্তান হয়ে গেছে। এদিকে দেবতারা কোন কারণে খুশী হওয়ার পর রাজাকে অভিশাপ মুক্ত করে পুরুষ করে দিতে চাইল। তখন সে বলল ‘না, আমি আর পুরুষ হতে চাই না, নারী রূপে আমি এই জীবনকে অনেক ভালো ভাগে উপভোগ করতে পারছি।’

### গুরুবাক্যে উপমন্যুর নিষ্ঠা

এরপর উপমন্যু ঋষির কাহিনী আসছে। উপমন্যুর এই অংশেই বিখ্যাত শিবসহস্র নাম আসছে। উপমন্যুর গুরু খুব কড়া ঋষি ছিলেন। প্রথম যখন গুরুর কাছে উপমন্যু শিক্ষা নিতে গেছেন তখন প্রথমে গুরু তাঁকে বলে দিলেন ‘তুমি যা কিছু ভিক্ষাতে পাবে সেখান থেকে আগে গুরুকে নিবেদন করে তারপর তুমি গ্রহণ করবে’। এখন রোজ ভিক্ষা করে যা কিছু পেতে সবটাই গুরুকে নিবেদন করে দিত। কিন্তু গুরু সমস্ত ভিক্ষাটাই নিজে খেয়ে নিতেন। কিছু দিন পর গুরু উপমন্যুকে বলছেন ‘আরে! আমি তো রোজই তোমার ভিক্ষা নিয়ে নিচ্ছি কিন্তু এখনও তুমি তো বেশ মোটাসোটাই আছ দেখছি। কি করে তোমার শরীরটাকে ঠিক রেখেছ?’ উপমন্যু বলছেন ‘আমি আরেকবার ভিক্ষা করতে যাই’। গুরু বলছেন ‘এটা তো তুমি খুব অন্যায্য করছ। ব্রহ্মচারীদের দ্বিতীয়বার ভিক্ষায় যাওয়ার কথা নয়’। উপমন্যু তখন দ্বিতীয়বার ভিক্ষা যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। কদিন পর গুরু বলছেন ‘তুমি তো দ্বিতীয়বার ভিক্ষাতে যাচ্ছ না, কিন্তু তাও তুমি মোটাসোটা হচ্ছ কি করে?’ উপমন্যু বলছেন ‘আমি যখন আপনার গরুগুলো চড়াতে যাই তখন গরুর দুধ আমি খেয়ে থাকি’। গুরু শুনে অবাক হয়ে বলছেন ‘তুমি তো আমার ভাগের দুধটাই খেয়ে নিচ্ছ, এরকম কাজ কক্ষণ করবে না’। কদিন পর গুরু দেখছেন উপমন্যুর শরীর আগের মতই আছে। জিজ্ঞাসা করাতে উপমন্যু বলছেন ‘বাছুর যখন গরুর বাঁট থেকে দুধ খায় তখন ওর মুখ থেকে যে ফেনা বেরোয় সেই ফেনা আমি খাই’। গুরু তখন বলছেন ‘আমাদের গরু বাছুর গুলো খুব ভালো, তুমি খাচ্ছ দেখে বাছুর গুলো আরও বেশী মুখ থেকে ফেনা ফেলতে থাকবে, তুমি তো এক প্রকার বাছুর থেকে ওর খাওয়ার কেড়ে নিচ্ছ’। এখন উপমন্যুর কাছে আর কোন পথ নেই কি খেয়ে থাকবে। একদিন খিদের জ্বালায় উপমন্যু আখ গাছের পাতার রস খেয়ে নিয়েছে। আখ গাছের পাতার রস খুব বিষাক্ত হয়। ঐ রস খেয়ে নিতেই তাঁর চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেছে। অন্ধ হয়ে চলতে গিয়ে একটা গর্তের মধ্যে উপমন্যু পড়ে গেছেন। অধ্যয়নের সময় গুরু দেখছেন উপমন্যু নেই। তিনি ভাবলেন খাওয়া-দাওয়া করতে পারছে না বলে অভিমান করে কোথাও পালিয়ে গেছে। জঙ্গলে খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন একটা গর্তের মধ্যে উপমন্যু পড়ে আছেন আর তাঁর চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেছে। গুরু তখন বেদ থেকে অশ্বিনীকুমারের মন্ত্র উপমন্যুকে শিখিয়ে দিয়ে পাঠ করতে বললেন। উপমন্যু এখন মন্ত্র পাঠ করতে শুরু করেছেন। পাঠ করতে করতে অশ্বিনীকুমার এসে গেছেন। অশ্বিনীকুমার এসে বলছেন ‘তোমাকে এই ওষুধ দিলাম, এই ওষুধ খেয়ে নাও, তাহলে তুমি ঠিক হয়ে যাবে’। উপমন্যু তখন বলছেন ‘আমাকে গুরু বলে দিয়েছেন আমি যা পাব সেটা আগে গুরুকে নিবেদন না করে আমি খেতে পারব না’। দেবতারা বলছেন ‘না, না, তোমার গুরুও আগে এই রকম করেছিলেন, তুমি খেয়ে নাও’। উপমন্যু বলছেন ‘আমার গুরু আগে কি করেছিলেন আমার জানা নেই আর জানতেও চাই না, আমাকে গুরু যেমনটি আদেশ দিয়েছেন আমি সেই আদেশই পালন করে যাব’। এই যে আমরা বলি গুরু যেমনটি করেন আমরাও তেমনটি করব। কিন্তু তা নয়, গুরু যেমনটি বলেন আমাদেরও তেমনটি করতে হবে, গুরু যেমনটি করেছিলেন বা করেছেন কক্ষণ তেমনটি করতে নেই। তখন অশ্বিনীকুমার খুব খুশী হয়ে চোখটা ঠিক করে দিলেন। ঠিক করে দিয়ে বললেন ‘তোমার গুরুর দাঁতগুলো লোহার, আমি তোমার দাঁতগুলো সোনার করে দিচ্ছি’। এর কি তাৎপর্য আমাদের জানা নেই। এরপর অশ্বিনীকুমার আরও কিছু বিদ্যা দিয়ে আশ্রমে ফিরে যেতে বললেন। আশ্রমে ফিরে আসতেই উপমন্যুকে দেখে গুরু বলছেন ‘আরে! তোমার তো দেখছি সব সিদ্ধি হয়ে গেছে, তুমি তো সব বিদ্যা পেয়ে গেছে’। তারপর উপমন্যু গুরুর আশ্রম থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন।

উপমন্যু পরে খুব বড় ঋষি হয়েছিলেন, তিনি বেদের কালের খুব নামকরা ঋষি ছিলেন। পরে তিনি ভগবান শিবের আরাধনা করেন। তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল ভগবান শিব যেন তাঁর সামনে এসে আবির্ভূত হন। তিনি নিজের মধ্যে সমস্ত কিছুকে সংযম করে হাতজোড় করে শিবের স্তুতি করতে শুরু করলেন। এই সময়ই তাঁর মুখ থেকে শিবসহস্রনাম স্তোত্র বেরিয়ে আসে। এটি শিবের খুব নামকরা স্তোত্র। প্রথমেই বলছেন ওঁ স্থিরঃ স্থাণুঃ প্রভুভীমঃ প্রবরো বরদো বরঃ। সর্বাভ্যা সর্ববিখ্যাতঃ সর্বং সর্বকরো ভবঃ। ১৪/১৬/৩১।

**মহাভারতে গঙ্গার মাহাত্ম্য** (গরুড়ের জন্ম কাহিনী – বালখিল্য ঋষিদের যজ্ঞ – গরুড়ের জন্ম – গরুড় কর্তৃক অমৃত হরণ – বিনতার দাসত্ব মোচন)

যুধিষ্ঠির আবার জিজ্ঞেস করছেন কোন দেশে কোন আশ্রমে আর কোথায় কোথায় নদী ঠিক ঠিক পূণ্য নদী? মহাভারতে গঙ্গাকে অত্যন্ত পূণ্য নদী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। গঙ্গার আগে ভারতে सिन्दु নদী পূণ্য নদী ছিল। আমাদের বেদে সরস্বতী নদীকে ঠিক ঠিক নদী রূপে স্তুতি করা হয়েছে। বলা হয় বেদের সময়কার ঋষিরা কিছুতেই সরস্বতী নদীকে ভুলতে পারলেন না। কিন্তু কোন কারণে সরস্বতী নদী শুকিয়ে যায়। তখন বিদেশীরা আর তাদের সাথে সাথে আমাদের দেশের কিছু বুদ্ধিজীবীরা বেদের ঋষিদের ধাপ্লাবাজ বলে দিলেন। পরবর্তি কালে সরস্বতী নদীর নামই দিয়েছিল পৌরানিক নদী, অর্থাৎ এটা নদী বলে কিছু ছিল না, এটা কল্পনার নদী। কিন্তু আদপেই এটা পৌরানিক নদী নয়। সরস্বতী নদী খুবই পবিত্র নদী। আর বেদের সময়ে সরস্বতী নদী সব থেকে বেশী পবিত্র নদী ছিল। সরস্বতী নদীর তীরে তখন অনেক সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। কিছু কাল আগে ঐতিহাসিকরা সরস্বতী নদীকে উদ্ধার করতে পেরেছেন। বেশীর ভাগ নদী হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়, সরস্বতী নদী কিন্তু উল্টো দিকে যায়, মানে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এটা খুবই তাই আশ্চর্যের। सिन्दु নদীও তিব্বত থেকে বেরিয়ে চীনের কিছু অংশকে ছুঁয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। সরস্বতী নদীর গতিপথও এই রকম ছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, ভূমিকম্প বা অন্য কোন ভৌগোলিক কারণে সরস্বতী নদীটা পরে শুকিয়ে যায়। শুকিয়ে যাওয়ার ফলে ধীরে ধীরে পুরোটাই হারিয়ে গেছে। কিছু দিন আগে স্যাটেলাইটের সাহায্যে ম্যাপিং করতে গিয়ে নদীর খাত গুলো বেরিয়ে এসেছে। এখন এনারা গবেষণা করে দেখলেন তাইতো এলাহাবাদের গঙ্গার সঙ্গম স্থলকে বলা হয় ত্রিবেণী, কারণ এখানে তিনটে নদীর সঙ্গম হয়েছে, গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতী। কিন্তু এখন আমরা যমুনা আর গঙ্গাকেই পাই, তাহলে সরস্বতী কোথায় গেল? আসলে সরস্বতী নদী কোন দিনই যমুনার কাছে আসেনি, সরস্বতী চিরদিনই ছিল सिन्दুর অববাহিকায়। সরস্বতী নদী শুকিয়ে যাওয়ার পর থেকে গঙ্গা নদীর মাহাত্ম্যটা বাড়তে শুরু করে। বর্তমান হিন্দু সমাজ পুরোপুরি দাঁড়িয়েছে গঙ্গার পবিত্রতার উপর। এই নির্ভরতাই আগে ছিল সরস্বতী নদীর উপর। পরের দিকে নর্মদা নদীরও খুব মাহাত্ম্য হয়। অবশ্য ঠাকুর আবার নর্মদা নদীর নাম করেননি, ঠাকুর বলছেন গঙ্গার তীরে জ্ঞান হয় আর যমুনার তীরে ভক্তি হয়। অন্য দিকে শঙ্করাচার্যের গুরু নর্মদার তীরে তপস্যা করতেন, তিনিও নর্মদার তীরে কিছু দিন তপস্যা করেছিলেন। এখনতো নর্মদার তীরে প্রচুর সন্ন্যাসীরা তপস্যা করছেন।

ভীষ্ম বলছেন তে দেশান্তে জনপদান্তেষুমাংস্তে চ পর্বতাঃ। যেষাং ভাগীরথী গঙ্গা মধ্যেনৈতি সরস্বরা।। ১৪/২৭/২৬। যে দেশ, যে ভূমির মাঝখান দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত সেই ভূমিই হল শ্রেষ্ঠতমো ভূমি। ভীষ্ম বলছেন বলেই নয়, সারা দেশের লোকেরাই গঙ্গার এই মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নিয়েছে। তবে যে যেখানে থাকে সে সেখানকার মাটি, নদী, বিগ্রহকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। দক্ষিণ ভারতেও অনেক নদী আছে, তারা সেই নদীকেই পবিত্র বলে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে যত উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা আছেন, তাঁদের স্বপ্ন হচ্ছে মৃত্যুর সময় যেন দু ফোঁটা গঙ্গাজল মুখে নিয়ে মারা যাই। কিছু দিন আগে দক্ষিণ ভারতের উপর একটা লেখা বেরিয়েছিল, সেখানে লেখক বলছেন, দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতে তীর্থ করে ফেরার সময় বাসে যদি বাসে জায়গা না পেত সেই সময় কণ্ঠস্বরকে যদি বলে দিত ভাই এই ব্যাগটা একটু সামলে রাখবেন এতে তীর্থম্ আছে। তীর্থম্ আছে শুনলেই সবাই সিট ছেড়ে দিত, আর এই ব্যাগে করে গঙ্গাজল নিয়ে যাচ্ছে শুনলে লোকেরা এদেরকেই প্রণাম করত। এগুলো কলেজের ছেলেরা মজা করে করত। ট্যাপের জল ভরে তীর্থম্ আছে মিথ্যে কথা বলে বাসে জায়গা করে নিত। সবাই যখন বলত আমাকে এক ফোঁটা গঙ্গাজল দিন। এরাও ঐ ট্যাপের জল একটু করে ছিটিয়ে দিত। আসলে এইটা দেখানো হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের লোকেরাও কিভাবে গঙ্গাজলকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে।

ভীষ্ম বলছেন স্পৃষ্টানি যেষাং গাঙ্গেয়ৈস্ত্যৈর্গাত্রাণি দেহিনাম্। ন্যস্তানি ন পুনস্তেষাং ত্যাগঃ স্বর্গাদ্বিধীয়তে।। ১৪/২৭/২৮। যাদের শরীর গঙ্গাজলে একবার সিক্ত হয়েছে, যদি সিক্ত নাও হয়ে থাকে যদি তার কোন

অস্তি গঙ্গাজলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, তার আর স্বর্গ থেকে কোন দিন পতন হবে না। যারা প্রথমে দিকে প্রচুর পাপকর্ম করেছে, কিন্তু পরে যদি গঙ্গায় স্নান করে নেয় তাহলে সব পাপ ধুয়ে যায়। যত অন্ধকারই থাকুক সূর্যোদয় হলে যেমন সব অন্ধকার পালিয়ে যায় ঠিক তেমনি গঙ্গায় যে স্নান করে সে যত পাপই করে থাকুক সব পাপ পরিষ্কার হয়ে যায়। গরুড়কে দেখলে যেমন সব সাপ পালিয়ে যায়, আর গরুড়কে দেখলেই যেমন কেউ সাপের বিষ থেকে মুক্ত হয়ে যায় ঠিক তেমনি গঙ্গা দর্শন মাত্রই সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

গরুড় হল নারায়ণের বাহন। কাশ্যপ মুনির চৌষটি জন স্ত্রী ছিল, এরা আবার সবাই বোন। এদের মধ্যে দুজনের নাম ছিল কদ্রু আর বিনতা। কাশ্যপ মুনি একবার এই দুই বোনের উপর খুব খুশী হয়ে বর দিতে চাইলেন। কদ্রু বর চাইল আমার হাজার খানেক সন্তান হোক আর এরা যেন খুব শক্তিমান হয়। কদ্রু সর্পজাতির জন্ম দিয়েছে। বিনতা দুজনে সতীন আবার বোনও, বিনতা বলল আমার হাজারটা চাইনা আমার দুটি সন্তান হোক যারা এই কদ্রুর সন্তানদের নিয়ন্ত্রণে রাখবে। কাশ্যপ দুজনকে বর দিয়ে দিলেন। কাশ্যপ মুনি একবার একটা যজ্ঞ করছেন। ইন্দ্র তাঁর সন্তান, দেবতাদের রাজা। ইন্দ্রকে কাশ্যপ মুনি অরণ্য থেকে কিছু অরণী কাঠ নিয়ে আসতে বললেন। ইন্দ্র খুব শক্তিমান পুরুষ, তিনি কয়েকটা বড় বড় অরণি গাছ কেটে নিয়ে আসছেন। আসার সময় ইন্দ্র দেখছেন কয়েকজন খর্বাকৃতি ঋষিদের সাথে দেখা হয়েছে যাঁদের শরীরটা হাতের বুড়ো আঙুলের মাপের ছোট ছোট। এই ঋষিদের নাম বালখিল্য। এনারা সব সময়ই তপস্যা করতে থাকেন। আর একা একা কখনই থাকেন না, পাঁচ ছয় জন এক সঙ্গে থাকবেন। কোন গাছের উপর উল্টো ঝুলে থেকে ঐভাবেই তপস্যা করতে থাকবেন। বালখিল্য ঋষিদেরও ইচ্ছে হয়েছে কাশ্যপ মুনির যজ্ঞে কিছু সেবা করবেন। কয়েকজন ঋষি মিলে জঙ্গলে গেছেন কিছু অরণি কাঠ সংগ্রহ করতে। বুড়ো আঙুলের মাপের এই তো ছোট্ট শরীর, কতটুকুই বা কাঠ আনবে। তাই পলাশ গাছে খুব ছোট্ট একটা পাতলা ডালকে বহু কষ্টে সাতজন মিলে কাঁধে করে নিয়ে আসছেন যজ্ঞে সাহায্য করতে। আসার সময় গরুর খুঁড়ে যে সামান্য গর্ত ছিল তাতে একটু জল জমে ছিল, ঐ কাঠের ভারে মাথা ঘুরছে বলে ঋষিরা সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছন না, দেখতে না পেয়ে ঐ গর্তের মধ্যে সব কজন ঋষি পড়ে গেছেন। পড়ে গিয়ে এখন সেখান থেকে বেরোতেও পারছেন না। ইতিমধ্যে ইন্দ্র সেখানে বালখিল্য ঋষিদের ঐ অবস্থা দেখে হাসতে শুরু করেছে। ইন্দ্র যে গাছগুলো নিয়ে যাচ্ছিল সেটাকে নিয়ে ঋষিদের ডিঙিয়ে চলে গেছে। তখন বালখিল্য ঋষিরা ইন্দ্রের এই আচরণে খুব ক্ষুব্ধ হয়ে গেছেন। ইন্দ্রের এত অহঙ্কার হয়ে গেছে! ঠিক আছে তোমার অহঙ্কার কিভাবে খর্ব করতে হয় দেখাচ্ছি! বালখিল্য ঋষিরা ঐখানে বসেই যজ্ঞ শুরু করে দিল। বালখিল্য ঋষিরা এমনিতেই খুব উচ্চকোটির ঋষি। তাঁরা এখন যজ্ঞ করতে শুরু করলেন এই সঙ্কল্প করে আরেকটা ইন্দ্রের জন্ম হোক, তারও এই রকম শক্তি হবে আর বর্তমান ইন্দ্রকে আমাদের ইন্দ্র পরাস্ত করে দেবে।

ঋষিদের যজ্ঞের সঙ্কল্পের কথা শুনে ইন্দ্রের তো ঘুম ছুটে গেছে। ইন্দ্র এখন কাশ্যপ মুনির কাছে ছুটে গেছেন। কাশ্যপ মুনি তখন নিজের যজ্ঞ বন্ধ করে দৌড়ে ঋষিদের কাছে এসেছেন ইন্দ্রকে বাঁচাতে। বালখিল্য ঋষিদের কাশ্যপ মুনি খুব আদর যত্ন, সম্মান করে ঠাণ্ডা করলেন। ঠাণ্ডা করার পর কাশ্যপ মুনি ঋষিদের জিজ্ঞেস করছেন ‘আপনারা এখানে কি করছেন?’ ঋষিরা বলল যজ্ঞ করছি। কাশ্যপ মুনি বললেন ‘কিসের জন্য যজ্ঞ করছেন?’ ‘আমরা একজন নতুন ইন্দ্রের জন্ম দেব’। ‘তা আপনারা যে নতুন ইন্দ্র করবেন কিন্তু ব্রহ্মা আগেই তো একজন ইন্দ্র করে রেখেছেন, এতে আপনারা ব্রহ্মাকে এইভাবে অপমান করে দিচ্ছেন না তো?’ ‘হ্যাঁ, তাই তো, আপনি ঠিকই বলছেন, এতে ব্রহ্মারতো অপমান হয়ে যাবে, তাহলে এখন কি হবে? যজ্ঞ যখন হয়েছে তখন তার ফলতো হবে’। তখন কাশ্যপ মুনি বললেন ‘এক কাজ করলে হয়, ইন্দ্রকে তো স্বর্গেরই রাজা হতে হবে, এখন দুজন ইন্দ্রকে তো স্বর্গের রাজা করা যাবে না, কিন্তু আকাশটাকেও তো স্বর্গ বলা হয়, তা আপনারা পাখিদের জন্য একজন ইন্দ্র করে দিন’। তখন ঋষিরা বললেন ‘এটা তো খুব ভালো বললেন, পাখিদের একজন ইন্দ্র হলে ভালোই হবে’। তখন গরুড়ের জন্ম হল। গরুড় হলেন পাখিদের ইন্দ্র। কিন্তু আগেই বর দেওয়া ছিল যে দ্বিতীয় ইন্দ্র আসল ইন্দ্রের থেকে বেশী শক্তিশালী হবেন, সব জায়গায় তাঁর অবাধ গতিবিধি থাকবে আর ইন্দ্রকে পরাজিত করতে পারবে। কাশ্যপ মুনি যখন দেখলেন এটাই যখন বিধান হয়ে গেছে তখন এটাকেই অন্য ভাবে কাজে লাগান হোক। এখন তিনি সেই বরটা বিনতাকে দিয়ে দিলেন।

কাশ্যপের বরে বিনতার দুটো ডিম হয়েছে। অন্য দিকে কদ্রুর হাজারটা ডিম হয়েছে। কিছু দিন পরের কদ্রুর ডিম থেকে সব বাসুকি আদি সাপ গুলো বেরিয়ে এসেছে। এদিকে পাঁচশ বছর হয়ে গেল বিনতার ডিম একটাও ফুটছে না। বিনতা তখন হিংসায় তাড়াতাড়ি করে একটা ডিমকে দিয়েছে ভেঙে। ভেঙে দিতেই ডিম থেকে একটা বাচ্চা পাখি বেরিয়ে



এসেছে যার উপরের অঙ্গটা তৈরী হয়ে গেছে কিন্তু নিজের অঙ্গটা তখনও তৈরী হয়নি। বেরিয়ে এসেই মা বিনতাকে খুব করে গালাগাল দিতে শুরু করেছে ‘তুমি একটা পাপিনী, ডিম ফোটার আগেই তুমি ফাটিয়ে দিয়েছ, তুমি আমার জীবনটাকে সর্বনাশ করে দিলে, আমি ঠিক সময়ে নিজের থেকে বেরোলে এমন শক্তিশালী হতাম কেউ ধারণাই করতে পারত না। ঠিক আছে তুমি যখন এই অন্যায় করেই ফেলেছ, আর হিংসের চোটে পাঁচশ বছর আগেই তুমি আমাকে ডিম থেকে বার করে দিয়েছ, তাই এই পাঁচশ বছর তুমি দাসীর জীবন কাটাবে’। এরপর আরও অনেক কাহিনী। ইতিমধ্যে কদ্রু আর বিনতার মধ্যে একটা বাজি হয়ে কদ্রু চালাকি করে বাজিতে জিতে বিনতাকে নিজের দাসী বানিয়ে নিয়েছে।

এদিকে পাঁচশ বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় ডিম থেকে গরুড় জন্ম নিয়েছেন। জন্ম নিয়েই তাঁর সেই বিশাল শরীর, আর সেই রকম শক্তিশালী। গরুড় যখন দেখল ভাইয়ের এই দুরবস্থা তখন তাকে পিঠে বসিয়ে সূর্যের কাছে দিয়ে এল, সেই থেকে গরুড়ের ভাই অরুণ সূর্যের সারথির কাজ করতে থাকল। অরুণোদয় মানেই সারথি অরুণের রথে করে সূর্য দেবতা আসছেন। গরুড় খুব শক্তিশালী কিন্তু তাঁর মাসি কদ্রু প্রায়ই এসে বলে এই গরুড় তুমি আমাকে এখানে নিয়ে চল, সেখানে নিয়ে চল। গরুড়ও ঘাড়ে করে যেখানে নিয়ে যেতে বলে সেখানে নিয়ে যায়। শুধু কদ্রুই নয়, তার সন্তান সাপগুলোও গরুড়কে চাকরের মত এসে বলে এই আমাদের এখানে নিয়ে চল, ওখানে নিয়ে চল। একদিন গরুড় কাঁদতে কাঁদতে এসে বিনতাকে বলছেন, এরা আমাদের কোন কাজ করে না উল্টে আমাকে কেন এদের কাজ করতে হয়। তখন বিনতা বলল কিভাবে কদ্রু মিথ্যে করে আমাকে দাসী বানিয়েছে। গরুড় গিয়ে তখন মাসি কদ্রুকে গিয়ে বলল ‘তুমি বল আমার মাকে আর আমাকে কি করলে তোমাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবে। তখন কদ্রু আর সাপেরা বলল যদি তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য অমৃত নিয়ে আস তাহলে তোমাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেব। সাপেদের এটাও একটা কৌশল, এরা ভেবেছে অমৃত যদি পেয়ে যাই তাহলে আমাদের আর কোন কিছুই প্রয়োজন হবে না, আর অমৃত যদি না আনতে পারে তাহলে বিনতা আর তার সন্তান গরুড় চিরকাল আমাদের দাসত্ব করতেই থাকবে।

গরুড় এবার চললেন অমৃত আনতে স্বর্গে। স্বর্গে গিয়ে গরুড় সরাসরি আক্রমণ করে বলছে আমি অমৃত নিয়ে যাব। সব দেবতারা একসাথে গরুড়কে আক্রমণ করেছে। কিন্তু গরুড় প্রচণ্ড শক্তিশালী, বালখিল্য ঋষিদের যজ্ঞের পূণ্য ফলে গরুড়ের জন্ম। গরুড় একাই সব দেবতাদের পরাজিত করে দিয়েছে। ইন্দ্রকে পরাজিত করে অমৃতের কলসকে নিজের পাঁজায় নিয়ে গরুড় এবার চলল। ইন্দ্র তখন গরুড়কে বলছেন ‘দেখো, তুমি অমৃত নিয়ে যাচ্ছ ঠিকই কিন্তু কদ্রুর সন্তানদের যদি অমৃত পান করিয়ে দাও তুমি নিজে আরও ফেঁসে যাবে। তুমি এক কাজ কর, কুশ ঘাসের একটা আসন বানিয়ে তার উপর এই অমৃত কলস রেখে দেবে। তাহলে আর সাপেরা পান করতে পারবে না’। ইন্দ্র এরপর গরুড়ের সাথে বন্ধুত্বও করে নিল। গরুড় এসে অমৃত রেখে দিয়েছে। সাপেদের বলল ‘এই নাও অমৃত’। এখন সাপগুলো যেমনি অমৃত পান করতে এসেছে কুশ ঘাসের ডগাতে লেগে সাপেদের জিভটা চিড়ে গেছে। সেই থেকে সাপেদের জিভ চেড়া থেকে গেল। সাপেরা আর অমৃত পান করতে পারল না, কারণ জিভটাই কেটে গেল। সাপেরা অমৃত পান না করতে পারায় গরুড় আবার দেবতাদের অমৃত ফিরিয়ে দিয়ে এসেছেন। এরপর দাসত্ব থেকেও মুক্ত হয়ে গেছে। মুক্ত হয়ে যাওয়ার পরে গরুড় এখন থেকে সাপ দেখলেই মারতে শুরু করল। আসলে আমরা জানি চিল বা বাজপাখি সাপ দেখলেই ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। মানুষ দেখে আসছে কিভাবে চিল, বাজপাখিরা সাপকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। ময়ূরকেও দেখলে সাপ পালিয়ে যায়।

ভীষ্ম বলছেন গরুড়কে দেখলে যেমন সব সাপ পালায়, ঠিক সেই রকম গঙ্গার দর্শন মাত্রেরই সব পাপ ধুয়ে যায়। শ্রীমাও বলছেন, যাদের শরীরে গঙ্গার পবিত্র বাতাস লাগে তারা পূণ্য হয়ে যায়। ভীষ্ম বলছেন, শুধু তাই নয়, গঙ্গায় স্নান, দর্শন, স্পর্শন করলে শুধু তার নিজেরই নয় তার আগের সাত পুরুষের সবাই উদ্ধার হয়ে যায়, আর পরে যে বংশধররা আসবে তারাও উদ্ধার হয়ে যায়। এগুলো বলা হয় মানুষের মনে একটা দিব্য সত্তার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি জন্মানোর জন্য।

### কন্যাদানের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পাত্র-পাত্রীর বয়সের ব্যাপারে মহাভারতের মত

এরপর যুধিষ্ঠীর প্রশ্ন করছেন কন্যাদানের কত রকম প্রক্রিয়া আছে। মহাভারত এই ব্যাপারে যা বলছে তার থেকে আরও বিস্তৃত ভাবে মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে। মহাভারতেও অনেক রকম কন্যাদানের প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে যেমন – প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস। এগুলো সবই মনুস্মৃতিতে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মহাভারতে বলা হচ্ছে আসুর আর রাক্ষস বিবাহ করতে নেই। আসুর মতে কন্যাপক্ষকে কোন ভাবে একটা প্রলোভন দিয়ে, টাকা দিয়ে মেয়েকে কিনে নেওয়া হয়। মহাভারত যদিও আসুর বিবাহকে এইভাবে বর্ণনা করেছে কিন্তু এইটাই যে সব সময় হয় তা

নয়, এই ধরনের বিবাহ বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে চলেছে। আমাদের ঠাকুরের বিবাহেই ঠাকুরের পরিবারের পক্ষ থেকে শ্রীমায়ের পরিবারকে টাকা দিতে হয়েছিল। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মেয়ে পক্ষই ছেলে পক্ষকে টাকা দেয়, যাকে ইদানিং বলছে পণ। রাক্ষস বিবাহ সব কালেই অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে মনে করা হয়। রাক্ষস বিবাহে ছেলে নিজে বা ছেলের বাড়ির লোকজনরা এসে বলে আমি তোমার মেয়েকে তুলে নিয়ে যাব। মেয়ের বাবা কিংবা বা আত্মীয়স্বজনরা যারাই রক্ষা করতে আসত তাদের মেরে পিটিয়ে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যেত, দরকার পড়লে মেয়ের বাড়ির কারুর গলা কাটতেও কোন দ্বিধা করত না। যেমন একটা সময় বহিরাগত মুসলমানরা হিন্দুদের মেয়েদের জোর করে তুলে নিয়ে বিবাহ করত, এগুলো সব রাক্ষস বিবাহের মধ্যে পড়ে। আমাদের পরম্পরাতে রাক্ষস বিবাহের অনুমতি দেওয়া হত না। মহাভারতে খুব মজার একটা ব্যাপার বলছে, বিবাহের বয়সের ব্যাপারে বলছে ছেলের বয়স তিরিশ আর মেয়ের বয়স দশ বছর হতে হবে। আজকাল কেউ এই বয়সের পার্থক্য মানবে না। আর তা নাহলে একুশ বছরের পুরুষ সাত বছরের মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে। মহাভারতের সময় এটাই অনুমোদিত ছিল, তিরিশ আর দশ আর তা নাহলে একুশ আর সাত। মহাভারতে আরও একটি অদ্ভুত মত আছে, একটা বয়স পর্যন্ত মেয়ে অপেক্ষা করবে, ঐ বয়সের মধ্যে বাবা-মা যদি একটা ভালো পাত্র জোগাড় করে দেয় তা হলে তো সব মিটে গেল, কিন্তু যদি জোগাড় না করতে পারে তাহলে তিন বছর কিংবা তিন মাসের মধ্যে মেয়ে নিজেই গিয়ে বিয়ে করে নিতে পারবে। এতে কোন পাপ লাগবে না। ভীষ্ম আবার বলছেন, টাকা দিয়ে দিলেই যে বিবাহ নিশ্চিত হয়ে যাবে তা নয়, যদি বিবাহের আনুষঙ্গিক কোন কিছু ঠিক ঠাক না হয় তাহলে যে কোন মুহূর্তে বিবাহকে বাতিল করে দেওয়া যেতে পারে। এগুলো আমরা এইজন্যই আলোচনা করছি এটা দেখানোর জন্য যে, তৎকালীন সমাজে যত রকমের রীতি নীতি প্রচলিত ছিল তার সব কিছুই মহাভারত তুলে নিয়ে এসে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছে।

অনুশাসনপর্ব এমন ভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে যে এর মধ্যে যত খুশী বিষয় বস্তু ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই নিয়েই পরের দিকে অনেক পণ্ডিত গবেষকরা মনে করতে শুরু করলেন অনেক অধ্যায় পরের দিকে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এই ব্যাপারে আমাদের জানার কোন পথ নেই। আর আমরা আগেই বলেছি, এই সব ব্যাপারে পরম্পরাতে যেটা বলা হয়েছে সেটাকেই আমাদের মেনে নিতে হয়। পরম্পরাতে বলে দিয়েছে এগুলো সবই ব্যাসদেব লিখেছেন, তখন আমরাও মেনে নিয়েছি ব্যাসদেবই লিখেছেন। যদি সত্যিই ব্যাসদেব না লিখে থাকেন তাহলে আমাদেরই কোন ঋষি লিখেছেন, এতে আমাদের কিছু আসে যায় না।

### ভারতে গরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও গোমাতার পূজার প্রচলনের ইতিহাস

এর মধ্যে লক্ষ্মী আর গরুর মধ্যে একটা সংলাপ আছে। যদিও এর কোন দার্শনিক মূল্য নেই কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রায়ই একটা প্রশ্ন ওঠে হিন্দুরা কবে থেকে গরুকে পূজা করতে শুরু করেছে। অনেকে বলেন বেদের সময় ঋষিরা গরুর মাংস খেতেন বলে গরুর প্রতি এই শ্রদ্ধাটা জাগিয়ে দিয়ে গোহত্যা বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু অনেকেই এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন। আলবারুনি একজন মুসলিম পণ্ডিত ছিলেন, যিনি ভারতে বসে ভারতের অনেক কিছুকে নিয়ে গবেষণা করেছেন, তিনিও বলছেন – অনেকে বলে ঋষিরা গরু খেতেন কিন্তু আরও অনেক ব্যাপার দেখে মনে হয় এই ধারণাটা ভুল। একজন মুসলিম পণ্ডিত এই কথা বলছেন। তিনি বলছেন ভারতের লোকের চিরদিনই গরুকে শ্রদ্ধা সম্মান করে আসছে। গরুকে কেন শ্রদ্ধা সম্মান করা হত এই নিয়ে আবার অনেক প্রশ্ন আছে। অনেকে মনে করেন গরুর দুধ আমরা খাই, তাই গরু মায়ের মত, আর গরু থেকে এত কিছু হচ্ছে, এই সব নানা রকম কারণ দেখান। কিন্তু মহাভারত যবে থেকে ভারতীয় সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে তবে থেকে গরুর মাহাত্ম্য অনেক বেড়ে গেছে। আর নানান রকমের কাহিনী আর প্রথা যেমন গরু দান করতে হয়, গরুকে প্রণাম করতে হয় আর পঞ্চ গব্যকে (দুধ, দই, ঘি, গোবর আর গোমূত্র) বেশীর ভাগ পূজোতে অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছিল। তবে এগুলোকে পূজা উপাচারের মধ্যেই নিয়ে আসা হয়েছিল। উপাচারের যদি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়া হয় তাহলে এর কোন ব্যাখ্যাই পাওয়া যাবে না। ইদানিং কালে মানুষ বিজ্ঞান মনস্কতার দিকে বেশী ঝুঁকি গেছে, তাই সব কিছুতেই এরা বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা খুঁজতে প্রয়াসী হন। আমাদের পূর্বজরা কেন খাওয়ার আগে আচমন করতেন, পশু-পাখিকে কেন খাওয়াতেন, অতিথিকে কেন পা ধোওয়ার জল দেওয়া হত ইত্যাদি যে উপাচার গুলো আমাদের গুরুজনদের পালন করতে দেখে আসছি, বা এর আগে আমরা যে অনেকবার পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা আলোচনা করেছি, যেখানে ব্রহ্মযজ্ঞ, ন্যযজ্ঞাদির কথা বলা হয়েছিল এগুলোর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারবে না আর হয়ও না। কোন এক সময় কোন এক ঋষি বলেছিলেন ‘তুমি যে আজকে এই শরীরটা নিয়ে জগতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ, তোমার পূর্বপুরুষদের অবদান আছে বলেই তুমি দাঁড়িয়ে আছ, তাঁদের প্রতি তোমার সম্মান, শ্রদ্ধা নিবেদন কর। কিভাবে করবে? তাঁরা এখন সূক্ষ্ম শরীরে আছেন, তুমি খাওয়ার আগে তাঁদের উদ্দেশ্যে

একটু আচমন করে অল্প জল দিয়ে দাও আর বছরে একবার শ্রাদ্ধ করে দেবে। পূর্বজদের প্রতি শ্রদ্ধার মাধ্যমে মহাজাগতিক সংযোগটাও সাধিত হয়ে গেল। হ্যাঁ, এটা কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নয় কিন্তু এটা হল আমার আপনার দৃষ্টিভঙ্গি। গোবর দিয়ে উঠোন নিকোলে বলা হয় জীবানু বা পোকামাকড়ের বংশবৃদ্ধি কমে যায়। কিন্তু কেউ কি পরীক্ষা করে দেখেছে যে পোকামাকড় কমে যায়? আমরা কেউ পরীক্ষা করতে যাবই না, আমরা এই রকমই করি, আমাদের পরম্পরাতে বলে দেওয়া হয়েছে। খ্রীস্টানরা রবিবার দিনই কেন চার্চে যায়? এই ধরনের হাজার রকমের প্রশ্ন করার কোন অর্থই হয় না। আমরা এই রকম করে আসছি আর এই রকমই করে থাকি, এরপর আর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। যদি কোন বড় ঋষি এসে নতুন কিছু বিধান দিয়ে দেন তখন সেটাই চলতে থাকবে। তুমি যদি নিজেকে যুক্তিবাদী বলে এগুলো পাল্টাতে চাও তাহলে তুমিও আগে বড় ঋষি হয়ে তোমার ক্ষমতা দেখাও তখন তুমি পাল্টাতে চাইলে পাল্টে দিতে পারবে।

আমাদের পরম্পরাতে আগে লেকচার দেওয়ার প্রথা ছিল না। এখন যেমন নোটিশ দেওয়া হয় অমুক শনিবার সন্ধ্যা ছয়টায় অমুক স্বামীজী কঠোপনিষদের উপর ভাষণ দেবেন। এই প্রথা ভারতে কখন ছিল না। আমাদের হিন্দু পরম্পরাতে কেশব সেন, স্বামী বিবেকানন্দ এনারাই প্রথম এই ধরনের লেকচারের প্রথা শুরু করেছিলেন। আসলে এটি খ্রীস্টানদের প্রথা। মুসলিম সম্প্রদায়ে যখন একত্রে নমাজ পড়া হয় তখন একজনের নেতৃত্বে পড়া হয়। সামনে একজন ইমাম বা কোন মৌলবী থাকবে আর তার পেছনে হাজার হাজার মুসলিম ভাইরা একদিকে মুখ করে নমাজ পড়ে যাবে। খ্রীস্টান ধর্মে এসে এই প্রথা পাল্টে যায়। সেখানে পাদরী বাইবেল থেকে কিছু পাঠ করবেন বা কিছু উপদেশ দেবেন, বক্তা একদিকে আর শ্রোতারা বক্তার দিকে মুখ করে সামনে বসে বা দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের প্রথাটা একেবারেই ভিন্ন রকম ছিল। একটা শাস্ত্রকে বেছে নেওয়া হত, একজন মুনি বা ঋষি সেটাকে ব্যাখ্যা করে যেতেন। আমাদের সাধুরা ছিলেন ব্যাখ্যাকার বা ভাষ্যকার। শাস্ত্রের যে কোন একটা শ্লোক নিয়ে সেটাকে ব্যাখ্যা করে যেতেন। আরেকটা প্রথা ছিল, কয়েকজন ঋষি একত্রিত হয়ে শাস্ত্রের কোন একটা শ্লোককে বিচার করতেন। সেখানে অবশ্য ঋষিদের শিষ্য আর আমন্ত্রিত কয়েকজন শ্রোতা ছাড়া আর কেউ থাকতেন না। বক্তৃতা দেওয়ার প্রথা আমাদের পরম্পরাতে আগে ছিল না। যারা সাধারণ অজ্ঞ লোক তাদের মনে নানা রকমের প্রশ্ন আসত, গোবরের এত মাহাত্ম্য কেন? আমাকে পঞ্চগব্যে গোমূত্র কেন খেতে হবে? কাউকে হয়তো জোর করে মুসলমান বা খ্রীস্টান করে দেওয়া হয়েছে, পরে তাকে যদি আবার হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে নিতে হত তখন একটু গোবর আর গোমূত্র খাইয়ে শুদ্ধি করে দেওয়া হত। একবার এক ব্রাহ্মণের ছেলে খ্রীস্টান হয়ে গিয়ে অনেক আজ্ঞে বাজে কাজ করতে শুরু করে। তখন ব্রাহ্মণরা তাকে অনেক বুঝিয়ে টুঝিয়ে বলছেন ‘যা হওয়ার বলছে একটু গোবর আর গোমূত্র খেয়ে নাও তাহলেই তুমি শুদ্ধ হয়ে যাবে’। তখন ছেলেটি বলছে ‘এতগুলো গরু খেয়ে পার করে দিয়েছি তাতে শুদ্ধি হল না, গোবর আর গোমূত্র আমাকে কি শুদ্ধি করবে’! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা তো শুনেই লাফিয়ে দশ হাত পিছিয়ে এসেছে। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে গোমূত্র বা গোবর খেয়ে আমার কি হবে? এগুলোর কোন উত্তর নেই। গরুকে আমরা মায়ের মত দেখি, আর আমরা এইভাবেই বড় হয়েছি। এর বাইরে আর কোন ব্যাখ্যা হতে পারে না। আর এটা সত্যিই দেখা যায় গোবর দিয়ে নিকোন হলে সেই জায়গাটা খুব পবিত্র থাকে আর অসুখ বিসুখও কম হয়।

একবার লক্ষ্মী অনেক অলঙ্কারাদিতে খুব সুন্দর ভাবে সজ্জিত হয়ে এক পাল গরুর মধ্যে যেখানে হাজারে হাজারে গরু ছিল সেখানে ঢুকে পড়েছেন। গরুগুলো লক্ষ্মীর এত বৈভব আর অলঙ্কার দেখে অবাক হয়ে বলছে ‘তুমি কে? তুমি কোথা থেকে এসেছ? এই রকম রূপ তো আমরা পৃথিবীতে কোন দিন দেখিনি। আমরা এই রূপ দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি’। লক্ষ্মী তখন বলছেন *লোককান্তাস্মি ভদ্রং বঃ শ্রীনামাহং পরিশ্রুতা। ময়া দৈত্যাঃ পরিত্যক্তা বিনষ্টাঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।* ১১৪/৭১/৬। ‘এই জগতে সবাই আমাকে চায়। আমার অনেকগুলো নাম আছে, যেমন শ্রী, ভদ্র ইত্যাদি। ময়া দৈত্যাঃ পরিত্যক্তা বিনষ্টাঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ, আমি যেদিন দৈত্যদের ছেড়ে দিলাম সেইদিন থেকে তারা চিরদিনের মত বিনষ্ট হয়ে গেল’। এর আগে আমরা বলিরাজার কাহিনীতে দেখেছিলাম, বলির শরীর থেকে লক্ষ্মী বেরিয়ে ইন্দ্রের শরীরের প্রবেশ করে গেল। আগে নাকি দৈত্যদের প্রচুর সম্পত্তি ছিল। কিন্তু লক্ষ্মী যেদিন থেকে দৈত্যদের ছেড়ে চলে গেলেন সেই থেকে আস্তে আস্তে দৈত্য জাতির সব কিছু হ্রাস হয়ে গেল। লক্ষ্মী বলছেন ‘আমার আশ্রয়ে ইন্দ্র, সূর্য, চন্দ্রমা আছে বলে তারা এত আনন্দ উপভোগ করছে’। এর থেকে এক ধাপ এগিয়ে লক্ষ্মী বলছেন ‘দেবতা ঋষিদের যে সিদ্ধি হয় সেটা আমারই কৃপাতে হয়’। এখানে লক্ষ্মী শ্রী অর্থে বলছেন, টাকা-পয়সার অর্থে বলছেন না। কারণ ঋষিরা কখনই লক্ষ্মীর পেছনে দৌড়ান না। লক্ষ্মী বলছেন ‘যার শরীরে আমি প্রবেশ করি না সে সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়ে যায়’। এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম লক্ষ্মী কার শরীরে বাস করেন। সেখানে আমরা মহাভারতের শ্লোকে পেয়েছিলাম যেগুলো মানবিক মূল্যবোধ বলা হয়, এই

মানবিক গুণগুলো যার মধ্যে আছে তার শরীরেই লক্ষ্মী বাস করেন। যারা খুব কর্মঠ, কর্মপটু, যারা ক্রোধরহিত, যার মধ্যে সত্ত্বগুণ আছে শ্রী তাদের মধ্যেই থাকে। যারা খুব ক্রুর, বাচাল, মিথ্যাচারী, এদের কাছে লক্ষ্মী আসেন কিন্তু কিছু দিন পরে চলে যান।

লক্ষ্মী বলছেন *ধর্মস্চার্শ্চ কামশ্চ ময়া জুষ্টাঃ সুখান্বিতাঃ। এবং প্রভাবাং মাং গাবো বিজানীত সুখপ্রদাম্।* ১৪/৭১/৯। ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটির ভোগ আমার সাহায্যেই হয়। এর আগে আলোচনায় আমরা আরেকটি পেয়েছিলাম, সেটা হল যশ। এই চারটে জিনিষ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও যশ তখনই হয় শ্রী যখন সঙ্গে থাকে। যশের অপর নাম শ্রী, যার জন্য নামের আগে শ্রী বা শ্রীমান লেখা হয়। শ্রীমান মানে যিনি শ্রীর মালিক, শ্রীর মালিক ভগবান বিষ্ণু, শ্রী হল লক্ষ্মী। যে পুরুষের শ্রী আছে যশ তারই হয়। আর লক্ষ্মী কখন ভেতরে আসেন? যখন কারুর মধ্যে মানবিক গুণগুলো বিদ্যমান থাকে। লক্ষ্মী গরুরদের বলছেন ‘হে গোবন্দ! তোমরা বুঝে নাও এটাই আমার প্রভাব। এবার আমার আগমন তোমাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য। আমি এবার তোমাদের মধ্যেই থাকব। তার ফলে তোমরা আরও শ্রী সম্পন্ন হয়ে যাবে। দেবতারা এমনিতেই শক্তিশালী তাদের ভেতরে আমি যখন প্রবেশ করে যাই তখন তাঁরা আরও শ্রী সম্পন্ন হয়ে ওঠেন। তোমরা গরুরাও আর শ্রী সম্পন্ন হয়ে যাবে’। গরুগুলো বলছে *অধ্রুবা চপলা চ ত্বং সামান্যা বহুভিঃ সহ। ন ত্বামিচ্ছাম ভদ্রং তে গম্যতাং যত্র রংস্যসে।* ১৪/৭১/১১। হে লক্ষ্মী দেবী! তুমি হলে অধ্রুবা, মেয়েদের স্বভাব অনুযায়ী তুমি চপলা, শান্ত তুমি কখনই থাকতে পারনা। তাই তুমি কোথাও বেশী দিন স্থির হয়ে থাকতে পারনা’। লক্ষ্মী কখন স্থির থাকতে পারে না এটা আমাদের শাস্ত্রই বলছে। লক্ষ্মী সারা দেশে নেচে নেচে বেড়াচ্ছেন, আজকে এখানে কাল সেখানে। আবার সারা পৃথিবীতে এই দেশে সেই দেশে নেচে নেচে বেড়াচ্ছেন। তাই কোন বিজ্ঞানসন্মতনকে যদি সাফল্য পেতে হয় তাহলে দেখতে হবে লক্ষ্মী এখন কোন এলাকায়, কোন রাজ্যের উপর নেচে বেড়াচ্ছেন। একবার বুঝে নিতে পারলে চোখ কান বুঝে সেখানে একশ একর জমি কিনে ফেলুক, তাহলে তাকে আর কেউ আটকাতে পারবে না। লক্ষ্মী যেখানে যাচ্ছে আগে থেকে তুমি সেখানে হাজির হয়ে গেছ, তোমাকে কে আটকাবে, তুমি এবার রাজা। ঠিক তেমনি লক্ষ্মী কোন একটা দেশে কক্ষণ স্থির থাকবেন না, এটাই তাঁর স্বভাব। কিন্তু লক্ষ্মী কোথায় থাকবেন তার কতকগুলো লক্ষণ আছে, এই লক্ষণগুলিকে ধরতে হবে। গরুরা এই কথাই লক্ষ্মীকে বলছে, তুমি অধ্রুব, চঞ্চল, তোমার মন কোথাও স্থির হয়ে থাকে না। গরুরা বলছে ‘তোমার একটা দোষ কি জান মা, তুমি একজনের সঙ্গে থাকতে পারনা, এক সঙ্গে তুমি অনেকের সাথে থাক। এই ধরণের চঞ্চলমতি নারীকে আমরা কি করে ভরসা করতে পারি। সেইজন্য মা, তুমি অন্য কোথাও যাও, আমাদের কিছু লাগবে না। আমাদের শরীর এমনিতেই সুস্থ ও সুন্দর, তুমি যে কৃপা করে আমাদের দর্শন দিয়েছ এতেই আমরা সন্তুষ্ট, তুমি এবার এস’।

লক্ষ্মী তখন বলছেন *কিমেতদ্বঃ ক্ষমং গাবো যন্মাং নেহাভিনন্দথ। ন মাং সম্প্রতি গৃহীধ্বং কস্মাদৈ দুর্লভং সতীম্।* ১৪/৭১/১৩। ‘এসব কি বলছ তোমরা! তোমরা আমাকে অভিনন্দনটুকুও করলে না! কস্মাদৈ দুর্লভং সতীম্, তোমরা কি সব বলছ আমি অনেকের সঙ্গে থাকি, আমি বিষ্ণু ছাড়া কারুর কাছে যাই না, আমি সতী। আর আমি দুর্লভং আমাকে অতি সহজে পাওয়া যায় না। আমি নিজে থেকে বলেছি আমি তোমাদের মধ্যে থাকব, তা সত্ত্বেও তোমরা এই রকম কথা কেন বলছ? আমাদের পুরনো প্রবাদই আছে অনাছত হয়ে কোথাও গেলে অপমানিতই হতে হয়। তোমরা না ডাকতেই তোমাদের কাছে আমি এসেছি, তাই তোমরা আমাকে এই ভাবে অপমান করছ’। লক্ষ্মী এমনিতে ভালো তো ভালো, কিন্তু যদি একবার মনে করেন আমাকে অপমান করা হচ্ছে তখন যেটা নিয়ে এসেছিলেন সেটাতো নিয়ে চলে যাবেনই সাথে সাথে আগে যা ছিল সেটাকেও নিয়ে বেরিয়ে যাবেন। লক্ষ্মী দেখছেন আমাকে না ডাকা সত্ত্বেও এসে গেছি বলে এরা আমাকে অপমান করতে পারল। সতীকেও নিমন্ত্রণ করা হয়নি, তা সত্ত্বেও বাপের বাড়িতে চলে গিয়ে অপমানিত হতে হয়েছিল। লক্ষ্মী বলছেন ‘এটা তোমাদেরই প্রভাব, আমি যে তোমাদের কাছে এইভাবে এসেছি, কিন্তু তোমরা আমাকে এই ভাবে অপমানিত করো না। আমি কোথাও অপমানিত হওয়ার যোগ্য নই’। গরুগুলো সেই একই কথা বলছে, তুমি এস। শেষে লক্ষ্মী খুব অপমানিত হয়ে বলছেন ‘না না তোমরা একটা কোথাও স্থান বল যেখানে আমি থাকব’। গরুগুলো তখন অনেক চিন্তা ভাবনা করে বলছে ‘দেখো মা! আমাদের শরীরের কোন স্থানই কুৎসিৎ নেই যেখানে তুমি থাকলে আমাদের সৌন্দর্য বাড়বে। তবে তুমি এক কাজ কর, আমাদের যে গোবর আর গোমূত্র, ঐগুলোতে তুমি বাস কর, আমাদের গোবর আর মূত্রও খারাপ কিছু পদার্থ নয়’। মানে গরু নিজের শরীরের কোথাও লক্ষ্মী বাস করতে দিল না। তাহলে লক্ষ্মী কোথায় থাকবে? আমার গোবর আর মূত্রে গিয়ে বাস কর। লক্ষ্মী তো প্রচণ্ড অপমানিত হয়ে গেছেন, বলছেন

‘আচ্ছা ঠিক আছে, যখন থাকতে দিয়েছ তখন আমি না হয় তোমাদের গোবর আর গোমুত্রেই বাস করব’। সেদিন থেকেই নাকি লক্ষ্মী গোবর আর গোমুত্রেই বাস করছেন। যারাই এই গোবর আর গোমুত্র ব্যবহার করবে লক্ষ্মী তাদের কাছেই আসবে। মহাভারত এইভাবে ভারতকে গোবর গোমুত্র ধরিয়ে দিল দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আর সেই থেকে সারা ভারত গোবর আর গোমুত্র ব্যবহার করে চলেছে কিন্তু ভারতের মাটি থেকে দারিদ্রতার অভিশাপটা কিছুতেই ঘুচল না। তবে বলা হয় ভারত আগে এত দরিদ্র দেশ ছিল না। তবে মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনীতে যে ছবিটা পাওয়া যায় তাতে অভাব অনটন দেখাই যায়। তাছাড়া জনসংখ্যার একটা বৃহৎ অংশ যারা শূদ্র চণ্ডাল ছিল, এদেরকে এনারা কোন কিছুর ধর্তব্যের মধ্যে রাখত না বলে জানা যায় না তাদের কি অবস্থাতে দিন কাটাতে হত। কিন্তু এখন সবাইকে জীবন-যাত্রার মূল স্রোতে নিয়ে আসার ফলে ঠিক ঠিক বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের দারিদ্রতা আছে। আগেকার দিনে শহরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যরা থাকত, আর এদের একটা স্বভাবই ছিল গরীবদের শোষণ করা। শহরের বাইরে শূদ্র চণ্ডালরা কিভাবে আছে কেউ দেখতেই যেত না। সেইজন্য শহরটুকু দেখেই বলেছিল ভারতে কোন অভাব নেই। কিন্তু অভাব ভারতে চিরদিনই ছিল। এই হল গোবর আর গোমুত্রের কথা।

### দানাদি গ্রহণের ফল ও উপবাসের ব্যাপারে মহাভারতের অভিমত

এরপর যুধিষ্ঠির একটা খুব মজার প্রশ্ন করছেন, দানাদি গ্রহণ করা কতটা ঠিক। দৈনন্দিন জীবন চালাতে গিয়ে যে ছোটখাটো জিনিষ গুলো প্রতিনিয়ত এসে যাচ্ছে এগুলোকে নিয়ে মহাভারত বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করছে। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞেস করছেন ‘যদি কোন ভালো ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধবাড়ির অন্ন গ্রহণ করে তাতে কি তার কোন ক্ষতি হয়? এই ব্যাপারে আপনার কি মত আমি জানতে চাই’। শ্রাদ্ধ বাড়ির অন্ন খাওয়া নিয়ে তখনও সমস্যা ছিল। ঠাকুরও ভক্তদের শ্রাদ্ধবাড়ির অন্ন খেতে নিষেধ করছেন। আসলে কি হয়, যেমনটি আমি অন্ন গ্রহণ করব আমার সত্তা তেমনটি হবে। আর যে যার অন্ন খাবে সে তার সত্তা পেয়ে যাবে। ঈশ্বরকে নিবেদন করা অন্ন খেলে ঈশ্বরের সত্তা পায়, সেইজন্য বলে প্রসাদ খেলে মুক্তি হয়। কিন্তু শ্রাদ্ধের অন্ন পিতৃদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, তাই শ্রাদ্ধের অন্ন পিতৃদের অন্ন। প্রসাদের তুলনায় শ্রাদ্ধের অন্ন নিকৃষ্ট। যারা আধ্যাত্মিক পথের যাত্রী, ভক্তিমার্গকে যারা অবলম্বন করেছে তাদের সেইজন্য শ্রাদ্ধের অন্ন খেতে নিষেধ করা হয়। আরেকটা হল, অল্প বয়সের কেউ মারা গেছে তারও খুব বিরাট করে শ্রাদ্ধ করছে, সেখানে খাওয়া-দাওয়া করতে কেমন একটা অস্বস্তি লাগে। আর তৃতীয় শ্রাদ্ধবাড়িতে খাওয়া মানে ফোকটে কিছু খাওয়া পাওয়া যাচ্ছ বলে অনেক আজোবাজে লোকরাও ঢুকে পড়ে। ভীষ্ম বলছেন, যারা কোন বৈদিক ব্রত পালন করছে না তারা যদি শ্রাদ্ধের অন্ন খায় তাতে তাদের কোন দোষ হয় না। কিন্তু যারা বৈদিক ব্রত পালন করছে তারা শ্রাদ্ধের অন্ন গ্রহণ করলে তাদের ব্রত ভঙ্গ হয়ে যায়।

যুধিষ্ঠির আবার প্রশ্ন করছেন, উপবাসকে তপস্যা বলা হয় এই ব্যাপারে আপনার কি ধারণা। উপবাসকে প্রত্যেক ধর্মে তপস্যার একটা খুব উচ্চ অঙ্গ মনে করা হয়। সেইজন্য মুসলমানরা তিরিশ দিন ধরে দিনের বেলা রোজা করে। খ্রীস্টান ধর্মেও উপবাসের প্রথা আছে। ভীষ্ম বলছেন, যারা পনের দিন, এক মাস ধরে উপোস করে থাকে এরা অহেতুক শরীরকে কষ্ট দেয়। যুধিষ্ঠির এখানে একদিন একাদশী বা পূর্ণিমা অমাবস্যার দিন উপোসের কথা জিজ্ঞেস করছেন না, যারা এক মাস, পনের দিন ধরে উপোস করে বসে থাকে তাদের কথা জিজ্ঞেস করছেন। ভীষ্ম তার উত্তরে বলছেন এরা মিছিমিছি শরীরকে কষ্ট দিচ্ছে। ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পথের সাধক তাদের জন্য ত্যাগের অনুশীলন করাই ঠিক ঠিক তপস্যা। দেখা যায় মানুষ যখন প্রচুর জপ-ধ্যান করা শুরু করে, প্রচুর সাধন ভজন করতে থাকে তখন সে নিজে থেকেই বুঝতে পারে ত্যাগই হল ঠিক ঠিক তপস্যা। একদিকে উপোস করে আছে অন্য দিকে ভেবে যাচ্ছে কখন উপোসটা ভাঙবে, তারপর শুধু দুধ কলা খাবে না, তার আবার বিরাট আয়োজন আগে থাকতেই ব্যবস্থা হয়ে থাকবে।

ভীষ্ম বলছেন ব্রাহ্মণদের ব্রত পারায়ণ হতে হয়। ব্রত পারায়ণ হল, যেদিন যেমন ব্রত থাকবে সেই ব্রতের নিয়ম অনুযায়ী সব কিছু পালন করে যাওয়া। যেমন মুসলমানদের রোজাতে দিনের বেলা না খেয়ে থাকতে হয়। এটা ব্রত, কিন্তু কোন কিছু নেই টানা পনের দিন না খেয়ে আছি এগুলোর কোন দাম নেই। একাদশীর দিন উপোস করে একাদশী ব্রত করলাম, চান্দ্রায়ণ ব্রত করলাম, নিশিপালন করলাম এই রকম একটা কিছু ব্রত করে উপোস করা ভাল। যাঁরা ব্রহ্মচারী, মুনি, এঁদের জন্য বেদের স্বাধ্যায়, এটাই এঁদের তপস্যা।

এখানে খুব সুন্দর বিশ্লেষণ করে বলছেন, যে সকালে আর সন্ধ্যা বেলাতে শুধু খায় আর তার মাঝখানে কিছু খায় না তাকে চির উপবাসী বলে গণ্য করতে হবে। শব্দটা হচ্ছে *অন্তরা সায়াশাশ্বৎ প্রাতরাশাশ্বৎ যো নরঃ। সদোপবাসী ভবতি যো ন ভুঙ্জেহন্তরা পুনঃ।।* ১৪/৭৯/১০ এখানে প্রাতঃ বলা হচ্ছে মানে সকালে সূর্যোদয়ের সময় অর্থাৎ সকাল ছটা সাতটার মধ্যে খেয়ে নিতে বলছেন আর সন্ধ্যা হতে না হতে খেয়ে নিতে হবে, এরা হলেন নিত্য উপবাসী, ঐর মত পুণ্য আর কারুর হতে পারেনা। আবার বলছেন, যে নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই থাকেন অন্য কোন নারীর সঙ্গ করে না, তাও বিশেষ বিশেষ দিন ছাড়া স্ত্রীর কাছে যায় না, এরা হলেন ব্রহ্মচারী। এমনিতেই একটা প্রবাদ আছে ‘এক নারী ব্রহ্মচারী’। শুধু নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই থাকে সেও ব্রহ্মচারী। যারা একটা জায়গাতেই মনকে সংযমিত রাখে, তাদের আর সন্ন্যাসী হওয়ার দরকার হয় না। গৃহস্থদের জন্য একটা অনুমোদন দিয়ে দেওয়া হল। যে নিয়মিত দান করে সে সত্যবাদী। আরেকটা কথা বলছেন, যে মাংস খায় না তাকে বলা হয় অমাংসাশী। যে সব সময় দান করে তাকে বলা হয় নিত্য পবিত্র। যে দিনে ঘুমোয় না তাকে বলা হয় নিত্য জাগ্রত। এই যে এখানে কয়েকটি অনুশাসনের কথা বলা হল, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে, স্ত্রী সঙ্গ নিয়ে, দান নিয়ে, ঘুমনো নিয়ে, এগুলোর মধ্যে একটা সাধারণ ব্যাপার আছে, সব কটিতেই কোথাও আমাদের মনকে সংযম করতে বলা হচ্ছে। আমরা যদি ঠিক করে নিই দিনে ঘুমবো না রাতেই ঘুমবো, তাহলে আমি হয়ে গেলাম নিত্য জাগ্রত যোগী। যদি আমি সকালে খেয়ে নিলাম আর সন্ধ্যার সময় খেয়ে নিলাম, সারা দিন আর সারা রাতে কোন সময় কিছু খেলাম না, তখন আমি হয়ে গেলাম নিত্য উপবাসী। যদি নিজের স্ত্রীকে ছাড়া অন্য কোন দিকে মন দিলেন না, তাও বিশেষ বিশেষ সময়, তখন আপনিও ব্রহ্মচারী হয়ে গেলেন। সব ক্ষেত্রেই মনটাকে ভোগ থেকে টেনে ত্যাগের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যখনই ভোগ থেকে ত্যাগের দিকে চলে গেল তখনই তাকে উচ্ছ্বাসে বসিয়ে দেওয়া হল। এটাই এগুলোর উদ্দেশ্য। যারা দেবতা, পিতৃ আর আশ্রিত, আশ্রিত বলতে অতিথি, চাকর-বাকর, পশুপাখি সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে, এদের সবাইর সাথে যদি অল্পকে ভাগ করে খাওয়া হয় তখন তারা মৃত্যুর পর অক্ষয় লোক পেয়ে যায়।

যুধিষ্ঠির এখানে একটা প্রশ্ন করছেন, দান যারা দেয় আর দান যারা নেয় এদের কি বৈশিষ্ট্য। এই ব্যাপারে ভীষ্ম এখানে একটা লম্বা কাহিনী বলবেন। বলছেন, যখন কোন ব্রাহ্মণ সাধুপুরুষ লোক থেকে দান গ্রহণ করে তখন সেই ব্রাহ্মণের দোষ যেটা হয় সেটা খুব অল্প হয়। কিন্তু অসাধুদের থেকে যদি দান গ্রহণ করা হয় তখন যে নিচ্ছে সে একেবারে পাপ সাগরে গিয়ে ডুবে যায়। কলকাতার এক ধর্মীয় সংস্থার সন্ন্যাসিনী নেত্রী তাঁর সংস্থার নামে যে জনকল্যাণ কাজ হত তার জন্য বিশ্বের যারা দান দেন তারা ক্রিমিনাল তাদের কাছ থেকে টাকা নিতেন। যাদের নামে যত রকম কুকীর্তির অভিযোগ আছে এদের কাছ থেকে টাকা নিতেন। এই টাকা তিনি আবার বিদেশে তাঁর সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে পাঠাতেন, সেইজন্য এই সন্ন্যাসিনীর উপর সদর দপ্তরের কর্তৃপক্ষরা খুব কৃতজ্ঞ ছিল। পরে সমস্ত টাকা ওখান থেকে ঘুরে অন্য জায়গায় যেত। এখানে টাকার একটা বিরাট চক্র কাজ করত। এই সন্ন্যাসিনীকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনি কেন কালো টাকা নিচ্ছেন। এখানে কালো টাকা দুটো অর্থেই, ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া আর আততায়ীদের রক্ত মাখা টাকা। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন Does money have colour? টাকার আবার রঙ হয় নাকি? এটাই পরে খুব নামকরা উক্তি হয়ে গিয়েছিল। মহাভারত এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, দান তুমি যে মুহুর্তে নিলে তার পাপটাও সেই মুহুর্তে নিয়ে নিলে। সৎ পুরুষদের থেকে নিলে কম, কিন্তু পাপীদের থেকে যদি টাকা নিয়েছ তোমাকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না, পাপ সাগরে গিয়ে ডুববেই ডুববে।

এই ব্যাপারে একটা কাহিনী ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন। এক রাজা আর সপ্তর্ষির মধ্যে কি হয়েছিল। আমাদের ঐতিহ্যে সপ্তর্ষির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন যুগে সপ্তর্ষিরা পাল্টে যান। সপ্তর্ষিরা ব্রহ্মার একেবারে শুদ্ধ মন থেকে জন্ম নিয়েছেন। ব্রহ্মা যখন প্রথম সৃষ্টির কাজ শুরু করেছিলেন তখন প্রথমে উনি মন থেকে সৃষ্টি করতে থাকলেন। সপ্তর্ষিরাও ব্রহ্মার মানসপুত্র। মহাভারতে এই সাতজন ঋষির নাম হল কাশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি। বিশ্বামিত্র নামটা খুব কমন নাম। মহাভারতেই বিশ্বামিত্রের নাম আসে যেখানে তাঁকে এক ক্ষত্রিয় রাজা রূপে দেখান হয়েছে, কিন্তু সপ্তর্ষির বিশ্বামিত্র অনেক আগেকার। এনাদের সঙ্গে আবার অরুন্ধতি ছিলেন, অরুন্ধতি হলেন বশিষ্ঠের স্ত্রী।

### সপ্তর্ষি ঋষি ও শিবী রাজার কাহিনী

এই সাতজন ঋষি আর অরুন্ধতি, এই আটজন একবার বিশ্ব পর্যটন করছিলেন। এঁদের সাথে একজন গণ্ডা নামে শূদ্রা স্ত্রীও ছিল যে এনাদের সেবা করত। গণ্ডার স্বামী পশুসখাও এই আটজনকে পরিচর্যা করত। একবার কয়েক বছর ধরে

গুরুতর অনাবৃষ্টি হয়েছিল, বৃষ্টি না হওয়াতে চারিদিকে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। দুর্ভিক্ষে সমস্ত প্রাণি বহু কষ্টে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করে যাচ্ছে। চারিদিকে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা চলছিল। অনেকদিন আগে শিবি রাজা এক যজ্ঞ করেছিল। সেই যজ্ঞে তিনি তার ছেলে রাজকুমার শৈব্যাকে যজ্ঞের ঋত্বিকদের দান করে দিয়েছিলেন। সেই শৈব্য এই দুর্ভিক্ষে অভুক্ত থেকে থেকে পথের মধ্যে মরতে বসেছে। ঋষিরা দেখলেন আমরাও ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছি আর এই বেচারাও মরতে যাচ্ছে, এখন এর নরমাংসই রান্না করে খেয়ে আমাদের প্রাণ রক্ষা করব। সেই সময় শিবি রাজা যদৃচ্ছাক্রমে সেখানে এসে হাজির হয়ে বলছে ‘আপনাদের এই অভক্ষ্য ভক্ষণ করতে হবে না যদি আপনারা আমার দান গ্রহণ করেন। আমি ব্রাহ্মণদের দান করতে সাতিশয় আল্লাদিত হই’। এই বলে শিবি সপ্তর্ষিদের দানের এক বিরাট লম্বা তালিকা দেখাচ্ছে সে কত কি দান করতে পারে। ঋষিরা তখন বলছেন ‘রাজার দান উপর থেকে খুব মিষ্টি বলে মনে হয় কিন্তু পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর। সেইজন্য আমরা আপনার দান গ্রহণ করতে পারছি না’।

চারিটেবল সংস্থাগুলিকে নিয়ে বার্গাড’শয়ের একটা খুব মজার নাটক আছে। তিনি বলছেন Every charitable organization has to live by selling themselves to the rich। যে কোন চারিটেবল সংস্থা, এই এনজিও গুলো এরা বড়লোকদের কাছে নিজেদের বিক্রী করে দেয়। তোষামদি না করলে এরা চলতেই পারবে না। এইটাই ঋষিরা বলছেন রাজার দান যদি নেওয়া হয় তখন তাকে রাজাকে তোষামদি করতে হবে। ঠাকুর জয়পুরের গোবিন্দজী মন্দিরের পূজারীর গল্প বলছেন। গোবিন্দজী মন্দিরের পূজারী তাঁর কি তেজ। একবার রাজা পূজারীকে ডেকে পাঠিয়েছে। পূজারী বলছেন ‘আমি কেন যাব রাজার কাছে, রাজার দরকার হলে সে আমার কাছে আসবে’। রাজা বুঝলেন পূজারীর খুব তেজ হয়েছে। রাজা এইবার পূজারীকে ধরে একটা বিয়ে দিয়ে দিলেন। বিয়ে দেওয়ার পর পূজারীর সব তেজ শেষ। এরপর থেকে সে নিজেই রাজার কাছে হাজির হয়ে যাচ্ছে। এই আপনার জন্য চরণামৃত নিয়ে এলাম, এই নির্মাল্য নিয়ে এলাম। আজকে ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ ছেলের পৈতে, লেগেই আছে। তখন রাজার কাছেই যেতে হচ্ছে। যেমনি কোন বড়লোকের কোন দান গ্রহণ কেউ করেছে সে মরেছে। সুফি সন্তরাও এই রকম ছিলেন। একবার নবাব সুফির সাথে দেখা করতে এসেছেন, সেই সুফি সন্ত পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে গেছে, নবাবের সাথে দেখাই করবে না। এই রকম অনেক ঘটনা আছে। তুমি এখানকার নবাব আর আমরা হলাম আল্লার যে সাম্রাজ্য সেখানকার নবাব, তোমাকে কেন আমি পাত্তা দিতে যাব। ঋষিরা বলছেন ব্রাহ্মণের শরীর তপস্যা দিয়েই শুদ্ধ হয়। এখানে ব্রাহ্মণ বলতে যে কোন তপস্বীকে, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী সবাইকে বলা হচ্ছে। সারা দিন তপস্যা করে ব্রাহ্মণ যে শুদ্ধি লাভ করে রাজার একটু দান গ্রহণ করলেই তার সব তপস্যা ধ্বংস হয়ে যায়। কেউ যদি ঠিক করে আমি আধ্যাত্মিক সাধনা করব, তপস্যা করব, তারপর সে যদি এর তার বাড়িতে খেয়ে বেড়ায়, যার তার কাছ থেকে উপহার নিতে থাকে তাহলে বুঝে নিতে হবে তার সব তপস্যা শেষ। সেইজন্য আধ্যাত্মিক সাধককে অপরিগ্রহ হতে হয়, কারুর কোন দান বা উপহার নিতে নেই, আর বড়লোকের দান তো কোন মতেই নেওয়া উচিত হবে না। ঋষিরা তখন শৈব্যাকে বলছেন, আপনার ধন-সম্পদ আপনার কাছে থাকুক আমরা আমাদের তপস্যা নিয়ে থাকি।

ঋষিদের কথায় রাজার আত্মসম্মানে খুব আঘাত লেগেছে। রাজা তখন মন্ত্রীদেব ইশারা করে ছোট ছোট ফল পেরে নিয়ে আসতে। মন্ত্রীর ফল নিয়ে আসার পর রাজা সেই ফলের মধ্যে সোনার মোহর ভরে দিয়েছে। সেই ফলগুলো নিয়ে ঋষিদের দেওয়ার জন্য আবার এসে হাজির হয়েছে। ঋষিরা ফলগুলো নিয়েছেন, নিয়ে ভাবছেন এই ফলগুলো এত ভারি লাগছে কেন। তখন অত্রি ঋষি বলছেন ‘আমি বুঝতে পারছি তোমরা চালাকি করে ফলের মধ্যে সোনা ভরে দিয়েছ, আমাদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়নি। তোমার সোনা যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে আমাদের ইহলোক ও পরলোক কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে’। এটা একেবারে নিশ্চিত, কোন সাধু, সন্ন্যাসী, ত্যাগী পুরুষ, যাঁরা তপস্যা করছেন, যদি তাঁদের কাছে জিনিষপত্র থাকে, ধন সম্পদ থাকে, তাহলে বুঝে নিতে হবে তার তপস্যা শেষ হয়ে গেছে। ঠাকুরও বলছেন যে সাধুর কাছে তল্পি তল্পা থাকে, কাপড়ে গিট আছে তাদের বিশ্বাস করতে নেই। ওর মন কোথাও কোন ভাবে বিষয়ে চলে গেছে।

কাশ্যপ ঋষি তখন বলছেন *যৎ পৃথিব্যাং ত্রীহিবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। সর্বং তন্মালমেকস্য তস্মাদ্বিহান্ শমং চরেৎ।* ১১৪/৭৯/৪৪। ‘এই পৃথিবীতে যত ধন-সম্পদ আছে, যত নারী আছে, যত অন্ন আছে এর সবটাই যদি কেউ পেয়ে যায় তাতেও কিন্তু সে কখন সন্তুষ্ট হবে না। সেইজন্য নিজের বিষয় তৃষ্ণাকে শান্ত করতে হয়’। যখনই কোন সাধু সন্ন্যাসী টাকা পয়সা সঞ্চয় করতে শুরু করে তখন সেই সাধু কিছু সঞ্চয় করেছে না, এই টাকা-পয়সাই তাকে গ্রাস করে ফেলে। তখন আর সে এগুলোর মায়া ত্যাগ করতে পারবে না। বড়লোকেরা কখন দান-ধ্যান করে না, যারা সাধারণ তারা

করে। বড়লোকেদের মধ্যে সাম্য বুদ্ধি কখনই থাকে না। পরস্পরের মধ্যে যে প্রীতি সৌহার্দ হয় সেটা সম অবস্থা সম্পন্ন লোকেদের মধ্যে তৈরী হয়। কম্যুনিজম কোথায় জন্ম নেয়? যেখানে অভাব, দুঃখ, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা আছে সেখানেই মানুষ একত্রিত হয়, ঐখান থেকেই কম্যুনিজমের জন্ম হয়। সেইজন্য কম্যুনিজমের খুব পুরনো নীতিই হচ্ছে লোকেরা যাত শিক্ষা না পায়, তাদের স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়ে যাক, দরিদ্র হতে থাকুক, তা নাহলে কম্যুনিজম আসতেই পারবে না। সবারই যদি টাকা-পয়সা হয়ে যায়, সবারই যদি স্বাস্থ্য ভালো থাকে তাহলে তো আর কেউ কম্যুনিজমের দিকে যাবে না। যেখানে অভাব সেখানেই কম্যুনিজমের প্রতিপত্তি। কারণ যারা অভাবে থাকে তারা একজোট হয়ে যায়। একটা পরিবার যখন গরীব থাকে তখন মা, বাবা, ভাই, বোন সবাই এক সঙ্গে থাকে। কিন্তু যেই কারুর টাকা-পয়সা আসতে শুরু করে তখন আস্তে আস্তে সবাই আলাদা হয়ে যেতে চায়। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। অর্থ কখনই মিলন করায় না, সব সময়ই বিচ্ছেদ করায়। আমাদের যদি দু মিনিট ভাবতে দেওয়া হয়, আমরা ভাবব আমার যদি দশ বিশ লাখ টাকা হয়ে যায় তাহলে আমার শান্তি হয়ে যাবে। কিন্তু কোন দিন শান্তি হবে না। টাকা-পয়সা হল মরীচিকার মত। টাকা-পয়সার পেছনে আমরা জীবনভর দৌড়াতেই থাকব, শান্তি কোন দিন আসবে না। এইটাই কাশ্যপ ঋষি বলছেন, জগতের যত যা কিছু সম্পদ আছে সব আমার, যত সুন্দরী নারী সব আমার, সব টাকা-পয়সা আমার তাতেও আমার তৃষ্ণা মিটবে না। সেইজন্য তৃষ্ণাকে শান্ত করতে হয়। আমরা যে অবস্থায় আছি, যা কিছু নিজে থেকে আসছে, যেটা চেষ্টা করে আসছে এতেই যদি সন্তুষ্টি না হওয়া যায় তাহলে আমাদের কষ্টের শেষ কোন দিন হবে না।

ঋষি বলছেন, গরুর বাছুর যখন জন্ম নেয় তখন থেকেই সে মাথায় শিং নিয়ে জন্মায়। যেমন যেমন বড় হতে থাকে তার শিংও তেমন তেমন বড় হতে থাকে। তৃষ্ণাও ঠিক তেমন সবার সঙ্গে সঙ্গে বড় হতে থাকে। গৌতম মুনি বলছেন *ন তল্লোকে দ্রব্যমস্তি যল্লোকে প্রতিপুরয়েৎ। সমুদ্রকল্পঃ পুরুষো ন কদাচন পূর্যতে।* ১৪/৭৯/৪৬। ‘জগতে এত দ্রব্য নেই যা দিয়ে মানুষের সব আশাকে পূরণ করে দিতে পারে। আশা হল সমুদ্রের মত। জগতের এত দ্রব্য নেই যা দিয়ে একজন পুরুষের এই আশার সমুদ্রকে পরিপূরণ করা যেতে পারবে।’ মানুষের আশা সমুদ্রের মত, ঢেলে যাব কিন্তু কোন দিন পূরণ হবে না। বিশ্বামিত্র ঋষি বলছেন তৃষ্ণা রূপ তীর মানুষকে সব সময় বিদ্ধ করতে থাকে। যেমনি একটা তৃষ্ণা পূর্ণ হয়ে যায় তেমনি আরেকটা তৃষ্ণা এসে যায়। আবার বলছেন ব্রাহ্মণের সম্পদ তপস্যা, এখানে ব্রাহ্মণ বলতে কিন্তু তপস্বী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী সবাইকে বলা হচ্ছে। প্রতিগ্রহ নিলেই সব তপস্যার নাশ হয়ে যাবে। অরুন্ধতি তখন সব শুনে বলছেন ‘কিছু কিছু লোক মনে করে এই জগতে ধর্ম সাধনের জন্য অর্থের প্রয়োজন কিন্তু আমার মতে সঞ্চয় যদি করতে হয় তাহলে তপস্যার পরেই সঞ্চয় করতে হয়’। ঠাকুরকে একজন বলছেন টাকা থাকলে কত লোকের উপকার করা যায়, ডিসপেন্সারি করা যায়, কুপ খনন করা যায়। ঠাকুর তখন বলছেন – তোমার সামনে যদি ভগবান এসে হাজির হন তখন তাঁর কাছে কি কটি হাসপাতাল, কটি ডিসপেন্সারি করতে চাইবে। সাধুজীবনে প্রথম দিকে অনেকের মন হতে পারে ঠাকুর কেন এই কথা বললেন, লোকের মঙ্গলের জন্যই তো এগুলো করতে চাইছে। কিন্তু বয়সের সাথে সাথে যখন ঠিক ঠিক বোধদয় হয় তখন বোঝা যায়, একটা বয়সে এগুলো শুনতে খুব ভালো লাগে লোকের উপকার করব, কিন্তু শেষমেশ তপস্যাটাই একমাত্র থাকবে, তপস্যাই একমাত্র গুরুত্ব। কিন্তু এসব কথা সবাইকে বলাও যায় না।

গণ্ডা বলে যে শূদ্রা মেয়েটি ঋষিদের সেবা করছিল, তাকেও রাজার মন্ত্রীরা ঐ ফল দিয়েছে। ‘আমার যাঁরা স্বামী, যাঁদের আমি সেবা করছি, এনারা এত বড় তপস্বী আর এনারাই এত ভয় পাচ্ছেন আমার সাহসই হচ্ছে না এই ফল নিতে’। এই বলে সেও ঐ ফল ফেরত দিয়ে দিয়েছে। তার স্বামী পশুসখ সেও বলছে আমার লাগবে না। এই হয়, গণ্ডা, পশুসখ এরা কত সাধারণ কিন্তু সৎ পুরুষের সঙ্গ করে করে, ঋষিদের সঙ্গে থেকে থেকে এদের মনটাও বিষয় তৃষ্ণা থেকে সরে এসেছে। রাজার দান প্রত্যাখ্যান করাতে রাজা খুব রেগে গেছে। রাজা বলছে আমাকে এত অপমান করেছে! ঠিক আছে আমি এর বদলা নেব। শিবী রাজা তড়িঘড়ি করে একটা যজ্ঞ করে সেখান থেকে একটা কৃত্যকে দাঁড় করাল। কৃত্য একটা রাক্ষসী। কৃত্য তৈরী হতেই রাজা তাকে আদেশ দিল ‘তুমি এক্ষুণি জঙ্গলে যাও, সেখানে সাতটা ঋষিকে পাবে, নাম জিজ্ঞেস করে নামানুরূপ কার্য অবগত হয়ে সাতটা ঋষিকে একটা একটা করে খেয়ে ফেল। আমাকে এই ভাবে অপমান করেছে! আমার দান প্রত্যাখ্যান করেছে! সব কটা ঋষিকে শেষ করে তুমি তারপর তোমার যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারবে’। কৃত্য তাড়াতাড়ি একটা মোটাসোটা সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করে একটা কুকুরকে নিয়ে জঙ্গলে ঘুরছে। ঋষিরা তাকে দেখে ভাবছে এই দুর্ভিক্ষে অভাবের দিনে এত মোটাসোটা হয়ে গেল কি করে। এরপর অনেক লম্বা কাহিনী। কৃত্য আসলে এক রাক্ষসী। যাই হোক কৃত্য এখন ঋষিদের নাম জিজ্ঞেস করে তার অর্থ জানতে শুরু করেছে। প্রথমে অত্রি ঋষি তাঁর নাম বলেছে, নামের অর্থও বলেছে; কিন্তু কৃত্য সেই নামের অর্থ বুঝতে পারল না। এই করে কারুর নামের অর্থই সে



বুঝতে না পেরে কাউকেই মারতে পারছে না। যেমন গৌতম মুনি বলছেন, গো মানে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গুলিকে আমি সংযম করে নিয়েছি তাই আমার নাম গৌতমো। আমার শরীরের যে কান্ধি (গো), সেই কান্ধি অন্ধকারকে দূর করে, সেইজন্য আমার নাম গৌতমো। কৃত্য নামের অর্থ শুনে বলল ‘আমি তোমার নামের অর্থ বুঝতে পারছি না’। অর্থ বুঝতে পারছে না বলে গৌতমোকে ছেড়ে দিল। এই করে করে কারুণ্য নামের অর্থ সে বুঝতে পারল না। তখন ঋষিরা বুঝতে পারলেন এই সন্ন্যাসী আসলে কৃত্য। তখন ঋষিরা তাঁদের তপস্যার জোরে এই কৃত্যকে নাশ করে দিয়েছেন। এখানে সাতজন ঋষিদের নামের কি ব্যাখ্যা আর নামের সাথে তাঁদের কি কর্ম সেটাকে এখানে বলা হয়েছে। কৃত্য যে এখানে ফাঁসল কারণ সে লোভ করতে গিয়েছিল। শেষে বলছে *তস্যাং সর্বাস্ববস্থাসু নরো লোভং বিবর্জয়েৎ। এষ ধর্মঃ পরো রাজংস্তস্মাল্লোভং বিবর্জয়েৎ। ১৪/৭৯/১৪৫*। সব অবস্থাতে লোভকে বর্জন কর। এই যে লম্বা কাহিনী বলা হল, কৃত্য ঋষিদের মারতে এসেছিল, মারতে এসে সে লোভে পড়ে গেছে। সেইজন্য মানুষকে বলা হচ্ছে সব অবস্থাতেই লোভকে বর্জন কর, লোভে কখন পড়বে না। এটাই পরম ধর্ম, সুতরাং হে রাজা যুধিষ্ঠির তোমার লোভ ত্যাগ করা উচিত।

গীতা আর উপনিষদের তত্ত্বকে বোঝা বা ধারণা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই দুর্লভ। সেইজন্য যাঁরা ভক্ত কিন্তু শাস্ত্রীয় তত্ত্ব বুঝতে পারেন না, তাঁরা গ্রন্থ সেবা করেন। গ্রন্থ সেবা মানে রোজ গীতা বা অন্য কোন শাস্ত্র বুঝুক বা না বুঝুক একটি কি দুটো অধ্যায় নিয়মিত পাঠ করে যান। মুসলমানদের মধ্যে একটা পরম্পরা আছে, যদিও এই পরম্পরাকে অনেকেই মানতে চায় না। মহম্মদ সিদ্ধি লাভ করার পর তাঁর মুখ থেকে কোরান বেরিয়েছে। সেই সময় মহম্মদের বাড়িতে কিছু সাধক সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে আল্লার চিন্তায় দিনরাত মত্ত হয়ে থাকত। এদেরই মধ্য থেকে নাকি পরে সুফি সম্প্রদায় বেরিয়ে এসেছিল। সুফিরা খুব গর্ব করে বলে হজরত মহম্মদের দুই রকমের শিক্ষা, একটা শিক্ষা সাধারণ মানুষের জন্য, যেটা কোরানে পাওয়া যায়, আরেকটি শিক্ষা হল ঠিক ঠিক শিক্ষা যেটা পরম্পরাতে চলে আসছে। মহম্মদের আসল যে শিক্ষা তিনি সেটা আমাদের দিয়েছিলেন, সেখান থেকে আমরা এই শিক্ষাকে পরম্পরা গত ভাবে ধরে রেখেছি, তাই আমরাই আসল তত্ত্বটা জানি। এটা সুফিদের দাবী। যেটা আমরা উপনিষদে বলি গুরুমুখী বিদ্যা। এই আসল শিক্ষার কথা এক সুফি আরেক সুফিকেই বলবে, গুরু শিষ্যকে বলবে, তার বাইরে আর কাউকে বলবে না। সুফিরা বলে আমরা এই শিক্ষা সরাসরি মহম্মদের মুখ থেকে পেয়েছি। হজরত মহম্মদ কোথা থেকে পেয়েছেন? সেই আল্লা থেকে। বেদে যে পরম্পরা চলে সেই একই পরম্পরা সুফিরাও অনুসরণ করে। মুসলমানরা যখন সুফিদের উপর অত্যাচার শুরু করল এই বলে যে সুফিরা ধাপ্লাবাজ তখন সুফিরা এই নিয়ে কোন গ্রাহ্যই করল না। সুফিরা এখনও বলে, আমরা যা যা অনুশীলন করে আসছি এগুলো মহম্মদের বাড়িতে বসেই করতাম। সুফিদের যা কিছু সাধনার পদ্ধতি আছে তার পুরোটাই আধ্যাত্মিকতাতে নিবেদিত। সাধারণদের জন্য কোরান, এটাই সুফিদের বক্তব্য। যেমন মহাভারতে অনেক রকম কথা বলা আছে, সেই রকম কোরানেও অনেক রকম কথা বলা আছে। কিন্তু আসল যে শিক্ষা বা তত্ত্ব সেটা মহম্মদ নাকি সুফিদেরই দিয়েছিলেন। ঠিক তেমনি গীতা, উপনিষদ হল যারা আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত তাদের জন্য। মহাভারত সাধারণ লোকদের জন্য। সাধারণ মানুষের যে দৈনন্দীন সমস্যা, তাদের যে চিন্তা ভাবনা এইগুলোকে নিয়ে মহাভারত আলোচনা করছে। শুধু তত্ত্ব যদি জানতে হয় তাহলে আমাকে গীতা উপনিষদ পাঠ করতে হবে। গীতা উপনিষদের তত্ত্বকে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনা, যে জিনিষকে মানুষ কম বুঝবে সেটাকে ততই গভীর মনে হবে, এটাই নিয়ম।

### ভগবান বিষ্ণুকে প্রসন্ন করার বিবিধ বিধি নিয়মাদি

অনুশাসনপর্বেও যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করে যাচ্ছেন আর ভীষ্ম উত্তর দিচ্ছেন। যুধিষ্ঠিরের একটি প্রশ্নে ভীষ্ম বলছেন, একবার দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন আপনি কোন কর্মের দ্বারা প্রসন্ন হন, আপনি কিভাবে সন্তুষ্ট পান। ভগবান বিষ্ণু বলছেন ‘ব্রাহ্মণের নিন্দা করাতে আমাকেই দ্বেষ করা হয় আর ব্রাহ্মণের পূজো করাই হল আমার পূজো’। এখানে এই শ্লোকের গুরুত্ব হল, অনেকে মনে করেন মহাভারতে এই ধরণের শ্লোকগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে ব্রাহ্মণরা সমাজের আপামর মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। স্বামীজীকে অনেক ভুলবশতঃ মনে করে তিনি জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু স্বামীজী কখনই জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন না। জাতিপ্রথা নিয়ে স্বামীজী অনেক কথাই বলেছেন, কখন এই প্রথার বিরুদ্ধে বলেছেন, কখন জাতিপ্রথার ভালো দিকগুলোকে তিনি প্রশংসা করেছেন। কিন্তু একটা জিনিষ স্বামীজী বারবার বলেছেন সেটা হল, জাতিপ্রথার নামে যে সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয় এটাকে সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করতে হবে। ব্রাহ্মণরা তখন জাতিপ্রথাকে ব্যবহার করে প্রচুর সুযোগ সুবিধা নিতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এইখানে ব্রাহ্মণদের যে সম্মান করার কথা বলা হচ্ছে, আসলে বিদ্যা আর তপস্যাকে সম্মান করার কথা বলা হচ্ছে।

রিচার্ড ফাইনম্যান খুব নামকরা পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন, নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন। জাতিতে তিনি জহুদি ছিলেন। জহুদিদের মধ্যে বিদ্যাকে খুব সম্মান করা হয়। তিনি তাঁর একটি স্মৃতিকথায় লিখছেন, একবার তিনি এক জহুদি বৃদ্ধার কাছে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ফিরে আসার সময় সেই বৃদ্ধা ফাইনম্যানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলছে আজকে আমার জীবনের একটা বিরাট গর্বের দিন, আজকে আমার সঙ্গে এক আর্মির জেনারেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে আর একজন প্রফেসরের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ফাইনম্যান তখন লেকচারারই ছিলেন, তখনও নোবেল প্রাইজ পাননি আর কোন নামডাকও হয়নি। ফাইনম্যান তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন যে সমাজে বিদ্যাকে এত সম্মান করা হয় সেই সমাজ কোন দিন নষ্ট হতে পারে না। একজন আর্মির জেনারেলকে সামান্য একজন লেকচারারের সাথে এক করে বৃদ্ধা গর্ব করে বলছেন আমার আজ কি গর্বের দিন, আমার বাড়িতে একজন আর্মি জেনারেল এসেছেন আর একজন প্রফেসর এসেছেন। স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের যে নিয়মাবলী তৈরী করে দিয়ে গেছেন, সেখানে তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন বিদ্যাচর্চার অভাবে সজ্ঞের অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যেদিন রামকৃষ্ণ মিশনে বিদ্যাচর্চা বন্ধ হবে বুঝে নিতে হবে সেদিন থেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের পতন শুরু হবে। যে কোন সম্প্রদায়কে যদি বিনাশ করে দিতে হয় শুধু শিক্ষার প্রতি যে সম্মান সেই সম্প্রদায়ের আছে ওটাকে নাশ করে দিতে হবে, আর কিছু করতে হবে না। ভারতে যে ব্রাহ্মণদের এত সম্মান করা হয় শুধু তাদের বিদ্যা আর তপস্যার জন্যই সম্মান করা হয়। শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে এক জায়গায় বলছেন ‘অগস্ত্য মুনি তপস্যা করেছিলেন, সমুদ্র পান করে নিয়েছিলেন, সেইজন্য আজকেও ব্রাহ্মণকে পূজা করা হয়’। কেন ব্রাহ্মণকে সম্মান ও পূজা করা হয়? কারণ তাঁর পূর্ব পূর্ব পুরুষদের পাণ্ডিত্য ছিল আর তাঁরা তপস্যা করেছিলেন।

বেলুড় মঠে একটা ঘটনা আছে। তখনও মন্দির নির্মাণ হয়নি, পুরনো মন্দিরেই ঠাকুরের পূজা হয়। সেই সময় একদিন একজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী মন্দিরে ঠাকুরের সামনে বসে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করছেন। দুজন অল্প বয়সী সাধু মন্দির থেকে প্রণাম করে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সেই সঙ্গীত শিল্পীকে নকল করে গলা দিয়ে বিদ্যুটে এ্যা এ্যা শব্দ করছিল। তাদের ঠিক পেছনেই মহাপুরুষ মহারাজও (স্বামী শিবানন্দ মহারাজ) নামছিলেন। উনি সাধুদের ঐ আওয়াজ শুনে একেবারে থ হয়ে গেছেন। নিজের ঘরে গিয়ে সেবককে বললেন ‘আমি বেলুড় মঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এখানে আর বিদ্যার সম্মান নেই। যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী এসেছেন তাঁকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে না, বিদ্যার সম্মান দেওয়া হচ্ছে না, ঠাকুর আর এখানে নেই। আমি চললাম’। তিনি তখন মঠের প্রেসিডেন্ট। মঠে তো বিরাট হৈচৈ পড়ে গেছে। মঠের প্রেসিডেন্টই রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বেরিয়ে চলে যাবেন। তারপর তো সেবকরা দৌড়ে গিয়ে ডাইনিং হলে খবর টবর দিয়ে খোঁজ নিতে বললেন কে অপমান করেছে। ইতিমধ্যে যে দুজন সাধু নকল করেছিল তারা তো ভয়ে কাঁপছে। তারপর তো তারা দুজনে দৌড়ে এসে মহারাজের পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলছে ‘না মহারাজ আমরা অসম্মান করতে চাইনি, শুধু গলাটা নকল করতে চেষ্টা করছিলাম’। এইভাবে কোন রকমে বুঝিয়ে বাজিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে ঠাণ্ডা করা হল। এই হচ্ছে বিদ্যার প্রতি সম্মান। যে সমাজ বিদ্যাকে সম্মান দেবে না, সেই সমাজ শেষ। এখন শিক্ষক, অধ্যাপকদের আগেকার মত সম্মান করা হয় না। আগে গ্রামে একজন শিক্ষক থাকলে পুরো গ্রাম তাকে মাথায় করে রাখত। আজকে শিক্ষক সমাজের সেই সম্মানও নেই, আর শিক্ষকরাও রাজনৈতিক দলগুলির ছত্রছায়ায় শিক্ষকতা ছেড়ে দাবি আদায়ের বুলি কাঁধে নিয়ে রাষ্ট্রায় নেমে পড়েছে। বুঝে নিতে হবে আমরাও বিনাশের দিকে এগোতে শুরু করেছি।

এরপর ভগবান বিষ্ণু কিছু পূজার প্রথা নিয়ে বলছেন যেখানে অশ্বখবৃক্ষের পূজা করা হয়, গরুকে সম্মান করা হয় ইত্যাদি, সেখানে আমি পূজিত হই। আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বিষ্ণু বলছেন *চক্রেণ নিহতা দৈত্যঃ পদ্ভ্যাং ক্রান্তা বসুন্ধরা। বারাহং রূপমাস্থায় হিরণ্যাক্ষো নিপাতিতঃ। বামনং রূপমাস্থায় জিতো রাজা ময়া বলিঃ।। ১৪/১০৭/১০-১১।* ‘আমি বরাহ অবতারে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলাম, চক্র নিয়ে দৈত্যদের নাশ করেছি, দুটো চরণ দিয়ে আমি পৃথিবীকে আক্রান্ত করেছি তাই এরা সবাই সম্মানিত’। চক্র, মাটি, বরাহ আর বামন এই চারটিকে সম্মান করতে হয়। কিন্তু এখন হিন্দুরা এর সব কিছুকে সম্মান দেয় কিন্তু বরাহকে সম্মান দেয় না। এগুলো হল সমাজের সব কিছুকে একটা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা। বামনদের দেখতে একটু অন্য রকম লাগে, তাই বলে তুমি তাকে বিদ্রুপ করতে পার না, কারণ ভগবানও একবার এই বামন রূপে অবতার হয়েছিলেন। এইটাই হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য, জগতের সব কিছুকে একটা ধর্মীয় ভাবের দৃষ্টি দিয়ে দেখা। ভগবান বিষ্ণু আবার বলছেন, যে সকালবেলায় স্নান করে জপাদি করে, জপ করার পর সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, তার যত রকমের পাপ সব নষ্ট হয়ে যায় আর সব তীর্থ দর্শনের ফল পায়। এইভাবে আমাদের

সবার জন্য মহাভারত পূজা উপাসনার কতকগুলো প্রথা তৈরী করে দিচ্ছে। অন্যান্য ধর্মে এই প্রথাগুলোকে একেবারে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, ওর বাইরে কেউ যেতে পারবে না। কিন্তু হিন্দু ধর্মে এই ধরনের প্রথার কোন শেষ নেই, যার যেমন ভালো লাগে, যার মনের গঠন যেমন সেই অনুসারে সে যে কোন প্রথাকে গ্রহণ করে উপাসনা করতে পারে।

### বিভিন্ন প্রথা ও নিয়মের ব্যাপারে বিভিন্ন ঋষির বিভিন্ন উপদেশ

এই ধরনের নানা রকমের প্রথা ও নিয়ম আমাদের ধর্মে চলে আসছে। একজন ঋষি আবার বলছেন কল্যা উথায় যো মর্ত্যঃ স্পর্শেদগাং বৈ যতং দধি। সর্ষপঞ্চ প্রিয়ঙ্গুঞ্চ কল্যাণং প্রতিমুচ্যতে। ১৪/১০৭/১৭। যে ব্যক্তি সকালে উঠে গরু, ঘৃত, দই, সরষে আর রাই মানে তিল জাতীয় শস্যকে স্পর্শ করে সেই ব্যক্তি সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে যায়। মহাভারতে অতিথিকে খুব সম্মান দেওয়া হয়েছে। যদি কোন অতিথিকে গৃহে সম্মান ও যথাযথ ভাবে আপ্যায়ন না করা হয়, অতিথি যদি নিরাশ হয়ে ফিরে যায় তাহলে সেই গৃহ থেকে সব পুণ্য বেরিয়ে যায়। এটা আমাদের বহু প্রাচীন প্রথা। কঠোপনিষদে নচিকেতা যখন যমরাজের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে সেই সময় যমরাজ বাড়িতে ছিলেন না। নচিকেতা যমরাজের জন্য তিন দিন ধরে উপবাস থেকে অপেক্ষা করছিলেন। যমরাজ ফিরে আসার পর তাঁর বাড়ির লোকেরা বলছেন বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্দ্রাক্ষণো গৃহান্। ব্রাহ্মণ অতিথি আগুনের মত বাড়িতে প্রবেশ করেছে। তস্মৈত্যং শান্তিঃ কুর্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্। ১/১/৭। এম্মুনি তার কাছে জল অর্ঘ্য নিয়ে যাও তা নাহলে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে।

আবার এক জায়গায় লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আপনি কার উপর রাগ করেন না, কার উপর প্রসন্ন থাকেন। লক্ষ্মী বলছেন প্রকীর্ত্ত ভাজনং যত্র ভিন্নভাণ্ডমখাসনম্। যোশিতশ্চৈব হন্যন্তে কস্মলোপহতে গৃহে। ১৪/১০৭/৫৫। যার বাড়িতে থালা বাসন এদিক সেদিক পড়ে থাকে না, বাসন ভাঙা থাকে না। যার জন্য আমাদের বলা হয় বাড়িতে ভাঙা বাসন রাখতে নেই, ভাঙা বাসন দারিদ্রের চিহ্ন। তারপর বলছেন যোশিতশ্চৈব হন্যন্তে, লক্ষ্মী বলছেন যে গৃহে নারীদের উপর অত্যাচার নিপীড়ণ করা হয় সেই গৃহে আমি কখনই থাকি না। মনুও বলছেন যেখানে নারীর পূজা করা হয় সেখানে সব দেবতারা বাস করেন। একদিকে বলছেন নারীকে সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখবে কিন্তু সম্মান দিয়ে রাখবে। মহাভারত বলছে নারীকে যেখানে সম্মান দেওয়া হয় সেখানে লক্ষ্মী বাস করেন আর মনুস্মৃতিতে মন বলছেন যেখানে নারীর সম্মান সেখানে সমস্ত দেবতাদের বাস। নারীকে যদি সম্মান ও আদরযত্ন না করা হয় তাহলে সেই গৃহে বিশেষ শুভ অনুষ্ঠানাদিতে তখনও কিন্তু দেবতারা, পিতৃ আদিগণ সবাই শুভ অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে চলে যান, যার ফলে ওই অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয় না।

বিভিন্ন ঋষিরা পূজা উপাচার ও প্রথাকে নিয়ে নিজের নিজের মত বলে যাচ্ছেন। একজন বলছেন অতিথিকে সব সময় সম্মান দেবেন আর বাড়িতে সব সময় আলো জ্বালাবে। সেইজন্য হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথাটা খুব কঠোর ভাবে মানা হয়, সন্ধ্যা হলেই সে যতই দরিদ্র হোক ঘরে ধূপধুনো আর আলো জ্বালাবে। এটাও আমাদের খুব প্রাচীন প্রথা, বলছেন আলো না জ্বালালে লক্ষ্মী বাস করেন না। দিনের বেলায় কক্ষণ ঘুমোবে না। আর বলছেন মাংস কখন খাবে না। মাংস খাওয়া না খাওয়া নিয়ে মহাভারতে অনেক আলোচনা আছে। মহাভারত কিন্তু মাংস খেতে পুরোপুরি নিষেধ করছে। অথচ তন্ত্রে এসে এই ধারণাটা একেবারেই পাল্টে যাচ্ছে। আবার বলছেন গরু আর ব্রাহ্মণকে কখনই হত্যা করবে না। অন্য দিকে ধৌম্য ঋষি খুব মজার বলছেন গৃহস্থের অশুভ লক্ষণ কি কি ভিন্নভাণ্ডঞ্চ খট্টাঞ্চ কুক্কটং শুনকং তথা। অপ্রশস্তানি সর্বাণি যশ্চ বৃক্ষো গৃহেরুহঃ। ১৪/১০৭/৬৪। ভাঙা বাসন, ভাঙা খাট আর বাড়িতে যদি মোরগ থাকে সেটা কখনই গৃহস্থের মঙ্গলজনক নয়, এই তিনটে থাকা মানে সেই বাড়ি থেকে লক্ষ্মী চলে গেলেন। হিন্দুদের কাছে গরু যেমন খুব পবিত্র ঠিক তেমনি মোরগ একেবারেই অপবিত্রতমো। মজার ব্যাপার হল বনমোরগের মাংস তখনকার দিনে সবাই খেত, পায়রাও খেত কিন্তু মোরগ একেবারেই অস্পৃশ্য ছিল, মুরগীর পালক গায়ে লাগলেও স্নান করতে হত। তখনকার দিনে আবার কুকুর রাখাও নিষেধ ছিল, মুসলমানদের মধ্যেও কুকুর রাখা নিষেধ, আসলে কুকুর খুব নোংরা করে। আরেকটি মজার হল বাড়ির ভেতরে যদি অশ্বথ বৃক্ষ থাকে তখন সেটা হয়ে যাবে অশুভ। আসলে উদ্দেশ্য হল যে জিনিষগুলো বাড়িকে নোংরা করবে, বাড়ির ক্ষতি করবে সেটাকে অশুভ বলে বাড়িতে রাখতে বারণ করা হচ্ছে। তার আগে বলছে অশ্বথ গাছকে পূজা করতে কিন্তু বাড়ির ভেতরে রাখা যাবে না। এখানে আবার ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে ভাঙা বাসন কেন রাখতে নেই? বলছেন ভাঙা বাসনে কলিযুগ বাস করে আর বাড়িতে ভাঙা খাট থাকলে টাকা-পয়সার হানি হয়। কুক্কট আর কুকুর যেখানে থাকে দেবতারা সেখানে বাস করেন না। আর অশ্বথ বৃক্ষের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলছেন, অশ্বথ বৃক্ষ মূলে সাপ বিছে এগুলো থাকবেই থাকবে, সেইজন্য বাড়িতে অশ্বথ গাছ কখনই হতে দেবে না। প্রথমে বললেন কলিযুগের কথা, তারপরে টাকা-

পয়সা নিয়ে বলছেন, টাকা-পয়সা কথা বলার পর দেবতাদের কথা বলছেন আর সেখান থেকে চলে গেলেন সাপ-বিছে যাতে না হয় সেইজন্য বাড়িতে অস্থখ গাছ যেন না থাকে।

আরও অনেক কিছু বলার পর শেষে জমদগ্নি ঋষি বলছেন *যো যজেদশ্বমেধেন বাজপেয়শতেন চ। অবাক্ষিরা বা লম্বত সত্রং বা স্ফীতমাহরেৎ।। ন যস্য হৃদয়ং শুদ্ধং নরকং স ধ্রুবং ব্রজেৎ। তুল্যং যজ্ঞস্য সত্যঞ্চ হৃদয়স্য চ শুদ্ধতা।।* ১৪/১০৭/৬৬-৬৭। কেউ যদি হাজার হাজার অশ্বমেধ ও বাজপেয় যজ্ঞ করে, মাথা নীচু করে গাছে যদি উল্টো হয়ে ঝুলে থাকে, এটাও তখন এক ধরনের তপস্যা ছিল আর সমৃদ্ধশীল ছত্র খুলে দেয় মানে প্রচুর টাকা-পয়সা দান করতে থাকে কিন্তু হৃদয় যদি শুদ্ধ পবিত্র না থাকে তাহলে কিছুই হবে না। বলছেন যে লোকের হৃদয় শুদ্ধ নেই সে নরকে যাবেই যাবে। যজ্ঞ, সত্য আর হৃদয়ের শুদ্ধি এই তিনটি সমান। মহাভারতের এই কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হৃদয় যদি শুদ্ধ না হয় তাহলে সে কখন সত্য কথা বলতেই পারবে না। আর হৃদয় শুদ্ধি না হলে যজ্ঞতো করতেই পারবে না, আসনে বসতেই পারবে না। আমরা যত যজ্ঞই করি না কেন হৃদয় শুদ্ধি না হলে কিছুই হবে না। এই জায়গাটা হল বেদ আর মহাভারতের সন্ধিক্ষণ। বেদে যজ্ঞের অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মহাভারতে এসে যজ্ঞের গুরুত্ব আস্তে আস্তে কমতে শুরু করে দিয়েছে। মহাভারত বলছে বেদের সময় থেকে তুমি যজ্ঞাদি অনেক করে এসেছ কিন্তু হৃদয় শুদ্ধ করোনি। বেদের সময় যজ্ঞাদি যেটা প্রধান ছিল সেটা মহাভারতে সরে এসে হৃদয়ের শুদ্ধি হয়ে গেছে। মহাভারত তাই বারবার বলছে সত্য কথা বলবে, হৃদয়কে শুদ্ধ করবে। কারণ সমস্ত ধর্মীয় কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষ নিজে। আগে যজ্ঞাদি, ইন্দ্রাদি দেবতারা ছিল সমস্ত কিছুর কেন্দ্র কিন্তু মহাভারতে এসে মানুষই প্রধান হয়ে গেল। মুক্তি কার? তোমার। স্বর্গে কে যাবে? তুমি। আসল সমস্যা হচ্ছে আমাকে নিয়ে, টাকা-পয়সা আমার নিজের জন্য দরকার, সুখভোগ আমার নিজের জন্য, তাই সব কিছুকে মহাভারত নিয়ে এল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। যেমনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে তখন বলছে তুমি যদি আধ্যাত্মিক উত্থান চাও, তাহলে দেখো বাপু তুমি যজ্ঞ করে যা হবে সত্য কথা বলে তাই হবে, চিন্তাশুদ্ধি করে তোমার একই জিনিষ হবে। সেইজন্য চিন্তাশুদ্ধির দিকে নজর দাও।

চিন্তাশুদ্ধি করতে গিয়ে কি হচ্ছে? যজ্ঞ করতে গেলে প্রচুর অর্থের দরকার, ব্রাহ্মণ দরকার কিন্তু মহাভারতের ধর্ম সাধারণ আপামর মানুষের ধর্ম। কে শূদ্র, কে চণ্ডাল, কে মুসলমান, কে হিন্দু, কে ব্রাহ্মণ, কে অন্ত্যজ এসবে কিছু আসে যায় না। তাদের পরিষ্কার বলে দেওয়া হচ্ছে তোমার হৃদয়কে শুদ্ধ কর। যদি তুমি হৃদয়কে শুদ্ধ করতে পার তাহলে তোমার মত আর কেউ নেই, তখন তুমি কোন ধর্মের, কোন বর্ণের তাতে কোন কিছুই আসে যায় না। হৃদয় পরিষ্কার হলে সবটা পরিষ্কার। এইদিকে মহাভারত সবার নজরটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে, এটাই হল মহাভারতের উত্তরণ। বেদের ধর্ম থেকে মহাভারতের ধর্মের যে উত্তরণ এটা হল অনেকগুলো দিকের মধ্যে একটা দিক। সব থেকে বড় উত্তরণ হল মহাভারত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম। যেমন বৈষ্ণবরা হল কৃষ্ণকেন্দ্রিক, বলাই হচ্ছে ইসকন, কৃষ্ণ কনসাশেনস্, মানে কৃষ্ণকেন্দ্রিক, কিন্তু মহাভারত হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তোমাকে নিজেকে শুদ্ধ করতে হবে।

এখানে আবার কিছু প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়েছে। এর আগে বলা হয়েছিল যার দান নেবে তখন তার পাপটাও নিতে হবে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে করতে হবে? বলছেন, যদি শ্রাদ্ধের সময় তোমাকে জুতো, ছাতা ইত্যাদি দান করে থাকে তাহলে একাগ্র চিত্ত হয়ে একশবার গায়ত্রীমন্ত্র জপ করলে এই পাপটা কেটে যাবে। যেদিন ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করবে সেদিন খুব করে সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করবে আর সেদিন রাত্রে উপবাস থাকবে তাহলে ব্রাহ্মণের শুদ্ধি হয়ে যাবে। কারুর বাড়িতে যদি মৃত্যু হয়ে থাকে, সেখানে মরণশৌচের তিন দিনের মধ্যে যদি ভোজন করা হয় তখন সে যদি বারো দিন ত্রিকাল স্নান করে তাহলে সে শুদ্ধ হয়ে যাবে। আসলে মানুষের মন প্রচণ্ড দুর্বল, সব সময় তার মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে আমার কিছু পাপ হল কিনা কে জানে। সেইজন্য ত্রিচানরা রবিবার দিন চার্চে গিয়ে সারাদিন সপ্তাহের পাপ স্বীকার করে আসে। মুসলমানরা মৌলবীদের কাছে গিয়ে বলে আমার এই রকম হয়ে গেছে আমি কি করব। মানুষের মন এই রকম দুর্বল মন। মহাভারত কি করছে? যখন যখন যেমনটি ঋষিরা প্রায়শ্চিত্তের কথা বলে গেছেন তার সব কটিকে সংগ্রহ করে মহাভারতে সন্নিবেশিত করে দিয়েছে।

**শিব-পার্বতীর সংবাদ** (ধর্ম ও অধর্মের স্বরূপ – সর্বজ্ঞের সংজ্ঞা – কর্মের বন্ধন কিভাবে হয় – মন, বাণী ও ক্রিয়াকে ঠিক করা – এবং বহু প্রকার ধর্ম ও অধর্মের ব্যাপারে শিবের উপদেশ)

ভীষ্মই এখনও সব বলে যাচ্ছেন। তবে অনুশাসনপর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বিভিন্ন আখ্যায়িকাকে নিয়ে এসে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাচ্ছেন সেই সময় এই ব্যাপারে কে কি বলেছিল। এর মধ্যে শিব-পার্বতীর সংলাপটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। মহাভারত আমরা আজকে যে অবস্থায় পাচ্ছি এই অবস্থাটা ঠিক কবে এসে দাঁড়িয়েছে আমরা বলতে পারব না। বেশীর ভাগ পণ্ডিত যাঁরা মহাভারতকে খুব বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা মনে করেন মহাভারত কখনই একজনের লেখা হতে পারেনা। কারণ হিসাবে তাঁরা বলেন মহাভারত অনেক রকম শৈলীতে লেখা হয়েছে, আর এত কিছু বিষয় মহাভারতে নিয়ে আসা হয়েছে যা শুধু মাত্র একজনের মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু কোন একটা অবস্থায় এসে মহাভারত ঠিক এই জায়গাটাতে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে এসে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি মোটামুটি একটা প্রক্রিয়াতে বাঁধা হয়ে গেছে। মহাভারতে যে এক লক্ষ শ্লোক আছে এটা খুব বহু পুরনো কথা। সেখানে আমরা অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে শিব-পার্বতীর সংলাপও পাই। এই শিব-পার্বতীর সংলাপের মধ্য থেকে যে একটা নতুন দর্শন বেরিয়ে আসছে সেটা অন্যান্য মতেও পাওয়া যাবে। শিব-পার্বতীর এই সংলাপে মূলতঃ পৌরানিক একটা মতকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। পুরানের যেই অংশে শিবকে বেশী মাহাত্ম্য দেওয়া হয়েছে সেখানে এই ধরনের আলোচনা আরও বৃহৎ ভাবে করা হয়েছে।

এখানে উমা ভগবান শিবকে জিজ্ঞেস করছেন **ভগবন্ সর্বভূতেশ দেবাসুরনমস্কৃত। ধর্মাধর্মে নৃণাং দেব ক্রুহি মে সংশয়ং বিভো।।১৪/১২২/১।** ‘হে ভগবান সর্বভূতেশ্বর! দেবতা ও অসুরদের দ্বারা নমস্কৃত! আপনি আমাকে ধর্ম ও অধর্মের স্বরূপটা ব্যাখ্যা করুন’। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, একটা নেউল ছিল আর তার লেজে একটা ইট বাঁধা আছে। নেউল ইচ্ছে করলে আরামসে গর্তে গিয়ে থাকতে পারে কিন্তু তার লেজে এমন একটা ইট বাঁধা দেওয়া হয়েছে যার ওজনের চাপে নেউলকে মাঝে মাঝেই গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। এত দিন ধরে এখানে আধ্যাত্মিক শাস্ত্র কথা শুনে শুনে আমাদের মোটামুটি ঈশ্বর সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়ে গেছে। এখন একটা ধারণা করতে পারছি যে ভগবানই আছেন, ভগবানই সত্য। অথচ আমরা ঐ দিকে কেন এগোতে পারছি না? ঠাকুর আরেকটি খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন। একটা চোর যদি জানতে পারে পাশের ঘরে প্রচুর সোনা রাখা আছে। চোরের কি আর রাত্রিতে ঘুম আসবে! চোর এখন প্রাণপন চেষ্টা করবে কি করে ঐ সোনাকে নিজের হেফাজতে নিয়ে আসতে পারে। ভোগের জিনিষ যদি পাশেই থাকে আর চেষ্টা করলেই পাওয়া যেতে পারে যদি বুঝে নিতে পারা যায় তখন সেটাকে কিভাবে নেওয়া যেতে পারে ভেবে ভেবে হাতটা নিশিপিশ করতে থাকবে। শাস্ত্র শুনে আমাদেরও কিছু তো বিশ্বাস হচ্ছে যে শাস্ত্র যা বলছে সত্য বলছে, ঈশ্বর সত্য, ঠাকুর সত্য। তাও ভগবানকে, ঠাকুরকে পেতে আমাদের মন প্রাণ ছটফট করছে না। একটা জিনিষকে পেতে ইচ্ছে কখন করবে না? যদি বিশ্বাস না থাকে তাহলে পেতে ইচ্ছে করবে না। আর তা নাহলে নেউলের মত লেজে ইট বাঁধা। আমাদের সবারই লেজে ইট বাঁধা। লেজে ইট বাঁধাটাই অধর্মের স্বরূপ। হিন্দুধর্মানুসারে আমরা জন্ম জন্ম ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছি এই অধর্মগুলিকে কিভাবে পেরিয়ে আসতে পারি।

আধ্যাত্মিক জীবনে উত্তরণে তিনটে ধাপ, প্রথমে এই বোধ আনতে হবে আমি অধর্মে পড়ে আছি, দ্বিতীয় ধাপ অধর্মকে অতিক্রম করে যেকোন ভাবে ধর্মকে ধরা, আর শেষ ধাপে ধর্ম আর অধর্ম দুটোকে অতিক্রম করা। ধর্মকে যতক্ষণ না অতিক্রম করতে পারছে ততক্ষণ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হবে না। শ্রীরামচন্দ্র বালিকে বধ করলেন, সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন এবং আরও যা কিছু করেছেন এগুলো তিনি ধর্মাধর্মের পারে গিয়ে করেছেন। এগুলো করেও তাঁর কিছু হয়নি আর না করলেও তাঁর কিছু আসত যেত না, কারণ তিনি ধর্মাধর্মের পারে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিষ হয়েছে, তিনি ধর্মাধর্মের পারে সব সময় স্থিত। স্বামীজীকে আমেরিকাতে কিছু খেতে দেওয়ার পর জিজ্ঞেস করা হয়েছে ‘স্বামীজী আপনি এগুলো খান তো’? ভগবান জানেন কি দেওয়া হয়েছিল। স্বামীজী বলছেন ‘আমাকে আমার গুরু বলে দিয়েছেন এসবে তোর কিছু হবে না, ভিক্ষায় যা পাবি সেটাই গ্রহণ করবি’। এনারা সবাই ধর্মাধর্মের পারে। আমরা সাধারণ লোক, আমাদের আগে অধর্ম করা থেকে বিরত হয়ে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। বিশ্বের যত ধর্মগ্রন্থ আছে, সমস্ত ধর্মগ্রন্থ মূলতঃ আমাদের শেখাচ্ছে অধর্মকে পার করে কিভাবে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আর ধর্ম ও অধর্ম এই দুটোকেই পার করার কথা খুব কম ধর্মগ্রন্থেই বলা হয়। যেমন উপনিষদ বলছে ধর্ম ও অধর্মকে অতিক্রম করলে তোমার কি হবে। ধর্মকে কিভাবে অতিক্রম করা যায় এটা অত্যন্ত গূহ্য, আর এটাই ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিকতা। অতি গূহ্য বলে এই কথাগুলো খুব কম বলা হয়। কারণ একটাই, যিনি সাধনা করেন তিনিই একমাত্র জানেন কিভাবে ধর্মকে অতিক্রম করা যায়। আবার কঠোপনিষদে বলছে **নাবারিতো দুষ্টরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাহপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।।(১/২/২৪)** যতক্ষণ

তোমার দুশ্চরিত্র থেকে না বেরিয়ে আসছ ততক্ষণ তোমার এগুলো হবে না। এটাই প্রথম শর্ত, যে অবিরত হয়নি, অর্থাৎ দুশ্চরিত্রে এখনও যার মন লেগে আছে এদের কখনই কিছু হবে না। তারপরের শর্ত অশান্তি, সে দুশ্চরিত্র থেকে সরে এসেছে, কোন পাপকর্ম করে না, কিন্তু মনটা ছটফট করে যাচ্ছে, মন যার শান্ত হয়নি তারও হবে না। আমাকে অমুক তীর্থে যেতে হবে। এখানে তীর্থ করা মানে? ধর্ম করা। যার এখনও বোধ আছে আমাকে তীর্থ করতে হবে, আর তীর্থে যাবার জন্য ছোট্টাছুটি করার সাথে বাড়িতে বসে মাংস ভাত খাওয়ার মধ্যে খুব বেশী তফাৎ নেই। বাড়িতে বসে মাংস ভাত খেয়ে টিভি দেখা বন্ধ করে এখন তীর্থে তীর্থে দৌড়ে বেড়াচ্ছি, এই মন্দির সেই মন্দির ঘুরে বেড়াচ্ছি, আপাতদৃষ্টিতে এটা খুবই ভালো কারণ সে একটা স্বার্থ থেকে সরে আসছে। কিন্তু এই ভাবে দৌড়াদৌড়ি করে কখনই আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয় না। এর পরের শর্ত ন অসমাহিতঃ, এবারে দুটোই বন্ধ হয়ে গেছে, কোন দুশ্চরিত্র করছে না আর শান্ত হয়ে বসে গেছে। কিন্তু আসনে বসলেই তার মন সারা বিশ্ব ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে। জপে বসলেই মন যে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াবে ঠিক নেই। এটাই হল অসমাহিতঃ, যার মন চঞ্চল তার দ্বারা ধর্ম অধর্মকে পার করা হবে না। *নাশান্তমানসো*, মনের এই ঘুরে বেড়ানোটাও এইবার ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু মাথায় ঢুকেছে কবে আমার ব্রহ্মজ্ঞান হবে, কবে আমার মুক্তি লাভ হবে, কবে ঈশ্বরের কৃপা হবে। এর দ্বারাও ধর্ম অধর্ম পার করা হবে না। এখানে যমরাজ চারটে ধাপের কথা বলছেন, প্রথম পাপকর্ম বন্ধ কর, দ্বিতীয় ঘোরাফেরা, মানে ইন্দ্রিয়গুলির লক্ষ্যজন্মফটা বন্ধ কর, তৃতীয় মনের চঞ্চলতা বন্ধ করে মনকে একাগ্র কর আর চতুর্থ আমার সিদ্ধিপ্রাপ্তি কবে হবে এই চিন্তাটাকেও ত্যাগ কর। সিদ্ধিলাভের ইচ্ছা বা ফলপ্রাপ্তির কামনা হল ফুটো বালতির মত। যে কোন কাজে যদি আমার বুদ্ধিকে এই সিদ্ধিলাভ কবে হবে এতে লাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বুঝে নিতে হবে আমার সব কিছুই নিষ্ফল হয়ে যাবে। আমি চাকরি করছি আর দিন রাত ভেবে যাচ্ছি আমার প্রমোশন কবে হবে, তার মানে আমার বালতি ফুটো হয়ে গেছে। একজন দম্পতি ভাবছে আমাদের কবে সন্তান হবে, মেয়ের বাবা চিন্তা করছে আমার মেয়েকে কবে একটা ভালো পাত্র পাওয়া সম্ভব করতে পারব, আমার ছেলের কবে একটা চাকরি হবে। এই চিন্তা যত করবে তত সেটা আরও পিছিয়ে যাবে। এটা ভালো বোঝা যায় রাতে ঘুমোবার সময় যদি চিন্তা করা হয় আমার ঘুমটা কখন আসবে, যত চিন্তা করতে থাকব আমার কখন ঘুম আসবে ততই ঘুম আসাটা পেছোতে থাকবে, শেষে আর ঘুমই আসবে না। সেইজন্য গীতায় জোর দিয়ে ভগবান বলছেন কর্ম করে যাও ফলের চিন্তা করো না।

এই চারটেই ঠিক ঠিক ধাপ। আমাদের যত ধর্মগ্রন্থ আছে সব ধর্মগ্রন্থই প্রথম ধাপটা, *নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ* এর উপর সব থেকে বেশী জোর দেয়। এই দুশ্চরিত্রটা কি? এইটাই পার্বতী জিজ্ঞেস করছেন ভগবান শিবকে ‘হে মহাদেব! আমাকে ধর্ম আর অধর্মের স্বরূপটা বলুন’। একবার মানুষ যখন ধর্ম আর অধর্মের স্বরূপকে ঠিক ঠিক বুঝে নিতে পারে তখনই মানুষ অধর্ম থেকে বেরোতে চেষ্টা করতে শুরু করে। কিন্তু অধর্ম থেকে বেরনো খুব মুশকিল। এত দিন তো আমরা সবাই মহাভারত অধ্যয়ন করছি, মহাভারতের বাইরে নতুন করে ধর্ম ও অধর্মকে জানার কিছুই নেই। মহাভারতের বাইরে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ নতুন করে কিছু বলতেও পারবে না। কিন্তু আমরা কি সবাই বেরোতে পারছি? বেরিয়ে আসাটাই খুব কঠিন, আমাদের সংস্কার এমন ভাবে বেঁধে রেখেছে নেউলের লেজে ইট বাঁধার মত, যত গর্তে ঢুকতে চাইছে তত তাকে বাইরে বার করে নিয়ে আসবে।

দেবাদিদেব মহাদেব প্রথমে শুরু করছেন এই বলে *সত্যধর্মরতাঃ সন্তঃ সর্বলিঙ্গবিবর্জিতাঃ ধর্মলঙ্কার্যভোক্তারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনাঃ*। ১১৪/১২২/৫। ‘যারা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যা কিছু উপার্জন করে এবং সেই উপার্জিত অর্থের দ্বারা ধর্ম সম্মত যে ভোগ করেন আর যতই ঝড়ঝাপটা আসুক সত্য আর ধর্ম এই দুটো থেকে আলাদা হন না, এঁরাই ঠিক ঠিক স্বর্গে যান’। এখানে ভগবান শিবের এই কথাটি আমাদের বুঝতে হবে। বলছেন যাঁরা ধর্ম মতে অর্থ উপার্জন করেছেন সেটাকে তাঁরা ভোগ করছেন। অর্থকে কিভাবে ভোগ করা হয়? মহাভারতের মতে যখন সৎ ভাবে অর্থ উপার্জন করা হয় তখন সেই অর্থের ভোগ হয় ধর্ম আর কামের দ্বারা। তাই ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটে এক সঙ্গে চলবে। অর্থাৎ সৎ ভাবে অর্থ উপার্জনের দ্বারা অর্জিত অর্থকে ঠিক ঠিক ধর্ম কাজে আর ধর্ম সম্মত কামে যাঁরা খরচ করেন তাঁরাই স্বর্গে যান। শেষ পর্যন্ত কিন্তু সেই ধর্ম, অর্থ আর কামের মধ্যে আমরা বাঁধা রইলাম। এরপরেই ভগবান শিব বলছেন *ন ধর্মের্ণ ন ধর্মের্ণ বধ্যন্তে ছিন্নসংশয়াঃ। প্রলয়োৎপত্তিতত্ত্বজ্ঞাঃ সর্বজ্ঞাঃ সর্বদর্শিনাঃ*। ১১৪/১২২/৬। ‘যাঁর মন থেকে সব রকম সংশয় ছিন্ন হয়ে গেছে, ছিন্ন সংশয়ঃ যাঁর হয়ে যায় সেই আত্মজ্ঞানী’। আমি আপনি কখনই বলতে পারিনা যে আমার একশ ভাগ বিশ্বাস যে ভগবানই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। কারণ এই বিশ্বাস যদি হয়ে যায় যে ভগবানই একমাত্র আছেন তাহলে তো ছিন্ন সংশয়ঃ হয়ে গেল। ছিন্ন সংশয় একমাত্র আত্মজ্ঞানীরই হয়। ব্রহ্মজ্ঞান যখন হয়ে যায় তখন সমস্ত সংশয় তার চলে

যাবে। সংশয় থাকা মানেই কিছু না কিছু গোলমাল আছে। আর আমার সংশয় চলে গেছে কিনা সেটা আমিই একমাত্র বুঝব অন্য আর কেউ কোন দিন বুঝতে পারবে না। ঠাকুর সেইজন্য বলছেন, যারা নিম্ন আধার কিন্তু এদিকে গেরুয়া পড়ে আছে তারা পরকে ঠকায় আবার নিজেকেও ঠকায়। মহাদেব বলছেন, সংশয় চলে গেছে আর প্রলয় ও উৎপত্তির তত্ত্ব তাঁরা জেনে যান। অর্থাৎ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যখন প্রলয় হয় তখন কিভাবে হয় সেটা এনারা যেমন জানেন তেমনি আবার এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কিভাবে হয় সেই তত্ত্বটাও তিনি জানেন। তিনি সর্বজ্ঞ সর্বদ্রষ্টা, তিনি সব কিছু বোঝেন। সর্বজ্ঞ এই শব্দটাকে নিয়ে এর আগেও আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। আচার্য শঙ্কর বলছেন, কেউ যদি বুঝে যায় সোনা জিনিষটা কি, তখন সোনা দিয়ে যত গয়না তৈরী হয় সেই গয়নাকে আর তাকে বিচার করতে হবে না। সোনাকে গলিয়ে এই ভাবে এই ভাবে করলে গয়না হয়। তখন সে সোনার ব্যাপারে সর্বজ্ঞ হয়ে গেল। সব কটা গয়নার ব্যাপারে সে সর্বজ্ঞ হবে না, কারণ নতুন নতুন গয়না আরও আসতে থাকবে। এইটাকে ঠাকুরও বলছেন তারে বাড়া, তারে বাড়া আছে, এটা কখন শেষ হয় না। কিন্তু তত্ত্বটা সে জেনে গেছে। তত্ত্বটা কি? এই সৃষ্টি ঈশ্বর থেকেই আসে আবার ঈশ্বরেই লয় হয়ে যায়। সৃষ্টির পর থাকে কোথায়? ঈশ্বরের মধ্যেই থাকে। জন্ম ঈশ্বরের থেকে, বাস ঈশ্বরের মধ্যে আর মৃত্যুটাও ঈশ্বরের মধ্যে, যে এটাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে নেয় সেই সর্বজ্ঞ হয়ে যায়। যখন সর্বজ্ঞ হয়ে যায় তখন কি হয়? মহাদেব বলছেন এরা আর কোন বন্ধনে পড়ে না। কিসের বন্ধনে পড়ে না? নাধর্মের ন ধর্মের, ধর্ম অধর্ম কোনটারই বন্ধনে পড়ে না। কথামতে ঠাকুর বলছেন ধর্মটাও বন্ধন, পুণ্যটাও বন্ধন। প্রথম অবস্থায় কথামত পড়তে গেলে কিছুতেই এর অর্থ বোঝা যায় না। অনেক দিন ধরে শাস্ত্র কথা শুনতে শুনতে, সাধন ভজন করতে করতে, সাধু সঙ্গ করতে করতে কথামতের কথাগুলো ধারণা হতে শুরু করে। ঠাকুর সত্যটাকে রেখে দিয়েছিলেন, ঠাকুর বলছেন সত্যকে ছেড়ে দিলে বাকি সব কিছুই মিথ্যা হয়ে যায়। আবার গীতাতে ভগবান তিনটে গুণের পারে যেতে বলছেন। সত্ত্বগুণটাও বন্ধন। সত্ত্বগুণ কি দিয়ে বাঁধে? সুখ দিয়ে আর জ্ঞান দিয়ে বাঁধে, দশটা জিনিষকে জানার ইচ্ছে দিয়ে বাঁধে। ধর্ম ও অধর্ম আসলে যমজ ভাই, এই দিক দিয়ে দেখলে একটা জিনিষকে অধর্ম বোধ হবে আবার অন্য দিক দিয়ে দেখলে সেটাকেই ধর্ম বলে বোধ হয়। ঠিক তেমনি স্বর্গ ও নরক এরাও যমজ ভাই। এক অপরের সঙ্গে সব সময়ই থাকবে। যখন ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন ছিন্ন সংশয়ঃ হয়ে যায় আর প্রলয় উৎপত্তির তত্ত্বটা জেনে যায় এবং সর্বজ্ঞ হয়ে যান। এঁদের অধর্ম কখন বাঁধতেই পারে না। অধর্ম কিভাবে বাঁধে? আমি মদ খাবো, মদ ছাড়া আমার চলে না। মানে এইবার অধর্ম তাকে বাঁধল। ধর্ম কিভাবে বাঁধে? আমি তীর্থ করব, গঙ্গা স্নান করব, না করলে মনের খেদ মিটবে না। আর অধর্ম ধর্মকে কিভাবে বাঁধে? নিজের ভোগের লিপ্সা আছে কিন্তু ধর্মের নাম করে লোককে ঠকিয়ে ভোগের তৃষ্ণা মেটাচ্ছে।

মহাদেব বলছেন *বীতরাগা বিমুচ্যন্তে পুরুষাঃ কর্মবন্ধনৈঃ। কর্মণা মনসা বাচা যেন হিংসন্তি কিঞ্চন।।* ১৪/১২২/৭। কর্মের বন্ধন তিন ভাবে হয়। মন, বাণী আর ক্রিয়া দিয়ে। কর্মের বন্ধন কিভাবে ছাড়বে? মন, বাণী আর ক্রিয়া দিয়ে যখন কোন হিংসা না করা হয় আর মন থেকে সমস্ত আসক্তি যার চলে গেছে, সে কখন কর্ম বন্ধনে পড়বে না। মূল হল আসক্তি। কিন্তু সাধারণ লোকদের কাছে এগুলো কোন তত্ত্ব কথা নয়। যখন তত্ত্ব কথা আলোচনা করবে তখন শুধু বলবে যার মন থেকে আসক্তি চলে গেছে সেই কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এখানে আমাদের প্রথমে অধর্ম থেকে ধর্মে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কারণ যিনি ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানে চলে যাবেন তখন অহিংসাও তাঁর বন্ধনের কারণ হবে না, কারণ অহিংসাটাও সত্ত্বগুণ। তাঁর কাছে তখন হিংসা করলেও যা অহিংসা করলেও তাই। কিন্তু প্রথমে হিংসাকে ত্যাগ করে অহিংসাতে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। এই কথাগুলো খুবই গভীর আর এগুলো সবার পক্ষে ধারণা করা যেমন সম্ভব নয়, অন্য দিকে উল্টো বুঝে তার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। মনকে অন্তর্মুখি করে পরিষ্কার না করলে এই কথাগুলোর ধারণা হয় না। মহাদেব বলছেন, যার কোন আসক্তি নেই, কোন প্রাণিকে হত্যা করে না, সুশীল, মানে যার ব্যবহার ভালো, সবার প্রতি দয়ার ভাব আছে এরা কখন কর্ম বন্ধনে পড়ে না। এদের কাছে শত্রু আর মিত্র সমান। কারণ মিত্র হলেই তার প্রতি ভালোবাসা আসবে, শত্রু হলে তার প্রতি হিংসার ভাব আসবে। যার প্রতি বিন্দুমাত্র ক্ষোভ থাকবে তখন মনে হবে কোন না কোন ভাবে তাকে দুটো কথা শুনিয়ে দিয়ে অপমান করতে, এটাও হিংসা। সবারই প্রতি প্রীতি ভাবের অনুশীলন করতে হয়। আর বলছেন যে জিতেন্দ্রিয় সেও কর্ম বন্ধনে পড়বে না। জিতেন্দ্রিয় মানে নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে যদি নিয়ন্ত্রণে না রাখা হয় *নাবিরতো দুশ্চরিতাঃ*, মানে দুশ্চরিত্র থেকে কখনই সে বেরিয়ে আসতে পারবে না। দুশ্চরিত্র মানেই তার ইন্দ্রিয় সংযমে নেই। মহাদেব বলছেন অপরের টাকার প্রতি তার মমতা নেই, এখানে লোভের কথা বলছেন না, বলছেন মমতা। শুধু টাকা-পয়সাই নয়, অপরের কোন কিছু দ্রব্য যদি কারুর কাছে থাকে তখন সেই দ্রব্যের তন্মাত্রাটা তাকে গ্রাস করে নেয়, তখন অপরের দ্রব্যের প্রতি একটা মমতা চলে আসে। আমাদের কেউ যদি বলে এই ব্রিফ কেসে পাঁচ লাখ টাকা আছে, আপনি এটা বর্ধমান পর্যন্ত পৌঁছে দিন। যতক্ষণ এই টাকা আমার কাছে থাকবে ততক্ষণ আমার অন্য রকম অনুভূতি

হতে বাধ্য। বর্ধমান পর্যন্ত আমার মনে শান্তি হবে না। বাচ্চা ছেলের হাতে একটা খেলনা পিস্তল যদি দিয়ে দেওয়া হয় তাকে আর কে পায়, যত রকমের কায়দা করা যায় পিস্তল নিয়ে তাই করতে থাকবে। বাচ্চা মেয়ের শাড়ির আঁচলে চাবি বাঁধা আছে আর সেটাকে নিয়ে ঘোরাতে থাকে, ঠাকুর বলছেন, দেখেছ এখন চাবি ঘোরাচ্ছে এরাই বড় হয়ে বরকে নাচাবে। যেমনি ভালোবাসা হয়ে গেল, প্রেম হয়ে গেল, বিয়ে হয়ে গেল, তখন মমতা এসে যায়। এই বর আমার সম্পত্তি, আমার যখন হয়ে গেল তখন নাচাতে শুরু করে। মমতা এখানে বাংলাতে মমতা যে অর্থে বলা হয় সেই অর্থে বলা হচ্ছে না, এটা আমার এই বোধ এসে পড়ে। এখানে মমতা করতে নিষেধ করেছেন না, অপরের জিনিষের প্রতি মমতা করবে না। নিজের টাকাতে তোমার মমতা থাকবেই কিন্তু পরের টাকাতে মমতা করতে যেও না। যেমন আমার দাদার টাকা, আমার বন্ধুর টাকা যেহেতু তাই আমি চাইলেই পেয়ে যাব। অপরে যদি আমার কাছে কিছু টাকা রাখতে দেয়, সেটার প্রতি মমতা আসবেই। টাকাটা নিয়ে চলে যাবার পর মনটা একটু খারাপ লাগবেই। এটা একটা মানসিক দুর্বলতা।

দ্বিতীয় বলছেন, পরস্পরী থেকে সব সময় দূরে থাকা। চাণক্য নীতিতে একটা কথাই আছে মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ, অপরের স্ত্রীকে মায়ের মত দেখবে আর অপরের টাকাকে মাটির ঢেলার মত দেখবে। এখানে কিন্তু অতটা নিয়ে যেতে বলা হচ্ছে না, বলছেন মমতা রাখবে না। বলছেন, তারা অল্প কি খায়? ধর্ম মাধ্যমে যেটা উপার্জিত হয়েছে তারা দ্বারা যে অল্প আসবে সেটাই খাবে। তার মানে ঘুষের দ্বারা, অন্যায় ভাবে টাকা রোজগার করে ভোগ করতে নিষেধ করা হচ্ছে। এই ধরণের লোকেরা স্বর্গে যাবেই যাবে। তিনটে জিনিষ এখানে করতে বলা হল, পরের টাকাতে কোন মমতা রাখবে না, লোভের কথা বলা হচ্ছে না, লোভ থেকে আরও সাধারণ স্তরে নিয়ে আসা হয়েছে, দ্বিতীয় পরস্পরী থেকে দূরে থাকবে আর শেষে বলছেন ধর্মের অল্পই শুধু খাবে।

মহাদেব এখানে খুব সহজ পথ বলে দিলেন। আসলে আমাদের সমস্যা হল আমরা কোন জিনিষকে জীবনে ধরে রাখতে পারিনা। আমরা যদি খুব একটা সহজ জিনিষকে অবলম্বন করে নিয়ে বলি আমি আমার ধর্ম সাধনের জন্য এটা রোজ পালন করতে থাকব। যাই হয়ে যাক, আগুন লেগে যাক, ভূমিকম্প হয়ে যাক একই সময় এই একই কাজ টানা ছয় মাস আমি পালন করে যাব। যেদিন থেকে ঠিক করলাম আমি এটা পালন করে যাব, তার সাত দিনের মধ্যে সমস্যা আসতে শুরু করবে। দু মাস যদি টানা পালন করে ফেলতে পারি তাহলে দেখব আমার মধ্যে একটা শক্তি এসে গেছে। শাস্ত্রে ধর্মের অনেক কথা বলা হয় ঠিকই, কিন্তু এত কথার দরকার পড়ে না। যে কোন একটা সহজ জিনিষকে ধর্ম সাধনের জন্য অবলম্বন করে নিয়ে সেটাকেই অন্ততঃ ছয় মাস টানা করে যাক। খুব সহজ একটা, আমি ঠিক করে নিলাম রোজ সাতটায় চা খাব। এবার রোজ সাতটায় চা খেতে শুরু করলাম। দু বছর যদি টানা সাতটায় চা খেতে থাকি, তারপর আমি বাইরে যদি কোথাও যাই, এমনকি যদি ট্রেনেও থাকি সেখানেও ঠিক সাতটার সময় আমার কাছে চা চলে আসবে। আসতে বাধ্য। সময়ের ব্যাপার বাদ দিয়ে যদি বলি কাল থেকে আমি ছোট মাছ ছাড়া খাবো না। মাছ খাওয়া পুরোটাই ছাড়লাম না, একটুখানি ছাড়া হল। এবার বাড়িতে বড় মাছ আসছে, ইলিশ মাছ আসছে কিন্তু মনকে আমি ধরে রেখেছি, ছোট মাছ ছাড়া অন্য কোন মাছ খাওয়া চলবে না। এতেই কয়েক মাসের মধ্যে যোগশক্তি চলে আসবে। তাই এত সব কথা কোন দরকারই পড়ে না। কিন্তু আমরা পারি না। ঠাকুর বলছেন এদের আঁট নেই, এই বলছে আমি মাছ খাব না, তারপর দিন থেকেই মাছ খেতে শুরু করবে।

মহাদেব বলছেন স্তৈর্যানিবৃত্তাঃ সততং সন্তুষ্টাঃ স্বধনে চ। স্বভাগ্যানুপজীবন্তি তে নরাঃ স্বর্গামিনঃ।। ১৪/১২২/১২। যারা চৌর্য্য বৃত্তি থেকে নিবৃত্ত, নিজের সম্পত্তি যাই থাকুক তাতেই সন্তুষ্ট থাকে, কোন ধরণের অধর্ম করে না আর নিজের ভাগ্যের উপর ভরসা করে থাকে, যার অর্থ হল বর্তমানে আমার যা আছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট আর ভবিষ্যতে আমার যা পাওয়ার তা ঠিকই চলে আসবে এই মনোভাব নিয়ে যারা চলে তারা অবশ্যই স্বর্গে যাবে। কত সহজ পথ মহাভারত বলে দিচ্ছে, এই সহজ জিনিষটুকু যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের স্বর্গের রাস্তা খোলা। দুই ধরণের লোক হয়, একজন বলবে আমার ভবিষ্যতে যা হবার হবে কিন্তু আজকে এই মুহূর্তে আমার এত পরিমাণ টাকা না হলে চলবে না। অন্য জন বলবে এখন আমি মেনে নিচ্ছে কিন্তু ভবিষ্যতে যেন আমার সব কিছু ঠিক হয়ে যায়। এরা দুজনই গোলমালে। কোথাও আমাদের কাজ বন্ধ করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে বলছেন না। কাজ পুরোটাই আমাদের করে যেতে হবে, কিন্তু বর্তমানে যা আছে সেটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাক আর ভবিষ্যতকে পুরোপুরি ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেবে। আমরা বেশীর ভাগই বর্তমানকে নিয়েও ছটফট করছি ভবিষ্যতকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আর দুর্ভাবনায় ছটফট করে যাচ্ছে, তাই অশান্তি আমাদের তাড়া করে যাচ্ছে। ভাগ্য বলতে এখানে কর্মকে বোঝায়। এই জিনিষটা মানুষ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেনা যে,



জগতে যেটা আমার প্রাপ্য প্রকৃতির কোন ক্ষমতাই নেই সেটাকে আটকে দেবে। আমরা যখন চিন্তা করছি আমার ভবিষ্যতে এই হোক সেই হোক তখন যেখানে আমার প্রাপ্যটা জমা হয় সেই পাত্রটাকে ফুটো করে দিচ্ছি। আমার প্রাপ্যটা আসতে চাইছে কিন্তু যখন ছটফট করছি তখন বেচারী ঘাবড়ে যায়, এর কাছে তো যাচ্ছি কিন্তু আমাকে রাখতে পারবে কিনা কে জানে। তখন সে বলে এখন থাক, পরে যাব আগে একটু শান্ত হোক। তার ফলে যেটা আসার ছিল সেটা পিছিয়ে গেল। আমার প্রাপ্যটা নষ্ট কখন হবে না, কিন্তু পিছিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে কবে আমি শান্ত হব। এত কথা যে বলা হচ্ছে এগুলো কোন তাত্ত্বিক কথা নয়, আমরা মানি আর নাই মানি কিন্তু এটাই সত্য। বর্তমানে যা আছে সেটাকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাক আর ভবিষ্যতে তোমার ভাগ্যের উপর নির্ভর করে থাক, যেটা আসার ঠিক এসে যাবে। কাজ করাটা কোথাও বন্ধ করতে বলছেন না। কাজ বন্ধ করতে বলা হয় একমাত্র সন্ন্যাসীদের। সন্ন্যাসীদের বলা হয় তুমি জাগতিক কোন কাজ করতে যাবে না, কিন্তু তোমার জপ, ধ্যান, তপস্যাকে চালিয়ে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত কাজ সবাইকেই করতে হবে। এই জগৎ মানেই তাই, কাজের জন্যই এই জগৎ দাঁড়িয়ে আছে।

মহাদেব বারবার একটা কথাই বলছেন, যেটা মহাভারতের বিশেষত্ব, সেটা হল ধর্ম সাধনে কখন কামকে বন্ধ করা যায় না। কিন্তু নিজের স্ত্রীতেই শুধু আবদ্ধ থাকবে তার বাইরে কোন রকম দৃষ্টি দেবে না। সেইজন্য বলাই হয় ‘এক নারী ব্রহ্মচারী’। নিজের স্ত্রীতেই যদি তুমি তোমার কাম সাধনকে আবদ্ধ রাখ তাতেই তোমার স্বর্গ নিশ্চিত। যখনই আমরা উপনিষদের তত্ত্ব যাব বা যে কোন আধ্যাত্মিক পথে যাব তখন আমাদের প্রথমেই বলে দেবে তুমি কাম বাসনা থেকে দূরে থাক। প্রথমে যে ধর্ম, অর্থ ও কাম মার্গের যে কথা বলা হয়েছে, মুক্তি মার্গে গেলে প্রথমেই কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলবে, অর্থাৎ অর্থ আর কামকে ত্যাগ কর, শেষে ধর্মকেও ত্যাগ করব। আমরা এখন যেটা আলোচনা করছি, এটা হল ধর্মমার্গের কথা। ধর্মমার্গে কখনই কামকে বন্ধ করা যায় না। ঠাকুরও বলছেন স্বদারায় গমনে দোষ নেই। ঠাকুর যেহেতু কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলছেন তাই আমার স্ত্রীর কাছে যাওয়া ঠিক হবে না যারা মনে করছে, তা নয়। গৃহস্থের ধর্ম তোমাকে পালন করতে হবে। তবে এটাও বলছেন একটি দুটি সন্তানের পর স্বামী স্ত্রী ভাইবোনের মত থাকবে। প্রথমের দিকে অনুমতি দিচ্ছেন। কিন্তু অপরের স্ত্রীর প্রতি কোন ধরনের দৃষ্টি দেওয়া একেবারেই নিষেধ।

এই যে এতক্ষণ ভগবান শিব যত কথা বললেন, টাকা-পয়সা নিয়ে, স্ত্রীকে নিয়ে, এই কথাগুলোকে বলা হচ্ছে দেবকৃত মার্গঃ। দেবতারা এই পথ বানিয়েছেন। এই পথকে অর্থাৎ শীল আর সদাচার পালন করলে রাগ আর দ্বেষ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উক্তি। এখানে আমাদের জীবিকা সম্বন্ধে অর্থাৎ অর্থ উপার্জন করে আমাদের জীবন কিভাবে চলবে সেটা বলা হচ্ছে, ভোগ কিভাবে করবে আর ধর্ম পালন কিভাবে হবে বলা হল। টাকা-পয়সার ব্যাপারে তিনটে পয়েন্ট বলছেন, ধর্ম মতে যেটা উপার্জন করছ আর দ্বিতীয় যেটা আছে সেটাতোই সন্তুষ্ট থাকবে, তৃতীয় ভবিষ্যতে এটাকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতে হবে। কামের ব্যাপারে বলছেন – নিজের স্ত্রীর বাইরে আর কারুর দিকে তাকাবে না। ধর্মের ব্যাপারে বলছেন – সত্য আর অহিংসা এই দুটোতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। সব কটিকে একত্রে বলছেন শীল সদাচার। বাকি যা কিছু আছে সব কিছু এইখান থেকেই বেরিয়ে আসবে। মহাভারতে এখানে মজার ব্যাপার হল, পর পর শ্লোকে বলে যাচ্ছেন এটা করলে স্বর্গ নিশ্চিত, তারপরেই দুম্ব করে এখানে বলে দিলেন – এগুলো পালন করতে কেন বলা হল? রাগ আর দ্বেষ থেকে দূরে থাকার জন্য। রাগ আর দ্বেষ থেকে যদি বেঁচে যাই তাহলে কি হবে? আমার আর শোক আর মোহ হবে না। শোক আর মোহ না হলে কি হবে? সংসারমুক্তি। সংসার মানেই শোক আর মোহ। শোক মানে যেটা ছিল সেটা চলে যাওয়াতে শোক হচ্ছে আর মোহ মানে যেটা নেই সেটাকে পাওয়ার ইচ্ছা। মানুষের যত অশান্তি, দুঃখ, দুর্দশা সব এই শোক মোহের জন্যই। একজনের সন্তান হচ্ছে না সেইজন্য সে কষ্টে আছে, আরেকজনের সন্তান হয়েছে হয় সে মরে গেছে নয়তো উচ্ছ্বসে গেছে সেইজন্য কষ্টে আছে। একজনের চাকরি হচ্ছে না সেইজন্য মোহে পড়ে আছে, আরেকজনের চাকরি চলে গেছে সেইজন্য শোক করছে। এর মধ্যেই মানুষ জন্ম জন্ম ধরে ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে। এখানে আসক্তি আর মোহকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। আসক্তি হল, যে জিনিষটা আমার কাছে আছে সেটাকে ধরে রাখার ইচ্ছা। মোহ আরেকটু এগিয়ে, যেটা নেই সেটাকে পাওয়ার ইচ্ছা। আসক্তিতে কষ্ট হয় না, যে জিনিষটা আছে সেটা চলে গেলে শোক হয়। আসক্তিটা হল দুটোরই মূলে, আর তার ফলটা হল শোক আর মোহ, জিনিষটা আছে চলে গেল, সেটাকে ভেবে এখন শোক হচ্ছে। যতক্ষণ ধরে আছি ততক্ষণ আনন্দেই আছি। মোহের ক্ষেত্রে কি হয়, কিছু টাকা জমিয়েছি একটা ভালো বাড়ি করতে হবে বলে। একটা বাড়ি করতে হবে এই ভেবে ভেবে বাড়ির প্রতি একটা মোহ জন্মে গেছে। কোন কারণে এখন জমান টাকাগুলো বেরিয়ে গেল। এমনি টাকা বেরিয়ে গেলে যে কষ্ট হত এক্ষেত্রে তার দ্বিগুণ কষ্ট হবে, তার কারণ টাকা যেটা ছিল সেটাতো গেলই আর একটা যে স্বপ্ন ছিল বাড়ি হবে সেটা ভেঙে গেল। আসক্তিতে একটা জিনিষকে ভেবে

ভেবে সেটার প্রতি একটা ভালোবাসা জন্মে গেছে, এবার ঐটাকে যখন পেতে চাইছি তখন সেটা হয়ে গেল মোহ, আর যেটা চলে গেল সেখানে এসে গেল শোক।

শাস্ত্রের তাহলে কি মূল উদ্দেশ্য? বেদাদিতে যে বলা হচ্ছে তুমি এই যজ্ঞ কর, এই কর সেই কর তাহলে তুমি স্বর্গে যাবে, ঋষিদের আদর্শেই স্বর্গ উদ্দেশ্য নয়। বেদের ঋষিরা খুব ভালো ভাবেই জানতেন যে স্বর্গ বা নরকের কোন গুরুত্ব নেই। বেদে তো নরকের কথাই বলা হয়নি। স্বর্গের কথা বলছেন কিন্তু নরকের কথা বলছেন না। কেন বলছেন না? কারণ কে জানে স্বর্গ নরক বলে কিছু আছে কিনা। মাঝে মাঝে প্রশ্ন ওঠে মৃত্যুর পর কি আছে কে দেখেছে আর কে জেনেছে? মৃত্যুর পর কি আছে আমরা কি করে বলছি? ঋষিরা যেকালে বলে গেছেন সেকালে মানতে হয়। সেইজন্য ঠাকুরও কখন স্বর্গ নরক নিয়ে কোন কথা বলেননি। স্বামীজী এগুলোর উপর কোন জোর দেননি। শ্রীমা একজন গ্রাম্য মহিলা, তিনিও একবারও স্বর্গাদি নিয়ে কোন কথা বলেননি। এনার তাহলে কি বললেন? রাগ দ্বেষ থেকে বেরিয়ে এস। তাহলে কি হবে? তোমার জীবন তখন একটা অর্থপূর্ণ হবে। পুনর্জন্মে যদি বিশ্বাস থাকে তাহলে ভালো জায়গাতেই জন্ম হবে, আর পুনর্জন্ম যদি না থাকে তাহলে ভালো ভাবে জীবন-যাপন করে জীবনকে তাৎপর্যময় করতে পারবে। স্বর্গের যে প্রলোভন দেওয়া হয়, এটাকে শঙ্করাচার্য খুব সুন্দর বলছেন, বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় বাচ্চা হয়ত দুধ খেতে চাইছে না, তখন তাকে বলা হয়, বাবা দুধটা খেয়ে নাও তাহলে তোমার চন্দ্রিমা বাড়বে। তার মানে তুমি খুব ফর্সা হবে। আরেকটা বলে তুমি দুধ খেয়ে নাও তাহলে তোমার চটিবর্ধন হবে, মানে তোমার চুল তাড়াতাড়ি লম্বা হবে। বাচ্চারা এগুলো খুব পছন্দ করে। তখন বাচ্চা নাক সিঁটকেও খেয়ে নেবে। স্বর্গাদির ব্যাপার এইটুকুই। এগুলো পালন করলে মৃত্যুর পর তুমি উচ্চ স্বর্গে যাবে। উচ্চ স্বর্গের লোভে যখন এগুলো পালন করতে শুরু করল তখন সে আস্তে আস্তে রাগ আর দ্বেষ থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। আসল উদ্দেশ্য এইখানেই। স্বর্গে যাবে কি যাবে না সেটা তো পরে, কিন্তু তার আগে রাগ দ্বেষটা নিয়ন্ত্রণে চলে এল।

উমা এইখানে ভগবান শিবকে প্রশ্ন করছেন ‘হে ভূতনাথ! বাণী দিয়ে কি ধরনের কর্ম করলে মানুষ বন্ধনে পড়ে না বা বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়?’ প্রথম কর্মের ব্যাপারে বলা হল, এবারে বলছেন বাণী নিয়ে। তখন ভগবান শিব বলছেন *আত্মহেতোঃ পরার্থে বা নর্মহাস্যাশ্রয়াত্তথা। যে মৃষা ন বদন্তীহ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।।১৪/১২২/১৮।* যে নিজের জন্য বা পরের জন্যও বা হাসিতে বা মজা করার জন্যও কক্ষণ মিথ্যা কথা বলে না, তারা স্বর্গলোকে যায়। এর আগেই মহাভারত বলছে পাঁচটি ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা যায়, সেখানে সত্যি কথা বললে পাপ লাগবে। আর এখানে ভগবান শিব বলছেন কক্ষণ মিথ্যা কথা বলবে না। ঠাকুরও বলছেন সত্য কথা কলির তপস্যা। ঠাকুর স্বামী ব্রহ্মানন্দকে, তখন তিনি যুবক রাখাল, মজাতেও মিথ্যে কথা বলতে নিষেধ করছে। তাহলে কোনটা ঠিক? মহাভারতের এটাই বিশেষত্ব, মহাভারত আমাদের অনেকগুলো পথ দিয়ে দিলেন। এবার আমাদের যে কোন একটা পথকে ধরতে হবে, ধরার পর ঐ পথকে দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরে চলতে হবে। সব ধর্মগ্রন্থ ঠিক ঠিক পড়া না থাকলে এগুলো বোঝা যায় না। যে কোন একটা পথকে আমাকে ধরতে হবে আর সেই পথ মত চলতে হবে। আসলে আমরা কি কোন একটা পথকে ধরতে পেরেছি যে আমি এটা করবই করব? রোজ সকাল সাতটায় আমি চা খাবই খাব, যদি সাতটা বেজে দু মিনিট হয়ে যায় সেদিন আমি আর চা খাব না। তখনই আমার তপস্যা শুরু হয়ে গেল। আমি যদি বলি অপরের মঙ্গলের জন্য, ভালোর জন্য যদি দরকার হয় আমি মিথ্যে কথা বলব, তাতে যদি আমার পাপ লাগে তো লাগুক। সত্যের শেষ পরীক্ষা হল স্বার্থহীনতা। স্বার্থহীনতাতে যখন কোন পথ এসে যাচ্ছে তখন সেটাই আধ্যাত্মিকতায় প্রবেশ করে গেল, তখন সেটা আর ধর্ম থাকছে না। তখন তিনি সত্য মিথ্যার পারে চলে গেছেন। কিন্তু এই কথা গুলো সাধারণ লোককে বলা হচ্ছে। কারণ শাস্ত্রের কথা শুনে যখন সে ঠিক করে নিল আমি হাসি ঠাট্টাতেও মিথ্যে কথা বলব না, তখন আগে সে যেখানে দিনে একশটা মিথ্যে কথা বলত এখন থেকে সে হয়তো দুটো মিথ্যে কথা বলবে। মিথ্যে কথা বলাটা কমে গেলে সেতো তখন মহৎ হয়ে গেল।

আবার বলছেন *বৃত্ত্যর্থং ধর্মহেতোর্বা কামকারান্তথৈব চ। অন্তং যে ন ভাষন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।।১৪/১২২/১৯।* যারা আজীবিকা মানে পেট চালাবার জন্যও মিথ্যে কথা বলে না, ধর্মের জন্য মিথ্যে কথা বলে না আর স্বেচ্ছাচার মানে মন যাদের অনিয়ন্ত্রণ থাকে তাতেও যারা মিথ্যা কথা বলে না, এরা সবাই স্বর্গে যাবে। এখানে তিনটে শর্তের কথা বলা হল, প্রথম হল আজীবিকা, পেট চালাবার জন্য যেটা রোজগার করতে হচ্ছে তার জন্যও সে কখন মিথ্যে কথা বলবে না। মহাভারতের সময় মিথ্যে কথা বলা, চুরি করা আর ভ্রষ্টাচার পুরো দমেই ছিল, এই সমস্যাগুলো

চিরদিনের, তা নাহলে এই কথাগুলো এখানে এত ভাবে বলা হত না। এই ধারা এখনও ভারতে চলে আসছে, এগুলো নতুন কিছু নয়। এখন ভারতে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সব ভ্রষ্টাচারে সিদ্ধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বলছেন, ধর্মের জন্য মিথ্যে কথা বলবে না। আমরা একটা মন্দির বানাচ্ছি, মন্দির বানাতে হয়তো দশ লাখ টাকা লাগবে। দেখলাম আট লাখ টাকা সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। এখন দুই লাখ টাকার জন্য আবার লোকের কাছে হাত পাততে হবে, লোকেরা নাও দিতে পারে তাই বলে দিলাম আমাদের পাঁচ লাখ টাকা মাত্র এসেছে। মিথ্যে কথা কেন বলছি? যাতে লোকে আরও কিছু টাকা দেয়। ইতিমধ্যে আমরা হিসাব করছি মন্দিরের কাছে একটা পুকুর কাটিয়ে নেব। পুকুরের নাম করে লোকের কাছে টাকা চাওয়া যাচ্ছে না, তাই মন্দিরের নাম করেই টাকা তুলে নেব। এখানে আমরা ধর্ম কার্যই করছি, নিজেরা টাকা ভাগ বাটোয়ারা করে নেব বলে বলছি না, কিন্তু একটা কায়দা করে মিথ্যে কথা বলে টাকা আদায় করছি। তৃতীয় হল স্বেচ্ছাচার। বদমাইসি করে বেড়াচ্ছে, বেলেলাপনা করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তখনও তারা মিথ্যে কথা বলছে না।

পরশং যে ন ভাষন্তে কটুকং নিষ্ঠুরং তথা। অপৈশুন্যরতাঃ সন্তস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ। ১৪/১২২/২১।

কড়া কথা, রক্ষ ও নিষ্ঠুর কথা বলে না। মানুষ যদি রেগে যায় তখন সে অপরকে নিষ্ঠুর কথা বলে দেয়। একজন অন্ধ, সে হয়তো কিছু ভুল করে ফেলল, তখন রেগে বলে দিচ্ছে ‘তুমিতো জন্মাক্ষ, তুমি আর এগুলো কি বুঝবে’। রিক্সাওয়ালার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলে বলে দেবে ‘চালাও তো রিক্সা তার ওপর আবার বড় বড় কথা বলতে আসছ’। এগুলো হল রক্ষ কথা। কিন্তু এই ধরনের রক্ষ কথা, কটু কথা বলা অত্যন্ত ক্ষতিকর। রেগে গেলে, ক্রোধ এসে গেলে ক্ষতিকারক দিকটা আমাদের মাথায় থাকে না বলে এই ধরনের কটু কথা বলে ফেলি। সেইজন্য আগে থাকতেই আমাদের এই ব্যাপারে খুব সজাগ থাকার প্রয়োজনে মুখের লাগামকে ঠিক রাখার জন্য কঠোর অনুশীলন করতে হয়। আর অপৈশুন্যতা, পিশুনিবৃত্তি, পিঠে ছারপোকাকার মত কামড়ান। মানে আড়ালে কারুর নিন্দা করা। এক মহারাজ খুব মজা করে বলতেন ‘একজন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। স্যালাইন চলছে, অক্সিজেন চলছে, কথা বন্ধ হয়ে গেছে। তার সামনে যদি কারুর নিন্দা করা হয়, ঐ নিন্দা শুনে সেই মৃত্যুপথ যাত্রীও সোজা উঠে বসে বলবে এই ব্যাপারে আমারও কিছু বক্তব্য আছে’। অপরের নিন্দা করে মানুষের এমন আনন্দ হয় কল্পনা করা যায় না। প্রথমে বললেন উপহাস করা, কটু কথা বলা, এগুলো কারুর মুখের উপর বলে দেওয়া হচ্ছে। এগুলো হল ঔদ্ধত। এরা আবার খুব গর্ব করে বলে ‘আমি কিছু আড়ালে বলি না, যা বলার সামনেই বলি’। এটাকেই বলা হয় ঔদ্ধত। এর পরের ধাপটা হল পিশুনিবৃত্তি। উনি বড় বলে তার মুখের উপর কিছু বললাম না, কিন্তু জান তার এই এই গোলমাল আছে। বলেই একের পর এক গোলমালে জিনিষগুলি নিয়ে বলতে থাকবে। এটাই হল পিশুনিবৃত্তি। এর নীচে হয় পরিহাস করা। এই তিনটে ধাপ বলা হল – একটা হল কটু কথা বলা, যারা আমার নীচে তাদেরকে হীন মনে করে কটু কথা বলা হল আর যে আমার উপরে তার মুখের কিছু বলা হল সেটা হয়ে যাবে ঔদ্ধত। এরই পেছনে আছে পিশুনিবৃত্তি। এর নীচে হল পরিহাস করা।

এই ধরনের কিছু কথা বলার পর বলছেন, এমন কথা বলতে নেই যাতে দুজন বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া হয়ে যেতে পারে। আমি হয়তো আমার এক বন্ধুর নামে আপনাকে কিছু বলেছি। সেই বন্ধু এখন বারবার আপনাকে জিজ্ঞেস করছে আমি আপনাকে তার নামে কি বলেছি। আপনি বলে দিতে পারেন, তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু বলে দিলে বন্ধুর সাথে আমার চিরদিনের মত সম্পর্কটা খারাপ হয়ে যাবে। যাতে দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া হয়ে যেতে পারে সেই ধরনের কথা কখনই বলতে নেই। এখানে সত্য কথাই বলা হচ্ছে কিন্তু তাতে দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হয়ে মনোমালিন্য হয়ে যেতে পারে। মহাদেব কিন্তু পরিস্কার তিনটে কথাতে জোর দিয়েছেন, সত্য কথা বলবে, মিথ্যে কথা বলাকে পুরোপুরি ত্যাগ করবে আর শুভদায়ক কথাই বলবে। পার্বতী তারপর মানসিক কর্ম নিয়ে প্রশ্ন করছেন। মানসিক কর্ম মানে, মন দিয়ে আমরা যত ধরনের চিন্তা ভাবনা করি। পার্বতী জিজ্ঞেস করছেন কি কি ধরনের চিন্তা ভাবনা করলে মানুষ কর্ম বন্ধনে পড়ে না এবং মুক্তির দিকে এগোতে পারে।

আমাদের জীবনের সব কিছুই চলে মনকে নিয়ে। বলা হয় ফলেন পরিচয়েৎ, আমরা কি ধরনের চিন্তা ভাবনা করছি সেটা বোঝা যায় ফল দিয়ে। চিন্তার ফলটা হল কার্য। আমি কি ধরনের চিন্তা ভাবনা করছি, মনের মধ্যে কি কি চিন্তা চলছে, আমি কতটা সৎ না অসৎ, এগুলো সব ধরা পড়ে আমার কার্য দিয়ে। চিন্তা আর কার্যের মধ্যবর্তী অবস্থাটা হল বাণী। এই বাণীর এমনিতে কোন মূল্য নেই, বাণীর একমাত্র ভূমিকা হল চিন্তা আর কর্মের মধ্যে সংযোগ ঘটানো। মানুষ যখন শুভ অশুভ যে কাজই করতে বাসনা করে প্রথমে তার মনে বিচার ওঠে। সেই কাজটা ভালো মন্দ যাই হোক করার আগে কাছের লোকদের বলতে শুরু করে। যারা সৎ থেকে অসতের পথে পা বাড়ায় তার আগে সে বন্ধুদের বলে বেড়াবে ‘আমি

কিন্তু এই রকম করব’। সেইজন্য বলা হয় মানুষ যখনই কোন কথা বলে সে কথাকে কখনই হাক্কা ভাবে নিতে নেই। যারা খুব পরিহাস প্রিয়, ইয়ার্কি মজা করতে ভালোবাসে তারা অনেক সময় নিজের মনের ভাবকে গোপন করে কিছু অন্য কথা বলেন। তবে এই ধরনের লোকের সংখ্যা খুব নগণ্য। ঠাকুরের সামনে একজন ভক্ত কিছু একটা কথা বলছেন, তখন ঠাকুর সেই ভক্তকে বলছেন ‘এটা কিন্তু তোমার মনের ভাব নয়’। মনের ভাব এক রকম আর মজা করার জন্য বা অন্য কিছু কারণে একটা অন্য রকম কথা বলে দেওয়া হয়, তবে এই জিনিষ খুব কম দেখা যায়। সাধারণতঃ দেখা যায় মনের ভাব প্রথমে বেরোয় বাণী দিয়ে। মনের ভাব বাণী দিয়ে বেরিয়ে যাবার পর সেটাই আবার কর্ম হয়ে বেরোয়। মন, বাণী আর কর্মের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য থাকে না। মহাভারতের এখানে আলোচ্য বিষয় হল আমি কিভাবে ধার্মিক হব, আমি কিভাবে ভগবানের দিকে এগোব। ধার্মিক হওয়া বা ভগবানের পথে এগোবার জন্য মন, বাণী ও কর্ম এই তিনটির কোন একটাতে আঘাত হানতে হবে। আমি যদি ভাবি জীবনে অনেক কিছুই করা হয়ে গেছে এবার থেকে আমাকে কিছু শুভ কর্ম করতে হবে। তাহলে এখানে সব থেকে ভালো হল শুভ কর্ম শুরু করে দেওয়া। এটা না হলে দ্বিতীয় উপায় হল মনের মধ্যে সব সময় সৎ চিন্তন নিয়ে থাকা। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা মনে সৎ চিন্তন নিয়ে থাকা যায় না। সেইজন্য আমাকে গঙ্গা স্নান করতে হবে, তীর্থ করতে হবে, ঠাকুরের মন্দিরে যেতে হবে, পূজো জপ-ধ্যান করতে হবে। এই দুটোর মধ্যে যদি কোনটাই না পারি তাহলে মুখে আমাকে নিয়মিত বলে যেতে হবে আমাকে শুভ কর্ম করতে হবে বা উচ্চস্বরে শাস্ত্রের মন্ত্র বা শ্লোক আবৃত্তি করতে থাকব। এইভাবে শাস্ত্র নিয়মিত পাঠ করলে মনকেও প্রভাবিত করে আর আমার যে কার্যসিদ্ধি হওয়ার সেটাকেও কোথাও না কোথাও প্রভাবিত করবে। আমরা শুনে এসেছি মন, বাণী ও ক্রিয়া এই তিনটেকেই ঠিক করতে হবে। আসলে তা নয়, যে কোন একটাকে ঠিক করতে পারলে বাকি দুটোও আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

ঠাকুর গৃহস্থদের জন্য বলছেন তোমরা মন থেকে ত্যাগ কর। গৃহস্থরা ঠাকুরের কথা শুনেছেন, কথামৃত পড়েছেন, ঠাকুর বলছেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে। অথচ গৃহস্থদের পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করা সম্ভব নয়, আর উচিতও হবে না, কারণ তার স্ত্রী রয়েছে, পুত্র রয়েছে, আত্মীয় স্বজনরা রয়েছে। কিন্তু গৃহস্থ মন থেকে ত্যাগ করবে, আমার এগুলো আর ভালো লাগছে না, কিন্তু যেহেতু আমার সংসার রয়েছে আমিও সংসারে রয়েছি তাই এগুলো করতে হচ্ছে। সন্ন্যাসীদের জন্য ঠাকুর বলছেন মনে ত্যাগ আর বাইরে ত্যাগ এই দুটোই থাকবে। আর যারা বাইরে ত্যাগ করে দেয় কিন্তু মনে মনে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে তারাও কিন্তু এক ধাপ এগিয়ে গেছে, কারণ সে সামাজিক কলঙ্ক থেকে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু এটা এমন বিরাট কিছু নয়। কিন্তু যারা আধ্যাত্মিক পথে চলে এসেছে তাদের কাছে সামাজিক ব্যাপার গুলো খুব তুচ্ছ হয়ে যায়। তাকে যেটাই করতে হবে সেটাতে নিজেকে লক্ষ্য রেখে করতে হয়। সমাজে কে কি বলল সেটা কোন গুরুত্ব নয়, আমাকে আমার নিজেরটা দেখতে হবে। সেইজন্য আধ্যাত্মিক পথের লোকদের শরীর, মনকে সব দিক থেকে সরিয়ে নিতে হবে। আর বাইরের কর্ম দিয়ে যা করার করলেও তাতে কোন আপত্তি নেই, মনে যেন তার কিছু প্রভাব না থাকে। আধ্যাত্মিক জীবনে এই চালাকি চলে না। বাইরে কিছু করছে না কিন্তু মনের মধ্যে তার রস আশ্বাদন করে যাচ্ছে এরা আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে পারেনা। সাধারণ লোকেরা যে ভক্তদের নিন্দা করে, অমুক বেলুড় মঠে এত লোকচার শুনতে যায়, মন্দিরে যায়, ঠাকুরের নাম করছে আর এদিকে ভোগের মধ্যে ডুবে আছে। কারণ বাইরের কিছু কিছু জিনিষ থেকে সে সরে এসেছে কিন্তু মনের দিক থেকে এখনও সরে আসতে পারছে না। মূল কথা হল মন, বাণী আর ক্রিয়া এই তিনটির কোন একটাকে প্রথমে ধরতে হয়। একটাকে যদি ঠিক করা হয়ে যায় আস্তে আস্তে বাকি দুটোও নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। অবশ্য এই ব্যাপারে আমাকে সচেতন হতে হবে যে আমাকে আধ্যাত্মিক পথে এগোতে হবে তাই এই তিনটেকেই নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। সচেতন না থাকলে কিন্তু কিছুই হবে না। যেমন একটা বাচ্চা ছেলেকে মেরে বেঁধে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে বলছে আজকে আর খেলতে যেতে পারবে না। কিন্তু তাই বলে বাচ্চাটা তো পাটে যাবে না। যেমনি সুযোগ পাবে আবার তিড়িং করে পালিয়ে যাবে। কেন দুষ্টুমি করতে নেই, কেন অবাধ্য হতে নেই, এই ব্যাপারে বাচ্চা সচেতন নয় বলে পাটে যাচ্ছে না।

মানসিক কর্মের ব্যাপারে পার্বতি যে প্রশ্ন করছেন তার উত্তরে মহাদেব বলছেন ‘হে কল্যাণী! যিনি সব সময় মন থেকে ধর্মের চিন্তন করেন এবং আচরণ করেন ঐরাই স্বর্গে যায়’। তাহলে ঠিক ঠিক মানসিক কর্মটা কি? মন থেকে সব সময় ধর্ম করা আর মন থেকেই ধর্মের সব কাজ করাটাই ঠিক ঠিক মানসিক কর্ম। যেমন আমরা যখন জপ-ধ্যান করছি তখন খুবই ভালো কাজ করছি, এইবার যখন জপ-ধ্যান করছি না তখনও ঐটাই চিন্তন করে যেতে হবে। অধর্মীয় জিনিষ কখনই চিন্তা করতে নেই। যখন দেখছি সব সময়ই আমার মনের মধ্যে ধর্মের জিনিষগুলোই ঘুরছে তখন আমি কিন্তু স্বর্গে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলেছি। আসলে সব সময় ধর্ম বিষয়ক চিন্তা নিয়ে থাকলে মানুষ রাগ আর দ্বেষ থেকে বেরিয়ে আসে, কিন্তু এখানে সাধারণ লোকদের জন্য বলা হচ্ছে বলে স্বর্গের কথা বলা হচ্ছে। ভগবান শিব বলছেন

দুশ্প্রণীতেন মনসা দুশ্প্রণীততরাকৃতিঃ। মনো বধ্যতি যেনেহ শৃণু বাক্যং শুভাননে।।১৪/১২২/২৯। যখন মনে কুবিচার, কুচিন্তা গুলো আসতে থাকে তখন ধীরে ধীরে তার কর্মগুলো খারাপ হতে থাকে। মন যাদের বিষাক্ত থাকে তার কর্মগুলোও বিষাক্ত হয়ে যায়। যদি কেউ বলে উনি মুখে কটু ও কড়া কথা বললে কি হবে ভেতরে একেবারে পরিষ্কার। কিন্তু কখনই তা হয় না, ভেতরের তার কিছু গোলমাল থাকতে বাধ্য। ভেতরে গোলমালের বৃত্তি আছে বলেই মুখ থেকে বাঁঝালো কটু কথা গুলো বেরোচ্ছে। এখানে সংস্কৃতে শব্দটা হল দুশ্প্রণীত, মানে যেগুলো শুভ নয়। ভেতরে যদি অশুভ কিছু থাকে তার কাজগুলোও সেই ধরণের হবে। মা যদি নিজের ছেলেকে রেগে বলে, তাকে মেরে শেষ করে দেব, তাহলে বুঝতে হবে ঐ মায়ের ভেতর হিংসার ভাব রয়েছে, নিজের ছেলেকে মেরে ফেলবে না ঠিকই আর অমানবিক ভাবে মারবেও না, কিন্তু এমন কোন একটা পরিস্থিতি যদি এসে যায় তখন দরকার পড়লে সে নিজের স্বামী বা অন্য কাউকে খুন করে দিতে পারে। কারণ ঐ বৃত্তিটা তার ভেতরে আগে থাকতেই আছে, যে বৃত্তিটা ছেলের প্রতি বাণী দিয়ে বেরোচ্ছে।

একজন নামকরা ইংরাজী লেখকের একটা গল্পে আছে, এক দম্পত্তি, তাদের অনেক বয়স হয়ে গেছে। কোন কারণবশতঃ, স্বামী স্ত্রীকে বলছে ‘দেখো, আমি তোমাকে অনেক দিন ধরেই বলতে চাইছিলাম কিন্তু বলা হয়নি, আমি তোমাকে ছেড়ে আরেকজনকে বিয়ে করতে যাচ্ছি’। স্ত্রী স্বামীকে একটি কথাও বলল না। সেদিন গরুর পেছনের একটা ঠ্যাং বাজার থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল মাংসের একটা বিশেষ পদ রান্না করার জন্য। স্ত্রী গিয়ে সেই মাংসের ঠ্যাংটাকে তুলে নিল। আস্তে করে স্বামীর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর সজোরে স্বামীর মাথার পেছন দিকে ঐ ঠ্যাংটা দিয়ে মারতেই স্বামী ঐখানেই সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। তারপর গিয়ে সেই মাংসের ঠ্যাং থেকে মাংস ছাড়িয়ে রান্না করেছে। রান্না করতে করতেই পুলিশে খবর দিয়ে বলছে আমার স্বামী এইখানে মারা গেছে। পুলিশ এসে দেখছে সত্যিই বয়স্ক ভদ্রলোক মরে পড়ে আছে। স্ত্রী বলছে ‘আমি তো মাংস রান্না করছিলাম, মাংস চাপিয়ে আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম আর এসে দেখছি এই কাণ্ড’। পুলিশ দেখছে মাথার পেছনে রক্ত লেগে জমাট হয়ে আছে। স্ত্রী একটু কান্নাকাটি করল। পুলিশের লোকরা এই পরিবারের সঙ্গে আগে থাকতেই পরিচিত ছিল। ভদ্রমহিলা পুলিশদের বলল ‘আমি মাংস রান্না করেছি, আপনার এখান থেকে খাওয়া-দাওয়া করেই জান’। পুলিশের সবাই খেতে বসেছে। সেখানে একজন পুলিশ কর্তা মজা করেই বলছে ‘আমরা যে মাংসটা খাচ্ছি এটাই হয়তো এই খুনের কোন সাক্ষ্য প্রমাণ’। কোন সাক্ষ্য প্রমাণই ছিল না। যেটা দিয়ে মারা হয়েছে সেটাকেই রান্না করে সবাইকে খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। ভেতরে হিংসা যদি না থাকে কখনই কেউ এইভাবে খুন করতে পারবে না। খবরের কাগজে খুনের কাহিনীগুলো পড়লে আমরা অবাক হয়ে যাই। কত রকম ভাবে মানুষ মানুষকে খুন করে যাচ্ছে। এমনি সাধারণ অবস্থায় কিন্তু বোঝা যাবে না যে এই লোকটা কোন দিন কাউকে খুন করতে পারবে। কিন্তু দু একটা কথা যে বলছে তাই দিয়েই অভিজ্ঞ লোকরা ধরে নেয় এর ভেতরে হিংসার ভাব আছে। কোন মানুষকে বুঝতে হলে শুধু তার নেতিবাচক কথাগুলোকে লক্ষ্য করে যেতে হবে। নেতিবাচক যে কথাগুলো বলছে আজ হোক কাল হোক ওকে ওখানে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বাণীর অনুরূপ কার্য করিয়ে ছাড়বে। কারণ এদের মধ্যে নিজেকে উপরে টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাটা নেই কিনা। এই কথা ভগবান শিব বলছেন, মনে যা গোলমাল থাকে কার্যে সেটাই পরিণত হয়, মাঝখানে বাণী থেকে থেকে সেটাকে জানান দিতে থাকে। বাণীকে লক্ষ্য করা থাকলে কার্যে পরিণত যখন হচ্ছে তখন আর অবাক হওয়ার কিছু থাকে না।

মহাদেব বলছেন, যেমনি মন দূষিত হয়ে গেল মন তখনই বন্ধনে পড়ে গেল। ইদানিং কালে আমেরিকায় একজন নামকরা লেখক এসেছেন তাঁর নাম জন বীসন। তাঁর বেশীর ভাগ উপন্যাসই আইনের জগৎ থেকে নেওয়া। ওনার একটা উপন্যাসে আছে একজন যুবক আইন পাশ করার পরে তাকে সঙ্গে সঙ্গে একটা কোম্পানী আইনের পরামর্শদাতা রূপে চাকরি দিয়েছে। কাজে যোগ দেওয়ার পর প্রথমের দিকে তাকে দিয়ে কিছু ভালো পরিষ্কার কাজ করিয়ে নিয়েছে আর তারই মাঝে মাঝে কায়দা করে তাকে দিয়ে কখন যে যত রকমের ভুলভাল বেআইনি কাজ করিয়ে সই করিয়ে নিয়েছে সে বেচারি টেরও পারেনি। তারপর আস্তে আস্তে কোম্পানী তাকে পুরো কজা করে নিয়েছে। কজা করে নিয়ে এবার তাকে বাধ্য করাচ্ছে তোমাকে এই কাজ গুলো করতে হবে। ছেলেটি যখন দেখছে এগুলো বেআইনি তখন সে বলে দিল ‘এই কাজ তো আমি করতে পারিনা’। কোম্পানীও তাকে বলছে ‘করতে পারো না মানে! এর আগেও তো তুমি এই কাজ করেছ, এই তো এত এত কাগজে সই করেছ’। এখন ছেলেটি ফেঁসে গেছে। তারপর থেকে কাহিনীটা শুরু হচ্ছে। এখন ছেলেটি এদের খপ্পড় থেকে বেরোনের চেষ্টা করতে শুরু করেছে। কিন্তু বেরোনের কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। মনের এটাই স্বভাব, মনে যখনই কোন দুষিত বিচার এসে গেল তখনই সে ফেঁসে গেল। ঠিক এই কারণে সাধকের সাধনার জীবনে কত যে সাবধানে থাকতে হয় সাধারণ লোক ধারণাই করতে পারবে না। একজন ব্রিটিশ মহারাজ নিজের মুখে তাঁর জীবনের একটা ঘটনা

বলেছিলেন। অল্প বয়সে দেশ, ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে এসেছেন। ব্রহ্মচারী অবস্থায় তিনি দিনরাত সাধুদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। তখন বেলুড় মঠে স্বামী শান্তানন্দজী মহারাজ থাকতেন। সেই সময় স্বামী শান্তানন্দজী মহারাজের খুব নামডাক। মহারাজ দুপুর বেলায় স্বামী শান্তানন্দজীর ঘরে গিয়ে তাঁর মাথা ম্যাসেজ করে দেওয়ার জন্য আবদার করতেন। স্বামী শান্তানন্দজী সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ম্যাসেজ করার অনুমতি দিলেন। তিনি একটা চেয়ারে বসে থাকতেন আর মহারাজ রোজ দুপুর বেলা গিয়ে এক ঘণ্টা ধরে তাঁর মাথা ম্যাসেজ করে দিতেন। মহারাজ বলছেন, মাথা ম্যাসেজ করার সময় তিনি জপ করতে থাকতেন। কিন্তু ঠাকুরের চিন্তা ছাড়া একটু যদি অন্য কোন চিন্তা মাথায় এসে যায়, সে যে কোন চিন্তাই হোক না কেন। যেমন আজকে আমি দুপুরে কি খেয়েছি এইটুকু চিন্তা যদি মাথায় এসে যায় শান্তানন্দজী সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে উঁহু করে উঠতেন। উনি বলছেন শেষে আমার আতঙ্ক হয়ে গিয়েছিল, আমি মাথা টিপছি সে সময় ঠাকুর ছাড়া অন্য কোন চিন্তা আসলেই সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে উঁহু উঁহু করে উঠছেন, তার মানে ঐ চিন্তাটা শান্তানন্দজীর মনের মধ্যে গিয়ে ধাক্কা মারছে। এই ব্রিটিশ মহারাজকে আমাদের সন্দেহ করার কিছু নেই। তিনি কার নামে বলছেন? যিনি অনেক বছর আগে দেহ রেখেছেন। তিনি মঠের কোন প্রেসিডেন্ট বা ভাইস-প্রেসিডেন্ট কিছুই ছিলেন না, একজন ভালো উচ্চমার্গের সাধু রূপে তাঁকে সবাই খুব শ্রদ্ধা করতেন। আর এই ঘটনা মহারাজ যখন বর্ণনা করছেন তখন তাঁর চোখ মুখের চেহারাই পাল্টে যাচ্ছে। এই রকম ঘটনা আমার সাথে হয়েছিল ভেবেও তিনি অবাধ হয়ে যাচ্ছেন।

হিন্দুরা পুনর্জন্ম মানতে কেন বাধ্য হয়েছে এটা আমাদের অনেকেরই প্রশ্ন। তার মধ্যে একটা আছে ভূতের সমস্যা। ভূত নিয়ে এমন এমন মহারাজদের জীবনে অভিজ্ঞতা হয়েছে যাঁদেরকে আমরা কখনই অবিশ্বাস করতে পারিনা আর তাঁর কোন উদ্দেশ্যও নেই যে মিথ্যে কথা বলে তিনি কিছু বাহাবা পেতে চাইছেন। যুক্তিবাদীরা যতই যুক্তি তর্ক নিয়ে আসুক এটাকে কখনই মিথ্যা প্রমাণও করে দিতে পারবে না। ভূতটাও আমাদের জীবনের একটা বাস্তব অঙ্গ। আমি মানি আর নাই মানি সেটা আমার সমস্যা। কিন্তু কিছু কিছু মানুষের জীবনে এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে যেটা আমরা কখনই অবিশ্বাস করতে পারি না। সেইজন্য মূল কথা হল মন হল শেষ কথা, যে জানে সে জানে। এটাকে নিয়ে আর প্রশ্ন করা যায় না। আর মনকে কখন নোংরা হতে দিতে নেই।

ভগবান শিব আরও বলছেন *অরণ্যে বিজনে ন্যস্তং পরস্বং দৃশ্যতে যদা। মনসাপি ন হিংসন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।।* ১৪/১২২/৩০। যদি নির্জনে কারুর টাকা পয়সা পড়ে থাকতে দেখার পরেও যে সেই টাকা-পয়সার প্রতি লোভ করে না আর মন থেকেও যে কারুকে হিংসা করে না, তারাই স্বর্গে যায়। নৈতিকতার উপর একটা খুব মজার প্রশ্ন করা হয়। তোমার খুব প্রিয় অন্তরঙ্গ একজন হাসপাতালে মারাত্মক একটা রোগ নিয়ে পড়ে আছে। তার চিকিৎসার জন্য তোমার এক্ষুনি দশ হাজার টাকা দরকার পড়েছে। তোমার হাতে কোন টাকা-পয়সা নেই। এখন আফ্রিকার এক কোন প্রত্যন্ত গ্রামে একজন বুড়ি যার একশ বছর বয়স আর মৃত্যুর জন্য তার প্রাণ ধুক্ ধুক্ করছে। কি ভাবে সে মরবে? তুমি যদি মনে কর 'বুড়িটি এবার মরে যাক' বুড়িটি তক্ষুণি মরে যাবে। আর মরলেই কোটি খানেক টাকা তোমার এ্যাকাউন্টে জমা পড়ে যাবে। সেই টাকা দিয়ে তুমি এখন তোমার প্রিয়জনের চিকিৎসার কাজে লাগাতে পারবে। তুমি এখন ঐ বুড়িকে মরতে দেবে কি দেবে না? তুমি যদি বল মরে যাক, তখন তোমার নৈতিকতা এক রকম হবে। আর যদি তুমি বল আমি তাকে চিনি না, জানি না, তার টাকা কেন আমি নিতে যাব? এগুলো হল নানান রকমের আজগুবি প্রশ্ন। সেইজন্য আমার আপনার ঠিক ঠিক ব্যক্তিত্বকে একান্তেই বোঝা যায়। আপনাকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে একটা জঙ্গলে নির্জন কুঠিয়াতে রেখে দেওয়া হল। সেখানে আপনার খাওয়া-দাওয়া শোওয়ার সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। এখন সারা দিন সারা রাত আমি কি চিন্তা নিয়ে সময় কাটাব? তখন যে চিন্তাটা করব সেটাই হল আমার ভেতরের ঠিক ঠিক চিন্তা। আমি জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ রাহুর মাঝখানে দেখলাম একটা টাকার থলি পড়ে আছে, এখন আমি তুলবো কি তুলবো না তাতেই বোঝা যাবে আমার মনে লোভ আছে কিনা। অথবা সেই রাতে ঐ নির্জন কুঠিয়ায় রাতে একটা যুবতী মেয়ে আশ্রয় চাইতে এল, আমি তাকে আশ্রয় দিলাম। এখন আমার মধ্যে কোন কাম-বাসনা আসছে কিনা তাতেই বোঝা যাবে আমি কি ভাবছি। ঐ অবস্থায় আমরা নিজেদেরকে ঠিক রাখতে পারিনা। এখানে বলছেন, যারা ঐ স্তরে চলে গেছেন তাঁরাই ঠিক ঠিক স্বর্গে যায়। ঐ অবস্থায় নিজেকে ধরে রাখা যে অসম্ভব তা নয়, কিন্তু যাঁরা উচ্চ স্তরের তাঁদের এই সব পরিস্থিতিতে কোন বিকারই আসবে না। এই কথা বলেই বলছেন, এগুলো কে কখনও অভিনন্দনও করবে না। আমি ভাবলাম টাকা পড়ে আছে, কেউ দেখতেও পাচ্ছে না, নিয়ে নিলেই হত। বলছেন নেওয়া তো দূরের কথা এই ধরনের কোন চিন্তাকেও আসতে দেবে না। আর এটাও বলছেন, একান্তে নির্জন কুঠিরে আছেন, কেউ আপনাকে দেখছে না, কেউ জানতে পারবে না, ঐ পরিস্থিতিতে একজন

কামাসক্ত মহিলা, শুধু এমনি এক নারী তা নয়, সে কামাসক্ত আর আপনাকে চাইছে কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি তার সাথে কিছু করছেন না, আমার ধর্ম আমি আমার স্ত্রীর বাইরে কিছু করতে পারব না। এদেরই স্বর্গে গতি হয়। এগুলো করলে যে পাপের কিছু হবে তা নয়, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি না করেন তাহলে আপনি একজন মহৎ পুরুষ। মহৎ পুরুষ আর সাধারণ পুরুষের মধ্যে এইটাই পার্থক্য, সাধারণ পুরুষ মিথ্যে কথা বলছে, ঘুষ নিচ্ছে, মদ খাচ্ছে, ফুঁটি করছে ঝগড়া করছে, নিজের স্বার্থ ছাড়া কোন কাজ করছে না আর এগুলো করাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু যদি না করে তখনই সে মহৎ পুরুষ হয়ে গেল। এত কথা বলার উদ্দেশ্য হল তুমি এখন যে অবস্থাতে আছ সেখান থেকে উপরের দিকে উঠে এস। আসলে ছোটবেলা থেকে আমাদের মধ্যে একটা সংস্কার তৈরী করা দেওয়া হয়েছে, এগুলো ভোগের সামগ্রী আর এগুলো অপ্রয়োজনীয়। ভোগের সামগ্রী তাই আমাদের কাছে হয়ে গেছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এখন মেয়েরা প্লাটিনামের গয়না পড়ছে। যে কোন দিন প্লাটিনাম দেখেনি তার কাছে মনে হবে এটা এ্যালুমিনিয়ামের কিছু বা রূপোর কিছু হবে। যে সোনা কোন দিন দেখেনি তার কাছে সোনারও কোন মূল্য নেই। এক ভদ্রলোক অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি মাঝখান দিয়ে যাবার সময় সেই অঞ্চলের একটি আদিবাসী তার সেবা করেছে। ভদ্রলোক খুশী হয়ে লোকটিকে হাজার খানেক ডলার দিয়েছে। এই আদিবাসী জানেই না ডলার কি জিনিষ। ডলারের ছাপা কাগজগুলো সে উড়িয়ে দিল। লোকটি বলছে এই ছাপা কাগজ উনুনে জ্বালালে ভালো জ্বলবেও না। ডলারের কোন দামই নেই তার কাছে। তারপর ভদ্রলোক তাকে দুটো গরু কিনে দিল। দুদিনেই সে গরু দুটোকে কেটে খেয়ে নিয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়েছে? ছোটবেলা থেকে রঙিন কাগজগুলোকে দামী জিনিষ বলে ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে টাকার গুরুত্বকে জানান হয়েছে। আসলে অস্বিজেন যেভাবে আমাদের জীবনে প্রয়োজনীয়, জল যেভাবে আমাদের প্রয়োজনীয় সেইভাবে এগুলোর কোন গুরুত্বই নেই। যেহেতু এগুলো গুরুত্ব নয় তাই টাকা-পয়সা, ভোগ বাসনাকে ছাড়াও খুব কঠিন নয়।

উমা আবার প্রশ্ন করছেন মানুষ কিভাবে দীর্ঘায়ু হয় আর কি তপস্যা করলে মানুষ দীর্ঘায়ু পায়। অনেক দিন বেঁচে থাকার ঈশ্বা মানুষের মধ্যে চিরদিন ধরে চলে আসছে। অথচ কঠোপনিষদে নচিকেতা বলছে অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত, বেশী দিন কে বাঁচতে চায়? আচার্য শঙ্কর উত্তর দিচ্ছেন অবিবেকী, যাদের বিবেক নেই তারাই বেশী দিন বাঁচতে চায়। কিন্তু যাদের সুখ সুবিধা বেশী আছে তারাও বেশী দিন বাঁচতে চায়। এই একটি প্রশ্নের সাথে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করছেন, কিছু লোককে দেখা যায় খুব ভাগ্যবান আবার অনেককে দেখা যায় পুরো অভাগা, কারুর মুখের দিকে তাকান যায় না আবার কিছু লোকের মুখের দিকে তাকালে আনন্দ হয়। আবার কিছু কিছু লোকের কোন সমস্যা হয় না আবার কিছু লোককে সমস্যা সব সময় ঘিরে রাখে। এগুলো কেন হয় আর কিভাবে তপস্যা করলে এগুলো থেকে বেরিয়ে আসা যায়?

মহাদেব উমাকে তখন বলছেন এর সব কিছুর মূলে আছে ঈর্ষা ভাব। যাদের ভেতর হিংসা ভাব আছে তাদের এই সমস্যা গুলো আসবে। এখানে হিংসা মানে ক্রুর ভাব, যাদের মধ্যে ক্ষমা নেই, দয়া নেই, যারা প্রাণিবধ করে, তুমি যত সমস্যার কথা বললে তাদের এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। যাদের মধ্যে হিংসা ভাব থাকে না তারাই ধর্মান্বিতা হয় আর রূপবান হয়। ছোট শিশুকে দেখলে কত মিষ্টি লাগে কারণ তার মধ্যে হিংসা ভাব নেই। যেমন যেমন বড় হতে থাকে আর হিংসা বাড়তে থাকে তেমন তেমন তার চেহারাটা কঠোর হতে থাকে। হিংসা প্রবণ মানুষ অপরের বধ্য হয়ে যায় এবং অপরের অপ্রিয় হয়ে যায় আর এরাই অল্পায়ু হয়। মহাভারত এখানে একটা সাধারণ ধারণা দিয়ে দিল, এর ব্যতিক্রমও অনেক সময় দেখা যায় যেমন অনেক বদলোকও অনেক দিন বেঁচে থাকে। কিন্তু সেখানে তখন অন্যান্য আরও কিছু কারণও থাকে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যাদের মনে খুব হিংসা ভাব আছে তারা অল্পায়ু হয়। যত ক্রিমিনাল আছে, নিজেদের মধ্যে বোমাবাজি, গোলাগুলি করছে এরাও জানে আমি বেশী দিন বাঁচব না, আমাকেও একদিন এইভাবেই মরতে হবে। মহাদেব বলছেন হিংসার কারণে যে মানুষ পাপকর্মে আবদ্ধ হয়ে থাকে সে সমস্ত প্রাণির অপ্রিয় হয়ে যায়। আর সমস্ত প্রাণির অপ্রিয় হয়ে গেলে সে অল্পায়ু হয়ে যায়। এর বিপরীত যারা হন, সবাইর প্রতি সমান প্রেম ভালোবাসা যাঁদের থাকে এঁরা দেবত্ব পায় আর দেবলোকে গিয়ে খুব আনন্দ ভোগ করে। এখানে কিন্তু বলছেন না যে তাঁরা দীর্ঘায়ু হন। কিন্তু পরেই বলছেন, শুভ কর্মাদি করার পর এরা যখন স্বর্গে যায়, স্বর্গ থেকে পরে যখন আবার জন্ম নেয় তখন তাঁরা দীর্ঘায়ু পান। অর্থাৎ ঐ জন্মেই তিনি দীর্ঘায়ু হন না, স্বর্গভোগ করার পর যে জন্ম হচ্ছে সেই জন্মে গিয়ে দীর্ঘায়ু হচ্ছেন। এই সব বলার পর মহাদেব বলছেন, এই পথ সাক্ষাৎ ব্রহ্মা তৈরী করেছেন। সেইজন্য এই পথকে এইভাবেই পালন করতে হবে। মূল কথা হল সং জীবন যাপন করবে, হিংসা করবে না, মন, বাণী আর ক্রিয়া দিয়ে কক্ষণ কোন অধর্ম করবে না। এইভাবে চললে মানুষ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। অধর্মটা ত্যাগ হয়ে গেল, আর ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। এরপর তার আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হবে।

মহাভারতই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে হিন্দুধর্মকে ঠিক ঠিক বোঝা যায়। কেউ যদি প্রশ্ন করে ভারত বলতে কি বোঝা? ভারতকে একটি দুটি কথা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না, কারণ ভারতে কোন কিছুই এক নয়, ভাষা এক নয়, ধর্ম আলাদা আলাদা, পোষাক আলাদা আলাদা, খাওয়া-দাওয়াও বৈচিত্র্যপূর্ণ। ভারতের সংজ্ঞা ভারত। একজন ভারতীয়কে সে দক্ষিণ ভারতের হোক, উত্তর ভারতেরই হোক কিংবা পূর্ব বা পশ্চিম ভারত থেকেই হোক দেখলেই বলে দেওয়া যাবে এই লোকটি ভারতীয়। ভারতীয়দের চেহারার মধ্যেই একটা পরিচিতি আছে, এই পরিচিতিটা যে কি জিনিষ সেটা আবার বলা যাবে না। হিন্দুধর্মেরও ঠিক একই বৈশিষ্ট্য। যদি কেউ বলে হিন্দুধর্ম কি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও? আমরা কখনই হিন্দুধর্মকে ব্যাখ্যা করে দিতে পারব না। কিন্তু খ্রীষ্টান, মুসলমান ধর্মের গ্রন্থ পড়লে বা অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থ পড়লে বলে দেওয়া যাবে এটা হিন্দুধর্ম নয়। হিন্দুধর্মের অন্যান্য যে ধর্মগ্রন্থ আছে সেগুলো খুব পরিষ্কার ভাবে পরিভাষিত করা হয়ে আছে। যেমন গীতা একটা নির্দিষ্ট ধারায় বাঁধা হয়ে আছে, তন্ত্রও তাই। সেইদিক থেকে মহাভারত নির্দিষ্ট ধারায় বাঁধা নেই। মহাভারত নিজের মত চলছে, যেমন যেমন তাঁর চিন্তা আসছে তেমন তেমন সে বলে যাচ্ছে।

এতক্ষণ আমরা শিব-পার্বতী সংবাদ আলোচনা করলাম, যেখানে মন, বাণী ও কর্মকে নিয়ে বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে। এরপর এখানে আবার একটা প্রশ্ন আসছে, মানুষ স্বর্গ, নরক, উত্তম বংশে, অধম বংশে কি করে জন্ম নেয়। আসলে কার্য-কারণ সম্পর্ক আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে আছে, লক্ষ্য খেলে ঝাল লাগবে এটা আমাদের জানা। ফিজিক্সের নিউটনের লজ অফ মোশানেও কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে। আর আমরা নিজেদের জীবনেও দেখছি কিছু খারাপ কাজ করলে পুলিশে ধরে নিয়ে যায় আবার কিছু ভালো কাজ করলে ফুলের মালা দিয়ে সম্বর্ধনা দেয়। এই জিনিষগুলিকেই যখন এক সঙ্গে মিলিয়ে দাঁড় করান হয় তখন তাকে আমরা কর্মবাদ বলছি। কর্মবাদ সত্য কি মিথ্যা আমাদের জানার কোন উপায় নেই, কিন্তু একটা মডেল হিসাবে দেখলে এর তুলনা নেই। জীবনকে স্বচ্ছন্দ ভাবে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে এই কর্মবাদ একটি উচ্চ বাদ। অন্য দিকে কর্মবাদকে যে মানবে না সে কখন হিন্দু হতেই পারবে না। কর্মবাদকে মানলেই আবার দুটো জিনিষকে স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নিতে হবে, কোন উপায় থাকে না, মানতেই হয়। একটা হল পুনর্জন্মবাদ আর দ্বিতীয় হল বর্ণপ্রথা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলে অনেকেই বলে আমি হিন্দু, আমি কর্মবাদকেও মানছি কিন্তু জাতিপ্রথাকে মানি না। এই ভাবে কখন বর্ণপ্রথাকে অস্বীকার করা যায় না। কর্মবাদ মানলেই, নিজেকে হিন্দু বলে স্বীকার করলেই বর্ণ ব্যবস্থাকেও মানতে হবে। সমস্যা হল উচ্চবর্ণ আর নিম্নবর্ণকে নিয়ে। আমাদের শাস্ত্রের উৎসে যদি যাওয়া হয়, বেদ উপনিষদে কোথাও এইভাবে কে উচ্চবর্ণ আর কে নিম্নবর্ণ এইভাবে বলবে না। বলবে, যার মধ্যে বিদ্যা আছে সে উচ্চবর্ণের। এখন কোন বিদ্যার কথা বলছে? এর আগে একটা জায়গায় আমরা আলোচনা করেছিলাম যারা ব্রহ্মবিদ্যাকে নিয়ে চলে তারা শ্রেষ্ঠ। এটাও একটা নিজস্ব মত। স্বামীজী বলছেন, একজন রাজা মহৎ আর একজন যে জুতো সেলাই করছে সে নীচ। কিন্তু রাজাকে জুতা সেলাইয়ের কাজে আগে নামিয়ে দেখা যাক কেমন সে জুতো সেলাই করছে। জুতো সেলাইও যদি সুন্দর ভাবে করে দিতে পারে তাহলে রাজাকে বলা হবে শ্রেষ্ঠ। আসল সমস্যা এইখানে। স্বামীজী দুটো কথা বলেছিলেন, একটা কথা হল জন্মের সময় জন্ম লগ্ন দেখে জ্যোতিষিরা বলে দিচ্ছেন এ হচ্ছে এই জাতির, এটাই তার ঠিক ঠিক জাত। দ্বিতীয় খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা স্বামীজী বলেছেন যেটা আজকের যুগের জন্য সত্যিই খুব জরুরী, জাতির নামে কোন সুবিধা নেওয়া চলবে না। এই সুবিধা নেওয়াটা বন্ধ করে দিলে জাতিপ্রথা তখন ঠিকই মনে হবে। যারাই কার্য-কারণ সম্পর্ককে মানবে তাদের স্বর্গ-নরকও মানতে হবে। আবার এটাও ঠিক, যতক্ষণ পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরকে যে না মানছে ততক্ষণ তার পক্ষে ধর্মকে মানা অসম্ভব, সে যে কোন ধর্মই হোক না কেন। মৃত্যুর পর জীবন কোন না কোন ভাবে চলছে, এইটাকে যদি বিশ্বাস না করি তাহলে ধর্ম আমার জন্য নয়। হিন্দুধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের মধ্যে শুধু পার্থক্য হল, হিন্দুধর্ম বলে মৃত্যুর পরই সব কিছু একেবারেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না, স্বর্গ বা নরক থেকে আবার তাকে ফিরে আসতে হয়। বারবার এই আসা আর যাওয়া চলতেই থাকে। এখন যারা কর্মবাদকে মানছে তাদের মনে জিজ্ঞাসা আসছে আমি কি কর্ম করলে উপরে যাব আর কি কর্ম করলে আমাকে নীচে যেতে হবে। যারা ঠিক ঠিক ধর্ম মানে তারা কোন ধরনের খারাপ কাজ করার কল্পনাও করতে পারে না। মানুষ যতই ধর্ম থেকে সরে আসুক, সব সময়ই তার মনে থাকে আমি যেন এমন কোন খারাপ কাজ না করি যার জন্য আমাকে নরকে যেতে হতে পারে। এই ব্যাপারে তারা খুব সাবধান থাকে। সেও দোষ করে যখন অসহায় হয়ে যায়। ভারতীয়দের বিশেষ করে হিন্দুদের খুব ধর্মপ্রাণ জাত বলে মনে করা হয়। বিশ্বের সব দেশেই ধর্মপ্রাণ লোক আছে কিন্তু বেশীর ভাগই ধর্মকে ওপরে ওপরে মানে কিন্তু হিন্দুরা ধর্মের একেবারে ভেতরে গিয়ে বসে আছে। যদি কোন দোষ করে তার জন্য আবার প্রায়শ্চিত্তও করে নিতে আপত্তি করে না, ভগবানের কাছে সে ক্ষমা চেয়ে নেয়। দোষ করার সময় তার এই বোধটা কিন্তু সব সময় থাকে যে আমি কাজটা ঠিক করছি না।



মহাভারতের অনেক ধরনের আইডিয়া গুলোকে দেখে অনেক পণ্ডিতরা বলছেন ব্রাহ্মণরা এগুলো নিজদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কায়দা করে মহাভারতে পরের দিকে ঢুকিয়েছে। অনেক জায়গায় বলছেন ক্ষত্রিয়রা ক্ষমতার শীর্ষে চলে আসার পর তাদের সুবিধার জন্য এইসব কথা বলা হয়েছে। মহাভারতে দানের খুব প্রশংসা করা হয়েছে, ভাগবতেও দানের প্রশংসা করা হয়েছে। কত কষ্ট করে, পরিশ্রম করে মানুষ দুটো টাকা রোজগার করে কিনা, তাই দান করতে গেলে মনে করে যেন গায়ের চামড়া ছিঁড়ে দিচ্ছে। কিন্তু ত্যাগের ভাব এই দান থেকেই শুরু হয়। যে মানুষ কারকে দুটো পয়সা দান করে না, তার কাছে এটা কখনই আশা করা যায় না সে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকে ত্যাগ করে ঈশ্বরের পথে যাবে। কিন্তু ঈশ্বরের পথে যেতে গেলে কোথাও একটা শুরু করতে হয়। দান হল ত্যাগের ভাবকে অবলম্বন করার প্রথম পদক্ষেপ। আর দ্বিতীয়তঃ সমাজের স্থিতিশীলতা পুরোপুরি নির্ভর করে দান-ধ্যানের উপর।

শিব আর পার্বতীর সংলাপ চলছে। মহাদেব পার্বতীকে বলছেন অনেক মানুষ আছে যারা অত্যন্ত কৃপণ হয়, এমনই কৃপণ হয় ব্রাহ্মণরাও যদি কিছু যাচ্ছা করে তাদেরকেও কিছু দিতে চায় না। এমনকি যারা দীন-দুখী, অন্ধ, কাঙাল, অতিথি এদেরকে দেখে সরে আসে। কথায়তে ঠিক এই রকম একটা বর্ণনা আছে। একজন তীর্থ করতে গেছে। সেখানে পাণ্ডারা তার কাছে কিছু চাওয়াতে বলছে কালকে এসে দেব। কিন্তু তার আগেই সে তীর্থ থেকে পালিয়ে এসেছে। ঠাকুর শুনে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলছেন কটি টাকার জন্য মিথ্যে কথা বলে পালিয়া আসা! এই ধরনের মানুষ কালচক্রে ঘোরে এবং আর কখনই মানব যোনিতে জন্ম নেবে না। হতে পারে ঘুরতে ঘুরতে অনেক জন্মের পর মানব যোনিতে জন্ম নিলেও নিতে পারে কিন্তু এরা অবশ্যই নির্ধনদের কুলে গিয়ে জন্ম নেয়। এই ধারণাগুলোকে আধার করেই আমাদের আগেকার চিন্তাবিদরা কিছু পরিস্থিতিকে অভিশাপ রূপে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। যেমন দারিদ্র, তুমি আগের আগের জন্মে দান-ধ্যান করোনি আজ তাই তোমার এই অবস্থা। মজার ব্যাপার হল ঠাকুরও এই কথা বলছেন — কি জানো, আগের জন্মে দানাদি করা থাকলে এই জন্মে একটু টাকা-পয়সা হয়। ভগবান শিব আবার বলছেন, কিছু কিছু মানুষ অহঙ্কারে একেবারে অন্ধ হয়ে থাকে আর এই অহঙ্কারে মত্ত হয়ে থাকার সুবাদে অনেক পাপকর্ম করে বেড়ায়। এরা বিদ্বদজনদের কোন সম্মান দেয় না, বাড়িতে অতিথি এলে বসার আসন পর্যন্ত দেয় না। এই ধরনের মানুষ যারা শুধু নিজের অহঙ্কারে মত্ত হয়ে আছে, গুরুজনদের সম্মান দেয় না, তারা অবশ্যই নরকে গিয়ে পতিত হয়। ট্রেনে বাসে বয়স্ক মানুষদের সিট ছেড়ে দেওয়াটা অন্যান্য দেশে একটা প্রথা কিন্তু এখানে এটাই ধর্ম, তোমাকে সিট ছেড়ে দিতে হবে। মহাভারতের এই ধরনের ভাবগুলো দেখলে বোঝা যায় তখনকার সমাজ সংস্কারক ও চিন্তাবিদরা ধর্মটাকে কিভাবে দাঁড় করিয়েছেন। এই সব বলার পর বলছেন যাঁরা ধর্মাত্মা তাঁরা সব সময় উত্তম জন্ম নেন। তিনটে আইডিয়া দিলেন, প্রথম যারা কৃপণ তারা নির্ধনদের কুলে জন্ম নেয়, দ্বিতীয় যাদের শক্তি ও অর্থ আছে কিন্তু অহঙ্কারী, গুরুজনদের সম্মান করে না, অর্থ আছে কিন্তু তার সদ্যবহার করে না, এরা নরকে গিয়ে পড়ে আর তৃতীয় যারা অর্থ আর শক্তির ঠিক ঠিক ব্যবহার করে তারাই উত্তম যোনিতে যায় এবং সেখান থেকে উপরের দিকে এগোতে থাকে। আবার বলছেন যাদের স্বভাব খুব ভদ্র আর গুরুজনদের সেবাদি করে তারাই ইহলোকে সুখ পায় আর পরলোকে উপরের দিকে যায়। যদি কোন কারণে স্বর্গাদি থেকে মানুষ যোনিতে আবার ফিরে আসে তখন এরা সব সময় মেধাবী হয়। এখানে একটা খুব মজার ব্যাপার বলছেন, শাস্ত্র এদের বুদ্ধিকে সব সময় অনুসরণ করে। এখানে ধারণাটা হল, যার বুদ্ধিটা পরিষ্কার হয়েছে এবং পরিষ্কার হওয়াতে ঋষি, মুনি, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতদের সম্মান করে, এদের এই জীবনেই শান্তি হয় আর মৃত্যুর পর এরা সবাই স্বর্গে অবশ্যই যাবে। স্বর্গ থেকে আবার যখন এরা জন্ম নেয় তখন এরা সব সময় মেধাবী হয় আর এই ধরনের মেধাবীদের বুদ্ধির পেছনে পেছনে শাস্ত্র হাঁটতে থাকে। আমাদের পরম্পরাতে একটা কথা চলে আসছে বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্, যার বিদ্যা আছে তার মধ্যে বিনয় থাকবে। কিন্তু ভারতে এখন যত পণ্ডিত আছেন বিদ্বান আছেন তাদের মধ্যে খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায় যে তাঁরা খুব বিনয়শীল। অথচ আগেকার দিনে যত ব্রাহ্মণরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা সত্যিকারের পণ্ডিত ছিলেন, তাঁরা কিন্তু সব সময় অন্য পণ্ডিতদের সম্মান করতেন এবং তাঁদের সামনে বিনয়ী থাকতেন। কিন্তু কম পণ্ডিতরা অন্য পণ্ডিতদের সামনে বুক ফুলিয়ে চলত। আমাদের মধ্যে আগে থাকতেই একটা রেওয়াজ ছিল, ইদানিং যদিও এই রেওয়াজটা আর নেই কিন্তু গ্রামে গঞ্জে এখনও আছে, ব্রাহ্মণ বা সাধু সন্ন্যাসীদের দেখলেই প্রণাম করবে। এখানে ব্রাহ্মণ বা সাধুকে প্রণাম করা হচ্ছে না, তাঁর মধ্যে যে বিদ্যা পাণ্ডিত্য আছে তার সামনে মাথা নত করা হচ্ছে। বিদ্যাকে যারা সম্মান দেয় তারাই পরে মেধাবী হয়। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, পরের দিকে শাস্ত্রই তাকে অনুসরণ করে। অর্থাৎ শাস্ত্রের কথা সে চটপট বুঝে নেয়। উইল ডুরাণ্ড, যিনি ইতিহাস ও দর্শনের উপর অনেক কিছু লিখেছেন, তিনি নিজের ব্যাপারে একটা খুব দামী কথা বলেছেন ‘তিরিশ বছর বয়সে আমি ভাবতাম আমি সব কিছুই জানি এখন আশি বছর বয়সে বুঝতে পারছি আমি কিছুই জানিনা’। সব কিছু জানি এই বোধ থেকে আমি কিছু জানিনা এই অবস্থায় আসতে তাঁর পঞ্চাশটি বছর লেগে গেল। এর অর্থ হল এবার তিনি বিদ্যাকে সম্মান করতে শিখেছেন। শাস্ত্রের

ক্ষেত্রে আবার প্রচণ্ড সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। এই সূক্ষ্ম বুদ্ধি কিন্তু সহজে আসে না। সেইজন্য আগেকার দিনের ঋষি মুনিরা শিষ্যদের প্রথমে শাস্ত্রের কোন কথা না বলে শুধু সেবা করে যেতে বলতেন। অনেক বছর ধরে সেবা করে যাচ্ছে, হঠাৎ গুরু প্রসন্ন হয়ে দু-একটি কথা বলে দিলেন তাতেই শিষ্যের সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যেত। আরুণির গল্প আমাদের সবারই জানা আছে। আরুণি গুরুর আশ্রমেই থাকত। একদিন গুরু বলল ‘খুব বৃষ্টি পড়ছে, দেখতো ক্ষেতের আল ভেঙে গিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে কিনা’। শিষ্য এখন বেরিয়ে গিয়ে দেখছে সত্যিই আল ভেঙে গিয়ে ক্ষেতের সব জল বেরিয়ে যাচ্ছে। কোন ভাবেই আলকে আটকান যাচ্ছে না দেখে শিষ্য আলের ভাঙা জায়গাটাতে শুয়ে পড়ল। সারা রাত ঐ আলের মধ্যেই শুয়ে রইল। গুরু ভোরবেলা গিয়ে দেখে আরুণি আলের মধ্যে ঐ ভাবে শুয়ে আছে। আরুণিকে ডাকতেই আরুণি যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে বেরিয়ে এসেছে। তখনও সে বেহুঁশ। গুরু বলছেন ‘মাটি ফুঁড়ে তুমি বেরিয়ে এসেছ তাই আজ থেকে তোমার নাম উদালক আর সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান তোমার মধ্যে এসে যাবে’। এখানে এইটাই বোঝাতে চাইছে, আমি যতই শাস্ত্র মুখস্ত করি, যতই গুরু সঙ্গ করি না কেন, শাস্ত্রমর্ম অর্থাৎ শাস্ত্র কি বলতে চাইছে এটা কিছুতেই হতে চায় না। স্বামী তুরিয়ানন্দজী বলতেন গীতার একটি শ্লোককে নিয়ে এক মাস ধরে চিন্তা করতে থাক, ঐ একটি শ্লোকের অর্থকে নিয়ে এক মাস ধ্যান করে যাও, তখন ঐ শ্লোক কি বলতে চাইছে পরিষ্কার হবে। শাস্ত্র এতই কঠিন। সেইজন্য বলছেন শাস্ত্র তাকে অনুসরণ করে, মানে শাস্ত্র পড়লেই সে চটপট বুঝে নেয়। মাণ্ড্যাক্যারিকা উপনিষদেও এই একই কথা বলছে, উত্তম শিষ্যকে গুরু একটা কথা বলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেয়। মধ্যম শিষ্যকে অনেক ভাবে বোঝাতে হয়, তারপর অনেক ধ্যান-ধারণার করার পর বুঝতে পারে গুরু কি বলতে চাইছেন। অধম শিষ্যকে যতই বোঝান হোক কিছুতেই বুঝতে পারে না। আরেক ধরনের শিষ্য অধমেরও নীচে যা বলবে তার উল্টো বুঝবে।

মহাদেব বলছেন *শ্রেয়াংসং মার্গমন্নিচ্ছন্ সদা যঃ পৃচ্ছতি দ্বিজান্। ধর্মাস্থেষী গুণাকাঙ্ক্ষী স স্বর্গং সমুপাশ্রুতে।* ১৪/১২৩/৫৫। যারা স্বর্গে যেতে চায় তাদেরকে প্রথমে ধর্মাস্থেষী হতে হবে, ধর্ম জিনিষটা কি সেটাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে, বোঝার পর সেইভাবে নিজেকে ধর্মে নিয়ে যেতে হবে। তারপর হল সংগুণ অভিলাষী, আমার ভেতরে যেন সংগুণগুলো আসে। যারা জীবনে উপরের দিকে উঠতে চায় তাদের কাছে এই তিনটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রথম ধর্ম অস্থেষী এবং দ্বিতীয় গুণাকাঙ্ক্ষী। আর তৃতীয় হল সং পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা। এখানে শব্দটা হল *পৃচ্ছতি দ্বিজান্*, এখানে ঠিক সাধু সঙ্গ বলা হচ্ছে না, বলছেন সং পুরুষকে পৃচ্ছতি, মানে প্রশ্ন করে। কি প্রশ্ন করে? আপনি কেমন আছেন, সব ঠিক আছে কিনা, আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা এবং সেই বুঝে সেবা করা। ধর্মাস্থেষী, গুণাকাঙ্ক্ষী আর দ্বিজানপৃচ্ছতি অর্থাৎ সং পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা এই তিনটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই তিনটে যার মধ্যে আছে সেই স্বর্গে যায়। মহাদেব বলছেন, এই ধরনের মানুষ স্বর্গে থেকে ফিরে যখন আবার মনুষ্যলোকে আসে তখন তার মধ্যে দুটো গুণের প্রাদুর্ভাব হয়। প্রথমত সে মেধাবী হয় আর দ্বিতীয়ত তার প্রচণ্ড ধারণাশক্তি হয়। মেধা শব্দকে সংস্কৃতে পরিভাষিত করা হয় এইভাবে – গ্রহণ ধারণা সামর্থ্যম্। একটা জিনিষকে গ্রহণ আর তাকে ধারণ করার সামর্থ্যকে বলা হয় মেধাবী।

আমাদের একটা কথা ভালো করে বুঝতে হবে। ভগবান যদি সত্য হন তাহলে জগতটা বেকার আর ভগবান যদি সত্য নাই হন তাহলেও জগতটা বেকার, আমি মরে গেলে সব শেষ। বিজ্ঞানের জড়বাদী বা ভৌতিকবাদীরা বলছে আমাদের জন্মটা একটা দৈবাৎ। ঘটনাবশতঃ আমরা জন্ম নিয়েছি, মরে গেলে সব শেষ। তাই যদি হয়, তাহলে এত মারামারি কাটাকাটি করার কি দরকার। আর যদি ঈশ্বরই সত্য হন তাহলে এই জগতের দিকে তাকাতে যাব কেন? কিন্তু এই দুটোর কোন ক্ষেত্রেই জগতকে আমরা ছাড়তে পারছি না, জগতকে বড্ড বেশী মূল্য দিয়ে ফেলি। তখন এই কথাগুলোর খুব দাম হয়ে যায়। এই জিনিষগুলো দিয়ে মহাভারত জগতের তাৎপর্যকে নষ্ট করে দিচ্ছে না। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে অহঙ্কার, কোন জিনিষকে আঁকড়ে রাখার যে ইচ্ছা এই জিনিষগুলিকে কাটিয়ে দেয়। এগুলো একবার কেটে গেলে মানুষ তখন আস্তে আস্তে উপরের দিকে যেতে শুরু করে। তখন তার ধারণা শক্তি বাড়তে শুরু হয়। কিন্তু যখনই সে বলে আমার যা কিছু আছে আমি ছাড়ব না, আমার অহঙ্কারকে আমি ধরে রাখব, তখনই সে আস্তে আস্তে ডুবতে শুরু করে। আমাদের চারিদিকে কত রকমের লোক আছে, সবাই নিজেকে খুব বুদ্ধিমান চালাক মনে করে যাচ্ছে। কিন্তু একবার শুধু একটা পরীক্ষা করবার জন্য এদের কাউকে গিয়ে যদি বলি ‘ভাই তুমি তো ধর্মের নামে এত নিন্দা করছ, ঠিক আছে তোমাকে পাঁচশটি টাকা দেব। তার বদলে তুমি একটি দিন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাজ তিনটে থেকে ছটা পর্যন্ত যা বলছেন সেটা ধৈর্য ধরে শুনে তিন ঘন্টা মহারাজ কি বললেন এটা এক পাতার মধ্যে লিখে আমাকে দিতে হবে’। প্রথম কথা এরা কেউই আসবে না, যদি আসেও তিন ঘন্টা ধৈর্য ধরে শুনতেই পারবে না, ঘুমিয়ে পড়বে নয়তো উঠে চলে যাবে। যদি পুরোটো শুনেও নেয় তবু

লিখতে পারবে না। এখানে আমরা খুব সাধারণ কথাই বলছি, শাস্ত্রের খুব গূঢ় তত্ত্ব নিয়ে কোন আলোচনাই করা হচ্ছে না, কিন্তু এটুকুকে বোঝার সেই মেধাটুকুও তাদের নেই। এরা যে নীচের দিকে যাচ্ছে এটাই হল তার লক্ষণ। সেইজন্য মহাদেব বলছেন অধর্মঃ ধর্মমিত্যাহর্ষে চ মোহবশং গতঃ। অত্রতা নষ্টমর্যাদাস্তে প্রোক্তা ব্রহ্মরাক্ষসঃ।।১৪/১২৩/৬২। এরা জগতের নানা রকমের কামনা-বাসনার মোহে পড়ে অধর্মকে ধর্ম মনে করে আর ধর্মকে অধর্ম। এই যে সন্তাসবাদীরা ধর্মের নামে কত নিরীহ মানুষের গলা কেটে যাচ্ছে, কিন্তু এদের কে বলবে যে, গলা কাটা কি কখন ধর্ম হতে পারে! এগুলো কখনই ধর্ম হতে পারে না। চোর, ডাকাত, বদমাইসরা অপরের চুরি করে, লুট করে অপরকে বোকা বানায় কিন্তু নিজেরা যখন ঝামেলায় পড়ে তখন এরা কোথায় যায়? সেই রাজার কাছেই যায়, রাজার কাছে গিয়ে ন্যায় বিচার চায়। তাহলে যারা ক্রিমিনাল তাদের মধ্যেও একটা মূল্যবোধের পরিভাষা আছে। তাই মূল্যবোধটাই মূল। আমার আপনার মূল্যবোধকে সে না মানতে পারে, আমাকে সম্মান নাও দিতে পারে কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে সেও কিন্তু মূল্যবোধকে ব্যবহার করছে। যত বড়ই ক্রিমিনাল হোক তারাও কিন্তু কথায় কথায় নিজের বউ বাচ্চার শরীরে রোড খুঁড় চালাতে যায় না, সেখানে তার মূল্যবোধ ঠিক আছে। তাই মূল্যবোধটাই আসল। ঠিক তেমনি জীবন একটা এমনই জিনিষ একটা ছোট্ট পিঁপড়ে থেকে শুরু করে সবাই নিজের জীবনকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। তার মানে জীবনটা অত্যন্ত মূল্যবান। জীবন যদি মূল্যবান হয়, সেখানে একজন যদি আমার ধর্মের না হয় তাহলে তার গলা কেটে দেব। তখন এটা অধর্ম। কেন এরা অধর্মকে ধর্ম মনে করছে? মোহে পড়ে এরা গলা কেটে দেওয়াটাকেই ধর্ম মনে করছে। অধর্মই যখন ধর্ম হয় তখন এরা হয়ে যায় দৈত্য, ব্রহ্মরাক্ষস। মৃত্যুর পর আবার যখন জন্ম নেয় তখন এরাই নরাধম হয়। এই সমস্যা অনেক পুরনো সমস্যা। একজনের দাড়িতে আগুন লেগে গেছে। এখন সে চেষ্টাচ্ছে বাঁচাও বাঁচাও করে। অন্য একজন দৌড়ে এসে বলছে ‘আপনার দাড়িতে যখন আগুন লেগেই গেছে তাহলে একটু দাঁড়ান আমাকে একটু বিড়িটা ধরিয়ে নিতে দিন’। এরাই নরাধম, একজনের কষ্ট দুর্দশা থেকে নিজের যতটুকু ফায়দা লুটে নিয়ে যাওয়া যায় এরা তারই চেষ্টা করে যায়।

ভগবান শিবকে পার্বতী আবার জিজ্ঞেস করছেন, এই জগতে দেখা যায় কিছু কিছু লোকের মধ্যে সব সময় দাস ভাব থাকে। এরা সব কাজ করে যায়, খেটে মরে, তা সত্ত্বেও গালাগাল খায় এমনকি মারও খায়, সব রকমের অত্যাচার সহ্য করে। কি কর্ম বিপাকে এদের এই দুরবস্থা হয়? ঠাকুরও বলছেন, কটি টাকার জন্য সাহেবের দাসত্ব করতে হয় আবার সাহেবের বুটের গোজাও খেতে হয়। এখন অবশ্য পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টে গেছে, বিশেষ করে সরকারী চাকরীতে অনেক কমছে কিন্তু বৃটিশ রাজত্বে প্রচণ্ড ছিল। এখন আবার অন্য ভাবে এসে যাচ্ছে। বর্তমান যুগে যত বিশ্বায়ন হচ্ছে, মুক্ত বাণিজ্য হচ্ছে, এতে তাই হচ্ছে। বড় বড় প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মীদের কিভাবে অপমান করা হয় ভাবাই যায় না, সেখানে চাকরির কোন নিরাপত্তা নেই, একটা হুকুমের চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। কজন আর আদালতে যেতে পারে। পার্বতী এটাই জিজ্ঞেস করছেন কোন্ দুর্বিপাকে মানুষের এই অবস্থা হয়। তখন ভগবান শিব পার্বতীকে বোঝাচ্ছেন, যারা অপরের টাকা-পয়সা চালাকি করে মেরে দেয়, যারা টাকা ঋণ নিয়েছে কিন্তু ফেরত দেয় না, কারুর কাছে কেউ কিছু একটা রাখতে দিয়েছে পরে সে ঐ জিনিষটা আর ফেরত দেয় না, এই ধরনের যারা হয় তারা এই জন্মে যদি শাস্তি না পায় পরের জন্মে গিয়ে তাদের এই শাস্তিটা ভোগ করতে হয়। কিভাবে ভোগ করে? এইভাবে দাসত্ব করে। এগুলো এক একটা থিয়োরি, এগুলোকে খুব আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই। ভারতে এগুলোকেই খুব আক্ষরিক ভাবে নিয়েছে। কারণ সাধারণদের জন্য এটাই খুব কার্যকরী হয়, তাদের বলা হয় অপরের টাকা মেরে দিলে কি হয় জানো? গরুকে যেভাবে পেটায় ঐ রকম তোমারও অবস্থা হবে। মহাদেব আবার বলছেন, শুধু তাই নয়, খুব বেশী কিছু যদি আত্মসাৎ করে থাকে তাহলে এক জন্মে না মিটলে পরের জন্মে আবার এরাই বলদ হয়ে জন্মায় আর তার বাড়িতে লাঙল টানতে টানতে মরে। এগুলো লোকদের মধ্যে একটা ভয় ঢুকিয়ে এই ধরনের নোংরা কাজগুলো করা থেকে আটকে দিয়ে উচ্চ ভাবের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। সাধারণ মানুষকে উপরে নিয়ে আসাই মূল উদ্দেশ্য। সেইজন্য গীতাদি শাস্ত্র পড়লে ঠিক ঠিক বোঝা যায়। শুধু তিনটে জিনিষ আছে, আমি আছি এটা সত্য, ঈশ্বর আছেন এটা সত্য। আমার এই অবস্থা থেকে আমি যে ঈশ্বরের কাছে যাব এর সব থেকে সহজ পথ হল বর্ণাশ্রম ধর্ম। তোমার বর্ণাশ্রম ধর্ম করে যাও, সেখান থেকেই তুমি আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে যাবে। এটাই হল মূল কথা। কিন্তু এতটুকু বলে দিলে মানুষের মন ভরে না, তারা আরও অনেক ছোটখাটো জিনিষকে জানতে চায়। সেইজন্য এখানে বলে দিলেন টাকা-পয়সা যদি কারুর মেরে দাও তাহলে তোমার কিন্তু এই অবস্থা হবে। তাও কি লোকেরা এসব করা বন্ধ করে দেবে? কখনই না। একটা নামকরা গল্প আছে। একজন লোক ব্যবসা করত, তার একটা লোহার বিরাট বড় দাড়িপাল্লা ছিল। সে একবার বন্ধুর কাছে দাড়িপাল্লাটা রেখে অন্য এক দেশে ব্যবসা করতে গেছে। বছর খানেক পর দেশে ফিরে এসে বন্ধুর কাছে গেছে দাড়িপাল্লাটা আনবার জন্য। দাড়িপাল্লাটার প্রতি বন্ধুর খুব লোভ হয়ে গিয়েছিল। বন্ধু বলছে ‘ভাই, দাড়িপাল্লাটা খুব সামলেই রেখেছিলাম কিন্তু কিছু দিন আগে হুঁদুরে ওটা খেয়ে

নিয়েছে’। লোকটি বলল ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতো হতেই পারে। তা যাই একটু স্নান করে আসি। তোমার ছেলেকে আমার সঙ্গে যদি একটু দাও তাহলে ও আমাকে রাষ্ট্রা ঘাটটা দেখিয়ে দেবে’। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে লোকটি একটি বাড়িতে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। স্নান করে ফিরে আসার পর বন্ধু জিজ্ঞেস করছে ‘ছেলে কোথায় গেল’? ‘আর বলব কি ভাই, আমার সাথেই আসছিল হঠাৎ কোথেকে একটা বাজপাখি এসে ওকে তুলে নিয়ে উড়ে গেছে’। এবার কোর্টে মামলা হয়ে গেছে। বিচারক বলছে ‘বাজপাখি ছেলেকে কি করে তুলে নিয়ে যেতে পারে’। লোকটি বলছে ‘হুজুর! এমন তাজ্জব ব্যাপার এখানেই ঘটে যেখানে লোহার দাড়িপাল্লাকেও হুঁদুরে খেয়ে নেয়। তা বাজপাখিও ছেলেকে নিয়ে যেতেই পারে’। তখন সব ব্যাপারটা জানা গেল। চালবাজি, বদমাইশি সব জায়গাতেই আছে কিন্তু ভারতে এটা চিরদিনই আছে। ভারতের উপর এখন জনসংখ্যার চাপ খুব বেশী, তার ফলে দারিদ্রতাও বেশী, তাই চালবাজি, লোক ঠকানোটাও এখানে বেশী। ধর্ম পালন করাটা তাই এখানে তোমার দায়িত্ব, যেখানে দায়িত্ব নয় সেখানে আইন করে বলে দিতে হচ্ছে সমাজের ভালোর জন্য তোমাকে এটা পালন করতে হবে। কিন্তু মানুষ তাও মানতে চায় না, সেইজন্য এইখানে এত ভাবে এই কথাগুলো বলছেন। দাসত্ব কারা করে? গত জন্মে যে অপরের টাকা আত্মসাৎ করেছে।

আসলে এখানে পাপ নিয়ে বলা হচ্ছে। পাপ দুই ভাবে হয়, প্রথমটা হল মনে উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পনা করে জেনে শুনে পাপ করে। আরেকটি হল অকস্মাৎ দৈব ইচ্ছায় পাপ কর্ম হয়ে যায়। এখনকার আইনেও এইভাবেই কোন কিছু অন্যায়ের বিচার করা হয়। কতদিন আগেই মহাভারত বলে দিয়েছে পাপ দুই ভাবে হয়। যারা আগে থেকে পরিকল্পনা করে পাপ করে ঐ পাপ তার কোন ভাবেই নাশ হয় না। ফলভিসন্ধিপূর্বকম, আগে থাকতেই প্ল্যান করে রেখেছে, ঐ লোকটাকে আমার খুন করতে হবে। মহাভারত বলছে, সহস্র অশমেধ যজ্ঞ করুক, শত শত প্রায়শ্চিত্ত করুক এই পাপটা কখনই যাবে না। কিন্তু অসাবধান বশতঃ বা দৈব ইচ্ছায় হঠাৎ যদি একটা ভুল কাজ হয়ে যায় তখন একটা প্রায়শ্চিত্ত করে দিলে মিটে যায়। রাষ্ট্রা দিয়ে চলতে গিয়ে পায়ের চাপে কত প্রাণি মরে যাচ্ছে আমরা জানতেও পারছি না, যখন জানতে পারছি তখন আহা আহা করে উঠছি। এটাও একটা পাপ হয়ে গেল। আবার অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বাঁচার জন্যেও অনেক প্রাণিকে মেরে ফেলতে হয়, এটাও পাপ হচ্ছে। এইজন্য আমাদের প্রত্যেক দিন পঞ্চ মহাযজ্ঞ করতে বলা হয়। পঞ্চ মহাযজ্ঞে ঐ পাপগুলোর শুদ্ধি হয়ে যায়। কিন্তু প্ল্যান করে যখন নানান রকমের পাপ কাজ করা হয়, এই পাপ কাজের কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। মনুষ্যত্বিত্তে এগুলো আরও বিস্তারিত করে পরিষ্কার ভাবে বলে দিচ্ছে তুমি যদি রীতিমত প্ল্যান করে পাপ কাজ কর তার কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। আছে কিন্তু সেই প্রায়শ্চিত্ত গুলোর বিধানগুলো আবার খুব কড়া। আজকে হয়ত আমি একটা খারাপ কাজ করলাম, বছর দশেক পর আমার মনে হতে শুরু করল আমি ঐ কাজটা ঠিক করিনি, মনে আমার খুব অপরাধ বোধ হতে শুরু করল। তখন আমি ঠিক করে নিলাম আমি প্রায়শ্চিত্ত করে নেব। ঐ প্রায়শ্চিত্তটা আর সাধারণ হবে না। প্রায়শ্চিত্ত আর কিছু নয়, শুধু মনটাকে শান্ত করার জন্য। পাপ বোধে মনটা খুঁত খুঁত করতে থাকে আর তাতে মনটা অশান্ত হয়ে ওঠে, প্রায়শ্চিত্তটা করে দিলে পাপ বোধটা চলে যাবে আর মনের খুঁত খুঁতানিটাও শান্ত হয়ে যাবে।

পার্বতী আবার জিজ্ঞেস করছেন মানুষের শরীর কিভাবে যায়। ভগবান শিব বলছেন আত্মাই হলেন নিত্য এবং চৈতন্য আর শরীরটা জড়। আত্মা আর শরীরের যে সংযোগ হয় তাকেই বলা হয় জীব। শরীর যখন কালে আক্রান্ত হয়ে জর্জরিত হয়ে যায়, কোন কর্মের যোগ্যতা থাকে না তখন দেহধারী জীব তাকে ছেড়ে চলে যায়। তখন লোকে বলে এই লোকটি মারা গেছে। এখানে মহাদেব স্বাভাবিক মৃত্যুর কথা বলছেন। মরে যাওয়া কিছু নেই, আসল হল আত্মা, সেই আত্মা অপ্রয়োজনীয় জিনিষটাকে ছেড়ে চলে গেছে, আমরা ভাবি যে লোকটি মরে গেল। মৃত্যু তখনই হবে যখন তার আসল জিনিষটা মরে যাবে, কিন্তু আসল জিনিষটার তো মৃত্যু নেই। মহাদেব বলছেন, পূর্বকৃত কর্ম অর্থাৎ প্রারব্ধ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই মানুষ বেঁচে থাকে। এই প্রারব্ধ কর্মের জন্যই তার শরীর, তার যত রকমের ক্রিয়া কর্মাদি চলতে থাকে, আর এই প্রারব্ধ কর্মে জন্যই কোন মানুষ দীর্ঘায়ু হয়, কোন মানুষ স্বল্পায়ু হয়। আমাদের চোখের সামনে আজকে যে লোকটাকে দেখছি এত হাসিখুশি, হঠাৎ একদিন হার্ট এটাকে মরে গেল। এগুলোর কোন ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু আমাদের মনটাকে তো শান্ত করতে হবে। যারাই ধর্ম পালন করে তাদের দুই রকমের ধারণা থাকে, একটা হল সব কিছু ভগবানের উপর ছেড়ে দেয়। ভগবানের ইচ্ছাতে এই শরীর হয়েছে, তাঁর যখন ইচ্ছা হবে এই শরীর নিয়ে নেবেন। আর দ্বিতীয় ধারণাটা হিন্দুদের, ভগবানের উপর না ছেড়ে তারা নিজের উপর নিয়ে নেয়। যেমনটি তুমি কর্ম করেছ তেমনটি তোমার সাথে হবে। তোমার প্রারব্ধ কর্মে এত দিন বাঁচার ছিল, সেটা মিটে গেছে, খেলা শেষ এবার বিদায় নাও। আর রোগ-শোকে যদি মারা না যাও তাহলে এই প্রারব্ধের জোরেই তুমি হয়তো একশ বছর বেঁচে থাকবে। শরীর যখন বার্ধক্যে জর্জরিত হয়ে যাবে তখন এই জীবাত্মা তোমাকে ছেড়ে বেরিয়ে যাবেই।

তপস্যা করলে, ব্রহ্মচর্য পালন করলে আর নিয়মিত ওষুধ পথ্যাদি সেবন করলে মানুষ ধৈর্যবান হয়, বলবান হয় আর দীর্ঘজীবী হয়। শরীর মন সুস্থ আর দীর্ঘজীবীর জন্য তিনটে শর্তের কথা বলা হল – ১) তপস্যা, ২) ব্রহ্মচর্য আর ৩) ওষুধ-পথ্যাদি। এই তিনটে যদি ঠিক ঠিক করা হয় তাহলে মানুষ ধৈর্যবান হয়। অনেক সন্ন্যাসীদের মধ্যে দেখা যায় কেউ কেউ একটুতেই অধৈর্য হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি তপস্যা করেন, সন্ন্যাসী বলে ব্রহ্মচর্যতে প্রতিষ্ঠিত। এখন তিনি যদি একটু ওষুধ সেবন করেন তাহলে তাঁর ঐ অধৈর্য হওয়াটা কমে যাবে। আরেকটি মত হল যাঁরা ধর্মাত্মা তাঁরা যখন স্বর্গে থাকেন তখন সেখানে দীর্ঘ দিন থাকেন, আবার যখন মানব শরীর ধারণ করেন তখনও তাঁরা দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকেন। কিন্তু যারা অধর্ম করে, বদলোক তারা বেশী দিন বাঁচে না। এগুলো বিভিন্ন মত। তখনকার দিনে এনারা কি রকম চিন্তা ভাবনা করতেন সেটা এখন থেকে বোঝা যায়। মূল কথা হল মানুষকে কিভাবে ধর্ম পথে আনা হবে। মানুষ মাদ্রেই বেঁচে থাকতে চায়, তাই তাকে বলা হল তুমি যদি ভালো কাজ কর তাহলে তুমি দীর্ঘায়ু পাবে। এখন ভালো মানুষও কম বয়সে মারা যায়। তখন বলে ভগবানের দরকার ছিল তাই তার আয়ুটা ফুরিয়ে গেছে। সব সময় চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিভাবে মানুষের মধ্যে ধর্ম ভাবটা জাগ্রত করিয়ে দেওয়া যায়। ধর্ম ভাব জাগাবার জন্যই এত কিছু বলা।

পার্বতী আবার একটা প্রশ্ন করছেন, জীবাত্তা কি স্ত্রী না পুরুষ, আর যে স্ত্রী হয় সে কি সব সময় স্ত্রী হয়, না পুরুষও হয়? এই ধরনের নানা রকমের প্রশ্ন আমাদের মনেও ওঠে। ভগবান শিব বলছেন, জীবাত্তা সব সময় নির্বিকার, তিনি স্ত্রীও নন পুরুষও নন। কিন্তু স্ত্রী যখন পুরুষোচিত কর্ম বেশী করে তখন মৃত্যুর পর সে পুরুষ যোনিতে জন্ম নেয়। পুরুষও যখন স্ত্রীর অনুরূপ কার্য করে, স্ত্রীর মত ভাবনা চিন্তা করে তখন সে স্ত্রী হয়ে জন্মায়। জন্ম যেটা হয় সেটা আমার মনে কি ধরনের চিন্তা ভাবনা হচ্ছে তাই দিয়েই নির্ধারিত হয়ে থাকে। এখন ভারতের মেয়েরা যে ভাবে চলছে অদূর ভবিষ্যতে ভারতে মেয়ের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় কমে যাবে। কারণ সব মেয়ে এখন কাজ করছে, গাড়ি চালাচ্ছে, পুরুষদের পোশাক পড়ছে, মানে পুরুষালি ভাব নিয়েই তাদের জীবন চলছে। এরা আর মেয়ে হয়ে কি করে জন্ম নেবে!

এখানে পার্বতী একটা মজার প্রশ্ন করছেন, কখন কখন দেখা যায় মরা মানুষ জেগে ওঠে, এটা কেন হয়? এই ধরনের ঘটনা ইদানিং কালেও অনেক সময় দেখা যায়। মহাভারতের সময়ও হয়তো এই ধরনের কিছু ঘটনা হয়ে থাকত, তাই এই প্রশ্নটাও মহাভারত নিয়ে এসে আমাদের মনের খেদ মিটিয়ে দিচ্ছে। ভগবান শিব বলছেন, যমরাজ যখন যমদূত গুলোকে পাঠায় তখন তারা ভুলে অন্য লোককে ধরে নিয়ে যায়। এই ভুল বেশী হয় হাসপাতাল গুলিতে। হাসপাতালে দশ জন রুগী আছে তার মধ্যে দুজনকে নিয়ে যেতে পাঠানো হল, এরা তখন ভুলে অন্য রুগীকে নিয়ে গেল। যখন দেখে ভুল হয়ে গেছে তখন আবার ফেরত পাঠিয়ে দেয়। এক সাহেব এই নিয়ে রিসার্চ করে একটা বই লিখেছিলেন ‘Life after Death’। তিনি সারা বিশ্ব ঘুরে ঘুরে এই ধরনের লোকেদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। মজার ব্যাপার হল এই ধরনের ঘটনা ভারতেই বেশী পাওয়া যায়। তিনি আবার মন্তব্য করছেন, ভারতের গভর্নমেন্ট যেমন গোলমেলে তাদের কাগজপত্রের কোন ঠিক থাকে না, ভারতের যে যমরাজ তারও একই দুরবস্থা, কোন কাগজপত্রের ঠিক থাকে না, ভুল লোককে ধরে চলে যায়। শেষে ভগবান শিব বলছেন যেটা আমরা এর আগেও আলোচনা করেছিলাম, বলছেন শুধু পুরুষার্থ দিয়ে কিছু হয় না আবার শুধু দৈব বা কপাল দিয়েও কিছু হয় না, যতক্ষণ দুটোর ঠিক ঠিক যোগ না হয় ততক্ষণ কিন্তু ফল দেয় না।

### ভীষ্মের দেহত্যাগ

শিব পার্বতীর সংলাপ বিশাল লম্বা। আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলাম। এরপর ভীষ্ম মৃত্যুর মুখে এসে গেছেন, এখন দিন ঘনিয়ে আসছে। সেই সময় যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করছেন ‘পিতামহ! কার কথা ভাবলে মানুষ সংসার থেকে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি পেয়ে যায়?’ ভীষ্ম তখন মুক্তির খুব সহজ উপায়টা বলে দিলেন *যস্য স্মরণমাত্রেণ জন্মসংসারবন্ধনাৎ। বিমুচ্যতে নমস্তস্মৈ বিষ্ণুবে প্রভবিষ্ণুবে।* বিষ্ণুর এই প্রণাম মন্ত্রের পর যুধিষ্ঠির আবার বলছেন ‘একটাই দৈব কি? পরম আশ্রয় স্থান কোনটি? কোন দেবতাকে স্তুতি করলে সব কিছু জানা যায়?’ এই ধরনের অনেক প্রশ্ন করছেন। তখন ভীষ্ম এই বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রটি বলছেন। সেই থেকে হিন্দুদের মধ্যে বিষ্ণুসহস্রনামের বিরাট মাহাত্ম্য হয়ে গেছে। সারা ভারতে নিষ্ঠাবান ভক্তরা রোজ সকালে স্নানের পর এই বিষ্ণুসহস্রনাম অত্যন্ত শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের সঙ্গে পাঠ করেন। কেউ যদি জীবনে শান্তি পেতে চায়, কেউ যদি সত্যি সত্যি সাধক হতে চায় তাহলে স্নানের পর এক ঘণ্টা টানা শুধু শাস্ত্র আবৃত্তিতে কাটাতে হবে। এক থেকে দুটি অধ্যায় চণ্ডী থেকে, এক থেকে দুটি অধ্যায় গীতা থেকে আর এই বিষ্ণু

সহস্রনাম। বিষ্ণু সহস্রনামে একশ কুড়িটা শ্লোক আছে, একশ কুড়িটা এক দিনে না হলে রোজ তিরিশটা শ্লোক করা যেতে পারে। আর সারা দিনে কোন একটা ধর্মগ্রন্থের কয়েকটি পাতা পড়তে হবে, কথামৃত অবশ্যই পড়তে হবে তার সঙ্গে ভাগবত হোক অধ্যাত্ম রামায়ণ হোক যে কোন একটা গ্রন্থকে বেছে নিয়ে পড়তে হবে। এগুলো না করলে একটা বয়সের পর, বিশেষ করে বুড়ো বয়সে মনটা সংসারের মধ্যেই ঘুরতে থাকবে। একবার যদি সংসারের ঝামেলা থেকে মন সরে আসে আর কোন কালেও মন সংসারে ঢুকবে না। এগুলো শ্রবণে কিছু হবে না, নিজেকে কণ্ঠ লাগিয়ে করতে হবে। সাধক মানেই যে সাধনা করছে। সাধককে নিজেই আবৃত্তি করতে হবে, টেপেরেকর্ডে শুনলে কিছুই হবে না। বিষ্ণু সহস্রনাম খুব সুন্দর এবং খুব গভীর। যেমন বলছেন জগৎপ্রভুং দেবদেবনন্তং পুরুষোত্তমম্। স্তবন্ নাম সহস্রণেন পুরুষঃ স্বত্থোখিতঃ।। মানুষ যখন নিরন্তর এর জপধ্যান করে, সঙ্গে সঙ্গে সে সব দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। আসল কথাটি হল জগতে ভগবানের নাম ছাড়া কিছু নেই। পরমং যো মহত্তেজঃ পরমং যো মহত্তপঃ। পরমং যো মহদ্রক্ষঃ পরমং যঃ পরায়ণঃ।। ১৪/১২৭/৯। যিনি সব অর্থেই পরম তাঁর কথা শোন। এরপরেই ভীষ্ম ভগবানের এক হাজারটি নাম বলছেন। আসলে এটা জপ। সাধারণত জপ হয় ভগবানের একটা নামকেই বারবার বলা। কিন্তু এখানে ভগবানের হাজারটা নাম আলাদা আলাদা ভাবে বলা হয়েছে। এই প্রথা মুসলমানদের মধ্যেও আছে, ওরা যখন জপ করে তখন তারা আল্লার নিরানব্বইটি নাম জপ করে। এটাতে একটা তারতম্য হয়, সেইজন্য এইখানে বলছেন স্তবস্ততি। জপধ্যানের কাজে এটা লাগে না। জপধ্যানের কাজে কি লাগছে? ঠাকুর বলছেন সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। কেন লয় হয়? আস্তে আস্তে ওঁকারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ওঁকারের পর আর কিছু নেই, তারপরেই সমাধি। আসলে মানুষ সাধনা করতে চায় না। একটু জপ করলেই মনে করছে সাধনা হয়ে গেল। কিন্তু জপ ছাড়া যে দীর্ঘ সময় পড়ে থাকে সেখানে এই ধরনের স্তবস্ততিগুলো পাঠ করতে হয়, আর কয়েকটি গ্রন্থকে ঠিক করে নিয়ে সেটাকে নিত্য পাঠ করে যেতে হয়।

ভীষ্মের শরশয্যা আটাল্ল দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ভীষ্ম বলেছিলেন তিনি উত্তরায়ণে শরীর ছাড়বেন। এখানে বলছে চান্দ্র মতে মাঘের শুক্লাষ্টমী তিথিতে যেদিন মকর সংক্রান্তি হয়েছিল সেই দিনে ভীষ্ম তাঁর পার্থিব শরীরকে ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভীষ্ম যখনই ঠিক করলেন শরীর ত্যাগ করবেন হঠাৎ তাঁর শরীর থেকে সব বাণগুলো খসে গেল, তাঁর শরীরের সব ক্ষত গুলো ঠিক হয়ে গেল। তখনও তিনি মাটিতে পড়ে আছেন। ঐভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি হাতজোড় করে বলছেন ‘হে ভগবান! এবার আমাকে আঙা দিন আমি যেন দেহত্যাগ করি’। শ্রীকৃষ্ণও আঙা দিলেন, এটাই উপযুক্ত সময় আপনার দেহত্যাগের। আবার এইখানে শেষ মুহুর্তেও ভীষ্ম বলছেন যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ। বাসুদেবেন তীর্থেন পুত্র সংশাম্য পাণ্ডবৈঃ।। ১৪/১৪৫/৪১ এইটাই মহাভারতের মূল মন্ত্র। যেখানেই শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম সেখানেই আর যেখানেই ধর্ম আছে সেখানেই জয়। এই বলে ভীষ্ম দেহত্যাগ করার পর একটা নাটকীয় মুহুর্তের অবতারণা করা হয়েছে। মা গঙ্গা সেখানে আবির্ভূত হয়ে শোকাক্ত কর্তে বলছেন ‘আমার পুত্র এত ধর্মাচারী ছিল, আর তাকে এইভাবে শিখণ্ডীর হাতে মারা যেতে হল’। শ্রীকৃষ্ণ আবার মা গঙ্গাকে সান্ত্বনা দিলেন। এইখানে এসে অনুশাসন পর্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে।

## আশ্বমেধিকপর্ব ও শেষ তিনটি পর্ব

এরপর শুরু হচ্ছে আশ্বমেধিক পর্ব। ভীষ্ম দেহত্যাগ করার পর তার শরীরকে দাহ করা হল, জলাঞ্জলীও দেওয়া হল। যুধিষ্ঠির খুব শোক করে কান্নাকাটি করছেন। যুধিষ্ঠিরের কান্নাকাটি দেখে ধৃতরাষ্ট্র আবার অনেক ভাবে বোঝালেন। যুধিষ্ঠিরের ঘুরে ঘুরে একটাই দুঃখ, আমার সব প্রিয়জনদের যুদ্ধে এই ভাবে মারা হল। যুধিষ্ঠিরকে তখন ধৃতরাষ্ট্র বলছেন ‘ক্ষত্রিয়দের যা ধর্ম আর সেই ধর্মানুসারেই যা করা উচিত তুমিতো সেটাই করেছে, সেইজন্য তোমার শোক করার কোন কারণ নেই’। এইভাবে অনেক কথা বলে যুধিষ্ঠিরকে শান্ত করলেন।

### অনুগীতা

এই পর্বটা হল যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকে নিয়ে। যুধিষ্ঠির আবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে চাইছেন। কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর মনে অনেক অশান্তি জমে আছে সেটাকে কিছুতেই কাটান যাচ্ছে না। ব্যাসদেব তখন যুধিষ্ঠিরকে অনেক কথা বললেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে বললেন। এই পর্বেও অনেক রকম কাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে।

এইখানে এসে শ্রীকৃষ্ণ অশ্বমেধ যজ্ঞের সব কিছু ব্যবস্থাপনা করে এবার দ্বারকায় ফিরে যাচ্ছেন। দ্বারকাতে ফিরে যাবার আগে শ্রীকৃষ্ণের সাথে অর্জুনের একটা সংলাপ আছে সেটাকেই আমরা এই পর্বের আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু করছি।

যুদ্ধটুকু সব হয়ে গেছে, রাজ্য স্থাপনার পর সব কিছু ভালো ভাবে চলছে, অর্জুনেরও মন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, এখনও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন দুজনে মিলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ অর্জুনের কি মনে হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন ‘হে শ্রীকৃষ্ণ! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যখন শুরু হতে যাচ্ছিল তখন আপনি নিজের মাহাত্ম্যকে প্রকাশ করেছিলেন আর আপনার যে ঈশ্বরীয় রূপ তারও দর্শন আমাকে করিয়েছিলেন এবং আমার প্রতি আপনার ভালোবাসা আর সৌহার্দ বশতঃ আমাকে সেই পরম জ্ঞানের উপদেশ দিয়েছিলেন। তারপর যুদ্ধ করে করে, অনেক ধরণের ঘটনা ঘটে যাওয়াতে আমার মনটা বিচলিত হয়ে গেছে, যার ফলে আপনি আমাকে যে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন সেটা আমার মন থেকে হারিয়ে গেছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে আপনার মুখ থেকে ঐ কথাগুলো আরেকবার শুনি’। এটিও খুব লম্বা একটি অধ্যায়, এই অধ্যায়কে বলা হয় অনুগীতা। এই অনুগীতার মধ্যেই আবার আরও ছোট ছোট গীতা আছে। অর্জুনের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ‘অর্জুন! তুমি বড্ড বেশী শ্রদ্ধাহীন আর তোমার বুদ্ধিটাও মন্দ’। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলছেন অথচ আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতার ভাষ্যে প্রথমেই বলছেন ভালো শিষ্যকে যখন উপদেশ দেওয়া হয় সেই উপদেশগুলি জগতে খুব তাড়াতাড়ি প্রচার পায়। অর্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ঠিক ঠিক শিষ্য তাই গীতার এত প্রচার প্রসার হল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যকে বলছেন তুমি শ্রদ্ধাহীন আর মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন। মন্দবুদ্ধির এখানে সংস্কৃত শব্দ হল দুর্মেধা, মেধা বলে তোমার কিছু নেই। মেধা মানে গ্রহণ ধারণা সামর্থ্য। অর্জুনকে বলা হচ্ছে তুমি ধারণ করে রাখতে পারলে না।

এটা খুব মজার ব্যাপার। সব শাস্ত্র একই কথা বলে। উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, রামায়ণ, পুরান সবাই এক কথা বলছে, এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলতে চাইছেন। সেইজন্য মহম্মদ যখন যোগের অবস্থায় ছিলেন তখন তিনি কোরানই বলেছেন, যিশু বাইবেলই বলেছেন। কারণ ঐ যোগের অবস্থায় তার মনে কি ভাব আসবে সেটা ওনাদের অধীনে নেই। একটা দিব্য শক্তি তখন তাঁদের মাধ্যমে কিছু বলতে চাইছে। যিশু বা মহম্মদকে আবার যদি বাইবেল বা কোরানের কথা বলতে বলা হয় এনারা নিজেরাই আর বলতে পারবেন না। দুটো বাচ্চা ঝগড়া করতে করতে একটা বাচ্চা বলল ‘তুই একটা প্যাঁচা’। ঐ বাচ্চাটা তখন রেগেমেগে বলল ‘তুই আমাকে কি বললি আবার বলতো’। ‘এই তো বলছি প্যাঁচা’। একটা সাধারণ চিন্তাকে খুব সহজে পুনরাবৃত্তি করা যায়। কিন্তু দিব্য চিন্তাকে কখন পুনরাবৃত্তি করা যায় না। যিনি বলছেন তিনিও ওটাই আবার বলতে পারবেন না। যদি বলেন সেই একই কথা আসবে কিন্তু তার রূপটা পাল্টে যাবে। গীতা আর অনুগীতার এইটাই তফাৎ। দুটো গীতারই তত্ত্ব এক কিন্তু পুরো আকারটা পাল্টে যাচ্ছে। এমনকি গীতাতে কোন কাহিনীর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে না কিন্তু অনুগীতাতে শুধু কাহিনী আর কাহিনী।

অর্জুনের উপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলছেন *স হি ধর্মঃ সুপর্য্যাগো ব্রক্ষণঃ পদবেদনে। ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ। ১৫/১৭/১২*। তখন আমি যে উপদেশ তোমাকে দিয়েছিলাম সেটাতে ব্রক্ষপদ পাওয়ার মত ছিল। আর ঠিক সেই রকমটি উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঐ একই কথা ঐ ভাবে বলার ক্ষমতা আমার আর নেই। কারণ আমি তখন যোগে অবস্থিত ছিলাম। এই শ্লোকটি প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ‘আমি যে তোমাকে গীতার উপদেশ দিয়েছিলাম ঐ উপদেশের মধ্যে তোমাকে ব্রক্ষপদকে জানিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। ঐটাকে আমি আর পুনরার তোমাকে বলতে পারব না, কারণ *পরং হি ব্রক্ষ কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া। ইতিহাসস্ত বক্ষ্যামি তস্মিন্মর্থে পুরাতনম্। ১৫/১৭/১৩*। তখন আমি যোগযুক্ত হয়ে পরমাত্মতত্ত্বের বর্ণন করেছিলাম। আমি এখন তাই তোমাকে সেই বিষয়ে অন্য প্রাচীন কথা বলছি’। যারা ধর্ম, আধ্যাত্মিক ব্যাপারে কিছু বুঝতে চাইছেন তাদের এই শ্লোকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সহকারে অনুধাবন করতে হবে। স্বামীজী যখন আমেরিকাতে ছিলেন সেই সময় একটা সভাতে স্বামীজী খুব সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তারপর ওনার এক বন্ধু স্বামীজীকে বলছেন ‘স্বামীজী! আপনার ঐ বক্তৃতাটা এর পরের সভাতেও আরেকবার বলবেন’। স্বামীজী বললেন ‘একই বিষয়ের উপরে দ্বিতীয়বার বলা আমার পক্ষে সম্ভব না’। তা সত্ত্বেও ভদ্রলোক অনেক করে অনুরোধ করার পর স্বামীজী ঐ একই বিষয় নিয়ে বললেন কিন্তু সেদিনকার মত হয়নি। ঐ বক্তৃতা শুনে বন্ধুটি খুব হতাশ হয়ে গেছে। স্বামীজী তখন অন্যান্যদের বলছেন ‘এই লোকটাকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে তখন আমি এক ভাবে ছিলাম, এখন আমার ভাব পাল্টে গেছে’।

যখন অঙ্ক, বিজ্ঞানাদি পড়ান হয়, মাস্টারমশাই যখন বলেন দুইয়ে দুইয়ে চার তখন সেটা চারই হবে, তিন কিংবা পাঁচ হবে না। তার আগের দিন রাত্রে মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়েছি কি হয়নি তার সঙ্গে দুইয়ে দুইয়ে চারের কোন সম্পর্ক নেই। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আচার্য শিষ্যকে ঐভাবে আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতে পারেন না। আচার্য কাউকে যখন আধ্যাত্মিক উপদেশ দেন তখন ভাবের জগৎ থেকে বলেন। যাঁরা অবতার তাঁরাও ভাবের জগৎ থেকে বলেন। ঠাকুর আবার এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী, কারণ ঠাকুর চব্বিশ ঘণ্টা ভাবরাজ্যেই বিচরণ করতেন, মুহূর্মুহু তিনি সমাধিতে লীন হয়ে যাচ্ছেন। স্বামীজী যখন এমনি সবার সাথে কথাবার্তা বলছেন তখনও তাঁর প্রত্যেকটি কথাই অমৃত মনে হত। কিন্তু ভাষণ আর এমনি সাধারণ কথা বলা আলাদা হয়ে যায়। চিকাগো ধর্ম সম্মেলনে স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতাটি যেখানে Sisters & brothers of America বলে শুরু করছেন ঐ বক্তৃতাটাই তিনি একেবারে পুরো আধ্যাত্মিক ভাবের তুঙ্গে অবস্থিত থেকে বলেছিলেন। স্বামীজীকে যদি আবার ঐ ভাষণটাই দিতে বলা হত তিনি কিন্তু আর দিতে পারতেন না। এইটাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, আমার পক্ষে আর বলা সম্ভব নয়, কারণ তখন আমি যোগযুক্ত অবস্থায় ছিলাম। একটা পরিস্থিতিতে, যেমন বাড়িতে ভালো মন্দ যদি কিছু হয়ে থাকে তখন আমি একটা শব্দ বলে দিলাম তাতেই কাছের লোককে স্পর্শ করে যাবে, ঐটাই পরে আমি আর বলতে পারব না। মানুষ যখন মানসিক ভাবে প্রচণ্ড আবেগ প্রবণ হয়ে পড়ে তখন তার মুখ দিয়ে যে কথাগুলো বেরিয়ে আসে সেই কথাগুলিই মারাত্মক ভাবে প্রতিক্রিয়া তৈরী করে। ঠিক তেমনি ভগবান তখন এক উচ্চ ভাবে বিভোর ছিলেন। এই কথাই আমাদের বেদেও বলা হয়েছে, ঋষিরা যখন যোগযুক্ত হয়ে যেতেন তখন তাঁরা কয়েকটি আধ্যাত্মিক সত্যের কথা বলতেন, ঐটাই বেদ। ওগুলো তাঁর কথা নয়, এগুলো আধ্যাত্মিক সত্য, ঐ অবস্থায় বেরিয়ে এসেছে কিন্তু তারপর আর বলতে পারবেন না।

অর্জুন গীতার কথা আবার বলার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তিরস্কার করছেন। তাহলে শ্রীকৃষ্ণও তো বলতে পারছেন না। না, ধরে রাখাটা শিষ্যের কাজ। এই ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম। দুই বন্ধু নদীর ধারে একটা আম গাছ থেকে আম পাড়তে গেছে। এক বন্ধুর কাঁধে চেপে অন্য বন্ধু আম পেড়ে পেড়ে বন্ধুকে দিচ্ছে, আর বন্ধু আমগুলো নদীর জলে ফেলে যাচ্ছে। যে পাড়ছিল সে নেমে এসে দেখছে সব আম নদীর জলে ভেসে গেছে। এখন বন্ধু আর কোথেকে আম পাড়বে সে তো এখন নেমে এসেছে। আমগুলো কোথায় গেল? জলে চলে গেছে। শিষ্যের কাজ হল এগুলোকে ধরে রাখা। গুরুর কোন দোষ এখানে নেই। এটা হল শিষ্যদের দায়িত্ব, গুরু উচ্চ অবস্থা থেকে যে কথা গুলো বলেছেন সেগুলোকে ধরে রাখা। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সজ্ঞ করলেন তখন তিনি শিষ্যদের একত্রিত করে এক সূত্রে বেঁধে দিয়ে শ্রীমাকে দায়িত্ব দিলেন। শ্রীমা ঐ দায়িত্বটা নিলেন, কারণ এই দোষটা যাতে না হয়। অর্জুনকে তাই বলছেন তোমার শ্রদ্ধা নেই আর তোমার মেধা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ যে আধ্যাত্মিক সত্যগুলো দিয়ে গেছেন সেগুলোকে আমাদেরকেই ধরে রাখতে হবে। যদি না ধরে রাখা হয় জিনিষটা একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। ধরে রাখার দায়িত্বটা ঠাকুরের কাজ নয়, এটা তাঁর শিষ্যদের দায়িত্ব। সেই কাজটা শ্রীমা আর স্বামীজী করলেন। এনারা দুজন না থাকলে যতই বলি ঠাকুরের কথা ভগবানের কথা, ঠাকুরের এই ভাবগুলো কিন্তু হারিয়ে যেত। একই কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন। যে শুনছে তাঁর দায়িত্ব এটাকে ধরে রাখা। পরে আরেকজন এটাকে ধরে যোগযুক্ত হয়ে যেতে পারে। এই কারণে এই শ্লোকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বিশ্বে যতগুলো ধর্ম আছে, যে কজন ধর্মীয় নেতা এসেছেন এদের মহত্ত্ব কোথায়? মহত্ত্বটা এইখানেই, যাঁরা এই কথাগুলো বলেন তাঁরা যোগযুক্ত হয়ে বলেন। মহম্মদ, যিশু সবাই যোগযুক্ত, ওনাদের কথা যদি না ধরে রাখা হত সব হারিয়ে যেত। তিনিও পরে এটাকে আর পুনরাবৃত্তি করতে পারবেন না। শ্রীকৃষ্ণ যে অবস্থাতে ছিলেন সেখানে অবস্থান করে সেই কথাগুলোকে ধারণা করে রাখার কথা নয়। ওনার সাধারণ ভাবটা ঐ রকম থাকবে কিন্তু ধরে রাখতে পারবেন না।

শ্রীকৃষ্ণ হলেন অবতার, তিনি অর্জুনকে বলছেন ‘আমি ঐ জিনিষই তোমাকে আর বলতে পারবো না, কিন্তু তত্ত্বটা একই তবে অন্য ভাবে বলছি’। কারণ তত্ত্বটা একই, আর ওনার যে হঠাৎ করে ঐ তত্ত্ব জ্ঞানটা হয়েছিল তা একেবারেই নয়, তিনি জানেন কি বক্তব্য ছিল। তাই বলছেন ‘তোমাকে আমি একই কথা বলব কিন্তু অন্য ভাবে বলব’। সেইজন্য এই অধ্যায়ের নাম হল অনুগীতা। এই অনুগীতার মধ্যে আরও ছোট ছোট গীতা আছে। এর প্রথমে আসে ব্রাহ্মণ গীতা। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলছেন ‘একবার এক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলোক থেকে নেমে আমার কাছে এলেন। তাঁকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। এখানে আমাদের মধ্যে আগে যে আলোচনা হয়েছিল সেটাই আমি তোমাকে বলছি’। ব্রাহ্মণকে কিছু প্রশ্ন করাতে এবার ব্রাহ্মণ সেটাকে আবার পেছনের দিকে টেনে নিয়ে বলছেন ‘এক সিদ্ধ মহর্ষি তিনি নিজের শিষ্যকে কিছু বলেছিলেন’। এইভাবে একটা কাহিনীর মধ্যে আরেকটা কাহিনীর সংলাপ ঢুকে যাচ্ছে। আমরা এখানে শুধু মূল কথা গুলো আলোচনা করব। সেই সিদ্ধ মহর্ষি শিষ্যকে আবার নিজের আগের কথা বলছেন ‘আমি কাম, ক্রোধে মোহিত হয়ে অনেক বার অনেক



পাপ করেছি। তার ফলে আমি অনেক রকমের অশুভ যোনি প্রাপ্ত হয়েছি আর অনেক কষ্টও পেয়েছি’। আর কি হয়েছিল? পুনঃ পুনঃ মরণং জন্ম চৈব পুনঃ পুনঃ। আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ। ১৫/১৭/৩২। বারবার আমি জন্ম নিয়েছি আর বারবার আমি মৃত্যুকেও পেয়েছি। নানা রকমের অন্ন ভক্ষণ করেছি আর নানা স্তন থেকে দুগ্ধ পান করেছি। মানে, আমি যখন শূয়োর হয়ে জন্মেছিলাম তখন শূয়োরের স্তন থেকে দুগ্ধ পান করেছি, সব বাচ্চাকেই স্তন থেকে দুগ্ধ পান করতে হয়, বিভিন্ন যোনিতে সব রকম স্তন থেকে দুগ্ধ পান করেছি। মহর্ষি এখন সিদ্ধ হয়ে গেছেন, তাই তাঁর এখন সব মনে পড়ে গেছে। আসলে মানুষ যতক্ষণ তার পুনর্জন্ম না দেখতে পায় ততক্ষণ তার মুক্তির ইচ্ছা আসে না। কোন ভক্তকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় জীবনের কি উদ্দেশ্য? ভক্ত বলবে আমি মুক্তি চাই। কিসের থেকে মুক্তি? সংসারের কাজকর্ম থেকে মুক্তি। কিন্তু এটা তো মুক্তি নয়, মুক্তি হল জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি। আমরা তো আমাদের আগের একটা জন্মের কথাও বলতে পারব না। কিন্তু আমরা বলছি জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি চাই। জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি কার জন্য প্রযোজ্য হবে? যে আগের আগের জন্মকে দেখেছে। কিন্তু তুমি তো তোমার একটা জন্মের কথা জাননা, সেইজন্য এই কথাগুলো আমাদের মুখের কথা মাত্র। ঠিক তেমনি যতক্ষণ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না হচ্ছে ততক্ষণ ঈশ্বরে বিশ্বাস আসতে পারেনা। যতক্ষণ পুনর্জন্ম না দেখেছে ততক্ষণ পুনর্জন্মে বিশ্বাস হয় না। সাধনা করতে করতে পুনর্জন্মটা পরিষ্কার হয়, তখন বিশ্বাস হয়। সাধনা করতে করতে নিজের আগের আগের জন্মগুলিকে দেখতে পায়, তখনই পুনর্জন্মে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয়।

সিদ্ধ মহর্ষি এখন নিজের সব আগের জন্মগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন। পেছনের দিকে তাকিয়ে তিনি এখন হতবাক হয়ে যাচ্ছেন, মাগো! আমার এই সব যোনিতে ঘুরতে হয়েছিল! আমি এর আগে কুকুর ছিলাম, বেড়াল ছিলাম, পোকামাকড় ছিলাম! আগের জন্মে আমি কি ছিলাম দেখে নিলে কি হবে? আতঙ্কে সে এই জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে পালাতে চাইবে। আমাদের সবারই পরিবারে কিছু না কিছু কষ্ট আছে, এই কষ্টের জন্য সংসারের প্রতি আমাদের বিরক্তি জন্মায়। এখন এই কষ্টগুলোকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, তখনও কি মনে হবে এই সংসারটা পাতকুয়া আর আত্মীয়স্বজনকে বিষধর সাপ? এক সময় বিষধর সাপ মনে হবে, যদি আমার কাছের লোকরা আমাকে কষ্ট দিতে থাকে। কিন্তু ওরা যদি কষ্ট না দেয়, আমাকে খুব যত্ন করে তখন কি মনে হবে এরা বিষধর সাপ? এই অবস্থায় না গেলে, যখন মা, ভাই, বোন, সন্তান, স্ত্রী সবাইকে বিষধর সাপ মনে হচ্ছে, সুযোগ পেলেই ছোবল দেবে, আধ্যাত্মিক পথে এগোন যায় না। ধর্মের জন্য ঠিক আছে। যখন বুঝে নেবে এই জগৎ থেকে তার পাওয়ার কিছু নেই, এই জগতের প্রতি একটা প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা জন্মাবে আর জগতটাকে পাতকুয়া মনে হবে তখনই সে ঈশ্বরের সন্ধানে ঝাপিয়ে পড়বে। জগতের প্রতি একটুও যদি দুর্বলতা থাকে তাহলেও কিন্তু নিস্তার নেই, ঐটুকু দুর্বলতাই অনেক জন্ম ধরে নাচাতে থাকবে। এই সংসারটা একটা পাতকুয়া, আমার মা একটা বিষধর সাপ, আমার বাবা একটা হিংস্র বাঘ, এই অবস্থায় যখন কারুর মন চলে যায় তখন বুঝতে হবে তাকে দিয়ে আর সংসার চলবে না।

সন্তানের কাছে মাও বন্ধন, এখানে কোন সন্দেহ নেই। স্বামী যোগানন্দ বিয়ে করতে চাইছিলেন না। তাঁর মা এসে বললেন বিয়ে করতে, বিয়ে না করলে মা কিছু করে বসবেন। মায়ের কথাতে স্বামী যোগানন্দ বিয়ে করে নিলেন। তারপরেই মা বলছেন ‘তুই কি আমার কথায় বিয়ে করেছিস! নিজের ইচ্ছে না থাকলে কি তুই বিয়ে করতিস’! সেই যে তিনি সাধু হয়ে গেলেন, তৎক্ষণাৎ মাকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। অন্য দিকে ছেলের বিয়ের পর পুত্রবধুকে মেনে নিতে চায় না, কারণ অধিকারের লোভ। স্বার্থে একটু আঘাত লাগলেই বোঝা যাবে মাতৃস্নেহ কত ঠুনকো হয়ে যেতে পারে। মাও তো মানুষ কিনা।

বানররা একটা দলে সংঘবদ্ধ হয়ে চলে। দলে অনেক মেয়ে বানরের সাথে একটা মাত্র পুরুষ বানর থাকে। মেয়ে বানর যখনই বাচ্চা দেয় সঙ্গে সঙ্গে বাপটা এসে দেখে এটা মেয়ে না ছেলে। ছেলে হলেই তাকে মেরে ফেলে দেয়। মেয়ে হলে ছেড়ে দেয়, কারণ সেই মেয়েটাই পরে তার স্ত্রী হবে। দিনের বেলায় যদি কোন পুরুষ সন্তান হয় তাকে আর মা বাঁচাতে পারে না। কিন্তু রাত্রির দিকে হলে মা মাতৃভের টানে ছেলে বাচ্চাটাকে কোথাও লুকিয়ে রেখে দেয়। বাপটাও খুঁজে বেড়ায়। মা তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বড় করে। এই বাচ্চা যখন বড় হয় তখন আবার বাপকে চ্যালেঞ্জ করে মেরে ফেলে দেয়। এমনিতে বাচ্চাকে যখন বাপ মেরে দেয় মা তার মাতৃ স্নেহে ঐ মৃত বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে রাখে, মৃত বাচ্চাটাকে ছাড়তে চায় না। তারপর আস্তে আস্তে বাচ্চার শরীরটা যখন পচে যায় তখন তাকে ছেড়ে দেয়। বানরদের এটা খুব প্রচলিত আচরণ। একজন বিজ্ঞানী এই নিয়ে পরীক্ষা করছিল মায়ের মাতৃত্ব ভাব কত দৃঢ়। সেই বিজ্ঞানী একটা মেয়ে বানরকে ধরেছে যে বুকে তার মরা সন্তানকে জড়িয়ে রেখেছে। ধরে এবার বানরটাকে একটা বড় পাত্রের উপর দাঁড় করিয়ে পাত্রের

নীচে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার পায়ে গরম লাগতে শুরু করেছে। যত গরম বাড়ছে মেয়ে বানরটা পা একবার এদিক ওদিক করতে শুরু করেছে, বুকে কিন্তু মরা বাচ্চাটাকে জড়িয়ে রেখেছে। অনেকক্ষণ হয়ে যাওয়ার পর যখন কোন ভাবেই পা রাখতে পারছে না, তখন সে ঐ মরা বাচ্চাটাকে পাত্রে উপর ফেলে তার শরীরের উপর দাঁড়িয়ে গেছে। স্বার্থের সামনে সব স্নেহ উড়ে যায়। এই সংসারটা হল শব সাধনার মত, মুখে চাল ভাজা ছোলা ভাজা দিতে থাকলে সব ঠিক থাকে তখন মায়ের মত স্নেহ ভালোবাসা আর কোথাও পাওয়া যাবে না। আসলে সংসারে মায়ের সম্পর্কের বাইরে আর বাকি যত সম্পর্ক আছে সেগুলো আরও জঘন্য। অন্য সম্পর্কের তুলনায় মা সন্তানের সম্পর্ক সব থেকে গাঢ় হয়। আর যদি স্বার্থশূন্য ভালোবাসার সম্পর্ক হয় সেটা একমাত্র বন্ধুর মধ্যে আর মা সন্তানের মধ্যেই হয়। যে কোন জাগতিক সম্পর্কের মধ্যে যতক্ষণ পবিত্রতা না থাকে ততক্ষণ সবটাই মায়ী। ঠাকুরও বলছেন মা দুই রকমের হয় বিদ্যা মা আর অবিদ্যা মা। স্ত্রীও দুই রকমের বিদ্যা স্ত্রী আর অবিদ্যা স্ত্রী। পবিত্রতা আসে একমাত্র আধ্যাত্মিকতাতেই, আধ্যাত্মিকতা না এলে কোন সম্পর্কই পবিত্র হতে পারবে না। সেই জন্য কোন সাধু মহাত্মা যদি কাউকে ভালোবাসে সেই ভালোবাসাই একমাত্র পবিত্র ভালোবাসা হয়। সাধুর অন্তঃকরণ পবিত্রতায় পরিপূর্ণ, তাই তাঁদের সম্পর্কটাই পবিত্র সম্পর্ক হয়। দ্বিতীয় যে পবিত্রতার সম্পর্ক পাওয়া যায় সেটা বন্ধুত্বের সম্পর্কে। স্বামীজী বলছেন Through a true friendship a person can even realize God, ঠিক ঠিক বন্ধুত্বের মধ্যে মানুষ ঈশ্বর দর্শন পর্যন্ত করতে পারে। আজ পর্যন্ত কোন মা নিজের সন্তানকে ভালোবেসে ঈশ্বর দর্শন করেনি, কিন্তু স্বামীজী বন্ধুর ক্ষেত্রে বলছেন। শাস্ত্রে সব জায়গায় বলছে সাধুসঙ্গ করতে, কোথাও তো বলেনি মাতৃসঙ্গ করতে। হ্যাঁ, বলছে তুমি মাকে সেবা করে যাও, এটা তোমার কর্তব্য। সাধুসঙ্গ কেন করতে বলছে? কারণ ঐ পবিত্রতা একমাত্র সাধুসঙ্গে আসে, দ্বিতীয় আসে বন্ধুত্বের মাধ্যমে, অবশ্য এই বন্ধুত্বের সম্পর্কটা আধ্যাত্মিক স্তরে রাখতে হবে। মা আবার দুই ধরনের হয়, ছেলে যদি সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে চায় তখন মা বলে আচ্ছা বাবা, তুমি যদি সন্ন্যাসী হতে চাও তাহলে চলে যাও, আমার যা হবার হবে। তখন বুঝতে হবে মায়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল। খোঁজ নিয়ে যদি দেখা যায় দেখা যাবে এই মা শুধু নিজের ছেলেকেই ভালোবাসে না, সারা গ্রামের সব ছেলেকেই নিজের ছেলের মত ভালোবাসে। আমরা এই ধরনের মায়ের কত প্রশংসা করি, এখানে মা আর ছেলের সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছে না, আসলে ঐ মহিলার স্বভাবটাই ঐ রকম। বাঘিনী যখন শিকার ধরে তখন মুখ দিয়ে শিকার এক ভাবে ধরে কিন্তু যখন নিজের বাচ্চাকে ঐ মুখ দিয়েই ধরে তখন অন্য ভাবে ধরে। একজন মা গ্রামের সবার সাথে বগড়া করে, সবাইকে কষ্ট দেয় আর নিজের সন্তানকে খুব ভালোবাসে, এদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। ছেলে বিয়ের পর বউকে নিয়ে আলাদা থাকতে যখন চায় তখন এই মাই বলে ‘তোকে আমি বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছি আর এখন আমাকে ছেড়ে থাকতে চাইছিস’! এই ছেলে যদি সন্ন্যাসী হতে চায় তখনও এই মাই এই একই কথা বলবে। তুমি যদি ছেলেকে দুধ না খাওয়াতে তাহলে কি ছেলে বড় হত না? গরুর দুধ, ছাগলের দুধ খেয়ে ঠিকই বড় হয়ে যাবে, কিন্তু মা যদি বুকের দুধ সন্তানকে না খাওয়ায় তখন মাকেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ইদানিং কালে ভোগবাদ এত বেড়ে গেছে, শরীরের সুখ আর ইন্দ্রিয়ের সুখ এর বাইরে মানুষ আর কিছু চিন্তাই করতে পারছে না। সংসারের এই সব দেখার সাথে সাথে যদি পুনর্জন্মকে দেখে নেয় তখন তো আতঙ্ক এসে যাবে। এই আতঙ্ক যখন হয় তখন বলে এইবার সংসার থেকে মুক্তি নিতে হবে। এর আগে যতই আমরা মুক্তির কথা বলি না কেন সবই মুখের কথা। ঠাকুরও অনেকবার বলছেন ঈশ্বরের প্রতি ঠিক ঠিক অনুরাগ যার এসেছে সে সংসারকে পাতকুয়া দেখে আর বাড়ির লোককে কালসাপ মনে করে। জগতের প্রতি বিতৃষ্ণার আসার সাথে শরীর খারাপ করা, কষ্ট পাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। সচরাচর মানুষ পশুর মত হয় নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু জানে না, সংসারী মানেই তাই। পরের জন্য জীবন দেওয়ার মনোভাব খুব কম বয়সে যখন কুড়ি একুশ বছর থাকে তখন থাকে। চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের লোক স্বার্থহীন অসম্ভব। ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম, চন্দ্রশেখর এরা কুড়ি বছর বয়সে দেশের জন্য জীবন দিয়ে দিল। ভারতের যত দুর্নীতির কাণ্ড ঘটছে তার মধ্যে পঞ্চাশ ষাট বছরের লোকেরাই জড়িয়ে আছে। স্বার্থ ত্যাগ করা, অপরের জন্য কিছু করা এদের পক্ষে সম্ভবই না।

মহর্ষি বলছেন রাজা অবমানাঃ সুকষ্টাশ্চ পরতঃ স্বজনান্তথা। শারীরা মানসা বাপি বেদনা ভূশদারুণাঃ। ১৫/১৭/৩৫। রাজা যেমন আমাকে কষ্ট দিয়েছে স্বজনরা ঠিক সেই ভাবেই আমাকে কষ্ট দিয়েছে। একজন পুলিশের পদস্থ অফিসারকে তার বন্ধু দুঃখ করে বলছেন জীবনে আমি যত ধোকা খেয়েছি সব কাছের লোকের কাছ থেকেই পেয়েছি, যাদের আমি জীবনে বেশী ভালোবেসেছি। পুলিশের ভদ্রলোক হেসে বললেন গুলি যখন চলে তখন কাছের লোকের গায়েই লাগে, দূরের লোকের গায়ে পৌঁছায় না। স্বজনরা যারা কাছের লোক তারাই বেশী কষ্ট দেয়। আর রাজা কষ্ট দেয়, কারণ সে ক্ষমতায় আছে কিনা। এই দুজন ছাড়া কেউ কষ্ট দেয় না। আজকের কাগজেই আছে, বিহারের এক রেলওয়ে

স্টেশনে ভোরবেলায় এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, এসি ট্রেনে তাঁর স্ত্রী আসবে তাকে নেবার জন্য। জিআরপির পুলিশ এসে সকাল বেলা ভদ্রলোককে বলছে আপনি একটা চোর এই ভোরবেলায় এখানে কি করছেন? ভদ্রলোক বলছেন এই দেখুন আমার প্ল্যাটফর্ম টিকিট, আমি আমার স্ত্রীকে নিতে এসেছি। পুলিশ কোন কথা না বলে দুই ডাঙা মেরে বলছে প্ল্যাটফর্ম টিকিট আছে তো কি হয়েছে, চোররাও ওরকম একটা টিকিট কেটে ভদ্রলোক সেজে থাকে। এই হচ্ছে রাজকষ্ট, রাজকষ্ট মানে সরাসরি রাজার থেকেই আসতে হবে তা নয়, যার হাতে রাজদণ্ড আছে। কনস্টেবল মানে তার হাতে রাজদণ্ড আছে। যাদের হাতেই কিছু রাজ ক্ষমতা আছে তারাই সেই ক্ষমতা দিয়ে সাধারণ লোকদের হয়রানি করবে। ট্রেনে টিটিরা বামেলা করবে, ট্রাফিক পুলিশ হয়রানি করবে, যেখানেই যাব সেখানেই কিছু না কিছু বামেলা করতে থাকবে। আগেকার দিনে গ্রামে এত আইন কানুন ছিল না, রাজা আছেন আর তার কর আদায়কারী কিছু লোক থাকত। কিন্তু বর্তমান যুগে চারিদিকে রাজার ক্ষমতা সম্পন্ন লোক, ইনকাম ট্যাক্স আছে, সেলস ট্যাক্স আছে, মিউনিসিপ্যালিটির লোক আছে, পুলিশের লোক আছে, আরও কত রকমের লোক আছে আর সবাই আমাদের জ্বালিয়েই যাচ্ছে। আর.কে লক্ষ্মণ, যিনি কার্টুনিস্ট ছিলেন, তিনি এটাকে নিয়েই কার্টুন বানান কিভাবে সাধারণ মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে। এখানে রাজা মানে যার হাতে ক্ষমতা। মহর্ষি এটাই বলছেন ক্ষমতাবান লোক আর স্বজনদের থেকে আমি সাংঘাতিক কষ্ট পেয়েছি, শুধু কষ্টই না, কত অপমানিত হতে হয়েছে। এই যে স্টেশনে লোকটিকে পুলিশ ডাঙা মারল, এতে তার হাড়গোড় নাও ভাঙতে পারে কিন্তু স্টেশনে অত লোকের সামনে তাকে অপমানিত হতে হয়েছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের বয়স্ক একজন ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী এসি ট্রেনে আসছে তাকে রিসিভ করতে এসেছেন, পুলিশ এসে তাকে দিল ডাঙা মেরে। কেন? তোমাকে দেখে একটা মজুর মনে হচ্ছে। মহর্ষি বলছেন, শরীর আর মনের অনেক কষ্ট আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। আর অপমান, কারাবাস, প্রাণদণ্ড সবই আমাকে ভোগ করতে হয়েছে আবার কতবার নরক বাসও করতে হয়েছে।

বারবার এই নানা রকমের ক্লেশ সহ্য করতে করতে হঠাৎ একদিন আমার মন খুব কষ্টে ভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। তখন আমি ভগবানের শরণ নিলাম আর লোক ব্যবহার ত্যাগ করলাম। তারপরেই আমি এই পথকে অবলম্বন করেছি। বেদান্তের ভাষ্যাদি করার সময় আচার্য শঙ্কর একটা কথা অনেকবার বলছেন, প্রত্যেক জীবের মধ্যে দুটো ভাব থাকে। এই দুটো ভাব হল যুসাদ্ প্রত্যয় আর অসাদ্ প্রত্যয়। অসাদ্ প্রত্যয় মানে আমি আছি আর যুসাদ্ প্রত্যয় মানে তুমি বোধ। আমি আছি আর জগৎ আছে এই বোধ সবারই আছে। একটা গরু সেও জানে সে গরু আর এটা ঘাস, একটা পিপড়েও জানে আমি পিপড়ে আর এটা মিষ্টি, আমি এই মিষ্টিটা খাব। এরও নীচে যখন ভাইরাসে যাব, সেখানেও একটা ভাইরাস সেও জানে আমি আর এটা আমার খাদ্য। এই আলাদা বোধ জীব মাঝেই থাকবে। এই বোধ থেকেই দর্শনের বিবর্তন শুরু হয়। আধ্যাত্মিক জীবনে এসে জীবের অসাদ্ প্রত্যয়টা পরিষ্কার থাকে, আমি আছি এই বোধ থাকবে। এর সাথে আরেকটা বোধ থাকে ঈশ্বর আছেন। ঠাকুর নিজের সম্বন্ধে বলছেন আমি আছি আর আমার মা আছেন। আমরা বলছি, আমি আছি আর ঠাকুর আছেন। আমার আর ঠাকুরের সঙ্গে একটা যোগসূত্র আছে। এই যোগসূত্রের মাঝখানে যুসাদ্ প্রত্যয় আছে – আমি আছি, ঠাকুর আছেন আর মাঝখানে জগৎ আছে। এই জগতের সঙ্গে আমি যে ব্যবহার করব, এটাকেই বলা হয় লোক ব্যবহার। লোক ব্যবহার কি রকম হবে? ঠাকুর এই লোক ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে শব সাধনার কথা দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তত্ত্ব মতে শব সাধনা করার সময় মাঝে মাঝে ঐ মরা শব মুখটাকে হাঁ করে ওঠে। তখন ঐ শবের মুখে কিছু ছোলা ভাজা, চাল ভাজা দিয়ে দিতে হয়, তখন ওর মুখটা বন্ধ হয়। এই জগৎটা, পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটা হল শব। মাঝে মাঝে মুখটা হাঁ করে ওঠে, ওর মুখে তখন চাল ভাজা, ছোলা ভাজা দিয়ে দিতে হয়। কারা শবের মুখে চাল ভাজা ছোলা ভাজা দেবে? যারা এখনও সিদ্ধ হননি। আমরা এখনও সিদ্ধ হইনি, যিনি সন্ন্যাসী তিনিও যদি সিদ্ধ না হন, এদের সবাইকে এই লোক ব্যবহার করতে হবে। সন্ন্যাসী যদি সিদ্ধ না হয়ে থাকেন তখন তাঁর কাছে বেলুড় মঠের প্রয়োজন আছে। বেলুড় মঠ যদি সন্ন্যাসীকে বহিষ্কার করে দেয় তখন সে কোথায় ভেসে ভেসে বেড়াবে! সন্ন্যাসীর কাছে বেলুড় মঠ শব, মাঝে মাঝে সে হাঁ করে। কিভাবে হাঁ করবে? তোমার তো দেখছি এখন কোন কাজ নেই, তুমি কিছু কাজ কর। সন্ন্যাসীও বলে দিল হ্যাঁ মহারাজ। সন্ন্যাসী হ্যাঁ বলে দিল মানে কিছু চালভাজা ছোলাভাজা দেওয়া হয়ে গেল। যাও তুমি বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটিতে ক্লাশ নাও। সন্ন্যাসী এখন শাস্ত্রের ক্লাশ নিতে শুরু করল। খুব ভাল। এবার যারা ক্লাশ নিচ্ছে তাদের ফোন নং নিয়ে সন্ধ্যা বেলা জিজ্ঞেস করছেন দাদা আমার ক্লাশটা কি রকম লাগল, দাদা আপনি আজ কেন ক্লাশে এলেন না। তাহলে বুঝতে হবে সন্ন্যাসী এবার গোলমালে পড়ে যাবে। এটাকে বলে লোক ব্যবহার। যে কোন আধ্যাত্মিক পুরুষের কাছে লোক ব্যবহার অত্যন্ত গর্হিত। সেইজন্য তাঁরা মাঝে মাঝে শব সাধনার মত মুখে একটু চাল ভাজা ছোলা ভাজা দিয়ে যুসাদ্ প্রত্যয়কে এখানেই ফেলে দিলেন। যুসাদ্ প্রত্যয় করে জগতকে যদি বেশী দাম দিতে যায় তাহলে এখানেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে।

মহর্ষি এইসব কথা বলে শিষ্যকে বলছেন ‘আমি এখন এই সব করে উত্তম সিদ্ধি লাভ করেছি, এই মর্ত্যলোকে আমি আর প্রবেশ করছি না’। তখন কাশ্যপ মুনি সেই সিদ্ধের কাছে কিছু প্রশ্ন করেছেন।

এখানে কিন্তু ধর্মপ্রাণ লোকেদের কথা বলা হচ্ছে না, যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ, পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে যাঁরা চলে গেছেন তাদের কথাই বলা হচ্ছে। আধ্যাত্মিক ইতিহাসে একটা পরিভাষা আছে যাকে বলা হয় ‘Sudden Conversion’ হঠাৎ আধ্যাত্মিক রূপান্তর। ভগবান বুদ্ধেরও হঠাৎ রূপান্তর হয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে এই রকম বহু সাধু সন্ত আছেন তাঁদের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এঁদের অনেকেরই হঠাৎ আধ্যাত্মিক রূপান্তর হয়েছিল। এর মধ্যে সাধু সুন্দর সিং এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন ভালো বংশের শিখ ছিলেন। সাধু সুন্দর সিং একটা খ্রীস্টান স্কুলে পড়তেন। স্কুলের ফাদাররা নানা রকমের কথা বলতেন। ক্লাশ গ্রী ফোরে তাঁর গীতা মুখস্ত ছিল। ছোটবেলা থেকেই তিনি ভোরবেলা স্নান করে গীতা গ্রন্থসাহেব পাঠ করতেন। তিনি আবার খ্রীস্টানদের পুরো বিরোধী ছিলেন। পনের বয়স পর্যন্ত তিনি খ্রীস্টানদের বিরোধীতাই করে এসেছেন। এমনই বিরোধীতা করতেন যে, মাঝে মাঝেই স্কুলে ফাদারদের গালমন্দ করতেন। একদিন তো বাইবেল গ্রন্থকে এই বলে পুড়িয়েই দিলেন যে, এটা কোন গ্রন্থই নয় একে পুড়িয়েই দিতে হয়। এই ঘটনার পর একদিন ভোরবেলা স্নান করে শাস্ত্র পাঠ করতে ঘরে ঢুকছেন তখন দেখেন যিশুখ্রীষ্ট ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমে সুন্দর সিংএর মনে হল স্বপ্ন দেখছি। তিনি চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে ঘোরটা কাটাতে চাইছেন, কিন্তু ঘোর কি কাটবে! তিনি তো সব স্নান করেই এসেছেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করছেন আপনি কে? যিশু বলছেন ‘I am Christ the Savior’। সেন্ট পলকে যেমন জিজ্ঞেস করেছিলেন ঠিক সেই রকম যিশু সুন্দর সিংকে বলছেন ‘তুমি আমার কেন নিন্দা করে বেড়াচ্ছ’? যিশুর ঐ কথা শুনেই তিনি যিশুর পায়ের উপর পড়ে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। সকাল সাতটার সময় ঘর থেকে বেরিয়ে বাবাকে বলে দিলেন ‘আমি খ্রীস্টান হয়ে গেছে’। বাবা শুনে নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছেন না, যে পরশু দিন বাইবেল পুড়িয়ে এসেছে সে বলছে আমি খ্রীস্টান হয়ে গেছি।

তারপর তিনি সব চুল দাড়ি কামিয়ে খ্রীস্টান হয়ে গেলেন। এরপর তিনি খ্রীস্টান সাধু হিসাবে খুব নাম করেছিলেন। ভারতের সব ফাদাররা সুন্দর সিংএর কাহিনী শুনে সব চমকে গেলেন আর রাতারাতি সারা দেশে সুন্দর সিংএর এই কাহিনী ছড়িয়ে দিলেন। খ্রীস্টান হয়ে সুন্দর সিং নামটা আর পাল্টালেন না, নামের আগে শুধু যোগ করলেন সাধু, যদিও খ্রীস্টান হয়ে গেছেন কিন্তু নামের আগে সাধু লাগাতেন। সাধু সুন্দর সিং সারা বিশ্ব জুড়ে, এমন কোন দেশ নেই যেখানে গিয়ে তিনি খ্রীস্টান ধর্মের উপর বক্তৃতা করেননি। তিনি যখন যিশুর উপর কথা বলতেন সমস্ত শ্রোতারা নাকি চোখের জল ফেলতেন। শ্রোতারা বলত, আমরা খ্রীষ্টকেও বিশ্বাস করিনা, চার্চকেও বিশ্বাস করিনা, খ্রীস্টান ধর্মকেও বিশ্বাস করিনা কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করি। পরে এই সাধু সুন্দর সিং খ্রীস্টান ধর্ম থেকে নিজেকে পুরো আলাদা করে নিলেন। আলাদা করে দিলেও উনি কিন্তু বরাবর গোঁড়া খ্রীস্টান থেকে গেলেন। সারা জীবনে একটি পয়সা রাখেননি, ভিক্ষা করে খেতেন, একেবারে কাঠখোঁটা সন্ন্যাসী যে রকম হয়। উনি শুধু বলতেন খ্রীষ্টধর্মকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে এই ভাবে থাকতে হবে। পাহাড়, উপত্যকায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর অনুগামীর সংখ্যা ছিল বিশাল। তারপর তিনি তিব্বতে যাওয়ার পর সেখানে তাঁর কি হল আর খোঁজ পাওয়া যায় না। এই যে আমরা সুন্দর সিংএর ঘটনাটা বললাম তিনি পরিস্কার ঘরের মধ্যে যিশুকে দেখতে পেলেন। আর যেই লোকটা একদিন আগে বাইবেল পুড়িয়েছে সেই লোকটা সেদিন থেকে খ্রীস্টান হয়ে গেল। সেন্ট পলের ক্ষেত্রে এই একই ঘটনা ঘটেছিল। সে আট দশ জন সৈন্যকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে দামাস্কাস যাচ্ছে খ্রীষ্টানদের মারার জন্য। হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে বিরাট লম্বা শরীর নিয়ে যিশু দাঁড়িয়ে বলছেন ‘তুমি আমার লোকগুলিকে মারতে চাইছ কেন’? ঐ এক দিব্য মূর্তিকে দেখতেই সে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে গেল। অথচ বাকিরা যারা তার সঙ্গে ছিল তারা কিছুই দেখতে পায়নি। তিন দিন তিনি ঐ রকম বেহুঁশ অবস্থায় ছিলেন। যখন হুঁশ এল তখন শুধু একটা কথাই বলে যেতে লাগলেন ‘Christ forgive me’। তারপর তিনি খ্রীস্টান ভাবধারায় রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। বাইবেলে তাঁর নামে একটা গসপেলই আছে। এগুলো সবই ‘Sudden Conversion’। হঠাৎ রূপান্তরের আগে এক রকম ছিল হঠাৎ দুম্ করে অন্য রকম হয়ে গেল। যেমন ভগবান বুদ্ধ, তিনি একজন ভোগের মধ্যে পালিত রাজকুমার, হঠাৎ সেখান থেকে তিনি অন্য রকম হয়ে গেলেন। আধ্যাত্মিক জীবন কিন্তু এইভাবে হঠাৎ হয় না। এই রকম যে হয় না তা নয়, খুব কম হয়।

আধ্যাত্মিক রূপান্তর সব সময় ধীরে ধীরে হতে থাকে। ঠাকুরকে যদি অবতার রূপে ভাবি তখন তাঁকে নিয়ে আলোচনার কিছু থাকে না, কিন্তু একটা জীবন রূপে যখন দেখব তখন তাঁর সব কিছুকেই জীবনের অঙ্গ রূপেই দেখতে হবে। রোমা রোঁলা যখন ঠাকুরের জীবনী লিখছেন তখন তাঁকে মানুষ রূপেই লিখেছেন। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে মা

ভবতারিণীর পূজার দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন, তখন হঠাৎ তাঁর চিন্তায় এলো মা মৃন্ময়ী না চিন্ময়ী, আচ্ছা মা কি সত্যিই দেখা দেন? মা রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিলেন, কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছিলেন আমাদের কেন দেখা দেবেন না? কোন একটা মুহুর্তে ঠাকুরের মনে এই চিন্তাগুলো ঢুকতে শুরু করেছে। মনের যে কোন আবেগকে নিয়ে যত চিন্তা করতে থাকবে তত সেই আবেগের শক্তি বাড়তে থাকবে। যেমন ক্রোধ, কারুর উপর যদি কোন কারণে ক্রোধ এসে যায়, এখন যত এই ক্রোধ নিয়ে চিন্তা করতে থাকব, আমাদের কি পেয়েছে! জানে না আমি কি করতে পারি! ব্যাটাকে একবার দেখাতে হবে আমি কি করতে পারি, এই ধরনের যত চিন্তা করতে থাকবে ততই তার ক্রোধের আগুনে তেল ঢালছে। সন্তানের জন্মের লগ্ন থেকেই সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা প্রগাঢ় হয় না, সন্তান যত বড় হতে থাকে, যত সন্তানকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে থাকে তত মায়ের ভালোবাসা গাঢ় হতে থাকে। সেইজন্য আমাদের শাস্ত্র প্রথম থেকে বলে আসছে মনের যে কোন আবেগই হল নেতিবাচক, ইতিবাচক আবেগ বলে কিছু হয় না। আধ্যাত্মিক জীবনে এইটাকে বলা হয় ভাব। ভাবের ক্ষেত্রেও এই একই জিনিষ হয়। একটা ভাবকে নিয়ে যত চিন্তা করবে, অনুশীলন করবে তত সেই ভাবটা গাঢ় হয়। ঠাকুরও ভাব পাকা করতে বলছেন। একটা চিন্তা যেটা আসে সেটা হঠাৎ করে আসে, ঠাকুরের একটাই চিন্তা উদয় হল ‘মা তুমি কি সত্য’?

এখানে সিদ্ধ মহর্ষি কাশ্যপ মুনিকে এটাই বলছেন ‘হঠাৎ আমার মনে হল আরে আমি এ কি করছি! তখন আমি ভগবানের দিকে মন দিলাম। ভগবানের দিকে মন দেওয়ার পর থেকে আমার সাধনা শুরু হল, সেই সাধনা করতে করতে আজ আমি সিদ্ধলোকে পৌঁছে গেছি’। সিদ্ধরা খুব নামকরা ঋষি হয়ে যান, এনারা দেবতাদের থেকেও উপরে থাকেন। ঐ সিদ্ধ অবস্থায় গিয়ে তিনি তাঁর পূর্বের সমস্ত জন্মকে দেখে বলছেন ‘এর আগে আমার কত জন্ম হয়েছিল, তখন আনন্দ যাই পেয়ে থাকি কষ্ট তার থেকে অনেক বেশী পেয়েছি’। বড় বড় সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা হলে মানুষ নানা রকমের প্রশ্ন করে, এখানে কাশ্যপ মুনিও অনেক প্রশ্ন করছেন।

কাশ্যপের বেশীর ভাগই প্রশ্ন হল কিভাবে মানুষের মৃত্যু হয়, কিভাবে মানুষ উপরের দিকে যায় ইত্যাদি। সিদ্ধ মহর্ষি তখন বলছেন শাস্ত্রে যেমন যেমন বলা হয়েছে সেই মত কাজ করলে মানুষ কীর্তি পায় আর যত কর্ম সঞ্চিৎ হয়ে আছে তার থেকে কিছু কর্ম নিয়ে এই শরীরের জন্ম হয়। ঐ কর্মগুলি যখন ক্ষীণ হয়ে যায়, তখন তার যা বয়সই থাকুক না কেন, শরীরটা খসে পড়ে যায়। সিদ্ধ মহর্ষি এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভালো কর্মগুলো আগে ক্ষয় হতে শুরু করে আর একটা বয়স পর থেকে বাজে কর্মগুলো কার্যকর হতে শুরু করে। তারও পর থেকে তার বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভাবে বিপরীত হয়ে যায়। আমরা এর আগে বলেছিলাম বেশীর ভাগ মানুষ চল্লিশ বছর পর থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত হতে থাকে, তার মানে তার ভালো কর্মগুলো সব শেষ হয়ে গেছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিয়ের আগে মেয়েদের সব কিছু ঠিকঠাক চলতে থাকে, যত রকমের গোলমাল বিয়ের পর মেয়েরা করতে থাকে, এখানেও তার পূণ্য কর্মগুলো বিয়ের আগেই শেষ হয়ে গেছে। এই কথা এখানেও বলা হচ্ছে, প্রথমের দিকে সব ভালো মত চলতে থাকে, কারণ প্রথমে পূণ্য কর্মগুলো বেরোতে থাকে, পরের দিকে সব বাজে কর্মগুলো বেরোতে শুরু করে। আমাদের বাংলাতেই বলে বুড়ো বয়সে ভিন্নরত হয়। একেবারে বৃদ্ধ অবস্থায় বুদ্ধি পুরো বিপরীত হয়ে যায়। যারা একটা বয়স থেকে পূজা অর্চনা, জপ-ধ্যান নিয়ে আছে এদের বাদে সব বুড়ো বয়সে সব মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। শুধু শরীরের চিন্তা, শরীরের বাইরে কিছু ভাবতে পারবে না। এই কারণেই আমাদের ঋষিরা বাণপ্রস্তের প্রথা করে গিয়েছিলেন। বাড়িতে থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যাতে সংসার চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত না থাকে আর সংসারের বাকি লোকগুলোকে যাতে উত্সাহ না করতে পারে, কারণ বাকি লোকগুলোকেও তো জীবন চালাতে হবে, তাই এই বাণপ্রস্ত প্রথাকে চালু করে গিয়েছিলেন।

আমাদের কাজ হয় তিন থেকে চারটে স্তরে। একটা হল হাত, হাতের পেছনে থাকে কর্মেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের পেছনে আছে মন আর মনের পেছনে আছে বুদ্ধি। বুদ্ধি মনকে সোজা থাকতে বলে, মন ইন্দ্রিয়কে বলে সোজা থাক আর ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করে হাতকে। বয়সের সাথে সাথে ইন্দ্রিয়গুলো প্রবল হতে থাকে। তার কারণ ইন্দ্রিয়কে প্রচুর ইন্ধন দেওয়া হয়ে গেছে। আগেই বলা হয়েছে আমাদের মনের আবেগগুলোকে যত ইন্ধন দিতে থাকব আবেগগুলো তত শক্তিশালী হবে। যেমন সারা জীবন যে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কাটিয়েছে, তার মানে খাওয়া-দাওয়ার ইন্দ্রিয়কে সে আছতি দিয়ে গেছে। অন্য দিকে মন যে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল সে এখন হয়ে গেছে দুর্বল। মনকে নিয়ন্ত্রণ করে বুদ্ধি। বুদ্ধি একমাত্র নিয়ন্ত্রণ হয় সাধুসঙ্গ ও গুরুজনের সঙ্গ করে আর শাস্ত্র অধ্যয়ণ এবং তপস্যা করে। কোনটাই সে সারা জীবন করেনি। বুদ্ধি হয়ে যায় নড়বড়ে, ঠাকুর যে বুদ্ধিকে বলছেন চিড়ে ভেজা বুদ্ধি। যার জন্য বুদ্ধি মনকে আর নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে না, মন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না ইন্দ্রিয়কে। অন্য দিকে তার স্নায়ু পেশীগুলোও দুর্বল হয়ে যায়, ইন্দ্রিয়ের উপর মনের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই

তার ফলে ইন্দ্রিয় হয়ে যায় প্রচণ্ড চঞ্চল। এক চরম যাচ্ছেতাই অবস্থা হয়ে যায়। জিহ্বা এখন প্রচুর জিনিষ খেতে চাইছে, কিন্তু পেট দুর্বল হয়ে গেছে, কিছুই আর হজম হবে না। কিন্তু বিরিয়ানি, কষা মাংস দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবে। বাচ্চা ছেলে যেমন বলে আমি একটা হাতি খাব, বৃদ্ধদের এই রকম বাচ্চাদের মত অবস্থা হয়ে যায়। ইন্দ্রিয় এখন সমুদ্র ঝড়ের সময় যে রকম উদ্দাম হয়ে যায় সেই রকম উদ্দাম হয়ে উঠেছে। শাস্ত্র চর্চা করে বুদ্ধি কে জাগ্রত রাখবে, বুদ্ধিকে জাগ্রত রেখে মনকে চাঙ্গা রাখবে সেই রকম কোন অনুশীলন নেই। লোভকে আর আটকাতে পারে না, কারণ একটা বয়সে খুব খেয়েছে, এখন শরীর আর নেয় না। শুধু এই একটা ইন্দ্রিয় না, যতগুলো ইন্দ্রিয় আছে একটাও শান্তিতে থাকতে দেয় না। এইটাকেই মহর্ষি বলছেন, শুভকর্ম গুলো শেষ হয়ে বাজে কর্মগুলো চাড়া মারতে থাকে, তখন এই দুরবস্থা হয়। বেলুড় মঠের সিনিয়র মহারাজরা ইয়ং সাধুদের বলেন তিরিশ বছরের মধ্যে যদি জীবনকে সংগঠিত না করে নিতে পার তাহলে বুড়ো বয়সে কেঁদে মরতে হবে। সাধুরা সাবধান করে দিয়ে বলেন, দেখো ভাই প্রথম থেকে তুমি যে রকম ছিলে শেষেও তুমি তাই থাকবে, এর বিরাট কিছু পরিবর্তন হবে না। তুমি যদি প্রথম থেকেই ঝগড়াটে থাক বুড়ো বয়সেও তুমি ঝগড়াই করবে। বিরাট পরিবর্তন যেটা হবে সেটা একটা পাহাড়কে নাড়িয়ে দেওয়ার মত। সমাজে যত বুড়ো বুড়ি আছে তাদের খোঁজ নিয়ে দেখুন, যে যে বুড়ো বুড়ির আচরণ আমাদের ভালো লাগছে না, তাদের সাথে একটু কথা বললে দেখা যাবে যৌবনে তাদের একই রোগ ছিল। এইসব দেখেই আমাদের ঋষি মুনিরা প্রারব্ধের ধারণাটা নিয়ে এলেন। আমরা কিছু কর্ম নিয়ে জন্ম নিয়েছি, ঐ কর্মই আমাদের শরীর দিয়ে বেরোচ্ছে। এই কর্মগুলোকে কিছুতেই পাল্টান যায় না, পাল্টায় যদি না আমি বিরাট একটা চেষ্টা করছি। কিন্তু সেই চেষ্টা কবে থেকে শুরু করব? খুব জোর পঁচিশ কি তিরিশ বছর বয়স থেকে। তাহলে তো সেই একই কথা হয়ে গেল। পঁচিশ বছর বয়সের আগে আমি যা ছিলাম, পঁচিশ বছর বয়সেও আমি তাই থাকব। তবে এই বয়সে চেষ্টাতে একটা জোর লাগাবার সামর্থ্য থাকে। সেইজন্যই বলা হয় ‘বল বুদ্ধি ভরসা তিরিশ পেরোলে ফর্সা’।

এখানে একটা বিরাট তালিকা দিয়ে বলছেন কি কি করলে মানুষের বুদ্ধি বিপরীত হয় এবং শরীরের ক্ষতি নিবন্ধ হেতু রোগগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। দূষিত খাবার খেলে, কোন দিন যদি ভারী খাবার মানে গরিষ্ঠ খাবার খেয়ে নিলে। গরিষ্ঠ খাদ্য ভারতে অত্যন্ত নিন্দিত, ভারতে গরুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে গুরুপাক বলে। তারপরে বলছেন, একটা খাওয়া হজম হয়নি তার আগেই দ্বিতীয় বার খেয় নেয়। ভীমসেনের আরেক নাম ছিল বৃকোদর। বৃক মানে নেকড়ে, নেকড়ে যা খায় সঙ্গে সঙ্গে হজম করে নেয়। ভীমও যা কিছু খেত, খেতে না খেতেই তার হজম হয়ে যেত। এই শক্তি সবার থাকে না। তারপরে বলছেন, *ব্যামমতিমাত্রাৎ ব্যবয়াং চোপসেবতে। সততং কর্মলোভাদা প্রাপ্তং বিধারয়েৎ। ১৫/১৮/১১।* অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যায়াম করাটাও খারাপ। আসলে বেশী পরিশ্রম করতে নিষেধ করা হচ্ছে। মলমূত্রাদির বেগকে জোর করে ধরে রাখলে, অতিরিক্ত রসযুক্ত খাবার মানে প্রচুর মশলা দেওয়া খাবার খেলে, দিনের বেলা ঘুমোলে এই ধরনের অনেক দোষের কথা বলে মূল কথা বলছেন এই দোষগুলোর যে কোন দোষ যদি কুপিত হয়ে যায় তখন দুটো জিনিষ হয়। কোন একটা রোগকে সে শরীরে ডেকে নিয়ে আসে আর তা নাহলে গলায় দড়ি দিয়ে বা জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। ইদানিং কালের একটা সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে মেয়েদের মধ্যে বিশেষ করে এয়ারহোস্টেস বা সুন্দরী প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান পাওয়া মেয়েদের মধ্যে চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেলে আত্মহত্যার প্রবণতাটা বেড়ে গেছে। কারণ একটা সময় ধরে শরীরের প্রতি এত বেশী মাত্রায় মন দিয়ে রেখেছিল পরে যখন চল্লিশ বছর বয়স থেকে স্বাভাবিক ভাবে শরীরের জৌলুষটা ঝরতে শুরু করে তখন সেটাকে মেনে নিতে পারেনা বলে আত্মহত্যা করে নেয়। জাগতিক কোন কিছু যদি অতিরিক্ত করা হয়, খাওয়া-দাওয়া, ভোগসুখ যে কোন কাজ করলে এই দুটোর মধ্যে একটা হবে। হয় একটা রোগ এসে যাবে আর তা নাহলে গলায় দড়ি দিয়ে দেবে। এই সব করেই জীব তার নাশের দিকে এগিয়ে যায়।

এখানে বারবার একটা কথাই বলে যাচ্ছেন, শাস্ত্র মতে কি বলছে, শাস্ত্র মতে না করলে কি হয় ইত্যাদি। আমরা এর আগেও বলেছি বন্ধন-মুক্তি, স্বর্গ-নরক, জীবাত্মা-ঈশ্বর এই কথাগুলো সব সময় শাস্ত্র দিয়েই জানা যায়। শাস্ত্র যদি বিশ্বাস কেউ না করে তাহলে তার কোন দিনই এগুলোতে বিশ্বাস হবে না, কারণ এগুলো কখনই যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায় না। এখানে বলছেন শাস্ত্র মতে জীবের তিনটে গতি হয় – উর্দ্ধ গতি, অধোগতি আর মধ্যম গতি, স্বর্গ, নরক আর মর্ত্যলোক। মর্ত্যলোকই ঠিক ঠিক কর্মভূমি। মর্ত্যলোকে অনেক ধরনের প্রাণি থাকে, স্বর্গে অনেক ধরনের প্রাণি থাকে না, সেখানে দেবতারাই খালি আছেন। আর নরকে শুধু পাপীরাই আছে। কিন্তু মর্ত্যলোকে অনেক ধরনের প্রাণি আছে, সাপ-বিছে যেমন আছে, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা, পশু-পাখি যেমন আছে আবার মানুষও আছে। কিছু দিন আগে একটা মজার ঘটনা

কাগজে বেরিয়েছিল। আমাদের ভারতের রাষ্ট্রপতির বাসের জন্য হায়দ্রাবাদে একটা বাড়ি রাখা আছে। সেখানে একদল কমাণ্ডো ইম্পেকশানে গিয়ে দেখছে বাড়িতে জঙ্গল হয়ে আছে আর সাপ, বিছে বানরে ভর্তি। সাপুড়ের ডেকে আনা হয়েছে সাপগুলোকে ধরার জন্য। সাপুড়েরা এসে দেখছে প্রচুর সাপ, কত আর সাপ ধরবে। তখন এরা বলল আমরা পাশেই আছি, আপনার সাপের হিস হিস শব্দ পেলেই আমাদের খবর দিয়ে দেবেন, আমরা এসে ধরে দেব। সব শুনে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করছে ‘বাড়িতে কি ভূতও আছে?’ কমাণ্ডোরা বলছে ‘রাষ্ট্রপতি আসার আগে আমরা বাড়িতে একটা যজ্ঞাদি কিছু করিয়ে নিই’। সাংবাদিকরা তখন উল্টে বলছে ‘আপনারা এক দিকে ভূতটুত বিশ্বাস করেন না আবার এদিকে ভূত তাড়াবার মন্ত্রটন্ত্রে বিশ্বাস করেন?’ কমাণ্ডোরা বলছে ‘এর বাইরে আমরা আর কোন উত্তর দেবে না’। তার মানে ঐ বাড়িতে ভূতও আছে। রাষ্ট্রপতি যত দিন থাকবেন তত দিন যাতে কোন অশান্তি না করে তাই যজ্ঞাদি করে ভূতগুলোকে শান্ত রাখা হয়। এই খবর রীতিমত কাগজে বেরিয়েছে। এর আগে একবার প্রতিভা পাটিল এসে এখানে ছিলেন তখন একটা ভূত এসে নাকি তাঁকে বিরক্ত করতে শুরু করেছিল, তারপর থেকে সবাই সাবধান হয়ে গেছে। এইটাই হল মর্ত্যলোক, এখানে সব কিছু আছে, সাপ, ব্যাঙ থেকে শুরু করে ভূতও আছে। এই জিনিষ স্বর্গলোকে পাওয়া যাবে না। সেইজন্য এই লোককে বলা হয় কর্মভূমি। মর্ত্যলোকে অনেক কিছু কর্ম করে উপরের দিকে যাবার সুযোগ পাওয়া যায়। মহর্ষি বলছেন, লোকেরা বলে স্বর্গে শুধু সুখ, কিন্তু স্বর্গেও সুখ নেই। তার কারণ সেখানেও আবার উঁচু নিচু ভেদ আছে। যারা নীচের স্বর্গে আছে তারা উপরের স্বর্গে যারা আছে তাদের দেখে জ্বলেপুড়ে মরে।

অনুগীতাতে অনেক রকম ধারণা ও তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে, এর মধ্যে কিছু তত্ত্ব থেকে গেছে কিছু আবার হারিয়ে গেছে। এখানে একটা ধারণার কথা বলছেন, যখন মা ও বাবার সংযোগ হয়ে শিশু যখন গর্ভে আসে তখন তার চৈতন্য হয় না, চৈতন্য আত্মা তারপরে ওর মধ্যে প্রবেশ করে, প্রবেশ করার পর ঐ চৈতন্য ভাবটা তার সারা শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। *যথা চ দীপঃ শরণে দীপ্যমানঃ প্রকাশতে। এবমেব শরীরানি প্রকাশয়তি চেতনা।* ১৫/১৯/১১। যেমন একটা অন্ধকার ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলে প্রদীপের আলোটা সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে যায়, ঠিক তেমনি জীবাত্মা যখন শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তখন তাঁর চৈতন্য সারা শরীরের ছড়িয়ে যায়। এখানে আরেকটি খুব সুন্দর প্রশ্ন আছে, আত্মা শরীরকে ধারণ করেন অর্থাৎ এই শরীরের যে আত্মা আছেন এই ধারণা প্রথম কে দিয়েছিলেন? তখন সিদ্ধ বলছেন ‘এই ধারণাটা সাক্ষাৎ ব্রহ্মা দিয়েছেন’। এখানে আমাদের একটা জিনিষ বলার আছে। আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা, আত্মা দেহকে আশ্রয় করে আছে কিন্তু আত্মাই মূল সত্তা, এর কি প্রমাণ আছে? কোন প্রমাণ নেই। শাস্ত্রই একমাত্র এর প্রমাণ। সেইজন্য এই সব প্রশ্ন অবান্তর হয়ে যায়। আসল কথা তুমি বাপু কি জগতের জ্বালায় পুড়ে মরছ? হে বাবা আমি পুড়ে মরছি আমাকে বাঁচান। তাহলে বাপু বেশী প্রশ্ন না করে যা যা করতে বলা হবে সেগুলো করে যাও। বাড়ির খুব প্রিয়জনের হার্ট এটাক হয়েছে, আমাকে এক্ষুণি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয়ে। ডাক্তারের কাছে গিয়ে কি আমি কি ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখতে চাইব? অথবা ফোন করে দেখে নেব এই ডাক্তার মেডিকেল কাউন্সিলের মেম্বর কিনা? আর যে ওষুধ প্রেসক্রাইব করেছেন সেগুলো খাওয়ানোর আগে কি খোঁজ নেব এই ওষুধের কি কি উপাদান, এর আগে এই ওষুধ খেয়ে কত লোক মারা গেছে, কজন বেঁচেছে? এইসব কি আমরা কখন করি? প্রথমেই ডাক্তারের হাতে পায়ে ধরে বলতে শুরু করে দিই ডাক্তারবাবু আমার স্ত্রীকে বাঁচান। এখন ডাক্তার কি দিচ্ছে, কি করতে বলছে সেটাই করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। ঋষিরা বলেন ধর্ম এদের জন্যই। জগতজ্বালায় জ্বলে যাচ্ছি আমাকে জল দাও, তখন জিজ্ঞেস করে না এটা গঙ্গার জল না নর্দমার জল। আগে আমার প্রাণ বাঁচাও। এই ভাব যদি না থাকে ধর্ম তাদের জন্য নয়। বাকিরা যাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয়ে যায় তাই ধর্মের বাকি কথাগুলো বলা হয়। কিন্তু যখন গুরু বাক্য পেয়ে এগোতে শুরু করে তখন সে দেখে গুরু যা বলেছিলেন ঠিক তাই তো দেখছি। কিন্তু প্রথমেই যদি গুরু বাক্যকে বিচার করতে শুরু করে দেয় তার দ্বারা আর এগোন হবে না। সেইজন্য বলা হয় গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে।

এখানে বলা হচ্ছে মুক্তি কে পায়। ১) সুখ ও দুঃখ দুটোকেই যে অনিত্য দেখে। শুধু একটাকে অনিত্য দেখলে হবে না, দুটোকেই অনিত্য দেখতে হবে। সুখ-দুঃখ আসবে যাবে, তাই দুঃখতেও কান্নাকাটি করার নেই আর সুখেতেও উৎফুল্ল হওয়ার কিছু নেই। ২) শরীরকে অপবিত্র বস্তুর সমাহার মনে করে। ঠাকুর বলছেন এই শরীরে কি আছে? কফ, মল, মূত্র, অস্তি, মজ্জা, নাড়ি, মেদ এগুলোই আছে। যোগশাস্ত্রেও বলছে শৌচাৎ সাস্ত্রোক্ত জুজুঙ্গা, যখন মানুষ খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে শুরু করে, যখন ব্রাহ্মণদের মত শুচিবাদি হয়ে যাবে তখন নিজের শরীরের প্রতিও প্রচণ্ড ঘেন্না ধরে যায় আর অপরের শরীরের সংসর্গ থেকেও একেবারে দূরে চলে যায়। মানুষ যেমনই হোক স্বাভাবিক ভাবে তার শরীর অত্যন্ত প্রিয় জিনিষ। শরীরকে মানুষ একটুও কষ্ট দিতে চায় না, আর কষ্ট পেলে সহ্যও করতে পারে না। সাধনার প্রাথমিক

অবস্থায় সামাজিক বন্ধন গুলো খসে পড়ে যায়। যখন সংসারকে মনে হবে পাতকুয়া আর বাড়ির লোকদের মনে হবে বিষধর সাপ তখন বুঝবে যে সে অনেকটা এগিয়েছে। আর যখন নিজের দেহকে একটা জেলখানা মনে হবে, কবে এই জেলখানা থেকে মুক্তি পাব এই ইচ্ছা যখন খুব বেশী মাত্রায় হবে তখন বুঝতে হবে এখন সে অনেক উচ্চমার্গে পৌঁছে গেছে। দেহ থেকে মুক্তি মানে মৃত্যু চাইছে না, দেহের প্রতি আসক্তি থেকে মুক্তি। যারা ধর্মের পথে আছে তারা কখনই বলছে না যে মা-বাবা এরা বিষধর সাপ এদের গলা কেটে দাও। দেহের প্রতি আসক্তি যেটা আছে সেটাকে কাটাতে বলা হচ্ছে। সাধকের শেষ আসক্তি থেকে যায় দেহের প্রতি। ঠাকুর আবার বলছেন, সাধুদের শেষ বন্ধন হল তার সাধুত্ব, সাধুত্বের অহঙ্কারটা যায় না। কোন সন্ন্যাসীকে যদি বলে দেওয়া হয় – এ কিসের সাধু! তাতেই সন্ন্যাসী রেগে যাবে। একবার কোন এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখিয়ে রাস্তার কয়েকটি চ্যাংড়া ছেলে কিছু খারাপ কথা বলেছে। শুনে ওনার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিছু দূর চলে যাবার পর সন্ন্যাসী আবার ছেলেদের কাছে ফিরে এসে হাতজোড় করে খুব বিনয় করে বলছেন ‘আপনারাই আমাকে ঠিক ঠিক চিনেছেন, আমি এখন দেখতে পাচ্ছি আমি সত্যিই অত্যন্ত জঘন্য সাধু। কারণ আমার সাধনা করে যত দূর এগিয়ে যাওয়ার কথা আমি এখনও তা পারিনি’। ছেলেদের কথাগুলো সত্যিই তাঁর মনে লেগেছিল যে এরা ঠিকই বলছে, কিন্তু প্রথম প্রতিক্রিয়ায় তিনি রেগে গিয়েছিলেন। গান্ধীজীর ক্ষেত্রেও ঠিক এই রকম হয়েছিল। গান্ধীজীকে একবার চার্চিল বলেছিলেন The half naked Fakir। গান্ধীজীর মনে কোথাও একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কিন্তু কোথাও তিনি সেটাকে প্রকাশ করেননি। প্রায় বছর দশেক পরে গান্ধীজী চার্চিলকে একটা চিঠিতে লিখছেন, গান্ধীজী আবার সবাইকে বন্ধু বলে সম্বোধন করতেন ‘আপনি আমাকে The half naked Fakir বলেছিলেন। আপনি আমার বন্ধু তাই আপনি আমার ভালোর জন্যই বলেছিলেন। আপনি আমাকে এত প্রশংসা করছেন দেখে আমি কুণ্ঠিত হয়ে যাচ্ছি। কারণ আপনি আমাকে ফকির বলেছেন, এটা আমার পক্ষে খুবই সম্মানের কথা। আর আপনি আমাকে অর্ধ নগ্ন বলে আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন আমি কত বড় প্রবঞ্চক, কারণ আমি যদি ঠিক ঠিক ফকির হতাম তাহলে আমি সব বস্ত্রই ছেড়ে দিতাম। আমি যে এখনও সব বস্ত্র ছেড়ে না দিয়ে অর্ধ নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়াই এটাই আমার গর্হিত। আপনি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন এই অর্ধ নগ্নকেও আমাকে পার করে যেতে হবে সেইজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই’।

এখানে কর্মবাদের উপর একটি শ্লোক আছে যার জন্য পরের দিকে কর্মবাদ খুব শক্তিশালী হয়ে গেছে। ততস্তু ক্ষীয়তে চৈব পুনশ্চান্যৎ প্রচীয়তে। যাবতু মোক্ষযোগন্তং ধর্মং নৈবাববুধ্যতে।।১৫/১৯/১৩। আমরা সবাই একটা কর্মের বোঝা নিয়ে জন্মেছি। যখন কর্ম ক্ষয় হতে শুরু হয় তখন এই কর্ম ক্ষয় হওয়ার সাথে সাথে কিছু নতুন কর্ম সংগ্রহ হয়ে যায়। এই নতুন কর্ম থেকে আবার জন্ম মৃত্যু চলতে থাকে। মনে করা যাক আমি দশ ইউনিট কর্ম নিয়ে জন্ম নিয়েছি। এই দশ ইউনিট কর্মকে যখন ক্ষয় করতে শুরু করে দিলাম তখন আরও পঁচিশ ইউনিট কর্ম এসে জুটে গেছে। এই পনের ইউনিট কর্মকে বার করার জন্য আমার আরও শরীর দরকার। এই পনের ইউনিট যখন ক্ষয় হয়ে যাবে তখন আরও কিছু কর্ম এসে জুটবে, সেটাকে ক্ষয় করার জন্য আরও শরীরের দরকার হবে। সেইজন্য এই সৃষ্টি কখন শেষ হয় না। যেমন আমরা এখানে শাস্ত্র শুনতে এসেছি, আগের জন্মে কিছু শুভ সংস্কার ছিল যে বেলুড় মঠে গিয়ে শাস্ত্র শুনব। শাস্ত্র শুনতে এলাম। এখানে এসে আমি আবার এর ওর সাথে বন্ধুত্ব করলাম, কারুর সাথে ঝগড়া মনোমালিন্য হল, তার মানে নতুন কর্ম সৃষ্টি হল। এই নতুন কর্মগুলিকে পূরণ করার জন্য আবার আসতে হবে। যতক্ষণ মোক্ষ না হয়ে যাচ্ছে, ঈশ্বর দর্শন না হওয়া পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর এই চক্র চলতেই থাকবে।

এইখানে এসেই ইণ্ডিক রিলিজিয়ান আর এব্রামিক রিলিজিয়ান আলাদা হয়ে যায়। এব্রামিক রিলিজিয়ান হল খ্রীশ্চান, ইসলাম আর জুদাইজম্। পার্সি ধর্মটা মাঝামাঝি, এরা কিছুটা এখান থেকে নেয় কিছুটা ঐদিক থেকেও নেয়, কিন্তু স্বতন্ত্র ধর্ম। খ্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্মের সিদ্ধান্তে বলা হয় আমি কর্ম করেছি, কর্ম করার পর আমি একদিন মারা গেলাম। এখন আমি কবরে পড়ে থাকব। এবার আমার একটা সময় বিচার হবে, সেই বিচার অনুসারে আমি অনন্ত স্বর্গে বা অনন্ত নরকে চলে যাব। কোথাও কোথাও আবার কিছু প্রায়শ্চিত্তের বিধানও দেওয়া হয়। ইণ্ডিক রিলিজিয়ানে, মানে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মেও বলছে তুমি যেমন কর্ম করেছ সেই অনুসারে তুমি স্বর্গ বা নরকে যাবে। এই পর্যন্ত সবই ঠিক আছে কিন্তু ঐ স্বর্গ বা নরক থেকে তোমাকে আবার এখানে ফিরে এসে সঞ্চিৎ কর্মকে নতুন শরীর দিয়ে বার করতে হবে। কিন্তু এই কর্মগুলো করতে গিয়ে আরও নতুন কর্ম এসে জুটবে। এগুলোকে তুমি কি করবে? আবার তোমাকে তাই শরীর ধারণ করতে হবে। এই চক্রটা কোথায় গিয়ে শেষ হবে? যখন তোমার মুক্তি হবে। এখানে মুক্তির ধারণা দেওয়া হচ্ছে আর এব্রামিক রিলিজিয়ানে যে জাজমেন্ট ডের কথা বলা হয় এটা একই। জাজমেন্ট ডের পর যে অনন্ত স্বর্গের কথা বলা হয়



ঠিক একই ব্যাপার ইণ্ডিক রিলিজিয়ানে মুক্তির ক্ষেত্রে হয়। শুধু পার্থক্য হল ইণ্ডিক রিলিজিয়ানে খ্রীস্টান মুসলমানদের মত কবরে পড়ে থাকবে না, তোমার জন্ম-মৃত্যু চলতেই থাকবে।

মুক্তির কথা বলার পর জীবনমুক্তির কথা বলছেন। এখানে দুটো শ্লোক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, গীতাতেও এই ধরনের শ্লোক আছে। *আত্মবৎ সর্বভূতেষু যশ্চরেন্নিয়তঃ শুচিঃ। অমানী নিরভীমানঃ সর্বতো মুক্ত এব সঃ।।১৫/২০/৩।* সর্বদা পবিত্র ভাব থাকবে। নিজের সঙ্গে যে রকমটি ব্যবহার করে সব প্রাণির সাথে ঠিক সেই রকমটিই ব্যবহার করে। যেমন আমি বেঁচে থাকতে চাই, সেইজন্য আমি একটা ছাগলকে বলি দেব না, মশা মারব না, কোন প্রাণির প্রতি হিংসা করব না। কারণ আমি নিজে নিজেকে ভালোবাসি। আমি খালিপেটে থাকতে পারি না, তাই অপর কাউকেও অভুক্ত রাখব না। আমি ভালো পোশাক পড়ে থাকতে চাই, তাই অপরের জামা কাপড়ে আঙুন লাগিয়ে দেব না – এই হল নিজের মত অপরের সাথে ব্যবহার। নিরহঙ্কারী ও মান আকাঙ্ক্ষী না, মানে অপরের কাছে আমি মান সম্মান পাব, অপরের প্রতি আমি জয়ী হব এই ভাব তার থাকে না। এরাই হলে নিত্যমুক্ত। নিত্যমুক্তের চারটে লক্ষণ এখানে বললেন ১) পবিত্রতা, ২) নিজের প্রতি যেমনটি ব্যবহার করছি ঠিক সেই রকমটি অপরের সাথে ব্যবহার, ৩) নিরহঙ্কারী আর ৪) সম্মান পাওয়ার ইচ্ছা থাকে না। এই চারটি যার হয়ে গেছে সেই জীবনমুক্ত হয়ে যায়।

এইটাকে তার পরের শ্লোকে খুব সংক্ষেপে বলছেন, যেটা গীতাতে ঘুরে ঘুরে আসবে *জীবিতং মরণং চোভে সুখদুঃখে তথৈব চ। লাভালাভে প্রিয়দ্বেষ্যে যঃ সমঃ স চ মুচ্যতে।।১৫/২০/৪।* যিনি দ্বন্দ্বাতীত, অর্থাৎ যিনি সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যু, লাভ-হানি, প্রিয়-অপ্রিয়, মিত্র-শত্রু ইত্যাদি যত দ্বন্দ্বাত্মক জিনিষ আছে এগুলোর পারে চলে গেছেন। যেমন আমার মধ্যে যদি শত্রু-মিত্র এই ভাব থাকে তখন আমি মিত্রের দিকে এগিয়ে যাব আর শত্রুর থেকে দূরে সরে আসব। এইখান থেকেই কর্মের খেলা শুরু হয়ে গেল। মিত্রকে খুশী করার জন্য বাজার থেকে কিছু নিয়ে আসতে হবে। বাজার থেকে বিনা পয়সায় আমি কিছু পাবো না, পয়সা লাগবে। পয়সার জন্য আমাকে কাজ করতে হবে। সাধারণ একটা জিনিষ থেকেই বিশাল কর্মের ধারা নেমে আসে। তাই বলছেন যে মুক্তি চাইছে তাকে এই দ্বন্দ্বাত্মক যা কিছু আছে সব কিছুর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

যিনি সকাম ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটেকে ত্যাগ করেছেন আর আকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে গেছেন মানে নিরাকাঙ্ক্ষী তিনি মুক্তি পেয়ে যাবেন। এখানে সকাম ধর্ম বলা হচ্ছে, যেমন আমি হরিদ্বারে তীর্থ করতে যাচ্ছি। কেন যাচ্ছি? আমার পুণ্য হবে। বলছেন এই পুণ্য কামনাও থাকবে না। হরিদ্বার ভগবানের তীর্থ ক্ষেত্র, অনেক মহাপুরুষরা এখানে তপস্যা করেছেন, আমি ভগবানকে ভালোবাসি তাই যাচ্ছি। আমি অর্থ রোজগার করছি। কেন করছি? বাড়িতে আমার বুড়ি মা আছেন, আমাকে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে, ব্যস্ এইটুকুর জন্যই অর্থ রোজগার, আর কিছুর জন্য করছি না। কিন্তু আমি যদি মনে করি আমি প্রচুর টাকা আয় করে বড়লোক হব, অনেক গাড়ি বাড়ি থাকবে, এটা হল সকাম অর্থ। ঠিক তেমনি কামের ক্ষেত্রেও বলছেন সকাম কাম। একজন লোক বিয়ে করেছে। কেন করেছে? আমার একটা সন্তান চাই। এই পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু তারপরও ভোগ করেই যাচ্ছে, এইটাকে নিষেধ করা হচ্ছে। যখন কেউ এই তিনটে জিনিষকে বাদ দিয়ে দিল, সকাম ধর্ম, সকাম অর্থ আর সকাম কাম আর সাথে সাথে নিরাকাঙ্ক্ষী, কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই, জীবনে যেমন যেমন আসছে, যেমন যেমন চলে যাচ্ছে, সেই রকমই জীবনে আসছে যাচ্ছে। তখন সে মুক্ত হয়ে গেল। সব ধর্মেই যাঁর মুক্ত হয়ে যান, তাঁরা এইভাবেই মুক্ত হন। আসলে মানুষ এই ভাবে থাকতে পারে না, তাই বলা হয় ঈশ্বরে ভক্তি কর। ঈশ্বরে ভক্তি হলে ঈশ্বরের প্রতি এত ভালোবাসা আসবে যে এই জিনিষগুলো আপনা থেকেই খসে পড়ে যাবে।

আবার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন, যখন মানুষ শারীরিক ও মানসিক সব সঙ্কল্পকে ত্যাগ করে দেয়, কোন সঙ্কল্পই তার নেই। গীতাতেও আছে *সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্ ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ*, সব সঙ্কল্পকে মন থেকে ত্যাগ করে দিয়েছে, কর্তব্যের বাইরে সে কিছুই করবে না। আমাকে একটা বড় বাড়ি করতে হবে, এটা হয়ে গেল সঙ্কল্প। বাড়ি তৈরী করতে গেলেই আমাকে এখন টাকা জোগাড় করতে হবে, প্ল্যান করতে হবে, সেই প্ল্যান মিউনিসিপ্যালিটি থেকে পাশ করাতে হবে, আরও কত রকমের কাজকর্ম করতে হবে। কিন্তু আমার একটা আশ্রয়েরও দরকার, ঠিক আছে সহজ ভাবে কোথাও একটা ব্যবস্থা করতে হচ্ছে তখন এটা হয়ে গেল কর্তব্য। আর সন্ন্যাসী যারা হয় তারা সর্বসঙ্কল্প সন্ন্যাসী। যারই কিছু সঙ্কল্প আছে তাকে এখনও অনেক ঘুরপাক খেতে হবে। বলছেন মুঞ্জ ঘাসের শিসের ভেতর থেকে যেমন তার

শাঁসটাকে টেনে আলাদা করা যায়, ঠিক তেমনি যোগী পরিষ্কার দেখতে পারে এই দেহ আর আত্মা আলাদা। ঠাকুর শুকনো নারকেলের উপমা দিচ্ছেন, খড়ো নারকেল যেমন শাঁস আর খোল আলাদা হয়ে যায়, নাড়লে উপর উপর করে তেমনি যখন সিদ্ধ হয়ে যান তিনি এই দেহ আর আত্মা আলাদা দেখতে পান। জীব যখন যোগ দ্বারা আত্মার যথার্থ স্বরূপকে দর্শন করে নেয় তখন ত্রিলোকের যিনি অধীশ্বর তিনিও আর তাকে বশে রাখতে পারেন না। তিনি তখন ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণ এই সব বলে অর্জুনকে বলছেন ‘হে অর্জুন! এই কথাগুলো তুমি মন দিয়ে শুনছো তো, এর আগে রথে বসে যখন আমার কথা শুনছিলে তখনও এইভাবে মন দিয়ে শুনছিলে কিন্তু পরে সব ভুলে গেছ, এবার ঠিক মত শুনছো তো’। এই কথা বলার পর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমার বিশ্বাস যার চিত্ত সব সময় ব্যগ্র মানে মন ছটফট করছে, যে জ্ঞানের উপদেশ পায়নি মানে প্রাথমিক ভাবে সাধনা করে নিজেকে প্রস্তুতি করেনি আর যার অন্তঃকরণ শুদ্ধ নয় সেই ব্যক্তি কোন দিন এগুলো বুঝতে পারবে না।

অনুগীতা পর্বের মধ্যেই অনেক ছোট ছোট গীতা আছে। এর মধ্যে ব্রাহ্মণগীতা নামে একটা ছোট গীতাও আছে। শ্রীকৃষ্ণ যেখানে অর্জুনকে বলছেন তোমার সব কিছু পরিষ্কার হয়েছে তো। সেখানেই অনুগীতা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু এখনও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। ব্রাহ্মণগীতাতে একজন ব্রাহ্মণ যিনি খুব জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, আর তাঁর স্ত্রী তাঁকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করত। একদিন তাঁর স্ত্রী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করছেন, আমি তো অন্য কিছুই জানিনা শুধু আপনাকে সেবাই করে গেলাম তাই মৃত্যুর পর আমার কি গতি হবে? আর আপনাকে যে আমি স্বামী রূপে পেলাম এর ফল কি হবে? ব্রাহ্মণ তখন ব্রাহ্মণীকে বলছেন ‘তুমি চিরদিনই পাপ থেকে দূরে থেকেছ তাই তোমার এই প্রশ্নকে আমি অন্যথা নিলাম না। যাদের জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়নি, অর্থাৎ যারা আত্মজ্ঞান লাভ করেনি তারা কিন্তু কাজ ছাড়া থাকতে পারেনা। যারাই বলে আমি কাজ ছাড়া থাকতে পারিনা তার মানেই বুঝে নিতে হবে তার জ্ঞান হয়নি। মোহমেব নিযচ্ছন্তি কর্মণা জ্ঞানবর্জিতাঃ। নৈষ্কর্মং ন চ লোকেহসিদ্ধ্যুতমপি লক্ষ্যতে।। ১৫/২২/৭। কর্মের নামে তারা শুধু মোহ সংগ্রহ করে যাচ্ছে’। আমরা মনে করছি আমি কাজ করছি কিন্তু আসলে আমাদের মনে কামনা-বাসনা গিজগিজ করছে, এই কামনা-বাসনাই আমাদের কাজ করিয়ে নিয়ে আরও মোহের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তদের মধ্যে বসে নানা রকম কথা বলছেন তখন একজন ভক্ত বলছে ‘আমার তো পুনর্জন্ম নিয়ে কোন ভয় নেই, আরেকটা জন্ম হলে আমার কিছু আসে যায় না’। ঠাকুর বলছেন ‘তুমি বলো না তোমার এখনও ভোগ করার ইচ্ছে আছে’। যারাই বলে আমি পুনর্জন্মকে ভয় পাইনা, যারাই বলে আমি কাজ ছাড়া থাকতে পারিনা, আমি কাজ করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়তে চাই। তার মানে এদের এখনও ভোগ করার ইচ্ছাকে দমন করা শুরু হয়নি, ভোগ করার ইচ্ছাকে দমন করা শুরু হয়নি মানে তোমার মোহ এখনও নাশ হয়নি। এই কথাই ব্রাহ্মণ নিজের ব্রাহ্মণীকে বলতে চাইছেন। বলছেন ‘যারা দ্বন্দ্বাতীত হয়নি তাদের মনে কখন শান্তি আসতে পারবে না। এই অবিনাশী ব্রহ্মকে, অবিনাশী এই শব্দটি আমাদের শাস্ত্রে ভগবানের ক্ষেত্রে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়, অবিনাশী মানে যাঁর কখন নাশ হয় না। এই ব্রহ্মের কখনই বিনাশ হয় না, কিন্তু তিনিই একমাত্র আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই এই কথা বলে বলছেন *দ্রাণেন ন তদ্ভ্যেং নাস্বাদ্যং চৈব জিহুয়া। স্পর্শেন তদস্পৃশ্যং মনসা তুবগম্যতে।। ১৫/২২/১২।* এই ঈশ্বরকে নাক দিয়ে ভ্রাণ করা যায় না, জিহ্বা দিয়ে তাঁকে আস্বাদন করা যায় না, অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। এমন কি মনটাও একটা ইন্দ্রিয়, কিন্তু এই মন দিয়েও তাঁকে জানা যায় না। এই সব কথার সাথে কিছু কিছু সৃষ্টি তত্ত্বের কথা আলোচনা করে বলছেন কিভাবে জীব কর্ম সংগ্রহ করে আর একটার পর একটা যোনিতে ঘুরতে থাকে। এর মধ্যে ব্রাহ্মণ আবার কিছু কাহিনীও বলছেন।

এরপর ব্রাহ্মণ অন্তর্যামির ব্যাপারে বলছেন। আমাদের যদিও মনে এই জগৎ, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো নিজের মতই চলছে, কিন্তু তা নয়, ঠিক ঠিক আসল হচ্ছেন আমাদের অন্তর্যামী, যিনি আমাদের ভেতরে অবস্থান করে আছেন। *একো গুরুর্নাস্তি ততো দ্বিতীয়ো যো হৃদয়ন্তমহমন্ ব্রবীমি। তেনানুশিষ্টা গুরুণা সদৈব পুর হতা দানবাঃ সর্ব এব।। ১৫/২৯/২।* যিনি জীবরূপে হৃদয়ে অবস্থান করেন, জগতে একমাত্র সেই নারায়ণই গুরু তিনি ভিন্ন অন্য কেহ গুরু নাই। গুরু এক অপর কেউ গুরু নয়। আমরা যে অর্থে গুরু মনে করি, আসলে গুরু ঠিক তা নয়। ঠাকুর যেটা বারবার বলছেন সচ্চিদানন্দই গুরু, একমাত্র তিনিই গুরু। যোগশাস্ত্রেও ঈশ্বরকেই বলা হচ্ছে *স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।* সেইজন্য দেখা যায় যাঁদেরই গুরুর দায়িত্ব পালন করতে হয় তাঁরা প্রচণ্ড বিনয়ী হয়ে যান, যেমন মহম্মদ বলছেন আমি পয়গম্বর তিনিই গুরু আমি তাঁর কথাগুলো শুধু তোমাদের বলে যাচ্ছি। এর আগে আমরা সাধু সুন্দর সিংএর কথা বলেছিলাম। সাধু সুন্দর সিংএরও একবার মনে হয়েছিল একটা নতুন সম্প্রদায় তৈরী করতে হবে। কিন্তু পরে তাঁর মনে কি

হল সেখান থেকে সরে এসে তিনি বললেন যেমন আছে তেমনই থাকুক। ঠাকুরও বলছেন – আমাকে কেউ গুরু, কর্তা ও বাবা বললে আমার গায়ে কাঁটার মত বেঁধে। কারণ গুরু একমাত্র ঈশ্বর, কর্তা একমাত্র ঈশ্বর বাকি যা আছে সব জড়, ছাদে জল পড়ছে আর ছাদে হাতি, বাঘ ইত্যাদির মুখওয়ালা পাইপ লাগানো আছে সেখান দিয়ে জল পড়ছে, জাগতিক গুরু এর বেশী কিছু নয়। আসল গুরু আমাদের অন্তরে যিনি অন্তর্যামীর রূপে বিরাজ করে আছেন তিনিই গুরু। জাগতিক গুরু আমার কানে মন্ত্র দিয়ে বলে দিলেন ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ এই মন্ত্র জপ করে যা। শিবই সব কিছু হয়েছেন, তাতে আমার কি হবে? আমি এবার যখন এই মন্ত্র জপ করতে শুরু করে দিলাম, অনেক দিন ধরে নিষ্ঠা ভক্তি নিয়ে জপ করতে করতে আমার ভেতরে যিনি অন্তর্যামী রূপে আছেন, সেখান থেকে মন্ত্রের এই অর্থটা, শিবই সব কিছু হয়েছেন, স্পষ্ট হতে শুরু করে। প্রত্যেকটি শব্দের তিনটে দিক থাকে, প্রথম হল শব্দ, দ্বিতীয় শব্দের একটা অর্থ থাকে, তৃতীয় দিকটাই হল জ্ঞান। আমাদের কাছে শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান একেবারে দুখে জলের মত মিশে আছে, কোনটাই আলাদা করে ধরতে পারিনা। একটা শিশু যখন কাঁদে তখন সেটা আমাদের কাছে শুধু শব্দ মাত্র। কিন্তু শিশুর মা বুঝতে পারে বাচ্চার এখন খিদে পেয়েছে বা ঘুম পেয়েছে, মা শব্দের অর্থটা বুঝতে পারে। বাচ্চার মার কাছে, শব্দ স্পষ্ট, অর্থ স্পষ্ট আর জ্ঞান স্পষ্ট। কি জ্ঞান? বাচ্চাকে এখন খাওয়াতে হবে।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান যখন হয় তার আগে এরও তিনটে দিক থাকে, শব্দ, অর্থ আর জ্ঞান। আমরা এখানে যে আধ্যাত্মিক বিষয় গুলো আলোচনা করছি এর শব্দগুলো আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে আসছে, অর্থ কতটা পরিষ্কার হচ্ছে বলা যাবে না, জ্ঞানের তো কোন প্রশ্নই উঠবে না। গুরু যখন বলছেন ওঁ নমঃ শিবায় তখনও এটা শব্দ রূপে পরিষ্কার কিন্তু গুরুও জানেন এর অর্থ আমার কিছু পরিষ্কার হবে না। তাই গুরু শিবের ছবি দেখিয়ে বলে দিলেন এই যে শিবকে দেখছ তিনিই সব কিছু হয়েছেন। ওঁ মানে কি? ওঁ মানে বোঝাতে গিয়ে গুরু একটা বই লিখে দেবেন হয়তো কিন্তু তাতেও আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে না। কিন্তু যখন ওঁ নমঃ শিবায় জপ করতে শুরু করে দিলাম আর দীর্ঘ দিন ধরে জপ করতে করতে হঠাৎ আমার কাছে মন্ত্রের পুরো অর্থটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই স্পষ্টটা বাইরে থেকে এসে করে দিচ্ছেন না, ভেতর থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে।

গুরু যে স্পষ্ট করে দেন না তা নয়, গুরুও স্পষ্ট করে দেন। কিন্তু কার ক্ষেত্রে করছেন? যেমন ঠাকুর নরেনের ক্ষেত্রে করে দিলেন। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আমাদের কাছে শব্দ শব্দই থেকে যায়। কিন্তু জাগতিক ক্ষেত্রে যখন বাড়িতে গিয়ে বলছি ‘মা আমাকে খেতে দাও’। মা শব্দটা শুনলেন, শব্দটা স্পষ্ট, তার অর্থটা স্পষ্ট আর জ্ঞানটাও স্পষ্ট। আবার যখন কুকুর ডাকছে তখন আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না কুকুরটা কি বলতে চাইছে কিন্তু অনেকে বুঝতে পারে, এখানে শব্দটা আমাদের কাছে স্পষ্ট কিন্তু অর্থ কিছুই বুঝতে পারছি না। জ্ঞান যেটা হয় সেটা ভেতর থেকেই হয়, সেইজন্য ব্রাহ্মণ বলছেন অন্তর্যামীই গুরু, অন্তর্যামী ছাড়া কেউই গুরু নয়, আসল গুরু তিনিই। সব জ্ঞান সেখান থেকেই আসছে। খুব সোজা হিসাব, আমরা যা কিছু এখানে অধ্যয়ন করছি তার সব কিছুর উৎস হল বেদ। বেদ কোথেকে এসেছে? ভগবানের মুখ থেকে বেদ বেরিয়েছে। তাহলে শেষ গুরু কে? ভগবানই গুরু হয়ে গেলেন। ঠাকুর তাই বলছেন সচ্চিদানন্দই গুরু। বেলুড় মঠে আমি স্বামী ভূতেশানন্দজীর কাছে দীক্ষা নিয়ে থাকি, কিংবা স্বামী বিরজানন্দজী বা স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর কাছেই দীক্ষা নিয়ে থাকি এতে আমার ব্যক্তিত্বের কি কোন পরিবর্তন হচ্ছে? সবার ক্ষেত্রে সেই একই ইষ্ট থাকবেন, একই ব্যক্তিত্ব থাকবে তাতে আলাদা আলাদা গুরুর কাছে দীক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তনটা কোথায় হচ্ছে? তাই আমি স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজের কাছেই দীক্ষা নিয়ে থাকি কিংবা স্বামী গহনানন্দের কাছেই দীক্ষা নিয়ে থাকি তাতে আমার কি এলো গেল। যদি আমরা বেলুড় মঠে দীক্ষা না নিয়ে ইসকনে নিতাম তাহলে আমাদের ব্যক্তিত্ব পুরো আলাদা হয়ে যেত। ওখানে না নিয়ে যদি আমরা কাশীর শিবমন্দিরে দীক্ষা নিতাম তাহলে আরও আলাদা ব্যক্তিত্ব তৈরী হত। এইসব ক্ষেত্রে গুরুর আলাদা মাহাত্ম্য হয়, কারণ পুরো ব্যক্তিত্বটা পাল্টে যাচ্ছে। আবার এই আলাদা আলাদা পথে যখন সাধনা করে এগোতে থাকে তখন শেষে গিয়ে দেখে তিনিই আছেন, সবই সেই এক ঈশ্বর। ঠাকুর ইসলাম ধর্মে সাধনা করে যে অনুভূতি পাচ্ছেন, খ্রীশ্চান ধর্মে সাধনা করে সেই একই অনুভূতি পাচ্ছেন। তাহলে গুরুর তফাৎ আর কোথায় রইল? সেইজন্য এইখানে বলছেন গুরু এক সেই অন্তর্যামী। আসলে সাধনা করতে করতে একটা অবস্থার পর যত শাস্ত্র পড়াই থাকুক না কেন তখন সেগুলো কোন কাজেই লাগে না। তখন নিজের মনই গুরু হয়ে যায়। মন যখন গুরু হয়ে যায় তারপরই ঠিক ঠিক সাধনা শুরু হয়। সেটাই এখানে বলছেন একো গুরোনাঁস্তি দ্বিতীয়া, গুরু এক দ্বিতীয় কোন গুরু নেই। সেই গুরু কোথায়? হৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে বিরাজ করে আছেন। শেষ অবস্থায় নিজের মনই গুরু হয়, মনকে পবিত্র না করলে কিছুই জ্ঞান হবে না। আসলে আমাদের না আছেন সাধন, ভজন, না আছে চিন্তন মনন, তাই আমরাই এই গুরু সেই গুরু নিয়ে বেশী মাতামাতি

করে বেড়াই। কথামতেও আছে শেষ অবস্থায় মনই গুরু হয়। শেষ অবস্থাতেই নয়, প্রথম থেকে মনই তোমার গুরু স্বামীজীও বারবার বলছেন All knowledge comes from within, information comes from outside but knowledge comes from within। আমি যত শাস্ত্র কথা শুনে যাই, যতই আমি মহাত্মাদের পেছনে ঘুরঘুর করি না কেন কিছুই জ্ঞান হবে না। কোথা থেকে জ্ঞান হবে? ভেতর থেকে হঠাৎ একদিন একটা জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ উৎসারিত হয়ে বলে দেবে এটা এই এই। এত দিন আমাকে যেটা শাস্ত্র আর মহাত্মাদের কাছ থেকে যেটা ভেতরে এসেছে সেটা কতকগুলি তথ্য। সেইজন্যই বলছে গুরু এক অন্তর্যামী। যিনি অন্তর্যামী তিনিই পরমাত্মা। সেই গুরুর শক্তিতেই সব দানবরা পরাস্ত হয়।

গুরুর কথা বলার পর বলছেন *একো বন্ধুর্নাস্তি ততো দ্বিতীয়ো যো হৃচ্ছয়ন্তমহম্নু ব্রবীমি। তেনানুশিষ্টা বান্ধবা বন্ধুমন্তঃ সপ্তর্যয়ঃ পার্থ দিবি প্রভাস্তি।।১৫/২৯/৩।* বন্ধু এক। প্রথমে বললেন গুরু এক, তিনি হৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে বাস করেন, তিনিই পরমাত্মা। এবারে বলছেন, বন্ধু এক। কোথায় বাস করেন? হৃদয়েই বাস করেন। তিনিই পরমাত্মা। তিনি ছাড়া আর কেউ বন্ধু হয় না। আধ্যাত্মিক ভাব না হলে সত্যিকারের বন্ধু কখনই তৈরী হয় না। কারুর প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা তখনই হবে যখন তার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব আসবে। আধ্যাত্মিক ভাব সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে যদি আধ্যাত্মিক ভাব সম্পন্ন ব্যক্তির বন্ধুত্ব হয় তার মানে পরমাত্মার সাথে পরমাত্মার বন্ধুত্ব। এর বাইরে বাকি যত সম্পর্ক সবই লেনাদেনার সম্পর্ক, স্বার্থের সম্পর্ক। মা ছেলেকে বলে, আমি তোমাকে এত দিন ধরে বড় করেছি তুমি বউয়ের দিকে বেশী না তাকিয়ে আমার দিকে নজর দাও, এটাই হল লেনাদানার সম্পর্ক। তৃতীয় বলছেন *একঃ শ্রোতা নাস্তি ততো দ্বিতীয়ো যো হৃচ্ছয়ন্তমহম্নু ব্রবীমি। তস্মিন্ গুরৌ গুরুবাসং নিরুখ্য শক্নো গতঃ সর্বলোকামরতম্।।১৫/২৯/৪।* শ্রোতা এক, তিনি অন্তর্যামী। আমি যা কথাই বলি এই জগতে কেউ নেই সেই কথা শোনার একমাত্র তিনিই অন্তর্যামী রূপে আমার সব কথা শোনেন। এখানে শ্রোতা দুই অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। মহাভারতের সময় বৈদিক প্রভাব থাকার জন্য শ্রোতার এখানে আরেকটু অর্থ হতে পারে শ্রোত্রিয়, মানে ব্রাহ্মণ, যেখান থেকে শিক্ষা পায়। দুটোই অর্থ হতে পারে। তারপরই বলছেন *একো দ্বৈষ্টা নাস্তি ততো দ্বিতীয়ো যো হৃচ্ছয়ন্তমহম্নু ব্রবীমি। তেনুশিষ্টা গুরুণা সদৈব লোকে দ্বিষ্টাঃ পন্নগাঃ সর্ব এব।।১৫/২৯/৫।* শত্রু এক, তিনি হৃদয়স্থিত অন্তর্যামী। বলছেন তাঁরই প্রেরণাতে সর্প, ব্যাঘ্রাদিরা ভেতরে অন্য প্রাণির প্রতি দ্বেষ ভাব রাখে। এটি হিন্দু দর্শনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তত্ত্ব। আমি যখন মাকে ভালোবাসছি, মা যখন আমাকে ভালোবাসছে তখন বলি মায়ের ভেতরে যে মাতৃভাব, সন্তানের প্রতি মায়ের যে স্নেহ মমতা সেটা ঈশ্বরই মায়ের মধ্যে দিয়েছেন। মা বাচ্চাকে স্নেহ করছেন, আদর করছেন আর তার পাশেই একটি সাপ ফণা তুলে বাচ্চাকে দংশন করতে আসছে, এই সাপের মধ্যে যে বিষ, অপরের প্রতি যে সাপের ক্রোধ কোথেকে এসেছে? এটাও সেই ঈশ্বরের থেকে এসেছে। সেমেটিক ধর্মে খ্রীস্টানরা বলবে ইভিল বা শয়তান থেকে যত খারাপ জিনিষগুলো আসছে। ভগবানের যেমন এ্যঙ্গেলস আছে তেমনি শয়তানের আছে ডেভিল। সাপ, বাঘ বা যেগুলো খল প্রকৃতির এগুলো সব ডেভিল। মানুষের মনে কখন এ্যঙ্গেল প্রবেশ করে কখন ডেভিল ঢোকে। এ্যঙ্গেল মানুষকে দিয়ে ভালো কাজ করায়, ডেভিল সব সময় খারাপ কাজ করায়। সেমেটিক ধর্মের এই মত। কিন্তু বেদান্তের একেবারে নির্দিষ্ট মত হল মায়ের যে মাতৃত্ব বোধ সেটা যেমন ভগবানের দেওয়া আর সাপের যে বিষ সেটাও ভগবানের দেওয়া। সেইজন্য আমাদের মধ্যে খুব প্রচলিত কথা হল তিনিই সাপ হয়ে দংশন করে আর তিনিই ওঝা হয়ে সারান। ঠাকুর তখন কাশীপুরে গলরোগে শয্যাশায়ী, নরেনাদি যুবকরা দিনরাত কাশীপুরে থেকে তাঁর সেবা করে যাচ্ছেন। নরেন্দ্রনাথ দত্তের মা ঠাকুরের কাছে একবার ঝগড়া করতে এসেছেন – কি দিনরাত হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছে, সামনে পরীক্ষা, আপনি ওকে বলুন বাড়িতে গিয়ে পড়াশোনা করে পরীক্ষাটা দিতে। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন – হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এক্ষুণি ওকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি, নিশ্চয়ই ওকে বাড়ি যেতে হবে আর পরীক্ষা দিতে হবে। ঘোড়ার গাড়িতে আসতে আসতে নরেনের মা বলছেন, দেখলি পরমহংস মশাইও তোকে বাড়ি যেতে বলছেন। নরেন হেসে বলছেন – ঠাকুর চোরকে বলেন চুরি করতে আর গৃহস্থকে বলেন সজাগ থাকতে। মা যখন সন্তানকে চুষন দেয় তখন সন্তানের শরীর মনে প্রাণের জোয়ার বয়ে যায় আর সাপ এসে যখন চুষন দেয় সেই প্রাণই স্তব্ধ হয়ে যায়, এই দুটোই কিন্তু ভগবানের। এগুলো আমরা মানতে পারিনা, মানতে না পারার সমস্যাটা আমাদের তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু এটাই সত্য।

এখানে একটা কাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে, যদিও এই কাহিনীটি উপনিষদ থেকে নেওয়া কিন্তু মহাভারত একটু পাল্টে দিয়েছে। উপনিষদে আছে একবার প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে দেবতা, দানব আর মানুষ শিক্ষা নিতে গেছে। প্রজাপতি দেবতাদের বললেন ‘দ’ ‘দ’ ‘দ’। এখানে এসে কাহিনীটা অন্য রকম, ব্রহ্মার কাছে একবার দেবতা, ঋষি, সর্প আর

অসুররা গিয়েছেন জগতের ব্যাপারে শিক্ষা নিতে। ব্রহ্মা এদের সবাইকে শুধু বলে দিলেন ‘ওঁ’, ওঁ ছাড়া আর কিছু বলেননি। ব্রহ্মা যখন ওঁকার করেছেন তখন নিজের মত উচ্চারণ করতে করতে চারজন চার দিকে চলে গেল। নিজের মত ওঁকারকে উচ্চারণ করার ফলে ওঁকে ঠিক পরিষ্কার ভাবে গ্রহণ না করে নিজের নিজের মত অর্থ বিচার করে সেইভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করে দিল। প্রথমে *তেষাং প্রদবমাণানামুপদেশে শৃণ্বতাম্। সর্পাণাং দংশনে ভাবঃ প্রবৃত্তঃ পূর্বমেব তু।* ১৫/৩০/৪। সাপরা বুঝল দংশন করলেই আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হবে। *অসুরাণাং প্রবৃত্তস্ত দম্ভভাবঃ স্বভাবজঃ। দানং দেবা ব্যবসিতা দমমেব মহর্ষয়ঃ।* ১৫/৩০/৫। অসুররা দম্ভ করতে থাকল। দেবতারা বুঝল দান করতে হবে আর ঋষিরা বুঝল ইন্দ্রিয়ের সংযম করতে হবে। বলছেন, তারপর থেকে জগতে সমস্ত প্রাণিদের মধ্যে এই চার ধরণের স্বভাব এসে গেছে। একই গুরু চারজন শিষ্য, চারজনকেই একই কথা বলা হল কিন্তু চারজন চার রকমের অর্থ বুঝল। সাপ বুঝল দংশন করতে হবে, অসুর ভাবল দম্ভ করতে বলা হয়েছে, দেবতারা বুঝল আমাদের দান করে যেতে হবে আর ঋষিরা বুঝে নিল গুরু ইন্দ্রিয় সংযমের কথা বলছেন। এইসব বলার পর বলছেন, তাহলে আসল গুরু কে? অন্তর্যামী। কিন্তু চারজন চার রকম কেন অর্থ করল? উপনিষদে এই ভাবটা অনেকবার এসেছে, একই কথা বলা হয় কিন্তু চারজন তাকে চার রকম ভাবে অর্থ করে। কিভাবে অর্থ করে? যার যেটা পছন্দ, যার যেমন ভাব। ঠাকুর এই ভাবটাকে একটা খুব সুন্দর গল্পের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ভোর রাতের আবছা অন্ধকারে একজন লোক রাস্তায় পড়ে আছে। একটা চোর দেখে ভাবছে, ব্যাটা সারা রাত চুরি করে এখন রাস্তায় পড়ে আছে। এরপর একজন মাতাল ওখান দিয়ে যাওয়ার সময় লোকটাকে দেখে বলছে ‘ব্যাটা এমন মদ খেয়েছে যে রাস্তায় উল্টে পড়ে আছে’। একজন সাধু যাচ্ছেন তিনি ভাবছেন ‘সারা রাত ধ্যান করে এখন ঈশ্বরের ভাবে বিভোর হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে’। তিনজন একই জিনিস দেখছে কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে বর্ণনা করছে, যার যেমন ভাব সে সেই রকম দেখছে। এইটাই এখানে বলছেন শেষ কথা হল অন্তর্যামীই একমাত্র গুরু।

এইভাবে ব্রাহ্মণ নিজের ব্রাহ্মণীকে অনেক উপদেশাদি দেওয়ার পর অনুগীতার অন্তর্গত ব্রাহ্মণগীতাতে খুব সুন্দর একটা সংলাপ আছে, একে বলা হয় রাজা জনক ও ব্রাহ্মণ সংবাদ। কোন কারণে রাজা জনক এক ব্রাহ্মণের উপর খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। অসন্তুষ্ট হয়ে রাজা জনক বলছেন তুমি আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যাও। ব্রাহ্মণ জানত রাজা জনক হলেন ব্রহ্মজ্ঞানী। *ইতুক্তঃ প্রতুবাচাথ ব্রাহ্মণো রাজসন্তমম্। আচক্ষু বিষয়ং রাজন্ যাবান্তব বশে স্থিতঃ।।* ১৫/৩৭/৩। তিনি রাজা জনককে জিজ্ঞেস করছেন ‘যাবান্তব বশে স্থিতঃ, আপনার বশে মানে অধীনে যতটুকু রাজ্যের সীমানা আমি তার বাইরেই তো চলে যাব’? ব্রাহ্মণের এই কথা শুনে রাজা জনক খুব চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন আর উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর বলছেন ‘আমি অনেক বিচার করার পর দেখছি এই জগতে সত্যিই আমার বলে কিছু নেই’। এর আগেও আমরা বলেছি মিথিলার উপর এক আশীর্বাদ ছিল যে যিনি মিথিলার রাজা হবেন তিনি সব সময়ই ব্রহ্মজ্ঞানী হবেন। মিথিলার রাজা এখন জ্ঞানী পুরুষ কিন্তু রাজ্য চালাতে গিয়ে একজন ব্রাহ্মণ অপরাধ করার জন্য তাকে দণ্ড দিতে হচ্ছে তুমি আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যাও। তখন সেই ব্রাহ্মণ বলছেন, আপনি বিচার করে বলুন আপনার কতটুকু রাজ্যের সীমানা তাহলে আমি সেই সীমানাটা অতিক্রম করে চলে যাব। রাজা জনক তখন অনেক ভেবে বলছেন আমার সীমানা বলতে কিছুই নেই। আসলে ব্রহ্মজ্ঞানী যিনি তাঁর মমত্ব বলে কিছুই নেই। রাজা জনক পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী, এর আগে তিনি শুক্তাচার্যকে বলছেন পুরো মিথিলাও যদি পুড়ে যায় তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এই জগতে আমার বলতে কিছুই নেই। তাহলে ব্রাহ্মণ মিথিলার রাজার দেশ ছেড়ে কি করে বেরিয়ে যাবে। তখন রাজা জনক সেই ব্রাহ্মণকে দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে দিলেন। রাজা জনক বিচার করে দেখছেন রাজ্য বলে আমার কিছু নেই, আর তানাহলে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার রাজত্ব। কারণ তিনি ব্রহ্মজ্ঞ। এখানে দুটো ভাব আসে, একটা বস্তু রূপ আর ব্রহ্মরূপ। এই কলমটার দুটো সত্তা, একটা এই কলম বস্তু রূপ আর ব্রহ্ম রূপ মানে তিনিই এই কলমটা হয়েছেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় সব সময় এই দুটোই হয়, বস্তু রূপে সব সময় ত্যাগ আর ব্রহ্ম রূপে গ্রহণ। রাজা জনক যখন বস্তু রূপে দেখছেন তখন দেখছেন আমার তো রাজ্য বলে কোথাও নেই, তখন বস্তু রূপে ত্যাগ হয়ে গেল। আবার যখন বস্তু রূপে গ্রহণ করছেন তখন দেখছেন পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমারই। ব্রাহ্মণ এখন তাই কোথায় যাবেন? কোথাও তাকে আর যেতে হল না। আসলে ব্রাহ্মণও জ্ঞানী ছিলেন। পরে সেই ব্রাহ্মণ বলছেন ‘দেখুন! আমি হলাম ধর্মরাজ। আমি পরীক্ষা নিতে এসেছিলাম আপনি ঠিক ঠিক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কিনা। সেইজন্য ব্রাহ্মণ হয়ে এই অপরাধ করেছিলাম’।

ব্রাহ্মণীকে এইভাবে ব্রাহ্মণ অনেক উপদেশ দিয়ে শেষে বলছেন ‘তুমি জেনে নাও আমি হল্যাম সেই পূর্বব্রাহ্ম’। তখন আরও অনেক তত্ত্ব কথা বলে শেষে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন ‘এই যে ব্রাহ্মণের কথা তোমাকে বললাম এই হলেন ঈশ্বর আর এই ব্রাহ্মণী হলেন প্রকৃতি অর্থাৎ বুদ্ধি। পরমাত্মা এই বুদ্ধিকে উপদেশ দেয়, সেই উপদেশকে অনুসরণ করে বুদ্ধি আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে থাকে’। এর পর শ্রীকৃষ্ণ অনেক উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন, রজোগুণাদি নিয়ে অনেক কথা বলছেন। এর আগেও আমরা এই নিয়ে আলোচনা করেছি।

### শ্রীকৃষ্ণের দিব্যশক্তিতে পরীক্ষিতের বেঁচে ওঠা

অভিমন্যু যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মারা গিয়েছিল তখন স্ত্রী উত্তরার গর্ভে তার এক সন্তান ছিল, এই সন্তানই পরীক্ষিত। অশ্বখামা যখন গর্ভস্থিত সন্তানের উপর ব্রহ্মাস্ত্র চালিয়ে দিয়েছিল তখন শ্রীকৃষ্ণকে যে প্রার্থনা করা হয়েছিল এই প্রসঙ্গটাই আবার ভাগবতেও আসবে। তখন শ্রীকৃষ্ণ উত্তরাকে বলছেন ‘দেখো উত্তরা! আমি কক্ষণ মিথ্যা কথা বলিনা, আমি বলছি এই গর্ভস্থ শিশুর কোন কিছুই হবে না, সে সুস্থ শরীর নিয়েই জন্ম গ্রহণ করবে। আমার এই কথার জোরেই এই শিশু বেঁচে উঠবে’। শ্রীকৃষ্ণের দিব্য শক্তিতেই পরীক্ষিত বেঁচে গিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ বলে যাচ্ছেন নোক্তপূর্বং ময়া মিথ্যা স্বৈরেহ্মপি কদাচন। ন চ যুদ্ধাৎ পরাবৃত্তস্তথা সঞ্জীবিতায়ম্।। যথা মে দয়িতো ধর্মো ব্রাহ্মণশ্চ বিশেষতঃ। অভিমন্যোঃ সুতো জাতো মৃতো জীবতুয় তথা।। যথা সত্যঞ্চ ধর্মশ্চ ময়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ। তথা মৃতঃ শিশুরয়ং জীবতাদভিমন্যুজঃ।। ১৫/৮৭/১৯-২০-২২। ‘আমি খেলার ছলেও মিথ্যা কথা বলিনি, যুদ্ধ থেকে কখন পালিয়ে যাইনি, এই শক্তির প্রভাবেই অভিমন্যুর এই শিশু জেগে উঠবে। ধর্ম, ব্রাহ্মণ আমার বিশেষ প্রিয়, এই পুণ্যের প্রভাবেই এই শিশু বেঁচে উঠবে। সত্য ধর্ম সব সময় আমার উপর প্রতিষ্ঠিত, এই পুণ্যের জোরেই অভিমন্যুর শিশু জেগে উঠবে’। আমরা অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের নামে বলি শ্রীকৃষ্ণ অনেক সময়ই এই মিথ্যা কথা সেই মিথ্যা কথা বলে এসেছেন, যুদ্ধের সময় অনেক রকমের ছল চাতুরি করেছেন। কিন্তু আদর্শেই তা নয়, তিনি আসলে সত্য ধর্মে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আর এমন ভাবে অনাসক্ত ছিলেন যে জগতের কোন কিছুর প্রতি তাঁর কোন ধরনের আসক্তি ছিল না। এই ভাবটাই আমরা ঠাকুরের একটা কাহিনীতে পাই, ব্যাসদেব যমুনা পার হবেন সেই সময় গোপীদের বলছেন আমার খুব খিদে পেয়েছে তোমাদের কাছে কি ননী ক্ষীর আছে আমাকে খেতে দাও। গোপীরা সবাই ব্যাসদেবকে খেতে দিলেন, তিনিও খাওয়ার পর বলছেন, ‘হে যমুনে আমি যদি কিছু খেয়ে না থাকি তাহলে তুমি দুই ভাগ হয়ে যাও, আমরা তোমার মাঝখান দিয়ে হেঁটে পার হয়ে যাই’। সঙ্গে সঙ্গে যমুনা দুই ভাগ হয়ে গেল, ব্যাসদেব আর গোপীরা সেই পথ দিয়ে হেঁটে যমুনা পার হয়ে গেল। গোপীরা জিজ্ঞেস করল, আপনি সব খাওয়া সত্ত্বেও কেন বললেন আমি তো কিছু খাইনি? ব্যাসদেব বলছেন, আমি তো কিছু খাইনি, আমি আর শরীর আলাদা, ওটা তো শরীরকে আহুতি দেওয়া হয়েছে। এই সব বলার পর বাচ্চাটি অঙ্গ সঞ্চালন করতে শুরু করেছে। এই সব গল্প শুনেই লোকেরা মনে করে সাধুবাবারা সব কিছু করে দিতে পারেন। ঠাকুর বলছেন – আমি ভাত বেড়ে দিয়েছি শালারা তাও খেতে চায় না। সাধু মহাত্মারা আমাদের জন্য কি আর করবেন? আমাদের জন্য ভাত রান্না করে দেবে, বেড়ে দেবে কিন্তু চিবোতে তো আমাদেরকেই করতে হবে। যদি চিবোতেও না হয় কিন্তু হজমটা তো আমাদের নিজেরদেকেই করতে হবে। মানুষ নিজে থেকে কিছুই করতে চায় না। কথামতে আরেকটি গল্প আছে। গুরু সকালবেলা শিষ্যকে বলছে ‘ওরে এবার উঠে রান্নাবান্না করার জোগাড় কর’। শিষ্য বলছে ‘না গুরুদেব আমি এখন জপে আছি’। ‘বেশ বেশ, তোমাকে কিছু করতে হবে না, জপ কর’। গুরু নিজেই এবার রান্নাবান্না করতে লাগলেন। গুরু রান্না করে শিষ্যকে ডাকছেন ‘ওরে, এবার ওঠ আসন-টাসন লাগা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর’। ‘না গুরু আমি এখন জপে আছি’। ‘না বাবা ঠিক আছে তুমি জপ কর’। গুরু নিজেই ভাত-ডাল বেড়ে সব ব্যবস্থা করে শিষ্যকে বলছেন ‘ওরে ভাত-টাত সব বাড়ী হয়ে গেছে এবার এসে খেতে বোস’। শিষ্য তখন বলছে ‘সকাল থেকে গুরুবাক্য দুবার উল্লঙ্ঘন হয়ে গেছে আর কত উল্লঙ্ঘন করব, তাই আমি আসছি’। কাজের সময় কেউ নেই, কিন্তু খাবার সময় সবাই এসে হাজির হয়ে যাবে। সবাই এইটাই চায়।

### যজ্ঞস্থলে নেউলের গড়াগড়ি

এখান থেকে মহাভারত আবার বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। কাহিনী আমাদের কাছে কোন গুরুত্ব নয়। এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী আছে। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ হয়ে গেছে, প্রচুর দানাদি করা হয়েছে। সেই সময় একটি নেউল ওখানে এসে বলছে এই যজ্ঞ কোন যজ্ঞই নয়। নেউলের কথা শুনে সবাই খুব রেগে গেছে। কি বলতে চাইছ তুমি এত দান ধ্যান করা হল আর তুমি বলছ এই যজ্ঞ মিথ্যে! নেউল তখন আবার একটা কাহিনী নিয়ে এসে বলছে, একবার প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের সময় এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষে করে কিছু ছাতু নিয়ে এসেছিল। ঐ ছাতু দিয়ে ব্রাহ্মণ চারটে রুটি বানিয়েছে।

একটা নিজের জন্য, একটা করে ছেলে আর বউয়ের জন্য আর একটা নিজের ব্রাহ্মণীর জন্য। সেই সময় এক অতিথি এসে উপস্থিত হয়েছে। অতিথি এসে বলছে আমি খুব ক্ষুধার্ত আমাকে শিগুগিরি কিছু খেতে দিন। অতিথিকে তখন একটা রুটি দেওয়া হয়েছে। ঐ একটা রুটিতে অতিথির খিদে মেটেনি। তখন তাকে এক এক করে সব কটি রুটিই খাইয়ে দিল। ব্রাহ্মণরা খুবই অভাবগ্রস্ত ছিল। অনেক দিন ধরেই তাদের খাবার-দাবার কিছুই জুটছিল না। খিদের জ্বালাতে চারজনই মারা গিয়েছে। রুটি বানানোর সময় কিছু আটা মেঝেতে পড়েছিল। নেউলটা মেঝেতে গড়াগড়ি দেওয়ার সময় তার শরীরে যে অংশটাতে আটা লেগেছিল সেই অংশটা স্বর্ণালী রঙের হয়ে গেছে। তারপর থেকে নেউলটি সারা বিশ্ব ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে, যদি এই রকম কোন যজ্ঞ কোথাও হয়ে থাকে তাহলে সেখানে গড়াগড়ি দিয়ে বাকি অংশটাও যাতে সোনার হয়ে যায়। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের খবর পেয়ে নেউল এসে যজ্ঞভূমিতে লুটোপুটি খাচ্ছে যাতে তার শরীরের বাকিটুকুও যদি সোনার হয়ে যায়। কিন্তু হল না। সেই কথাই নেউল বলছে ‘ঐ ব্রাহ্মণ অতিথিকে চারটে রুটি খাইয়ে দিয়ে নিজেরা প্রাণত্যাগ করে তারা এমন পুণ্য করল যে আমার শরীরটা সোনার হয়ে গেল। আর আপনারা এমনই দান করেছেন যে শরীরের বাকিটুকু আর সোনার হতে পারল না’। সবাই শুনে চুপ করে গেল, কিছু বলার আর নেই। কাহিনীটা এইখানেই শেষ হয়ে যায়। এটা শুধু মাত্র একটা কাহিনী নয়। ভারতের আদর্শটা কি, ভারতীয়দের সাধনা কি রকম হতে পারে সেটাকেই এখানে দেখানো হয়েছে। আমি না খেয়ে মরে যাব সেও ঠিক আছে কিন্তু অতিথিকে কখনই অভুক্ত ও অতৃপ্ত থাকতে দেব না। মহাভারতের কাহিনীগুলোর মাধ্যমে ত্যাগ তপস্যাকে খুব বেশী করে তুলে ধরা হয়েছে।

### ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, গান্ধারী ও কুন্তীর বাণপ্রস্থ ও মর্ত্যধাম ত্যাগ

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সহ এখনও হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদেই অবস্থান করছেন। কিন্তু থেকে থেকেই তাঁদের মন শোকে ভারাক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, আমার সব কটি সন্তানই এভাবে মারা গেল। ধৃতরাষ্ট্রের খুব ইচ্ছে হয়েছে ছেলেদের জন্য একটা খুব ভালো রকমের শ্রাদ্ধাদি করবেন। কিন্তু ভীম কিছুতেই এই শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্মের জন্য অর্থ দিতে রাজী হচ্ছিল না। এখনও কৌরবদের প্রতি রাগটা ভীম পুষে রেখেছে। কিন্তু যে করেই হোক অর্থাদির ব্যবস্থা করে দেওয়ার পর ধৃতরাষ্ট্র খুব ভালো করে শ্রাদ্ধাদি করলেন। এরপর বিদুর এসে ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন ‘আপনি এত দিন ধরে পাণ্ডবদের উপর কত অত্যাচার করে এসেছেন, এখন আর কত দিন এদের সঙ্গে থাকবেন। আপনার এখন উচিত বাণপ্রস্থ অবলম্বন করা’। একদিন এনারা সবাই মিলে গান্ধারী আর ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে নিয়ে বাণপ্রস্থ হয়ে জঙ্গলে চলে গেলেন। পাণ্ডবরা এনাদের অনেক করে আটকাবার চেষ্টা করে গেছে যাতে হস্তিনাপুর থেকে না চলে যান। একদিন রাতের অন্ধকারে পাণ্ডবদের কিছু না বলে এনারা জঙ্গলে চলে গেলেন। জঙ্গলে থাকলেও পাণ্ডবরা খবরা-খবর নিত। একজন অন্ধ আর গান্ধারীর চোখে কাপড় বাঁধা, দুজনেই চোখে কিছু দেখতে পাননা। একদিন সেই জঙ্গলে দাবানল লেগে গেল, সেই দাবানলেই তাঁরা পুড়ে মারা গেলেন। মহাভারতের মূল কাহিনী ভীষ্মের শরীর ত্যাগেই শেষ হয়ে যায়, তারপর বাকিটুকু খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে দেওয়া হয়েছে।

### যদুবংশের নাশ ও শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যলীলার পরিসমাপ্তি

একদিকে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে রাজত্ব করছেন। অন্য দিকে দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করছেন। সেই সময় দ্বারকাতে কয়েকজন মুনি এসেছেন। দ্বারকার যাদবরা তখন প্রচণ্ড ঔদ্ধত হয়ে গিয়েছিল। যদুবংশীরা ভাবত আমরা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা রক্ষিত। তাদের অনেক ক্ষমতাও হয়ে গিয়েছিল। এইসব কারণে যদুবংশীরা খুব অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। শাস্ত্রকে মেয়ে সাজিয়ে আর কাপড়ের মধ্যে একটা পাথর রেখে এরা সাধুবাবাদের কাছে গিয়ে মজা করে বলছে ‘এই মেয়েটি অন্তঃসত্ত্ব। আপনারা বলুন এর ছেলে হবে, না মেয়ে হবে’। ঋষি বুঝতে পেরেছেন তাঁদের সঙ্গে এরা মজা করছে, তিনি তখন রেগে গিয়ে বলছেন ‘মুষল হবে। আর এই মুষল থেকেই তোমাদের পুরো বংশকে নাশ হবে’। শ্রীকৃষ্ণের কাছেও খবর পৌঁছে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ শুনে বললেন ‘আর কিছু করার নেই, সব খেলা শেষ’। তখন ঐ পাথরটাকে ভেঙে ভেঙে টুকরো করে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল, যাতে বংশের বিনাশের কোন কারণ না হতে পারে।

এরপর যদুবংশীয় সব রাজপুরুষরা সমুদ্রের তীরে প্রভাস তীর্থে গেছে পিকনিক করতে। পিকনিকে গিয়ে যা হয়, এখনও যা হয় আগেও তাই হত। সব মদ খেয়ে একে অপরের উপর অহঙ্কার করতে শুরু করেছে। সাত্যকি আর কৃতবর্মা এই দুজনই যদুবংশের বড় কমান্ডার ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সাত্যকি ছিলেন পাণ্ডবদের দিকে। যদুবংশ থেকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ আর সাত্যকিই ছিলেন অর্জুনদের দিকে। কৃতবর্মারা ছিলেন কৌরবদের দিকে। এখন পিকনিকে এসে এই দুজনের মধ্যে এক অপরের সাথে তর্কাতর্কি থেকে শুরু হয়ে গেছে প্রচণ্ড ঝগড়া বিবাদ। এদিকে এরা কেউই অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে

যায়নি। প্রথমে দিকে শুরু হল হাতাহাতি। সমুদ্রের ধারে শণ গাছের মত লম্বা লম্বা ঘাস হয়ে ছিল। যে পাথরকে ভেঙে ভেঙে টুকরো করে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সেগুলোই এখন ঐ শণ গাছের শেকড়ের সাথে আটকে গিয়ে মুশল হয়ে গেছে। হাতাহাতিতে কিছু হচ্ছে না দেখে সবাই ঐ শণ ঘাস উপড়ে তুলে একে অপরের দিকে তীরের মত মারতেই লোহার শলার মত সবার শরীরে বিদ্ধ হতে শুরু করে দিল। শণ গাছের শেকড়ে যে পাথরের টুকরোগুলো আটকে ছিল সেগুলো এখন গিয়ে শরীরে আঘাত হতেই একে একে সব মরতে শুরু করেছে। এই ভাবে পুরো যদুবংশ ঐখানেই মরে শেষ হয়ে গেল। আর কপাল এমন, ঐ পাথরের একটা টুকরো বেচে গিয়েছিল। একজন ব্যাধ ঐ টুকরোটা নিয়ে তীর বানিয়েছিল। যদুবংশ পুরো নাশ হয়ে যাওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ একটা গাছের তলায় চিত্তিত হয়ে অর্ধশায়িত হয়ে আছেন। ব্যাধ দূর থেকে একটা হরিণ ভেবে সেই তীরটা চালিয়ে দিয়েছেন। তারপর গিয়ে দেখেন শ্রীকৃষ্ণ। ঐ তীরেই শ্রীকৃষ্ণ শরীর ত্যাগ করলেন। ব্রাহ্মণ ঋষির অভিশাপ এই ভাবেই ফলে গেল।

### শ্রীকৃষ্ণের অবর্তমানে অর্জুন শক্তিহীন এবং যদুবংশীয় মহিলাদের রক্ষা করতে অর্জুনের অসফলতা

এই খবর হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদের কাছে আসতেই যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলছেন ‘এদের সব পুরুষরাই তো মারা গিয়েছেন এখন দ্বারকার মেয়েদের কি হবে! তুমি এক্ষুণি দ্বারকা গিয়ে সব মেয়েদের রক্ষা করে নিয়ে এস’। অর্জুন দ্বারকাতে এসে মেয়েদের নিয়ে আসছেন, পথে ডাকাতরা অর্জুনদের আক্রমণ করেছে। দস্যু, ডাকাতদের ছিনতাই, ডাকাতি এগুলো ভারতে চিরদিনই ছিল। ভারতে ডাকাতি ছিনতাইকে প্রথম নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়েছে ইংরেজরা আসার পর। একদল ডাকাতদের বলা হত ঠগী বাহিনী। এরা প্রচণ্ড চতুর এবং হিংস্র হত। তখনকার দিনে মানুষ পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করত। একটা গ্রুপ হয়তো এখান থেকে পাটনা হেঁটে যাচ্ছে। ঠগী বাহিনীরা যদি বুঝে নিত এদের সাথে টাকা-পয়সা আছে তখন এরাও এই গ্রুপের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকত আর এদের সাথে বন্ধুত্ব করে নিত। বন্ধুত্ব করে বিশ্বাস অর্জন করে যখন সব জেনে নিল কার সাথে কোথায় কি কি আছে তখনই তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকত কিভাবে সব হাতড়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এরা রাতে বন্ধুর মত পাশেই শোবে। আবার ঘুমন্ত অবস্থায় কাউকে খুন করত না। এটাই এদের ধর্ম ছিল। হঠাৎ করে চোঁচিয়ে উঠবে ‘সাপ! সাপ!’ করে। যখন গ্রুপের কেউ ধরমড় করে উঠে পড়ত তখন এরা একটা সিক্কের কাপড় দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে খুন করে দিয়ে সব জিনিষপত্র নিয়ে চলে যেত। এদের পুরো এক একটা গ্যাঙ ছিল। একটা গ্যাঙ আরেকটা গ্যাঙকে বুঝে নিত এক ধরনের গুড়ের মাধ্যমে। বিভিন্ন স্বাদের গুড় রাখত। ঐ গুড় খেলে বুঝে নিত যে এই লোকটা আমার গ্যাঙের কি অন্য গ্যাঙের। পাটনা আর কানপুরের মধ্যে এরা সব থেকে বেশী সক্রিয় ছিল। একজন বৃটিশ প্রশাসক একবার উঠে পড়ে লেগেছিলেন এদেরকে একেবারে শেষ করে দেবার জন্য।

ডাকাতরা যেই আক্রমণ করেছে অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে গাণ্ডীব নিয়ে তীর মারতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। গাণ্ডীব দিয়ে তীর চালাতেই অর্জুন দুটো জিনিষ লক্ষ্য করলেন, এক দেখলেন গাণ্ডীবের তীরে সেই আগের মত বেগ আর নেই। দ্বিতীয় যেটা লক্ষ্য করলেন, অর্জুন যে অক্ষয় তুণীর পেয়েছিলেন দেখছেন তীর গুলো সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। ডাকাতরা যখন বুঝে গেল এই সেই অর্জুন, তখন অর্জুনকে আচ্ছা করে মারধোর করেছে আর যদুবংশের যত যুবতী মেয়েগুলো ছিল সব কটি মেয়েকে তুলে নিয়ে তার সাথে যত টাকা-পয়সা ছিল সবই কেড়েকুড়ে নিয়ে চলে গেল। অর্জুনের মত বীর তখন হতোদ্যম হয়ে কাঁদতে কাঁদতে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। যুধিষ্ঠিরকে সব কথা বললেন ‘এটা কি হয়ে গেল! আমি এত বড় যুদ্ধ করেছিলাম, এত বীরেরা আমার কাছে পর্যুদস্ত হয়ে পরাজয় স্বীকার করেছিল, আর আজ আমারই সামনে শ্রীকৃষ্ণের বংশের সব মেয়েগুলোকে অপহরণ করে নিয়ে চলে গেল, আমি কিছুই করতে পারলাম না’। তখন যুধিষ্ঠির বললেন ‘এতদিন তোমার যা কিছু শক্তি ছিল শ্রীকৃষ্ণের জন্যই ছিল। শ্রীকৃষ্ণও আজ আর নেই, তোমার শক্তিও শেষ হয়ে গেছে’। তখন পাণ্ডবরা ঠিক করল আমাদের আর বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই, চল আমরা সবাই প্রাণত্যাগ করব। কিভাবে প্রাণত্যাগ করবে? আমরা সবাই হাঁটতে হাঁটতে হিমালয়ের পথে চলতে থাকব।

### মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদী সহ পঞ্চ পাণ্ডবদের যাত্রা

তখন পাঁচ ভাই মিলে দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয়ের পথে চলা শুরু হল। এই যাত্রাকেই বলা হয় মহাপ্রস্থানের পথে। এদের পেছন পেছনে একটা কুকুরও চলেছে। মহাভারতের কাহিনীকে প্রথম থেকে এত দীর্ঘ টানা হয়েছে কিন্তু শেষের দিকে এসে কয়েক পাতার মধ্যেই পুরো কাহিনীটাকে এত তাড়াতাড়ি শেষ করে দিয়েছেন যে অবাক হয়ে যেতে হয়। মহাপ্রস্থানের পথে চলত চলতে প্রথম দ্রৌপদী পড়ে গেলেন। দ্রৌপদী পড়ে যেতেই ভীম চিৎকার করে বললেন ‘দাদা! দাদা! দ্রৌপদী পড়ে গেল’। যুধিষ্ঠির ফিরেও তাকালেন না। বললেন ‘পড়ে যাক। পাঁচ জনের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও ওর মনে



চিরদিনই অর্জুনের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা ছিল। এই পাপের জন্যই দ্রৌপদীর পতন হয়ে গেল। এখন পাঁচ ভাই শুধু চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পর ভীম আবার চিৎকার করে বলছেন ‘দাদা! সহদেবও পড়ে গেল। সহদেব আমাদের সবাইকে এত সেবা করত। ও কেন পড়ে গেল?’ যুধিষ্ঠির তখন বলছেন ‘সহদেব আমাদের মধ্যে নিজেকে বেশী বুদ্ধিমান মনে করত, এই অহঙ্কারের জন্য সহদেবের পতন হয়ে গেল’। আবার কিছুক্ষণ পর ভীম বলছেন ‘দাদা! নকুল পড়ে গেল’। যুধিষ্ঠির বলছেন ‘নকুল নিজেকে জগতের সব থেকে রূপবান মনে করত। এই পাপেই তার পতন হল’। কিছুক্ষণ পর আবার ভীম চৈঁচিয়ে বলছে ‘দাদা! দাদা! একি অর্জুন পড়ে গেল। সে তো হাসিঠাট্টাতেও কোন দিন মিথ্যা কথা বলেনি’। তখন যুধিষ্ঠির বলছেন ‘নিজের শক্তির উপর অর্জুনের বড় বেশী অহঙ্কার ছিল, আর সে নিজে একদিন বলেছিল আমি একদিনেই সব শত্রুর বিনাশ করে দেব। অথচ আঠার দিন যুদ্ধ চলেছি, অর্জুন এক দিনে তা করতে পারেনি। সঙ্কল্প করেছিল কিন্তু রাখতে পারেনি এই পাপেই তার পতন হল’। শেষে ভীমসেন পড়ে যেতে শুরু করেছে। ঐ অবস্থাতেই ভীম বলে যাচ্ছে ‘দাদা! দাদা! আমার দিকে তাকান, আমি পড়ে যাচ্ছি। আমি তো আপনাকে এত ভালোবাসতাম, আমি কেন পড়ে যাচ্ছি!’ যুধিষ্ঠির তখন ভীমসেনকে বলছেন ‘ভীম! তুমি অন্যকে ভক্ষ্যবস্তু প্রদান না করে নিজেই বড় বেশী খাওয়া-দাওয়া করতে আর নিজেকে অদ্বিতীয় বলশালী ভেবে খুব বেশী মাত্রায় আত্মশ্লাঘা করতে, আমার মত কেউ নেই। এই পাপেই তোমার পতন হল’।

যুধিষ্ঠির এবার একাই স্বর্গের পথে চলেছেন। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর দেবরাজ ইন্দ্র রথের চাকার আওয়াজে চারিদিক কম্পিত করতে করতে যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বলছেন ‘মহারাজ! আপনি এই রথে আরুঢ় হয়ে স্বর্গারোহণ করুন’। তখন যুধিষ্ঠির ভাইদের পতনের কারণে শোকাকুল হয়ে বলছেন ‘হে দেবরাজ! আমার স্ত্রী পাঞ্চালী ও আমার পরমপ্রিয় ভাইয়েরা রাস্তার উপর নিপতিত হয়ে রয়েছে। এদের সবাইকে পরিত্যাগ করে স্বর্গারোহণে আমার বিন্দু মাত্র বাসনা নাই। অতএব আপনি অনুগ্রহ করে আমার সাথেই এদের সবাইকে স্বর্গারোহণের ব্যবস্থা করে দিন’। ইন্দ্র তখন বললেন ‘মহারাজ! দ্রৌপদী ও আপনার চার ভাই মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করে আপনার আগেই স্বর্গারোহণ করেছে, আপনি এই নরদেহেই স্বর্গারুঢ় হয়ে তাদের সবার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবেন’। ইন্দ্রের কথা শোনার পর যুধিষ্ঠির আবার বলছেন ‘দেবরাজ! এই কুকুরটি আমার একান্ত ভক্ত এবং বহু দিন আমার সাথে সাথে আছে তাই একেও আমার সাথে স্বর্গারোহণ করার অনুমতি করুন। এই কুকুরকে ত্যাগ করে স্বর্গারোহণ করলে আমার পক্ষে নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার করা হয়ে যাবে’। ইন্দ্র কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না ‘হে ধর্মরাজ! যে ব্যক্তি কুকুরের সাথে একত্রে অবস্থান করে সে কখনই স্বর্গে বাস করতে সমর্থ হয় না। দেবতারার তার যজ্ঞদানাদির সব ফল বিনষ্ট করে দেন। অতএব আপনি অবিলম্বে এই কুকুরকে পরিত্যাগ করুন আর এতে আপনার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হবে না’। যুধিষ্ঠির তখন বলছেন ‘হে দেবরাজ! আমার ভাইরা ও দ্রৌপদী মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে গেছে, আমি তাদের কখনই জীবন দান করতে পারব না, তাই আমি তাদের পরিত্যাগ করেছি। এদের জীবিত অবস্থায় আমি কখনই পরিত্যাগ করিনি। আমার মতে শরণাগত ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন করা, স্ত্রীহত্যা, ব্রাহ্মণের সম্পত্তি হরণ ও মিত্রদ্রোহ এই চারটি কার্যে যে মহাপাপ আর ভক্তজনকে পরিত্যাগ করাতে একই পাপ হয়। সুতরাং আমি এই কুকুরকে কোন ভাবেই পরিত্যাগ করতে পারিনা’।

যুধিষ্ঠির এই কথা বলার পরেই কুকুরটি যমরাজের রূপ ধারণ করে মধুর বাক্যে বলছেন ‘বৎস! আমি তোমাকে পরীক্ষা নেওয়ার জন্যই কুকুর বেশে তোমার সাথে সাথে পথ চলেছি। এখন বুঝলাম তুমি সত্যিই অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, বুদ্ধিমান ও সর্বভূতে তোমার দয়া। এর আগেও আমি দ্বৈতবনে একবার তোমাকে পরীক্ষা করেছিলাম। সেখানে তুমি আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমাকে বিস্মিত করেছিলে। তারপর আবার ভীম ও অর্জুনের জীবন প্রার্থনা না করে তুমি তোমার সৎ মা মাদ্রীর কথা ভেবে নকুলের জীবন প্রার্থনা করেছিলে আর এখন কুকুরকে আশ্রিত বিবেচনা করে দেবরথ পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছ। তোমার এই সব কাজ দেখে আমি নিতান্ত প্রীত হয়েছি’।

### সশরীরে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ

যুধিষ্ঠির স্বর্গে যখন পৌঁছে গেছেন তখন তাঁর সামনে একটা দিব্য দৃশ্য সংঘটিত হল। তিনি দেখছেন দুর্যোধনরা সবাই স্বর্গে আছে কিন্তু তাঁর চার ভাইয়েরা এখন নরকে পড়ে আছে। যুধিষ্ঠির তখন বলছেন আমাকে আমার ভাইদের কাছে নিয়ে চল। যুধিষ্ঠির সেখানে পৌঁছে যেতেই ভায়েরা সব আতর্নাদ করে বলছে ‘দাদা! আপনি এখানে একটু অবস্থান করুন, আমরা এই নরকে খুব কষ্টে আছি। আপনি এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ালে আমাদের স্বস্তি বোধ হচ্ছে, আপনার উপস্থিতি আমাদের ভালো লাগছে, বাতাসটাও ভালো হয়ে গেছে’। তখন যুধিষ্ঠির বললেন ‘আমি কোথাও যাব না তোমাদের ছেড়ে, আমি

এখানেই থাকব’। তখন ঐ দৃশ্যটা মিটে গেল। ধর্মরাজ বলছেন ‘আমি তিনবার তোমার পরীক্ষা নিলাম। প্রথম যক্ষরাজ হয়ে, দ্বিতীয় একটা কুকুর হয়ে তৃতীয় তোমার ভাইদের নরকবাসের দৃশ্য অবলোকনের দ্বারা। তুমি নিজের সুখের পরোয়া না করে, ভাইদের ভালোবেসে তাদের কষ্ট দেখে তুমি স্বর্গসুখ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে দিলে। তাই এখন তুমি স্বদেহে স্বর্গে যাবে’। এরপর যুধিষ্ঠির সশরীরের স্বর্গে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখছেন তাঁর সব পূর্বপুরুষরা, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাই স্বর্গে রয়েছেন, তাঁর ভাইয়েরাও পৌঁছে গেছেন।

বলা হয় একমাত্র যুধিষ্ঠিরই নাকি সশরীরের স্বর্গে গিয়েছিলেন। আবার অনেক কাহিনীতে বলে তাঁর একটা আঙুল নাকি পচে গিয়েছিল যেহেতু যুদ্ধের সময় অশ্বথামা হত ইতি গজঃ এই মিথ্যা কথা বলেছিলেন। যাই হোক মহাভারতের কাহিনী মূলতঃ এইখানেই শেষ হয়ে যায়। শুভ রথাযাত্রার দিনে মহাভারতের এই দীর্ঘ আলোচনা শেষ করা হল।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ তৎসৎ।

ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্ণমস্তু ॥

**সূচীপত্র**  
দ্বিতীয় খণ্ড

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	<b>বিরাটপর্ব</b>	
১	পাণ্ডবদের এক বছর অজ্ঞাতবাস	১
২	রাজকর্মচারীর রাজার প্রতি আচরণের ব্যাপারে যুধিষ্ঠিরকে ধোঁম্যের শিক্ষা	১
৩	ভীম কর্তৃক কীচক বধ	৪
৪	কৌরবদের বিরাট রাজার গোধান অপহরণের অপচেষ্টা ও অর্জুনের কাছে পরাজয়	৬
	<b>উদ্যোগপর্ব</b>	
৫	দূতের গুণাবলী – শ্রীকৃষ্ণের ব্যাখ্যা	১০
৬	বলরাম কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের সমালোচনা	১১
৭	শ্রীকৃষ্ণ সমীপে দুর্যোধন ও অর্জুন উভয়ের একত্র আগমন	১২
৮	মদ্ররাজ শল্যের দুর্যোধনের শিবিরে যোগ	১২
৯	কৌরবদের দূত হয়ে সঞ্জয়ের বিরাট রাজার দরবারে আগমন	১৩
১০	বিদুর নীতি	১৫
১১	সনৎসুজাতীয় সংবাদ	২৬
১২	শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নামের অর্থ	৪১
১৩	দারিদ্রতার অভিশাপ ও পরিণাম – যুধিষ্ঠিরের আক্ষেপ	৪৪
১৪	দূত রূপে শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর আগমন	৪৭
১৫	বিদুলোপাখ্যান এবং পুত্রদের প্রতি কুন্তীদেবীর বার্তা	৫২
১৬	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কর্ণকে কর্ণের পরিচয় প্রদান	৫৫
১৭	যুদ্ধকে কর্ণের যজ্ঞের সাথে তুলনা	৫৬
১৮	রুক্মিী রাজার কথা	৫৭
	<b>ভীষ্মপর্ব</b>	
১৯	শিখণ্ডীর কাহিনী	৫৮
২০	অক্ষৌহিণীর বিবরণ	৫৯
২১	ধর্মযুদ্ধের নিয়ম কানুন নিরূপণ	৬০
২২	ভীষ্মের শরশয্যার খবর নিয়ে সঞ্জয়ের ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আগমন	৬১
২৩	অর্জুনের দুর্গাস্ততি ও অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের গীতার উপদেশ দান	৬১
২৪	যুদ্ধের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীষ্ম-দ্রোণাদির আশীর্বাদ প্রার্থনা	৬২
২৫	ভীষ্ম বধার্থে শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র হস্তে রথ থেকে অবতরণ	৬৩
২৬	ভীষ্মের পতন	৬৪
২৭	ভীষ্ম ও কর্ণের সংলাপ	৬৫
	<b>দ্রোণপর্ব</b>	
২৮	শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের থেকে ধৃতরাষ্ট্রের আশঙ্কা ও ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন	৬৬
২৯	কর্মবাদের উপর ধৃতরাষ্ট্রের মতামত	৬৭
৩০	ভগদত্ত বধ	৬৮
৩১	অভিমন্যু বধ	৭০
৩২	মৃত্যুর জন্ম কাহিনী	৭২
৩৩	অর্জুনের প্রতিজ্ঞা	৭৫
৩৪	অর্জুনের মুখে বিভিন্ন পাপকর্মের বর্ণনা	৭৫
৩৫	অর্জুনের প্রতিজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণের অসন্তোষ এবং পরে দারুককে একান্তে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ	৭৭

৩৬	জয়দ্রথের রক্ষার জন্য দ্রোণাচার্যের শকটব্যুহ রচনা	৭৮
৩৭	অর্জুনের অগ্রসরে দুর্যোধনের প্রতিরোধ	৮০
৩৮	ভুরিশ্রবা ও সাত্যকির লড়াই, অর্জুন কর্তৃক ভুরিশ্রবার দক্ষিণ হস্ত ছেদন	৮১
৩৯	জয়দ্রথ বধ	৮২
৪০	দুর্যোধনকে কর্ণের উপদেশ	৮৩
৪১	ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রশ্নে মূল্যবোধ	৮৪
৪২	কর্ণের প্রতি কৃপাচার্যের দোষারোপ	৮৫
৪৩	ঈশ্বরের ইচ্ছা আর শূন্য দিয়ে গুণ করা	৮৬
৪৪	কর্ণ আর অশ্বখামার বিবাদ	৮৬
৪৫	ঘটোৎকচের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং ঘটোৎকচের উপর কর্ণের শক্তি অস্ত্রের প্রয়োগ	৮৭
৪৬	ঘটোৎকচের মৃত্যুতে শ্রীকৃষ্ণের স্বস্তির কারণের ব্যাখ্যা	৮৮
৪৭	পূর্বেই অর্জুনের প্রতি কর্ণের শক্তি অস্ত্রের প্রয়োগ না করার কারণ	৯০
৪৮	দ্রোণাচার্যের অস্ত্র ত্যাগ	৯০
৪৯	সত্য ভাষণ ও মিথ্যা ভাষনের দ্বন্দের বিশ্লেষণ	৯১
৫০	ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক দ্রোণাচার্য বধ	৯৩
৫১	অশ্বখামার মতে মানুষ কখন অধর্ম করে	৯৩
৫২	অশ্বখামার নারায়ণাস্ত্রের প্রয়োগ, ভীমের নারায়ণাস্ত্রের উপক্ষা এবং অর্জুন কর্তৃক ভীমের রক্ষা	৯৪
৫৩	নারায়ণাস্ত্র ব্যর্থ হওয়াতে অশ্বখামার হতাশা এবং ব্যাসদেব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন	৯৫
৫৪	ব্যাসদেব কর্তৃক অবতার তত্ত্বের নিরূপণ ও শিবের মহিমা কীর্তন	৯৬
	<b>কর্ণপর্ব</b>	
৫৫	জীবনে সাফল্যের জন্য চারটে গুণ	৯৯
৫৬	কর্ণের রথের সারথির ভূমিকায় শল্য	১০০
৫৭	কর্ণ ও শল্যের মধ্যে বাকযুদ্ধ	১০২
৫৮	অর্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ধিক্কার, অর্জুনের যুধিষ্ঠির বধের উদ্যোগ এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে নিবারণ	১০৬
৫৯	ভীমের দুঃশাসন বধ	১০৮
৬০	অর্জুন আর কর্ণের সম্মুখ লড়াই ও কর্ণের পতন	১০৯
	<b>শল্যপর্ব</b>	
৬১	দুর্যোধনের হ্রদ মধ্যে প্রবেশ, যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের বাদানুবাদ, ভীম কর্তৃক গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ	১১১
৬২	শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুর্যোধনের কুটুক্তি ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দুর্যোধনের বিভিন্ন অধর্ম কর্মের বিবরণ	১১৩
	<b>সৌপ্তিকপর্ব ও স্ত্রীপর্ব</b>	
৬৩	রাতের অন্ধকারে অশ্বখামাদির পাণ্ডব শিবিরে হানা, পঞ্চ পাণ্ডবদের পুত্রদের বধ, অশ্বখামার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ ও নারদের হস্তক্ষেপ	১১৩
৬৪	ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুরের সান্ত্বনা	১১৪
৬৫	ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক ক্রোধবশাৎ ভীমের লৌহমূর্তি চূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণকে গান্ধারীর অভিশাপ	১১৫
	<b>শান্তিপর্ব</b>	
৬৬	যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি ও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের ইচ্ছা, ব্যাসদেব কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ	১১৬
৬৭	ধর্মের প্রমাণ ধর্ম	১১৭
৬৮	দায়বদ্ধতা নির্ধারণের তত্ত্ব	১১৮
৬৯	কাল, কর্মবাদ, বিধাতা ও কালের পরিহাস	১১৯
৭০	কার পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান নেই	১২১
৭১	কোন কোন কাজে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়	১২২
৭২	যুধিষ্ঠিরের কাছে চার্বাকের আবির্ভাব	১২৩
৭৩	পিতামহ ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর	১২৩

৭৪	তৎকালীন সমাজের বর্ণধর্ম	১২৮
৭৫	শত্রু বা বিরোধীদের প্রতি রাজার আচরণ প্রসঙ্গে বৃহস্পতি নীতি	১৩০
৭৬	মানবজীবনে পিতা, মাতা ও গুরুর স্থান	১৩৩
৭৭	চার ধরনের পাপ কর্মের প্রায়শ্চিত্ত হয় না	১৩৪
৭৮	সত্য ও অসত্যের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক নীতি	১৩৫
৭৯	ধর্মের পূর্ণাঙ্গ রূপ	১৩৫
৮০	দুঃখ, সঙ্কট, বামেলা, মহাবিপদাদি থেকে মুক্তির উপায়	১৩৮
৮১	শেয়াল ও বাঘের কাহিনীর মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্মের নীতিশাস্ত্রের শিক্ষা	১৪০
৮২	মুর্খদের তপস্যার পরিণতি ও উটের কাহিনী	১৪১
৮৩	বিশ্বামিত্র ও চণ্ডালের কাহিনীতে আপৎধর্মের বিশ্লেষণ	১৪২
৮৪	অতিথি সেবার আদর্শ এবং ব্যাধ ও পায়রার কাহিনী	১৫০
৮৫	ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে তপস্যার গুরুত্ব	১৫০
৮৬	সত্যই পরম গতি	১৫২
৮৭	কাম, ক্রোধ ও লোভের উৎস ও এগুলোর প্রতিক্রিয়া	১৫৩
৮৮	ধর্ম, অর্থ ও কামের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের বিচার	১৫৮
৮৯	মুক্তির ইচ্ছা কার হয়	১৫৯
৯০	কৃত্যে বিনাশ ও বন্ধুত্বে ঈশ্বরলাভ	১৬২
৯১	ত্যাগের মহিমা (মক্ষিগীতা)	১৬৩
৯২	রাজা জনক ও নহুষ সংবাদ (বোধ্যগীতা)	১৬৫
৯৩	জগতে সুখে কিভাবে বিচরণ করা যায় – ব্রাহ্মণ ও প্রহ্লাদ সংলাপ	১৬৭
৯৪	জন্ম, কর্মফল ও পুণ্যফলাদি নির্ধারণে মহাভারতের মত এবং সত্য ও মডেলের পার্থক্য	১৬৮
৯৫	দৈনন্দীন জীবনে আচার	১৭৫
৯৬	শরীরের উপর পাপকর্মের প্রতিক্রিয়া	১৭৬
৯৭	পাপ লুকালে পাপ বাড়ে, লুকিয়ে ধর্ম করলে ধর্ম লাভ ত্বরান্বিত হয়	১৭৭
৯৮	অধ্যাত্ম ও ধর্মের প্রভেদ	১৭৭
৯৯	সৃষ্টির ব্যাপারে মহাভারতের চিন্তাধারা ও সত্ত্ব, রজো ও তমো গুণানুসারে জীবের স্বভাব	১৭৮
১০০	তত্ত্বদর্শি কে?	১৮২
১০১	জ্ঞান ও ভক্তির লক্ষ্য ও পরিণাম এক	১৮৩
১০২	মহাভারতের মতানুসারে জপ-ধ্যান প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ	১৮৪
১০৩	ইন্দ্র ও বলিরাজার সংবাদ	১৮৮
১০৪	পুত্র শুকদেবকে ব্যাসদেবের উপদেশ (বারো রকমের যোগ – উত্তম জ্ঞান কিসে হয় – শান্তি কিসে আসে – ধ্যানের মাধ্যমে পঞ্চ তত্ত্বকে জয়ে কি কি সিদ্ধাই – ব্যক্ত ও অব্যক্তের সংজ্ঞা – জগতে কত রকমের প্রাণি ও তার শ্রেণিবিভাগ্যস)	১৯১
১০৫	সন্ন্যাসীর আচরণ ও ধর্ম	১৯৮
১০৬	ধর্মের উৎপত্তি ও কি প্রাপ্তির জন্য ধর্ম পালন? এই প্রসঙ্গে জাজলি ও তুলাধরের সংলাপ	২০৩
১০৭	ধর্ম, অর্থ ও কামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি? এই প্রসঙ্গে নির্ধন ব্রাহ্মণ ও কুণ্ডারের কাহিনী	২০৮
১০৮	শান্তিপর্বের মূল বক্তব্য	২১০
১০৯	পরশর গীতা	২১২
১১০	হংসগীতা	২১৬
১১১	সাংখ্য ও যোগ দর্শনের আলোচনা এবং যোগীদের যোগ সাধনা	২১৮
	<b>অনুশাসনপর্ব</b>	
১১২	লক্ষ্মী কোথায় থাকেন আর কোথায় থাকেন না	২২৩
১১৩	গুরুবাক্যে উপমন্ডুর নিষ্ঠা	২২৬
১১৪	মহাভারতে গঙ্গার মাহাত্ম্য (গরুড়ের জন্ম কাহিনী – বালখিল্য ঋষিদের যজ্ঞ – গরুড়ের জন্ম – গরুড় কর্তৃক অমৃত হরণ – বিনতার দাসত্ব মোচন)	২২৭
১১৫	কন্যাদানের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পাত্র-পাত্রীর বয়সের ব্যাপারে মহাভারতের মত	২২৯

১১৬	ভারতে গরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও গোমাতা পূজার প্রচলনের ইতিহাস	২৩০
১১৭	দানাদি গ্রহণের ফল ও উপবাসের ব্যাপারে মহাভারতের অভিমত	২৩৩
১১৮	সপ্তর্ষি ঋষি ও শিব রাজার কাহিনী	২৩৪
১১৯	ভগবান বিষ্ণুকে প্রসন্ন করার বিবিধ বিধি নিয়মাদি	২৩৭
১২০	বিভিন্ন প্রথা ও নিয়মের ব্যাপারে বিভিন্ন ঋষির বিভিন্ন উপদেশ	২৩৯
১২১	শিব-পার্বতীর সংবাদ (ধর্ম ও অধর্মের স্বরূপ – সর্বজ্ঞের সংজ্ঞা – কর্মের বন্ধন কিভাবে হয় – মন, বাণী ও ক্রিয়াকে ঠিক করা – এবং বহু প্রকার ধর্ম ও অধর্মের ব্যাপারে শিবের উপদেশ)	২৪১
১২২	ভীষ্মের দেহত্যাগ	২৫৭
১২৩	অনুগীতা	২৫৮
১২৪	শ্রীকৃষ্ণের দিব্যশক্তিতে পরীক্ষিতের বেঁচে ওঠা	২৭৪
১২৫	যজ্ঞস্থলে নেউলের গড়াগড়ি	২৭৪
১২৬	ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, গান্ধারী ও কুন্তীর বাণপ্রস্থ ও মর্ত্যধাম ত্যাগ	২৭৫
১২৭	যদুবংশের নাশ ও শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যলীলার পরিসমাপ্তি	২৭৫
১২৮	শ্রীকৃষ্ণের অবর্তমানে অর্জুন শক্তিহীন এবং যদুবংশীয় মহিলাদের রক্ষা করতে অর্জুনের অসফলতা	২৭৬
১২৯	মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদী সহ পঞ্চ পাণ্ডবদের যাত্রা	২৭৬
১৩০	সশরীরে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ	২৭৭

